মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

১৩১৯

কলিকাতা

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

ই

উ

এ

ক

ল

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

চিত্র-সূচী।

লক্ষ্মী।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ভারতশিল্পের ইতিহাস।

মানবসমাজ স্বভাবতই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। অত্যন্ত অসভ্য মানবসমাজেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও দেশকালের প্রচলিত প্রভাব সকল শ্রেণীর মানব-সমাজকেই নানা উপায়ে সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের জন্য লালায়িত করিয়া থাকে। সেই লালসা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলিয়া, তাহার তাড়নায় মানবসমাজে বিবিধ শিল্পকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। কোন সময়ে ইহার আরম্ভ, কেহ তাহার কালনির্ণয় করিতে পারেন না। যত পুরাকালের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই বুঝিতে পারা যাইতেছে,—কোনও কালেই মানবসমাজে শিল্পকৌশলের অভাব ছিল না।

এই কৌশল ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে যুগে কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতেই মানবচেষ্টা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত, সেই যুগেও—নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী-গঠনেও,—মানবপ্রতিভা তাহাকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিত; কেবল প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী করিয়া কোনও ক্রমে গড়িয়া তুলিবামাত্র নিরস্ত হইতে পারিত না। সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হইবামাত্র মানবসমাজ বিনা প্রয়োজনেও রচনা-কার্য্যে চিত্তবিনোদন করিত; তাহাকে বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করিয়া, ঘর-সংসারকে সুন্দর করিয়া তুলিবার আয়োজন করিত। এই সকল কারণে, শিল্পের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারত-শিল্পের ইতিহাস সংকলিত না হইলে, ভারত-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে না। ইহা সত্য হইলেও, এ কথা এখনও আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না।

দেশের লোকে এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এতদিন একখানি ভারতশিল্পের ইতিহাস সঙ্কলিত করিবার জন্য যত্ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারাও একটি কারণে এত দিন এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের অগণ্য মূর্ত্তিশিল্পের সন্ধানলাভ করিয়াও, এত দিন উদাসীন ছিলেন কেন, তাহা প্রথমে বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে।

কিন্তু যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে গ্রন্থ-রচনার প্রথম **প্রয়াস** করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থেই ইহার কারণ উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। ওয়েষ্টমেকট এইরূপ এক জন গ্রন্থকার। তাঁহার ভাস্কর্য্যশিল্প-বিষয়ক * সুবিখ্যাত গ্রন্থ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—

"There is no temptation to dwell at length on the Sculpture of Hindustan. It affords no assistance in tracing the history of art and its debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art, the point of view from which it would have to be considered."

ওয়েষ্টমেকটের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতশিল্পকে সমুন্নত শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত ছিলেন। সুতরাং ভারত-শিল্পের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই বলিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ শিল্পজাত দ্রব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন; একশ্রেণী কলালালিত্যের আধার; আর একশ্রেণী কেবল কারুকার্য্যের আধার। তাঁহারা আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যকে শিল্পের নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করেন না;--তাহা 'পণ্য' নামেই কথিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যকেই পণ্যদ্রব্য বলিয়া মনে করিতেন; তাহার মধ্যে সমুন্নত শিল্পকলার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যে যুগে এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল, সে যুগে তাঁহাদের অপরাধ ছিল না। তখনও ভারতবর্ষের শিল্প-নিদর্শনগুলি যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে নাই বলিয়া, তাঁহারা তাহার মর্য্যাদা-নির্ণয়ের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

ভারতবর্ষে প্রকৃত শিল্পকলা বিকশিত হয় নাই, এই ধারণা এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যদেশে ভারতশিল্পদ্রব্যের অদ্বিতীয় অনুরাগী বলিয়া সুপরিচিত, সেই সার জর্জ্জ বার্ডউড পর্য্যন্ত [ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে] অকুতোভয়ে বলিয়াছিলেন,—"কি ভাস্কর্য্য, কি চিত্র, কিছুই ভারতবর্ষে কলাশিল্পের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। †

* Handbook of Sculpture. Edinburgh, 1864.

* Sculpture and painting are unknown as fine arts in India.—*Industrial Arts of India.*

ইহার পর ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রাচ্য-তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য এক অভিনব প্রয়াস প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বহুদেশের বহু পণ্ডিত প্রাচ্য ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া, তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে যবদ্বীপের একটি বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্র বিলাতের শিল্প-সভার * প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সকলেই তাহাকে শিল্পকৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, সার জর্জ্জ বার্ডউড অম্লানবদনে বলিয়াছিলেন,—

"The senseless similitude, by its immemorial fixed pose, is nothing more than an uninspired brazen image, vacuously squinting down its nose to its thumbs, knees and toes. A boiled Suet pudding would serve equally well as a symbol of passionate purity and serenity of soul." †

সার জর্জ্জের এই উক্তি সমগ্র ভারতশিল্পের প্রকাশ্য অপবাদ বিঘোষিত করিবামাত্র, বিলাতের ত্রয়োদশ জন রসজ্ঞ শিল্পাচার্য্য "টাইম্‌স্‌" পত্রিকায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন,—

"We the undersigned artists, critics and students of art... find in the best art of India a lofty and adequate expression of the religious emotion of the people, and of their deepest thoughts on the subject of the divine" (Times, Feb 28, 1910)

এই প্রতিবাদ কেবল ত্রয়োদশ জন শিল্পাচার্য্যের প্রতিবাদ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কারণ, অনেকেই এখন ভারতশিল্পের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। অধ্যাপক হাভেল, ডাক্তার কুমারস্বামী প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থ-পাঠেও অনেকের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—"ভারতশিল্প এক নূতন শিল্প-জগতের সন্ধান প্রদান করিয়াছে।"

এত কালের পর! তথাপি ইহাকে সুলক্ষণ বলিতে হইবে। তাহার প্রথম ফল প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয় একখানি "ভারতশিল্পের ইতিহাস" প্রকাশিত করিয়াছেন। * এই গ্রন্থই ভারতশিল্পের

* Royal Society of Arts.

† সার জর্জ এই সুতীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এত দূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, যবদ্বীপের প্রস্তরমূর্ত্তিকে brazen image বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

* A History of Fine Art in India and Ceylon, from the earliest times to the present day. Oxford, Clarendon Press.

ইতিহাস-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। তজ্জন্য ইহা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধনা লাভ করিবে। ইহার সকল কথাই আমাদের কথা। সুতরাং ইহার সমালোচনা আবশ্যক।

ভিন্সেণ্ট স্মিথের নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত। তিনি আমাদের দেশে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সঙ্কলনে যেরূপ অধ্যবসায়ের ও বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তাঁহার গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-গ্রন্থরূপে পরিগৃহীত হইয়া, ছাত্রসমাজেও সুপরিচিত হইয়াছে। ভ্রমপ্রমাদের অভাব না থাকিলেও, সেই গ্রন্থই এখন প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতশিল্পের ইতিহাস-বিষয়ক সদ্যঃ-প্রকাশিত গ্রন্থখানিও সেইরূপ সমাদর লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

এই গ্রন্থের সকল কথা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত ইতিহাসের কথা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তথাপি প্রথম উদ্যম বলিয়া, এরূপ গ্রন্থ-রচনার বাধা বিপত্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। ইহাতে অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত মতামত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ; অনেক মতামতের অনুকূল প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সে সকল কথা উপেক্ষা করিলেও, এই গ্রন্থে জানিবার কথার, শিখিবার কথার, এবং ভাবিবার কথার অভাব নাই।

প্রথম কথাই প্রধান কথা। তাহা ভারতশিল্পের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রয়োজনের কথা। এরূপ গ্রন্থের যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা ইহাতে বিশদ-ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে, তাহার শিল্প-কৌশলকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সরল সত্যটি ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকেই ভাল করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। কারণ, এখনও অনেকের ধারণা,—কারুকার্য্যময় ভাঙ্গা পাথরের টুক্‌রা কুড়াইয়া কি হইবে ? সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনেও এই কথা সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যে পরিপাটীর সাহায্যে লোকে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকুক, তাহার নাম "ভাষা",—এইরূপ একটি ব্যাখ্যা সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত আছে। * এই লক্ষণা সংকীর্ণ লক্ষণা নহে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—ইঙ্গিত,

---

* ভাষতে অনয়া (পরিপাট্যা) লোক ইতি।

সঙ্গীত, কথোপকথন, লিখনপ্রণালী, চিত্র ও ভাস্কর্য্য সমান ভাবেই ভাষা-পদবাচ্য। যে উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহাকেই "ভাষা" বলিতে হইলে, চিত্রকে ও ভাস্কর্য্যকে ভাষা বলিতে ইতস্ততঃ করিব কেন? তাহারও ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে, ছন্দ আছে, যতি আছে, অলঙ্কারশাস্ত্র আছে;—তাহাকেও এক শ্রেণীর কাব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার মধ্যে পুরাকালের কত ভাব, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত শিক্ষা দীক্ষা, কত লোকচরিত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে কেমন করিয়া?

এই উপায়ে গ্রীস, মিশর, বাবিলন প্রভৃতি কত দেশের বিলুপ্ত পুরাকাহিনী সঙ্কলিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার কথা স্মরণ করিলেও, আমাদের ঔদাসীন্য বিদূরিত হইতে পারে। ইতিহাস এখন আর ঘটনা-বিবৃতির তালিকা-মাত্র বলিয়া কথিত হয় না। তাহা মানব-মনের ক্রমবিকাশের চিত্রপট;—শিল্পনিদর্শনগুলিকে উপেক্ষা করিলে, সে চিত্রপট যথাযথরূপে অঙ্কিত হইতে পারে না। আরও একটি কারণ আছে;—পুরাকালের সাহিত্য পুরাকাহিনী-সঙ্কলনের প্রধান অবলম্বন হইলেও, সকল বিষয়ে তাহাকে নিঃসংশয়ে অবলম্বন করা যায় না। তাহাতে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত মতামতের ছায়া অনেক সময়ে সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যাহা হওয়া উচিত, তাহাতে তাহারই প্রাধান্য থাকে;—যাহা সত্য সত্যই বর্ত্তমান ছিল, তাহা বহু ক্লেশে বাছিয়া বাহির করিতে হয়। শিল্পের নিদর্শন সেরূপ নহে। তাহা দেশপ্রচলিত সর্ব্বলোক-নমস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার ধ্যান-ধারণার অমোঘ নিদর্শন। লিখিত সাহিত্যের সাহায্যে শিল্পনিদর্শনের, এবং শিল্পনিদর্শনের সাহায্যে লিখিত সাহিত্যের, অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেই, আমরা পুরাকালের প্রকৃত চিত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারি। কেবল লিখিত সাহিত্যেই বাল্মীকি-ব্যাস ও কালিদাস-ভবভূতি আবির্ভূত হন নাই; শিল্পসাহিত্যেও অনেক মহাকবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের নামগোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের রচনাগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যাঁহারা কথা গাঁথিয়া, অবাঙ্‌মনসগোচরকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়াও, বাক্যে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া, ঋষিপদবাচ্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, যাঁহারা অরূপকে রূপের আভাসে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবজ্ঞাত হইবেন কেন? বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র,

কাব্য, নাটক, দর্শন, গণিত আলোচিত হইবে; আর অজন্তা, অমরাবতী, খণ্ডগিরি প্রভৃতি অনালোচিত থাকিবে কেন? তাহার আলোচনার চেষ্টাকে উপহাস করা সহজ; তাহার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এক সময়ে অভিজ্ঞানশকুন্তল ভাষান্তরিত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে প্রেরিত হইবার পর, ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের অনুসন্ধান কার্য্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর আগ্রহ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্প্রতি ভারত-শিল্পের পুরাতন নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াও, সেইরূপ অনুসন্ধান-চেষ্টা প্রচলিত করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা সভ্যসমাজে বিজ্ঞ বিচক্ষণ বলিয়া সুপরিচিত, তাঁহারাও কারুকার্য্যখচিত ভাঙ্গা পাথর কুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদের দেশে তাহার কথা "অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্‌" হইলেও, সভ্য-সমাজে তাহার কথা এখন সমাদরলাভের যোগ্য বলিয়াই মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইতেছে। যাঁহারা এতকাল বলিতেন,—"ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, নানা ভাষা, নানা আচার ব্যবহার," এখন তাঁহারাই বলিতেছেন,—"এ সকল বর্ত্তমান থাকিলেও, সমগ্র ভারতবর্ষের যে একটি নিজস্ব চরিত্রসত্তা বর্ত্তমান আছে, ভারতশিল্পে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে।" *

শিল্পের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্য যেরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রতি সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই।

আমরা এক। জাতিভেদ, ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, তাহার অন্তরায় হইতে পারে নাই। এই ঐতিহাসিক সত্যটির মধ্যেই ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র নিহিত রহিয়াছে। শিল্পে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, সাহিত্যালোচনার ন্যায় শিল্পালোচনাও নব্যভারতের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে, শিল্পাদর্শের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, জাপান-নিবাসী কাকাসু ওকাকুরা সভ্যসমাজকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন, †—"আমরা এক, সমগ্র আসিয়ানিবাসী জনসাধারণই এক", এবং শিল্পের মধ্যেই সেই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। যে শাস্ত্রের আলোচনায়

* ভিন্সেণ্ট স্মিথ ইহার পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়াছেন,—"Notwithstanding the endless diversity of races, creeds, customs and languages, India as a whole has a character of her own which is reflected in her art."

* The Ideals of The East.

আমরা এই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারি, তাহাকে উপহাসে উড়াইয়া দিলে, আমাদের জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য প্রশংসালাভ করিতে পারে না।

এখন কেবল যথারীতি অনুসন্ধানকার্য্য আবদ্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে ; এখনও অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দেশের লোককে পাথর কুড়াইতেই হইবে। ইহার জন্য শ্রমস্বীকার করিতে হইবে, অর্থব্যয় করিতে হইবে, উপযুক্ত অনুসন্ধান-পদ্ধতির ও বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশের লেখকগণের উপর এই ভার ন্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলে, সকল সময়ে সকল বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। তাঁহারা পথপ্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন ; আমরা গৃহকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া, অনুসন্ধান-কার্য্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে কাহার ক্ষতি,—তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশেও, ভারত-শিল্পের অল্পবিস্তর আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এই আলোচনা প্রকৃতপথে যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হইলে, ভারত-শিল্পের মূল প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাহা যে কেবল সভ্যসমাজের সম্মুখে এক নূতন শিল্প-জগতের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াই নিরস্ত হইবে, তাহা নয়। তাহাতেই আমরা আমাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিব ;—সে কালের সহিত এ কালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের পরিচয় লাভ করিয়া, আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিব।

এই অনুসন্ধান-কার্য্য যত অধিক দূর অগ্রসর হইবে, ততই ভারতশিল্পের নূতন নূতন কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের অকাতর অর্থব্যয়ে, এবং অপরাজিত অধ্যবসায়ে, বাঙ্গালীর শিল্পপ্রতিভার যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইতেছে, তাহা এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজের সম্মুখে যথাযোগ্যভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। তাহাতেও এক নূতন শিল্প-জগৎ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহা বাঙ্গালীর শিল্পজগৎ ;—বাঙ্গালীর ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য গৌরব-ক্ষেত্র। সে জগতের শিল্প-সম্রাট বরেন্দ্রভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বেও, তাঁহার নাম অপরিজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আজ।

১

সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি !
তুমি যাহে দেছ পদ,—
সে যে ফুল্ল কোকনদ !
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ-মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?

২

তুমি চোখে মুখে হেসে',
উড়ায়ে আঁচলে কেশে,
চলে' গেলে নিজ দেশে অতি ফুল্লমতি !
মানিলে না কোন মানা,
আমি কেন ভাবি নানা ?
চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী ?

৩

কোন্ দিকে, কোন্ পথে,
চড়িয়া পুষ্পক-রথে
কখন চলিয়া গেলে তুমি দ্রুতগতি—
চিতা-ধূম-অন্ধকারে,
বিষম শোকাশ্রু-ভারে,—
তখন দেখি নি চেয়ে, ছিনু ছন্নমতি।

৪

আজ
দেখি মুছি' অশ্রুভারে,—
তোমারে বরিয়া দ্বারে
ল'য়ে যান আগুসারে দেবী অরুন্ধতী !

বুদ্ধ।

Engraved &Printed by K. V. Seyne & Bros.

দেব-বালা বেছে বেছে,
চরণে বিছায়ে দেছে,
মল্লিকা যুথিকা বেলা শেফালি মালতী।

৫

আঁচলে নয়ন মুছে
মাতৃলোক কত পুছে!—
কত না তারকা-দীপে করিছে আরতি!
অপ্সরী কিন্নরী কত
চামর-ব্যজনে রত;
অমর অমরী কত করে স্তুতি নতি!

৬

কমলা করুণা-ভরে
স্বর্ণ-ঝাঁপি দেন করে!
আদরে নয়ন-দুটি মুছান ভারতী!
আগ্রহে পরান শচী
পারিজাত-মালা রচি',
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু পরান পার্ব্বতী!

৭

শুভ সমারোহ হেন,
তবু যেন—তবু যেন—
তোমার সপ্রেম-দৃষ্টি খুঁজিছে জগতী!
আমি রোগে—দুখে—শোকে,
গোধূলির ক্ষীণালোকে
কর-যোড়ে করিতেছি মরণে মিনতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

বংশানুক্রম।

১

এই গুরুতর বিষয়ের যথাযোগ্য আলোচনা, আমার সাধ্য থাকিলেও, এ স্থলে সম্ভব হইত না। তথাপি, এই বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা আবশ্যক, এই বিবেচনায় সঙ্ক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষিত-সমাজেও এই শাস্ত্রে যেরূপ অনাদর দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বথা শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে এ শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে, মনুষ্য-সমাজের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না। আমরা অনেক শাস্ত্রেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু মানুষ হইয়াও মানব-তত্ত্ব চিরদিন উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, মনুষ্য-সমাজের উন্নতি অবনতি প্রধানতঃ যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, সে বিষয়ে আমরা অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। অথচ জীবন-পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছাও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, অন্ধের ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া বহু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। মানুষ বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল; প্রধানতঃ বংশানুক্রমেরই ফল। মানুষের উন্নতি অবনতি এই বিষয়ের আলোচনার উপর যত দূর নির্ভর করে, অন্য বিষয়ের উপর তত দূর নহে। আমরা সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছি; কিন্তু উপভোগ করিবে কে? আমরা যে দিন দিন নির্ব্বাণ-মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছি! এখনও যদি এই বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন না করি, এবং তাহা সৎসাহসের সহিত কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে আত্মহত্যার পাপ স্পর্শিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আর উপেক্ষা না করিয়া সকলেরই ইহাতে মনোনিবেশ করা উচিত। আমি এমন স্পর্দ্ধা করি না যে, যেরূপ ভাবে এই শাস্ত্রের আলোচনা হওয়া আবশ্যক, তাহা করিতে পারিব। তথাপি, এ বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

প্রয়োজন

বংশানুক্রম কি? ইহা কি কোনও শক্তি? না, ইহা শক্তি নহে। ইহা সাদৃশ্যবাচক শব্দ মাত্র। মাধ্যাকর্ষণাদির ন্যায় শক্তিবোধক শব্দ নহে। সকলেই জানেন, সন্তান পিতা মাতার আকৃতি ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সন্তানের সহিত পিতা মাতার সাদৃশ্য চিরপ্রসিদ্ধ। অনেক

সংজ্ঞা।

সময় মুখ দেখিলেই বলা যায়, অমুক অমুকের পুত্র, অথবা কন্যা। কিন্তু সাদৃশ্য থাকিলেও, পিতা ও পুত্র, ঠিক এক নহে। প্রভেদও অনেক দেখা যায়। আকৃতিতে ও স্বভাবে উভয়ের মধ্যে বহু প্রভেদ আছে ; নচেৎ উভয়কে পৃথক করিয়া চেনাই যাইত না। উভয়ের পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। যে পরিমাণ সাদৃশ্য ও যে পরিমাণ বৈষম্য আছে, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করা, তাহার কারণ সকল জ্ঞাত হওয়া, তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফল উপলব্ধি করা,—বংশানুক্রম শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বংশানুক্রমের নিয়ম সকল ও কার্য্য-প্রণালী জ্ঞাত হইয়া সমাজকে তদনুসারে পরিচালিত করা, ইহার সার্থকতা। আমরা প্রথমতঃ ব্যক্তির বংশানুক্রমের আলোচনা করিব। পরে এই আলোচনার ফল সমাজ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিব। পিতা মাতা বলিলে এ স্থলে কেবল তাঁহাদিগকেই বুঝাইবে না। জাতক শুধু পিতৃমাতৃধর্ম্মই প্রাপ্ত হয় না ; পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিগণের ধর্ম্মও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কখনও দেখা যায়, পিতামহের ন্যায় অঙ্গ হইল, কখনও বা মাতামহের ন্যায় ; কখনও বা তাঁহাদিগের স্বভাব, কখনও পীড়া ইত্যাদি অনেক বিষয়েই বহুসংখ্যক পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্ম লইয়া জাতক ভূমিষ্ঠ হয়।

জাতক দেহে ও মনে নূতন সৃষ্টি নহে। যেন জগতে কাহারও সহিত তাহার সংস্রব নাই, সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, এরূপ বিবেচনা ভ্রমসঙ্কুল। সে পিতৃমাতৃজ, সুতরাং পিতৃমাতৃবংশের ধর্ম্ম ন্যূনাধিক প্রাপ্ত হইবেই। ইহাই তাহার জন্মগত নিজস্ব, ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব। ইহার প্রভাব সে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিবে না। তাহার পিতা মাতা পরিবর্ত্তন না করিলে, তাহার জন্মাগত উপকরণ পরিবর্ত্তিত না হইলে, তাহার ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন করা যায় না। কাদার মত তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করা যায় না। শিক্ষা ও সংসর্গ প্রায় বিফল হয় ; তাহার স্ব-ভাবই প্রবল হইয়া উঠে।

ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ ॥—মিত্রলাভ ; ১৬।

কথিত আছে, হজরৎ মহম্মদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন্ সময়ে বালককে শিক্ষা দেওয়া উচিত ?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তাহার জন্মের অন্ততঃ এক শতাব্দ পূর্ব্বে।" সেই মহাপুরুষ এই বাক্য দ্বারা

বংশানুক্রমের কথাই সূচিত করিয়াছিলেন। যে বংশানুক্রম অনুসারে দুর্জ্জন, তাহাকে শিক্ষা দিলে, সে আরও ভয়ঙ্কর হইতে পারে।

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ংকরঃ ॥"—মিত্রলাভ ; ৯০ ॥

'চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনে না।' গুরু শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করিবার শক্তি দান করিতে পারিবেন না। জাতক যে উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন তিনি করিতে পারিবেন না ; যদি পরিস্ফুট করিতে পারেন, বড়ই ভাগ্যের কথা। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন,—

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ পুনর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ ॥

গুরু, প্রাজ্ঞ ও জড়, উভয়কেই বিদ্যা দেন ; কিন্তু তাহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি দিতে পারেন না। অপহরণ করিতেও পারেন না। তাই, এক জনের ফল হয়, অপরের হয় না। শক্তি অন্তর্নিহিত, উহা উপাদান-গত। উপাদান বংশগত। সুতরাং বিদ্যা কি করিবে? জগতের শিক্ষিত বদ্‌মায়েস্‌দিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাই বেদে অধিকার সকলের নাই ; সকল ব্রাহ্মণেরও নাই। ইহাই এতদ্দেশীয় প্রাচীন নির্দ্দেশ। ইহা সমাজের মঙ্গল-বিধান। সকল কার্য্যেই অধিকারি-ভেদ আছে ; জন্মই অধিকার প্রদান করে। শিক্ষা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্তর্নিহিত শক্তিকে কখনও কখনও বিকশিত করিতে পারে, সত্য ; কিন্তু উহাদিগের শক্তি অধিক নহে। পণ্ডিত ডন্‌ক্যাষ্টার বলিতেছেন, "বাইওমেট্রিসিয়ান অথবা মেণ্ডেলিয়ান, উভয়েই স্বীকার করেন যে, শুক্রশোণিত যেরূপ হইবে, অপত্যও তেমনই হইবে ; উহাদিগের মধ্যে যাহা আছে, ব্যক্তির মধ্যে তাহা থাকিবে ; পারিপার্শ্বিক অথবা বাহ্য অবস্থা তাহার অল্পই বিকাশ করিতে সমর্থ হয়। (১) অতি অনুন্নত জীবের সম্বন্ধেও এ কথা সত্য ; মানবের ন্যায়

(১) It matters not whether the character considered is regarded from the standpoint of the Biometrician or the Mendelian, both agree that what is present in the individual, and that external conditions as a rule play but a small part in determining its appearance.—Heredity in the light of recent research. p. 112.

উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবের সম্বন্ধে ইহা বিশেষ ভাবে সত্য। ইহা জীব-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম; ইহার ব্যভিচার প্রায় দেখা যায় না। মানবের দেহ ত সম্পূর্ণ ই বংশানুক্রমের ফল; মনও তাহাই। উভয়েই পরিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনতা বড় স্বীকার করে না। (২) এই নিমিত্তই মানবের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে বংশানুক্রম শাস্ত্রের আলোচনা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। তাঁহার অন্য পন্থা নাই।

বিঘ্ন।

এই আলোচনায় বহু বিঘ্ন আছে। সে সকল হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক। যাহার যেমন সাধনা, তাহার সিদ্ধি তেমনই হয়। আমাদিগের আদর্শ উপযুক্ত ছাঁচে গড়া চাই। একটি চুট্‌কী গল্প কেহ শুনাইল, কেহ একটা বাহারে মিল্ দিয়া দুই ছত্র লিখিয়া দিল—অমনই তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। অমনই তাহাকে মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম! এরূপ আদর্শের যত দিন পূজা করিব, তত দিন সাহিত্যালোচনা সফলতা লাভ করিবে না। যাঁহারা পৃথিবীর অসভ্য বর্ব্বর-জাতীয়গণের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অসভ্যগণ বড়ই ভাবোন্মত্ত; হিতাহিত-জ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়া ভাবে উন্মত্ত হয়। সভ্য-দিগের পক্ষেও ভাবোন্মাদ আবশ্যক; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ভাবোন্মত্ত হইলে, সভ্যে ও বর্ব্বরে প্রভেদ থাকে না। রোম নগরীর যখন ধ্বংস হয়, তখন নীরোর ন্যায় বেহালা-বাদনে উন্মত্ত হইলে, সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গলই সকল আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, ইহাই প্রার্থনীয়। তাহাই আবশ্যক। পন্থাও তদনুরূপ না হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমরা যে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই প্রদর্শন করি, ইহা কি আমাদিগের অসভ্য দ্রাবিড়ীয়-সংমিশ্রণজাত বংশানুক্রম সূচিত করিতেছে? করিতেছে না, এরূপ বলা যায় না। আমরা দীর্ঘকাল কোনও চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে পারি না। এ সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। শ্রদ্ধার সহিত সমাজের মঙ্গলকামনায় এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; নচেৎ ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমরা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই

---

(২) It shows how little room is left in the development of the individual for the effects of environment even on the intellect or mind in the broadest sense of the word.—Ibid p. 50.

তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং বংশানুক্রমের আলোচনায় তাঁহারা যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র তাহার সমর্থন করা যায় না। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন, জাতক তাহার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ পরজন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মে সৎ অসৎ কর্ম্ম যাহা করিয়াছিল, তদনুসারে শুভাদৃষ্ট অথবা দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া জীবকে জন্ম-জন্মান্তরে নানা যোনি ভ্রমণ করাইয়া থাকে। পর পর জন্মের কর্ম্ম দ্বারা, অথবা ভোগ দ্বারা, ঐ অদৃষ্ট-বন্ধন ছেদন করিতে হয়; নচেৎ জীবের পরম-পুরুষার্থ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পূর্ব্বজন্ম অঙ্গীকার করেন না। এই হেতু, বংশানুক্রমের আলোচনা শুক্র শোণিত (৩) হইতেই আরম্ভ করেন। জীবজগতে অধিকাংশ স্থলেই শুক্র-শোণিত-সংমিশ্রণে অপত্য গঠিত হয়। এক-কোষ জীব, অর্থাৎ যাহাদিগের দেহে একটিমাত্র কোষ (যথা ম্যালেরিয়া কীট ইত্যাদি) তাহারা ভিন্ন, এবং অপুংজনন (৪) যে সকল বহুকোষ জীবেরও সময় সময় দেখা যায়, তাহারা ভিন্ন, অন্যান্য জীব স্ত্রী-কোষ ও পুং-কোষের সংমিশ্রণে জাত হইয়া থাকে। উহাদিগের মিশ্রণে যে যুক্তকোষ (৫) উৎপন্ন হয়, তাহাই শত-সহস্রধা বিভক্ত হইতে হইতে অপত্যদেহের রচনা করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই স্থান হইতে বংশানুক্রমের আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই মতের সহিত জন্মান্তর-বাদের বিরোধ হয় না; কারণ, জন্মান্তরীয় জীবাত্মা কর্ম্মানুসারে যথাযোগ্য যুক্তকোষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জীবাত্মা কর্ম্মানুসারে বিভিন্নপ্রকার যুক্ত-কোষকে আশ্রয় করিতে হইলে, যব ব্রীহি আদি পদার্থে যুক্ত হইয়া পিতৃমাতৃদেহগত হয়, এবং এই উপায়ে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট, এবং পরে যথাসময়ে জাত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় পণ্ডিত-গণের এই মত স্বীকার করিলে, পাশ্চাত্য প্রণালীতে বংশানুক্রমের আলোচনা করিবার পক্ষে কোনও বিঘ্ন থাকে না। যুক্ত-কোষ-বাদ সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া জন্মান্তর-বাদ অস্বীকার করিবার কারণ নাই।

জন্মান্তর বাদ।

আর একটি কথা বলিয়াই ক্রমে মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সে কথাটি অদৃষ্টবাদ। বংশানুক্রমের আলোচনায় জন্মগত ব্যক্তিত্বই প্রবল,

---

(৩) শুক্র=পুং-কোষ; শোণিত=স্ত্রী-কোষ।

(৪) Parphro Genesis.

(৫) Lygite.

জানা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলকে তত দূর প্রবল বলা যায় না। এই মত সহজেই কঠোর অদৃষ্টবাদে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ কোনও কোনও স্থলে না হইয়াছে, তাহাও নহে। স্বয়ং বেটিসন্‌ও ঈদৃশ অদৃষ্টবাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। যদিও মুখে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয়, এ ভাব তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "বংশানুক্রমের ঘটনা-পরম্পরা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নহে, এইরূপ বিবেচনা করিতে আমরা ভালবাসি; কিন্তু এইরূপ অনুমান যে সত্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমি উহাদিগকে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বিবেচনা করিবার কারণ দেখি না; কিন্তু বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ মত আর পূর্ব্বের ন্যায় অসম্ভব বোধ করা যায় না। (৬) তবে কি আমরা অদৃষ্টবাদের অধীন হইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবাপন্ন হইতে চলিলাম? এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কিন্তু এ স্থলেও এতদ্দেশীয় পূর্ব্ব-মনীষিগণের মীমাংসা স্বীকার করিলেই, জড়ত্বের আক্রমণ হইতে অনেকপরিমাণে মুক্ত হওয়া যায়। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের বিবাদ চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ স্মরণ করুন। অদৃষ্ট, কাল ও পুরুষকার,—এই তিনের সংযোগে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই মীমাংসা অঙ্গীকার করিলেই জড়ত্ব আর আক্রমণ করিতে পারে না; পুরুষকার অপ্রতিহত রহিয়া যায়।

আনুপূর্ব্বিক কথা, অদৃষ্টবাদ।

শ্রীশশধর রায়।

---

(৬) On the other hand with the experimental proof that variation consists largely in the unpacking and repacking of an original complexity, it is not so certain as we might like to think that the order of these events is not predetermined * * * I see no ground whatever for holding such a view, but in fairness the possibility should not be forgotten, and in the light of modern research it scarcely looks so absurdly improbable as before.--Darwin and Modern Science. P. 101.

ডাক্তারের নির্ব্বুদ্ধিতা।

১

ডাক্তার সনৎকুমার নন্দী এম্‌. বি. পাশ করিয়া প্রথম যে দিন গ্রামে আসিলেন, সে দিন সনাতনপুরের অধিকাংশ লোক দল বাঁধিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। গ্রাম্য পুরোহিত বৃদ্ধ শ্রীকান্ত বাচস্পতি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "চিরজীবী হও বাবা, তোমাকে দিয়ে কেবল তোমার বাপ দাদার নয়, সনাতনপুর গ্রামখানার মুখও উজ্জ্বল হয়েছে।"

বাড়ীর ভিতর গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই মা সনৎকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "গরীব দুঃখীদের দুঃখ দূর করিস্ বাছা! ভগবান ছাড়া যাদের তিন সংসারে কেউ নেই, তাদের সেবা কর্‌লে ভগবানেরই সেবা করা হয়। লোকে যেন আমাকে রত্নগর্ভা বলে; তবেই তোকে গর্ভে ধারণ করা সার্থক হবে।"

সনৎকুমার নতমস্তকে বলিলেন, "মা, তোমার আশীর্ব্বাদ কি কখনও নিষ্ফল হয়? আমি প্রাণপণে গরীব দুঃখীর সেবা করবো।"

২

মায়ের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া সনৎকুমার চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সনৎকুমারের ইচ্ছা ছিল, তিনি কোনও বড় যায়গায় গিয়া স্বাধীন-ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার পিতা শরৎকুমার বাবু আদেশ করিলেন, 'সার্ভিস' লইতে হইবে।

শরৎকুমার বাবু সেকেলে সবজজ। সুদীর্ঘকাল সদরালাগিরি করিয়া গত পনের বৎসর হইতে তিনি বাড়ী বসিয়া নিরুপদ্রবে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। সরকারী চাকরীর উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস ও অনুরাগ। তিনি বলিলেন, "ওরে সোনা, এ বুড়োর কথাটা মনে রাখিস্,—'যেমন তেমন চাকরী, দুধ-ভাত!' স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করে' কেবল ত ভাব্‌বি, এপিডেমিক আরম্ভ হবে কবে? ম্যালেরিয়া এখনও হতভাগাগুলোর হাড় নিয়ে ভেল্‌কী খেলচে না কেন? 'গো-মড়কে মুচীর পার্ব্বণ!' তোকে স্বাধীন ব্যবসা করতে হ'বে না। সরকারী চাকরী নিয়ে 'এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন' হয়ে যা, কত নূতন নূতন দেশ দেখ্‌তে পাবি, কত নূতন নূতন রোগের চিকিৎসা করবি, কত শিখ্‌তে পারবি। এ বড় ভাল গবর্মেণ্ট রে, এখানে গুণের আদর নেই

যে বলে, সে মিথ্যাবাদী। আমি আট শো টাকার সদরালাগিরি থেকে অবসর নিয়ে এই যে মোটা পেন্সনটা ভোগ করচি, এ কি কম সুখ! গুণ দেখাতে পারিস্, কালে তুইও দেবেন ডাক্তারের মত রায় বাহাদুর হ'বি, 'সিভিল মেডিকেল আফিসারে'র পদে 'প্রমোশন' পাবি, সে কি কম সম্মান! বাইরের প্র্যাক্‌টিসই বা তোর কে বন্ধ করবে? মুখটা মিষ্টি করিস্, আর উপর-ওয়ালাদের সম্ভ্রম রেখে চলিস। আজ কাল তোদের ভারি 'স্পিরিট' হয়েছে, আজ কাল ইয়ং-বেঙ্গলদের এক রোগ হয়েছে, তারা মনে করে, মানীর মান তুড়ে' কথা বল্লে খুব 'স্পিরিট' দেখানো হয়! আমরা পুরাণো লোক, আমাদের মতে চলিস্, সুখে থাক্‌বি।"

পিতৃ-আজ্ঞায় সনৎকুমার সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া প্রথমে কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিলেন।

৩

দুই বৎসর পরে সনৎকুমার মাণিকনগর মহকুমায় সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ও সবজেলের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। যথাসময়ে তিনি পত্নী মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া মাণিকনগরে উপস্থিত হইলেন। মফস্বলে এই তাঁহার প্রথম চাকরী।

হাঁসপাতালের রোগীদের লইয়া সনৎকুমারের দিন পরমানন্দে কাটিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীরা বুঝিতে পারিল, এমন ডাক্তার সেখানে পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই। তাঁহার মিষ্ট কথায়, তাঁহার সদয় ব্যবহারে ও সুচিকিৎসায় হাঁসপাতালে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যাহাদের বিশ্বাস ছিল, 'খয়রাতী দাওয়াই' ব্যবহারে রোগ সারে না, সরকারী হাঁসপাতালে কেবল খড়ি-গোলা জল দিয়া চিকিৎসা চলে, তাহাদের সে ধারণা কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। রোগীরা সনৎকুমারকে কেবল চিকিৎসক নহে, তাহাদের সুখ দুঃখের বন্ধু ও 'ব্যথার ব্যথী' মনে করিতে লাগিল। তাঁহার মিষ্ট কথায় ও আশ্বাসবাক্যে তাহাদের রোগযন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। তিনি তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিতেন, অনেক দুঃস্থ রোগীকে অর্থসাহায্য করিতেন। সনৎকুমারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও সকরুণ ব্যবহারে দরিদ্র রোগীদের কৃতজ্ঞ হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিতে আপ্লুত হইত। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, এই উপকারের ঋণ তাহারা কিরূপে পরিশোধ করিবে।

স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আড্ডায় ডাক্তারের সমালোচনা আরম্ভ হইল। আড্ডাধারী প্রাচীন জমীদার করুণাকান্ত বাবু বলিলেন, "না হ'বে কেন, কত বড় লোকের ছেলে! শরৎবাবু সদরালা হ'বার আগে বছর দুই এখানে মুন্সেফী করে গিয়েছেন;—কি অমায়িক ভাব! বড় ছোট তাঁর কাছে সব সমান ছিল, মুখের কথাই বা কত মিষ্ট! এক দিনও কারও কাছে হাকিমী মেজাজের পরিচয় দেন নি। আজকালকার হাকিমরা মনে করেন,—সাধারণের সঙ্গে মিশলে তাঁদের মান সম্ভ্রমের লাঘব হ'বে। কোনও ভদ্রলোক দেখা করতে গেলে ভাবেন, মামলার কথা বলতে এসেছে। শরৎ বাবু সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, অথচ নিক্তির তৌলে বিচার করতেন।"

পারিষদ শশীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওটা ওদের জাতীয় স্বধর্ম্ম।"

আর এক জন বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, ছোকরা ব্যবসায়ের 'প্রেষ্টিজ' একেবারে মাটী করতে বসেছে। রোগীদের পয়সা দিয়ে বশ করচে, ভাগ্যে বাপ 'রিটায়ার্ড' সবজজ; এতটা কি ভাল? আমরা এ রকম চিকিৎসা আরম্ভ করলে আমাদেরও পসার হয়। ঘটে এক কাঁচ্চা বুদ্ধি থাকলে কি আর এমন 'আহাম্মুকী' করে?" বক্তা ভজহরি বাবু এক জন নেটিভ ডাক্তার। পসারটি নষ্ট হওয়ায় এখন তিনি এই আড্ডায় দাবা খেলেন, এবং তামাক খান।

তৃতীয় ব্যক্তি ডাক্তারের হাত হইতে হুঁকাটা টানিয়া লইয়া তাহাতে দম দিয়া বলিলেন, "শুনেছিলাম বটে, চোর খাবার দিয়ে কুকুরের মুখ বন্ধ করে! কিছু পয়সা দিয়ে রোগীর মুখ বন্ধ করবার কথা এই প্রথম শুনচি।"

জমীদার বাবু বলিলেন, তোমরা লোকের শুধু খারাপ 'সাইড'টাই দেখ। মনে কর না কেন, উহার বাপের অনেক পয়সা। গরীব দুঃখীর দুঃখ দেখে তাদের দু' পয়সা দিয়ে সাহায্য করচে।"

চতুর্থ পারিষদ বলিল, "হা হা! দাদা আমার যেন মহাদেব! লোকের 'ব্যাড সাইড'টা মোটেই ওঁর নজরে পড়ে না।"

দাদা গম্ভীরভাবে ধূম পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, নশ্বর মনুষ্য-জীবনে এমন শ্রুতিসুখকর জিনিস আর কি আছে? দুই এক ছিলিম তামাক ভিন্ন ইহাতে একটি পয়সা ব্যয় নাই, অথচ কত আরাম!

8

মাণিকনগরে পঁয়তাল্লিশ ঘর ভদ্রলোকের বাস। তাহাদের মধ্যে তিনটি

দল। একটি দল জাতি লইয়া, দ্বিতীয় দল ডাক্তার লইয়া, তৃতীয় দল স্কুল লইয়া। ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতি লইয়া দলাদলি; এক দল অন্য দলের অন্ন স্পর্শ করেন না, পাছে জাতি যায়; কাকা এক দলে, ভাইপো অন্য দলে। অন্য দলের অন্ন-গ্রহণে জাতি যায়, কিন্তু রাত্রিকালে নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটু 'ভাইনম্ গ্যালিসাই' না হইলে চলে না! গ্রামে কয়েক জন নেটিভ ডাক্তার আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলি। এক দল পসার বাড়াইবার জন্য অন্য দলকে গালি দেন, এবং অন্য দল গোপনে গালি পরিপাক করিয়া প্রকাশ্যে মানহানির মামলা করিবার ভয় দেখান। অগত্যা প্রথম দল পিপীলিকার গর্ত্তের সন্ধান করেন!—এইরূপ দলাদলির মধ্যে মাণিকনগর খুব সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল।

ডাক্তার সনৎকুমার মাণিকনগরের কোনও দলে যোগদান করিলেন না, তিনি সকলেরই সহিত নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দলপতিগণ তাঁহাকে স্ব স্ব দলে টানিয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন এক জন বলিল, "লোকটার কোনও 'প্রিন্সিপল' নাই।"

দ্বিতীয় দল বলিল, "বড় ফাজিল, এত বাজে বকে!"

তৃতীয় দল বলিল, "ছেলেমানুষ বৈ ত নয়, বুদ্ধি পাক্‌তে এখনও অনেক দেরী।"

মাণিকনগরে হাকিমদের এক দল আছে। তাঁহাদের দলটি ক্ষুদ্র; স্থানীয় কোনও ভদ্রলোক তাঁহাদের দলে 'কল্‌কে' পান না। ডাক্তার 'গেজেটেড্ অফিসার', অতএব তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়া লইলে তাঁহাদের 'অফিসিয়াল অ্যারিষ্টোক্রাসী' ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই বুঝিয়া তাঁহারা ডাক্তারকে বলিলেন, "তুমি আমাদের দলে এস, আমরা—

'হাকিমী ধরণে হাসি,
হাকিমী ধরণে কাশি,
মোদের হাকিমী গল্পে যে ন্যাহি দেয় 'হুঁ',
তার ত্রিসীমায় নাহি আসি।'

হে মিষ্টভাষী কর্ম্মশ্রান্ত পথিক, তুমি আমাদের দলে মিশিবার অযোগ্য নহ।"

ডাক্তার মিষ্টভাষী বটে, কিন্তু অধিকমাত্রায় স্পষ্টভাষী হওয়ায় সনৎকুমার

সে দলে মিশিতে পারিলেন না। অগত্যা হাঁসপাতালের কার্য্যে মনসংযোগ করিয়া তাঁহাকে সাধুসংসর্গের অভাবজনিত ক্ষোভ নিবারণ করিতে হইল।

৫

একদিন মধ্যাহ্নে একটা 'গলায় দড়ি' সরকারী হাঁসপাতালে উপস্থিত।

একটি নীচজাতীয়া যুবতী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া অভিমানে গলায় দড়ি দিয়াছিল, কিন্তু সে ভাগ্যবিড়ম্বনায় মরিবার সুযোগ পাইল না। সে ঘরের কড়িকাঠে ঝুলিয়া স্বর্গে যাইবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামী গলার দড়ি কাটিয়া তাহাকে নামাইয়া ফেলিল; তাহার পর একখানি গরুর গাড়ীতে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ স্থাপিত করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সেই গাড়ীর সঙ্গে হাঁসপাতালে আসিল। যুবতীর শাশুড়ী গাড়ীর পশ্চাতে, সে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, "এমন আবাগের বেটীকে ঘরে এনেছিলাম গো! আমাদের মায়ে পুতের হাতে দড়ি দিলে।"

যুবতীর অবস্থা শোচনীয়। ডাক্তার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিনের চিকিৎসায় ও পরিচর্য্যায় যুবতী সুস্থ হইয়া গৃহে গেল। তাহার স্বামী ফৌজদারীতে পড়িল। স্ত্রীলোকটির বাঁচিবার আশা ছিল না। ডাক্তার তাহাকে বাঁচাইয়াছেন শুনিয়া গ্রামের লোক মুক্তকণ্ঠে ডাক্তারের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ডাক্তারের এই প্রশংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া ভজহরি ডাক্তার দাবার মজলিসে বসিয়া বলিলেন, "ডাক্তারে তো সবই করে! ছুঁড়ীটার পরমায়ু ছিল, বেঁচে গিয়েছে। আমরাও এ রকম দু শো পাঁচ শো গলায় দড়ি বাঁচাতে পারি।"

৬

আর একদিন অপরাহ্নে সনৎকুমার বাসায় বসিয়া পত্র লিখিতেছেন, এমন সময় একটি বিধবা প্রৌঢ়া গোয়ালিনী মলিনবস্ত্রে ম্লানমুখে তাঁহার বাসায় প্রবেশ করিল।

ঝি উঠানে বসিয়া কয়লা ভাঙ্গিতেছিল; সে বলিল, "কেরে মাগী, বাইরে গিয়ে দাঁড়া না; এখন কি ভিক্ষে করবার সময়?"

ঝির কর্কশ কণ্ঠস্বরে সনৎকুমারের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি বাতায়নপথে সেই দরিদ্রা বিধবার ম্লান মুখ দেখিতে পাইলেন; পরিচারিকাকে বলিলেন, "ঝি, তুমি কি সকলকেই ভিখারী মনে কর? ওর

মুখ দেখচো না? নিশ্চয়ই ওর কোনও আপনার লোকের ব্যারাম হয়েছে, ওকে আমার কাছে আস্‌তে দাও।”

বিধবা সঙ্কুচিতভাবে ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চাও বাছা!”

ঘোষানী কাতরভাবে বলিল, “আমার মেয়ে বড় কাহিল, অনেক দিন থেকে সে জ্বরে ভুগচে, কবরেজের পাঁচনে বড়িতে কিছুই হলো না। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনাকে একবার দেখতে যেতে হবে।”

ডাক্তার বলিলেন, “কত দূর?”

ঘোষানী বলিল, “আমাদের বাড়ী রাজনগর, সে এখান থেকে চার ক্রোশ হবে।

ডাক্তার বলিলেন, “ওঃ, তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ। তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, টাকা দিতে পারবে? আমাকে আট টাকা দিতে হবে, আর ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া যা লাগে।”

ঘোষানী বলিল, “গরীব বলে’ একটু দয়া করবে না বাছা? শুনেছি, তোমার খুব দয়ার শরীর, তাই তোমার দুয়োরে এসেছি। এত টাকা আমি দিতে পারবো না।”

ডাক্তার বলিলেন, “সকলকে দয়া করতে গেলে কি চলে? আচ্ছা, তুমি ছ’ টাকা দিও, আর গাড়ী ভাড়া লাগবে।”

ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানকে ডাকা হইল। রাজনগরে যাইতে হইবে শুনিয়া সে বলিল, “সেখানে কি রাস্তা আছে হুজুর? অনেক মেঠো পথ ভাঙ্গতে হ’বে। যেতে আস্‌তে পাঁচ টাকার কমে পার্‌বো না।”

ডাক্তার মিষ্ট কথায় তাহাকে চারি টাকায় রাজী করিয়া গাড়ীতে ঘোড়া জুতিতে বলিলেন।

ডাক্তার মনে করিলেন, দশ টাকা খরচ করিয়া যে তাঁহাকে ‘কল্‌’ দিতেছে, তাহার হাতে নিশ্চয়ই পয়সা আছে। কিন্তু বিধবা প্রাণের দায়ে কি করিয়া যে এই টাকা কয়টি সংগ্রহ করিয়াছিল, তা সেই জানে, আর জানেন অন্তর্য্যামী।

৭

বৈশাখ মাস, দুঃসহ গ্রীষ্ম। ছয় মাসের মধ্যে এক বিন্দু বৃষ্টি হয় নাই; নদী, দীঘী, পুষ্করিণী শুকাইয়া গিয়াছে। পল্লীবাসিগণ পানীয় জলের অভাবে

"এইখানে বোসো বাবা; তোমাকে বসিতে দিই, এমন যায়গা কি এই কাঙ্গালিনীর কুঁড়ে ঘরে আছে!"

ডাক্তার বলিলেন, "থাক, থাক; বস্‌বার আর দরকার নেই; তোমার মেয়ে কোথায়, দেখি।"

ঘোষানী কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক মাটীর প্রদীপটা জ্বালিয়া তৈলসিক্ত কালো কাঠের দীপগাছার উপর রাখিল, তাহার পর ডাক্তারকে কুটীরের ভিতর লইয়া গেল।

৯

কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ডাক্তার একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন। দশ টাকা খরচ করিয়া যে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছে, তাহার সাংসারিক অবস্থা এমন শোচনীয়! তিনি দেখিলেন, কুটীরখানি যেরূপ ক্ষুদ্র, তাহার আসবাবও সেইরূপ সামান্য। মৃদু দীপালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, কুটীরের এক পাশে একটি বাঁশের 'সাঙ্গা'—'সাঙ্গার' উপর কতকগুলি হাঁড়ি কলসী, এক ধারে একটি বহু পুরাতন বেতের 'ঝাঁপা', তাহার পাশে একটি ঘটী, দুইখানি কালো পাথর ও গোটা দুই পাথরের বাটী, দুইটি 'ফেরো' (জলপানের পাত্র)। কুলুঙ্গীতে একটি তেলের ভাঁড়। একটি ঝুড়ীতে এক ঝুড়ী ঘুঁটে। দেওয়ালের কাছে একটি মলিন শয্যায় একটি কঙ্কালসার যুবতী শয়ন করিয়াছিল। তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি অক্ষি-কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। মুখখানি বিবর্ণ, যেন শোণিত-সংস্পর্শ-রহিত, মাথার কেশরাশি রুক্ষ, অনাদরে তাহা ছিন্ন উপাধানে লুটাইতেছে।—এই যুবতী ঘোষানীর বিধবা কন্যা। তাহারই চিকিৎসার জন্য ঘোষানী তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ডাক্তার লইয়া আসিয়াছিল।

ডাক্তারকে দেখিয়া যুবতী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় ও অনাহারে সে এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উঠিতে পারিল না। ডাক্তার বলিলেন, "থাক্, থাক্, তোমাকে উঠ্‌তে হবে না।"

ঘোষানী বলিল, "বাবা, কোথায় তোমাকে বস্‌তে দেব? আমার ঘরে ত কিছু নেই, মণ্ডলদের বাড়ী থেকে একটা 'মোড়া' চেয়ে আন্‌লেও হতো।—এই চট্‌খানায় বোস্ বাবা।"—ঘোষানী একখানি চট বাহির করিয়া রোগিণীর শয্যাপ্রান্তে প্রসারিত করিল।

ডাক্তার সেই চটে উপবেশন করিলে ঘোষানী বলিতে লাগিল, "বাবা, দুঃখের কথা আর কি বলবো? আমার এই মেয়েটির নাম যশোদা; মা যশোদা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, মায়ের আমার কত গুণ! আহা, রোগে রোগে মুখখানিতে যেন কালি পড়ে গিয়েছে। আট বছর বয়সে রামনগরের হাবুল ঘোষের বেটা লখার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। হাবুল ঘোষের নাম শোননি বুঝি? জমীদারের গোমস্তা মশাই পর্য্যন্ত আমার বেহাইকে চেনে। আমার বেয়াইয়ের সোনার সংসার। তার দশ গণ্ডা গাই গরু, আর পাঁচ গণ্ডা গাই মোষ। ঘরে রোজ এক মণ দেড় মণ দুধ হয়; তিনখান লাঙ্গল, এক 'খাদা' জমী চাষ করে। জামাইটিও পেয়েছিলাম যেন 'কাত্তিক'! তা পোড়াকপালীর অদেষ্টে এত সুখ সইবে কেন? বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে ভেদ হ'য়ে জামাইটি মারা গেল। আহা, বাছা আমার দুধের মেয়ে, 'সোয়ামী' কি বস্তু, তা কোনও দিন জান্‌তে পারলে না। তার মুখে একটি দিন হাসি দেখি নি। মেয়েটার দশা দেখে আমাদের ঘোষ পাগলের মত হয়েছিল; মুখে কিছু বল্‌তো না বটে, কিন্তু মনে মনে 'গুম্‌রে' মরতো। এক এক সময় একা বসে' 'হাপুস'-নয়নে কাঁদতো, হাতের হুঁকো হাতেই থাক্‌তো। সে জামাইয়ের শোক আর সামলাতে পারলে না! আমায় পথের ভিখারী করে' মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। 'অলুক্ষুণে' মেয়ে বলে' বেয়াই বেটার বৌকে ভাত দিলে না। কি করবো বাছা? পেটে ধরেছি, ফেলতে তো পারিনে। এই আট বছর মায়ে ঝিয়ে গতর খাটিয়ে কোনও রকমে সংসার চালিয়েছিলাম, তা শেষে মেয়েটা রোগে পড়্‌লো। এই আট বছর দু'সন্ধ্যে ভাতের মুখ দেখিনি। রোগে রোগে বাছা আমার মাটীর সঙ্গে মিশে গ্যাছে। ডাক্তার বাবু, আমার আর কেউ নাই, আপনার পায়ে পড়ি—যশোকে সারিয়ে দিন।"

ঘোষানী অশ্রুপূর্ণনেত্রে ডাক্তারের পা ধরিতে গেল। সনৎকুমার নির্ব্বাক-ভাবে দুঃখিনী বিধবার কষ্টের কাহিনী শুনিতেছিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইও না, আমার যতটুকু সাধ্য, তা করবো।" অগত্যা তিনি রোগিণীর দিকে চাহিয়া করুণস্বরে বলিলেন, "দেখি মা, তোমার হাত।"

ডাক্তার সাবধানে রোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, রোগ দুশ্চিকিৎস্য

বটে, কিন্তু তখনও সাংঘাতিক হয় নাই। প্লীহা ও যকৃতে উদরটি ঢকাকার ধারণ করিয়াছে। দেহে রক্ত নাই, অস্থির উপর চর্ম্মের একটি আবরণ রহিয়াছে মাত্র। ঔষধ অপেক্ষা তখন তাহার পথ্য ও পরিচর্য্যাই অধিক আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত গ্রাম্য কবিরাজের ব্যবস্থানুযায়ী দুই একটি বটিকা ও পাচন্ ভিন্ন কোনও ঔষধ পড়ে নাই। ডাক্তার অভিজ্ঞতাফলে বুঝিয়াছিলেন, ভদ্রলোকে সর্ব্বদা ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করেন বলিয়া অনেক সময় ঔষধে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু চাষার রোগ হইলে যৎসামান্য ঔষধেই ইন্দ্রজালবৎ ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। দাতব্য ঔষধালয়ের 'জল' পান করিয়া চাষার রোগ সারে, কিন্তু বড় বড় ডাক্তারখানা হইতে সংগৃহীত মূল্যবান ঔষধে 'ভদ্রলোক' রোগীর রোগ শীঘ্র দূর হয় না। সিক্ত স্যাঁতসেতে জমীতে জল পড়িলে, জমী সে জল শীঘ্র শোষণ করিতে পারে না, কিন্তু শুষ্ক জমী শীঘ্র জল শোষণ করে। ডাক্তার নিরাশ হইলেন না, ঘোষানীকে বলিলেন, "আজ ত তোমার মেয়েকে ঔষধ দিবার কোনও উপায় নাই; কাল তুমি সরকারী দাওয়াইখানায় যাইও, আমি ঔষধ দিব। দুই চারি দিন তাহা খাওয়াইলেই রোগ সারিয়া যাইবে। তবে মেয়েটির 'তাওতে'র ব্যবস্থা করা চাই। ঔষধে রোগ সারে বটে, কিন্তু শরীর সবল করিতে হইলে ভাল পথ্যও চাই, কেবল ঔষধ খাইলেই শরীর টেঁকে না। আজ রাত্রে উহাকে খানিক দুধ খাইতে দাও, রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।"

ঘোষানী কোনও কথা কহিল না, মলিন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নীরব রহিল।

যশোদা ক্ষীণস্বরে বলিল, "দুধ কোথায় পাবি, মা?"

ঘোষানী বলিল, "একবেলা যাদের এক মুঠা ভাত যোটে না, তারা দুধ পাবে কোথা বাবা? ঘরে যে কটি চাল আছে—তা দিয়ে আধ সের দুধ আনি; আমি না হয় আজ 'উপোস' করে থাকবো।—আহা, লক্ষ্মীকে যদি না বেচতাম!"

ডাক্তার ঘোষানীর দারিদ্র্যের পরিচয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মী কি তোমার গাই গরুর নাম?"

ঘোষানী বলিল, "হাঁ বাবা, ঐ গাইটিই এ হতভাগিনীর শেষ সম্বল ছিল। লক্ষ্মী দু' সের ক'রে দুধ দিত, তাই বেচে কোনও রকমে আমাদের সংসার চলতো। আপনাকে দিয়ে মেয়েটাকে দেখাবার জন্যে আজ সকালে যদু

ঘোষের কাছে লক্ষ্মীকে দশ টাকায় বেচে এসেছি। এখন আর আমাদের দিন গুজরানের উপায় নেই।”

ঘোষানীর কথা শুনিয়া ডাক্তার আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুতে জল দেখা দিল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “যদু ঘোষের বাড়ীটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পার?”

ঘোষানী বলিল, “তা আর পারবো না কেন বাছা? ও পাড়ায় তার বাড়ী, মস্ত গেরস্ত, বাড়ীতে তিনখান ঘর, তার গোয়ালে এক পাল গরু, রোজ তার ঘরে আধ মণ পঁচিশ সের দুধ হয়! 'আধ-কড়ে' করে' লক্ষ্মীকে বেচেছি বাবা, আজকার বাজারে লক্ষ্মীর দাম ফেলে-ছড়ে দেড় কুড়ি টাকা। কি করি, গরজে পড়ে' দশ টাকায় বেচে ফেলেছি।”

ডাক্তার ঘোষানীর সঙ্গে যদু ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক হাসিতেছিল। শৃগালের দল বাঁশবনের অন্তরালে দলবদ্ধ হইয়া, সমস্বরে প্রহর ঘোষণা করিতেছিল। গ্রাম্য কুকুরগুলা গৃহস্থের উঠানে বসিয়া বা গ্রাম্যপথে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিল। বেণে-পাড়ায় মৃদঙ্গধ্বনি আসন্ন সঙ্কীর্ত্তনের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রকৃতি স্থির। রাত্রি বড় মধুর। ডাক্তার ভাবিলেন, হায়! পৃথিবীতে গরীবের যদি এত দুঃখকষ্ট না থাকিত।

সনৎকুমার মিষ্ট কথায় যদু ঘোষের মন নরম করিয়া তাহার হাতে দশটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন। ভিজিট ও গাড়ী ভাড়া বাবদ দশ টাকা হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির করিয়া ঘোষানী পূর্ব্বেই তাঁহাকে দিয়াছিল। এ সেই টাকা। ডাক্তার টাকা দিয়া লক্ষ্মীকে ফিরাইয়া লইলেন; যদু ঘোষের রাখাল নিতাই বৎস সহ লক্ষ্মীকে ঘোষানীর গোয়ালঘরে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল।

ডাক্তার বলিলেন, “তোমার টাকা দিয়েই লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে নিলাম। তোমার গাই তোমারই থাক, তুমি প্রাণের দায়ে আমাকে টাকা দিয়েছ বটে, কিন্তু তোমার মত গরীবের কাছে টাকা নিলে আমি ভগবানের কাছে কি জবাব দেব? তোমার মেয়ের চিকিৎসার জন্যে তোমাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। আমি মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাব।”

ঘোষানী জিজ্ঞাসা করিল, “গাড়ী ত তোমার নয়, গাড়ী ভাড়া কে দেবে?”

সনৎকুমার বলিলেন, “ভগবান! তিনি ভিন্ন আর কে দেনেওয়ালা আছে? টাকা কড়ি কি কারও সঙ্গে আসে, না যায়?”

সনৎকুমারের কথা শুনিয়া ঘোষানী তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। অশ্রুধারায় তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত করিয়া বলিল, "বাবা, তোমার বড় দয়ার শরীর, তোমার মা সার্থক তোমাকে পেটে ধরেছিলেন।"

১০

সনৎ ডাক্তারের এই সদাশয়তার কথা দুই এক দিনের মধ্যেই মাণিক-নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। যে কোচম্যান তাঁহাকে রাজনগরে লইয়া গিয়াছিল, সে গাঁজার মজলিসে বসিয়া ইয়ার বন্ধুদের কাছে এই গল্প করিল। ক্রমে কথাটা করুণাকান্ত বাবুর দাবার মজলিসেও সালঙ্কারে প্রবেশ লাভ করিল। আন্দোলনের একটা নূতন বিষয় পাইয়া সকলেই অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভজহরি তলাপাত্র কড়িবাঁধা 'বামুনে' বাঁধানো হুঁকায় একটা লম্বা টান দিয়া বলিলেন, "ছোকরা এই রকম করে'ই পসার জমাবে দেখচি! পকেট থেকে গাড়ীভাড়া ও পথ্যের খরচ যুগিয়ে রোগীর 'চিকিৎস্যে' করতে হ'বে? নির্ব্বোধ, নির্ব্বোধ! নিতান্ত বেকুব না হ'লে আর কে এমন কাজ করে? মধ্যে থেকে আমাদের পাঁচ জনেরই অন্ন মারলে দেখচি। আপদটা এখান থেকে বিদেয় হ'বে কবে? ওহে রামকান্ত! ওর againstএ 'বেঙ্গলী'তে একটা correspondence বার করবে?

রামকান্ত মধ্যে মধ্যে ইংরাজী খবরের কাগজে 'গরুর তিনটে ল্যাজ', 'নবপ্রসূত শিশুর পাকা দাড়ি গোঁফ' প্রভৃতি অত্যন্ত রসাল ও উদ্ভট সংবাদ লিখিয়া অল্পদিনেই মাণিকনগরে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারে তিনি হঠাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না।

আড্ডাধারীর অন্যতম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু বড়ে টিপিয়া বলিলেন, "শুনেছি না কি, সেই ঘোষের মেয়ের রূপ আছে। আমি যদি নাড়ী টিপতে শিখতাম, তা হ'লে কেবল দেখা কেন, বিনি পয়সায় তার ভাত কাপড় পর্য্যন্ত যোগাতাম।"

আবগারীর দারোগা শ্রীনারায়ণ বাবুর বিনি পয়সায় নেশা করিবার সুবিধা ছিল। সুতরাং তখন তিনি কিঞ্চিৎ তরল অবস্থায় ছিলেন। তিনি সোৎসাহে মাথায় চাদর জড়াইয়া তবলায় চাঁটী দিয়া স্খলিতস্বরে গায়িলেন,—"বয়স তার—" ইত্যাদি।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জীবনচরিতের মূলসূত্র।*

নরনারীর চরিতাখ্যান কোন পদ্ধতি অনুসারে করিলে উহা সমাজের মঙ্গলজনক হইতে পারে, মনীষী স্যার সিড্‌নে লী তাহাই তাঁহার এই বক্তৃতায় বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আলেখ্যের যেমন ভূমি বা ক্ষেত্রের নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে, চিত্রটি ঠিকমত ফুটিয়া উঠে না, তেমনই যে নর বা নারীর চরিতাখ্যান করিতে হইবে, তাঁহার যে সমাজে উদ্ভব হইয়াছিল, এবং পরে যে মনুষ্য-সমাজে সে চরিতের বর্ণনা করিতে হইবে, সেই সমাজের পরিচয় ঠিকমত দিতে না পারিলে, সেই নর বা নারীর চরিতকথা ফুটিয়া উঠে না। সমাজই মনুষ্যজীবনের ক্ষেত্রস্বরূপ। সমাজের গতি অনুসারে, ভাব ও অভাবের পরিণতি অনুসারে, এক এক নর বা নারী এক এক ভাবে ফুটিয়া উঠেন। যিনি নেপোলিয়ানকে বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ফরাসী-বিপ্লবের ভঙ্গী বুঝিতেই হইবে। জগতে ফরাসী-বিপ্লব দুইটা হয় নাই, নেপোলিয়ানও দুইটা হইবে না। প্রতিবেশ-প্রভাব জন্যই মানুষ। সেই প্রতিবেশ-প্রভাব বুঝিতে না পারিলে মানুষকে বুঝা যায় না।

কোনও ব্যক্তিবিশেষের জীবনকথা লিখিয়া রাখিবার সাধ হয় কেন? উত্তরে স্যার সিড্‌নে লী বলিতেছেন যে, মানুষ চরিত্রের ও কীর্ত্তির ধারা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, আগামিগণকে নিজেদের ভাবে ভাবুক রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস ও চরিতাখ্যান করিয়া থাকে। চিরজীবী হইয়া থাকিবার বাসনা মনুষ্য-হৃদয়ে বড়ই প্রবল। যদি পারিতাম, তবে স্ব-দেহকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতাম। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। তাই মানুষ নিজের কীর্ত্তির ও প্রভাবের ধারা বংশপরম্পরায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় ইতিহাস লেখে, চরিতাখ্যান করে, সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করে, আলেখ্য ও বিগ্রহ রচিয়া থাকে। স্মৃতির সাহায্যে চরিত্রের ও কীর্ত্তির পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার জন্যই ইতিহাস ও জীবনাখ্যান লিখিত হয়। আবার মানুষেরও এমনই প্রকৃতি যে, মানুষ অতীত কথার আলোড়ন করিতে ভালবাসে; পুরাতনকে সজীব রাখিবার জন্য মানুষ সাধ্যমত চেষ্টা করে। ইহাই হইল চরিতাখ্যানের মূল তত্ত্ব।

* *Principles of Biography: The Leslie Stephen Lecture, delivered in the Senate House, Cambridge, on 13th May 1911. By Sir Sidney Lee, Hon. D. Litt., Oxford.*

চরিত-আখ্যানের উপাদান কি? উত্তরে ডাক্তার লী বলিতেছেন,—character and exploit jointly constitute biographic personality. চরিত্র এবং কীর্ত্তি, এই দুইটি আখ্যানযোগ্য বিষয়। অর্থাৎ, যে চরিতে বিশিষ্টতা নাই, যাহা সমাজের উপর একটা ছাপ দিয়া যাইতে না পারে, তাহা আখ্যানযোগ্য নহে। যে পুরুষ কীর্ত্তিমান নহেন, যাঁহার যশ স্থায়ী হইবে না, তাঁহার চরিতও আখ্যানযোগ্য নহে। যিনি এমন চরিত লিখিবেন, তাঁহার লিখনভঙ্গী, শব্দচয়নসামর্থ্য এমন হইবে যে, তাহা টেঁকসহী ও মজবুত হইবে, চিরস্থায়িরূপে সাহিত্যে স্থান অধিকার করিতে পারিবে। যেমন যোগ্য বিষয় হওয়া চাই, তেমনই তদুপযুক্ত লিখনভঙ্গী হওয়া চাই, তবে চরিত-আখ্যান ভাষায় ও সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে পারে। চরিত ও চরিতাখ্যান ব্যাপার লইয়া ইটালীর কবি ও আখ্যানকার একটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি-বৃক্ষের ডালে ডালে, বৃন্তে বৃন্তে নরনারী ঝুলিতেছে; তাহাদের জীবন-সূত্রের সহিত এক একটি পদক বাঁধা আছে; সেই পদকে তাহাদের কীর্ত্তি ও চরিত্র অঙ্কিত আছে। বৃক্ষের তলায় বিশাল বিস্মৃতির নদী বহিয়া যাইতেছে; নদীর পরপারে অমরাবতীর মন্দির আছে, এবং নদীর জলে কবি রাজহংস সকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মৃত্যু আসিয়া যখন নরনারীর কুসুমগুচ্ছ সকলকে ছাঁটিতে আরম্ভ করে, তখন অনেকেই পদকশুদ্ধ বিস্মৃতির জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়, অনেকের পদকগুলি রাজহংসেরা ঠোঁটে করিয়া ধরিয়া ফেলে, জলে ডুবিতে দেয় না। পরে সেই পদকগুলিকে লইয়া তাহারা অমরাবতীর মন্দিরে অক্ষয় বেদীর পার্শ্বে রাখিয়া আসে। চরিত্র ও কীর্ত্তির হিসাবে পদকগুলি রাজহংসের মুখে পড়ে। অর্থবাদের হিসাবে এমন সুন্দর অর্থবাদ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এরিষ্টটল বলিয়াছেন,—"a career, which is 'serious complete and of a certain magnitude', is a fit biographic theme." যে জীবন প্রগাঢ় নহে, পূর্ণ নহে, ব্যাপক নহে, তাহার আখ্যানের প্রয়োজন নাই। যাঁহার চরিত্র ও কীর্ত্তি সমাজের নিম্ন স্তরকে পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারে নাই, যাঁহার প্রভাব বহু জনের উপর ব্যাপ্ত নহে, যাহা পূর্ণ নহে, তাহার আখ্যান করিলে লেখকের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

এই সকল কথা বলিয়া স্যার সিড্‌নে লী বলিতেছেন,—Death is a part of life and no man is fit subject for biography till he is

dead. মৃত্যু জীবনের অংশস্বরূপ; মৃত্যু না ঘটিলে জীবন পূর্ণ হয় না। সুতরাং মানুষ না মরিলে তাহার জীবনকথা লিখিতে নাই। জীবিত ব্যক্তির চরিতাখ্যান করিলে হয় তাহাতে নিন্দার ভাগ অধিক থাকিবে, নহে ত অতি-প্রশংসায় উহা পূর্ণ হইবে। কারণ, No man's memory can be accounted great until it has outlived his life. মৃত্যুর পরেও যাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহার জীবন আখ্যানযোগ্য নহে। নামের হিসাবে নামটা দশ জনের মুখে মুখে ঘুরিলে হইবে না; জীবিতকালে সে ব্যক্তি সমাজের যে স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মরণের পরেও কিছুকাল সে প্রভাব বজায় থাকিলে, তবে বুঝিতে হইবে, এমন লোকের স্মৃতি চরিতা-খ্যানের সাহায্যে রক্ষা করিতে পারিলে উহা স্থায়ী হইয়া থাকিবে। অতএব ব্যক্তিবিশেষের মরণের কিছুকাল পরে তাহার চরিত আখ্যাত করিতে হয়। সে আখ্যান এমন ভাবে করিতে হইবে যে, উহা সমাজে টিকে—স্থায়িভাবে থাকে।

এরিষ্টটলের "Magnitude" শব্দটা লইয়া নিবন্ধ-কার লী আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কেহ বড় চাকুরে হইয়া বড় বড় কাজ করিলেন বলিয়া যে তাঁহার জীবনকথা লিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তেমন অবস্থায় পড়িলে সকলেই তেমন বড় কাজ করিতে পারে। এমন লোকের জীবনচরিত লিখিলে লোকটার সহিত চরিতাখ্যানটাও বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায়। কেহ ভাল লেখক, ভাল কবি বলিয়া যে তাঁহার জীবন-কথার আবৃত্তি করিতে হইবে, তাহাও ঠিক নহে। সমাজের তাৎকালিক রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে হয় ত কোনও লেখকের লেখার খুব প্রশংসা হইল; কিন্তু সে প্রশংসা রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায়; ফলে চরিতাখ্যানটাও সেই সঙ্গে ব্যর্থ হইয়া যায়। সমাজের সখের প্রশংসা, খোসখেয়ালের তারিফ, জাতির ভাবোন্মেষ জন্য প্রশংসা নহে। উহা ভ্রমর-গুঞ্জন মাত্র, সখের ও খেয়ালের ফুল শুকাইলেই ভ্রমর-গুঞ্জন বন্ধ হইবে। অতএব কোনও কবি, কর্ম্মী, বা লেখকের জীবিতকালের প্রশংসার ছটা দেখিয়া, এবং সে ছটায় মুগ্ধ হইয়া যে লেখক জীবনকথা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিই অনেক ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হন। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের এই মহত্ত্ব বা magnitude বুঝা বড় কঠিন। বীরত্ব হিসাবে মারলবরো ওয়েলিংটন অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু মারলবরোকে ইংরেজ অনেকটা ভুলিয়াছে,

ওয়েলিংটনকে ভুলিতে পারে নাই—সহসা পারিবেও না। ইহার হেতু এই যে, ওয়েলিংটনের জীবনের মহত্ত্ব বা magnitude মারলবরো অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। এই মহত্ত্বের যাচাই ঠিকমত করিতে না পারিলে, চরিতাখ্যান-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ই।

Autobiography বা নিজের জীবন নিজেই লেখার অভ্যাস অনেকের আছে। রুসো বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ণভাবে নিরহঙ্কার, স্তুতি-নিন্দার অতীত যে হইতে না পারে, যে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হইতে না পারে, সে যেন আত্ম-জীবনকথা লিখিতে উদ্যত না হয়। একেবারে ভিতরটা খুলিয়া, ভিতরে বাহিরে উলঙ্গ হইয়া, তবে আত্মজীবনকথা লিখিতে হয়। লেখক জীবিত থাকিতে আত্মজীবনকথা ছাপিতে নাই। স্যার সিড্‌নে লী বলিয়াছেন যে, যাহারা স্বীয় জীবনে ইতিহাসের উপাদান গড়িয়া বা সংগ্রহ করিয়া যাইতে না পারে, তাহারা যেন আত্মজীবনকথা না লেখে। সিজার, লুথার, নেপোলিয়ান, মুল্‌ট্‌কে প্রভৃতি মহাত্মগণই আত্মজীবনকথা লিখিতে পারেন। কেন না, ইঁহারা কর্ম্মের দ্বারা দেশের ও জাতির ইতিহাসকে যথেষ্ট উপাদান দিয়া গিয়াছেন। কাহারও আত্মজীবনকথা কৈফিয়ৎ হইলেই সর্ব্বনাশ; তখন তাহার আর কোনও মূল্য থাকে না। তুমি ভাল কি মন্দ, সে বিচার আগামিগণ করিবে; ভবিষ্যতের সে বিচারের উপর কথা কহিবার তোমার কোনও অধিকার নাই; কথা কহিলেও তাহা অগ্রাহ্য হয়, ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত সে কথার উপর নির্ভর করে না। নিজের কথাই হউক, আর অন্যের কথাই হউক, জীবনকথা is the truthful transmission of personality, মনুষ্যত্বের সত্য বিকাশমাত্র। উহাতে মিথ্যার বা সত্যগোপনের অবসর নাই। এই হিসাবে বস্‌ওয়েল কর্ত্তৃক লিখিত জনসনের জীবনকথা এবং রুসোর আত্মজীবনকথা জগতের সাহিত্যে দুইখানি আদর্শ পুস্তক। ইহার পরেই লকহার্টের লিখিত সার ওয়াল্টার স্কটের জীবন কথা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ পুস্তক।

চরিতাখ্যান ইতিহাস নহে। ইতিহাসে এবং চরিতাখ্যানে যে বৈষম্য আছে, তাহা মনীষী বেকন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। লী সাহেবের ভাষায় বলিতে হইলে বলা চলে যে, Bacon warns us that history sets forth the point of public business; while biography reveals the true and inward sources of the action, tells of

সদ্যঃস্নাতা।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

private no less than of public conduct, and pays as much attention to the slender wires as to the great weights that hang from them.

ইতিহাস সামাজিক ও জাতিগত ব্যাপারের বর্ণনা করে; চরিতাখ্যান ব্যক্তিগত চরিতের কথা বলে; ব্যক্তিগত চরিত্রের যে সকল সূক্ষ্ম সূত্রে ঐতিহাসিক ঘটনা সকল ঝুলিতেছে, সেই সকল সূত্রের বর্ণনা করিয়া থাকে। মানুষটিকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে যাহা যাহা বর্ণনা করা আবশ্যক, চরিতাখ্যানে কেবল তাহাই লিখিত হইবে। মানুষটাকে সাধু গড়িয়া বা দেবতা করিয়া যে লেখক চরিতকথা লিখিয়া থাকেন, তিনি ঠিক চরিত-লেখক নহেন; তিনি চাটুকারমাত্র। অন্যে চাটুকার হয়, হউক; কিন্তু নিজের জীবনকথা নিজে লিখিতে বসিয়া যদি কেহ নিজেকে দেবতা বানাইয়া বসে, তবে তাহার তুল্য নরাধম আর নাই। তাই রুসো রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এক আমি 'সত্যবাদী', আর ভারতের বেদব্যাস আমা অপেক্ষা বড় সত্যবাদী; কেন না, তিনি নিজের জননীর কলঙ্ককথা লিখিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কথাটা মজার কথা বটে, কিন্তু চরিতাখ্যানের ইহাই যে মূলসূত্র, তাহা সার সিডনে লীও স্বীকার করিয়াছেন।

এইবার সার সিডনে লীর একটু পরিচয় দিব। ইনি মনীষী লেস্‌লি ষ্টীফেনের সহচর ছিলেন; নিজেও এক জন সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া বিদ্বজ্জনসমাজে সুপরিচিত। যে বহিখানি ধরিয়া আমরা এই নিবন্ধ প্রকাশ করিলাম, তাহা ইংরেজি ভাষায় চরিতাখ্যানের মূলসূত্র বলিয়া গ্রাহ্য ও মান্য হইয়াছে। অধুনা বঙ্গদেশেও চরিতকথা লিখিবার সখ উঠিয়াছে। যাঁহারা চরিতাখ্যায়ক হইতে চাহেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাল করিবেন। বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনসমাজে এই পুস্তকের আদর হইলে ভাষার অনেক আবর্জ্জনা দূর হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দ-লাড়।

১

দেবীপুর গ্রামে হরিদাসের বাস। হরিদাস নিঃসন্তান; কারণ, বিবাহ হয় নাই। মাতা বর্ত্তমান, কিন্তু পিতা স্বর্গস্থ। কিঞ্চিৎ জমীদারী আছে। কিন্তু খাজনা উস্থল হয় না। হরিদাস ওকালতী পাশ, কিন্তু সকলের মতে সে অতিশয় বেয়াকুফ। বেয়াকুফ যে ঠিক মূর্খ, তাহা নহে। সংসারে থাকিয়াও যে সংসার-সংশ্লিষ্ট নহে, সংসারের কলকারখানা কিছু বুঝে না, তাহাকেই বেয়াকুফ কহে। সামান্য জমীদারীটুকুর পাঁচ জন সরিকদার; বাগানের কদলী ও পুষ্করিণীর মৎস্য সকলে বাঁটিয়া খায়; হরিদাস কিছুই পায় না।

হরিদাস বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ। সতেজ গলা, থিয়েটারের গান প্রভৃতি বেশ গাহিতে পারে। কবিতাও তাহার অপরিচিত নয়। চাউনি অতি সুন্দর ও সরল। হৃদয় উদার, সকলেরই আজ্ঞাধীন হরিদাস। এরূপ লোক স্ত্রীসমাজে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। কি অবগুণ্ঠনবতী, কি বিরহিণী, কি বৃদ্ধা, কি বালিকা, সকলেই হরিদাসকে ভালবাসে। হরিদাস খাবার চাহিলে তৎক্ষণাৎ রেকাবীপূর্ণ সন্দেশ আসিত, পান চাহিলে ডিবাপূর্ণ পান আসিত। আদালতে হরিদাসের পসার ছিল না, কিন্তু স্ত্রীসমাজে তাহার ওকালতী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামী স্ত্রীর কোন্দল, পিতা পুত্রের বিবাদ, ভ্রাতা ভগ্নীর দ্বেষ, প্রভু ভৃত্যের রোষারুষি চক্ষুর নিমেষে মিটাইয়া দিয়া হরিদাস সকলকে আনন্দিত করিত। চৈত্রমাসের ঝড়ে, শরতের তীক্ষ্ণ রৌদ্রে, শ্রাবণের মুষল-ধারাসারে, মাঘের দুরন্ত শীতে, হরিদাস সকলের মন রক্ষা করিয়া অবলীলাক্রমে গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষা করিত; এবং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সকলের ব্যাগার খাটিয়া বেড়াইত।

দিন বেশ কাটিতেছিল। কিন্তু অর্থের অনাটন ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া হরিদাসের মনে ভীতিসঞ্চার করিতেছিল। অবিবাহিতা ভগ্নী মালতীর বিবাহ হয় কি করিয়া? যাহারা দেখিতে আসে, তাহারাই তিন চারি হাজার টাকা দাবী করে। এত টাকা দরিদ্র হরিদাস কোথায় পাইবে?

চৈত্র মাস। মাধব মাসে স্বভাবতঃ প্রবল ভাবনা আসিয়া জুটে। কি যেন গিয়াছে, কি যেন হইবে, কি যেন ঘটিতেছে! সকলই বিভীষিকাময়! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের তরঙ্গে মন অতিশয় বিক্ষিপ্ত ও উচাটন হইয়া উঠে!

ঘন-মসী-আঁকা ভ্রূ লইয়া, সীমন্তে সিন্দুর নিমেষের তরে পরিধান করিয়া, সন্ধ্যা পশ্চিম প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল। হঠাৎ একটা দক্ষিণা বাতাস সুবাস লইয়া আসিল। গোটাকতক ঝিল্লী আসরে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। হরিদাসের কলেবর কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত হইল। এই যে সংসারের প্রকাণ্ড অসীম বর্ত্ম, ইহার মধ্যে সকলেরই পথ আছে; আমারও নিশ্চয় আছে। নচেৎ ভগবান থাকিবার দরকার কি? এই শান্তিপূর্ণ চিন্তা ক্রমে হরিদাসের মনে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহার আশার ও ক্ষুধার সঞ্চার করিল। আহারের চেষ্টায় হরিদাস মুখোপাধ্যায়-গৃহের দিকে চলিল।

২

গৃহখানি সামান্য। সেকালের পাকা কোঠা। তিনটি কামরা। মলিনবসনা বিধবা মাতা বালিকা মালতীর কেশগুচ্ছ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। মালতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। অন্তরের বিশাল সৌন্দর্য্য ও বাহিরের অতুলনীয় রূপরাশি, একটি অপরটির প্রতিবিম্বস্বরূপ মালতীকে অবলম্বন করিয়াছিল। মালতী সেই ছোট গ্রামখানির প্রতিমা। পল্লবঘন আম্রকাননের পশুপক্ষী, অবারিত মাঠের রাখাল, গ্রাম্য পথের পথিক, আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই মালতীকে দেখিলে সংসার ভুলিয়া যাইত। মালতীর কেশগুচ্ছ বিন্যস্ত করিতে করিতে বিধবা মাতার নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। এই সুবর্ণপ্রতিমা কাহার হাতে পড়িবে? এই নির্ম্মম কঠিন সংসারে চিরস্নেহলালিতা মালতী কোথায় আশ্রয়লাভ করিবে?

সেই দেবীপুর গ্রামের প্রচুর ধনশালী ও পরাক্রান্ত জমীদার হরিহর চাটুর্য্যে। তাঁহার একমাত্র সন্তান বিনয়কুমার। সেই গ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে আর একটা প্রকাণ্ড জমীদারী। তাহার জমীদার মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা প্রমীলার সহিত বিনয়-কুমারের বিবাহের কথা চলিতেছিল। বাল্যসখা হরিদাস। বাঁড়ুয্যে মহাশয় চাটুর্য্যে মহাশয়ের পক্ষীয়দিগকে কনে দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হরিহর চাটুর্য্যে পুত্র বিনয়কুমারকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, তোমরা আজ-কালকার এম এ পাশ করা ছেলে, নিজে পছন্দ করিয়া আইস। তবে নিশ্চয় জানিও, মতিলালের কন্যা পরম সুন্দরী, এবং (ঈষৎ নম্রভাবে) দুইটি জমীদারী একত্র হইলে তুমিই দেশের রাজা হইতে পারিবে। তাহাই

প্রথমতঃ বিবেচ্য। কারণ, আমার বৃন্দাবন-বাসই অভীষ্ট।” ইহা বলিয়াই ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া চাটুর্য্যে মহাশয় তীব্রদৃষ্টিতে পুত্রকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হরিনামের মালা জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিনয় বাল্যাবধি পিতৃভক্ত। মনে মনে ভাবিল, পিতৃসত্য-পালনার্থ যখন স্বয়ং নারায়ণ বনে গিয়াছিলেন, তখন আমি কোন ছার! বিনয় ধীরে ধীরে বলিল, “আমার দেখিবার কোনও দরকার নাই। হরিদাস দেখিলেই—” হরিদাসের নাম শুনিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় একটু ত্রস্তভাবে কহিলেন, “বাবা, ওখানে অধিক ক্ষণ থাকিও না; হরিদাসকে ডাকাইয়া কাছারী-বাটীতে পরামর্শ করিও। কিন্তু হরিদাসের উপর আমার আস্থা নাই, সে একটা ঘোর বেয়াকুব।” বিনয় বলিয়াছিল, “আপনার কোনও ভয় নাই, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।”

কিন্তু হরিহর চাটুর্য্যের বিলক্ষণ ভয় ছিল। সে ভয় মালতীর। দরিদ্রা মালতীকে দেখিয়া বিনয় মুগ্ধ হইলে, কল্পিত রাজত্ব ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। বিনয় কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিলে দেবীপুরের পশ্চিমপ্রান্তে তিনি কদাচ বিনয়কুমারকে যাইতে দিতেন না।

অথচ বিনয়ের ইতিহাস বহুদিন হইতে অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল। বিনয়কুমার সহস্রবার মালতীকে মনে মনে বিবাহ করিত, শতসহস্রবার ধ্যান করিত। গতবৎসর গ্রীষ্মাবকাশে বিনয় হরিদাসের অনুসন্ধানে তাহাদের বাটীতে গিয়া তাহাকে পায় নাই। তখন মালতী একাকিনী গৃহকর্ম্মে রত ছিল। ভ্রাতার বন্ধু বিনয়কুমারকে দেখিয়া সলজ্জা মালতী একখানি চেয়ার দিয়া সভয়ে শয়নগৃহের বাতায়নের অন্তরাল হইতে বিনয়কে লুকাইয়া দেখিয়াছিল। জীর্ণবাসপরিধৃতা, মুক্তকেশী, রূপসী বালিকাকে দেখিয়া বিনয় স্বীয় হৃদয়টুকু একমনে তাহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল। স্নেহশান্তিময়ী মালতী বোধ হয় সেটুকু সাত রাজার ধন মাণিকের মত কুড়াইয়া পাইয়াছিল। তাহার পর কতবার বিনয় কত পথ দিয়া গিয়াছে, এবং বালিকা কত ছল করিয়া বহু দূর হইতেও বিনয়কে কতবার দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। সে বিনয়ের দিকে এক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি ও নবীন-উদ্যম-বিজড়িত হৃদয়ের অসীম প্রণয় প্রাণের সহিত সঁপিয়া দিয়াছিল। বিনয় সেগুলি মধুর প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জপ করিত। আশ্রমের শকুন্তলা, বিন্ধ্যাটবীর সীতা, বিনয়ের মালতী।

রত্নজড়িত নূপুর পরাইয়া, হৃদয়মন্দিরে মালতীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিনয় বিশাল স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়াছিল।

আজ পিতার দৃঢ় সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া বিনয়ের মনে ভয় হইল। হৃদয়ের স্থির স্বচ্ছ মালতী-প্রতিবিম্বিত নিষ্কম্প সরসীনীর প্রবল বাত্যায় উদ্বেলিত হইল। সুন্দর মুখখানি ম্লান করিয়া, বড় বড় চক্ষু দুটি নত করিয়া, ধীরে ধীরে বিনয় বাহিরে আসিল।

বাহিরে কলেজের এক জন পুরাতন সহপাঠী বন্ধু নিশিকান্ত বসিয়া ছিল। নিশিকান্তের বাটী ফরাসডাঙ্গায়। নিশি ভয়ানক চতুর, কৃষ্ণবর্ণ-কান্তি, সুগোল-কোটরগত-চক্ষু, এবং সিগারেট প্রিয়। জ্ঞাতির মধ্যে একটা মামলা বাধিয়া যাওয়াতে, বিশ্বাসী ও গর্দ্দভের ন্যায় পরিশ্রমী এক জন উকীলের, এবং বিনা সুদে কিঞ্চিৎ ঋণের অনুসন্ধানে নিশিকান্ত কলিকাতায় আসিয়াছিল। চিরহিতার্থী বন্ধু বিনয়কুমার তাহাকে অর্থ ও উকীল উভয়ই যোগাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবীপুরে লইয়া আসিয়াছিল।

বিনয়কে ম্রিয়মাণ দেখিয়া নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি ?"

বিনয় বন্ধুকে আদ্যোপান্ত বলিল।

নিশিকান্ত একান্তমনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিতা কাহার কথা বেশী শুনেন ?"

বিনয়। তিনি কেবল মাকে একটু ভয় করেন।

নিশিকান্ত। তোমার মার মত কি ?

বিনয়। মার কোনও বিষয়ে শীঘ্র মত হয় না। তিনি সারাদিন মন্দির ও পূজা লইয়া থাকেন। যত দূর বুঝিয়াছি, তাঁহারও এই বিবাহে মত আছে; কারণ, কল্য সন্ধ্যাকালে পাহাড়ের শিবমন্দিরে পূজা দিতে যাইবেন। তিনি দেবদেবতা প্রভৃতি খুব মানেন।

নিশিকান্ত একটা সিগারেটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ভগবান তাঁহাকে ও কর্ত্তাকে সুমতি দিবেন, ইহাই আমি স্থির করিয়াছি। এখন তোমার বন্ধুবর উকীল হরিদাসের ওখানে চল।"

এই কথোপকথনের পর উভয় বন্ধু হরিদাসের আমবাগানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালতীর কেশবিন্যাসে ব্যাপৃতা বিধবা মাতা বহির্ব্বাটীতে পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও হরিদাস ?"

নিশিকান্ত বিনয়কে বলিল, "তুমি এখানে লুকাইয়া থাক। আমি পরিচয় দিয়া আসি।"

৩

নিশিকান্ত বহির্ব্বাটীতে গিয়া একটা প্রকাণ্ড প্রণাম করিয়া বসিল। "মা, আপনি বাহিরে আসুন। আমার নাম নিশিকান্ত বসু, জাতিতে খাঁটী কায়স্থ। নিবাস ফরাসডাঙ্গা। আমি মামলাগ্রস্ত। হরিদাস বাবুকে উকীল করিব, মনঃস্থ করিয়াছি। তিনি বিনয়বাবুর বন্ধু। বিনয়বাবু আমার বন্ধু। বিনয়বাবুরই অনুরোধে আমি এখানে উপস্থিত। অসময়ে আসিয়াছি, মার্জ্জনা করিবেন। হরিদাস বাবু বোধ হয় শীঘ্রই বাড়ী ফিরিবেন। ভয় নাই, আমি আপনার পুত্রের ন্যায়।"

এই প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়া নিশিকান্ত বসিয়া পড়িল। মধুর মাতৃসম্ভাষণ শুনিয়া বিধবার ভয় দূর হইল। তিনি মালতীকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। চতুর নিশিকান্ত পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বিধবার পদপ্রান্তে একটি গিনি ও মালতীর হস্তে একটি গিনি রাখিল।

মালতী লজ্জায় ও ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

নিশিকান্ত সহাস্যে বলিল, "ভয় নাই, উকীলের ঘরে মক্কেল পুত্রের ন্যায়। যে মামলা চলিতেছে, তাহাতে সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইবে। সে সহস্র মুদ্রা আপনার পুত্র হরিদাসের। এই অর্থ বিনয়কুমার আমাকে যোগাইতেছেন। ধর্ম্ম ও সত্য বিনয়ের ব্রত। যে দিকে ধর্ম্ম, সেই দিকে জয়। বিনয়ই ধর্ম্ম। কি বল দিদিমণি?"

মালতী ইতিপূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিধবা আসন পাতিয়া বসিলে, নিশিকান্ত বলিল, "মা, আপনার কন্যার ন্যায় রূপসী চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই। আমার মতে বিনয়কুমার তাহার উপযুক্ত পাত্র।"

বিধবা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বাবা, আমার কপালে কি তা হবে? আমরা দরিদ্র। মালতীকে তাহারা লইবে কেন? পায়ে ঠেলিবে।"

নিশিকান্ত। আমার নাম নিশিকান্ত, পিতার নাম রজনীকান্ত। আপনার ভিটায় বসিয়া বলিতেছি, বিনয়কুমার কেন, তাহার বাপ পর্য্যন্ত আপনার কন্যাকে লইবে, নচেৎ নরকস্থ হইবে। আমি বরাবর সত্য কথা বলি। (সিগারেট লইয়া) এই সমস্ত দেশ একত্র করিলে আপনার কন্যার মূল্য হয় না।"

বিধবা। বাবা, তোমার বড় মিষ্ট কথা। আমার হরিদাসের ঐ রকম। কিন্তু কোনওটাই ফলে না। তোমার উপর বড় মায়া হইতেছে।

নিশিকান্ত। এই দয়াস্নেহশূন্য সংসারের মায়াটাও মন্দ নয়। আমার পিতা মাতা নাই। জ্ঞাতিরা আমার সর্ব্বনাশে উদ্যত। আমি দেবীপুরে একটা বাঁড়ী করিব, স্থির করিয়াছি। আপনার পুত্রের যাহাতে পসার হয়, সে বিষয়েও যত্ন করিব। দ্বিতীয়তঃ, আপনার কন্যার সম্বন্ধে যাহা কহিলাম, তাহাতে যদি আপনার মত হয়, তবে ফলাফলের ভার আমার হস্তে সমর্পণ করুন। বিশ্বাস করিলেই সুফল হয়। অবিশ্বাসের ফল বিষময়। এই একটা খাঁটী কথা। অন্ধ বিশ্বাসও ভাল। কাল ইহা বুঝিতে পারিবেন। আপনার কন্যা তের বৎসর পার হইয়াছে, দেখিতেছি। যদি আমাকে পুত্র জ্ঞান করেন, তবে তাহার বিবাহের ভার আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

নিশিকান্তের এই তৃতীয় বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া বিধবার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। ইত্যবসরে হরিদাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

৪

হরিদাস বলিল, "মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।" কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়াই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। নিশিকান্ত বলিল, "হরিদাস বাবু, কোনও লজ্জা নাই। আপনার সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই আপনার মাতার পুত্রস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছি। আমার নাম নিশিকান্ত বসু; মামলাগ্রস্ত পুরুষ। জাতিতে কায়স্থ। জ্ঞাতি-বিরোধে দেহ জর্জ্জরিত—প্রবাসী—বিনয়কুমারের বন্ধু—আপনাকে উকীল রাখিতে চাহি—ভ্রাতৃসম আপনি—পরস্পরের দুঃখে দুঃখী হওয়াই জগতে ধর্ম্ম—নিবাস ফরাসডাঙ্গা—"

এক কথাতেই হরিদাস নিশিকান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মাতা বলিলেন, "বাবা হরিদাস, নিশিকান্ত আমাদের অসময়ের বন্ধু, উহাকে যত্ন কর।"

নিশিকান্ত হরিদাসকে টানিয়া আম্রকাননের দিকে লইয়া গেল। নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া অদূরে অস্ফুট আলোক হরিদাসের বাটীর বাতায়নের এক পার্শ্ব হইতে বাহির হইতেছিল। বিনয় উন্মনা হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিল। নিশিকান্ত বাগানের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি এখানে বসিয়া বিস্কুট খাও, আমি চা তৈয়ারি করিয়া বিনয়কে ডাকিয়া আনি।"

সে হরিদাসকে বৃক্ষতলে বসাইয়া বিনয়ের সন্ধানে গেল। নিশিকান্ত ডাকিল, "বিনয়!"

বিনয় বলিল, "কি ভাই?"

নিশি বলিল, "বিপদের ধৈর্য্যই ঔষধ। যদি মঙ্গল চাও, তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর।

বিনয়। তথাস্তু।

নিশি। হরিদাসের নিকট মালতীর কথা এবং তোমার পিতার প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণভাবে গোপন করিতে হইবে। আমার প্রস্তাবগুলির সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন কর। কেবলমাত্র হরিদাসকে আমার সহিত দিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিবে।

বিনয় তাহাই করিল। নিশিকান্ত স্পিরিটষ্টোভে চা তৈয়ারি করিয়া উভয়কে পান করাইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হরিদাস ও নিশিকান্ত পর দিন প্রভাতের কন্যাদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিল। হরিদাস আহ্লাদে বিহ্বল। নিশিকান্ত কহিল, "মেয়েটি চমৎকার। বিনয়ের একান্ত অনুরোধ, যাহাতে তোমার মনোনীত হয়, তাহাই করিবে। জমীদারীর আয় দুই লক্ষ। বুঝিলে ত?"

হরিদাস সানন্দে বলিল, "বিনয়, তুমি ধন্য! তোমার বিবাহ হইয়া গেলে আমার মালতীর জন্য একটি পাত্রের চেষ্টা করিও। আমরা বড় গরীব।"

হরিদাসের নয়নে জল, বিনয়ের মুখ ভার, ম্লান ও শোকক্লিষ্ট। নিশিকান্ত গম্ভীরবদনে তীক্ষ্ণ-কটাক্ষে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হরিদাসকে বলিল, "বিনয় চুপ করিয়া চা খাউক; আমরা একটু পুষ্করিণীর পাড়ে মামলা মোকদ্দমার কথা আলোচনা করি।"

ইতিমধ্যে প্রতিবাসিনী গদাইচাঁদের মাতা আসিয়া মালতীকে সংবাদ দিয়াছিল, "ওলো মালতী, কাল যে বড় ধূম! জমীদারের ছেলে বিনয় বাবু আর তোর দাদা নরসিংপুরে মতিলাল বাবুর মেয়েকে দেখ্‌তে যাবে। তার সঙ্গে বিনয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

মালতী কেবলমাত্র বলিল, "বেশ ত।" রাত্রি নয়টার পর হরিদাস ফিরিয়া আসিলে মালতীর মাতা বলিল, "বাবা হরিদাস, দেখ্‌ ত, মালতীর জ্বর হয় নাই ত।"

হরিদাস গায়ে হাত দিয়া দেখিল, খুব জ্বর। হরিদাস বলিল, "তাই ত, আমি প্রাতঃকালে তবে নরসিংহপুরে যাই কি করিয়া?"

মালতী ধীরে ধীরে বলিল, "ততক্ষণে আমার জ্বর সেরে যাবে, দাদা।" রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বালিকা হৃদয়ের যন্ত্রণায় কাঁদিয়াছিল। শতসহস্র দেবতাকে মানাইয়া যে দেবতাকে সে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে শীঘ্রই মন্দির হইতে চলিয়া যাইবে। দলিতা মালতী বেদনাভরে সেই চরণ-কমল কল্পনায় কতবার চুম্বন করিল। প্রত্যেক অশ্রুকণার সহিত অগণন মুহূর্ত্ত-সঞ্চিত আশার বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিল।

মধুমাস। আম্রকাননে পিক কুহরিতেছিল। নব-দম্পতীর সুখ কামনা করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হরিদাস ঔষধ লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু খাওয়াইতে হইল না। মালতীকে জাগাইয়া হরিদাস দেখিল, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। মালতী হাসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জ্বর হয় নাই। আমার পুতুলের বাক্স হইতে ভাল পুতুলটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাই—" হরিদাস স্নেহভরে বলিল, "আবার কিনে দেব।"

৫

প্রাতঃকালে মহাসমারোহ। নরসিংহপুরের পথে ফিট্‌ফাট গৌরবর্ণ হরিদাস, কৃষ্ণবর্ণ সিগারেট-প্রিয় নিশিকান্ত ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান আমলাদ্বয় যাদব ও ব্যোমকেশ মোটর-কারে চড়িয়া মুক্ত বাতাসে ধূলা বিকীর্ণ করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিতেছিল। পথে সারি সারি রাখাল-বালক 'হাওয়া গাড়ী, হাওয়া গাড়ী!' ইত্যাকার চীৎকার করিতে করিতে দুই একটা ঢিল মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়িত গাভীগণের পশ্চাতে পড়িয়া তাহারা নিরস্ত হইয়া গেল। নিশিকান্ত বলিল, "এখানকার লোক অত্যন্ত বদ। আসিবার সময় উত্তম মধ্যম দিব, মনঃস্থ করিয়াছি।" ব্যোমকেশ কহিল, "উহারা নিরীহ, তাড়া দিলেই যথেষ্ট।"

দেখিতে দেখিতে সকলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত। মহা আহ্লাদসহকারে অভ্যর্থনা—সুসজ্জিত গৃহ—খাম্বীরা তামাকু—তাম্বূলাদি-সেবনের পর, ক্রমে সকলের সম্মতিক্রমে সুসজ্জিতা সালঙ্কৃতা কন্যা উপস্থিত।

হরিদাস দেখিতে লাগিল। আমলাদ্বয় সসম্ভ্রমে পার্শ্বে বসিয়া রহিল। নিশিকান্ত নির্লিপ্তভাবে ঘন ঘন ধূমপান করিতে লাগিল।

প্রমীলা সকলকে নিস্তব্ধ দেখিয়া একবার হরিদাসের দিকে চাহিল। হরিদাস ভয়ে মুখ ফিরাইয়া লইল। নিশিকান্ত কহিল, "ভয় নাই, ভাল করিয়া দেখ।"

হরিদাস বলিল, "চমৎকার মেয়ে, দেখা বাহুল্য। বিনয়ের উপযুক্ত মেয়ে।" হরিদাসের ক্রমেই সাহস উৎসাহ বাড়িতেছিল। আমলাদ্বয় ঘন ঘন হরিদাসের অনুমোদন করিতেছিল।

নিশিকান্ত হরিদাসের কর্ণে কহিল, "তোমার পছন্দের উপর নির্ভর। তুমি সম্পূর্ণ দায়ী, যদি বিনয় পছন্দ না করে, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

হরিদাস বুক ফুলাইয়া কহিল, "আচ্ছা।"

হরিদাস কহিল, "সুন্দরী মেয়ে। আমার পছন্দ হইয়াছে।"

নিশিকান্ত কহিল, "এখন একটু জলযোগ করিলে হয় না?"

কন্যাপক্ষের এক জন কহিল, "একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলে হয় না?"

নিশিকান্ত বলিল, "ইহার অনুজ্ঞা আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে হরিদাস বাবু ইচ্ছা করিলে আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন।"

হরিদাস নামজাদা যুবা পুরুষ। অন্দরমহলে সকলে তাহার বুদ্ধির ঘন ঘন প্রশংসা করিতে লাগিল। অনেকে কহিল, "হরিদাসের যেমন সুন্দর পছন্দ, যদি উনিই পাত্র হইতেন, তাহা হইলেও মন্দ হইত না।" প্রমীলার মাতা সে কালের তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রৌঢ়া। তিনি বলিলেন, "তাই বা মন্দ কি? অমন ঘরজামাই পাইলে, বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা নাই।" কর্ত্তা নস্য লইয়া কহিলেন, "অ্যাও হয়, অ-ও হয়, আমাদের কি টাকার অভাব? হরিহর চাটুর্য্যে একটা প্রকাণ্ড ধড়ীবাজ লোক।" গৃহিণী কর্ণাকর্ণি করিয়া কহিলেন, "মেয়ের হরিদাসকে পছন্দ হইয়াছে।"

যাহা হউক, হরিদাস ব্যগ্রতাসহকারে কন্যার মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা ও হস্তে গিনি রক্ষা করিয়া কহিল, "আয়ুষ্মতী হও।" সকলে প্রমীলাকে কহিল, "প্রণাম কর।" প্রমীলা প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে গেল।

তৎপরে রেকাবীপূর্ণ জলখাবার উপস্থিত দেখিয়া নিশিকান্ত ও হরিদাস ও আমলাদ্বয় অবিলম্বে আনন্দপরিপূর্ণচিত্তে পথশ্রমজনিত ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে বসিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে হরিদাস ঘোর গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি চমৎকার!" সকলে স্মিতমুখে বলিল, "ব্যাপার কি?"

হরিদাস। এই লাড়ু কি সুন্দর! জীবনে এমন লাড়ু কুত্রাপি খাই নাই। কন্যাপক্ষীয় ও পক্ষীয়া সকলেই উৎফুল্ল-আননে হরিদাসের পছন্দকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। "এ লাড়ু কন্যার স্বহস্তের তৈয়ারী। ওগুলি আনন্দ-লাড়ু।"

হরিদাস কহিল, "আরও চাহি।" সে দুই তিন বার চাহিয়া লইয়া এবং তৃপ্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া বলিল, "জীবনের সার্থকতা আজ উপলব্ধি করিলাম। জন্ম-জন্ম যেন এ হেন লাড়ু খাই।" সকলেই অত্যন্ত হৃষ্ট। যাইবার সময় প্রমীলা সগর্ব্বহৃদয়ে ও সতৃষ্ণ-নয়নে হরিদাসের দিকে চাহিয়াছিল। সেই সময় হঠাৎ হরিদাসও চাহিয়াছিল, এবং বোধ হয়, সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে লাড়ু তৈয়ারীর সার্থকতা ও উভয়ের জীবনের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জড়িত হইয়া গিয়াছিল। নিশিকান্ত সিগারেটের ধূমমধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ হাসিয়াছিল।

৬

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কুমার গৃহের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া আকাশের নক্ষত্র দেখিতেছিল। বিনয়ের পিতা হরিদাসের চাতুরীর বাহাদুরী ও নিশিকান্তের ক্ষিপ্রতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছিলেন। দ্রুতগতি অন্দর-মহলে গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উভয়ের কার্য্য-সফলতার সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

গৃহিণী অনেক চেষ্টার পরে কহিলেন, "বেশ ; আমি একবার শিবমন্দিরে যাইব। বাবার যাহা অভিরুচি, তাহাই হইবে।"

তখন চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী সদলবলে দাস-দাসী সমভিব্যাহারে শিবিকা-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

প্রকাণ্ড পাল্‌কী। বত্রিশ জন বাহক। বিরাট প্রশস্ত দ্বার। গৃহিণীর কলেবরের আয়তনের সমতুল। সেই ফরমায়েসী শিবিকা বর্দ্ধমানে প্রস্তুত। মূল্য এক শত বত্রিশ টাকা। দুই ঘণ্টার মধ্যে বিশাল গ্রাম দেবীপুরের অপর প্রান্তে মাঠ ও বন পার হইয়া দাস-দাসী-পরিবৃতা জমীদারের গৃহিণী মন্দিরে পঁহুছিলেন। স্থানটি বিজন, আম্রকাননে বেষ্টিত।

বিরাট উপচারে পূজা সমাপ্ত করিয়া মন্দিরের পূজারী কহিলেন, "মা, এখন আপনি প্রণাম করুন।"

দীর্ঘে প্রস্থে সমান আয়তনবিশিষ্ট দেহ, প্রণামোপযোগী অবস্থায় নত করিবার প্রয়াসে তিন জন দাসী বামে, দক্ষিণে ও মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া গেল।

গৃহিণী শিবের মস্তকে একটি কনকধুতুরা স্থাপিত করিলেন। হঠাৎ পুষ্প মস্তক হইতে পড়িয়া গেল।

সকলে প্রমাদ গণিল। ইতিপূর্ব্বে মা জননীর প্রদত্ত ধুতুরা কখনও শিব-মস্তকভ্রষ্ট হয় নাই! বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণীর ঘর্ম্ম অধিকপরিমাণে ছুটিল। তিনি সভয়ে বলিলেন, "মহাদেব, এ বিবাহে মঙ্গল হবে ত?"

মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে সঘনে ধ্বনি উঠিল, "না!"

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে সকলে পলায়নতৎপর হইবার বিশেষ চেষ্টা প্রকাশ করাতে গৃহিণী তারস্বরে কহিলেন, "তোমরা সকলে থাক। দেবীপুরে অনেক বার পূর্ব্বে কর্ত্তাদের সময় দৈববাণী হয়েছে।"

বাহিরে সকলে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল। মন্দিরে কেবলমাত্র পূজারী। কোনও নূতন লোকের চিহ্নমাত্র নাই!

গৃহিণীর আজ্ঞানুসারে সকলে বাহিরে গেল। তখন জমীদার-ভামিনী গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ হইয়া রোমাঞ্চিতকলেবরে ভক্তি-ভরে কহিলেন, "বাবা, আমার আজ জন্ম সার্থক; আবার বল, তোমার ইচ্ছা কি?"

নিঃশব্দ ও নির্জ্জন গৃহে পুনরায় দৈববাণী হইল, "তোমার পুত্রের মনোনীতা কন্যাই দেবীপুরের জমীদার-বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। সেই গৃহলক্ষ্মীকে লইয়া আইস, নচেৎ—"

গৃহিণী তখন মূর্চ্ছিতা। পূজারী শুষ্ককণ্ঠ। দাস দাসী বহির্ভাগে সত্রাসে রাম-নাম জপ করিতেছিল। গৃহিণীর বিরাট দেহ শিবিকায় বহন করিয়া আনা দুষ্কর দেখিয়া সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সর্দ্দার বলিল, "মশাল জাল।" প্রায় বিংশতি মশালে বনস্থলী সম্পূর্ণ আলোকিত হইল, তথাপি ভূতের সন্ধান পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে গৃহিণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি সগর্ব্বে বলিলেন, "অদ্য জন্ম সার্থক, ওরে! তোরা শীঘ্র বাড়ী লইয়া চল।"

সকলেই তথাস্তু বলিয়া গৃহিণীকে পূর্ব্ববৎ বহন করিয়া এক ঘণ্টায় দুই ঘণ্টার রাস্তা সাবাড় করিল। পূজারী মন্দির ফেলিয়া গৃহে চলিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি সন্ধ্যাকালে মন্দিরে কেহ প্রবেশ করিত না!

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? মথুর সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া কহিল, "দৈববাণী

সুনিশ্চিত।” সকল প্রজাই বিশ্বাস করিল। রাত্রিকালে সকলে পরামর্শ করিল, “এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না।”

গৃহিণী অন্তঃপুরে উপনীত হইয়াই বলিলেন, “বিনয়কে ডাকিয়া আন্।” বিনয় মাতার মুখশ্রীর অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল।

মাতা পুত্রকে বক্ষে টানিয়া ক্রন্দনরোলে ভদ্রাসন ফাটাইতে বসিলেন। তার পর বলিলেন, “ওরে আমার নয়নের মণি, ওরে আমার শিবের দাস, আমার বাবার মাণিক, এখনই বল, তুই কাকে পছন্দ করেছিস্, সেই যে দেবীপুরের রাজলক্ষ্মী!”

৭

বিনয় বলিল, “মা, তুমি থাম। কেউ শুন্‌তে পাবে।” তাহার পর চুপি চুপি মাতা ও পুত্রে কথা হইল। পুত্র কাঁদিল, মাতা নয়নের জল মুছাইল। এইরূপে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল। তখন হরিহর চট্টোপাধ্যায় অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন।

বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া গৃহিণী সুস্পষ্টকণ্ঠে বুঝাইয়া দিলেন যে, এ বিবাহ হইতে পারে না। কারণ, দৈব সম্পূর্ণ প্রতিকূল। দৈববাণীর মতে এবং বিনয়ের অন্তরের ইচ্ছা মতে, হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী মালতীই এ গৃহের ত্রিভুবনানুমোদিতা ভবিষ্যৎ রাজলক্ষ্মী!”

কর্ত্তা প্রথমে রক্তবর্ণ হইয়া চটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া শীত-মেরুপ্রান্তে হটিতে লাগিলেন। এইরূপ পরস্পর ঘন ঘন চটিয়া এবং হটিয়া স্থির হইল, ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর রক্তলোচন হরিহর চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃকালে কাছারী-বাটীতে গমন করিলেন। প্রজাগণ একবাক্যে জানাইল যে, দৈববাণীই অনুসরণীয়; তাহাই একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ।

বৃদ্ধ নায়েব গোপালকৃষ্ণ কর্ত্তার ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষের খাতা আনিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার প্রপিতামহী এইরূপে দৈববাণী দ্বারা পরিণীতা হইয়াছিলেন!

চতুর্দ্দিকেই বিপ্লব! চতুর্দ্দিকেই ঘোর চক্র! এ কি ব্যাপার! হরিহর চাটুর্য্যে বেয়াকুফের ন্যায় দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভৃত্যকে কহিলেন, “নিশিকান্ত বাবুকে লইয়া আইস।”

সুবর্ণ-চশমা-পরিধৃত নিশিকান্ত সুগোল চক্ষু নত করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আপনি প্রবীণ পুরুষ, ধর্ম্মপরায়ণ ; আমি কায়স্থের সন্তান, আপনার দাসানুদাস ; তবে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যত দূর আসে, আমার নাম নিশিকান্ত বসু, জাতিতে খাঁটী কায়স্থ, নিবাস ফরাসডাঙ্গা—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনার বংশ যে দৈব-রক্ষিত শ্রেষ্ঠ বংশ—তাহা অতিশয় ঠিক, এবং সে বংশের গৌরব দৈববাণী পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করাটা কত দূর শ্রেয়—"

তাহার পর নিশিকান্ত সমাগত প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "সকলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জয় কামনা করহ !"

তখন সকলে জয়নাদ আরম্ভ করিল ! হরিহর চাটুর্য্যে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞভ্রষ্ট মেঘনাদের ন্যায় সর্ষপ তৈল দ্বারা নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্র অভিষিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "বেশ ; অদ্যই বৃন্দাবনধামে যাওয়া মনঃস্থ করিলাম।"

কিন্তু বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বেই গৃহিণীর সুগভীর গর্জ্জন ও ধিক্কার, বিনয়ের শঙ্কিত-মুখচ্ছবি ও সংসারের মায়া হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয় প্লাবিত করিল।

মহাসমারোহে দেবীপুরে দুইটি বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর উভয় নব দম্পতীকে দুই জোড়া আশীর্ব্বাদ করিয়া নিশিকান্ত সাহ্লাদে গমনোদ্যত হইল। এমন সময় হরিহর চট্টোপাধ্যায় নিশিকান্তকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি অতি সুচতুর, বিশ্বাসযোগ্য ও কর্ম্মঠ পুরুষ, আমার বিষয়ের ম্যানেজারী তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে চাহি, বিনয় অত্যন্ত গাধা—"

নিশিকান্ত জিহ্বাকর্ত্তন পূর্ব্বক কহিল, "আমি জাতিতে কায়স্থ—নিবাস ফরাসডাঙ্গা—অমন কথা বলিবেন না—দাসানুদাস—"

কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা অটল। ক্রমে নিশিকান্ত উভয় জমীদারীর ম্যানেজার হইয়া পড়িল।

হরিদাসের বিধবা মাতা মহাসমারোহে নূতন বধূর দ্বারা আনন্দ-লাড়ু তৈয়ারী করাইয়া বৈশাখ মাসের প্রথমেই আনন্দপ্লাবিত গৃহপ্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে প্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইলেন।

হরিদাস আম্রকাননে নিশিকান্তকে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিশি দা', দৈববাণীর ব্যাপারটা কি হইয়াছিল, বল ত ?"

নিশিকান্ত গম্ভীরভাবে একটি সিগারেট গ্রহণ করিয়া কহিল, "আম্র বৃক্ষের উপর হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধ্বন্যোৎক্ষেপণ করিয়াছিলাম। এ বিদ্যাটা অতি সোজা ; তবে গলা সাফ চাহি।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

জুতা।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে জুতা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ, কোন্ দেশ কত কাল হইতে জুতার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহাই সভ্যতালাভের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, জুতা-তত্ত্ব উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

কোন্ পুরাকালে ভারতবর্ষে জুতার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান-লাভের উপায় নাই। * ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, সভ্যতা-বিকাশের প্রথম উপক্রম হইতেই, তাহা প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে। জুতার জন্ম-কথা উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবলে একটি হাস্যরসোদ্দীপক কবিতার অবতারণা করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে জুতাকে পরম গৌরব দান করিয়াছেন। স্বয়ং যুধিষ্ঠির [মহাভারতীয় অনুশাসন-পর্ব্বে ৯৫ অধ্যায়ের প্রারম্ভে] ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

যদিদং শ্রাদ্ধকৃত্যেষু দীয়তে ভরতর্ষভ।
ছত্রং চোপানহৌ চৈব কেনৈতৎ সম্প্রবর্ত্তিতম্॥

এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব জমদগ্নির একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছিলেন,—"একদা মধ্যাহ্নসময়ে জমদগ্নি উর্দ্ধ দিকে বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এবং তাঁহার ভার্য্যা রেণুকা বাণাহরণে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। সূর্য্য-তাপতপ্তা রেণুকা বাণাহরণে অসমর্থা হইলে, কোপনস্বভাব জমদগ্নি মার্ত্তণ্ডদেবের সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য ধনুতে বাণ সংযোগ করিলেন।

---

* তৈত্তিরীয়-সংহিতায় [৫। ৪। ৪। ৪] "কাষ্ণী উপানহা উপমুঞ্চতি" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জুতার ব্যবহার কত পুরাতন, ইহাতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তখন সূর্য্যদেব জমদগ্নির শরণাগত হইয়া জমদগ্নিকে তাপনিবারক ছত্র ও চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিয়াছিলেন। দানকালে সূর্য্যদেব বলিয়াছিলেন,—

মহর্ষে শিরসস্ত্রাণং ছত্রং মদ্রশ্মিবারণং।
প্রতিগৃহ্নীষ পদ্ভ্যাঞ্চ ত্রাণার্থং চর্ম্মপাদুকে॥

এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা কত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান-লাভের উপায় নাই। যুধিষ্ঠিরের সময়ে লোকে ইহা বিস্মৃত হইয়াছিল, কেবল পিতামহ ভীষ্মদেবই ইহার বিষয় অবগত ছিলেন।

জুতার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পর, তাহা ভারতবর্ষে যথাযোগ্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। নগ্নপদে বিচরণ করিবার নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াই, শাস্ত্রকারগণ জুতা পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে [দ্বিতীয়াংশে ২১ অধ্যায়] তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

বর্ষাতাপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামা বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ।

কালক্রমে জুতার ব্যবহার এত প্রবল হইয়াছিল যে, উপনয়নের পর এবং সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে, [ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়] জুতা ব্যবহৃত হইবে কি না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-শাসনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে [তৃতীয় প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে ২৬ সূত্রে] দেখিতে পাওয়া যায়,—

অন্তর্গ্রামে উপানহোর্ধারণম্॥

ইহার অর্থ এই যে,—ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়, ব্রহ্মচারী যে গ্রামে বাস করিতেছেন, কেবল সেই গ্রামের মধ্যে বিচরণ করিবার সময়েই, জুতার ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও, অন্যত্র বিচরণ করিবার সময়ে, জুতার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল না। তবে নিজেরই হউক, আর অপরেরই হউক, জুতা অস্পৃশ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল। কাহারও
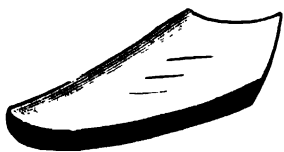
পাদুকা।

ব্যবহার্য্য জুতাই হাতে করিয়া বহন করিবার রীতি ছিল না। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে [তৃতীয় প্রপাঠকের ৫ খণ্ডের ২২ সূত্রে] তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

নোপানহৌ স্বয়ং হরেৎ॥

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলে, সমাবর্ত্তন করিবার সময়ে, উপানহ ধারণ করিবার

মন্ত্র অদ্যাপি সুপরিচিত আছে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রটি উল্লিখিত আছে,—

প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতম্ ॥

হলায়ুধ [ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে] ইহার ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, জুতা-মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকায় তদীয় পাণ্ডিত্য অভ্রান্তরূপে ব্যক্ত হইতেছে। যথা,—

হে উপানহৌ যুবাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ।

"উপক্রান্ত-গতি-ক্রিয়ায়া অত্যাগঃ প্রতিষ্ঠা ; তন্নিমিত্তত্বাৎ যুবামেব প্রতিষ্ঠে স্থো ভবতঃ। ততো মা মাং পাতং রক্ষতং। কুতঃ? বিশ্বতঃ সর্ব্বস্মাৎ গতি-বিরোধিনঃ কণ্টকাদেঃ।"

ইহার অর্থ এই যে,—"হে জুতাযুগল ! তোমরা প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। আরব্ধ গতিক্রিয়ার অত্যাগের নাম প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বলিয়া, তোমাদের নাম প্রতিষ্ঠা, অতএব তোমরা গতিবিরোধী কণ্টকাদি হইতে আমাকে রক্ষা কর।"
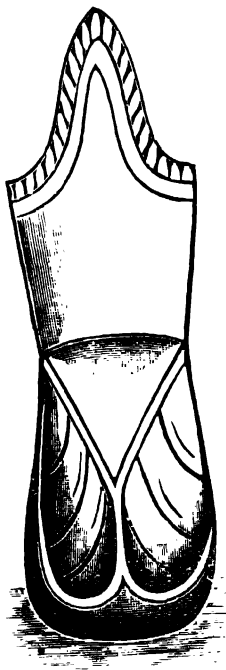
আজানুপত্রচরণ।

জুতা এইরূপে মন্ত্রমধ্যে স্থান লাভ করিয়াও সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি লাভ করিতে পারে নাই। সর্ব্বদা জুতা পরিধান করিয়া বিচরণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, সকলের সম্মুখে জুতা পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবার নিয়ম ছিল না। তাহা সদাচারবিরোধী বলিয়া, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রশাসন প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও জুতা ত্যাগ করিয়া দেবতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহ-পুরাণের বচনে জানিতে পারা যায়,—জুতা পরিধান করিয়া ভগবৎসমীপে গমন করিলে, ত্রয়োদশ বর্ষ চর্ম্ম-কার-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যথা,—

বহন্নুপানহৌ পদ্ভ্যাং যস্তু মামুপচংক্রমেৎ।
চর্ম্মকারস্তু জায়েত বর্ষাণাস্তু ত্রয়োদশ ॥

তথাপি সকল শ্রেণীর জুতার পক্ষে এরূপ কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ

হয় না। এক শ্রেণীর জুতা পরিধান করিয়া, "আচমন" পর্য্যন্ত চলিতে পারিত ;—দেবতার, গুরুজনের ও রাজার সমীপবর্ত্তী হইবারও বাধা ছিল না। ভট্টভাষ্যধৃত স্মৃতিবচনে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"রাজ্ঞাং গুরূণাং দেবানাং ন দুষোদস্তিকে চরন্।
আজানুপত্রচরণ স্তথাচমনকর্ম্মণি ॥"

ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির জুতা যেমন একালের সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে, সেকালেও সেইরূপ ছিল বলিয়াই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর জুতার মধ্যে "আজানুপত্রচরণ" নামক জুতার সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। নচেৎ এরূপ স্মৃতি-বচন প্রচলিত হইতে পারিত না।

কিরূপ প্রয়োজনে, কোন্ কোন্ কার্য্যে, জুতা ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইবার কারণ ছিল না। তজ্জন্য তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কিরূপ প্রয়োজনে, কোন্ কোন্ কার্য্যে, জুতা ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—
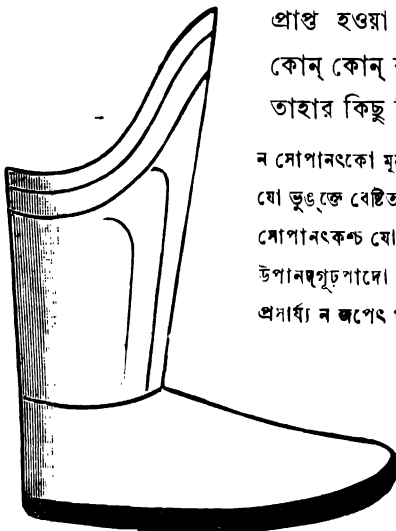
ন সোপানৎকো মূত্র-পুরীষে কুর্য্যাৎ ॥ [আপস্তম্ব]
যো ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্‌মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরম্ ॥ [কূর্ম্মপুরাণ]
উপানদ্‌গূঢ়পাদো বা যানশয্যাগতস্তথা।
প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা ॥ [তন্ত্রান্তর তন্ত্র]

আজানুপত্রচরণ।

সেকালে অন্যের জুতা কোনও প্রকারে আত্মসাৎ করিবার প্রলোভন ছিল না। কারণ, অন্যের ব্যবহৃত জুতা ও বস্ত্র ব্যবহার করিবার পক্ষে নিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্য সকলের নিকট সুপরিচিত ছিল। যথা,—

উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ। [মনু ৪।৬৬]

জুতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, শিল্পশাস্ত্রে [বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ ৪০০—৪০১ সূত্রে] কেবল দুই শ্রেণীর জুতারই

পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর নাম "পাদুকা"; অপর শ্রেণীর নাম "উপানহ্"। যথা,—

উপানহৌ প্রকর্ত্তব্যৌ স্বপাদ-প্রমিতৌ তথা।
পাদুকে চ তথা কার্য্যে অন্যথা দুঃখশোকদৌ॥

অতি পুরাকালের সাহিত্যে "পাদুকা" শব্দের অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরকালে "পাদুকা" ও "উপানহ" তুল্যার্থে প্রযুক্ত হইত বলিয়াই অমরসিংহ [অমরকোষে শূদ্রবর্গে ৮০] এই দুইটি শব্দকে একই পর্য্যায়ের অন্তর্গত করিয়া থাকিবেন।

আজানুপত্রচরণ॥
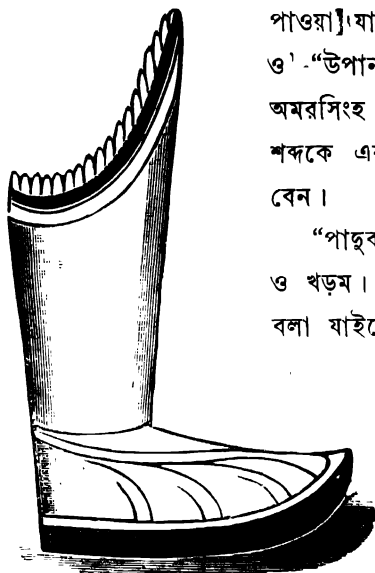
"পাদুকা" দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—চটীজুতা ও খড়ম। সুতরাং সকল "পাদুকা"কে উপানহ্ বলা যাইতে পারে না। এক শ্রেণীর পাদুকার নাম "গুরু-পাদুকা";—তাহা পাদুকা নহে; "পাদুকা-প্রতিমা" মাত্র। মণি-রত্ন স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, এবং চন্দন দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ "গুরুপাদুকা"-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইবার নিয়ম আছে। যথা,—

মণিরত্নময়ী কার্য্যা হেমরূপ্যময়ীপি বা।
চন্দনেনাপি কর্ত্তব্যা পাদুকা প্রতিমাপি বা।
শ্রীপর্ণা শ্রীদ্রুমাবাপি দেবদারুময়ীপি বা।
ষড়ঙ্গুলা চ সা কার্য্যা পাদুকে পূজয়েৎ সদা॥ [দেবীপুরাণ]

পদদ্বয়ে ব্যবহার করিবার জন্য যে "পাদুকা" নির্ম্মিত হইত, তাহা অবশ্যই চরণযুগলের পরিমাণ অনুসারেই নির্ম্মিত হইত।

"পাদুকা"র ন্যায় "উপানহে"রও প্রকারভেদ ছিল। যাহার দ্বারা পদ "উপনদ্ধ" [সর্ব্বতোভাবে আবৃত] হয়, [উপ+নহ্+ক্বিপ্] তাহারই নাম "উপানহ"। সুতরাং তাহা চটীজুতা বা খড়ম হইতে পৃথক্ পদার্থ। তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম "অনুপদীনা"; অপর শ্রেণীর নাম "আজানুপত্রচরণ"।

অনুপদসর্ব্বান্নায়ানয়ং বদ্ধা ভক্ষয়তি নেয়েষু ॥

এই [৫।২।৯] পাণিনি-সূত্রে "অনুপদীনা"র পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাশিকা-বৃত্তিতে ইহা "অনুরায়ামে সাদৃশ্যে বা অনুপদং বদ্ধা অনুপদীনা উপানৎ" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহা আয়তনে বা সাদৃশ্যে পদের অনুরূপ, সেইরূপ সমস্ত পদাবরণকারক জুতার নাম "অনুপদীনা";— তাহা একালের "লপেট" জুতার স্থলাভিষিক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। "আজানুপত্রচরণ" জানু পর্য্যন্ত আবরণকারী বুট-জুতা।

ঋষভোপানহো ঞ্যঃ ॥

এই [৫।১।১৪] পাণিনি-সূত্রের ব্যাখ্যায়, কাশিকা-বৃত্তিতে চর্ম্ম ও মুঞ্জ
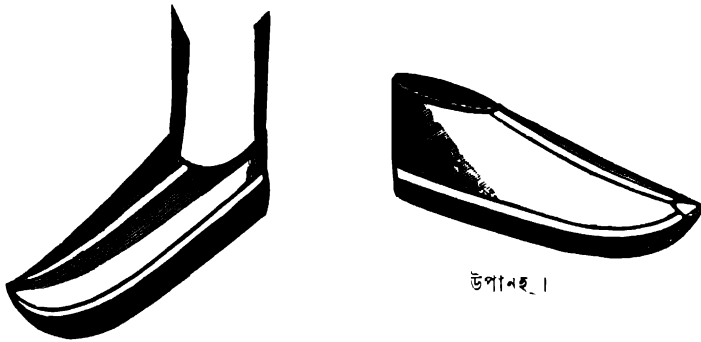
উপানহ্।

[এক শ্রেণীর তৃণ] "উপানহে"র উপাদান-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মুঞ্জ-নির্ম্মিত জুতাই হয় ত এক সময়ে "মোজা" নামে পরিচিত ছিল। উচ্চারণ-গত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে বলিতে হইবে,—অনুপদীনা প্রভৃতি উপানহ মুঞ্জ দ্বারা নির্ম্মিত হইত বলিয়াই "মোজা" নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ভরত মল্লিক লিখিয়া গিয়াছেন,—

সৈব উপানৎ পাদায়তা পাদায়ামপ্রমাণা চেৎ অনুপদীনা মোজ. খ্যাতা স্যাৎ। গুল্‌ফাদি-সহিতমশেষপদং অনুপদং সাকল্যে অব্যয়ীভাবঃ।

সুপণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় [ইন্দো-এরিয়ান্ গ্রন্থের প্রথম ভাগের ২২৬ পৃষ্ঠায়] ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,— "বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ মোজা [ষ্টকিং] অর্থেই অনুপদীনার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।" ডাক্তার মহোদয়ের মতে "মোজা" শব্দটি পারসীক ভাষা হইতে গৃহীত। কিন্তু মুঞ্জের সহিত উপানহের চিরপুরাতন সম্পর্ক স্মরণ

করিলে মনে হয়,—কালক্রমে অনুপদীনা জুতাই ভারতবর্ষে "মোজা" নাম লাভ করিয়াছিল; "মোজা" শব্দ পারসীক ভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই। সন্ন্যাসিগণের ব্যবহার্য্য জুতা নারিকেল-তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহার পরিচয় "কাদম্বরী"তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

বিশাখিকাশিখরনিবদ্ধনারিকেলফলবল্কলময়ধৌতোপানদ্‌যুগোপেতাম্।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে দেবলোক [সূর্য্যলোক] হইতেই মর্ত্ত্যলোকে জুতার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং দেবলোকে [নিতান্তপক্ষে সূর্য্যলোকে] জুতার ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল! কোনও কোনও সূর্য্যমূর্ত্তির পদযুগলে জুতা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যপদযুগল যে জুতা দ্বারা আবৃত করিতে হইবে, এরূপ কোনও বচন দেখিতে না পাইলেও, অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তিতে তাহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "সূর্য্যপদে উপানৎ" প্রবন্ধে [সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৬শ ভাগের ১৮৫ পৃষ্ঠায়] পণ্ডিতবর শ্রীযুত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সূর্য্যমূর্ত্তির পদযুগলের আবরণ-পদার্থ জুতা কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত সূর্য্যমূর্ত্তির পদযুগলে যে আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে বুট-জুতা ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যত্নে বরেন্দ্রভূমির নানা স্থান হইতে সংগৃহীত সূর্য্যমূর্ত্তিনিচয়ের পদযুগলে যে সকল জুতা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার ছয়টি চিত্র প্রদর্শিত হইল। সেকালের ভাস্কর্য্যে নানা শ্রেণীর জুতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাকে জুতা ভিন্ন আর কিছু মনে করিয়া সংশয়াপন্ন হইবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্ত্তিকেয়ের জুতা এখনও সর্ব্বত্র সুপরিচিত। পাদুকা-সংযোগে দেবমূর্ত্তি সুসজ্জিত করিবার প্রথা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত একটি ধ্যানে পাদুকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং বরপঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্ব্বস্তুরূপাভিরাবৃতাম্॥
শক্তিভিঃ স্মেরবদনা· স্মেরমৌক্তিকভূষণাম্।
রত্নপাদুকয়োন্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ॥

গ্রীক্‌সেনা ভারত-সীমায় উপনীত হইবার সময় হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচিত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস,—

সেই সময় হইতে ভারতবর্ষের লোকে গ্রীক্‌দিগের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়ে সভ্যতালাভের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু জুতা সম্বন্ধে এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপায় নাই। গ্রীক্‌গণ ভারত-সীমায় পদার্পণ করিয়া, ভারতবর্ষের জুতার পরিচয় স্বদেশেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এরিয়ানের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে ভারতবর্ষের কারুকার্য্যখচিত জুতা শিল্পগৌরবে উল্লেখ-যোগ্য না হইলে, তাহা এরূপ ভাবে বিদেশের লেখকের গ্রন্থে স্থানলাভ করিতে পারিত না।* তাহা গ্রীক্‌দিগের অনুকরণলব্ধ হইলে, সে কথাও উল্লিখিত হইত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বিদেশী গল্প।

ত্যাগের জয়।

ব্রিটানী দেশে একটি বালক ছিল। কমলার স্নেহদৃষ্টি কখনও তাহার উপর নিপতিত হয় নাই।

মৎস্যজীবীদিগের "ডুসি এমি" নামক একখানি ছোট জাহাজে সে ক্যাবিনের ভৃত্য ছিল। সাধারণ ক্যাবিন-ভৃত্যদিগের ন্যায় সেও বেতন অপেক্ষা খালাসীদিগের চরণাঘাতই অধিকপরিমাণে লাভ করিত।

বালক দৃঢ়কায়, কর্ম্মঠ ও সদানন্দ। তাহার শরীরের মাংসপেশীসমূহ সুদৃঢ়, মস্তক সুগঠিত; স্কন্ধদেশ বিপুল বলের পরিচায়ক। এক কথায় বালকটির অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর, বল-ব্যঞ্জক। তাহার আকৃতি যেমন সুন্দর, ব্যবহারও তেমনই অনিন্দনীয়। তাহাকে দেখিলে মনে বিরক্তি অথবা অবসাদের ছায়াপাত হইত না। সংসারে তাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না, এই যা তাহার প্রধান দুঃখ। জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ ইভেস্ কেরিয়োঁ ও "ডুসি এমি"র খালাসী-সমূহ ব্যতীত জগতের আর কাহারও সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। তাহার প্রসূতি বিপথগামিনী

* The Indians wore shoes made of white leather, and these are elaborately trimmed, while the soles were variegated, and made of great thickness to make the wearer seem so much taller.—Mc. Crindle's Arrian, p. 220.

হইয়াছিল। বালকের জন্মের পরই সেণ্ট-ব্রায়েন হাঁসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। বালকের মাতামহ ও মাতামহী বহু পূর্ব্বে সংসার হইতে দোকানপাট তুলিয়াছিলেন। তাহার মাতুল, মাতুলানী, অথবা মাতৃস্বসা, কেহই বিদ্যমান ছিলেন না; সুতরাং হতভাগ্য জীন পীয়েরের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না।

অনাথ-আশ্রমে কিছুকাল প্রতিপালিত হইবার পর সে ল্যাম্‌বেলের উপকণ্ঠস্থিত কোনও কৃষকের ভবনে আশ্রয় লাভ করে। কৃষকের মেষপাল চরাইয়া সে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিত; তাহাতেই কোনও ক্রমে তাহার দিনপাত হইত।

জীন পীয়েরের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বর্ষ, সেই সময় একদিন মধুর প্রভাতে সে তাহার প্রভুর সহিত সেণ্ট-জেন-দেলা-মার হাটে মেষ-বিক্রয়ার্থ গমন করিল। এখানে আসিয়া সে জীবনে সর্ব্বপ্রথম সমুদ্র দর্শন করিল। দেখিবামাত্রই তাহার হৃদয় মুগ্ধ হইল। সে সমুদ্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল।

সে দৃশ্য কি সুন্দর, কি বিচিত্র! আলোকোজ্জ্বল দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার বক্ষে জীবন-যাপন কি মনোরম! না, সে আর কৃষকের পল্লীভবনে ফিরিবে না! এখন হইতে সে সমুদ্র-বক্ষে বাস করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে!

সেই সময় মৎস্যজীবীদিগের একখানি জাহাজে একটি ক্যাবিন-ভৃত্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। জীন্ পীয়ের আবেদন করিবামাত্র সেই চাকরীতে সে বাহাল হইল। মহানন্দে বালক ইভেস্ কেরিয়োঁর অনুসরণ করিল। সেই দিবস অপরাহ্নেই জাহাজের মালিম পাল তুলিয়া সেণ্টমালো অভিমুখে জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

জীন পীয়ের অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, শিশুসুলভ কল্পনায় নাবিক-জীবনকে সে যত মধুর, যত মনোরম মনে করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত সুন্দর নহে। হতভাগ্য বালক খালাসীগণ কর্ত্তৃক নিয়তই প্রহৃত, তিরস্কৃত ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইত। কথায় কথায় পদাঘাত তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। নাবিকদিগের নানাপ্রকার নীচ কার্য্য সর্ব্বদাই তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইত। কিন্তু বালক নির্ব্বিকারচিত্তে নীরবে এই সকল অত্যাচার সহ্য করিত। বয়সের তুলনায় তাহার সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না।

নাবিক-জীবন অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া কখনও তাহার মনে অনুতাপ

জন্মে নাই। জীবনযাত্রার এবংবিধ পরিবর্ত্তনে সে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট বা অসুখী হয় নাই। এখানে সে পেট ভরিয়া আহার করিতে পাইত। এরূপ আহার্য্য সে জীবনে কখনও পায় নাই। বিশেষতঃ সমুদ্রকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত; ইহাই তাহার পরম সান্ত্বনার বিষয় ছিল।

জাহাজের মালিমটি অতিরিক্ত সুরাভক্ত ছিল। যতটুকু সুরা তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, তদপেক্ষা অধিক ব্রাণ্ডী পান করিবার পর সহচর-দিগকে সে আপনার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিত। তখন জাহাজের নাবিকগণের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা লক্ষিত হইত। জীন পীয়ের আপনার অংশের সুরা মালিমের অগোচরে অন্যান্য নাবিকদিগকে অর্পণ করিত। এই উপায়ে সে অনেকের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা আর সর্ব্বদা বালককে প্রহার করিত না। কিছু কাল পরে মালিমের সহধর্ম্মিণী বালককে স্বীয় অঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় দিলেন; তিনি তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বালক জীবনে কখনও অপরের স্নেহ অথবা ভালবাসা পায় নাই। স্নেহ প্রেমের মধুর রসাস্বাদনে সে আজন্ম বঞ্চিত।

জগতে ভালবাসিবার পাত্র তাহার কেহই ছিল না। জীন পীয়েরের বুভুক্ষু হৃদয় এ জন্য সর্ব্বদাই একটা অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিত। সংসারে সে একটি ভালবাসিবার পাত্র চাহে—প্রাণ ভরিয়া সে তাহাকে ভালবাসিবে, স্নেহ করিবে। মাতৃস্নেহ কাহাকে বলে, তাহা সে কখনও জানিত না; সুতরাং কোমলমতি বালক সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিত।

একদা অপরাহ্নে জাহাজখানি কোনও অপরিচিত বন্দরে নঙ্গর করিল। বালক তীরে নামিয়া স্বেচ্ছামত বেড়াইবার আদেশ পাইয়াছিল। তীরে ভ্রমণকালে তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা সংঘটিত হইল। তাহা এমন কিছু অসাধারণ অথবা বিচিত্র ব্যাপার নহে। রাজপথে সে একটি কুকুর দেখিতে পাইল। জীবটি অতি ক্ষুদ্রও নহে, তেমন বড়ও নয়। তাহাকে প্রিয়দর্শনও বলা চলে না, অথচ সে কুৎসিত নহে। খুব যে বুড়া, তাহাও নয়; কিন্তু তাহাকে পূর্ণবয়স্কও বলা যায় না। পথে সময়ে সময়ে আমরা যেরূপ কুকুর দেখিতে পাই, কখনও কখনও বা কোলে করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয়, এ কুকুরটি সেই প্রকার। এই নির্ব্বান্ধব জীবটি বোধ হয় কোনও মনিবের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। জীন পীয়ের একটি ভালবাসিবার পাত্র

পাইল ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইল। কুকুর তাহাকে প্রভুপদে বরণ করিয়া ফেলিল।

আত্মীয়স্বজনবর্জ্জিত বালক দেখিল,—এই কুকুরটি তাহার অপেক্ষাও হতভাগ্য ও নির্ব্বান্ধব। জীন পীয়েরের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। পরদিবস জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিলে ইভেস্-কেরিয়েঁা স্তূপীকৃত জালের অন্তরালে কুকুরটিকে দেখিতে পাইল। দেখিবা-মাত্র সে সলম্ফে ক্যাবিন-ভৃত্যের উপর আপতিত হইয়া তাহাকে ডেকের উপর ফেলিয়া দিল; তার পর নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় বালককে পদাঘাত করিতে লাগিল।

জীন পীয়ের করুণকণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু, প্রভু!"

জাহাজ ক্রমশঃ বন্দর হইতে গভীর সমুদ্রে চলিয়া গেল। তখন কুকুরটিকে আর জাহাজের উপর দেখা গেল না। শুধু দূর হইতে তাহার কাতর ক্রন্দন ও চীৎকারধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

"প্রভু!"

"চুপ কর, বদমাস ছোকরা! নহিলে এখনই তোর হাতে পায়ে শিকল পরাইয়া দিব"।

বিপুলদেহ, জোয়ান ট্রেজিক্ সহসা বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা, একবার এ দিকে চেয়ে দেখ দেখি?

নাবিক অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, আলোকোজ্জ্বল, ফেনপুষ্পিত তরঙ্গমালার উপর একটি কাষ্ঠবৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ভাসিতেছে। বোধ হইতে-ছিল, পদার্থটি জাহাজের অভিমুখেই ভাসিয়া আসিতেছে। তরঙ্গান্দোলনের সহিত উহা একবার উপরে ভাসিয়া উঠিতেছিল, আবার তন্মুহূর্ত্তেই দৃষ্টি-পথের অন্তরালে অন্তরিত হইতেছিল।

সেই কুকুরটা নয়?

বস্তবিক, তাই। ক্রমশঃ হতভাগ্য জীব জাহাজের সমীপবর্ত্তী হইতে-ছিল। সে তখন একান্ত শ্রান্ত; অতিকষ্টে কোনরূপে জাহাজের কাছে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল।

"এবার বিরক্ত করিতে আসিলে, কুকুরটার মাথা এই লোহার দাণ্ডার আঘাতে ভঙ্গিয়া দিব।"

"তুমি কখনই এমন কাজ করিতে পাইবে না!"

বিবর্ণমুখে, নির্ভীক-দৃষ্টিতে জীন পীয়ের অসুরের ন্যায় জোয়ান ট্রেজিকের পানে চাহিল।

"কেন বল্ দেখি, ছোকরা?"

"আমার ইচ্ছা নয়, তুমি এমন মন্দ কাজ কর। বিশেষতঃ কাজটা নিতান্ত কাপুরুষের, অত্যন্ত নিষ্ঠুরের। আমি ইহা ঘটিতে দিব না।"

"আর একবার বল্ দেখি, তার পর দেখ্—তোর কি হয়।"

জীন পীয়ের বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। কুকুরের দৃষ্টান্তে তাহার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা দৈব-প্রেরণার ন্যায় তাহার মনে একটা কথার উদয় হইল।

"আমি তোমার কাপুরুষতার কথা তোমায় বাগ্দত্তা পত্নীকে বলিয়া দিব। তিনি কেমন করুণাময়ী, আর তুমি কি পশু! এ কথা শুনিলে তিনি আর তোমায় ভালবাসিবেন না। তোমার মত নির্দ্দয়কে তিনি কখনও বিবাহ করিবেন না, বুঝেছ, ট্রেজিক্!"

বালক ট্রেজিকের হৃদয়ের অতি কোমল স্থলে আঘাত করিয়াছিল। অত বড় জোয়ানের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা সে জানিত। ট্রেজিক বালকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া প্রকাণ্ড মুষ্টি উদ্যত করিল; কিন্তু বালক ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, ট্রেজিকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা হাসিতে লাগিল। শুধু কেরিয়েঁা কোনও কথা কহিল না। সে নীরবে দাঁড়াইয়া কুকুরের দুর্দ্দশা দেখিতেছিল। হতভাগ্য জীব আর পারিতেছিল না। তাহার নয়নের দৃষ্টি ক্রমশঃ উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

"কুকুরটার সাহস ও ধৈর্য্য আছে!"

"প্রভু, প্রভু!"

"এ দিকে এস বালক, শীঘ্র উহাকে জাহাজের উপর তুলিয়া ফেল!"

কুকুরটিকে যখন জাহাজে তোলা হইল, তখন তাহার দেহে বিন্দুমাত্র সামর্থ্য ছিল না। অবসন্নভাবে সিক্তদেহে সে জাহাজের ডেকের উপর শুইয়া পড়িল।

* * * * *

কুকুরটি বড় চমৎকার। সে সর্ব্বদাই উৎফুল্ল থাকিত। তাহার বুদ্ধিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। জীন পীয়েরের সে বিশ্বস্ত বন্ধু বটে; কিন্তু অন্যান্য নাবিক-

দিগেরও সে সহচর ছিল। সকল অবস্থায়, তাহাদের সুখ দুঃখের আনন্দ ও নিরানন্দের ভাগী ছিল। আকাশ যখন বন্ধুর ন্যায় হাসিত, প্রসন্ন সূর্য্যালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইত, তখন সে নাবিকগণের পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের কার্য্যের সহায়তা করিত। আবার যখন ভীষণ ঝটিকায় সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, ভৈরব তাণ্ডবে তরঙ্গমালা মৃত্যুলীলার অভিনয় করিত, তখনও সে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। সে তাহাদের নৈশভোজে যেমন আনন্দের সহিত যোগ দিত, আবার প্রভাতের অনশনক্লেশও তাহাদের সহিত তেমনই ভাবে সহ্য করিত।

সে অনুক্ষণ দলের পুরোভাগে অবস্থান করিত। দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, শূন্যপানে চাহিয়া, বাতাসের আঘ্রাণ লইয়া, সে যেন মানুষের ন্যায় ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিত। রস্‌কফ্ হইতে হেগ্ বন্দর পর্য্যন্ত সকল দেশের জনসাধারণ তাহাকে বিলক্ষণ চিনিত। লোকে বলিত, "ঐ দেখ, সেই টম্! জল-ঝড় হইবার পূর্ব্বে সে 'ডুসি এমি' জাহাজের নাবিকগণকে সতর্ক করিয়া দেয়!"

বাস্তবিক, কথাটা সত্য। সমুদ্রবক্ষে ক্রমাগত অবস্থানহেতু, আকাশের লক্ষণাদি দেখিয়া সে বহুদর্শী নাবিকের ন্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

সী-গল পক্ষীদিগের পানে চাহিয়া সে যখন চীৎকার করিত, জীন্ পীয়ের বলিত, "ঐ দেখ, টম্ হাসিতেছে। শীঘ্র ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। আকাশ এখন মেঘশূন্য থাকিবে।"

টমের ব্যবহারে উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইলে মালিম কেরিয়োঁর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইত। সে তখন আকাশের পানে চাহিয়া আসন্ন ঝটিকার প্রতীক্ষা করিত। এরূপ অবস্থায় ঝটিকা না হইয়া যাইত না।

মাছ ধরিবার সময়, জাল গুটাইয়া লইবার পূর্ব্বেই টম্ বুঝিতে পারিত, জালে মাছ পড়িয়াছে কি না। তাহার ঘেউ ঘেউ রব ঠিক জয়ধ্বনির মত শুনাইত। কিন্তু সে যখন কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিত না, অথবা জাহাজের এক কোণে পালের অন্তরালে বসিয়া অসন্তোষজনক শব্দ করিত, তখন নাবিকগণের হৃদয়ও অপ্রসন্ন হইত। তাহারা বুঝিতে পারিত, এ ক্ষেপে বিশেষ কিছুই উঠিবে না।

ক্রমে এমন হইল যে, টম্ নহিলে কাহারও চলিত না! একদিন তাহারা যাহাকে মারিয়া ফেলিতে গিয়াছিল, এখন সেই তাহাদের শুভাশুভের

নিয়ামক ! নাবিকগণ টম্‌্‌কে এত স্নেহ করিত যে, একবার সে পীড়িত হইলে, বিপুলদেহ ট্রেজিফ তাহার কল্যাণকল্পে রোগশান্তির উদ্দেশ্যে সেণ্ট-রফ্‌ ধর্ম্মমন্দিরে সারমেয়-কুলের দেবতার পাদপীঠে একটা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা স্থাপিত করিয়াছিল। পুরোহিত এ ব্যাপারে তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অবশেষে ট্রেজিকের নবপরিণীতা পত্নী যে অতিকষ্টে যাজকবরের অসন্তোষের শান্ত করেন !

জীন পীয়েরও ক্রমশঃ যৌবনলাভ করিল। সুন্দরী আন্‌ মেরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাহার মুখ লজ্জার রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিত বটে, কিন্তু তাহার তুলনায় সে টম্‌কেই অধিক ভালবাসিত। কুকুরটিও এই অপরিমেয় স্নেহের সম্পূর্ণ প্রতিদান করিত। পশুর হৃদয় মানবের হৃদয় অপেক্ষা প্রশস্ত ও গভীর। টম্‌ সর্ব্বপ্রকার বিপৎকালে অনুক্ষণ সহচরবৃন্দের পার্শ্বে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় অবস্থান করিত।

* * * *

"হে যীশু ! হে দয়াময়ী মেরী মাতা ! আমাদিগকে দয়া কর, সকলকে রক্ষা কর, করুণাময়ী !"

জাহাজের পাল শতখণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল। মাস্তুল ভাঙ্গিয়া সশব্দে জাহাজের ডেকের উপর পতিত হইল !

"হে দেবতা, হে প্রভু, এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর ; তোমার পবিত্র মন্দিরে আড়াই সের বাতী পুড়াইব, দয়াময় !"

"এক জন জলে পড়িয়া গেল ! ধর—ধর, দড়ি ধর !"

"হায়, হায় ! এ কি হইল গো ! জাহাজ ডুবিল যে !"

জাহাজখানি "ডুসি এমি"। ঝটিকাবেগে পোতখানি আইরিস সমুদ্রে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্নাবস্থায় কোনও ক্রমে স্রোতোবেগে উহা কিন্‌সেস্‌ বন্দরের অভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছিল। চারি দিকে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা জাহাজখানিকে প্রতিমুহূর্ত্তেই গ্রাস করিতে উদ্যত। আকাশে রুদ্রমূর্ত্তি মেঘমালা গর্জ্জন করিতেছে ! মেঘান্ধকারে দিগন্তের আলোকরশ্মি নিভিয়া গিয়াছে ! তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য—আসন্ন।

না,—অন্য জাহাজের লোক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছে। একখানি আইরিস তরণী ঝটিকা উপেক্ষা করিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছিল। পোত ক্রমে জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইল। একগাছি রজ্জু "ডুসি

এমি"র উপর নিক্ষিপ্ত হইল। এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সকলে একে একে চলিয়া আইস ; কিন্তু সাবধান, কুকুরটিকে আনিতে পাইবে না। আইন অনুসারে এ দেশে কুকুরের আমদানী নিষিদ্ধ।"

"কি বলিলে ?"

"এস, শীঘ্র নৌকায় উঠিয়া পড়। আর দেরী করিও না। তোমাদের জাহাজ ত ডুবিল !"

"টম্‌কে ছাড়িয়া যাইব ?"

"কাজেই ; নিয়ম যখন নাই, তখন ফেলিয়াই আসিতে হইবে।"

জীন পীয়ের কুকুরকে বাহুপাশে তুলিয়া লইল। হতভাগ্য জীব আপনার আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া করুণনয়নে সঙ্গীদিগের পানে চাহিল। লবণাক্ত-তরঙ্গশীকর-তাড়নে জীন পীয়ের চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। শীতল-সলিল-স্পর্শে তাহার অস্থি পর্য্যন্ত শীতে জর্জ্জরিত। জানুদেশ সমুদ্র-সলিলে নিমগ্নপ্রায়। জীন চীৎকার করিয়া বলিল, "তবে আমি এইখানেই রহিলাম।"

জাহাজের মালিম কেরিয়েঁা বলিল, "আমরাও যাইব না। সকলেই এখানে থাকিব।" নাবিকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে মালিমের কথার অনুমোদন করিল।

উদ্ধারকারিগণ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিল। অবশেষে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিল! কিন্তু কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না।

"উহাকে ছাড়িয়া আমরা যাইব না !"

"কিন্তু আমাদের সাধ্য কি, বল ; আইনে যে নাই! তোমরা সকলেই ক্ষেপিয়াছ !"

"টম্‌কে ছাড়িয়া কেহই নড়িব না !"

জল ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। করুণার প্রতিমূর্ত্তি বীরগণের জানুদেশ জলে ডুবিয়া গেল।

অবশেষে উদ্ধারকারিগণ হারি মানিল। ব্রিটনেরা জয়লাভ করিল। জীন পীয়ের সর্ব্বাগ্রে তরণীতে আশ্রয় লইল।

টম বাঁচিয়া গেল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* Madame Severine-রচিত ফরাসী গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

কর্ণসুবর্ণ।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেয়ার্ড এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণ্যালে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। (১) উক্ত পত্রিকার দুই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

লেয়ার্ড লিখিয়াছিলেন যে, মুরশিদাবাদ নগরীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরথীর দক্ষিণ তটে একটি প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম কনসেনপুরী (কর্ণাসনপুরী), আধুনিক নাম রাঙ্গামাটী। বাঙ্গালার প্রাচীন নরপতি মহারাজ কর্ণসেন এই নগরীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহার নাম কর্ণসেনপুরী হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু লেয়ার্ড স্থানীয় লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ইহার নাম কান-সোনাপুরী বা "কর্ণসোনাকা ঘর"।

লেয়ার্ড কর্ণেল উইলফোর্ডের প্রাচীন প্রবন্ধ (২) অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, লঙ্কার (সিলোন কিংবা যাবা) অধিপতি অর্ণবপোতে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করেন। তৎকালে বঙ্গেশ্বর সচরাচর কুসুমপুর (রাঙ্গামাটী) নগরে বাস করিতেন। লঙ্কাপতি তথায় উপনীত হইয়া নগর আক্রমণ করিয়া তাহা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তদবধি এই নগরী পরিত্যক্ত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কর্ণেল উইলফোর্ডের বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ-ভাগে লঙ্কাপতি পরাক্রমবাহু অর্ণবপোতারোহণে "রমাহ্ন"-(রামানয়)-দেশাধিপতি রাজা অরিমর্দ্দনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে অরিমর্দ্দন হত ও "কুসুমি" প্রভৃতি নগর বিনষ্ট হইয়াছিল।

মহাবংশের ৬৬ এবং ৬৭ অধ্যায়ে পরাক্রমবাহুর বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৎপাঠে ইহাই অনুমিত হয় যে, মহারাজ পরাক্রমবাহু লঙ্কাদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত রামানয় রাজ্য ও দক্ষিণাপথের পাণ্ড্যরাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাক্রমবাহু কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-বিজয়ের কোনও কথা মহাবংশে বিবৃত নাই। সুরতাং উইলফোর্ডের বর্ণনা সত্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

---

(1) J. A. S. B. vol. XXII. p. 281-2.

(2) Asiatic Researches, vol. IX. p. 39.

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলজীগ্রন্থে এই প্রাচীন নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, দেব, কর, পালিত, সেন, সিংহ, গুহ ও দাস-বংশীয় প্রধান কায়স্থগণ কতকগুলি সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেববংশীয়-দিগের ত্রয়োদশ সমাজ; যথা,—কর্ণস্বর্ণ (কানসোনা), গৌরহট্ট, চাগাঁ, চিত্রপুর, বৈরাটী, নীলপুর, ভূষালি, আন্দুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম, চৌরগাঁ, ইন্দ্রাণী, ও গৌরীপুর।

কর্ণসুবর্ণ বা কাণসোনা যে প্রাচীন প্রধান নগরী, তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। চীন পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ (বা হিয়োন ছোয়াং) বঙ্গদেশস্থিত এই কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, কি না, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

পরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপ, তথা হইতে সমতট, সমতট হইতে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ, কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের পরস্পর দূরত্ব (৩) তিনি নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (সিউ-কি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

পৌণ্ডবর্দ্ধন (পুণ্ডরীয়া) হইতে ৯০০ লি (১৮০ মাইল)।
কামরূপ (গৌহাটী) হইতে ১২।১৩ শত লি (২৬০ মাইল)।
সমতট (রামপাল) হইতে ৯০০ লি (১৮০ মাইল)।
তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে ৭০০ লি (১৪০ মাইল)।
কর্ণসুবর্ণ (কানসোনা) হইতে ৭০০ লি (১৪০ মাইল)। (৪)
উড়িষ্যা (যাজপুর)।

হিয়োন সাঙের লিখিত দূরত্ব স্থির রাখিয়া, বাঙ্গালার মানচিত্রে দৃষ্টি করিলে নির্ণীত হয় যে, পরিব্রাজক-বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ নগরী সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী ও আধুনিক সিংভূম জেলার অন্তর্গত।

খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে মহারাজ যযাতিকেশরী বৈতরণী নদীর তীরস্থিত স্থানে যযাতিপুর নগরীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ শত বৎসর এই যযাতিপুর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল

(৩) কোনও কোনও পণ্ডিত ৫ লিতে ১ মাইল ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ ৬ লিতে ১ মাইল অবধারণ করিয়াছেন। আমরা ৫ লিতে ১ মাইল ধরিয়াছি।

(৪) হিয়োনসাঙের জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পৌণ্ডবর্দ্ধন হইতে কর্ণসুবর্ণ ৯০০ লি (১৮০ মাইল) দূরে অবস্থিত।

বলিয়া বোধ হয়। এই যযাতিপুর অধুনা যাজপুর নামে পরিচিত। (মতান্তরে যজ্ঞপুর হইতে যাজপুর নামের উৎপত্তি) হিয়োন সাঙের ভ্রমণ-কালে যাজপুর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এই যাজপুর ও তাম্রলিপ্ত, উভয়ই সুপরিচিত স্থান। যাজপুর ও তাম্রলিপ্ত হইতে মানচিত্রের উপর ৭০০ লি দীর্ঘ দুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে, উভয় রেখা চৈবাসা নগরীর প্রায় ২০ মাইল উত্তর দিকে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে সফরাণ নামে একটি গ্রাম আছে। জেনারল কনিংহামের সহকারী বেগ্‌লার ইহাকে মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী ও হিয়োন সাঙের বর্ণিত "কিরণসুবর্ণ" নগরী বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। জেনারল কনিংহাম সফরাণের কিঞ্চিৎদূরবর্ত্তী বড়বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থানে শশাঙ্কের রাজধানীর সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেগলার বলেন যে, কনিংহামের নির্দ্দিষ্ট স্থানের ভূগর্ভে প্রাচীন প্রাসাদ বা অট্টালিকা-দির ভগ্নবেশেষ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সফরানের নিকট ভূগর্ভে প্রাচীন অট্টালিকার প্রচুর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। (৫)

আমাদের বিবেচনায় ভাগীরথীর তীরস্থিত কর্ণসুবর্ণ বা (কাণসোনা) হিয়োন সাঙের বর্ণিত কি-লো-ন-সু-ফ-ল-ন হইলেও, কর্ণসুবর্ণের অধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অরণ্যময় প্রদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পঞ্চ সহস্র হস্তী, দুই সহস্র অশ্বারোহী ও অর্দ্ধলক্ষ পদাতি লইয়া বাঙ্গালায় উপনীত হইলে (৬), মহারাজ শশাঙ্ক স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক দুরাক্রম্য স্থানে স্বীয় রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রধান নগরী হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল। তিনি বৎসারাধিককাল (গৌড় কিংবা) কর্ণসুবর্ণ নগরে বাস করিয়া পূর্ব্বভারতের রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধিবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রায় ছয় বৎসর কাল হর্ষবর্দ্ধন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি স্বীয় রাজধানীতে বিশ্রাম করিতে পারেন নাই। হর্ষবর্দ্ধন গৌড় (বা কর্ণসুবর্ণ) অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি

(৫) Archaeological Survey Report Vol. VIII. p. 191.

(৬) পরে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষ অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার হস্তী হইয়াছিল: এই বিপুল বাহিনী লইয়া তিনি গৌড়েশ্বর শশাঙ্কদেব ও মহারাষ্ট্রপতি পুলকেশীকে জয় করিতে পারেন নাই।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

মহারাজ শশাঙ্ককে পদানত করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কদেবের জীবনকাল পর্য্যন্ত পশ্চিম বাঙ্গলা ও মগধের অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত ছিল। তদ্ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি রাজ্যের অধিপতি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৬০৬—৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন রাজদণ্ড ধারণ করেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরেও মহারাজ শশাঙ্কদেব প্রবলবিক্রমে পূর্ব্বভারতে রাজপতাকা উড়াইতেছিলেন। গঞ্জামের তাম্রশাসন-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ৩০০ গুপ্তাব্দে (৬১৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার অধিকার কলিঙ্গ অবধি বিস্তৃত ছিল।

শশাঙ্কদেবের অন্য নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। বাণভট্ট তাঁহাকে গৌড়েশ্বর নরেন্দ্র গুপ্ত নামেই পরিচিত করিয়াছেন। বোধ হয়, মগধের শেষ গুপ্ত-বংশ কিংবা দক্ষিণ কোশলের গুপ্ত-বংশ হইতে তিনি উদ্ভূত।

সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোটাস বা রুহিদাসের গড়ের মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের যে শিলামুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে,—

১ শ্রীমহাসামন্ত

২ শশাঙ্কদেবস্য।

তৎকালে শশাঙ্কদেবের ন্যায় এক জন পরাক্রমশালী নরপতি ও মহাসামন্ত (বা মহারাজের) অতিরিক্ত উপাধি ধারণ করিতে পারেন নাই। আধুনিক হায়দ্রাবাদ, বরোদা, মহীশূর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি যে শ্রেণীর নরপতি, এই পর্য্যায়ের নরপতিগণ তৎকালে "মহাসামন্ত" বা "মহারাজ" উপাধি ধারণ করিতেন। কেবল সম্রাটই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। গুপ্ত-বংশের স্থাপনকর্ত্তা গুপ্ত ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচের 'মহারাজ' উপাধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত দেব হইতে তাঁহাদের 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি দৃষ্ট হইতেছে। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির কেবলমাত্র 'মহারাজ' উপাধি লিখিত আছে। এরূপ রাশি রাশি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। মহারাজ শশাঙ্কদেব প্রথমতঃ কোন নরপতির সামন্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু পরে তিনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হিয়োন সাঙ তাঁহাকে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি লিখিয়াছেন; কিন্তু বাণভট্ট তাঁহাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মহারাজ শশাঙ্কদেব শিবোপাসক ছিলেন; এবং বৌদ্ধদিগের নির্য্যাতন

তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কি জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনষ্ট করেন, তাহার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। হিয়োন সাঙ বলেন, বর্দ্ধন-বংশের প্রবল উন্নতি-দর্শনে তিনি হিংসায় উদ্দীপ্ত হইয়া এই ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দুইটি কারণ অনুমান করিতে পারি। প্রথমতঃ, শশাঙ্ক দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু রাজ্য-বর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মালবরাজ দেবগুপ্ত, বোধ হয়, শশাঙ্কদেবের কোনও নিকট-সম্পৃক্ত আত্মীয় ছিলেন।

মগধের প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির অধিকাংশ শশাঙ্ক দেব বিনষ্ট করেন। বুদ্ধ-গয়ার চিরপ্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ তিনি সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তথাকার সুবিখ্যাত মন্দির হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি উৎখাত করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। হিয়োন সাঙ বলেন, এই দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যৎকালে শশাঙ্কদেব মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় বুদ্ধমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। (৭) তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন, "আমরা অবশ্যই বুদ্ধমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিয়া তথায় শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিব।"

হিয়োন সাঙ বলেন, মহারাজ শশাঙ্ক বুদ্ধমূর্ত্তিধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ভীষণ ব্রণ রোগে আক্রান্ত হন। তাহাতেই তিনি কালকবলিত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পূর্ব্বভারতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় হিয়োন সাঙ পূর্ব্বভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি যে কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটী নহে। তাহা সুবর্ণরেখার তীরস্থিত সফরাণ ব্যতীত অন্য কোনও নগরী হইতে পারে না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ।

---

(৭) Sasanka-Raja having cut down the Bodhi tree, wished to destroy this image; but having seen its loving features, his mind had not rest or determination, and he returned with his retinue homewards. On his way he said to one of his officers, "We must remove that statue of Buddha and place there a figure of Mahesvara." Beal's Si-yuke. Vol. II. p. 121.

গিরিশচন্দ্র।

গত ২৬শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি একটা কুড়ি মিনিটের সময়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য, বাঙ্গলার রঙ্গভূমির পিতৃতুল্য, নাট্য-সাহিত্যের চক্রবর্ত্তী সম্রাট, কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। চিরজীবন দেশের সেবা করিয়া, মাতৃভাষার পূজায় মগ্ন থাকিয়া, সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিলেন। বঙ্গের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। বঙ্গভূমি! তুমি যে রত্ন কাল-সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলে, কুবেরের অলকায় সে রত্ন নাই। গিরিশ তোমার অঙ্ক শূন্য করিয়া, দেশবাসীকে কাঁদাইয়া, বাঙ্গলার নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য করিয়া, পৃথিবীর পান্থশালা ত্যাগ করিলেন। গিরিশের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী জন্মভূমি! তোমার রত্ন-প্রদীপ নিভিয়া গেল! বাঙ্গলায় পুঞ্জীভূত—ঘনীভূত অমানিশার অন্ধকার! এই অন্ধকারে, স্মৃতির পবিত্র শ্মশানে, বাঙ্গালী! অশ্রুজলে গিরিশচন্দ্রের তর্পণ কর।

গিরিশচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত বিচিত্র। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে গিরিশচন্দ্রের 'নিজত্ব' গঠিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বহু ভাবের আধার ছিলেন। পরস্পর-বিরোধী বহু ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানবজীবনে প্রায় দেখা যায় না। গিরিশচন্দ্র ভাবের তরঙ্গে অভিভূত—মগ্ন হন নাই। বীরের ন্যায় তাহাদিগকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন।—ভাব-বীর গিরিশ হাসিতে হাসিতে সংসারের হলাহল স্বয়ং পান করিয়াছিলেন;—গুরুর কৃপায় নীলকণ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন; জীবের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে গুরু-দত্ত অমৃত বাঙ্গলা দেশের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন!

গিরিশচন্দ্রে মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্বভাব-দত্ত উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নাটকে, গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, রস-রচনায়—সেই মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দেদীপ্যমান। যে প্রতিভা নিত্য নূতনের সৃষ্টি করিতে পারে,

যে প্রতিভা দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও গতানুগতিকতাকে বিজয় করিয়া, দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি করিয়া চরিতার্থ হয়, গিরিশচন্দ্র সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। চিরাচরিত সংস্কারের অনুশাসন, প্রচলিত পদ্ধতির প্রভাব গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। নাটক-কার গিরিশচন্দ্র নিপুণ ও সাহসী চিত্রকরের মত তুলিকার দুই চারিটি টানে ছবি সম্পূর্ণ ও সজীব করিয়া দিতেন। মানসীর সীমন্তসিন্দূর উজ্জ্বল করিয়া দিবার, অথবা মোহিনীর কণ্ঠমালার মুক্তায় শুভ্রতার আরোপ করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র কখনও 'মিনিয়েচর'-চিত্রকরের ন্যায় বর্ণ-ফলকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র তুলিকা ঘর্ষণ করিতেন না! তাঁহার প্রতিভা নাগরিকার ন্যায় কৃত্রিম প্রসাধনের পক্ষপাতিনী ছিল না। বাণীর বরপুত্র গিরিশের প্রতিভা কপালকুণ্ডলার ন্যায় স্বভাব-সুন্দরী। তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গের মুকুর; জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাই গিরিশচন্দ্র অনায়াসে, অবলীলায়, বিশাল পটে স্বর্গের, মর্ত্ত্যের ও নরকের,—দেব, মানব ও দানবের,—বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি-শক্তি অতুলনীয়। তিনিও বিশ্বামিত্রের ন্যায় সাহিত্যে নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পরিবার প্রভৃতি যেমন অসংখ্য, তেমনই বিচিত্র। অনুভূতির উপাদানে কল্পনা মিশাইয়া তিনি চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন। আপনার অনুভূত ভাব ঢালিয়া দিয়া মানসী প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। মনোবৃত্তির বিষম দ্বন্দ্ব, পুণ্য ও পাপের সংঘর্ষ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও এই সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে গিরিশচন্দ্র দিব্যদৃষ্টি ছিলেন। তাঁহার কাব্য-জগতের অসংখ্য চরিত্রের বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। তিনি অনেক নূতন, মৌলিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেই নূতনের রাজ্যেও তাঁহার বিদূষক-চিত্রাবলী নূতন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক, ইংরাজী সাহিত্যের 'বফুন', ফলষ্টাফ্ প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের বিদূষক বা বরুণচাঁদ প্রভৃতির সন্নিহিত হইতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র গীতি-কবিতায় সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশের গান বাঙ্গলায় অমর হইয়া থাকিবে। তাহা খাঁটী বাঙ্গালীর গান। সে গানে বাঙ্গালা দেশের কবির, প্রেমিকের, নিরাশের, সুখীর, দুঃখীর, ব্যথিতের, বিপন্নের, সাধকের,

ভক্তের, ধর্ম্মোন্মাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করা যায়। তাঁহার রস-রচনাও অপূর্ব্ব। তাঁহার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ হীরকের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

আদি-কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের সৃষ্ট চরিত্রেও যে প্রতিভা নূতনতা ও মৌলিকতার আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, সাহস ও সাফল্যের আলোচনা করিবার, পরিচয় দিবার শক্তি আমাদের নাই। ভবিষ্যতে কোনও সৌভাগ্যবান শক্তিশালী সমালোচক সে সাধনায় সিদ্ধ হইবেন।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গলার নাট্যশালায় নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তিনি রঙ্গভূমির জন্মদাতা কি না, ঐতিহাসিক তাহার নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু ইহা সত্য, গিরিশচন্দ্রই এতদিন পিতার মত বাঙ্গালার রঙ্গভূমির লালনপালন, এমন কি, শাসন করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কালিদাসের ভাষায় বলা যায়,—

স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

দক্ষ, ম্যাক্‌বেথ, যোগেশ প্রভৃতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নট-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। শেষ বয়সেও গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।—গিরিশচন্দ্র চিরজীবন জ্ঞান-সাগরের কূলে বসিয়া উপল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র,—সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র—হোমিও-প্যাথী চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। তাঁহার ভূয়োদর্শন ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হইত। বিতর্কে, যুক্তিবিন্যাসে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক পটুতা ছিল। মনীষার এমন অভিব্যক্তি এ জীবনে আর দেখিব কি?

গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রসাদে নব-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অগাধ বিশ্বাস ও দেবদুর্ল্লভ ভক্তির আধার ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে ও প্রাক্তনের ফলে গিরিশ এই বিশ্বাস ও ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শ্রীশ্রীগুরুর চরণে সস্মিতমুখে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মৃত্যু যেন সেই বিশ্বাসের আধার, ভক্তির আধারকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। শ্মশানশায়ী গিরিশচন্দ্রের শিবনেত্রে সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশ, আর প্রশান্তমুখে সেই প্রসন্ন হাস্যের রেখা,—তাহা কি ভুলিবার?

ধরার পান্থশালা,—কর্ম্ম-ভোগের ভূমি ত্যাগ করিবার সময় এমন হাসি হাসিয়া যাইবার সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে ?

গিরিশচন্দ্র যশের কাঙ্গালী ছিলেন না। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বিনিময়ে তিনি সমালোচনা, মোসাহেবী চাহিতেন না। 'স্তুতিশুল্কবান্ধবতা' গিরিশ-চন্দ্রের ললাটে বিধাতা লিখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রতিভা যশের ভিখারিণী নয়; সে যশকে—যশের আকাঙ্ক্ষাকে বিজয় করিতে পারে।

কবিবর! জীবনে তোমার স্তুতি করিবার অবকাশ দাও নাই; তুমি ত যশের কাঙ্গাল ছিলে না! গিরিশচন্দ্র! আজ ব্রাহ্মণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর! বাইশ বৎসর তোমার স্নেহ ভোগ করিয়াছি। এখন তোমার স্মৃতি সেই স্নেহের স্থান অধিকার করিয়া থাকুক।

গিরিশচন্দ্রের শেষ দান---শেষ রচনা—'বিশ্বামিত্র'। তিনি জাতিকে আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল আদর্শ দান করিয়া গুরুপদে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। --লোক-সেবা করিতে করিতে—কর্ম্মযজ্ঞের ক্ষেত্র হইতে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট আদর্শ দেশে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক। *

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

---

* বসুমতী।

মহামতি ষ্টেড্।

ইংলণ্ডের সম্পাদককুলের চূড়ামণি, মনস্বী, বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বহিতৈষী, শান্তির দূত মহামতি, ডবলিউ, টী, ষ্টেড আর ইহজগতে নাই! টিটানিকের সহিত অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ইংলণ্ডের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে! জন মর্লে যখন "পেলমেল গেজেটে"র সম্পাদক, তখন ষ্টেড তাঁহার সহকারী ছিলেন। উদারনীতিক ষ্টেড দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য চিরদিন যুদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি বিশ্বপ্রেমিক; বিশ্বহিতৈষিণাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।—'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—তাঁহার চরিত্রে সার্থক হইয়াছিল। নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ষ্টেড মিথ্যার শত্রু, সত্যের বন্ধু ও ঋতের উপাসক ছিলেন। ইংলণ্ডের কুমারী-কুলের কৌমার্য্য,—সমাজের শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য সত্যসন্ধ ষ্টেড স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছিলেন, কারা-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। চিন্তাশীল, দূরদর্শী ষ্টেড লোকমত নিয়ন্ত্রিত করিতেন; লোকমতের সৃষ্টি করিতেন। পরমার্থ বা কর-তালির লোভে তিনি মস্তিষ্কহীন মানব সাধারণ নামক সহস্রশীর্ষ-দৈত্যের মনোরঞ্জন করিতেন না। বুয়র-যুদ্ধের সময় তিনি স্পষ্টভাষায় ইংরেজকে সাবধান করিয়াছিলেন, নীতি ও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিয়া স্বয়ং লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর বক্ষঃ হইতে অত্যাচার, অনাচার, বিদ্বেষ ও বিরোধের নির্ব্বাসনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান্ অথচ বিচারশীল, যুক্তিবাদী খ্রীষ্টান ছিলেন। ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন; তাই অসম্ভবকেও সম্ভব মনে করিতেন। এই সৎসাহসে ও ঈশ্বরনিষ্ঠার প্রভাবে তিনি জগদ্ব্যাপী মানব-নিগ্রহের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তিনি ভারতবাসীর মিত্র ছিলেন। ভারতবাসী তাঁহার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।

তাঁহার "রিভিউ অফ রিভিউ" বিশ্ববিশ্রুত ও বিশ্বব্যাপী মাসিকপত্র।—জগতে এরূপ মাসিক আর নাই। ইহাও তাঁহার মৌলিক চিন্তাশক্তির ফল। মহামতি ষ্টেড ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দের, মনীষিগণের মিত্র ছিলেন। হেগের শান্তির দরবার তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। সকল সমাজে, সকল সম্প্রদায়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। জগতের সকল সভ্য দেশে তিনি প্রভাব বিস্তার করিয়া-

ছিলেন। পৃথিবীর কোন্ অংশ তাঁহার চিন্তায় অনুপ্রাণিত,—প্রতিভাত হয় নাই?

আজ সেই স্বনামধন্য ব্রিটানিয়ার বরপুত্র, সম্পাদক-সমাজের সম্রাট নাম-শেষ হইলেন! মজ্জমান মানবপুঞ্জের সম্মুখে মৃত্যু! বিশাল সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে মৃত্যুর ছায়া! মানবহিতে চিরজীবন যাপন করিয়া, জীবনের সায়াহ্নে অসংখ্য বিপন্নের সহিত তিনি ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সিন্ধুসলিলে মগ্ন হইয়াছেন। বিশাল অ্যাটলাণ্টিকের অতল তলই তোমার উপযুক্ত সমাধি-ক্ষেত্র। অ্যাটলাণ্টিকের তরঙ্গচূড়ে তোমার অবস্থান বিরাজ করিবে, আর মানবসাধারণের স্মৃতিপটে তোমার গৌরবগাথা উদ্ভাসিত করিয়া দিবে! জীবনে তুমি জগতের শান্তির জন্য লালায়িত ছিলে, হে মানব-সমষ্টির শান্তির ভিখারী, আজ মঙ্গলময় তোমাকে সেই শান্তির অধিকারী করুন।
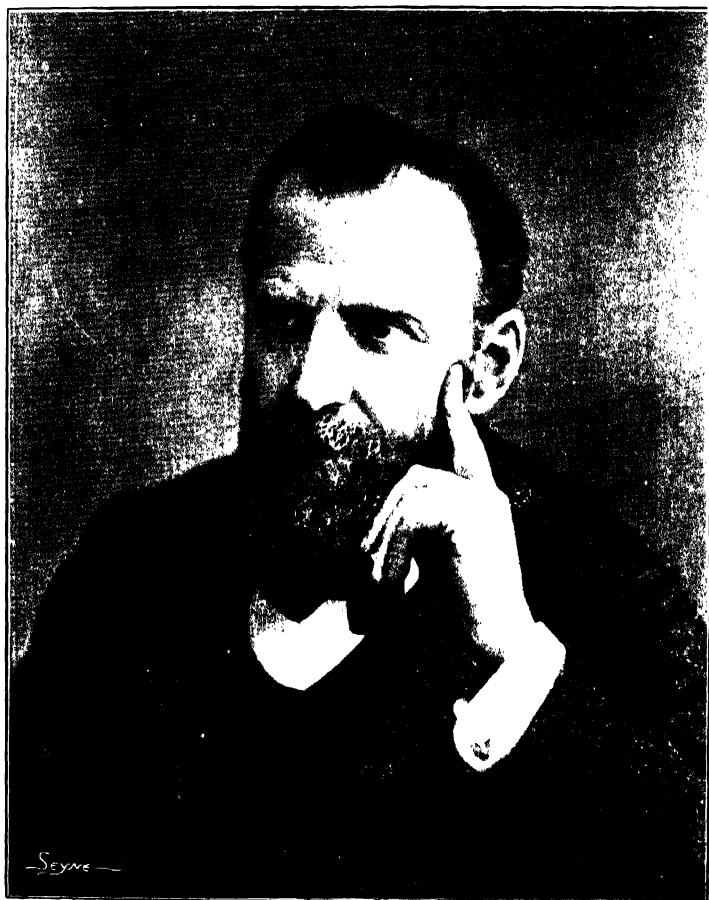
মহামতি ষ্টেড্।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

সহযোগী সাহিত্য।

বর্ষ-সমালোচনা।

গত বৎসরে ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও সভ্য দেশেই এমন কোনও কাব্যগ্রন্থ বা নব-সিদ্ধান্তপূর্ণ পুস্তক বা পুস্তিকা প্রকাশিত হয় নাই, যাহার প্রভাবে জগতের ভাব-ভাণ্ডারের পুষ্টি হয়; গত বৎসরে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তরাশির শ্রেণীবিভাগ ও সমালোচনাই হইয়াছে। ইউরোপব্যাপী সমাজ-বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া, অনেকেই ভীত হইয়াছেন। সেই ভীতিজন্য সামাজিক তথ্যের আলোচনায় গত বৎসরের ইউরোপীয় সাহিত্য পূর্ণ হইয়াছে। দেশভেদে সাহিত্য-চর্চ্চার বিচার-বিভাগ করিব :—

(১) ফ্রান্স :—ফ্রান্সে অপরাধ-তত্ত্বের, পাপের বিশ্লেষণের পূর্ণ বিচার হইয়া গিয়াছে। মসিয়ে লাবোরি (M. Labori) অপরাধ-তত্ত্বের পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন ইউরোপে ধর্ম্মের প্রভাব প্রবল ছিল, তখন ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক পাপ পুণ্যের নির্দ্ধারণ হইত। রোমান-ক্যাথলিক-ধর্ম্মপ্রধান দেশ সকলে পোপের সিদ্ধান্তই সর্ব্বজনমান্য ছিল। তিনি যে কার্য্যকে পাপজ বলিতেন, তাহা পাপ বা অপরাধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত, যাহাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহা পুণ্যাত্মক বলিয়া পরিগৃহীত হইত। শিক্ষার অতিবিস্তারে সমাজ হইতে এখন ধর্ম্মের প্রায় লোপ হইয়াছে; খুব অল্প লোকেই এখন পোপের কথাকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করে। পরকালের ভয় কাহারও নাই। পরকাল আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস নাই। এমন অবস্থায় পুরাতন মাপকাঠীতে পাপ পুণ্যের পরিমাণ হইতে থাকিলে, সমাজে বিপ্লব ঘটিবেই। এই হেতু মসিয়ে লাবোরি ইউরোপীয় পাপপুণ্যের মূল তত্ত্বের উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অপরাধ-তত্ত্ব-বিষয়ক বক্তৃতাসমূহ ইউরোপের সকল দেশেই পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। লাবোরির মত সকল গ্রাহ্য হইলে, ইউরোপের ভাষার ভঙ্গী, সাহিত্যের গতি, পাপ-পুণ্যের নির্দ্দেশ, সবই পরিবর্ত্তিত হইবে।

ফ্রান্সের মনীষিগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহেন। পূর্ব্বে ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ফরাসী সমাজকে যেমন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল, এখন আবার তেমনই ভাবে ফরাসী খৃষ্টীয় সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। ধর্ম্ম রাজশাসনের অঙ্গ নহে বলিয়া শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রাহ্য হইয়াছে; পোপের সহিত ফরাসী গবর্মেণ্টের ও ফরাসী জাতির সকল সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে; বড় বড় গির্জ্জার সংলগ্ন দেবোত্তর ভূমি ও অন্য সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ফরাসী সাহিত্যেও এই ভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দল ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সমাজকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছেন; অন্য দল ধর্ম্মকে ছাঁটিয়া কেবল যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া সমাজকে ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাস হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া

শুনিয়া ফরাসী রাজনীতিক ব্রায়ান্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস ও কাব্যে সন্নিবিষ্ট নহে, উহা এখন সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও মাসিক পত্রিকার পত্রে পত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

(২) জর্ম্মণী ঃ—জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ Historical Analogy বা ঐতিহাসিক ঘটনার সৌসাদৃশ্যের, জাতির গতি ও পরিণতির সমতার বিষয় লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। ভারত-বর্ষ, চীন, মিশর, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, পারস্য, গ্রীস, রোম, সারাসেন, স্পেন প্রভৃতি দেশের ও জাতি সকলের উত্থান-পতনের ইতিহাস-কথার তুলনায় সমালোচনা করিয়া, জর্ম্মন সোসিয়ালিষ্ট-গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ফরাসী-বিপ্লবের পর হইতে ইউরোপে যে নব সভ্যতার যুগ অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহার অবসানকাল আসন্ন হইয়াছে। এইবারই ইউরোপের সভ্যতালোকের অবসান হইবে কি না, ইউরোপে আবার Dark Age বা অন্ধযুগের প্রবর্ত্তন হইবে কি না, তাহা তাঁহারা ঠিক বলিতে পারেন না। হর্ বেলক্ (H. Beloc) প্রমুখ সোসিয়ালিষ্ট লেখকগণ এইরূপ মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন যে, অতঃপর ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সংস্কৃত-সাহিত্য-চর্চ্চাপরায়ণ জর্ম্মণ পণ্ডিত-গণের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন যে, পদার্থতত্ত্বের আবিষ্কার জন্য টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, এরোপ্লেন, তারশূন্য টেলিগ্রাফ, ডিনামাইট, কর্ডাইট, লিডাইট প্রভৃতি যন্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ সকল সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ হইলেও, উহা স্থায়ী নহে। ভাব স্থায়ী, ভাবানুগ ব্যবহারের ধারা স্থায়ী, অতএব সমাজকে নূতন ভাবে ভাবুক করিয়া, ভাবসামঞ্জস্যে সমাজকে স্থিতিশীল করিয়া রাখিতে পারিলে, ইউরোপের বিশিষ্টতা চিরস্থায়িনী হইতে পারে। জিমরম্যান প্রমুখ লেখকগণ এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের ব্রাহ্মণগণ যেমন এখনও ভাবপ্রাধান্য হেতু সমাজের শিরোমণি হইয়া আছেন, সাধক ভক্ত সন্ন্যাসী যতি সকল যেমন সমাজের পূজনীয় হইয়া আছেন, এখনও ভারতে যেমন কেবল ধনের আদর নাই, তেমনই পদ্ধতি অনুসারে জর্ম্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই আলোচনাতেই জর্ম্মণীর সাহিত্য পরিপূর্ণ। সোসিয়ালিজম ও কমিউনিজমের কথা লইয়া জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ ব্যস্ত। জর্ম্মণীর এক দল যেমন কেবল টাকার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিদ্যাকেই অর্থকরী করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তেমনই আর এক দল অর্থের মোহকে পরিহার করিয়া, ধনৈশ্বর্য্যকে বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের অনুগত করিয়া, সমাজে সামঞ্জস্য-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্রাটের দল অর্থ, বিলাস ও প্রাধান্যের দিকে; হর্ বেলক্ পরিচালিত সোসিয়ালিষ্ট দল সংযম ও সামঞ্জস্যের দিকে। এই দুই দলের বিরোধে উদ্ভূত পুস্তক পুস্তিকা সকল এখন জর্ম্মণ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

(৩) রুষ ঃ—কাউণ্ট টলষ্টীর ভাবপ্রাবল্যে রুষীয় সমাজ ও সাহিত্য এখন সোসিয়ালিষ্ট সিদ্ধান্তের অনুগামী হইতেছে। তবে রুষে ব্যক্ত গুপ্ত দুই রকমের সাহিত্য আছে। ব্যক্ত সাহিত্য তেমন প্রবল নহে; গুপ্ত সাহিত্য অতি প্রবল ও তাহার প্রভাবও বহুদূরব্যাপী। প্রিন্স কুরপ্যাটকিন, ম্যাক্সিম গোর্কী প্রভৃতি লেখকগণ অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টাজন্যই কুরপ্যাটকিনকে দেশত্যাগী হইয়া, ইংলণ্ডে—প্রবাসে কষ্টে দিনযাপন করিতে হইতেছে।

ইংলণ্ডের লেখক স্বর্গীয় ষ্টেড বলিয়াছেন যে, রুষের ভবিষ্যৎ যে কি হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না ; রুষ সমাজদেহে কোন কোন শক্তি যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। রুষ সাহিত্যের গতি পরিণতি বুঝা ভার। তবে ইউরোপের সোসিয়ালিজম যে রুষে অতিশয় বিস্তারলাভ করিয়াছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু রুষের বিশিষ্টতা এই যে, রুষীয় সমাজে ও সাহিত্যে এখনও নাস্তিকতা প্রবল হয় নাই ; তাই রুষের সাহিত্যে—বিশেষতঃ টলষ্টীর লেখায় ভাবকোমলতা এখনও পর্য্যাপ্তপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমান রুষ টলষ্টীর মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত। সাহিত্যে ও সমাজে এ নবজীবনের পারণতি যে কিসে হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

(৪) তুর্কী ঃ—তুর্কী ইউরোপের দেশ হইলেও, উহা এতকাল এসিয়ার ভাবেই মুগ্ধ ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের সারাসেন সভ্যতার পুরাতন আদর্শ বক্ষে ধরিয়া তুর্কী এত দিন উন্নতমস্তকে ইউরোপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই তিন বৎসর কাল তুর্কীতে এক বিষম ভাব-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব চলিতেছে। ফরাসী লেখক পিয়র্ লোটী এই বিপ্লবের সমাচার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপকে দিয়াছেন। নবীন তুর্কী দুই স্বতন্ত্র ভাবে বিমুগ্ধ ও উন্মত্ত। এক দিকে ফ্রান্সের সর্ব্বসামঞ্জস্যের ভাব, উচ্চ নীচ-সমীকরণের ভাব তুর্ক সমাজকে অলোড়িত করিতেছে। হারেমের সে দুর্ভেদ্য যবনিকা অনেকটা ছিন্ন হইয়াছে ; একেন্দীদিগের সে পুরাতন গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে ; স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচলন হইয়াছে ; বিদ্বান ও উদ্‌যোগী পুরুষের সমাদর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য দিকে জর্ম্মণীর দেশাত্মবোধ, সমাজপ্রীতি, জাতির ধারা ও বিশিষ্টতা রক্ষার প্রয়াস নবীন তুর্কীকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে তুর্কী ভাষা এত কাল ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় ও প্রেমসঙ্গীতে পূর্ণ ছিল, সেই তুর্কী ভাষায় এই কয় বৎসরের মধ্যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। ভাষার এই নব তাড়িত-শক্তির প্রভাবে তুর্কজাতির মধ্যে তথা ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রধান সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মাত্ম-বোধের বিকাশ খরতর ভাবে হইতেছে। ইহাই Pan-Islamism বা মোসলেম-একীকরণের মহাভাব। এসিয়া ও ইউরোপের সকল দেশের সকল জাতীয় মোসলেমগণকে এক জাতিতে ও এক ভাবে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই প্যান-ইসলামিজমের উৎপত্তি। জর্ম্মণীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নবীন তুর্ক লেখকগণ ইতিহাসের আলোচনা সম্যক্‌রূপে করিতেছেন। Comparative History ও Historical Analogy—ইতিহাসের এই দুই শাখার আলোচনা অধিকমাত্রায় হইতেছে। নবীন তুর্ক লেখকগণ ইতিহাসের দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ও সমাজকে দেখিতেছেন, ইতিহাসের বনীয়াদের উপর কোরাণের নূতন ব্যাখ্যা করিতেছেন। নবতুর্কের এই নবভাব আরবী ও পারসীক-দুই ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মিশর, পারস্য ও তাতারে এই ভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মিশর ও তুর্কী হইতে এই নব-ভাবের বার্ত্তা ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ভারতের মুসলমানগণকে নব-ভাবে সঞ্জীবিত করিতেছে, উর্দ্দু ভাষাকে নূতন প্রাণ দিয়া, নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। অধুনা ইতিহাস-চর্চ্চা উর্দ্দু ভাষায় যত প্রবল ভাবে হইতেছে, তাহার তুলনায় ভারতের আর কোনও প্রাদেশিক ভাষায় তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। রাজস্থানের চারণগণ পূর্ব্বে যেমন গাথা রচনা করিয়া পুরাকান্তিকাহিনীর আবৃত্তি করিতেন, তুর্কীর নবীন

কবিগণ তেমনই গাথা রচনা করিয়া, তাহারই প্রচার করিতেছেন। এই সকল গাথা ভাষার অশেষ সৌষ্ঠবসাধন করিতেছে।

(৫) ইংলণ্ড ঃ—ইংলণ্ড সভ্য ইউরোপের ভাবমঞ্জুষা। ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী লেখকগণ নূতন কিছু সৃষ্টি করিতেছেন না। জর্ম্মণী, ফ্রান্স, রুষিয়া, তুর্কী প্রভৃতি দেশে যে সকল নূতন ভাব উদ্ভূত হইতেছে, ইংলণ্ডের লেখকগণ কেবল সেই সকলের সমাহরণ করিতেছেন; ঝাড়িয়া বাছিয়া গুছাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কার্লাইলের সময় হইতে ইংলণ্ডে এক দল জর্ম্মণ-অনুরাগী লেখকের উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহারা, জর্ম্মণ বিজ্ঞনসমাজে যাহা কিছু নূতন বাহির হয়, তাহাই ইংরেজী আকারে ইংরেজ পাঠকগণকে উপঢৌকন দিয়া থাকেন। অধুনা লর্ড হালডেন এই দলের অধিনায়ক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ফ্রান্সের মাধুরী অহরণ করিতেছেন গ্রাণ্ট এলেনের দল; হল কেনের অনুচর-সহচরবর্গ এখন "প্যান-ইস্‌লামিজমে"র প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। চীনের ইতিহাসকথা লইয়াও এখন ইংলণ্ডে খুব আলোচনা চলিতেছে। কাজেই বলিতে হয়, ইংলণ্ডে এখন পরের সামগ্রী লইয়াই সাহিত্যের পুষ্টি বা বিস্তৃতি ঘটিতেছে। সোসিয়ালিজমের সিদ্ধান্ত সকল ভাষার স্তরে স্তরে যেন বিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভাষার লিখনভঙ্গীও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মসিয়ে ব্রায়ান্দের কথা ইংলণ্ডের পক্ষে ষোল আনা ভাবে খাটে—খবরের কাগজের স্তম্ভে ও মাসিকপত্রিকায় সাহিত্য নিবদ্ধ রহিয়াছে। এক মারী কোরেলী খবরের কাগজের প্রভাবের অতীত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মহিমাও দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। ক্যাণ্টারবরীর বর্ত্তমান আর্কবিশপ বলিয়াছেন যে, সোসিয়ালিজম্, ফেবিয়ান সোসাইটী ও সফ্রেজিষ্টদের মত, এই তিনই আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের উপাদান হইয়াছে। বিলাস, অর্থলিপ্সা ও ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টি যখন সমাজের প্রধান সাধনার বিষয় হয়, তখন মৌলিক চিন্তা-প্রবাহ স্থবির হইয়া যায়, সুকুমার কলাবিদ্যা ম্লান হয়, জাতির মাধুর্য্যহানি হয়। আর্কবিশপের এই সিদ্ধান্ত ইংলণ্ডের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই গ্রাহ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক, নূতন ভাবের জন্য ইউরোপ আর ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করে না, উপরন্তু ইংলণ্ড ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের চিন্তার কণা সকল আহরণ করিয়া তাহাই নিজ সমাজে ছাড়াইয়া দিয়া এক নূতন বিপ্লবের সূচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সাহিত্য সেই ভাবী বিপ্লবের শঙ্কায় যেন থর থর কাঁপিতেছে। সাহিত্যে মৌলিকতা একেবারেই নাই।

(৬) আমেরিকা ঃ—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র হইতে মার্কিণের সকল নূতন ভাব প্রস্ফুরিত হয়। আমেরিকাতেই ইউরোপের ভাব-সমন্বয় ঘটিয়া থাকে; কেন না, আমেরিকাতেই ইউরোপের সকল সভ্যদেশের সকল ভাবের পর্য্যবসান ঘটে। এই আমেরিকা এখন কেবল ইউরোপের ভাবেই মুগ্ধ নহে। হার্ভার্ডের উপাধিধারী নবীন পণ্ডিতগণ চীনের পুরাতত্ত্ব লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমেরিকার আদর্শে নূতন চীন গঠিত হইতেছে; আমেরিকার আদর্শে চীনে প্রজাতন্ত্র শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইল; আমেরিকার আদর্শে চীন ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে; অথচ আমেরিকা চীনের পুরাতন ভাবে বিভোর হইয়া উঠিতেছে। ফলে, আমেরিকা চীনের সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতি লাভ

করিয়াছেন। গত বৎসরে চীনের পুরাতত্ত্বের কথা-সমন্বিত দুইখানি অত্যুত্তম ইতিহাস মার্কিণ-দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় পূর্ণ আরও একখানি উপাদেয় পুস্তক মার্কিন দেশে প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বে চীন মার্কিণের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, জাপানের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া, নবজীবন-লাভের চেষ্টায় প্রমত্ত হইয়াছে; পশ্চিমে তুর্কী, তাতার, মিশর, পারস্য আত্মরক্ষার চেষ্টায় জর্ম্মণী ও ফ্রান্সের আদর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। এসিয়ার দুই দিকেই এই দুই নব-ভাবের উদয় হইয়াছে। ভারতবর্ষ মধ্যস্থলে থাকিয়া এই দুই দিকেই দুই ভাবের বেগ গ্রহণ করিতেছেন। আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে "প্যান-ইসলামিজমে"র তীব্র রুক্ষ ভাব ভারতে আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে জাপান ও চীনের নূতন বার্ত্তা আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে জাপান ও চীনের নূতন বার্ত্তা ভারতে প্রবেশ লাভ করিতেছে। আমেরিকা এসিয়ার পূর্ব্ব দিকে নবাভ্যুদয়ের উষারাগের সহিত নবজীবনের প্রভাত-সমীরণ সঞ্চারিত করিতেছেন। এই সমীর-সংস্পর্শে জাপান জাগিয়াছে, চীনের উদ্বোধন ঘটিয়াছে। জর্ম্মণী এসিয়ার পশ্চিম দিক হইতে অতীতের ভস্মস্তূপে ফুৎকার দিয়া, অতীত-ভাববহ্নিকণাকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন। ভারতে এই দুই দিকের দুই প্রবাহ সমঞ্জসীকৃত হইয়া প্রাদেশিক ভাষা সকলকে নবীন সুষমায় সমলঙ্কৃত করিতেছে।

(৭) ভারতবর্ষ ঃ—ইংরেজের শাসনফলে, ইউরোপীয় সভ্যতার সজ্ঘাতে, ভারতের তিনটি প্রাদেশিক ভাষা সমুন্নত হইয়াছে। প্রথম—বাঙ্গালা ভাষা। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজীর আদর্শে গঠিত। ইংরেজী ভাষার দোষ গুণ আধুনিক বাঙ্গালায় পরিস্ফুট। ইংরেজী না জানিলে, না বুঝিলে, আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য ঠিক মত বুঝিয়া উঠা সেকেলে বাঙ্গালীর পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইংরেজ কবি ও মনীষিগণের আদর্শে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য রচিত। তাই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অতি মধুর, অতীব সজীব ও সদ্ভাবপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ইংরেজী সাহিত্যে বিলাসের জাড্য প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের এই পাঁচ সাত বৎসরের বাঙ্গালা ভাষাও জটিলতা-পূর্ণ,—জড়ান, পাকান, বাঁকান, গাঁটপড়া হইয়া গিয়াছে। এখনকার অনেক বাঙ্গালী কবি ও লেখক গদ্য পদ্য লিখিবার সময়ে হয় ত মনে মনে মুচকি হাসিয়া বলিয়া থাকেন—"তুমি বুঝ, আর আমি বুঝি মন, আর যেন কেউ না বুঝে।" তাই ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য পদ্যের প্রভাব খুব কম হইয়া গিয়াছে। রঙ্গলাল ও বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনী গুপ্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালার লেখক ও কবিগণের প্রভাব ভারতের সর্ব্বত্র অসাধারণ ছিল। যাউক সে কথা। ভারতের দ্বিতীয় সমুন্নত প্রাদেশিক ভাষা—উর্দ্দু। উর্দ্দুকে ঠিক প্রাদেশিক ভাষা না বলিয়া ভারতীয় মুসলমান-দিগের এবং ইসলাম ভাবাপন্ন জাতি সকলের জাতিগত ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পেশাবর হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত মুসলমানমাত্রই উর্দ্দু জানেন, উর্দ্দু বলিতে পারেন। আমার মনে হয়, এক হিসাবে উর্দ্দু বাঙ্গালা অপেক্ষা সজীব ভাষা। উর্দ্দু প্যান-ইস্লামিজমের সকল ভাব কুক্ষিগত করিয়াছে। উর্দ্দু নবীন বাঙ্গালার সকল মাধুরী আহরণ করিয়াছে। হায়দরাবাদের নিজাম, রামপুরের নবাব প্রমুখ মুসলমান

নরপতিগণ নবীন উর্দ্দু ভাষার যথেষ্ট সমাদর করিয় থাকেন। আলিগড়ের মুসলমান বিদ্যার্থিগণ যথারীতি উর্দ্দুর আলোচনা করিয়া থাকেন। সায়ের দাস প্রমুখ অনেকগুলি বড় বড় কবি উর্দ্দু ভাষাকে বিভূষিত করিয়াছেন। ভাল ভাল ইতিহাস গ্রন্থ উর্দ্দু ভাষায় লিখিত হইতেছে। ভাবাভিব্যঞ্জনায় উর্দ্দুর সামর্থ্য অসাধারণ। উর্দ্দু সংবাদপত্র সকলের প্রভাব বাঙ্গালা সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক অধিক। উর্দ্দুতে রসের কবিতা যেমন মিঠে, বীরত্বের কবিতা তেমনই ওজস্বিনী। আমার মনে হয়, উর্দ্দু কালে বাঙ্গালা ভাষাকেও পরাজিত করিবে। মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠী ভাষা ভারতের তৃতীয় উন্নত ভাষা। ইতিহাস-চর্চ্চায়, রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় মারাঠী ভাষা ভারতের অন্য সকল ভাষার অগ্রগণ্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষা তৈজস-ভাবপূর্ণ। গত বৎসর উর্দ্দু ও মারাঠী ভাষা যে ভাবে পুষ্ট হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি ঘটে নাই। এমন কি, হিন্দী ভাষা এখন বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালায় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা অধিকতর হইতেছে বটে ; কিন্তু ভাষার মহিমার পুষ্টির পক্ষে বাঙ্গালী মনীষিগণের তেমন চেষ্টা আর নাই। মনে হয়, প্রাদেশিক পুরাতত্ত্বের সমাহরণে ও আলোচনায় মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক সফলচেষ্ট হইয়াছেন।

ইহাই গতবর্ষের সাহিত্যের স্থূল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যে অন্তর্ভেদিনী মনীষার প্রভাবে ইউরোপের সাহিত্য জগতের আদরের সামগ্রী হইয়াছিল, সে মনীষা ইউরোপের কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। গত বৎসরের ইউরোপীয় সাহিত্য জঠর-জ্বালার আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঈর্ষ্যানলে প্রজ্বলিত। উহাতে ভাব নাই, কবিত্ব নাই, মাধুরী নাই। আমরা ইউরোপের অনুচিকীর্ষু ; আমাদেরও অবস্থা আদর্শের অনুকূল হইয়াছে। কেবল উর্দ্দুতেই একটু সজীবতা আছে। তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলে বাঙ্গালীর লাভ হইতে পারে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা, ফাল্গুন।—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে কয়েকখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে 'প্রতিভা'র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবভাষায় অনুপ্রাস' নামক প্রবন্ধটি সংস্কৃত কলেজের সারস্বত-সম্মিলনে পঠিত। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সংস্কৃত গ্রন্থের নামে, গ্রন্থকারের নামে, বর্ণনীয় বিষয়ে, নায়ক-নায়িকার নাম-নির্দ্দেশে, পাত্র-পাত্রীগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে অনুপ্রাসের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, বৈদ্যক শাস্ত্র, দর্শন, স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, কোষগ্রন্থ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের ঘনঘটা। প্রবন্ধটি চাটনী বটে, কিন্তু করলার চাটনী। শ্রীসুধরঞ্জন রায়ের 'কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' নামক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের বিরাট বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। কবে কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। সমালোচনার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়—'হাতের চেয়ে আম বড়' হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধের ভাষাটিও কঙ্করবৎ কঠিন, চর্ব্বণের চেষ্টা করিলে দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই,—"রমেশ দৃঢ়তাহীন শিথিল, বিরুদ্ধতাকে সে কঠোর প্রতিবাদে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে না, তাহার নিকট মাথা নোয়াইয়া, আজ কাল করিয়া দৈবপ্রেরিত শুভ অবসরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। 'বসিয়া থাকে' ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? রমেশ 'বিরুদ্ধতার নিকট মাথা নোয়াইয়া বসিয়া থাকে' কিরূপ বাঙ্গালা মহাশয়! "বস্তু জাগতিক বিহারী বস্তু-জাগতিক রমেশ হইতে বড়, এ কথা নিশ্চিত।" কিন্তু এ কথাও নিশ্চিত যে, ইংরেজীতে অনুবাদ না করিয়া এ সকল হেঁয়ালীর অর্থ বুঝিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র। বাঙ্গালা ভাষারূপ লাওয়ারিস্ মরদাকে পদদলিত করা আজকাল এই শ্রেণীর নবীন লেখকদিগের উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। কবি শ্রীদুর্গাচরণ কুশারী 'সাথী' কবিতায় লিখিয়াছেন,—

"নির্ব্বিকার সে অনন্তে—সেই শূন্যে ছুটে গেছে, উন্মত্ত মন,
তাহারে বাঁধিতে তুমি কি করেছ খেলা-খেলি তুচ্ছ আয়োজন।"

লুকাচুরি আছে, দৌড়াদৌড়িও আছে, ছুটাছুটিও অনেক স্থলেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু 'খেলা-খেলি' কবির নূতন সৃষ্টি! ইহা কি লাঠালাঠির ভায়রা-ভাই? 'আটিয়া মসজিদ' শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রত্নতত্ত্বকণিকা। টাঙ্গাইল মহকুমায় আটিয়া নামক যে প্রাচীন মস্‌জিদটি আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 'বাণী পন্থা' একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। লেখক শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন অনেক দিন হইতেই ইহা লিখিতেছেন। এবার অষ্টম অনুবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধের সমালোচনা নানা কারণে অসঙ্গত। তবে এ কথ বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা যায় যে, দার্শনিক প্রবন্ধের ভাষা নীরস ও মাধুর্য্যহীন হইলে তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীযশোদালাল বণিক 'সমালোচক' নামক ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়াছেন। কাতু-কুতু দিলে অনেক সময় হাসি পায় বটে, কিন্তু কাতুকুতু রসিকতা নহে। কবিতাটির আরম্ভভাগ মন্দ নয়, কিন্তু—

"শান্ত-শীতল আকাশতলে জলদমুক্ত নীলিমা,
পূরব-প্রান্তে কনক-চন্দ্র হাস্য ছড়ায় ত্রিসীমা।"

এরূপ মিল অসহ্য। বণিক সমালোচকের 'সমালোচক ভেক্ মহাশয় লাফ দে' উঠেন আকাশে।' এই সমালোচক ভেকটি কোন জাতীয়? সে 'লম্ফ দিয়ে কূপ' ত্যাগ করে, এবং 'লাফ দে, আকাশে উঠে!' এমন লম্ফনপটু ব্যাঙ সমালোচকের মস্তিষ্ক-চিড়িয়াখানায় থাকিতে পারে; বাস্তব জগতে আছে কি না, জানি না। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'বাজীকর' গল্প লিখিয়াছেন। মধু বাজীকর সাপুড়ে,সুতরাং তাহার সঙ্গিনী নীরদা নিশ্চয়ই বেথুন কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী নহে। কিন্তু বাজীকরের সঙ্গে থাকিয়া সে ভাষা লইয়া ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। নীরদা বেদে মধুকে বলিতেছে, "আমি যখন নির্মুক্ত ছোরা নিয়ে উমার কাছে গিয়ে বল্লাম—উমা, আজ বিধাতার নিয়তি আমার হাত দিয়ে তার দণ্ডদান করবার জন্যে এসেছে,—

আজ তোর পরিপূর্ণ আনন্দের দিন, আজ তোর মুক্তির দিন, আমার এই অস্ত্র পাপকে আমূল বিদ্ধ করে' ধর্ম্মকে পরিমাণ করবে।" দীনবন্ধুর সাধুচরণের মুখে সাধু ভাষা বরং সহ্য হয়, কিন্তু বেদের সঙ্গিনীর মুখে 'পাপকে আমূল বিদ্ধ ক'রে ধর্ম্মকে পরিমাণ' করিবার বক্তৃতা নিতান্ত অসহ্য। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকারের 'দুগ্ধের বিশুদ্ধতা' নানা তথ্যে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। এই ভেজালের যুগে এরূপ প্রবন্ধের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন জাপানে'র পরিচয় দিয়াছেন। জাপান সম্বন্ধে সুরেশ বাবুর অভিজ্ঞতা আছে। এই শ্রেণীর অনূদিত প্রবন্ধসমূহের ন্যায় ইহা নীরস নহে। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের 'সহানুভূতি' ও শ্রীবিনোদমোহন চক্রবর্ত্তীর 'কারণ' কবিতা। উভয় কবিতায় কবিত্বের অভাব নাই। শ্রীশীতলকান্ত চক্রবর্ত্তীর 'ভারতের দ্বারা ইউরোপীয় বাণিজ্যের ও বর্ত্তমান ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্রপাত' নানা ইংরাজি 'কোটেসন' ও পাদটীকায় কণ্টকিত হইলেও, একটি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। ইহা পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। 'বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা' অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক রচিত ও চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ। একাধিক মাসিকে এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মহীনতার যুগে এরূপ প্রবন্ধের উপযোগিতা আছে। কিন্তু লেখকের ভাষার দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। ইংরেজীর বোট্‌কা গন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অত্যন্ত অসহ্য। 'আকাঙ্ক্ষা' নামক ক্ষুদ্র কবিতায় শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা দেবী আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, "আমি সৌরভ হব।"— আমরা বলি, তথাস্তু!

সুপ্রভাত, চৈত্র।—প্রথমেই শ্রীমতী সুখলতা রাও কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'সীতাদেবীর অগ্নিপ্রবেশ' নামক চিত্রের একখানি সুরঞ্জিত অনুলিপি। অনেক পুরুষ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্র অপেক্ষা এখানি সুন্দর। সীতাদেবীর ভক্তিভাব মধুর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের 'নামদেব ও তাঁহার উপদেশ' ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ। ধর্ম্মপিপাসুর প্রীতিকর। শ্রীশশিভূষণ বসুর 'বার্ণার্ড প্যালিসি' একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ। কঠোর সাধনায় মানুষ কিরূপে সিদ্ধিলাভ করে, এই জীবনচরিতে তাহার পরিচয় আছে। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বাঁকুড়ার কথোপকথনের বাঙ্গালা'র পরিচয় দিয়াছেন। সকল জেলায় কথোপকথনের ভাষায় কিছু না কিছু পার্থক্য আছে। বিভিন্ন জেলার লেখকগণ যদি এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাহা হইলে, তাহা ভবিষ্যতে একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান-রচনার সাহায্য করিতে পারে। 'সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ' হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতবর্ষের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহ' নামক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভটি চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রাদিতে ইহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগণপতি রায় 'চীনবাসিগণের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে'র পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমস্ বার্টন' চলিতেছে। প্রবন্ধে অনুবাদের গন্ধ প্রবল। যথা, "ঐ সিদ্ধকাম, সুশ্রী, ভব্য এবং উপযুক্ত মহাশয়ের জন্য বিয়ের বাজারে প্রথম শ্রেণীর চেয়ে নীচের স্তরের মেয়ের ব্যবস্থা কর।" ভাষায় এরূপ গুরুচণ্ডালী ভাব ও ফিরিঙ্গিয়ানা সমর্থনযোগ্য নহে। কিছু দিন মন্ত্র করুন না। 'বিপত্নীক' শ্রীঅনুরূপা দেবীর

ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প। লেখিকা গল্পে ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের চিত্র আঁকিতেছেন। তাই বুঝি ভাষাটিকেও চমৎকার ইঙ্গ-বঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। মা সরস্বতী গাউন পরিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। "মানদা কহিল,—তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য, তাঁকে বলবেন, আমার মতন একটা ক্ষুদ্রা নারীকে যদি তিনি তাঁদের মহৎ কার্য্যের মধ্যে একটা তৃণ সরিয়ে দেবার জন্যও প্রয়োজনীয় করে' নিতে পারেন, তা হলে একটা জীবনকে তিনি চিরদিনের মত সার্থক ক'রে তুলবেন।' চমৎকার রবীন্দ্রী ঢং! পুনশ্চ, "অমলা তাহার চিত্তের প্রবল কর্ম্মতৃষ্ণা ও সৎপথে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল।" রমণীর রচনায় 'আশ্চর্য্য' হওয়া দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত না হইলেও, 'প্রবল কর্ম্মতৃষ্ণা' দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এ কালে সম্প্রদায়বিশেষের লেখিকারা 'অবাঙ্মনসগোচর' নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা তৃষ্ণাও দেখিতে পান। শ্রীলীলার 'আশ্বাস' কবিতাটি মধুর।

অর্চ্চনা, ফাল্গুন।—'স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রের সাময়িক উচ্ছ্বাস। লেখক সংক্ষেপে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের জন্য শোক করিয়াছেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় "সাহিত্যে মৌলিকতা" লিখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, "যে পাকা চোর, সে পরের সোনা লইয়া তৎক্ষণাৎ তদবস্থায় তাহা বাজারে বাহির করে না। সে তাহার ভিন্ন গঠন দিয়া জনসমাজে নিজের বলিয়া তাহা চালাইতে চেষ্টা করে। ভাবরাজ্যে ভাব-সম্পদ লইয়া এইরূপ কাড়াকাড়ি ব্যাপার নিয়তই চলিতেছে।" ভাব নদীর স্রোতের মত, সে স্রোতে সকলেরই অবগাহন করিবার অধিকার আছে। এক জন লেখক একটি কোনও বিশেষ ভাবকে ভাষায় আকার-বদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আর এক জন লেখক সেই ভাবটি স্পর্শ করিলে পাকা চোর হইবেন? 'গুলে বকাওলি' কবি দেবেন্দ্রনাথের কবিতা। কোমল ও মধুর। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় 'পথের কথা'য় কোম্পানীর আমোলের চার্লস্ ওয়েষ্টনের পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিক খুঁটী-নাটী লইয়া প্রবন্ধ-রচনায় লেখক সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সহিত সমস্বরে আমরাও বলি, 'ধন্য ওয়েষ্টন! তোমার মত উদারপ্রাণ দাতা ইংরেজের এ যুগে বড়ই অভাব!' শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মনের 'সারঙ্গ' একটি চলন-সই গাথা। বিখ্যাত গোয়েন্দার গল্প-লেখক শ্রীপাঁচকড়ি দে 'পিশাচ পিতা' নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্পটি লিখিতেছেন। এখন পথে, ঘাটে, রেলের গাড়ীতে ও ট্রামে, এমন কি, সুদূর পল্লীগ্রামে শুদ্ধান্তবাসিনীর উপাধানের নীচেও গোয়েন্দার কাহিনীর অবাধ প্রচার। কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্যহীন অসার কৌতুক-লহরী ও কলঙ্ক-কাহিনীর অবাধ গতিতে উৎসাহ-প্রদান কি এতই আবশ্যক? নভেলের নায়িকা রাধারাণী বাঙ্গালিনীর শাড়ী পরিয়াও গাউন ঢাকিতে পারেন নাই। গল্পের ভাষাও সর্ব্বত্র স্বচ্ছ নহে। এক স্থানে আছে "আমি বলিলাম, হাঁ, এ রহস্যের ভিতর কি আছে, জানিবার জন্য আমিও একটু ব্যগ্র হইয়াছি।" আমরা হইলে লিখিতাম, "ইহার ভিতর কি রহস্য আছে—ইত্যাদি।" ঘটনার অস্বাভাবিকতাই এ দেশের অনেক গল্প-লেখকের রচনার প্রধান সম্বল, ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না। 'হংকঙের পথে' শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোমের মনোজ্ঞ ভ্রমণবৃত্তান্ত। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'হিমাচল' নামক কবিতায় ভাষা ও ছন্দ ভাল

ঠুকিয়া কুস্তি আরম্ভ করিয়াছে। এমন কটমট শব্দে গ্রথিত উদ্ভট কবিতা বাঙ্গালার কবিতা কণ্টকিত মাসিক সাহিত্যেও বিরল। যথা,—

ঐ দাবাগ্নি উগ্রচণ্ড,
ধ্বস্ত কীর্ণ শৈলখণ্ড,
বৃক্ষ কাষ্ঠ রুক্ষ শব্দে
তীব্র ক্ষিপ্র ফাটে।
উড্ডীন ব্যোমে ছন্ন পর্ণ,
অগ্নিস্তোম ধূম্রবর্ণ,
নর্ম্মহ্লাদে ক্রুদ্ধ দৈত্য
মত্ত হিক্কা ঠাটে!

এমন হিক্কা-উৎপাদক কাঠ-ফাঠা উৎকট 'কাব্যি' লেখা সকলের সাধ্য নহে! 'বিষ্ণু-সংহিতায় দণ্ডনীতি' ক্রমশঃপ্রকাশ্য সন্দর্ভ। 'আবদুল্লা' নামক গল্প শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্কলিত; সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। গল্পটিতে বেশ রস আছে।

উদ্বোধন, চৈত্র।—গত চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে উদ্বোধন সমভাবে চলিতেছে, হ্রাসবৃদ্ধি নাই। উদ্বোধন ৺রামকৃষ্ণ মঠের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে অবতার-জীবনের সাধক-ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভক্তের রচনা মধুর হইবারই কথা। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা। এই প্রবন্ধে 'উদ্বোধন'-প্রকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের মহান সঙ্কল্পের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'হিন্দু ধর্ম্মের সীমানা' প্রবন্ধটি সকলেরই আলোচনাযোগ্য। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 'বেদান্ত' নামক প্রবন্ধে বেদান্তের স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। 'ভরেতের সাধনা' ও 'অদ্বৈত-প্রসঙ্গ' পাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের 'হারাধন' নামক সুদীর্ঘ গাথাটি 'বাগবাজার সোস্যাল ইউনিয়নে'র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। ইহাতে দরিদ্রনারায়ণের সেবার পুণ্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

ভারতমহিলা, ফাল্গুন।—ভুপালের বেগম সাহেবার একখানি ধূমাকার চিত্র এই সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বেগম সাহেবা অসূর্য্যম্পশ্যা বলিয়াই কি তাঁহার আপাদমস্তক মসীমণ্ডলে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে? শ্রীকাননকুমারী দেবী 'স্ত্রী-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন,—'রাজনৈতিক, সমাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু এই উন্নতিলাভের পথে আমরা যাহাতে পুরুষের বিঘ্ন না হইয়া বরং তাঁহাদের সহায় হইতে পারি, এ উপায় তাঁহাদিগের—শুধু তাঁহাদিগের কেন, আমাদেরও করা উচিত।' ......'প্রকৃতপক্ষে এখনও তাঁহারা (মহিলাগণ) পুরুষ জাতির সম্পূর্ণ অধীন। আমাদের বিধিদত্ত 'ন্যায্য' স্বত্ব ও অধিকার পুরুষদিগের নিকট হইতে দাবী করিয়া আদায় করিয়া লইব।' সাধু সঙ্কল্প, সন্দেহ নাই। আমাদের এই পরাধীন দেশে রাজনৈতিক উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় দেশের ভ্রাতারা যেরূপ নাকের জলে চোখের জলে এক করিতেছেন, তাহা

দেখিয়াও যে এই লেখিকার মনে রাজনৈতিক অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে, ইহা বিচিত্র বটে। কথিত আছে, 'ন্যাড়া বেলতলায় যায় না।' কিন্তু সুকেশিনীগণের সে আশঙ্কা নাই, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। উনানের ভিজে কাঠে ফুঁ পাড়িয়া অশ্রুপ্রবাহ উৎসারিত করা যথেষ্ট নহে বলিয়াই কি ভারত-মহিলার মনে 'রাজনৈতিক' অধিকার-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে? আপনাদের সুখের জন্য হতভাগ্য পুরুষগণের আহার-নিদ্রার অবকাশ নাই। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপনারা যদি পুরুষদিগের নিকট হইতে 'স্বত্ব ও অধিকার দাবী করিয়া করিয়া আদায় করিবার' চেষ্টায় তাহাদের কর্ণমর্দ্দন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বেচারা পুরুষদের সংসারধর্ম্মপালন বিড়ম্বনাজনক হইয়া উঠিবে। আলোচ্য সংখ্যাতেই ভুপালের বেগমসাহেবার ইউরোপদর্শন-সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে: তাহাতে দেখিলাম,—"তুরস্কের স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে বেগমসাহেবা বলেন, "আমাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তুরস্কের মহিলারা শিক্ষার পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় রমণীর ন্যায় স্বাধীনা হইবারও চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্য আমার ভয় হয় যে, তাঁহাদের অবলম্বিত এই পথ ভবিষ্যতে বিপদসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন আপনাদের গন্তব্য প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত না হ'ন। মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মে রমণীর অধিকার সম্বন্ধে যে আদেশ আছে, সেই আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও অনেক মহীয়সী মহিলা শিক্ষা ও জ্ঞানগৌরবে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।" হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা তুল্যরূপে খাটে। মহিলা-সমাজের সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পুরুষের কান মলিয়া স্বত্ব ও অধিকার আদায় করিবার চেষ্টা নিতান্তই অনাবশ্যক। কবি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'নারী' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কবি এই কবিতায় নারীর মাতৃমূর্ত্তি, পত্নীমূর্ত্তি ও কন্যামূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীপ্রতিভা নাগের 'সেবা' প্রবন্ধটি রমণীসমাজের পাঠযোগ্য। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারু' নামক জাপানী গল্পটি মিষ্ট। কিন্তু এ ভাষায় গল্প অচল। যথা:—"সৌন্দর্য্যে সে তার স্ত্রীর কাছে ঘেঁসিতেই পারিত না। কিন্তু সে জাল বোনা কাজে খুব দক্ষ ছিল,—ভোগের মায়াজাল, যা দুর্ব্বলচিত্ত মানুষকে জড়াইয়া ফেলে, এবং ক্রমশঃ কঠিন হইয়া তাহাকে কাছে লইয়া যায়।" এই জাপানী রমণীর চরিত্রে ও সাধ্বী বঙ্গনারীর চরিত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। "চিল্কা" শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষের সরস ভ্রমণবৃত্তান্ত। লেখিকা লিখিয়াছেন,—"চিল্কা হ্রদের তীরে খলিকট্ট রাজার এক প্রমোদভবন আছে, উহাতে ত্রিশ লক্ষ টাকার আসবাব আছে। বৈদ্যুতিক কল বসাইতেই নাকি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই বাড়ীর জন্য সাহেব কোম্পানীর নিকট রাজার এখনও ৩২ লক্ষ টাকা ঋণ আছে।" রাজার আয় কত টাকা? বিলাস ও ব্যসনই ভারতের সাক্ষিগোপালদের সর্ব্বনাশ করিল। শ্রীকুমুদিনী বসুর 'সাধে বাদ' গল্পটি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মাসিক সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সকল গল্প প্রকাশিত হয়, এই গল্পটি সেগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই নবীনা লেখিকার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, চৈত্র। বর্ত্তমান সংখ্যায় এই পত্রিকার প্রথম বৎসর শেষ হইল। ঢাকা রিভিউ নূতন ধরণের মাসিক, হরগৌরী আকারে বাহির হইয়া থাকে। ইহার প্রথম অংশ ইংরাজী প্রবন্ধে পূর্ণ, আমরা তাহার সমালোচনা করিব না। শেষাংশের প্রবন্ধগুলি বঙ্গভাষায় রচিত। আলোচ্য সংখ্যায় চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত 'ভারত-বর্ষের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহ' ও 'বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর 'শিশুর প্রতি' কবিতাটি সুন্দর ; ভাব প্রহেলিকাপূর্ণ বা ভাষা কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন নহে। শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্তের 'দরিদ্র দম্পতি' চলনসই কবিতা। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর 'আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন' সারগর্ভ সন্দর্ভ। শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়ের 'ত্রাণ' কবিতাটি মন্দ নহে। 'শুকতারা' শ্রীরাজনারায়ণ দাসের জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধের ভাষা সরস, কিন্তু লেখক বিষয়টিকে এমন ফেনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ফেনার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাবানের মনেও ঈর্ষ্যা জন্মিবে! শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মার 'সার্থকতা'র বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিলাম না। আজকাল অনেক মাসিকে 'চবৈতুহি' শ্রেণীর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। পাদ-পূরণেই তাহাদের সার্থকতা। 'অমরেন্দ্র' ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস, এই সংখ্যায় শেষ হইল। লেখিকা শ্রীকুমুদিনী বসুর হাত ক্রমে খুলিবে, এরূপ আশা আছে। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 'পুত্রহারা' নামক একটি গল্প লিখিয়াছেন। বন্ধনীর ভিতর 'চিত্র' শব্দটি দেখিয়া জানিতে পারিলাম, ইহা 'চিত্র'। গল্পে ও চিত্রে পার্থক্য আছে। 'চিত্র' বলিয়া 'মার্কা' দিলেই যে কোনও রচনা চিত্র হয় না। শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 'ময়ূরভট্টের সূর্য্যশতকের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়ের 'অক্ষর-বিভীষিকা' সাহিত্য-সম্মিলনের ৫ম অধিবেশনে পঠিত সুলিখিত ও সুচিন্তিত সরস প্রবন্ধ।

ভারতী, চৈত্র।—সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত "বর্ষ-শেষ" নামক একখানি রঞ্জিত চিত্র। রক্ত-সমুদ্রে, রাঙ্গা নয়, হলুদে চাকী ডুবু-ডুবু, অর্দ্ধবৃত্ত দৃশ্যমান। সূর্য্য ডুবিলেই বর্ষ শেষ হয়, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,'—এই রক্ত-পীত বর্ণোদ্গার এ জগতের নয়। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র ভাব-রত্ন অনুমান-সমুদ্রে ডুবিয়া তুলিতে হয়। রক্তরাগরঞ্জিত কাগজে হরিদ্রাভ অর্দ্ধবৃত্ত দেখিয়া যাহাকে সূর্য্য বলিলাম, তাহা চাঁদ হইতে পারে, রাশিচক্রের কর্কট হইতে পারে, বর্ষও হইতে পারে। অন্ততঃ 'বর্ষ নয়' বলিবার পথ নাই। সারা বছর হাড়ে হাড়ে বর্ষকে অনুভব করিয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও তাহাকে দেখি নাই। অতএব 'না' বলিবার যো নাই। সুতরাং 'বর্ষ-শেষ'কে অগত্যা শিরোধার্য্য করিলাম। "দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুরমণী"র চিত্রখানি অতি সুন্দর। ইহার কোনও ইতিহাস "ভারতী"র বর্ণারণ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। চিত্রখানি 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি'র পাণ্ডাদিগের অদ্ভুত ও উদ্ভট সিদ্ধান্তের অকাট্য প্রতিবাদ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শিল্পী চিত্র-বিজ্ঞানের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এবং স্বাভাবিকতা, চিত্রশিল্পের বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও ছন্দের গলা না টিপিয়াও সৌন্দর্য্যের উদ্বোধনে সফল হইয়াছিলেন। ইহার নাক চোখ প্রভৃতি মানুষের মত ; নাকের বদলে খগচঞ্চু ও চোখের বদলে বাদাম দিয়া তাঁহার

মানসীর ছবি আঁকিয়া এই অতীত যুগের শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির উপাসনা করেন নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিত্র-কলার সূতিকাগৃহ ভারতে অবনীন্দ্র-পন্থীদের মতে তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল! শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার বিপুলতা দেখিয়া 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'র কথা মনে পড়ে, দ্রৌপদীর বসনের মত এ সমালোচনা—স্তব ও প্রহেলিকার জটিল জাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে। কথার এমন প্রবাহ সচরাচর দেখা যায় না। লেখকের দুই একটি 'স্বতঃসিদ্ধ'—সিদ্ধান্ত অত্যন্ত চমৎকার। রবীন্দ্রনাথ "আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণব তন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেই জন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না। - স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।"—অদ্ভুত নহে কি? প্রথম ত 'পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের দৃষ্টি।' বোধের হাসি নয়, কান্না নয়, হাত নয়, পা নয়—দৃষ্টি। তবে তাহা চশমায় ছাঁকা কি না, অজিত দার্শনিক তাহার উল্লেখ করেন নাই। অধ্যাত্মবোধ বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় 'অন্তর্নিগূঢ়' হইয়াছিল! এই 'অন্তর্নিগূঢ়ে'র জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি, সাহিত্য উদ্বাস্ত হইতে বসিয়াছে। 'অন্তর্নিগূঢ়ে'র অন্তরে প্রবেশ করি, এমন সূক্ষ্ম শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। তাহার উপর আবার 'বিশ্বানুপ্রবিষ্ট।' প্রহেলিকা বটে, তবে ভাঙ্গিবার উপায় নাই। এই সকল দাঁতভাঙ্গা শব্দের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যে সকল দাড়াভাঙ্গা দার্শনিক কাঁকড়ার সৃষ্টি করিয়া ভবের হাটে ছাড়িয়া দিতেছেন, তাঁহার শিষ্যবর্গের উদ্গারে তাহারই অপচারের ন্যক্কারজনক গন্ধ। আবার অপরূপ সিদ্ধান্ত শুনুন,—এ দেশের লোক 'ভেককে বিশ্বাস করে।' অজিতের 'ভেক' যদি বোলপুরের শান্তিনিকেতনের কোটরবাসী কোলা ব্যাং—এমন কি ব্যাঙ্গাচীও হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু যে 'ভেক' দেখাইয়া বাঙ্গালা দেশে ভিখারীরা ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে, সে 'ভেক'কে কোনও মতে বিশ্বাস করিব না। তবে কেহ কেহ ভেককে বিশ্বাস করে বটে; নহিলে ভবের হাটে ভেকধারীরা ভিক্ষা পাইত না। কিন্তু, এ বিশ্বাস সার্ব্বভৌমিক নহে। 'বাস্তব'কে পদাঘাত করিয়া অলৌকিককে শ্রদ্ধা করিবার পরামর্শ দিয়া অজিত দার্শনিক সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নহিলে তাঁহাদের কাণা কড়ি সাহিত্যের হাটে চলিবে কেন? আশ্চর্য্য এই যে, এই সকল nonsenseও ছাপার অক্ষরে জাহির হয়। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বসুর "হিজলীর প্রাচীন কীর্ত্তি" উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তির পরিচয় ও চিত্র আছে, কিন্তু তাহা হইতে সত্য আহরণ করিবার কোনও বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টা নাই। "বঙ্কিম-যুগের কথায় শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায় জগদীশনাথের গল্প করিয়াছেন। শ্রীযুত কালিদাস রায় "সুন্দর" নামক তথাকথিত কবিতায় ধমক দিয়াছেন—"কে বলে তোম কালো?" ইহার উপর আর কথা চলে না। কালো নয়, আলোই বটে! এত দিন কবি, কবির মানসী, প্রজাপতি, চাঁদিনী যামিনী প্রভৃতি পুষ্পরেণু মাখিতেন, সাহিত্যেও ছড়াইয়া দিতেন। কিন্তু কবি কালিদাস মৌলিক প্রতিভার আশীর্ব্বাদে 'চন্দ্র-রেণু' প্রস্তুত করিয়াছেন। কবি মেঘকে বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস্,
চন্দ্র-রেণু গায়ে মাখিস্।"

উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা বটে! আশীর্ব্বাদ করি, যে হামানদিস্তায় কবি কালিদাস চাঁদ চূর্ণ করিয়াছেন, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকুক। কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহাদের 'দশন-কান্তি-চূর্ণে' কালিদাসের চাঁদ-চূর মিশাইয়া দিন,—তাহা হইলে জয়দেবের 'দন্তরুচি-কৌমুদী' বহু দন্তপাটীতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! ত্রিবেদী ভায়া পরিষদের চিত্রশালায় এই হামানদিস্তাটি সংগ্রহ করিয়া রাখুন। বালখিল্য কবিরা এই 'চাঁদ-চূর' সেবন করুন, উপকৃত হইবেন।—বাঙ্গালায় কবিশালার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনার চাঁদা হইতে রবীন্দ্রনাথের নামে কোনও শীত-শীতল প্রদেশে এইরূপ একটি আশ্রম, বা কবি-নিকেতন, বা 'রবীন্দ্র-চন্দ্র-চূর' প্রতিষ্ঠিত করিলে হয় না? রবীন্দ্রনাথই এই চন্দ্র-চূর-স্কুলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই তাঁহার নামটাও জুড়িয়া দিতে বলিতেছি। "বিভ্রম" গল্পটি মন্দ নহে। সংক্ষিপ্ত হইলে আরও মনোজ্ঞ হইত। লেখক লিখিয়াছেন,—'সবদিনাপেক্ষা'! আমরা বলি, যদ্যপ্যাপনারৈইরূপাভুতোত্তটার্যসঙ্কীল্প হইয়া উঠেন, তাহা হইলে প্রবাসাদিদলিত ব্যাকরণাহি আবার ফণা তুলিবে।

প্রবাসী, চৈত্র।—শ্রীযুত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের "গৃহহারা জননী"র চিত্রখানি গাঢ় বর্ণ-প্রলেপে অনুলিপ্ত। প্রতিলিপিতে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিলাম না। কবিবর রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি" উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন। আপনার অতীতকে বর্ত্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে; সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আছে; কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুত রামলাল সরকারের "চীনব্রহ্ম-সীমান্তের অসভ্য জাতি" নামক প্রবন্ধে এবার "কাচিন জাতির কথা" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ,—চিত্তাকর্ষক। লেখক ভাষাবিন্যাসে অত্যন্ত উদাসীন, যথেচ্ছাচারী। "ইহারা বংশানুক্রমিক সুভা দ্বারা শাসিত হয়।" এখানে 'দ্বারা'র জন্য 'কর্ত্তৃক'কে নির্ব্বাসিত করিবার কারণ কি? ইনি লিখিয়াছেন,—"শাসনকর্ত্তাগণকে।" যদি সন্ধিই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ব্যাকরণের বিদ্রোহী হইয়া বিগ্রহ করিয়া লাভ কি? 'কর্ত্তাদিগকে' লিখিলেই কাজ চলিত, ব্যাকরণকে জবাই করিতে হইত না। "তাহারা টেঙ্গিয়ে আনীত হইয়া বিচারে তাহাদের শিরশ্ছেদের হুকুম হইয়াছে।" এই 'তাহারা' ও 'তাহাদের' বাঁশবনে ডোম কানা হইয়া ঘুরিতেছে, অন্বয় বিষম অনর্থে পরিণত হইয়াছে। সরকার মহাশয় বানানেও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। যথা—"কএকজন", "বিসম্বাদ" প্রভৃতি। লেখকের মতে, বঙ্গবামাদের অবস্থা কাচিন স্ত্রীলোকদের মত। বঙ্গনারীরা রামলাল বাবুর এই সমবেদনায় ও তুলনায় পুলকিত হইবেন কি না, বলিতে পারি না। এ সকল বিষয়ে

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিলে অনেক লেখককে আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে পারি। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" ও শ্রীযুত রফিউদ্দিন আহাম্মদের "ভারতীয় নাবিক" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত কালিদাস রায় রবীন্দ্রনাথের সেই পলাতক মানসপুত্রকে —বিশারদ যাহাকে বেতাইয়া দেশছাড়া করিয়াছিলেন—খুঁজিয়া আনিয়া আবার বাঙ্গলার কাব্যি-কচুবনে "বসন্তে কাননরাণী"র অধিকারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই নিন সেই হারানিধি। "ঘুরছিছে ঢেউগুলি তার চরণতলে পুলকে।" পূর্ব্বে 'পুলক' গাছে গাছে নাচিত, এখন পুলকিত ঢেউ বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত করিতেছে। ক্ষতি নাই! "কাননরাণী"র একটি চরণ অত্যন্ত মনোরম, কবিত্বপূর্ণ, মৌলিক :—"হাস্য, যেন রক্তশিলায় কুন্দফুলের ঝরণা।" কিন্তু "উর্ণানাভের স্বর্ণজালের ওড়না"য় নবীন কবি সত্যেন্দ্রনাথের মানসীর দেহসৌরভ যে এখনও জড়াইয়া আছে। তবে এক জন আচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন বটে, "পরকীয়া নহিলে রস হয় না।" তা, ওড়নাই সই। 'উর্ণানাভ' নয়, উর্ণনাভ। ভেড়ার উর্ণা আছে, মাকড়সার নাই, এইটুকু মনে রাখিলেই ভবিষ্যতে আর গোল বাধিবে না। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "হর্ষচরিতের ঐতিহাসিক উপাদানে" অনেক তথ্যের সঙ্কলন করিয়াছেন। "প্রেমভিক্ষা" প্রভৃতি কবিতা এত অন্তঃসার-শূন্য ও অকিঞ্চিৎকর ও ন্যাকামীতে পরিপূর্ণ যে, গালি দিতেও প্রবৃত্তি হয় না। "বিবিধ প্রসঙ্গে" লেখক লিখিয়াছেন,—"গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক জন সুপরিজ্ঞাত নাটককার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোন নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারেও কখন যাই নাই। এই জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।" আমরা বলি, বাপু! গিরিশ বাবুর বইগুলি না পড়িয়া ভাল কর নাই। আমরা দেখিয়াছি, তোমার অপেক্ষা অনেক জাঁদরেল পণ্ডিত ও ধৃষ্ট গিরিশ বাবুর বই পড়িয়া, অথবা তাঁহার অভিনয় দেখিয়া, তরিয়া গিয়াছে। এখন আর তাহারা কথায় বার্ত্তায় সহজে ধরা পড়ে না। তুমিও অনায়াসে তেমনই হইতে পারিতে ; যা তা বকিয়া বা লিখিয়া ধরা পড়িতে না। আর, তুমি শ্রমস্বীকার করিয়া এ সংবাদ সাধারণকে না জানাইলেও দুনিয়া অচল হইত না। কারণ, শুধু গিরিশ বাবুর কেন—পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে তুমি এ যাত্রায় কখনও কোনও গ্রন্থকারের কোনও বইয়ের পাতাও উল্টাইয়া দেখ নাই, এমন মর্ম্মভেদী সংবাদ পাইলেও, বোধ করি, বাঙ্গলার আট কোটী নরনারী শোকাভিভূত হইত না। আর যদি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের কথা ধর, গো-সম্প্রদায়ের কোনও, ক্ষণজন্মা দীর্ঘশৃঙ্গ যদি কখনও তৃণ ভোজন না করে, তাহা হইলে, ধরণীর যেরূপ ক্ষতি, এ ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত! অতএব, 'লিলিপুটিয়ান' পঙ্গুগণের হিমাচল লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস সাধারণতঃ যেরূপ ফল প্রসব করে এই সংবাদ-ঘোষণার মূল উদ্দেশ্যের ফল, তোমারও বাপু! সেইরূপই হইয়াছে। ছয় লাইনের মধ্যে এত স্পর্দ্ধা, এত নির্লজ্জতা, এত অবিনয় ও এত নির্ব্বোধের সরলতা আর কখনও দেখিয়াছি, তাহা ত মনে হয় না।

চিত্র।

'কমলা' শ্রীযুত ভবানীচরণ লাহা কর্ত্তৃক অঙ্কিত। 'সদ্যঃস্নাতা' জুবিলী একাডেমীর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সরকারের কল্পনা।—কলিকাতার প্রসিদ্ধ কে. ভি. সেন ব্রাদার্স বাঙ্গালী-জীবনের এইরূপ চিত্রাবলী বৃহদাকারে প্রচারিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।—'সদ্যঃস্নাতা' তাঁহাদের 'স্নান' পর্য্যায়ের চিত্রমালার অন্যতম।

☞ ৭২ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনের 'প্রতিভাত' স্থলে 'প্রতিভাসিত' ও অষ্টম লাইনের 'অবস্থান' স্থলে 'অবদান' হইবে।

'দুঁহু মুখ হেরইতে দুঁহু সে আকুল।

চিত্রকর···শ্রীভবানীচরণ লাহা।

K. V. Seyne & Bros

সাগরিকা।

অবতরণিকা।

তথ্যানুসন্ধানচেষ্টা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যবদ্বীপের নাম একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তাহার সহিত আমাদিগের কতকালের কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাহার কথা আমাদিগের দেশের জনশ্রুতি হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী বলী দ্বীপে এখনও হিন্দু-সমাজ বর্ত্তমান;—এখনও ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুবৌদ্ধ-পুরাকীর্ত্তির অসংখ্য নিদর্শন দেদীপ্যমান। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—এক সময়ে আমাদিগের সমুদ্র-যাত্রার অনুরাগ ও প্রয়োজন বহু দূর দেশেও আমাদিগের আচার-ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল।

যবদ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের পুরাতন সংসর্গের বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিবার প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবার বহুপূর্ব্বেই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। তখন যবদ্বীপ ওলন্দাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা দুই শত বৎসর শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, যথাযোগ্যভাবে অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে [১৮১১ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত] অত্যল্পকালমাত্র যবদ্বীপ ইংরেজগণের অধিকারভুক্ত হইলে, গবর্ণর স্যর ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড র‍্যাফেলের উদ্‌যোগে, অনুসন্ধান-কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ওলন্দাজগণ পুনরায় অধিকারলাভ করিবার পর হইতে, উত্তরোত্তর অনেক বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। তাহাতে যে সকল কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

এক দিকে, ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভারত-সংসর্গের অগণ্য অভ্রান্ত নিদর্শন; আর এক দিকে, ভারতবাসিগণের সুপরিচিত সমুদ্রযাত্রা-বিষয়ক

অকীর্ত্তিকর ঘৃণার ভাব; যুগপৎ দুইটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীকে নানা সন্দেহে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে! একখানি গ্রন্থে [এই সন্দেহ-মূলে] স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে,—যাহারা যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া থাকিলেও, ভারতবাসী ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তাহারা হয় ত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, তথায় উপনিবেশ-সংস্থাপনের স্থানাভাব লক্ষ্য করিয়াই, যবদ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (১) আর একখানি সদ্যঃপ্রকাশিত গ্রন্থে যবদ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের পুরাতন সংসর্গ ইতিহাসের অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুরূহ সমস্যা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। (২)

এই সকল কারণে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধান-লব্ধ বিবরণমাত্রের সঙ্কলন-কার্য্যের জন্য, পুস্তকালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, এতদ্বিষয়ে আশানুরূপ ফললাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, পরস্পরের সংসর্গ-সূচক পরিচয়নিচয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, কেবল দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে অনুসন্ধান-কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলেই, সকল তথ্য সঙ্কলিত হইতে পারে না। দ্বীপপুঞ্জে যে সকল শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে সেরূপ নিদর্শন বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যেও ব্যাপৃত হইতে হইবে। সেরূপ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের কোনও স্থানেই অনুসন্ধান-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এই অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য হইলে, এতদিন অনেক বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত। কিন্তু যাঁহারা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার যথার্থ অধিকারী বলিয়া কথিত

---

(১) The solution of this difficulty may perhaps be found in the suggestion that the colonists were not Indians after all, in the sense in which we usually understand the term, but nations from the northwest—the inhabitants in fact of Gandhara and Komboja, who, finding no room for new settlement in India Proper, turning to their right, passed down the Indus, and sought a distant home on this Pearl of Island—Fergusson's History of Eastern Architecture, revised and extended by R. P. Spiers (1910) p. 415.

(২) The extensive and long-continued emigration from India to the Far East,—including Pegu. Siam, and Cambodia on the mainland, with Java, Sumatra, Bali and Borneo among the island of the Malay Archipelago,—and the consequent establishment of Indian institutions and art in the countries named, constitute one of the darkest mysteries of history—Vincent A. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon (1911).

হইতে পারেন, সেরূপ লোক দুর্লভ। আমাদিগের সাহিত্য-রচনার অধিকাংশ আগ্রহ অনধিকার-চর্চ্চার আগ্রহ। তাহাকেই আমরা সাহিত্যের "জাগরণ" বলিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি।

বহুকাল হইল, আমাদিগের সমুদ্র-যাত্রার অবসান হইয়া গিয়াছে। তাহা এখন সমাজ-চ্যুতির কারণ বলিয়াই সুপরিচিত। সুতরাং আমাদিগের দ্বারা যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনায় কেহ কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিলে, উপহাস করা যায় না। আমরাই বরং উপহাসের পাত্র। কারণ, আমরা ইতিহাস-বিমুখ, অনুসন্ধান-বিমুখ, অথচ পূর্ণমাত্রায় সভ্যতাভিমানী।

কোন্ সময়ে হইতে, কিরূপ কারণ-পরম্পরায়, আমাদিগের সমুদ্র-যাত্রা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া দূরে থাকুক, আমরা তাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি কি না, তাহাতেও সংশয়ের অভাব নাই। আমাদিগের সমুদ্র-যাত্রার অনভ্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অধোগতির নিদর্শন হইলেও, তাহাকেই পুরাকালের মর্য্যাদা দান করিবার অভিপ্রায়ে, আমরা সমগ্র কলিকালকেই সমুদ্র-যাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ কাল বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছি।

শাস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রার নিষেধাত্মক ও নিন্দাত্মক বচনাবলীর-অভাব নাই। তাহা সকলের নিকটেই সুপরিচিত। এই সকল নিষেধ-বাক্য ও নিন্দাবাদ সমুদ্র-যাত্রা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। প্রাচীন স্মৃতিতেও নিষেধবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব বহুকাল হইতে সমুদ্র-যাত্রা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে;—এরূপ সিদ্ধান্ত, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মর্য্যাদালাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র ও লোকাচার অনেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান-প্রদান করিয়া থাকে। সমুদ্র-যাত্রার ব্যাপারেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইলেও, লোক-সমাজে তাহা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। তজ্জন্য তাহা "পাপ" বলিয়া উল্লিখিত না হইয়া, "অনাচার" বলিয়াই উল্লিখিত হইত। (৩) অনেক দিন পর্য্যন্ত উত্তর-

(৩) "অনাচার" শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম সূচিত করিলেও, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে "পাপ" হইতে পৃথক বলিয়াই পরিচিত ছিল। "সর্ব্বদেশেষনাচারঃ পথি তাম্বুলচর্ব্বণম্।" এই স্মৃতি-বচনে পথে তাম্বুল-চর্ব্বণ করিবার প্রথা সকল দেশের প্রচলিত "অনাচার" বলিয়া কথিত, তজ্জন্য কাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এই অর্থেই স্মৃতিশাস্ত্রে "অনাচার"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভারতে এই "অনাচার" প্রবলপ্রতাপে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪) উত্তর-ভারতের যে অংশ "প্রাচী" নামে অভিহিত, তাহার সহিত সমুদ্রোপকূলের সান্নিধ্য থাকায়, উত্তর-ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে—বঙ্গোপ-সাগরের উপকূল-প্রদেশে,—সমুদ্র-যাত্রা সমধিক প্রচলিত থাকিবার কথা। দাক্ষিণাপথে সে ভাবে সমুদ্র-যাত্রার "অনাচার" প্রচলিত থাকিবার কোনরূপ প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই লোক-ব্যবহার-সূচক শাস্ত্রবাক্যের যথাযোগ্য আলোচনা করেন নাই।

সমুদ্র ও সমুদ্রপোতের সহিত আমাদের কত কালের পরিচয়, বৈদিক সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাট্য-সাহিত্যেও তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। তাহা সর্ব্বথা বিশ্বাস-যোগ্য হইলেও, কোন্ কোন্ দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশের লোকের সমুদ্রপথে যাতায়াত প্রচলিত ছিল, আমাদিগের পুরাতন সাহিত্যে তাহার সম্যক্ পরিচয়লাভের উপায় নাই। সুতরাং, সে সাহিত্যে যাহা কিছু উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের বলে, খৃষ্টাবির্ভাবের সমসময়ে, ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে যে সমুদ্র-যাত্রা-কুশল অকুতোভয় নাবিকগণ বর্ত্তমান ছিল, তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত অসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে। (৫)

---

(৪) দক্ষিণাপথে মাতুলকন্যা-বিবাহের যে "অনাচার" প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া, বৌধায়ন উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথের শাস্ত্রনিষিদ্ধ কতকগুলি প্রচলিত "অনাচারে"র পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তরাপথের জনসমাজের 'সমুদ্র-সংযান" একটি "অনাচার" বলিয়া উল্লিখিত। যথা,—

"পঞ্চধা বিপ্রপত্তি র্দক্ষিণত স্তথোত্তরতঃ। যানি দক্ষিণত স্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। যথৈতৎ—অনুপেতেন সহ ভোজনং, স্ত্রিয়া সহ ভোজনং, মাতুল-পিতৃস্বসৃ-দুহিতৃ-গমনমিতি। অথোত্তরত—ঊর্ণাবিক্রয়ঃ, সীধু-পান মুভয়তোদদ্ভি র্ব্যবহার; আয়ুধীয়কং সমুদ্র-সংযান মিতি।"

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তর-ভারতের জনসমাজ সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধাত্মক শাস্ত্রশাসন অস্বীকার করিয়া, "সমুদ্র-সংযানে" আসক্ত ছিল। ভারতবর্ষীয়গণের সমুদ্রপথে দ্বীপদ্বীপান্তরে গমনাগমনের যে সকল পূর্ব্বকাহিনীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে [শাস্ত্রানুসারে] মুখ্যতঃ উত্তরাপথের কাহিনী ও বঙ্গোপসাগরকূলের কাহিনী বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) It is certain that during the early centuries of the Christian era India possessed an active and enterprising sea-faring population on both coasts—that of the Bay of Bengal on the east, and that of the Arabian Sea on the west.—Vincent A. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon (1911) p. 259.

যবদ্বীপের প্রচলিত জনশ্রুতিতেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্যর ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড র‍্যাফেল তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে জনশ্রুতির মর্ম্ম এই যে,—"আদিশাক নামক এক জন লোক-নায়ক, ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া, যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং সেই ঘটনাকে চির-স্মরণীয় করিবার জন্য যবদ্বীপে শকাব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন।" (৬) তাহা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গণনায়, ৭৫ [মতান্তরে ৭৯] খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী ঘটনা। একখানি গ্রন্থে, এই ঘটনা ভারতবর্ষের প্রাচ্য উপকূল হইতে সমাগত "আজিশাক" নামক নরপতির যবদ্বীপে উপনিবেশ-সংস্থাপন-চেষ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৭) ইহা জনশ্রুতিমাত্র;—কিন্তু ইহাই যবদ্বীপের লোকসমাজে প্রচলিত প্রবল জনশ্রুতি।

চীন দেশের ইতিহাসেও যবদ্বীপে ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইবার একটী জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহা একখানি গ্রন্থে, চীন-সম্রাট ক্যাং-উ-তির শাসন-সময়ের, [২৬-৫৭ খৃষ্টাব্দের] সমকালবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত। ইহাও জনশ্রুতিমাত্র; কিন্তু ইহা আর একটি পুরাতন সভ্যসমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি।

এই সকল জনশ্রুতির সাহায্যে যবদ্বীপে ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইবার যেরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহাকেই প্রথম ও শেষ উপনিবেশ-সংস্থাপন-চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। একবার যবদ্বীপের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবার পর, যাতায়াতের প্রথা তিরোহিত না হইয়া, উত্তরোত্তর প্রবল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তাহার অনুকূল প্রমাণও অপ্রাপ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

তাহা যবদ্বীপের আর একটি প্রচলিত প্রবল জনশ্রুতি। তাহার মর্ম্ম এই যে,—"৬০৩ খৃষ্টাব্দে এক জন ভারতবর্ষীয় রাজকুমার ছয়খানি বৃহৎ ও এক শত ক্ষুদ্রকায় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, পঞ্চ সহস্র সহযাত্রি-সমভি-ব্যাহারে, যবদ্বীপে উপনীত হইয়া, তদ্দেশে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।"

---

(৬) Sir S. Raffle's History of Java, Vol. I, p. 465.

(৭) Vincent A. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon (1911)

একজন গ্রন্থকার এই রাজকুমারকে "গুজরাত-রাজকুমার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; (৮) এবং তাঁহার উক্তি, ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়াই, অধ্যাপক হাভেল কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে (৯)। কিন্তু সুপণ্ডিত লাসেন্ এই রাজকুমারকে "কলিঙ্গদেশ হইতে সমাগত" বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন (১০)। তৎপ্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া, যবদ্বীপের শিল্প-প্রতিভার সমালোচক-বর্গের গ্রন্থে নানা কল্পনা-জল্পনা আতিশয্য লাভ করিয়াছে। যবদ্বীপে ভারত-বর্ষীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইবার এই সকল জনশ্রুতি-মূলক প্রমাণ সংকলিত হইলেও, সকল তর্ক সহজে নিরস্ত হইতে পারে নাই।

অনেকের ধারণা এই যে,—যাঁহারা যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই, সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধাত্মক শাস্ত্রশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই ; হিন্দুর পক্ষে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চীন দেশের ইতিহাসে ও যব দ্বীপের পুরাকীর্ত্তির মধ্যে ইহার প্রতিকূল প্রমাণই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।

কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, চীন দেশের ইতিহাস-লেখকগণের পক্ষে তাহার বিবরণ-সঙ্কলনের প্রয়োজন ছিল। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন,—"কাশ্মীর-রাজকুমার গুণবর্ম্মা, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর, চীন দেশের একটি বিহারে বাস করিয়া, ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নান্‌কিন্ নগরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার যত্নেই যবদ্বীপে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। (১১) ইহার একটি অনুকূল প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়।

গুণবর্ম্মার চেষ্টায় যবদ্বীপে বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, [৪১৪ খৃষ্টাব্দে] চতুর্দ্দশ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিবার পর, চীনদেশের বৌদ্ধ শ্রমণ ফা হিয়ান্, যবদ্বীপে উপনীত হইয়া, তথায় পাঁচ মাস বাস করিয়া-ছিলেন। তিনি তৎকালে তথায় ব্রাহ্মণগণের ও জৈন-সম্প্রদায়েরই

(৮) In the year 525 (A. D. 603 or 599) it being foretold to a king of Kujrate or Gujarat that his country would decay and go to ruin, he resolved to send his son to Java.—Fergusson's History of Eastern Architecture p, 411 (new Edition).

(৯) Indian Sculpture and Painting.

(১০) Indische Alterthumskunde, Bd, ii.

(১১) History of the Sung Dynasty.

প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায় দেখিতে পান নাই। সুতরাং যাঁহারা যবদ্বীপে উপনিবেশ-সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন না, তাহাতে সংশয় নাই। যবদ্বীপের পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনের মধ্যেও, প্রথমে ব্রাহ্মণ্য-মতের, পরে বৌদ্ধ-মতের এবং সর্ব্বশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-মতের প্রাধান্য-সূচক অগণ্য পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল প্রমাণ-মূলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—সমুদ্রযাত্রা-নিষেধাত্মক শাস্ত্রশাসন প্রচলিত থাকিলেও, [যবদ্বীপে রাজ্য-সংস্থাপনের সমকালবর্ত্তী] খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের লোক-সমাজে সমুদ্র-যাত্রার অভ্যাস পূর্ণপ্রতাপেই প্রচলিত ছিল। তখনকার ভারত-ভারতী, কবি কালিদাসের কণ্ঠলগ্ন হইয়া, গৌরবের সঙ্গেই "তমাল-তালী-বনরাজি-নীলা" ভারত-বেলার উল্লেখ করিতে গিয়া, "সমুদ্র সংযানে" ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেন। তাহার পর? তাহার পর,—বিক্রমাদিত্যের তিরোভাবে, ভারত-ভারতী হাহাকার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

"সা রসবত্তা বিহতা, নবকা বিলসন্তি, চরতি ন কং কঃ!"

হূণগণ ভারত-সাম্রাজ্যে আপতিত হইবার পর, এবং হর্ষবর্দ্ধন সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের সেই চিরপুরাতন "রসবত্তা বিহতা" হইয়াছিল; নবীনগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; তখন কে না কাহাকে আক্রমণ করিত? দেশ অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল! সেই বিপ্লব-যুগের অনিবার্য্য অত্যাচারে, উপর্য্যুপরি ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া, কত লোক জননী জন্মভূমির মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, দেশান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল,—শ্যামদেশের ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্দেশের ৬০৭ শকাব্দের (৬৮৫ খৃষ্টাব্দের) ঘটনা-বিবৃতির প্রসঙ্গে লিখিত রহিয়াছে,—"এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষেই ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ স্বদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, দলে দলে দেশান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্বদেশত্যাগের সেই অনিবার্য্য তাড়নায়, চারিটি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া, ব্রহ্ম-শ্যাম-কাম্বোডিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।" (১২)

(১২) Man, art no. 125, 1902.

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ যে সময়ে, যেরূপ কারণে, যে দেশে, উপনীত হইয়াছিলেন, সেই দেশেই ভারতবর্ষের পদাঙ্ক দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিবিধ রেখা-বিন্যাসের মধ্যেই তাঁহাদিগের সভ্যতার ও শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা প্রবর্ত্তিত হইলে, যবদ্বীপের শিল্প-প্রতিভার নিদর্শনের মধ্যে আমাদিগের অনেক বিলুপ্ত কাহিনীর পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে।

যবদ্বীপের পুরাকীর্ত্তির মধ্যে বৌদ্ধ-কীর্ত্তিই সমধিক উল্লেখযোগ্য, শিল্প-গৌরবে তাহাই জগদ্বিখ্যাত। তাহা মহাযান-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি। সে কীর্ত্তি ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাহার পর, মুসলমানগণের আক্রমণে, হিন্দুগণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ বলী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্যান্য লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তদ্দেশে আর হিন্দু-কীর্ত্তি বা বৌদ্ধ-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠালাভের অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু যবদ্বীপনিবাসিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তদ্দেশের পুরাকীর্ত্তিনিচয় আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইতে পারে নাই বলিয়া, এখনও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

শিল্প-লালিত্যের হিসাবে যাহা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তাহা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহাতেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদের অভাব ছিল না; কিন্তু এখন আর তাহার উল্লেখের বা সমালোচনার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই যুগ ভারতবর্ষেরও একটি উল্লেখযোগ্য চিরস্মরণীয় শিল্প-যুগ। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে যুগ বর্ত্তমান ছিল, তাহা বিপ্লব-যুগ। সে যুগে ভারতবর্ষের লোকে, স্বদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, নানা দূর দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া, তৎকালে উল্লেখযোগ্য শিল্প-লালিত্য বিকশিত হইতে পারে নাই।

এই বিপ্লব-যুগের অবসানে, উত্তর-ভারতে আবার একটি প্রবল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাহা "পাল-সাম্রাজ্য" নামে উল্লিখিত। তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক নাম,—"গৌড়ীয়-সাম্রাজ্য"। তাহাকে "বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য" বলিলেই ইতিহাসের মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইতে পারে। এই সাম্রাজ্য কিরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,

কিরূপেই বা ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহার সকল কথাই বাঙ্গালীর কথা।

লামা তারানাথের গ্রন্থে এই সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইবার একটি জনশ্রুতি-মূলক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহা দীর্ঘকাল সুধীসমাজে সুবিজ্ঞাত থাকিলেও, কেহ তাহাকে সাহস করিয়া ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন নাই। বিবরণটি এইরূপ ঃ—

"সমগ্র দেশের একজনমাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন না ; যিনি পারিতেন, তিনিই শাসনকর্ত্তা হইতেন। অবশেষে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজা নির্ব্বাচিত করায়, তিনি রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন।"

এই গোপাল পাল-রাজবংশের আদি রাজা প্রথম গোপালদেব। তাঁহার পুত্রের নাম ধর্ম্মপাল। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন [মালদহের অন্তর্গত] খালিমপুরে আবিষ্কৃত হইবার পর, জানিতে পারা গিয়াছে, তাঁহার পিতা গোপাল দেব।

"মাৎস্য-ন্যায় মপোহিতুং প্রকৃতিভি র্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ।"

অরাজকতার [মৎস্য-ন্যায়ের] উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণলাভের আশায়, প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তারানাথের গ্রন্থোক্ত জনশ্রুতি এইরূপে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইবার পর বুঝিতে পারা গিয়াছে,—পাল-সাম্রাজ্য প্রজাশক্তির সহায্যে সংস্থাপিত হইয়াই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

এই সাম্রাজ্য, ধর্ম্মপালের ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র দেবপালদেবের সুদীর্ঘ শাসন-সময়ে, সমগ্র উত্তরাপথেই বাঙ্গালীর বাহুবলের ও শাসন-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, এই দুই নরপালের শাসন-সময়েই, বাহুবলের ও শাসন-কৌশলের ন্যায় জ্ঞানবলেরও সমুন্নতি সাধিত করিয়া, বঙ্গবাসিগণ তাঁহাদিগের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যকে সর্ব্ববিষয়েই গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময়ে, এক নূতন প্রাণ যেন সগৌরবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পাল-নরপালগণের জয়স্কন্ধাবারে, "ভাগীরথী-প্রবাহ-প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক-রণতরণী সুবিখ্যাত সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখর-শ্রেণীরূপে লোকের মনে বিভ্রমের উৎপাদন করিত ;—নিরতিশয় ঘন-সন্নিবিষ্ট ঘনাঘন নামক রণকুঞ্জর-নিকর জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়া, দিনশোভাকে

শ্যামায়মান করিয়া, লোকের মনে নিরবচ্ছিন্ন জলদ-সময়-সমাগম-সন্দেহের উৎপাদন করিয়া দিত;—উত্তরাঞ্চলাগত অগণ্য মিত্ররাজন্য কর্ত্তৃক উপ-ঢৌকনীকৃত অসংখ্য অশ্ব-সেনার প্রখর-খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল-সমাবেশ দিঙ্‌মণ্ডলের অন্তরাল নিরন্তর ধূসরিত হইয়া থাকিত; রাজরাজেশ্বরের সেবার্থ সমাগত সমস্ত-জম্বুদ্বীপাধিপতিগণের অনন্ত পদাতি-পদভরে বসুন্ধরা অবনত হইয়া পড়িত।" (১৩)

"সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, গৃহচত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়স্থানে বণিক্‌সমূহ কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরাবস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপালের বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎবক্রভাবে বিনম্র হইয়া থাকিত।" (১৪)

"সেই ধর্ম্মপাল হইতে বিজয়ী জয়পাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবপালদেবের নির্দ্দেশক্রমে, দিগ্বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলে, দূর হইতে তাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া, স্বকীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর উচ্চ মস্তকে জয়পালের যুদ্ধোদ্যমোপশমকারিণী আজ্ঞা ধারণ করিয়া, আত্মীয়বর্গে পরি-বেষ্টিত হইয়া, চিরকাল পরমসুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"(১৫)

এক দিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ,—এক দিকে বরুণ-নিকেতন, অপর দিকে লক্ষ্মী-জন্মনিকেতন,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই দেব-পালদেব নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন।"(১৬)

এইরূপে যে প্রবর্দ্ধমান-কল্যাণ-বিজয়রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, বিবিধ স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—এখনও পাল-নরপালগণের জনকভূমি-বরেন্দ্রমণ্ডলের নানা স্থানে সেকালের অসংখ্য কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য গৌরব-যুগেই, বরেন্দ্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল ভারতশিল্পে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের

(১৩) ধর্ম্মপাল-দেবপাল-নারায়ণপাল-মহীপাল-বিগ্রহপাল প্রভৃতির তাম্রশাসন।

(১৪) ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন। ১৩ শ্লোক।

(১৫) নারায়ণ পালের তাম্রশাসন। ৫ শ্লোক।

(১৬) দেবপালের তাম্রশাসন। ১৫ শ্লোক

কথা এখন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। তথাপি তাঁহাদিগের স্বদেশের সাহিত্যে সে কথা এখনও যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা লাভ করিতে পারে নাই!

অধ্যবসায় ও অকুতোভয়তা এই যুগের প্রধান গৌরব বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; তাহা অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সায় অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগের গৌড়জন নানা বিষয়েই দিগ্‌বিজয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সমগ্র উত্তরাপথের সংস্কৃত সাহিত্যে "গৌড়ীয় রচনারীতি" প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল; সমগ্র বৌদ্ধজগতে গৌড়ীয় উপাধ্যায়গণের বিশদ ব্যখ্যা সমাদর লাভ করিয়াছিল;—ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দিগ্দেশে গৌড়ীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রচারশ্রম সফল হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিবংশের কুলপ্রশস্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত-দ্রবিড়-গুর্জ্জরনাথ-দর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশানাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বর শ্চির মুপাস্য ধিয়ং যদীয়াম্॥" (১৭)

এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা স্মরণ করিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—কাহার প্রতিভা-প্রভাবে [খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে] উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলে শিল্পগৌরব সমুন্নতশিরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; কাহার পুরাকীর্ত্তি-সংরক্ষণ-লালসায় মগধের তীর্থক্ষেত্রে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগই যবদ্বীপেরও অনিন্দ্যসুন্দর ভাস্কর্য্য-লালিত্যের অভ্যুদয়-যুগ তাহার গৌরবও বাঙ্গালীর ইতিহাসের সঙ্গেই একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। শিল্পাদর্শের মধ্যে, বিষয়-নির্ব্বাচনের মধ্যে, রচনা-প্রতিভার মধ্যে, এখনও তাহার প্রমাণ ও পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সে পথে এখনও অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত হয় নাই।

এখনও অনুসন্ধান-নিপুণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী একটি বিস্ময়-যুগের মোহাবরণেই আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে প্রাচ্য-শিল্প-নামক কোনরূপ স্বতন্ত্র শিল্পের অস্তিত্বমাত্রও স্বীকার করিতেন না। এক্ষণে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্যে এক নূতন শিল্প-জগতের সন্ধান লাভ করিয়াও, তাঁহারা শিল্প-লালিত্যের রসাস্বাদে বিস্ময়প্রকাশ করিয়াই, গ্রন্থরচনা

(১৭) গরুড়স্তম্ভলিপি।

করিতেছেন। তাহার মূলে কিরূপ ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরা নিহিত থাকিতে পারে, এখনও তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

সে চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইলে, যবদ্বীপের শিল্প-লালিত্যকে আর বিচ্ছিন্নভাবে উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার প্রবৃত্তি রহিবে না ; তাহার মূল প্রস্রবণের সন্ধান-লাভের আশায়, ভারতবর্ষের দিকেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই যুগের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। তজ্জন্য তাহা ভৌগোলিক-সীমানিবদ্ধ হইয়া, কখনও "মাগধ-শিল্পে"র, কখনও "উৎকল-শিল্পে"র, কখনও বা "গৌড়-মাগধ" শিল্পের নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। তৎসমস্ত যে এক অখণ্ড শিল্প-যুগের কীর্ত্তিচিহ্ন, রচনাকালই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ। তৎসমস্ত যে এক অখণ্ড শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন, তাহাই কেবল এখনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয় নাই। সে কথা স্বীকার করিলে, পূর্ব্ব-প্রথিত অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত পণ্ড হইয়া যায় বলিয়া, এখনও তর্কজাল বিস্তৃত হইতেছে কিন্তু এই যুগের নানা স্থানের শিল্প-নিদর্শন যতই তুলনায় সমালোচিত হইবে, ততই তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক অখণ্ড শিল্প-প্রতিভার পদাঙ্ক-রেখা আবিষ্কৃত করিয়া তাহা বরেন্দ্র-শিল্পী ধীমানের ও তৎপুত্র বীতপালের শিল্প-প্রতিভার সাক্ষ্যদানে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে চিরগৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। এই নবাবিষ্কার-যুগের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, ভারত-শিল্পের ইতিহাসলেখক সুপণ্ডিত ভিন্সেণ্ট স্মিথ ইঙ্গিতে তাহার আভাস প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন,—"দেখা যাইতেছে যে, ভাস্কর্য্য-বিচারে মধ্যযুগের মাগধ-শিল্পরীতিকে বীতপালের, এবং উৎকল-শিল্পরীতিকে ধীমানের শিল্পরীতি বলিয়াই সন্ধানলাভ করা যাইতে পারে।" (১৮)

তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া যবদ্বীপের শিল্প-লালিত্যের প্রকৃত উদ্ভবক্ষেত্রের সন্ধানলাভের জন্য চেষ্টা না করিয়া দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"যবদ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা এখনও অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।" এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন

(১৮) Apparently in sculpture we may trace the Medieval Biher School back to Bitapalo and the Orissan School back to Dhiman.--Vincent A. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon (1911) p. 306.

সমস্যার মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য, যেখানে অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সফল-কাম হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে পদার্পণ না করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদিগের সুপরিচিত ছাত্রবর্গ, কোনও না কোনও একটি কাল্পনিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াই, মর্ম্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ফাগু‍র্সনই ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি যবদ্বীপের ভাস্কর্য্য লালিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের ভাস্কর্য্য-লালিত্যের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলকেই যবদ্বীপের ভাস্কর্য্যবিদ্যার শিক্ষাক্ষেত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। (১৯) কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলের সঙ্গে যবদ্বীপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবার বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে, তাম্রলিপ্তির প্রসিদ্ধ বন্দরের সহিত শ্রীভোজ-বন্দরের ধারাবাহিক বাণিজ্য-সম্বন্ধ দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিবার নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফা হিয়ান, আই সিঙ্গ প্রভৃতি বৌদ্ধ-শ্রমণগণের গ্রন্থে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, যে যুগে যবদ্বীপে ভাস্কর্য্য-লালিত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সেই যুগে তাহার সহিত বঙ্গভূমির বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায়, যবদ্বীপের ভাস্কর্য্য-ললিত্যের সঙ্গে বঙ্গভূমির ভাস্কর্য্য-লালিত্যের কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবারই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বঙ্গভূমিতে যে কখনও কোনও স্বতন্ত্র ভাস্কর্য্য-রীতি বিকশিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয়-লাভের অভাবে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ তাহার কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। যে যুগে যবদ্বীপের শিল্প-লালিত্য জগদ্বিখ্যাত গৌরব লাভ করিয়াছে, সেই যুগের বঙ্গভূমির শিল্প-ললিত্যে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, কেহ তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ, গ্রন্থ-সংকলনকালে, ফাগু‍র্সনের পুরাতন সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করিতে গিয়া, ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলকে যবদ্বীপের শিক্ষাক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বরং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"যবদ্বীপের মূর্ত্তিগুলির অঙ্গলাবণ্য এরূপ শিল্প-সুষমামণ্ডিত যে, ভারতবর্ষে সেরূপ

---

(১৯) History of Indian and Eastern Aachitecture, Vol. 11, p. 426. (New Edition),

মূর্ত্তি-লাবণ্য দুর্ল্লভ।" (২০) ভারতবর্ষের সে সকল শ্রীমূর্ত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত, তাহার কথা স্মরণ করিয়াই, ভিন্সেণ্ট স্মিথ এরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ধীমানের জন্মভূমিতে যে সকল শ্রীমূর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে, যথাযোগ্য পরিচয়ের অভাবে, তাহার সহিত কেহ কখনও যবদ্বীপের শ্রীমূর্ত্তি-নিচয়ের তুলনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং অনন্যোপায় হইয়া, ফাগুর্সনের ন্যায়, ভিন্সেণ্ট স্মিথ নিজেও একটি কাল্পনিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন,—"বোধ হয়, চীনদেশের প্রভাবই যবদ্বীপের শিল্প-সুষমার মূল।" (২১) কিন্তু তিনি আবার পরক্ষণেই সত্যানুরাগী ইতিহাস-লেখকের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন,—"এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের যত দূর আলোচনা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট হয় নাই; এখনও অনেক কথার মীমাংসা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই।" (২২)

বঙ্গভূমির শিল্প-প্রতিভার ইতিহাস সংকলিত না হইলে, সে উপায় আবিষ্কৃত হইবে না। যে দেশের সমুদ্রোপকূলের সহিত যবদ্বীপের সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী বাণিজ্য-সম্পর্কের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দেশের শিল্প-প্রতিভার ইতিহাস-সংকলনের জন্য চেষ্টা না করিলে, অনেক কথারই মীমাংসা করিবার উপায় অবজ্ঞাত হইবে। এই প্রয়োজনের উপলব্ধি করিয়াই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ধীমানের জন্মভূমির নানা স্থানে শ্রীমূর্ত্তি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাহার কোনও কোনও শ্রীমূর্ত্তির ছায়াচিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে প্রদর্শিত করিয়া, অনুসন্ধান সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সম্মিলন-সম্বন্ধীয় অনেক অকীর্ত্তিকর কলহ-কোলা-হলের কথাই সংবাদপত্রে স্থানলাভ করিযাছে, কেবল বাঙ্গালীর ইতি-হাসের এই শিল্প-গৌরবের কথাই স্থানলাভ করিতে পারে নাই!

ইহাতে মনে হয়,—প্রদর্শিত ছায়াচিত্রগুলি ক্ষণকালের খেলার সামগ্রীর মতই প্রতিভাত হইয়া থাকিবে। যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ

(২০) The individual figures have a beauty of countenance which, unfortunately, is rare in Indian Sculpture.

(২১) Possibly Chinese teaching may be one of the causes of the excellence of the sculptures.

(২২) At present it is impossible to solve the many problems suggested by the reliefs.

হইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এখনও যবদ্বীপের শিল্প-প্রতিভার প্রকৃত শিক্ষা-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত করিতে না পারিয়া, নানা কল্পনাজল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও সত্যানুসন্ধানের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশিত করিতেছেন, ছায়াচিত্রাবলী সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া, কিরূপ কিরণপাতে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে কত দূর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহার কথা চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে, এই চিত্রপ্রদর্শনকে সাহিত্য-সম্মিলনের স্মরণীয় ব্যাপার বলিয়াই উল্লেখ করিতে হইত। অন্য কোনও সভ্যদেশের সাহিত্য-সম্মিলন ইহাকে এরূপ নীরবে উপভোগ করিতে পারিত না!

বাঙ্গালীর ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইলে, গৌড়শিল্পকলার ইতিহাসও সঙ্কলিত করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য মগধের, উৎকলের ও দ্বীপপুঞ্জের মধ্যযুগের শিল্পরীতির সহিত গৌড়শিল্পরীতির কোনরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল কি না, তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহার আলোচনার জন্যই "সাগরিকা" সঙ্কলিত হইল। ভারতদ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের অধিবাসিগণের উপনিবেশ, তাহার কথাই "সাগরিকা"র প্রধান কথা;—তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসেরও একটি প্রধান কথা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। যে সকল প্রমাণে দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ বাঙ্গালীর উপনিবেশ বলিয়াই প্রতিভাত হয়, তাহা গ্রন্থমধ্যে একে একে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

উপেক্ষিতা।

[পল্লী-কাহিনী।]

১

সত্যশরণ বাবু যখন রাজনগরের জমীদারগণের নায়েব ছিলেন, তখন তাঁহার সুখ-সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা সুকুমারীকে কোনও ধনীর সন্তানের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ক্রমে সুকুমারী দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া একাদশে পড়িল। মেয়ে

আর ঘরে রাখা যায় না দেখিয়া সত্যশরণ নানা স্থানে সুপাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভাল অবস্থা ও ভাল ছেলে এক সঙ্গে জুটিয়া উঠিল না। কৃতবিদ্য দরিদ্র-সন্তানের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবার তাঁহার আগ্রহ ছিল না ; কারণ, তিনি জানিতেন, এ কালে গ্রাজুয়েটের মূল্য ২৫৲ ৩০৲ টাকার অধিক নহে ; আবার বর্ণজ্ঞানহীন ধনিসন্তানকে কন্যা সম্প্রদান করাও তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না ; অশিক্ষিত ধনি-সন্তানেরা কুসংসর্গে মিশিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ধূলিমুষ্টির ন্যায় উড়াইয়া দেয়, তাহার পর পথে আসিয়া দাঁড়ায়, ভিক্ষাপাত্র ভিন্ন তাহাদের অন্য সম্বল কিছুই থাকে না। এ অবস্থায় তিনি কোথায় মেয়ের বিবাহ দিবেন, ইহা স্থির করিতে করিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ একদিন চিত্রগুপ্ত মুন্সী তাঁহাকে তলপ দিলেন। সত্যশরণ বাবু নায়েবী ত্যাগ করিয়া ও দেহের বোঝা নামাইয়া রাজাধিরাজ বিশ্বেশ্বরের বিচারালয়ে প্রস্থান করিলেন। সুকুমারীর বিবাহ হইল না।

মেয়ে যতই সুন্দরী হউক, এ কালে টাকা না হইলে মেয়ের বিবাহ হয় না ; টাকার অভাবে অনেক কুমারীর বিবাহ দেওয়া তাহাদের অভি-ভাবকদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার প্রতীকারের কোনও পথ নাই। ছেলের যত পাশ বাড়ে, পয়স্বিনী গাভীর মত নিলামের বাজারে তাহার দরও তত বাড়িয়া যায় ; স্বর্ণগর্দ্দভগণের লাঙ্গূল স্পর্শ করে, কাহার সাধ্য ? যাহার পিতার দু'খানি তালুক বা দু' লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে, কে তাহার কাছে যায় ? ছেলেটি হয় ত খানায় পড়েন, টো'লে পড়া পর্য্যন্ত বিদ্যা, কিন্তু দর দাম করিবার সময় তাহার বাপ বলেন, "দুই এক শো ভরি সোনার গহনা কে চায় ? দশ বিশখান জড়োয়া গহনা দিতে পার ত ঘটকালী করো। মেয়েটি কুরূপা হইলেও ক্ষতি নাই, বিবাহ ত মেয়ের সঙ্গে নহে, গহনার সঙ্গে !"

সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন পিতৃহীনা অর্থসম্পদবিরহিতা সুকুমারীকে কোন্ মূর্খ ধনিসন্তান বা বিশ্ববিদ্যালয় ফেরতা উপাধিব্যাধি-বিমণ্ডিত পণ্ডিত বিবাহ করিবে ? সত্যশরণ বাবু যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, বিলক্ষণ ধূমধামে দিন কাটাইয়া দিয়াছেন। তিনি পরিবারবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় করিয়া যান নাই। যৎসামান্য ভূসম্পত্তি—বাড়ী বাগান পুষ্করিণী ইত্যাদি ছিল, তাহা হইতে যে দু' পয়সা আয় হইত,

তাহাতেই কষ্টে সংসার চলিতে লাগিল। তাহা বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া সত্যশরণ-গৃহিণী মৌনবতী অসঙ্গত মনে করিলেন।

সত্যশরণের মৃত্যুর পর সুকুমারীর মাতুল হীরালাল বাবু ভগিনীর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি অভিভাবক হইয়া ভগিনীর সংসারের কি উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; তবে সত্যশরণের পুকুরের মাছ, বাগানের ডাব ও মর্ত্তমান রম্ভা, এবং বাঁশ-ঝাড়ের বাঁশ হীরালালের ভোগে লাগিত।

মৌনবতী একদিন বলিলেন, "দাদা, মেয়েটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠলো, ওর জন্যে একটা 'পাত্তর' খোঁজ কর।"

হীরালাল সেদিন বাগানের ডাব পাড়াইয়া বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; তিনি ক্লান্তি দূর করিবার জন্য ভগিনীর গৃহে জলপান করিতে বসিয়াছিলেন; একটি রসগোল্লা গলাধঃকরণ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বিয়ে? সুকুমারীর বিয়ের জন্যে আবার ভাবনা! ও মেয়ে কত জন লুফে' নিয়ে যাবে। দাঁড়াও, ছেলে ঠিক করচি।"

ভ্রাতার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ভগিনী মাস খানেক নীরব থাকিলেন।

এক মাস পরে হীরালাল মৌনবতীকে বলিলেন "ছেলের বাজার ত বড় চড়া; টাকা কড়ি খরচ করে' সুকুমারীর বিবাহ দেওয়ার সুবিধা নাই। আর তা কর্ত্তব্যও নয়; কারণ, যদি ছেলে দেখে দাও, তাতেই যে মেয়ে সুখে থাকবে, তার স্থিরতা কি? আমাদের হরিচরণ বি এ, পাশ করে, ত্রিশ টাকা ইনের চাকরী করচে, কিন্তু বিয়ে করবার সময় শ্বশুরের কাছে সে তিনটি হাজার টাকা নিয়েছে! এখন বাসন মাজতে মাজতে হরিচরণের স্ত্রীর হাতে 'খাটা' পড়ে' গেল। রামকানাই বাবুর তিন হাজার টাকাই বাজে খরচ!—জমীদার সজনী বাবু পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে' কালীগঞ্জের চৌধুরী-বাড়ী মেয়ের বিয়ে দিলেন; জামাইটি কলিকাতা ছাড়ে না, রাত্রে বাইজীর বাড়ীতে বাস করে, মদের মাহাত্ম্যে পেটেও কাঁসর ঘণ্টা বাজচে। সুকুমারীর অদৃষ্টে সুখ থাকে ত অমনই হবে; ও পাড়ার নরহরির সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ফ্যালো। টাকাকড়ি কিছু খরচ হবে না, আর নরহরিও বেশ সুপাত্র, দাঁয়েদের দোকানে গোমস্তাগিরি কর্‌চে, সরিকের সংসার নয়। শাশুড়ীটি হবে ভাল। কি বল?

কথাটা যৌনবতীর ভাল লাগিল না। দাঁয়েদের 'পশরহাট্টা' দোকানের গোমস্তা নরহরিকে শেষে জামাতৃরূপে গ্রহণ করিতে হইবে! নরহরি কি তাঁহার জামাই হইবার যোগ্য? স্বামী জীবিত থাকিতে তিনি মনে করিতেন, কোনও শিক্ষানবীশ ডেপুটী, নব্য মুন্সেফ—নিতান্ত না হয় একটি সবরেজিষ্ট্রারকে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তাঁহার 'হাকিম জামাই' লাভের ইচ্ছা বহুদিন হইতেই বলবতী, শেষে কি না দোকানের গোমস্তা?

কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়! নরহরির সঙ্গেই সুকুমারীর শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাড়ার পাঁচ জন পাঁচ কথা বলিতে লাগিল; কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার নাসা-বন্দুকে নস্যের বারুদ ঠাসিয়া বলিলেন, "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—সত্যচরণ নরহরিকে কোনদিন তামাক সাজতেও ডাকে নি, সেই কি না হ'লো তার জামাই! হীরালাল কিন্তু কাজটা ভাল করলে না!"

রামকান্ত বলিলেন, "বড়লোকের মেয়ে কি গরীবের ঘরে পড়ে না? মেয়ের অদৃষ্টে সুখ থাকে ত, নরহরি গোমস্তাগিরি করতে করতেই বড় মহাজন হয়ে উঠবে। সত্যশরণের বাপও জমীদারের গোমস্তা ছিল। সকলেই যদি ধনী জামাই চায়—তবে কি গরীবের বিয়ে হবে না?"

নিতাই ভাদুড়ী বলিলেন, "যার সংসার-প্রতিপালনের 'ক্ষ্যামোতা' নেই, তার বিয়ে করা কেন? নরহরি আট টাকা মাহিনা পায়, সংসারে নিজে ও মা ভিন্ন আর কেউ নেই ব'লেই তাতে কোনও রকমে খোরাক পোষাকটা চলে! এর উপর একটা বিয়ে করলে, বুঝবে মজাটা। যখন পাঁচটা 'কাচ্চাবাচ্চা' হবে, তখন বাপধনকে শরষের ফুল দেখতে হবে।"

রামকান্ত বলিলেন, "তা তোমার সে ভাবনা কেন? বুঝবে নরহরি, বুঝবে তার খাশুড়ী; সত্যশরণের পরিবারের হাতে কি কম টাকাটা আছে? সে ইচ্ছা করলে মেয়ে জামাইকে তিন পুরুষ ধরে পুষতে পারে।"

গ্রাম্য বিচারপতিগণ পাশার আড্ডায় বসিয়া এইরূপ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন; গ্রামের লোকের দিন বেশ উৎসাহে কাটিতে লাগিল। বড়লোকের জামাই হইয়া নরহরিও সমকক্ষগণের মধ্যে মাথা তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে স্বপ্নেও এরূপ সৌভাগ্যের আশা করে নাই!

৩

সুকুমারী পিতৃগৃহেই রহিল। প্রথম বৎসর নরহরি স্ত্রীকে গৃহে লইয়া গেল

না। মা মধ্যে মধ্যে আগ্রহপ্রকাশ করিত, বলিত, "হ্যাঁরে, বিয়ে করলি, বৌ ঘরে আন্‌চিস্‌ নে, লোকে বল্‌বে কি?"

নরহরি বলিল, "লোকে কি বলবে ভেবে তো আমার ঘুম নেই! বৌ ছোট, থাক্‌ না মায়ের কাছে; তুমি তাকে বাড়ীতে এনে ত কেবল দিনরাত খাটিয়ে নেবে!"

নরহরির মা অভিমান করিয়া শেষে আর বৌ আনিবার কথা বলিত না।

বৎসর অতীত হইলে নরহরির মা লোকের গঞ্জনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। একদিন সে স্বয়ং বেয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া বৌকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।

মৌনবতী নানাপ্রকার আপত্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে যখন বেয়ান তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, তখন মৌনবতী বলিলেন, "বৌ নিয়ে যেতে চাচ্চ, বৌকে খেতে দেবে কি? তোমার ছেলে ত আট টাকা মাইনের চাকরী করে। তাতে তোমার আর তোমার ছেলেরই খেতে কুলোয় না। আমার মেয়ে কি তোমার বাড়ী গিয়ে 'উপোষ' পাড়বে? শেষে আমাকেই চালডাল পাঠাতে হ'বে, তার আর দরকার কি? সুকু এখানেই থাক।"

নরহরির মা এই স্পষ্টবাক্যে কিছু অপমান বোধ করিল, বলিল, "এ কথা বল্‌চো কেন বেয়ান? নরোর ঐ আট টাকা দেখেই ত তার হাতে মেয়ে দিয়েছিলে? বৌকে চিরকাল বাপের বাড়ী রাখ্‌বার জন্য কি বেটার বিয়ে দিয়েছিলাম? আগে জানলে গরীবের ঘর থেকে বৌ আনতাম, বেটার বিয়ে দিয়ে খোঁটা খেতে খেতে 'পরাণ' গেল!"

মৌনবতী নামে মৌনবতী হইলেও বড় প্রখরা ছিলেন। বেয়ানের মন্তব্যে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বলিলেন, "আ মোলো মাগী, বাড়ীতে এসে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে! যা, আমি তোর বেটার বৌ পাঠাবো না; যা খুসী হয় করিস্‌। মেয়ে যেন আমি বেচে খেয়েছি!"

বেয়ানও ছাড়িবার পাত্রী নহে—সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আমি মাগী! গরীব বলে' আমার যেন মান নেই, আমি মাগী! আচ্ছা, থাক্‌ তুই মেয়ে নিয়ে, আমার নরো যদি পুরুষ মানুষ হয়, তবে সে আর কখনও এ মুখো হবে না। কুটুম্বের এত অপমান! আমি মাগী!

বেয়ান মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায় সদম্ভে প্রস্থান করিল।

৪

সেই রাত্রে নরহরি দোকানের খাতা লেখা শেষ করিয়া বাড়ী আসিবামাত্র তাহার মা বলিল, "আমি বৌ আনতে চেয়েছিলাম বলে' তোর শাশুড়ী যা বলবার নয়, তাই বলে, আমাকে গালিগালাজ করেছে; মাগীর ভারি দেমাক; তুই যদি পুরুষ মানুষ হ'স্ ত আর কখন শ্বশুরবাড়ীর নামও করিস্ নি, থাক মাগী মেয়ে বুকে নিয়ে!"

নরহরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল, "না, আমি পুরুষ মানুষ নই, মেয়ে মানুষ! তোমার যেমন বুদ্ধি! আমাকে না সুধিয়ে বৌ আনতে গেলে কেন? বৌ সেখানে আছে, তাতে ক্ষতিটা কি? আমার শাশুড়ীর হাতে দশ টাকা আছে, তার মন যুগিয়ে চলতে পারলে আমারই লাভ। তোমার ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে! দৌড়ে সেখানে ঝগড়া করতে গিয়েছিলে! আমি মেয়ে মানুষ হ'লে তোমার কথায় চলতাম। তুমি রাঁধো বাড়ো, খাও, বৌএর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

পুত্রের কথা শুনিয়া বিধবার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই নরপশুকে সে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছে, স্বয়ং না খাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছে। মা অপেক্ষা শাশুড়ী তাহার আপন হইল! হতভাগিনী ভগবানের নিকট মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কিন্তু যমের স্বভাব স্বতন্ত্র; না ডাকিতেও তিনি আসেন, এবং বিস্তর সাধ্যসাধনা করিলেও আসেন না। নরহরির মাতার কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না, সে মরিতে পারিল না; অতি কষ্টে ভব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া নরহরি কিছু সৌখীন হইয়া উঠিয়াছিল; সে বাদামী রঙ্গের জুতা পায়ে দিয়া, ইস্ত্রিকরা জামা ও সিল্কের চাদরে ভদ্রলোক সাজিয়া সুগন্ধি-তৈল-চর্চ্চিত কেশে 'টেড়ী' কাটিয়া সন্ধ্যার পর যথানিয়মে শ্বশুরবাড়ীতে দর্শন দিতে লাগিল। মৌনবতী কোনও দিন জামাইয়ের জন্য পুলি, আঁদোশা ভাজিতেন, কোনও দিন গরম খিচুড়ী রাঁধিয়া দিতেন; পুলি, আঁদোশা ও খিচুড়ী পারিপাক করিয়া নরহরি ভাবিতে লাগিল, শাশুড়ীই পূর্ব্বজন্মে তাহার মা ছিলেন! দরিদ্রা জননীকে সে নিতান্ত অবহেলার চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। বেতনের টাকা কয়টি জমাইয়া স্ত্রীর গহনা গড়াইবে ভাবিয়া সে সংসারের খরচপত্র একরকম বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মাতা মাসের মধ্যে দশ দিন একাদশী করিতে লাগিল।

হতভাগ্য বঙ্গদেশে এমন নরহরির অভাব নাই।

৫

বিবাহের তিন বৎসর পরে নরহরির একটি পুত্রসন্তান হইল। নরহরির মা এতদিন বেয়ানের সহিত বাক্যালাপও করে নাই, সে দিকেও যায় নাই। কিন্তু নাতি হইয়াছে,—তাহাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিল না। সে তাহার গরদের কাপড়খানি দত্তবৌর কাছে বন্দক রাখিয়া দুইটি টাকা আনিল, পৌত্রের হাতে টাকা দুটি দিয়া তাহার মুখ দেখিয়া আসিল। পৌত্রকে কোলে লইয়া সে যে আনন্দ পাইল, তাহার তুলনায় পূর্ব্ব অপমান তাহার নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

তাহার পর হইতেই নরহরির মা মধ্যে মধ্যে নাতিকে দেখিতে যাইত। শিশুর বয়স ছয় মাস হইলে নরহরি কয়েক দিনের জন্য স্ত্রীপুত্রকে বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ীতেই ছেলের অন্নপ্রাশন দিল। পাঁচ জন আত্মীয় প্রতিবেশীর নিন্দার ভয়ে সে এই দুষ্কর্ম্ম করিল! নরহরির মা তাহার রূপার মল ভাঙ্গিয়া নাতির কোমরপাটা গড়াইয়া দিল। আদর করিয়া নাতির নাম রাখিল—"গোবরা"। মৌনবতী তাহার নাম রাখিল ক্ষিতীন্দ্রমোহন।

ক্ষিতীন্দ্রমোহন ওরফে গোবরা দিন দিন শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় বাড়িতে লাগিল। সুকুমারীও ছেলে লইয়া সংসারের কাজ করিবার সময় পায় না; বুড়া শ্বাশুড়ী দাসীর মত তাহার সেবা করিতে লাগিল। পুত্রবধুর স্নানের জল তুলিয়া দেওয়া ও তাহার কাপড় কাচা তাহার একটা উপরি চাকরী হইয়া উঠিল, কিন্তু সে গোবরার মুখ দেখিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইত। গোবরাও ঠাকুরমার বড় অনুগত হইয়া উঠিল! শিশুকে স্নেহে কেহ প্রতারিত করিতে পারে না; কে ভালবাসে না বাসে, ছেলেরা যেমন বুঝিতে পারে, বুড়োরা যদি তেমন পারিত, তাহা হইলে সংসারের অনেক অশান্তি অদৃশ্য হইত।

শ্বশুরবাড়ী মেয়ের অশন-বসনের যথেষ্ট অভাব বুঝিয়া সুকুমারীর মা সুকুমারী ও তাহার শিশুপুত্রকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন। নাতিকে বিদায় দিয়া নরহরির মা সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সমস্ত দিন সংসারের কাজে সে কোনও রকমে মনঃসংযোগ করিত। কিন্তু অপরাহ্নে যখন পাড়ার মেয়েরা কলসী-কক্ষে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী দিঘীতে জল আনিতে যাইত, তাহার গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত সুদীর্ঘ নিমগাছের ছায়া দীর্ঘতর হইয়া উঠিত, দুরন্ত প্রকাণ্ড

অশ্বথ গাছের নবোদ্গত শ্যামল পল্লবদলের অন্তরালস্থিত একটি বিরহী ঘুঘু 'ঘুঘু ঘুঘু' শব্দে করুণ বিলাপ করিয়া অপরাহ্নের ক্লান্ত প্রকৃতির হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিত, এবং গরুর পাল গোচারণক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন আর বৃদ্ধা কোনও রূপে স্থির থাকিতে পারিত না। সে সংসারের সকল কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া বেয়ানের বাড়ীতে উপস্থিত হইত, এবং গোবরাকে কোলে লইয়া একবার পাড়ার ভিতর ঘুরিয়া আসিত। পথ দিয়া যাইতে যাইতে সে পল্লীবাসী গৃহস্থগণের কত ছেলে মেয়ে দেখিতে পাইত, কিন্তু গোবরার মত সুন্দর ছেলে সে একটিও দেখিত না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে গোবরাকে তাহার মায়ের কোলে দিয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

হাঁটিতে শিখিয়া গোবরা আর তাহার দিদিমার বাড়ী থাকিতে চাহিত না। দিদিমার পরিচারিকা দেঁতোর মাকে সে সর্ব্বদা বিরক্ত করিত, "আমাকে বালি নিয়ে তল।" দেঁতোর মা বলিত, "এই যে তোমার বাড়ী, আবার তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?" গোবরা বলিত, "এ বালি না, ঠাকুমাল বালি তল।" সে দেঁতোর মার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিত। দেঁতোর মা বাধ্য হইয়া কোনও দিন সকালে, কোনও দিন মধ্যাহ্নে, গোবরাকে তাহার ঠাকুমার কাছে রাখিয়া আসিত। সুকুমারীর মা বলিতেন, "ছেলেটা দেখ্‌ছি আমার বশ হবে না, ঠাকুরমার উপরই ওর টান বেশী; আমি খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করচি, আমার বাড়ী থাক্‌তে চায় না! মাগী কি জানে, ছেলেটাকে 'ওষুদ' করেছে!"

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। নরহরির গোমস্তাগিরি আর ঘুচিল না, সুতরাং তাহার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইল না। সুকুমারী পূর্ব্বের মত মায়ের আশ্রয়েই বাস করিতে লাগিল। গোবরার বয়স পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, এখন সে তাহার পিতার সহিত বাজারে যায়, এক পয়সা দামের একখানি প্রথমভাগ লইয়া পিতার কাছে বসিয়া 'ক'-য়ে করাত, 'খ'-য়ে খরগোস পড়ে; কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঠাকুমার কাছে উপস্থিত হয়! কোনও কোনও দিন ঠাকুমার নিকট হইতে একটি পয়সা লইয়া ময়রার দোকান হইতে একটি মেঠাই বা রসগোল্লা লইয়া আসে। ঠাকুরমা গঙ্গাস্নানে গিয়া নবদ্বীপ হইতে তাহার জন্য একটি ক্ষুদ্র ছাতা আনিয়াছিল। গোবরা নীলাম্বরী কাপড়খানি পরিয়া জুতাজামায় সজ্জিত হইয়া সেই ছাতাটি মাথায়

দিয়া যখন ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে পথ দিয়া চলিত, তখন বৃদ্ধার মনে হইত, নারায়ণ বামন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিকে ছলিতে যাইতেছেন। স্তব্ধ সন্ধ্যায় তুলসী-তলায় মাটীর প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া বৃদ্ধা হরিনামের মালা লইয়া জপে বসিত, কিন্তু ভগবানের পরিবর্ত্তে গোবরার মূর্ত্তি তাহার মানস-পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

বর্ষার পর হঠাৎ গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইল। ক্ষুদ্র রাজনগর গ্রামের লোক ঘরে ঘরে জ্বরে পড়িতে লাগিল। কেহ যে কাহারও মুখে জল দিবে, তাহার উপায় রহিল না। জ্বর-বিকারে, জ্বরাতিসারে অনেকেই মরিল; বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার দল পাঁচ সাত দিন জ্বর ভোগ করিয়াই মরিতে লাগিল। গ্রাম্য জমীদার দেখিয়া শুনিয়া সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিলেন।

বর্ষার জলে গাছের পাতা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল। গ্রামের পচা গর্ত্ত হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু গৃহে গৃহে মৃত্যু-বীজ বিতরণ করিতে লাগিল। ভেকের মকধ্বনি ও মশকের গুণগুণানি দিবারাত্রি গ্রাম গুল্‌জার করিয়া রাখিল। বাজারে দোকানপাট বন্ধ, পথ কর্দ্দমে পূর্ণ, আকাশে কালো মেঘের কৃষ্ণকুন্তলচ্ছটা, আর মুহুর্মুহু দামিনীর স্ফুরণ।

নরহরির মা কয়েকদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাসন মাজিয়াছিল। প্রথমে তাহার সর্দ্দি কাশী হয়। বিধবাদের দেহের মমতা নাই, ক্রমাগত অনিয়ম হইতে লাগিল। নিষেধ করিবার কেহ নাই। আহা বলিবার কেহ নাই। অভাগিনী সংসারে সেবা করিতেই আসিয়াছিল, সেবা পাইতে আসে নাই। একদিন রাত্রে সে প্রবল কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইল। দ্বিতীয় দিন আর সে উঠিতে পারিল না।

নরহরি দেখিল, মাকে লইয়া বড়ই বিপদ। সে শাশুড়ীর নিকট নিজে আর্জ্জি পেশ করিল, "সুকুমারীকে না পাঠাইলেই নয়, কেই বা মায়ের সেবা করে, কেই বা দুটি ভাত রাঁধিয়া দেয়।"

সুকুমারীর মা বলিলেন, "তোমার মার হয়েছে ব্যারাম, আমার মেয়ে যাবে তার সেবা কর্ত্তে! আরও বা কত কি শুন্‌বো!—তোমার বাড়ী ত আর মগের মুলুকে নয়, দু' বেলা দু' মুঠো এখানেই খেয়ে যেও। সুকুকে এখন পাঠাতে পারবো না, ওর শরীর ভাল নয়, খাটুনী বরদাস্ত করিতে পারবে না।"

শ্রীমান নরহরি লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। কিন্তু সে সেকেলে ছোকরা; লেখা পড়া শিখিয়া ভদ্রলোক হইতে পারে নাই, 'চক্ষুলজ্জা'ও কিছু কিছু ছিল, গর্ভধারিণী জননীকে অবলীলাক্রমে যমের হাতে সমর্পণ করিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিল না! স্বয়ং আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া জননীর সেবার ভার গ্রহণ করিল।

কয়েক দিন সে শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিল না। মায়ের শয্যাপ্রান্ত হইতে সে নড়িতে পারিত না; কবিরাজের বড়ি খাওয়াইত; মুখে জল দিত; মায়ের কাপড় কাচিয়া দিত; তাহাকে বাতাস করিত। বিধবা কন্যা পীড়িতা বৃদ্ধা মাতার যেরূপ সেবা করে, নরহরি সেই ভাবে মায়ের সেবা করিতে লাগিল। সে বুঝিয়াছিল, সে জীবনে অনেক বার মায়ের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছে, তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছে; এবার সে তাহার প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইল।—সে কোনও দিন মুড়ি ভিজাইয়া খাইত, কোনও দিন দুখানা বাতাসা ও এক গেলাস জল খাইয়া দিবারাত্রি কাটাইত।

কবিরাজের বড়ি ও নরহরির শুশ্রূষা যমকে ভুলাইতে পারিল না। একদিন সন্ধ্যার সময় মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জনে প্রলয়ের আভাস ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। অন্ধকার আকাশের নীচে ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রকৃতিরাণীর অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিল; এবং নরহরির জীর্ণ কুটীরে তাহার হতভাগিনী আত্মনিগ্রহপরায়ণা বৃদ্ধা জননীর জীবন-বন্ধন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে টুটিতে লাগিল!

বৃদ্ধা অস্ফুটস্বরে বলিল, "একবার আন্‌লি নে রে! একবার দেখালি নে। গোবরা, গোবরা, তোকে বুঝি দাদা আর দেখতে পেলাম না।" বৃদ্ধার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে ব্যাকুলভাবে শূন্যে চাহিল, বুঝি সে আশা করিয়াছিল, গোবরা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্ত্তিতে শূন্যে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইবে।

নরহরি মনের কষ্ট গোপন করিয়া বলিল, "মা, আজ বড় বাদলা, এমন দিনে গোবরাকে আনি কি করে'?"

নরহরি জানিত, এমন দুর্য্যোগ দূরের কথা—অন্য কোনও দিনও পীড়িতা পিতামহীর নিকট তাহার আই-মা গোবরাকে আসিতে দিবেন না।—'ষেঠের বাছার' অকল্যাণ হইতে পারে, এই ভয়ে সুকুমারীর মা দৌহিত্রকে পীড়িতা বেয়ানের কাছে পাঠান নাই।

স্নেহ-পাশ।

[চিত্রকর···লে, ব্রুণ।]

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রাবৃট-নিশার সমস্ত অন্ধকার নরহরির হৃদয়াকাশে ঘনাইয়া আসিল। মৃণ্ময় গৃহে মৃৎপ্রদীপের ম্লান আলোক সেই গাঢ় তিমিররাশি অপসারিত করিতে পারিল না।

বৃদ্ধা ঈষৎ মুখব্যাদান করিল। অন্তিম যাতনায়, কি অন্তিম পিপাসায়, কে বলিবে? নরহরি এক ঝিনুক দুগ্ধমিশ্রিত গঙ্গাজল তাহার মুখে দিল; অধিকাংশ জল 'কস্' দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

নরহরি অশ্রু সংযত করিয়া মায়ের কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "মা, কষ্ট হচ্ছে কি? বল, 'নারায়ণ মধুসূদন'।"

বৃদ্ধা অস্ফুটস্বরে বলিল, "গোবরা, গোবরা রে! আর দেখা হলো না!"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বৃদ্ধার কণ্ঠ চিরনীরব হইল। স্নেহমুগ্ধা বৃদ্ধা গোবরার নাম ওষ্ঠে লইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বেদ-মার্গ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বকৃত গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বেদমার্গের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন:—

দ্বিবিধো হি বৈদিকো ধর্ম্মঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদ্ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।

অর্থাৎ, 'বৈদিক ধর্ম্ম দ্বি-বিধ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। ধর্ম্মই জগতের স্থিতির কারণ—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম প্রাণীদিগের অভ্যুদয়ের, এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম—প্রাণীদিগের নিঃশ্রেয়সের সাক্ষাৎ হেতু।'

'ধারণাদ্ ধর্ম্ম উচ্যতে'—জগৎকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম। সেই জন্য বেদ বলিয়াছেন—ধর্ম্মো জগতঃ প্রতিষ্ঠা। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর বলিলেন—জগতঃ স্থিতিকারণম্। কিসে ধর্ম্ম জগতের স্থিতিকারণ?

জগদীশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন—যেন জগৎ ঋত-মার্গে ভ্রমণ করিয়া কল্পান্তে তাঁহার চরণে মিলিত হয়। ইহাই জগতের নিয়তি। যে নিয়মের অনুসরণ করিলে জগতের বিবর্ত্তন-গতি অব্যাহত হয়, জগতের বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়তি পূর্ণ

হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। জীব ও জড়—এই উভয়কে লইয়া জগৎ। উভয়েই বিবর্ত্তন-নীতির অধীন—অতএব যদ্দ্বারা জীবের ও জড়ের বিবর্ত্তনের সহায়তা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। আর যদ্দ্বারা বিবর্ত্তনের ব্যাঘাত হয়, তাহাই অধর্ম্ম। এ ভাবে ধর্ম্মকে জগতের প্রতিষ্ঠা, স্থিতিহেতু, ধারক বলা অসঙ্গত নহে।

জগৎ যদি বিবর্ত্তনের পথে না গিয়া, বিপথে চলিতে থাকে, যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়তির অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, এক কথায় জগৎ যদি ঋত-মার্গে না গিয়া অধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহা হইলেই জগতে বিপ্লব বাধা বিপত্তির ঝঞ্ঝা বহিতে আরম্ভ হয়। আধ্যাত্মিক ভাষায় ইহাকে 'ধর্ম্মের গ্লানি' বলে। পৌরাণিকেরা বলেন যে, এরূপ হইলে ধরণী পীড়িতা হইয়া আর্ত্তনাদ করেন, এবং তাঁহার করুণ ক্রন্দনে ভগবানের সিংহাসন চঞ্চল হয়, এবং তখন 'ধর্ম্ম'-সংস্থাপনের জন্য স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয়। সংক্ষেপে ইহাই অবতার-তত্ত্ব।

কথাটা একটু বুঝিয়া দেখিলেই ভাল হয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, জগৎই জগদীশ্বরের শরীর।

জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে।

পিণ্ডাণ্ড জীবশরীরে যেমন জীব অধিষ্ঠিত, ব্রহ্মাণ্ড জগৎশরীরে তেমনই ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। সাধারণতঃ উভয়েই দ্রষ্টা, বা সাক্ষিমাত্র। জীবের শরীর-ব্যাপার, জীবনযন্ত্র দেহযন্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ (automatic) ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে। হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, পাকাশয় স্বতঃসিদ্ধভাবে স্ব স্ব ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে ; সে সম্বন্ধে জীবের কোনও সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব কেবল ভোক্তৃ-ভাবে দেহক্রিয়ার ফলভোগ করিতেছেন। কিন্তু যদি কোনও দিন শরীরে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, যদি হৃদয়ের স্পন্দন অধিমাত্র হয়, পাকাশয়ে অজীর্ণ হয়, ফুসফুসে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, তবে যতক্ষণ না শরীরের সেই সেই উৎপাত নিবারিত হইয়া ধর্ম্মস্থাপন হয়, ততক্ষণ সাক্ষী জীবকে শরীর-ব্যাপারে মনোযোগী হইতে হয়। সে অবস্থায় জীবকে ঊর্দ্ধ ব্যোম হইতে শরীরের মাটীতে অবতরণ করিতে হয়।

ইহা গেল পিণ্ডাণ্ড দেহের কথা। ব্রহ্মাণ্ড জগতেও ঠিক ঐরূপই হয়। সাধারণতঃ জগদ্‌ব্যাপার দেবতাদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব অধিকারে অপ্রমত্ত থাকিয়া স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে জগদ্‌ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে বিবর্ত্তনবিরোধী

দৈত্য অসুরের উৎপাতে জগতের শরীরে পীড়া উৎপন্ন হয়—জগৎ আর ঋজুগতিতে ঋত-মার্গে অগ্রসর হইতে পারে না। তখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের নিবারণ জন্য—এক কথায় ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিতে হয়। ইহাই তাঁহার অবতার-গ্রহণ। তখন ধর্ম্মের গ্লানি নিবারিত হয়, জগতের পীড়া প্রশমিত হয়। জগৎ আবার বিবর্ত্তন-স্রোতে উন্নতির অভিমুখে অক্ষুণ্ণগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

কি উপায়ে জীব উন্নতির পথে চালিত হইতে পারে? কোন্ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে জীব বিবর্ত্তনের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে? অর্থাৎ, কোন্ কর্ম্ম করিলে তাহার 'ধর্ম্ম' হয়, এবং কোন্ কর্ম্ম করিলে অধর্ম্ম হয়? সাধারণ জীব ইহার নির্ণয় করিতে অসমর্থ। যদিই বা কার্য্য-কারণের পরম্পরা লক্ষ্য করিয়া অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া ভূয়োবিজ্ঞানের ফলে জীব স্থূল ব্যাপারে কথঞ্চিৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু এমন অনেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যাহার সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা-নিবারণের কোনই উপায় নাই। অতএব কিরূপে সে ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিবে? সেই জন্যই বেদের প্রয়োজন। বেদ জীবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। যে ধর্ম্ম বেদঘোষিত, বেদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তাহাকে বৈদিক ধর্ম্ম বলে।

শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—বৈদিক ধর্ম্ম দ্বি-বিধ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। ইহার অর্থ কি?

জগতে দুই শ্রেণীর জীব আছে—এক শ্রেণীর লোক সকাম, অন্য শ্রেণীর লোক নিষ্কাম। প্রথম শ্রেণীর লোক কামনা দ্বারা চালিত হইয়া প্রবৃত্তি-মার্গের পথিক; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কামনা-মুক্ত বলিয়া নিবৃত্তিমার্গের পথিক। প্রথম শ্রেণীর লক্ষ্য অভ্যুদয় (উন্নতি), দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স (মুক্তি)। প্রথম শ্রেণীর চেষ্টা কি উপায়ে ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হইবে; দ্বিতীয় শ্রেণীর চেষ্টা কি প্রণালীতে সংসারের বারণ হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে। প্রবৃত্তিমার্গকে প্রেয়ের পথ, এবং নিবৃত্তিমার্গকে শ্রেয়ের পথ বলা হইয়াছে।

অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈচ্চব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।—কঠ।

জগতে যখন দুই শ্রেণীর লোক রহিয়াছে, তখন বেদ যদি কেবল প্রবৃত্তিমার্গ বা কেবল নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করিতেন, তবে বেদের

অসম্পূর্ণতা হইত। সেই জন্ত বৈদিক ধর্ম্ম দ্বি-বিধ—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ।

আপত্তি হইতে পারে যে, বিবর্ত্তনবাদের সহিত এ মতের সামঞ্জস্য কোথায়? জগতের অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তির দাস অসভ্য মানব ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া প্রথম অর্দ্ধ-সভ্য, ক্রমে সভ্য, পরে সুসভ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যসমাজে অবশ্য প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী উভয় শ্রেণীরই লোক আছেন। কিন্তু মানবের আদিম গ্রন্থ বেদ যখন প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সভ্যতার সেই আদিম যুগে নিবৃত্তিধর্ম্মী মানবের একান্ত অভাব ছিল। অতএব সে সময়ে নিবৃত্তিধর্ম্মের অধিকারীর অভাবে বেদ কেন নিবৃত্তিধর্ম্মের প্রচার করিবেন? ফলতঃও দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, আদিম বৈদিক যুগে কেবল সকাম যাগ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান ছিল; তখন নিষ্কাম জ্ঞানধর্ম্মের অঙ্কুরও ভারতবর্ষে উদ্গত হয় নাই। এ মত যে ভ্রান্তি-পোষিত, তাহা আমি অন্যত্র প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আর্য্য ঋষিরা যে ভাবে বিবর্ত্তনবাদের প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এককালে প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম—এই উভয়েরই প্রচার আদৌ অসঙ্গত নহে।

আর্য্য ঋষিদিগের মতে, সৃষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, বর্ত্তমান সৃষ্টিই আবহমানকাল বিদ্যমান রহিয়াছে, কিংবা চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। এই সৃষ্টির পর প্রলয় হইবে, আবার সৃষ্টি হইবে, আবার প্রলয় হইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি প্রলয়, সৃষ্টি প্রলয়—এই ধারা অনন্ত কাল প্রবাহিত থাকিবে। ভবিষ্যতে যাহা হইবে, অতীতেও তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে সৃষ্টি ছিল, তাহার পূর্ব্বে আবার প্রলয় হইয়াছিল। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি প্রলয়, সৃষ্টি প্রলয় —এই ধারা অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আছে। এক একবার সৃষ্টির পর যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সেই সৃষ্টি-নাটকের অভিনেতা জীবগণ বিনষ্ট হইয়া যায় না; জীব অজর অমর, তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই। প্রলয়ের সময় জীব সকল ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে; আবার সৃষ্টি আরব্ধ হইলে, ব্রহ্মসাগর হইতে উত্থিত হইয়া যে যাহার উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি-নাটকের অভিনয় আরম্ভ করে। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৃষ্টি প্রচলিত ছিল,

সেই সৃষ্টিতে কি বৈচিত্র্য ছিল না? তখন কেবল কি অসভ্য মানুষই জগৎময় বর্ব্বরতার অভিনয় করিয়া বেড়াইত? তাহা যদি না হয়, তবে সেই সৃষ্টির পর যখন প্রলয় উপস্থিত হইল, তখন সকল শ্রেণীর জীবই ব্রহ্মে গিয়া পুনঃ-সৃষ্টির অপেক্ষা করিয়া বিলীন রহিল। পরে যখন বর্ত্তমান সৃষ্টি অরম্ভ হইল, তখন সেই সমস্ত জীব আবার পৃথিবীতে আসিয়া লীলা আরম্ভ করিল। তখন জীবগণের মধ্যে সকল শ্রেণীরই লোক ছিলেন—অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, সভ্য ও সুসভ্য। তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকাম ও নিষ্কাম, প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী, উভয় প্রকৃতিরই লোক থাকিবেন, ইহা কি বিচিত্র? তাহা যদি না হয়, তবে বেদ সকাম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ—উভয়ই যে এক সঙ্গে উপদেশ করিবেন, ইহা অসঙ্গত হইবে কেন?

জগতের রঙ্গভূমে জীব পুনঃপুনঃ আসিয়া অভিনয় করে। সেই জন্য জগতের একটি নাম সংসার। জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে, জীবনযাপন করে, মরণমুখে পতিত হয়। আবার সংসারে আসে, আবার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, আবার মৃত্যুগ্রস্ত হয়। জীবের এই গতাগতিই সংসার। উপনিষদ্ এই সংসারকে এক স্থলে ব্রহ্মচক্র বলিয়াছেন। এই চক্রের কেন্দ্রে বা নাভিতে ব্রহ্ম বিরাজিত, এবং ইহার পরিধিতে জীবের কর্ম্মভূমি। জীব এই ব্রহ্মচক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে। জীবের আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে, এবং অবসানও ব্রহ্মে। ঋষিরা এই চক্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রথমার্দ্ধ প্রবৃত্তি-মার্গ, এবং শেষার্দ্ধ নিবৃত্তিমার্গ। জীব ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়া প্রথমতঃ প্রবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হয়: জন্মের পর জন্ম এই প্রবৃত্তি-বৃত্তার্দ্ধে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন তাহার সকাম অবস্থা। সে তখন অভ্যুদয় চায়। প্রথমতঃ, জীব ইহলোকসর্ব্বস্ব থাকে। কিসে এখানে তাহার সুখ সমৃদ্ধি উন্নতি অভ্যুদয় হইবে, ইহারই জন্য সে ব্যস্ত থাকে। ক্রমশঃ পৃথিবীর সুখে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না সে বুঝে—ইহলোকের পর পরলোক আছে। তখন সে স্বর্গের কামনা করে। স্বর্গে প্রভূত সুখ, স্বর্গে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সুখ, স্বর্গের সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই। অতএব সে স্বর্গসুখ চায়। এইরূপ সকাম, প্রবৃত্তিমার্গী, অভ্যুদয়কামী জীবের জন্যই কর্ম্মকাণ্ড বেদ। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া এই কাণ্ড গঠিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড বেদ জীবকে অভ্যুদয়লাভের উপায় বলিয়া দিয়াছেন। সে উপায়ের পারিভাষিক নাম 'ইষ্টাপূর্ত্ত' (যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি)। কর্ম্মকাণ্ড বেদ প্রবৃত্তিমার্গীকে বলিতেছেন:—

স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত।

স্বারাজ্যকামঃ রাজসূয়েন যজেত।

অর্থাৎ, যদি পৃথিবীর চরম ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য লাভ করিতে চাও, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। যদি উৎকৃষ্ট সুখের আস্পদ স্বর্গ ভোগ করিতে চাও, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ইত্যাদি। ইহাই প্রবৃত্তিলক্ষণ—বৈদিক ধর্ম্ম। কিন্তু জীব চিরদিন প্রবৃত্তিমার্গে থাকিতে পারে না। ব্রহ্মচক্রে অগ্রসর হইতে হইতে এক দিন তাহাকে প্রবৃত্তি বৃত্তার্দ্ধের শেষ সীমায় পঁহুছিতে হয়। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই সে নিবৃত্তিবৃত্তার্দ্ধে প্রবেশ করে। তখন হইতে জীব প্রবৃত্তিমার্গে থাকে না, নিবৃত্তি মার্গে প্রস্থিত হয়। নিবৃত্তিমার্গের শেষ সীমায় বিবেক আসিয়া জীবের কর্ণমূলে আঘাত করে। সে জীবকে বলে—'ইহলোকই বল, আর পরলোকই বল, যে সুখের জন্য তুমি লালায়িত, তাহা স্থায়ী সুখ নহে। তুমি অমৃতের পুত্র। অমরত্বলাভের চেষ্টা কর। তুচ্ছ সুখের জন্য ভূমানন্দ হারাইও না।' এই বিবেকের বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রাচীন আর্য্যমহিলা মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন ঃ—

যেনাহং অমৃতা ন স্যাম্ তেন কিং কুর্য্যাম্।

"যাহার দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি?" তখন জীব বিচার করিতে আরম্ভ করে। 'আমি প্রেয়ের পথে যাইব, না শ্রেয়ের পথ আশ্রয় করিব? আমি জড় ধরিয়া থাকিব, কিংবা চিৎকে আলিঙ্গন করিব?' তখন বৈরাগ্য তাহার চিত্তকে আশ্রয় করে। সকামতা ঘুচিয়া তাহার চিত্ত নিষ্কাম হইতে আরম্ভ হয়। পার্থিব প্রলোভন, জগতের অস্থায়ী সুখ তাহাকে আর ভুলাইতে পারে না। সে নচিকেতার মত বলে ঃ—

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।

বিত্তের দ্বারা মানুষের তৃপ্তি নাই।" এইবার সে প্রকৃতপক্ষে নিবৃত্তি-মার্গের পথিক হয়। তাহারই জন্য জ্ঞানকাণ্ড বেদ। আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া এই জ্ঞানকাণ্ড গঠিত। জ্ঞানকাণ্ড বেদ তাঁহাকে বলেন যে, অভ্যুদয় তোমার লক্ষ্য নহে, নিঃশ্রেয়সই তোমার প্রাপ্য। কারণ, তুমি সকাম নও—নিষ্কাম। তাঁহার উদ্দেশে জ্ঞানকাণ্ড বেদ বলিয়াছেন—"দেখ, বরং মানুষের পক্ষে ক্ষুদ্র মুষ্টিতে আকাশ বেষ্টন করা সম্ভব, কিন্তু সেই পরমদেব ব্রহ্মকে না জানিলে সংসারের অন্ত কখনই হইবে না।"

যদা চর্ম্মবদ্ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।

তদা দেবমবিজ্ঞায় সংসারান্তো ভবিষ্যতি।

বেদ আবার বলিতেছেন—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

"একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই।"

ইহাই নিবৃত্তিমার্গ। নিষ্কামী নিঃশ্রেয়সার্থীর জন্য নিবৃত্তিলক্ষণ বৈদিক ধর্ম্ম।

অতএব শঙ্করাচার্য্য যথার্থই বলিয়াছেন যে,—বেদমার্গ দ্বি-বিধ, প্রবৃত্তি-লক্ষণ এবং নিবৃত্তিলক্ষণ। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের লক্ষ্য অভ্যুদয়, এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

'সহজিয়া' ধর্ম্ম ও সাহিত্য।

বুদ্ধদেব রমণীগণকে বৌদ্ধবিহারে স্থান দিতে অসম্মত ছিলেন। মহা-প্রজাপতি গৌতমী যখন প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব প্রথমবার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার আনন্দ মহাপ্রজাপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধদেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। তখনও বুদ্ধ এ অনু-রোধ পালন করেন নাই। মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধদেবের মাতৃষ্বসা ছিলেন, এবং তিনিই বুদ্ধদেবকে শৈশবে লালনপালন করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার যখন এই গৌতমী আবার প্রব্রজ্যা-গ্রহণের প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার জীবনের পবিত্রতা ও সাধনা স্মরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার প্রার্থনা আর অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। আদর্শ-রমণী গৌতমী ভিক্ষুণী হইলেন।

কিন্তু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সাহচর্য্যের এই পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বুদ্ধ এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—স্ত্রীজাতি যদি তথাগতের উপদিষ্ট ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে, হে আনন্দ! এই ব্রহ্মচর্য্যসাধন দীর্ঘকাল অবস্থিত হইত; সদ্ধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) সহস্র বর্ষকাল অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু স্ত্রীজাতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায়, এখন ব্রহ্মচর্য্য আর

দীর্ঘকাল থাকিবে না; সদ্ধর্ম্মও পঞ্চ শত বৎসরমাত্র অবস্থান করিবে। যেমন কোনও সম্পন্ন শালিক্ষেত্রে 'সেতট্ঠিকা' (শ্বেতাস্থিক) নামক রোগে আক্রান্ত হইলে, সেই শালিক্ষেত্র শীঘ্রই নষ্ট হয়, সেইরূপ, আনন্দ! যে ধর্ম্মবিনয়ে স্ত্রীজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। [বিনয়-পিটক, চুল্লবগ্‌গ, ১০, ১, ১—৫ এবং ১০, ১, ৬]

ভিক্ষুণী বৌদ্ধসঙ্ঘে গৃহীত হইলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আনন্দকে এই আশঙ্কার কথা শুনাইয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না, ভাবী অশুভ পরিণামের পরিহারকল্পে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই জন্য এই সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যে কত দূর চিন্তিত ছিলেন, এবং কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি-মাত্র নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

(১) যে কোনও ভিক্ষু, সঙ্ঘের সম্মতি প্রাপ্ত না হইয়া, ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ প্রদান করিবেন, তাঁহার অপরাধ হইবে, এবং তাঁহাকে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

(২) যে কোনও ভিক্ষু উপযুক্ত সময় ভিন্ন (উপযুক্ত সময়=ভিক্ষুণী যখন পীড়িতা হইবেন) ভিক্ষুণীর বাসস্থানে উপস্থিত হইয়া, উপদেশ প্রদান করিবেন, তিনি অপরাধী হইবেন, এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।

(৩) ভিক্ষু সম্মতি প্রাপ্ত হইলেও যদি সূর্য্যাস্তের পর ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ প্রদান করেন, তবে তিনি অপরাধী ও দণ্ডার্হ।

(৪) যে কোনও ভিক্ষু সঙ্কেত করিয়া ভিক্ষুণীর সহিত উপযুক্ত সময় ভিন্ন (যে পথ ভয়সঙ্কুল, এবং যাহাতে অস্ত্রাদি লইয়া যাইতে হয়, সেই পথে পর্য্যটন ভিন্ন অন্য সময়) একাকী দীর্ঘ পথ, এমন কি, গ্রামান্তর পর্য্যন্ত গমন করিবেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যে কোনও ভিক্ষু সঙ্কেত করিয়া, ভিক্ষুণীর সহিত, পরতীরে উত্তরণের প্রয়োজন ভিন্ন, স্রোতের অনুলোমগামিনী বা প্রতিলোমগামিনী একই নৌকায় আরোহণ করিবেন, তিনি দণ্ডার্হ হইবেন।

(৬) যে কোনও ভিক্ষু একাকী কোনও একাকিনী ভিক্ষুণীর সহিত নির্জ্জনে উপবেশন করিবেন, তাঁহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

[বিনয়-পিটক, পাতিমোক্‌খ ও সুত্তবিভঙ্গ, পাচিত্তিয়, ২১—৩০]

বুদ্ধদেবের অনুশাসন যে এক সময় সফল হইয়াছিল, তাহার কোনও

সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর জীবন ধর্ম্ম-জগতের উচ্চতম আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে।

কিন্তু নরনারীর সংমিশ্রণের বিপদ কালক্রমে বৌদ্ধবিহারগুলিতে সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা দিতে লাগিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ নীতি অভ্যাস করিয়াও মানবসুলভ দুর্ব্বলতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ইঁহারা মস্তক মুণ্ডন করিলেন। এই জন্য হিন্দুরা ইঁহাদিগকে 'নেড়া-নেড়ী' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। যখন মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্য্যগণ নরনারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও মিলনই ধর্ম্মের অন্যতম সোপান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ব্যভিচারের মাত্রা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়ের পর 'নেড়ানেড়ী', 'কিশোরীভজক', 'কর্ত্তাভজা', 'বাউল', 'মহিমাধর্ম্মী', প্রভৃতি বিচিত্রনামধারী বজ্রতন্ত্রের উপাসক বৌদ্ধগণ হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে অতিশয় হীন হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত শত শত কীর্ত্তি কালে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যেরূপ ভারতবর্ষে ছড়াইয়া আছে, এই সকল সম্প্রদায়ও সেইরূপ যুথভ্রষ্ট পরাভূত বৌদ্ধ-মতাবলম্বিগণের লুপ্তাবশেষ নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুস্থানে বিদ্যমান।

বজ্রাচার্য্যগণের মতের যে উচ্চ আদর্শ, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল। সুতরাং নরনারীর অবাধ-মিলন-জনিত যে সকল পতন অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহার সমস্তই পতিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে দেখা দিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এইরূপ সমাজ-তাড়িত, নিরাশ্রয়, হতভাগ্য 'বার শত নেড়া' ও 'তের শত নেড়ী' ভাগীরথীর তীরে খড়দহ গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভু ও তদীয় পুত্র বীরভদ্র প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহারা হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে অতি হীন ছিল, এবং 'সদ্ধর্ম্মে'র আশ্রয়বিচ্যুত হইয়া একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই পতিতদিগকে আশ্রয় দান করিয়া, নিত্যানন্দ প্রভু পতিতপাবন নাম অর্জ্জন করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া নেড়ানেড়ীরা কতদূর কৃতার্থ হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ তাহারা বৎসর বৎসর খড়দহ গ্রামে এক মেলার অনুষ্ঠান করিত। এই ঐতিহাসিক 'নেড়া নেড়ীর' মেলা, গত চারি বৎসর হইল, উঠিয়া গিয়াছে।

মুর্শীদাবাদে রামকেলি গ্রামে রূপ গোস্বামী এইরূপ একদল নেড়ানেড়ীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাদের মেলা এখনও বৎসর বৎসর তথায় বসিয়া

থাকে। যদিও ইঁহারা চৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, তথাপি ভিতরে ভিতরে ইঁহারা বজ্রতন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পন্থায়ই ধর্ম্মাচরণ করেন। মহাযান সম্প্রদায়ের মতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—শুধু শূন্য ছিল। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে শূন্য-বাদের প্রচার করেন, তদনুসারে শূন্য বা মহাশূন্যই মাধ্যমিক মহাযানীদের উপাস্য হইয়া দাঁড়ায়। সম্প্রতি এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"চৈতন্যের পুজা কর কি না?" সে উত্তরে বলিল,—"চৈতন্যের আবার মূর্ত্তি কি? তাঁহার কোনও মূর্ত্তি নাই—তিনি শূন্যমূর্ত্তি।" শেষ সময়ের বৌদ্ধধর্ম্মের চাঁই রামাই পণ্ডিত "ধ্যায়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং" বলিয়া শূন্যের স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যায় মহিমা-ধর্ম্মীরা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের স্থলে পঞ্চবিষ্ণুর কল্পনা এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মকে কতকটা শোধিত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর বিবাহ হইতে পারিত না। তাহাদের পতন হইলে, বৌদ্ধ বিহারের অনুশাসনে তাহারা পতিত বলিয়া ঘৃণিত হইত। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, ইহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। গোস্বামীকে পাঁচ সিকা দিয়া বৈষ্ণবীগ্রহণের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিন্দার বিষয় নহে। যে অধঃপতন নেড়ানেড়ী-সমাজে অবশ্যম্ভাবী ছিল, এই বিবাহ-প্রথা সেই অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার উপায়। এই নিয়মের ফলে দম্পতী সমাজে একটা স্থান লাভ করিত।

এই নেড়ানেড়ীর দল ও 'সহজিয়া'রা অভিন্ন। চৈতন্যদেব যে সময়ে আবির্ভূত হন, সেই সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের মিলন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া, বঙ্গসমাজে পাপের পুষ্টিসাধন করিতেছিল। কিন্তু বজ্রাচার্য্যগণ-প্রবর্ত্তিত 'পরকীয়া' মতের একটা উচ্চ আদর্শ ছিল। আমরা সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

এই বাঙ্গালী বজ্রাচার্য্যগণ প্রেমকে যে উচ্চ স্থান হইতে দেখিয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীতে অন্য কোনও জাতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। গুপ্ত-সাধনতন্ত্রে একটি শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই,—রূপ-যৌবন-শীল-সৌভাগ্য-শালিনী কুলাঙ্গনাকে যত্নের সহিত পূজা করিলে, সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। আমরা শাক্ত-মতে এই যে সাধনার কথা দেখিতে পাই, 'সহজিয়া'গণ তাহারই চরমে উপনীত হইয়াছিলেন।

বজ্রতন্ত্রের মতে, 'স্বকীয়া' অপেক্ষা 'পরকীয়া' নায়িকা এবং 'স্বকীয়' অপেক্ষা 'পরকীয়' নায়ক প্রশস্ত। 'সহজিয়া'-সাহিত্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর-প্রসঙ্গে এই কথার আলোচনা আছে। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শ রমণীগণ, এবং যাঁহারা স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়িয়া মরিতেন, তাঁহারা 'স্বকীয়া', এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রেমের উচ্চতম আদর্শ। কিন্তু সহজিয়াগণ উহা অস্বীকার করিয়া বলেন,—"এই আদর্শে প্রেমের স্থান কতটুকু, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ইহাতে কতটা সামাজিক-প্রশংসা-লাভের চেষ্টা, কতটা পরকালে পুণ্যের পুরস্কার-লাভের লালসা, কতটা পারিবারিক সংস্কার, এবং কতটা খাঁটী প্রেম তাহা বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। সীতা, সাবিত্রীর প্রেম খুব উচ্চ অঙ্গের হইতে পারে, কিন্তু তাহা কষিয়া লইবার উপায় কি? জাতি, কুল, মান, গৌরব সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া যে প্রেমের সাধন করিতে হয়, তাহাই প্রকৃত প্রেমের সাধন। 'পরকীয়' ভিন্ন এই উচ্চতম প্রেমের পরীক্ষা ও উদাহরণ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? রাধিকা রাজকন্যা, তিনি তাঁহার শৈলসদৃশ উচ্চ কুল, মান ও গৌরব, এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের পদে বিসর্জ্জন দিয়া, পরকীয়া-সাধনা দেখাইয়াছেন।" সহজিয়ারা বলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃতে" এই সমস্ত সংস্কার-পরিত্যাগের কথা কহিয়াছেন,—

> "লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম কর্ম্ম।
> লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, মর্ম্ম।
> দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
> স্বজন করিবে যত তাড়ন ভর্ৎসন।
> সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।"

শুধু স্বজন পরিত্যাগ ও তাহাদিগের অত্যাচার-সহন নহে, যে আর্য্য ধর্ম্মের পথ অপরিহার্য্য, তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই উক্তির দ্বারা যে নির্ভীকতা সূচিত হইয়াছে, তাহা প্রেমসাধনার পথে একমাত্র 'পরকিয়া'তেই সম্ভবপর।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে কাণুপাদ নামক এক জন বাঙ্গালী বজ্রাচার্য্য 'পরকীয়া'-মত-সমর্থক অনেকগুলি দোঁহা বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত টীকা সমেত সেই দোঁহাবলী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি যক্ষের ধনের

ন্যায় সেগুলি যেরূপ সঙ্গোপনে রাখিয়াছেন, তাহাতে উহা কোনও কালে কাহারও ভোগে লাগিবে কি না সন্দেহ। 'সহজিয়া' মত চণ্ডীদাস নিজে স্বীকার করিয়া ইহার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রহেলিকার মত পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ইহা সামাজিকের ধর্ম্ম নহে; ইহা শুধু উচ্চ অঙ্গের সাধকের প্রেমসাধনার পথ। সাধারণ লোক এ পথে প্রবেশ করিলে সে নিশ্চয় পতিত হইবে, তাহার অধোগতি হইবে। কিন্তু এরূপ সাধনা যে উচ্চতম, তাহা তিনি নিজে রামীর প্রেমে বুঝিয়াছিলেন। রামীকে তিনি গায়ত্রীতুল্য পবিত্র মনে করিতেন। "তুমি হও পিতৃমাতৃ, তুমি হও বেদমাতা গায়ত্রী" প্রভৃতিভাবে সম্বোধন করিয়া তিনি তাহার উদ্দেশ্যে পদরচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই সহজ সাধন অতি দুষ্কর। সহজিয়ারা বলেন,—কাঠ, পুতুল, কিম্বা শিলার পূজা সহজ, কিন্তু মানুষ-পূজা অতি কঠিন। মানুষ ভালবাসার পরিবর্ত্তে পদে পদে অবিচার ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে। সে সমস্ত অকুণ্ঠিত-ভাবে সহ্য করিয়া তাহার প্রতি অচলা নিষ্ঠা রক্ষা করা, এবং তাহাকে দেবতা-জ্ঞানে অর্চ্চনা করা অতি কঠিন। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে?
তিমির আঁধার যে হয়েছে পার
সহজ জেনেছে সে।"

অর্থাৎ লালসা ও ইন্দ্রিয়ের তিমির যে জন অতিক্রম করিয়াছে, কেবল সেই এই পথ অবলম্বন করিবার যোগ্য। পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার যে ব্যক্তি অতিক্রম করিয়াছে, সে এই দুর্লভ প্রেম পন্থা'র 'পন্থী'। এই জন্য তিনি রাধার মুখে কহাইয়াছেন,—"সতী বা অসতী তুমি মোর গতি।" এখানে সতীত্বের গৌরব ও অসতী-কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তিনি সামাজিক সংস্কারের অতীত হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস জানিতেন যে, এ প্রেম-সাধনা সাধারণের জন্য নহে, এই জন্য বলিয়াছেন,—এরূপ প্রেমিক বা প্রেমিকা "কোটীতে গোটিক হয়।" কিন্তু কোটীর মধ্যে এই একটি প্রেমিকই ভগবানের প্রেমলাভের অধিকারী। মানুষের প্রতি ভালবাসা সোপানস্বরূপ, তাহা পার হইলেই স্বর্গ-রাজ্যের সিংহদ্বার। এই জন্য তিনি বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের বারতা যে জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন, নায়িকা-সাধন করিতে হইলে "শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহ করিতে হয়।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তাড়িত অসংস্থিত-দেহ প্রেমিকের জন্য ইহা নহে। ভোগ ও দুঃখভোগ যে দেহ হইতে দূর হইয়াছে, যাহা শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত, সেই দেহের দেহী এই পথে প্রবেশ করিবার অধিকারী। এই দুষ্কর তপস্যায় লোকের নিকট কলঙ্কিত হইতে হয়, অথচ নিজের পবিত্রতা অটুট থাকিবে।

"কলঙ্ক-সাগরে সিনান করিবি
এলাইঞা মাথার কেশ,
নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি,
সম দুখ সুখ ক্লেশ।"

চণ্ডীদাস জানিতেন, এই প্রেমসাধন যিনি করিতে পারেন, তিনি যাদুকরের ন্যায় অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে সমর্থ। এই জন্য তিনি বলিয়াছেন,—

"সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবে ত রসিকরাজ,
যে জন চতুর সুমেরুশিখর সূতায় বাঁধিতে পারে,
মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে এ প্রেম মিলায় তারে।"

অতএব হে সাধক, যদি কালসর্পের উন্মুক্ত বদনে ভেককে নাচাইয়া অক্ষুণ্ণদেহে ফিরাইয়া আনিতে পার, সুমেরুশিখর সুতায় বাঁধিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিতে পার, মাকড়সার জাল দিয়া মত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে এই পথে অগ্রসর হও, নতুবা ইন্দ্রিয় লইয়া খেলিতে চাহিলে তোমার অধঃপতন ও লজ্জার শেষ থাকিবে না।

সহজিয়া সাহিত্য পাঠ করিলে, ইহা যে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী ও বৌদ্ধমতের সমর্থক, তাহা ভাবিতে বিলম্ব হয় না। এই সম্প্রদায়ের "জ্ঞানাদিসাধন" নামক প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথিতে, যে সকল গুরু "পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ না করিয়া, পাষাণাদি দিয়া প্রতিমাদির মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন", তাঁহারা নিন্দিত হইয়াছেন। "অনিত্য মায়াবাদী লোকের মুখে মায়ামন্ত্র ও বেদের অর্থ, অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞ ও গোদানাদি করিলে মরিয়া পরলোকে স্বর্গের দ্বারে যাব ইত্যাদিরূপ মায়াবাদী বৈদিক ব্রাহ্মণের কথা"—এই ভাবের উক্তিসমূহের দ্বারা প্রাতীয়মান হয়, সহজিয়া

সম্প্রদায় যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের বিরোধী। ইঁহারা মানুষ-পূজা ও চিত্তসংযম প্রভৃতি উপায় ভিন্ন ধর্ম্মের অন্য কোনও 'পন্থা' স্বীকার করিতেন না। আধুনিক 'কর্ত্তাভজা'গণের মত সম্বন্ধে আমি বিশেষরূপে অভিজ্ঞ নহি, কিন্তু শুনিয়াছি, তাঁহাদের মতও কতকটা এইরূপ।

বৌদ্ধবিহারের উন্নতচরিত্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর উদ্গত হইলে, তাঁহারা প্রথমতঃ ডন্-জুয়ান কাব্যের নায়িকা জুলিয়ার মত আত্মসংযমে বিশেষ চেষ্টিত হইতেন। যখন ব্যাধি অসাধ্য হইত, তখন সেই প্রেমকেই অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইবার পথে অগ্রসর হইতেন। সম্ভবতঃ এই ভাবে নরনারীর মধ্যে এইরূপ প্রেমসাধনার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল এই পথে যাইয়া যে কত শত উদ্ভ্রান্ত পথিক দুর্গতির নিম্নতম কূপে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দুর্গম রাজ্যে প্রবেশলাভের চেষ্টায় শত শত ক্ষতবিক্ষত হৃদয় যখন প্রকৃত প্রেমের জন্য লালায়িত হইয়াছিল, সেই সময় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

"সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।"

শিখী মাইতির ভগিনী রূপসী মাধবীর নিকট ছোট হরিদাস ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন, এই অপরাধে চৈতন্যদেব আর তাহার মুখ দেখিলেন না। উড়িষ্যার রাম রায় রমণীবৃন্দে পরিবৃত ছিলেন। চৈতন্যদেব তথায় উপস্থিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করিলে, রাম রায় বলিলেন,— "আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার এরূপ সতর্ক ব্যবহারের কি কারণ?" চৈতন্য বলিলেন,—

আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না যুয়ায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুধাবিন্দুপাতে কেন না করে পরশ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

এক দেবদাসী জয়দেবের পদ গান করিতেছিল। দূর হইতে তাহা শুনিয়া, চৈতন্যদেব উন্মত্তের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়াছিলেন। স্বরূপ তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিলে, চৈতন্যদেব সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—

"স্ত্রী পরশ হইলে মোর হইত মরণ।" এমন কি, নবযৌবনে যখন তিনি অতি চঞ্চলপ্রকৃতি ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন, তখনও

সবে পরস্ত্রী মাত্র, নহে উপহাস,
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ।—চৈতন্যভাগবত

তিনি সকলকে উপহাস করিতেন, কিন্তু রমণীগণের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতেন। এই নির্ম্মলশেফালিকাশুভ্রচরিত্র যখন হরিনামে মত্ত হইয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে উর্দ্ধে প্রেমের স্বর্গ দেখাইয়া দিলেন, তখন প্রেমসাধনায় অগ্রসর বজ্রাচারী শত শত নর-নারীর পিপাসিত হৃদয় যেন প্রকৃতই স্বর্গের অমিয় পান করিতে কৃতার্থ হইল। মানুষ-পূজা ছাড়িয়া দেবতার পূজা করা যায়, চৈতন্য ইহা সপ্রমাণ করিলেন। যে সোপান অবলম্বন করিয়া সাধক স্বর্গে আরোহণ করিবার প্রয়াসী ছিলেন, মহাপ্রভু সে সোপান অগ্রাহ্য করিলেন। কূপোদকে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের যোগ্যতা লাভের চেষ্টা মূর্খতা। একেবারেই সুরধুনী-নীরে অবগাহন করিয়া পবিত্র হও। তোমার গৃহের পার্শ্বে নির্ম্মলসলিলা ভাগীরথী; তাহার তীরে বসিয়া বৃথা কূপ খনন করিতেছ কেন? ঐ কূপে পড়িয়া মরিবারই আশঙ্কা অধিক। এবার চণ্ডীদাসের কবিতা, নরোত্তম দাস ও রঘুনাথ দাস প্রভৃতি রাজসন্ন্যাসীদিগের জীবনভাষ্য দ্বারা সার্থক হইল। রাধিকা রাজকুমারী কুলের গৌরব ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন—কৃষ্ণের জন্য। নরোত্তম ও রঘুনাথ দাসও কি তাহা করেন নাই? চৈতন্য প্রভু এই ভাবে মানুষ-ভজনার পথ অতিক্রম করিয়া একবারেই ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিতেন। তিনি বলিলেন,—

যুবকের আর্ত্তি যথা যুবক দেখিয়া,
সেইরূপ আর্ত্তি আর না দেখি ভাবিয়া।
এ কারণে ভক্তগণ ভাবে যদুপতি
পত্নীভাবে তার প্রতি স্থির করি মতি।—গোবিন্দদাসের কর্চ্চা।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের ইহাই অর্থ।

কিন্তু চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের প্রায় দুই শত বৎসর পরে বজ্রাচারীদিগের 'পরকীয়া' মত পুনরায় বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিল। সেই মত নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্থিমজ্জায় অনুস্যূত ছিল। কালে তাহাই প্রবল হইয়া, বৈষ্ণব সমাজকে 'পরকীয়া' মতে দীক্ষিত করিল। ১১৩৭ সালে মালিহাটী গ্রামে ছয় মাস ব্যাপিয়া বৈষ্ণব-সমাজের যে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়,

তাহাতে 'পরকীয়া'-মত-সমর্থক রাধামোহন ঠাকুরের নিকট বৃন্দাবন ও গৌড়ের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবমণ্ডলী বিচারে পরাভূত হন। এই সভায় নবাব জাফর আলি খাঁনের পক্ষ হইতে নিযুক্ত মুন্সী ফৌজদার আসান খাঁ, মুন্সেফ আসখানী গড়, রামহরি মজুমদার, মুন্সেফ ঘোড়ী শেখ হিঙ্গান ও মহিমপুরের কাজী সদরুদ্দি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-মতের পোষাক বৃন্দাবনের পণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য, কাশীর হরানন্দ ব্রহ্মচারী, তৈলঙ্গ পণ্ডিত রামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনারগ্রামের পণ্ডিত শ্রীরাম বিদ্যাভূষণ ও লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহাদের গৌড় ও বৃন্দাবনের সমস্ত শিষ্য উক্ত ঠাকুরকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। শুধু গৌড়ে নহে, পরকীয়া মতের প্রাধান্য বৃন্দাবনেও স্বীকৃত হয়। বৃন্দাবনে ইহাদের 'ঢাণ্ডা গাড়া' হয়। তদবধি বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে পরকীয়া মতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-সংবলিত দুইখানি দলীলের সম্প্রতি উদ্ধার হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অমা-নিশাথিনী।

১

স্বপ্ত গ্রাম ; দ্বিপ্রহরা অমা-নিশীথিনী,
গাঢ় আলিঙ্গনে তার মূর্চ্ছিতা মেদিনী।
পথ ঘাট নদী মাঠ অরণ্য প্রান্তর
অভেদে মিশিয়া গেছে—কত দূরান্তর!
আলোকে ভূলোকে যেন ছিলাম হারায়ে ;
আঁধারে—আমারে পুনঃ পেতেছি কুড়ায়ে।
মৃদু-গতি হৃৎপিণ্ড, শিথিল শরীর ;
হৃদয় বাসনা-হীন, উদাস, গম্ভীর।
জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কত মনে হয়,—
কি ভীষণ নর-ভাগ্য—চির-নিরাশ্রয়!
কাতর-অন্তরে, ভয়ে, ভাবি বারংবার,
কোথা জীবনের শেষ—সমাপ্তি আমার!

২

বৃথা কূটবুদ্ধি, তর্ক, জ্ঞান-অভিমান।
কারণ-সাগরে সুপ্ত পুরুষ প্রধান;
জন্মিল সয়ম্ভু-হৃদে সৃষ্টির কল্পনা,
কেমনে—কখন—কেন—হয় না ধারণা।
কল্পনার পরিণতি—জন্মিল শকতি,
নাহি জানি,—অন্ধ কিংবা চৈতন্য-মূরতি।
সেই শকতির ক্রিয়া এই ভূমণ্ডল,
দ্রষ্টা দৃশ্য, উভ আমি—কর্ম্ম, কর্ম্মফল।
অবরোহে জীব আমি, অধিরোহ-ক্রমে
লভিব ব্রহ্মত্ব আমি—কত পরিশ্রমে।
নতুবা নিস্তার নাই, জন্মি' বারংবার
সহিতে হইবে মোরে নিজ অত্যাচার।

৩

অদূরে ডাকিল শিবা; চমকিল হিয়া,
নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ উঠিল জাগিয়া।
বক্ষে বিশ্ব-শোষী তৃষা—আজন্ম যন্ত্রণা,
কেন গণ্ডুষের লাগি' কাতর প্রার্থনা?
যে চক্ষে ডুবিছে বিশ্ব প্রলয়-তিমিরে,
কেন তারে রুদ্ধ করি ঘেরিয়া প্রাচীরে?
হে সত্তা—হে পরমাত্মা, এস একবার,
তোমায় আমায় হোক্ সম্বন্ধ-বিচার!
ঘুচে যাক্ দেশ-কাল, পাত্রাপাত্র-ভেদ,
মিলনের সুখশান্তি, বিরহের খেদ!
যাক্ ঘটিকার শব্দ চিরতরে থামি',
সৃষ্টি নাই—স্রষ্টা নাই, নাই তুমি—আমি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

যাদবচন্দ্রের আত্মকাহিনী।

[পূজ্যপাদ পিতামহ যাদবচন্দ্র স্বহস্তে আত্ম-জীবনচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। কোনও কোনও অংশ পাঠকের বিরক্তি-উৎপাদনের ভয়ে পরিত্যাগ করিলাম।—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।]

স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র।

"সন ১২০১ সালে ১৮ই পৌষ তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মাবধি ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতাম, যে হেতু

আমার ধাৎ বড় শ্লৈষ্মিক ছিল। এজন্য স্বর্গীয় পিতামাতা সর্ব্বদা আমাকে নিকটে নিকটে রাখিতেন! সুস্থ সময়ে পাঠশালায় লেখাপড়া করিতাম; কিন্তু গুরুমহাশয় প্রভৃতি আমাকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না।

নবম বৎসরে উপনয়ন হয়। দশম বৎসরে কর্ণমূল ফুলিয়া আমার জ্বর-বিকার হয়। কর্ণমুলে অস্ত্র হইলে গলার ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। এতাদৃশ ঘা হইয়াছিল যে, ঐ রোগে গঙ্গাযাত্রা হেতু উপর হইতে আমাকে বাহিরবাটীতে আনা হইয়াছিল। পরে পরমায়ু থাকায় রক্ষা পাইলাম।

১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কিতাবাদি লেখাপড়া যাহা শিক্ষা হইবার হইল। ১২ বৎসর বয়সে পার্শি পড়িতে আরম্ভ করি। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে উহা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাস পাঠানন্তর উহা ভাল লাগিল না; পুনরায় পার্শি পড়িতে আরম্ভ করিলাম; কৃতবিদ্য হওনের অত্যল্প কাল বাকী থাকিতে, অর্থাৎ অল্লামি, উর্ফি, হাফেজ, এই তিন কেতাব পড়া বাকী থাকিতে আমার হামসরফ (সহপাঠী) এবং পরমবন্ধু বিষ্ণুমোহন মিত্রের ভ্রাতা মথুরমোহন মিত্র ও মধুসূদন মিত্র লোকান্তরে গমন করিলেন। আমার পড়িতে আর ইচ্ছা হইল না। আমি বাটীতে না জানাইয়া ক'লিকাতায় গমন করিলাম; এবং ভগবতীচরণ মিত্রের নিকট পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহপাত্র হইলাম। তিনি পার্শি, ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দুই মাস স্বয়ং আমাকে পড়াইলেন বটে, কিন্তু আমার আর পড়াশুনা ভাল লাগিল না; আমার মন সর্ব্বদা উচাটন থাকিত। পরে বাটী আসিয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত ব্যায়রাম ভোগ করিলাম।

রোগের উপশম হইলে ৺ জগন্নাথদর্শনের ইচ্ছা করিলাম। পিতামাতা প্রভৃতি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কটক অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নারায়ণ-গড়ের সরহদ্দে "ব্রহ্মচারী লালাবান্‌দি"র সন্নিকটে যেখানে রাস্তার উপর পুল আছে, সেখানে পৌঁছিয়া রৌদ্রে কাতর হইয়া পড়িলাম। একখানি ধুতি উড়ানি, আর কাপড়ের খোঁটে কয়েকটি টাকা বাঁধা ছিল। সে সব রাখিয়া জলে নামিলাম। অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া শীতল হওনানন্তর ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিলাম যে, বস্ত্র ও টাকা নাই।

বড় ক্ষুধা হইয়াছিল। পয়সার অভাবে আহার্য্য কিনিতে না পারিয়া হতভম্ভ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা ২।৩ টার সময় কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী ঠাকুরচরণ রায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কটক জেলার রজই

নামক এক আড়ঙ্গের পোস্তানি দারোগা। তিনি আপন কর্ম্মস্থানে গমন করিতেছিলেন। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে?'

উত্তরে আমূল সকল কথা বলিলাম। পরিচয়ও দিলাম! পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া সস্নেহে আমার হস্তধারণানন্তর কহিলেন, 'তুমি কাশীর ভাই! আমার সঙ্গে এস। এই স্থানে লোক ঠেঙ্গাইয়া মারে, তুমি কেমন করিয়া এতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, ইহাই আশ্চর্য্য।'

পরে রজই পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় পাঁচ ছয় দিন রাখিয়া লোক সঙ্গে দিয়া ভদরক মোকামে দাদার নিকট পাঠাইলেন। দাদা আমার প্রতি দৃষ্টিমাত্র বুঝিলেন, আমি বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন।

কয়েক রোজ ভদরকে থাকিয়া কটকে গেলাম। তথায় বিশ্বমোহন মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন; জানিলেন, মথুরের বন্ধু যাদব। অনেক রোদন করিলেন। দুই দিবস আমাকে দেখিতেন না; ভিন্ন ঘরে, মথুরের প্রতি যে স্নেহ ছিল, সেই স্নেহে রাখিলেন।

কয়েক দিবস পরে শোক শান্ত হইলে তিনি আমাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। সদরআলা জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা নীলমণি আর তাঁহার পারিষদ নবীন গাঙ্গুলী, নমকির দেওয়ানের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বসু ও হরিহর রায় প্রভৃতি কয়েক জন শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন। আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আমার ইপ্সিত শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলাম।

জগন্নাথদেবের রত্নদেবীর চতুষ্পার্শ বড় অন্ধকারময়। লোকের ভিড়ও খুব। প্রদক্ষিণ করিবার সময় আমার দম বন্ধ হইয়া আসিল। কম্পিত-কণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিলাম, 'নীলমণি দাদা, আমি মরিলাম'

নীলমণি ও নবীন বড় জোয়ান ও সাহসী। তাঁহারা সেই রত্নদেবীর দেয়ালে আমাকে ঠেলা দিয়া রাখিয়া দুইজনে দুই দিকে হস্ত প্রসারিয়া দাঁড়াইলেন। সে স্থানে কেহ আসিতে পারিল না। পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। তখন আমার সঙ্গীরা আমাকে শূন্যভরে লইয়া অক্ষয় বটতলায় ফেলিলেন। অনেকক্ষণ জল সেচন ও ব্যজন করিতে

করিতে আমার চৈতন্য হইল। আমার সঙ্গীদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে দিবস আমার প্রাণরক্ষা হইল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে দাদার কর্ম্মোন্নতি ঘটিল। তাঁহার সেই পদে আমি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে নিযুক্ত হইলাম। হরিনাথ মিত্র সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর। এই আঠার বৎসর বয়সে আমি বৈতরণী নদীর কিনারায় যাজপুর মোকামে নমক-চৌকীর দারোগা হইলাম। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে একবার কিছুদিনের জন্য দাদার কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হই। ঘোড়ায় চড়িয়া আমায় তদারক করিতে হইত। একদিবস তদারকে বহির্গত হইয়াছি। কোনও এক সরাইয়ের কিঞ্চিৎ দূরে একটা কাঁটা-জঙ্গল ছিল। ঘোড়া ক্ষেপিয়া সেই জঙ্গলে আমাকে ফেলিয়া দিয়া একটা পদাঘাত করিল; দ্বিতীয় পদাঘাতসময়ে তাহার কদমে কি বাজিল, সে কাত হইয়া অন্য দিকে পড়িল। আমার সঙ্গী চাপরাশী ছুটিয়া আসিয়া আমার অবস্থা দেখিল—ডাকিল, উত্তর পাইল না। পরে কাঁটা জঙ্গল কাটিয়া আমাকে বাহির করিয়া সরাইতে লইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইল। কয়েক দিবস তথায় থাকিলাম। ঘোড়া ত্যাগ করিলাম। ঘোড়া আর দুই এক কদম মারিলে বাঁচিতাম না, দিগম্বর মিত্রের পুত্রের ন্যায় হইতাম।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে বালিহস্তায় বদলী হইলাম। প্রবাদ আছে, এইখানে বালি রাজার মৃত্যু হয়। এই চৌকীতে আসিতে না আসিতে শুনিলাম, সমুদ্রের লোণা সৈবালিতে দরিয়া-কিনারায় অনেক মানুষ গরু ভাসিয়া যাইতেছে। তাতে সরকারি নমকের ক্ষতি হয়। আড়ঙ্গ মুড়ামালঙ্গ ও সাত-ভেয়ে, তাহারই তদারকের ভার আমার প্রতি অর্পণ করা হয়। আমি মুড়ামালঙ্গে পৌঁছিয়া তিন শত মণ চোরাই নমক মায় কিস্তি গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। দরিয়ার এক স্থানে যথায় মাইপহরা নামক বাতিঘর আছে, তাহারই সন্নিকটে দরিয়ার উপকূলে মুড়ামালঙ্গ।

*　*　*　*

কটক পৌঁছিলে চার্লস বিচর সাহেব এজেণ্ট আমার প্রতি তুষ্ট হন। সেই সময় বিষ্ণুমোহন মিত্র (ভদরক মোকামের রিটেল গোলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) কর্ম্ম হইতে অপসৃত হন। সাহেব আমাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত

করেন। কিছুদিন কাজ করিবার পর কটক জেলা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল, ভদরক রিটেল পোলা বালেশ্বর জেলার সামিল হইল। সার্ জন্ ডাউনি সাহেব তথাকার এজেণ্ট হইলেন! অস্করি ফেক্‌য়ত নামক কোনও ব্যক্তি দেওয়ান হইলেন। তিনিই কর্ত্তা,। তিনি আসিয়া দেখিলেন ভদরক গোলা বড় উপার্জ্জনের স্থান। তখন তিনি আমাকে বরখাস্ত করিয়া আমার স্থানে তাঁহার ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া এক রোবকারী লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন, যাদবচন্দ্র বালক এবং অনুপযুক্ত, এতাদৃশ ভারি কর্ম্মের যোগ্য নহেন। আমার বদলী দারোগা আসিয়া পৌঁছিল। আমার জিম্মায় তহবিলে তখন সাত আট হাজার টাকা ছিল। তহবিল বুঝিয়া লইবার সময় নূতন দারোগা আপন তসবি অর্থাৎ জপের মালায় সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম, কাগজ কলমে না লিখিয়া জপের মালায় সংখ্যা রাখিলে ভুল হইবে তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অবশেষে টাকার রসিদ দিবার সময়, তিনি দস্তখতের স্থানে নামের মোহর করিয়া কহিলেন, 'আমরা এইরূপে দস্তখত করিয়া থাকি, তুমি রিপোর্ট করিলে জানিতে পারিবে।'

আমি ঐ রসিদ রিপোর্টসহ পাঠাইলাম, তাহাতে লিখিলাম যে, 'আমার স্থানে যে ব্যক্তি আসিয়াছেন তিনি তহবিলের টাকা বুঝিয়া লইবার সময় জপের মালায় সংখ্যা রাখেন, এবং রসিদে দস্তখত না করিয়া নামের মোহর দিয়াছেন। ইহা হুজুরে মঞ্জুর হইবে কি না জানি না।' তখন উইলিয়ম বেলেণ্ট সাহেব কমিশনর ছিলেন। তিনি আমার রিপোর্ট পাইয়া আমাকে তলব করিলেন, এবং আমার সাক্ষাতে উইলি সাহেবকে বলিলেন, 'এই ব্যক্তিকে সারথা আড়ঙ্গে পোক্তানি দারোগাগিরি কর্ম্মে বাহাল কর।'

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমি সারথা আড়ঙ্গে বাহাল হইলাম। তথায় একদিন ডোঙ্গায় করিয়া একটা লোণা নদী পার হইতেছিলাম, সহসা ডোঙ্গা উল্টাইয়া ডুবিয়া গেলাম। মাঝি রক্ষা করিল, নতুবা সে যাত্রা মরিতাম। ১৮২৪ সালে দসমলঙ্গ আড়ঙ্গে, ১৮২৫ সালে অন্য একটা আড়ঙ্গে বদলী হই। তৎকালে ব্রজোমোহন ঘোষাল নমকির দেওয়ান। তাঁহার অত্যাচারে আমি তিষ্ঠিতে না পারিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বাটী আসিয়াছিলাম। ১৮২৭ সালে ডাউনি সাহেব আমাকে তলব করিয়া মলঙ্গ আড়ঙ্গের দারোগাগিরি কর্ম্ম দেন। তথায় ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করি। ঐ সময় হেন্‌রী রিকেট সাহেব বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট কলেকটার ছিলেন। ব্রজমোহন ঘোষালের

দৌরাত্ম্যের কথা তিনি অবগত ছিলেন। এমন সময় ডাউনি সাহেব বদলী হইলেন, এবং রিকেট সাহেব তাঁহার স্থানে নমকির এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। নিমকি এলাকায় ছোট বড় ছয় শত কর্ম্মচারী ছিল, প্রায় সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হইলেন, ব্রজমোহন সস্পেণ্ড হইলেন। ব্রজনন্দ দাস নামে এক জন বাঙ্গালী দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। আমিও অপরধীর মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু বিচার হয় নাই।

আমার অপরাধের বিচার জন্য রিকেট সাহেব আমাকে বালেশ্বরে তলব করিলেন, আমি তিন শত বেহারা মালঙ্গি লইয়া হাজির হইলাম। আমার মুহুরী দুই জন ভয়ে হাজির হইল না। সাহেব আমায় জিজ্ঞসা করিলেন, "তুমি ঘুষ লইয়া থাক?"

উত্তর। না; আর ঘুষ লইয়া কে কোথায় স্বীকার করিয়া থাকে?

সাহেব আরও রাগিয়া কহিলেন, 'হলপানে হলপ করিয়া বল।'

আমি উত্তর করিলাম, 'মহাপ্রসাদ বা গঙ্গাজল যবন-স্পৃষ্ট হইলে মহত্ত্ব হারায়। এ হলপ লইয়া শতবার বলিতে পারি, যে হেতু ইহার মহত্ত্ব নাই। কিন্তু আসল হলপ, আপনি ধর্ম্মস্বরূপ, আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা বলা যায়, তাহা অপেক্ষা অন্য হলপ বড় নয়, শাস্ত্রে এইরূপ বলে।'

সাহেব। তুমি কি পণ্ডিত?

আমি। পণ্ডিত নহি, পণ্ডিতসমাজে বাস করি।

সাহেব। মণ্ডলঘাট পণ্ডিতসমাজ?

আমি। মণ্ডলঘাটে পণ্ডিত লোক আছে বটে, কিন্তু চাষা-গ্রাম। আমার বাসস্থান গঙ্গার ধারে—হুগলীর নিকট। তথায় অনেক পণ্ডিত ও সভ্যলোক আছেন।

সাহেব। ব্রজমোহন ঘোষাল তোমার কে হয়?

আমি। কেহ নহে—আমার সঙ্গে কোনও সুবাদও নাই।

সাহেব। তোমাকে কে চাকুরী দিয়াছে?

আমি। কটক জেলার এজেণ্ট চার্লস বিচর সাহেব।

সাহেব। কত দিন চাকরী করিতেছ?

আমি। দশ বৎসর।

হলপ মকুফ হইল। দাদন করিতে করিতে সাহেব মালঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ১৬ কুত্তি খোরাকী নমক পাও; তাহা ওজনে

৮/ মণ। আর গাছা নমক ৮/মণ পাও। এই ১৬ মণ নমক তোমরা কি কর?"

উত্তর। আমরা খাইয়া থাকি।

সাহেব সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি বলিলাম, "মালঙ্গী লোক আপন আপন প্রাপ্য নমক এক বিন্দুও খায় না; পোক্তানী নমক হইতে দৈনিক খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। খোরাকী নমক বিক্রয় করে।"

সাহেব। তোমার জানত বিক্রয় হয়?

আমি। হাঁ; বরং আমি আপন দস্তখত মোহরে ছাড়-চিঠি দিয়া বিক্রয় করাই

সাহেব। সরকারের চাকর হইয়া তুমি এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাক? তোমায় সস্‌পেণ্ড করিলাম।

আমি। আপনি সব করিতে পারেন, কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করিতে দিতে আজ্ঞা হয়।

সাহেব। কি, বল?

আমি। মালঙ্গী লোক অতি দুঃখী; পরিধানে বস্ত্র নাই—একটুকরা ন্যাকড়া অবলম্বন; দেহে বা কেশে তেল নাই—রূক্ষ অপরিস্কার; আহার্য্য — ভাত, পুঁইডাটা, কাঁকড়া, আর লবণ। আট মাস পোক্তানে থাকে, চারি মাস ছুটী পায়। এই চারি মাস ঘরে গিয়া চাষ করে। জমীদার খাজনার জন্য পীড়ন করিলে চাষের ধান্য বিক্রয় করিয়া খাজনা দেয়। তখন আহারের উপায় আর থাকে না। * * যে সকল স্থানে নমক দুষ্প্রাপ্য, অথবা মহার্ঘ, সেই সকল স্থানের মালঙ্গীর নামে আপন দস্তখত মোহরে ছাড়-চিঠি লিখিয়া দিয়া থাকি। ইহা অমুক আইনের অমুক ধারার বিধান অনুসারে অবিধি নয়। ফলে তাহারা বিক্রয়লব্ধ অর্থে জমীদারের খাজনা দিতে এবং পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়। * * *

রিকেট সাহেব প্রজাপালক, ন্যায়বান্; তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি তীক্ষ্ণনয়নে চাহিয়া মালঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা এই দারোগাকে ঘুষ দিয়া থাক? আর ইহার উপর তোমাদের কোনও নালিশ আছে?"

সকলে এক-জবানে কহিল, "কোনও নালিশ নাই—আমরা ঘুষ দিই না।"

তিন জন মালঙ্গী কহিল, "এক দিবস আমরা দৈনিক খাইবার নমক

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়।

(এক এক সের হইবেক) লইয়া যাইতেছিলাম। দারোগা তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোক করিয়া লইলেন ; এবং চাপরাশী মহসিল দিয়া বালেশ্বর লইয়া যাইবার হুকুম দিলেন। পরে চাপরাশীকে চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন। চাপরাশী আমাদিগকে সরকারী গোলায় লইয়া গিয়া আপনার খাবার নমক হইতে তিন জনকে তিন সের নমক দিল ; এবং আমাদিগকে বাটীতে রাখিয়া আসিয়া কহিল, 'এমত কর্ম্ম আর করিও না।' অন্য মালঙ্গীরা ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল, তাদের কিছু হ'ল না। আমরা ধরা পড়িলাম, তাই এ শাস্তি। অতএব ইনি পক্ষপাত '

সাহেব হাস্যসংবরণ করিয়া গম্ভীরবদনে কহিলেন, 'তবে দারোগা বাবুকে এখানে আর রাখিব না।'

কথিত তিন জন মালঙ্গী শ্রবণমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল, এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল, বলিল 'এ দারোগা না থাকিলে আমরা পোক্তান করিব না।'

এই কথা শুনিবামাত্র তিন শত মালঙ্গী একেবারে হরিবোল দিয়া উঠিল। সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এই দারোগা তোমাদের থাকিবেক।' পরে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তুমি অন্য মাজুল হইতে, কিন্তু তুমি প্রজা-পালক ও সত্যবাদী ; যদি তোমার কোনও অপরাধ থাকে, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম ' তুমি ব্রজমোহন ঘোষালের আত্মীয় হইলে ক্ষমা করিতে বোধ হয় পারিতাম না। আগামী সালে তোমায় বড় আড়ঙ্গের কর্ম্ম দিব। তুমি ৮ মাস কর্ম্ম করিয়া ৪ মাস আমার হুজুরে হাজির হইবে। বিটেল গোলার নমক চালানি, যাহা ব্রজমোহনের ছিল, তাহা তোমাকে দিলাম ; ইহাতে বৎসরে দেড় হাজার টাকা কিফাত পাইবা।'

* * * *

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের কালেক্টরী তহবিল তছ্রূপাত হইল। খাজাঞ্চীকে বরতরফ করিয়া কালেক্টার ইষ্টেনী ফোরত সাহেব গঙ্গাপ্রসাদ গোঁসাইকে খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্ম দিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্ট ইষ্টেনী ফোরত সাহেবকেও সরাইলেন। তাঁহার স্থানে ডনেলী সাহেব আসিলেন। রিকেট সাহেব কমিশনর হইলেন, তিনি ডনেলী সাহেবকে আদেশ করিলেন, 'গোঁসাইকে তাড়াইয়া যাদবচন্দ্রকে সেই স্থানে নিযুক্ত করিবে।'

১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সাল দুই বৎসর খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্ম করিলাম। ডনেলী

সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া হেডকেরাণী জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার নাম কমিশনরের নিকট পাঠাইয়া ডিপুটী কলেক্টরের পদের জন্য রিকমেণ্ড করিলেন। রিকেট সাহেব জগবন্ধু নাম কাটিয়া আমাকে রিকমেণ্ড করিলেন। ১৮৩৮ সালে জানুয়ারী মাহায় আমি ডিপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলাম।

১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর, হিজলী ও অন্যান্য স্থানে বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাহায় চব্বিশ-পরগণায় বদলী হইলাম। একবার খাড়িজুড়ি বন্দোবস্ত করিতে গিয়া বনের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। বাঘ ১০।১২ হাত তফাতে ছিল। সঙ্গের লোক চীৎকার করাতে বাঘ পলাইয়া গেল।

১৮৫২ সালে বর্দ্ধমানে বদলী হই। ১৮৫৩ সালে হুগলী আসি। তথা হইতে আবার বর্দ্ধমান। অবশেষে ১৮৫৭ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি। পেন্‌সন্ হয় মাসিক ২২৫৲ টাকা। এক্ষণে আমার চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—ডিপুটী কলেক্টর; মধ্যম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র—ডিপুটী কলেক্টর, পরে রেজিষ্ট্রার; তৃতীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র—ডিপুটী কলেক্টর; চতুর্থ শ্রীপূর্ণচন্দ্র রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত আছেন। ৪২ বৎসর চাকরী করি। এক্ষণে আমার বয়স ৭৯ বৎসর! ইতি ১৫ই বৈশাখ, ১২৭৯ সাল।"

১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ কৃষ্ণাদশমী তিথিতে পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাচ।

পুরাকালে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল কি না, এই বিষয়ে শিক্ষিতসমাজে মতভেদের অভাব নাই। অনেকে কাচকে পাশ্চাত্য জাতির উদ্ভাবিত আধুনিক শিল্প বলিয়া মনে করেন, এবং "কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাদ্ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্"—ইত্যাদি প্রাচীন শ্লোকে উক্ত "কাচ"কে স্ফটিকের নামান্তর বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আপাততঃ এই মতের খণ্ডন কঠিন

আত্মজীবনচরিতের কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। স্থানে স্থানে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সকল শব্দ পড়িতে না পারায় এরূপ করিতে হইয়াছে। —শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, স্বচ্ছতা, বিম্বগ্রাহিতা প্রভৃতি গুণ স্ফটিকে চির-প্রসিদ্ধ। কাচেও এই সকল গুণ বর্ত্তমান। সুতরাং স্ফটিক হইতে কাচের স্বতন্ত্র সত্তা কেবল স্বতন্ত্র নাম দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কিন্তু একটু প্রণিধান-সহকারে পুরাতন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অনায়াসে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। সুশ্রুত-সংহিতায় (১) বিভিন্ন অর্থে একই স্থলে কাচের ও স্ফটিকের উল্লেখ দেখা যায়। কাদম্বরী গ্রন্থে (২) "স্ফটিকোপল" শব্দে স্ফটিক প্রস্তরবাচক "উপল" শব্দের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গরুড় পুরাণে (৩) কাবের প্রভৃতি দেশ স্ফটিকের আকর-রূপে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্ফটিক এক শ্রেণীর উপল মাত্র। চিকিৎসাশাস্ত্রে "কাচ" ক্ষার পদার্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। অমরকোষের মতেও "কাচ" ও ক্ষার এক পদার্থ। পাশ্চাত্য দেশের লোকেও ক্ষারবিশেষের দ্বারাই কাচ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের সাহিত্যে উল্লিখিত কাচের, এবং পাশ্চাত্য সমাজে প্রচলিত কাচের উপাদানগত কোনরূপ পার্থক্যের উপলব্ধি হয় না। "কাচ" নিতান্ত ভঙ্গপ্রবণ; এই হেতুই, "কাচমুল্যেন বিক্রিতো হন্ত চিন্তমণির্ম্ময়া" ইত্যাদি পুরাতন কবিতায় "কাচ" তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নেপালাধিপতি মহারাজ প্রতাপসিংহ সাহের কৃত পুরশ্চর্য্যার্ণব গ্রন্থে ধৃত তন্ত্রান্তর-বচনে ৪) কাচপাত্রের ও স্ফটিকপাত্রের স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখা যায়। কুলার্ণবতন্ত্রেও (৫) কাচপাত্রের উল্লেখ আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের কৃত ইণ্ডোএরিয়ান্ গ্রন্থে কলিকা-পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত

---

(১) "কাচস্ফটিকপাত্রেষু শীতলেষু শুভেষু চ।—সুশ্রুত-সংহিতা

২) অবাপমধ্যে স্ফটিকোপলোপমম্।—কাদম্বরী।

(৩) "কাবের-বিন্ধ্য-যবন-চীন-নেপালভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ॥—গরুড় পুরাণ; পূর্ব্বভাগ।

(৪) পাত্রং কাঞ্চন-'কাচ'-রূপ্যজনিতং মুক্তাকপালোদ্ভবম্।
বৈশ্বামিত্রমুদঞ্চ কামদমিদং হৈমং প্রিয়ং স্ফাটিকম্, ইত্যাদি।—পুরশ্চর্য্যার্ণব।

(৫) অথবা বর্ত্তুলাকারং কুর্য্যাদ্দেবি মনোহরম্।
স্বর্ণরৌপ্যশিলাকূর্ম্মকপালালাবুমৃণ্ময়ম্
নারিকেলশঙ্খমুক্তাশুক্তি 'কাচ' সমুদ্ভবম্।
পুণ্যবৃক্ষকৃতং রম্যং পাত্রং দেবি প্রকল্পয়েৎ।—কুলার্ণবতন্ত্র।

হইয়াছে, তাহাতেও কাচের ও স্ফটিকের বিভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :—

জলপাত্রন্তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতম্।
পবিত্রং শীতলং পাত্রং ঘটিতং স্ফটিকেন চ।
কাচেন রচিতং তদ্বৎ তথা বৈদূর্য্যসম্ভবম্॥
তৎ পানপাত্রং ভূপানাং তজ্‌জ্ঞেয়ং চষকং বুধৈঃ।
কানকং রাজতঞ্চৈব স্ফাটিকং কাচ মেবচ॥

প্রাকৃত ভাষায় এই কাচ শব্দ 'কচ্চ' রূপে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত "কর্পূরমঞ্জরী" নামক সট্টকে 'কচ্চ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—"কচ্চং মাণিক্কং চ সমং আহরণে পউঞ্জী অদী" (৬) ইহার অর্থ এই যে, কাচ ও মাণিক্য, এই উভয় পদার্থকে একত্র আভরণে প্রযুক্ত করা হইতেছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রসঙ্গে কাচকুম্ভের (৭) উপযোগিতা স্পষ্ট ভাষায় কথিত হইয়াছে। কাচ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া কুম্ভ অর্থাৎ বোতল প্রস্তুত করা হইত। সুতরাং কাচের দ্রবীকরণ ও ছাঁচে পাতনপ্রণালী অতিপুরাকালেই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কাচের চাকচিক্যে সভ্যজগৎ প্রোদ্ভাষিত। কাচের গ্লাস প্রভৃতি বিবিধ পাত্র অনেকেই ব্যবহার করেন। কাচপাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়া উচ্ছিষ্ট হইলে আর শুদ্ধ হয় না, অনেকেই এইরূপ নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। এই কারণেই কাচের চুড়ী ব্যবহারের পক্ষেও এইরূপ দোষারোপ হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে কাচ উচ্ছিষ্ট হইলেও মৃতপাত্রের ন্যায় পরিত্যজ্য নহে; স্বর্ণপাত্রের ন্যায় জল দ্বারা ধৌত করিলেই শাস্ত্রানুসারে ইহার শুদ্ধি সম্পাদিত হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্রের কৃত শুদ্ধিচিন্তামণি গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখা যায়। যথা,—

অশ্মনাং কাচভাণ্ডনাং হৈমানামিব শোধনম্।
নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডং জলেনৈব বিশুধ্যতি॥

এই বচন অঙ্গিরা মুনির। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বাচস্পতি মিশ্রের মত অনেক স্থলেই উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণে এই বচনটি উদ্ধৃত হয় নাই; এবং তিনি কাচ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেন নাই। তাহাতে

---

(৬) কর্পূরমঞ্জরী; ১ম অঙ্ক।

(৭) তৎকাচকুম্ভে নিহিতং প্রগাঢ়ম্।—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

বোধ হয়, বঙ্গদেশে ঐ সময়ে কাচের ব্যবহার একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; প্রয়োজনের অভাবেই ইহার কথা উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু অঙ্গিরা ঋষির বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা আর্য্য মহর্ষিগণ সমাজের কল্যাণকামনায় স্ব স্ব মত সংহিতাকারে প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই অতিপুরাতন যুগেই, গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কাচপাত্রও প্রচলিত হইয়াছিল। নতুবা অঙ্গিরা ঋষি কাচের শুদ্ধিকথনের প্রয়াসী হইতেন না। স্মৃতিনিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র ও ষড়দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতি মিশ্র, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী। কারণ, তিনি শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডনখণ্ডগ্রন্থের বিরুদ্ধে "খণ্ডনোদ্ধার" নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "দ্বৈতনির্ণয়" নামক স্মৃতিনিবন্ধের উপক্রম-পাঠে জানা যায়, রাজাধিরাজ পুরুষোত্তম দেবের মাতা (৮) এবং শ্রীভৈরবেন্দ্র ক্ষমাপতির ধর্ম্মপত্নী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তিনি "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বংশানুক্রম।

২

যিনি বলিয়াছিলেন,—"বহু স্যামঃ," তিনি এক ছিলেন, বহু হইয়াছেন। এ জগতে প্রকৃতপক্ষে সব-ই এক, কিন্তু কত বহুবিধ। সুতরাং সাদৃশ্য আছে;

সাদৃশ্য ও বৈষম্য।

আর তাহারই মধ্যে বৈষম্য আছে। পুত্র পিতামাতার ন্যায় হয়, কিন্তু ঠিক্ তাঁহাদের তুল্য হয় না; দেহেও নয়, মনেও নয়। এক পিতার পাঁচ পুত্র কত বিভিন্ন, একটি গাছের পাঁচটি ফলে কত প্রভেদ। একটি বৃক্ষের বহুপত্র প্রথম দর্শনে সমানই বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিলে নানা প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য ও বৈষম্য কেবল চেতন পদার্থেই লক্ষিত হয়, এমন নহে; অচেতনের মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অম্লজান ও ওজোন সম-ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী; তেমনই ক্লোরিণ,

(৮) শ্রীভৈরবেন্দ্রধরণীধরধর্ম্মপত্নী রাজাধিরাজপুরুষোত্তমদেবমাতা।
বাচস্পতিং নিখিলতন্ত্রবিদং নিযুজ্য দ্বৈতে বিনির্ণয়বিধিং বিধিবত্তনোতি॥

ব্রোমিন্ ও আইওডিন্; তেমনই গন্ধক, সিলেনিয়াম্ ও টিলেরিয়াম্ ইত্যাদি। দুই দানা মিছরী, দুই খণ্ড কয়লা, দুইটি হীরা, দুইটি প্রস্তর, দেখিতে প্রথমতঃ এক বোধ হইলেও, কত বিভিন্ন, তাহা পরীক্ষায় জানা যায়। সুতরাং বৈষম্য কেবল জীবের ধর্ম্ম নহে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিষম, অথবা বিচিত্র। বৈষম্যই যেন প্রধান নিয়ম। কিন্তু তাহারই মধ্যে সাদৃশ্যও বিদ্যমান। দুইটি মনুষ্য বিভিন্ন হইলেও, একই আকৃতি। সেই সাদৃশ্য দ্বারা গো, মেষ, মহিষ হইতে তাহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানা যায়। আবার দুইটি পর্ব্বত বিভিন্ন হইলেও, পর্ব্বত হিসাবে উহারা একই; সমতা দ্বারাই উহাদিগকে নদী হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য বিচিত্র পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য উভয়ই আছে। কাহারও সহিত কাহারও সাদৃশ্য অধিক, অপরের সহিত অল্প। মনুষ্যে মনুষ্যে সাদৃশ্য অধিক, কিন্তু মনুষ্যে ও অশ্বে আদৃশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প; আর পিপীলিকার সহিত সাদৃশ্য আরও অল্প। অম্লজানের সহিত ওজনের সাদৃশ্য অধিক, কিন্তু ক্লোরিন্ অথবা ব্রোমিনের সাদৃশ্য অল্প। এইরূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে যে জগতের সমস্ত পদার্থ যদি একটি তালিকা-ভুক্ত করা যায়, তবে ঐ তালিকার লিখিত কতিপয় বস্তুকে অধিক সাদৃশ্যবশতঃ এক জাতি, অপর কতিপয় পদার্থকে অন্য জাতি, এইরূপে শ্রেণীবিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাদৃশ্য যত অধিক হয়, তদনুসারে কতকগুলিকে এক এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া যাহাদের মধ্যে যত অল্প সাদৃশ্য থাকে, তাহাদিগকে অন্য শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই অনুসারে দল অথবা ভাগগুলিও ছোট বড় হইবে।

এ স্থলে বিড়ালের কথা মনে করা যাউক। দেশী বিড়াল, বিলাতী বিড়াল, লাঙ্গূলহীন বিড়াল, সলাঙ্গূল বিড়াল,—নানাপ্রকার বিড়াল আছে। ইহাদিগের মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাকে প্রকার-ভেদ বলিব। কি ইহারা সকলেই বিড়াল-জাতি। আবার সকলেই জানেন, বিড়াল বাঘের মাসী; ব্যাঘ্র ও সিংহের সহিত তাহার দেহের সাদৃশ্য স্পষ্টই দেখা যায়। সুতরাং সিংহের বিভাগে তাহাকে ধরা যাইতে পারে; কিন্তু বিড়ালদিগের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ, সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। এই অধিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও কতিপয় সাদৃশ্য লইয়া উহাদিগের সহিত তাহাকে যে বড় বিভাগে ফেলা যায়, তাহাকে 'গণ' বলিব।

আবার বিড়াল ও সিংহ ব্যাঘ্র সকলেই আম-মাংসাশী ; সুতরাং কুকুর ভল্লুক উদ্ (otter), শীল প্রভৃতি অন্যান্য হিংস্র আম-মাংসাশী স্থলচর ও জলচর জন্তু লইয়া ইহাদিগকে আরও বড় এক বিভাগের অন্তর্গত করা যায়। তাহাকে 'শ্রেণী' বলিব। কিন্তু এই বৃহত্তর শ্রেণীর সকলেই স্তন্যপায়ী ; অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তু (গো, অশ্ব প্রভৃতি) লইয়া আরও বৃহত্তর স্তন্যপায়ী শ্রেণীর গঠন করা যায়। কিন্তু এই সকল জন্তু ও পক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্যদিগকে এক সঙ্গে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাদিগের সকলেরই মেরুদণ্ড আছে ; এই সাদৃশ্য দ্বারা পিপীলিকা, পতঙ্গ, জোঁক, কেঁচো ইত্যাদি হইতে ইহাদিগকে পৃথক করা যায়। এই ভাগকে মেরুদণ্ডযুক্ত বিভাগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা ও উল্লিখিত পিপীলিকা আদি সকলেই জন্তু ; উদ্ভিদ নহে। সুতরাং ইহাদিগের সকলকেই 'জন্তু' নাম দেওয়া যাইতে পারে। আবার ইহারাও জীব, উদ্ভিদও জীব ; সুতরাং উভয়কে লইয়া 'জীব-রাজ্য' বলা যায়। এইরূপ বিভাগ করিয়া প্রাণিতত্ত্বের ভাষায় বিড়ালকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত মত বিভাগ করিতে হয়।—
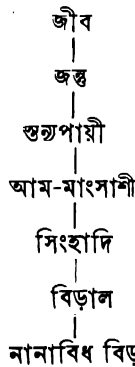
কেবল জীব বলিলে জগতে বিড়ালের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় না, জন্তু বলিতে হইবে। তাহাতেও হইবে না, স্তন্যপায়ী, আমমাংসাশী, তৎপরে সিংহাদি, তৎপরে (গৃহপালিত) বিড়াল—এত কথা বলিলে পর তাহার স্থাননির্দ্দেশ করা যায়। যাহা হউক, স্থূল কথা এই যে, কতিপয় সাদৃশ্য লইয়া চেতন অচেতন সকল পদার্থকেই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা যায়, তদপেক্ষা অল্প সাদৃশ্যে গণ, তদপেক্ষা অল্প সাদৃশ্যে শ্রেণী, এইরূপ যতই সাদৃশ্য কমিবে, ততই বৃহত্তর বিভাগ হইবে। সুতরাং বৈষম্যও বাড়িবে। সাদৃশ্য কমিলেই ক্রমে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটিবে।

সমস্ত পদার্থেরই এইরূপ যে সকল সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখা যায়, তাহা ঐ সকল পদার্থগত অথবা ব্যক্তিগত। কিন্তু চেতন পদার্থের বংশপরম্পরা আছে। এক বংশের সহিত তাহার পরবর্ত্তী বংশের যে সাদৃশ্য (অথবা বৈষম্য) লক্ষিত হয়, তাহাই বংশানুক্রম-পদ বাচ্য। এই অর্থে পিতা পুত্রে যে সাদৃশ্য (ও বৈষম্য ', তাহাই বংশানুক্রম ; অন্যবিধ সাদৃশ্য বৈষম্য বংশানুক্রম নহে। বংশগত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের তথ্য অবগত হওয়াই আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইহা কেন হয়? ইহার কারণ কি? বংশানুক্রম কত প্রকার? পুত্র কি পিতার সকল লক্ষণই প্রাপ্ত হয়? যদি না হয়, কোনগুলি প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি হয় না? পরিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে বংশানুক্রমের গতি কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অথবা নির্দ্দিষ্ট হয় কি না? এ সকলের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ফল কি? ইত্যাদি বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পিতৃপুরুষের লক্ষণ অপত্য প্রাপ্ত হওয়ার নাম বংশানুক্রম। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রম বলিতে বংশপরম্পরার সাদৃশ্যই বুঝিতে হয়। বৈষম্য বংশানুক্রমের ব্যাঘাতমাত্র। যেখানে বৈষম্য অধিক, যেখানে বংশানুক্রম প্রবল নহে? এবং যেখানে বংশানুক্রম প্রবল, সেখানে বৈষম্য অধিক নহে। পিতার ন্যায় হস্ত,পদ, চক্ষু, নাসিকা ইত্যাদি পুত্র প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহা বংশানুক্রম। কিন্তু পিতা ব্যায়াম অভ্যাস করায় তাঁহার বাহুযুগলের পেশী দৃঢ় হইলে, তাহাও কি পুত্র পাইবে? পিতা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকিলে, পুত্রও কি ঐ ভাষার জ্ঞান লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে? না, তদ্রূপ হইতে দেখা যায় না; এবং অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তাহা হইতেও পারে না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সকল লক্ষণ বংশানুগত হয় না। অপত্য শুক্র-শোণিত হইতে জাত হয়। সুতরাং যে সকল লক্ষণ শুক্রশোণিত-গত, তাহাই বংশানুগত হয়; অন্য কিছুই বংশানুগত হয় না। কিন্তু কিরূপ পরিবর্ত্তন শুক্রশোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে? এক্ষণে যত দূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে বিবেচনা হয় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাবশতঃ যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা বংশানুগত হয় না? অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীস্থ জীবে তদ্রূপ হইবার প্রমাণাভাব। এই হেতু পিতার ব্যায়ামলব্ধ দৃঢ়পেশী পুত্র প্রাপ্ত হয় না, পিতার ইংরেজী শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না। মুসলমানগণ শিশ্নের ত্বক্‌চ্ছেদ কার্য্য বহু শতাব্দী করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অপত্যের শিশ্নত্বক যেরূপ ছিল, অদ্যাপি তাহাই আছে। চীনদেশে বহুকাল হইতে নারীদিগের পদ চেষ্টা করিয়া ছোট

করা হইতেছে; কিন্তু অদ্যাপি কোনও কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহার পদ পুত্রের পদের তুলনায় হ্রস্ব হইল না। তা'র পর মন ও বুদ্ধির কথা বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, ভাষা-ব্যবহার যদিও মন ও বুদ্ধির উৎকৃষ্ট ফল, তথাপি মানব বহু যুগযুগান্তর হইতে ভাষা ব্যবহার করিবার পর, এখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে, কেবল জন্মবশতঃ ভাষা ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ, বহুকাল অভ্যাসের পরও ভাষা বংশানুগত হইল না। এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিতেছেন যে, দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিবর্ত্তনই কেবলমাত্র অভ্যাসলব্ধ অথবা চেষ্টালব্ধ হইলে, উহা বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় না। কেবল যে সকল পরিবর্ত্তন শুক্রশোণিতকে স্বভাবতঃ আশ্রয় করে, অথবা শুক্রশোণিতমধ্যে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাই বংশানুগত হইয়া থাকে।

এই তথ্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিবার ফলে নানারূপ অদ্ভুত ধারণা উৎপন্ন হইয়াছিল। গর্ভাবস্থায় কোনও নারী যদি কোনরূপ উৎকট চিন্তা করিলেন, বংশানুক্রমের বিধান অনুসারে অপত্য তাহাও প্রাপ্ত হইল; কোনও নারী ঐ অবস্থায় কাহারও মূর্ত্তি চিন্তা করিলেন, পুত্র তদাকৃতি প্রাপ্ত হইল। এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস এক্ষণে আর স্বীকার করা যায় না; তবে মাতার দুশ্চিন্তা হেতু রক্ত-চলাচলের ব্যাঘাত হইলে ভ্রূণ-দেহের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। উহা বংশানুক্রমের বিধান অনুসারে ঘটে না।

এক্ষণে আর এক কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। পিতৃলক্ষণ পুত্রে যে বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, সে বৈষম্য অল্পও হইতে পারে; অধিকও হইতে পারে। এক পুরুষের লক্ষণ পর পর পুরুষে এই ভাবে বংশানুগত হইয়া থাকে;— কোনও কোনও লক্ষণ ঠিক্ তদ্রূপভাবেই সংক্রমিত হইল, আর অন্য কোনও কোনও লক্ষণ তাহা হইল না। সংক্রমণ বিষয়ে লক্ষণের অল্পতায় বা আধিক্যে কিছুই আসে যায় না। অপত্যের যে সকল লক্ষণ, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, পিতৃপুরুষ হইতে এরূপ ভাবে পৃথক হইয়া গেল যে, তাহা আর কখনই পিতৃ-পুরুষের ন্যায় হয় না, বহুপুরুষেও ঐ পার্থক্য অথবা বৈষম্যের অপনোদন হয় না, উহা স্থায়িভাবেই থাকিয়া যায়, সেই সকল লক্ষণ হইতেই একজাতীয় জীব কালক্রমে অন্য জাতিতে পরিণত হয়। এইরূপে জীবের বিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে,পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয়বিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে ক্ষুদ্রগুলি বংশানুক্রমে পুঞ্জীকৃত হইয়া এক-জাতীয় জীবকে অন্য জাতিতে

বিবর্ত্তিত করে; বৃহৎগুলি স্থায়ী হয় না; কারণ, বৃহৎপরিবর্ত্তনযুক্ত জীব অন্যের সহিত সংগত হইয়া যে অপত্যের উৎপাদন করে, সেই অপত্যে ঐ পরিবর্ত্তনের আধিক্য খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং ঐ পরিবর্ত্তন অস্থায়ী বলিয়া উহা দ্বারা জীব-বিবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনই এরূপ হইতে পারে যে, তাহা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইয়া গেল। সেই হেতু জীবও মূলতঃ পরিবর্ত্তিত অথবা বিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বংশানুক্রম বলিতে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত পর-পর-বংশীয়গণের সাদৃশ্য বুঝায়। সুতরাং এই সাদৃশ্য (অথবা বৈষম্য) বুঝিতে হইলে, পর-পর বংশ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। অপত্য কিরূপে জাত হয়, তাহাই অগ্রে দেখা আবশ্যক। জীব দ্বিবিধ, এক-কোষ ও বহু-কোষ। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মারোগ প্রভৃতির কীটাণু এক-কোষ; উহাদিগের দেহ একটিমাত্র কোষে গঠিত; ঐ কোষ জীব-বস্তুতে (১) পূর্ণ। আর বহুসংখ্যক কোষ একত্র হইয়া বহু-কোষ জীবের দেহ রচনা করে। মানব বহু-কোষ জীব। এক-কোষ জীব বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া বংশ-রক্ষা করে। একটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি; উহারা প্রত্যেকে দ্বিখণ্ডিত হইয়া চারিটি, এইরূপে এক দিবা-রাত্রির মধ্যে একটি এক-কৌষিক জীব হইতে প্রায় ১০০,০০০ এক লক্ষ জীব উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহার অধিকও হইয়া থাকে। এই সকল জীবের আকৃতি একই প্রকার; তাহাতে কিছুই প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। তথাপি নিশ্চয়ই কিছু কিছু প্রভেদ আছে। যাহা হউক, ইহাদিগের এক পুরুষের সহিত পর-বংশীয়গণের সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক; ষোল আনা বলিলেও বলা যায়। ইহাদিগের কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নাই; কেবল ক্ষুদ্র একটু জীববস্তু-পূর্ণ কোষমাত্রই উহাদিগের অঙ্গ। সুতরাং বাহ্য পরিবর্ত্তনের স্থলই একরূপ নাই। (২) এই হেতু বংশপরম্পরায় সকলেই সম-অবয়ব দৃষ্ট হয়।

বংশ বৃদ্ধি।

কিন্তু, বহুকোষ জীবের দেহ বহু কোষে গঠিত; আর সেই সকল কোষও নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পিচ্ছিল, একটু জীববস্তু-পূর্ণ একটি প্রাথমিক কোষের বিভিন্ন অংশ বহু পরিবর্ত্তনের পর স্নায়ুকোষ, শিরাকোষ,

(১) অম্লজান, উদজান, অঙ্গার, যবক্ষারজান, গন্ধক, ফস্ফরাস্ ইত্যাদি বস্তুতে জীব-বস্তু (Protoplasm) গঠিত হয়। এ বস্তু অচেতনের নাই।

(২) এক-কোষ জীবের কোষভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশেও যৎসামান্য পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

অস্থিকোষ, ত্বক্‌কোষ ইত্যাদি নানাপ্রকার কোষে পরিণত হইয়াছে। কোষের জীব-বস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দানা আছে। উহাদিগকে বিন্দু বলিব। উহাদিগের মধ্যে একটি প্রধান, তাহাকে কেন্দ্র-বিন্দু (nucleus) বলা যায়। ঐ সকল বিন্দু বিবিধ প্রকারে বিবর্ত্তিত ও সজ্জিত হইয়া উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকার কোষে পরিণত হয়। তাহা হইতেই পূর্ণদেহের বিভিন্ন অংশ গঠিত হইয়াছে। বহু জীবের দেহ-কোষ ও বংশরক্ষক কোষ পৃথক্‌-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। এক-কোষ জীব কেবল একটি বংশরক্ষক কোষমাত্র ; উহার প্রত্যেক অংশই বংশরক্ষা করে ; কারণ, ঐ কোষ বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক অংশ হইতেই সম-অবয়ব অপত্য জাত হয়। কিন্তু বহু-কোষ জীবের দেহে অস্থিকোষ, ত্বক্‌কোষ ইত্যাদি হইতে অপত্য জাত হয় না। উহার দেহস্থ স্থানবিশেষ হইতে বংশরক্ষক কোষ উৎপন্ন হয় ; তদ্দ্বারাই অপত্য গঠিত হয়। (৩) অন্য-স্থানস্থ কোষ হইতে তাহা হয় না। এই বংশরক্ষক কোষ এক-কৌষিক জীবের ন্যায় একটি কোষ-মাত্র। বহুকোষ-জীবের বংশরক্ষক কোষ, অর্থাৎ পুংকীট ও স্ত্রীকীট প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র কোষ। উহা এক-কোষ জীবের ন্যায় বহু ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে পূর্ণাবয়ব ভ্রূণ-দেহ গঠিত করে। এইরূপেই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। কোষস্থ কোনও বিন্দু শিরা-কোষে, কোনও বিন্দু অস্থিকোষে, কোনও বিন্দু ত্বক্‌কোষে পরিণত হয়। এইরূপে নানা বিন্দু হইতে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। কিন্তু দ্বিবিধ বংশরক্ষক কোষ অর্থাৎ পুং-কোষ ও স্ত্রী-কোষ, সংমিশ্রিত হইয়া বহু ভাগে বিভক্ত, এবং বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে যখন ভ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গঠিত করে, তখন ঐ যুক্ত-কোষের একটি অংশ কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনের অধীন হয় না, উহা অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া যায়। ঐ অপরিবর্ত্তিত কোষাংশ অপত্যের বংশরক্ষক কোষ হইয়া যায়। উহাও বহুধা বিভক্ত হয় সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তিত হয় না। পিতার দেহ হইতে ঠিক অপরিবর্ত্তিতভাবে পুত্রের দেহে সংক্রমিত হইয়া তাহার বংশরক্ষক কোষ উৎপন্ন হয়। উহা এই অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতে (৪) বংশপরম্পরায়

(৩) মানবের বংশরক্ষক কোষ পুরুষের অণ্ডে ও নারীর Ovary অথবা কোষাধারে থাকে। ইহাদিগের সংমিশ্রণে অপত্য জাত হয়।

(৪) সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত নহে ; কোষস্থ বিন্দু সকলের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু এ স্থলে মোটামুটি অপরিবর্ত্তিত বলিলে দোষ হইবে না।

সংক্রমিত হইয়া বংশ রক্ষা করে, (৫) সুতরাং দেহ বংশরক্ষক কোষের আধারমাত্র। পিতৃদেহস্থ কোষ পুত্র-দেহে সংক্রমিত হইল, এইমাত্র। যখন এক পদার্থই প্রায় অবিকৃত অবস্থাতে পর পর বংশের গঠন করিতেছে, তখন পূর্ব্বপুরুষের সহিত পর-পর-বংশীয়গণের সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার যখন বুঝা যাইতেছে যে, বংশরক্ষক কোষের আভ্যন্তরিক গঠন দানা-যুক্ত, অথবা বহু-বিন্দু-পূর্ণ, এবং সে সকলের অবস্থান ও স্বভাব কোনও না কোনওরূপে অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; এবং তাহাদিগের মধ্যে কোনওটি সবল কোনওটি দুর্ব্বল বলিয়া আভ্যন্তরীণ জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, এবং সেই হেতু কোনওটা আত্মশক্তির বিকাশ করিতে পারিতেছে, কোনওটা পারিতেছে না ; অথবা নষ্ট ও বিকৃত হইয়া যাইতেছে ; তখন বংশপরম্পরায় ন্যূনাধিক বৈষম্য উৎপন্ন হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ণ-গঠিত জীব-গণের মধ্যে যেমন জীবন-সংগ্রাম অথবা আহার ও বংশবৃদ্ধির সুবিধা অসুবিধা হেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, বংশরক্ষক কোষের অভ্যন্তরস্থ জীববিন্দুগুলির মধ্যেও নানা কারণে ঐরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পূর্ণদেহ জীব যেমন ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু কেহ জয়ী হয়, অন্যে বিনিষ্ট হয়, উহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ। এই হেতু উহাদিগের গঠন, অবস্থান ও অস্তিত্ব চিরদিন সমান থাকে না। এই অভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনবশতঃই পরবংশীয়গণ পরিবর্ত্তিত হয় এবং যদি সেই পরিবর্ত্তন অতিমাত্র ও আকস্মিক অথচ স্থায়ী হয়, (৬) তবে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ভিন্ন-জাতীয় জীব উৎপন্ন হইতে পারে ; আর যদি উহা অল্পমাত্র অথচ স্থায়ী হয়, (৭) তাহা হইলেও ভিন্ন-জাতীয় জীব উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় আবশ্যক হয়। সে যাহা হউক, পরিবর্ত্তন ও নির্ব্বাচন বংশরক্ষক কোষের অভ্যন্তরে হওয়াতেই বংশপরম্পরায় অল্পাধিক বৈষম্য সঞ্জাত হয়। এইরূপে

---

(৫) These (reproductive cells) remain simple and un-differentiated. * * These cells and the results of their division are but little implicated in the differentiation which makes the multicellular organism what it is. Goddess and Thandon. The Evolution of Sex pp. 261-2.

The bodies of the higher animals may be regarded as something temporary and nonessential and destined merely to carry for a time and nourish the unicellular egg. Ray Lankerten.

(৬) mutation. (৭) Germinal variation.

জীব-জগতে পিতৃপুরুষের সহিত পরবংশীয়গণের সাদৃশ্য ও বৈষম্য উভয়ই বুঝা হইতে পারে। (৮) সাদৃশ্যের পরিমাণ অধিক কি অল্প, তাহা বুঝিলেই বৈষম্যও বুঝা গেল।

শ্রীশশধর রায়।

ভারতের অর্ণবযান।*

এই পুস্তকখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত, বিলাতের লঙ্গম্যানস্ গ্রীণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্-এ ইহার অনুক্রমণিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও চিত্রাবলী অতি সুন্দর হইয়াছে। লিখনভঙ্গীও বেশ। প্রমাণপ্রয়োগ, সংগ্রহ-ব্যবস্থা অতি যুক্তিযুক্ত। এমন পুস্তকের লেখক এক জন মনস্বী বাঙ্গালী যুবক, ইহা যখন মনে হয়, তখন মনে বেশ একটু শ্লাঘাবোধ হয়!

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

বৈদিক যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতের আর্য্য ও দ্রাবিড়গণ কেমন ভাবে নৌ-নির্ম্মাণ-শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা উন্নত ও প্রশস্ত করিয়াছেন, দূরদূরান্তের দ্বীপে ও দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন,—এসিয়ার সর্ব্বত্র ভারতের আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার ঘটাইয়াছেন, সে সকল কথাই এই পুস্তকে অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

---

৮ পিতৃপুরুষ বলিতে পিতা মাতা ও উভয় কুলের ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিগণকে বুঝিতে হইবে।

* *Indian shipping. A history of the sea-borne trade and maritime activity of the Indians from the earliest times.*

By Radhakumud Mukherjee M. A.

সাগরিক-বাণিজ্য-বিস্তার বিষয়ে, উপনিবেশ বিস্তারকার্য্যে বাঙ্গালী যে এককালে ভারতের অগ্রণী ছিলেন, বাঙ্গালার বীর কৈবর্ত্তগণ অতি দীর্ঘ অর্ণবযান সকল প্রস্তুত করিয়া চীন ও জাপানে পর্য্যন্ত যাইতেন, সে সমাচার এই পুস্তকে আনুপূর্ব্বিক পাওয়া যায়। অতীত ও বিস্মৃত বাঙ্গালার গৌরব-কাহিনীর হিসাবে এ পুস্তক স্পর্দ্ধার সহিত মাথায় করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। এই পুস্তক পাঠ করিয়াই জানিতে পারিয়াছি যে ভারতে আর্য্য-মনুষ্যত্বের গৌরবগরিমার যুগে আফিরিকার সোকোট্রা, মিশর ও মাদাগাস্কার হইতে দূর প্রাচীগগনোপান্তে মালয় দ্বীপপুঞ্জে, চীন ও জাপানে আর্য্য ও দ্রাবিড় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালী এবং দ্রাবিড় চোল ও তামিলগণ, পশ্চিমে গুর্জ্জরী জঠ ও মারহাট্টাগণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরবক্ষ অধিকার করিয়াছিল। এক দিন দুই দিনের অধিকার নহে, একাদিক্রমে দুই তিন সহস্র বর্ষ কাল ভারতের নাবিক এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাঞ্চলে একাধিপত্য করিয়াছেন। শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার এই আড়াই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুবৃহৎ পুস্তকে ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে আমাদিগকে এইটুকু শিখাইয়াছেন। এ শিক্ষার—এই মহামন্ত্রের জন্য উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

পুস্তকখানি স্থূলতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে ; প্রথম,—হিন্দু বা আর্য্য যুগ ; দ্বিতীয়,— ইসলাম যুগ। হিন্দু যুগের কথা আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা আছে ; প্রথম ভাগে বৈদিক ও আর্য্য-যুগের কথা আছে ; দ্বিতীয় ভাগে বৌদ্ধ, মৌর্য্য, আন্ধ্র ও কুশন কালের কথা বর্ণিত আছে বর্ণনা ও বিষয়-বিন্যাস অতি সুন্দর হইয়াছে। লেখক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারপদ্ধতির প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। যাহা তাঁহাদের বিচারপদ্ধতির অনুসারে গ্রাহ্য না হইতে পারে, তাহা তিনি একেবারেই স্পর্শ করেন নাই। তথাপি তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে এখন পর্য্যাপ্ত বলিতেই হইবে। এত খবর ত এ দেশের শিক্ষিত সমাজের অনেকেই জানিতেন না। তাঁহার এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়া যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আর কিছু না হউক, বাঙ্গালার আধুনিক হিন্দুগণ বুঝিতে পারিবেন যে সমুদ্রযাত্রা, দূরদেশে গমন, বাঙ্গালী তথা সাধারণ হিন্দুর পক্ষে কখনই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা সামাজবিরুদ্ধ ছিল না। সুমার্জ্জিত ইংরেজী ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিয়া শ্রীযুত রাধাকুমুদ পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন বটে,

পরন্তু উহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে, লেখকের কোনরূপ প্রতিষ্ঠা হউক বা না হউক, বাঙ্গালী বুধগণের পক্ষেও যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করিত, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। গ্রন্থকার প্রমাণ-সংগ্রহ বিষয়ে তিল-মাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ও মনসামঙ্গল পর্য্যন্ত ভারত-সাহিত্যের যেখানে নৌ-নির্ম্মাণ ও সমুদ্র-যাত্রার কথা আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা ছাড়া পালি, আরবী, মিশরী, যুনানী, ইরাণী, চীন, ব্রহ্ম, যব ও বলী দ্বীপের সাহিত্য হইতে ভারতের নৌ-শক্তির প্রাধান্যের উল্লেখ যেখানে পাইয়াছেন, সেইখান হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপঢৌকন দিয়াছেন।

আর্য্য-যুগে কেবল আর্য্যগণকেই চারি বর্ণে বিভক্ত করা হয় নাই। গজ বাজী, মেষ, মহিষ, গো শূকরাদি সকল জন্তুকেই ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে বিভক্ত করা হইত। কেবল পশুসর্পাদির মধ্যেই চাতুর্বর্ণ্যের বিন্যাস ছিল না, বৃক্ষ-আয়ুর্ব্বেদে কাষ্ঠকেও চারি বর্ণে বিভক্ত করা হইয়াছে। কাষ্ঠের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বিচার করিয়া নৌনির্ম্মাণ করা হইত। নির্ম্মিত নৌকাদিরও তেমনই কাষ্ঠের ও নির্ম্মাণপদ্ধতির অনুসারে চারি বর্ণ বা চারি জাতি ছিল।

"লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ॥"

এই সঙ্গে ইহাও বলা আছে হে, "ক্ষত্রিয়কাষ্ঠে ঘটিতা ভোজমতে সুখ-সম্পদং নৌকা।" যুক্তিকল্পতরু নামক পুঁথিতে লেখা আছে,—

"ন সিন্ধুনাব্যার্হতি লৌহবন্ধং
তল্লোহকান্তৈর্হ্রিয়তে হি লৌহম্।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা
গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ॥"

আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদর কথায় আছে যে, সেকালে সাগরতলে অয়স্কান্তের পর্ব্বত থাকিত, লৌহের বন্ধনীযুক্ত নৌকা চুম্বকের আকর্ষণে একেবারে আলগা হইয়া যাইত! এখনও নোয়াখালি জেলায় সমুদ্রতীরে সন্দ্বীপের চারি পার্শ্বে বেতের বন্ধনীযুক্ত নৌকা সকল সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। ইহাদের নির্ম্মাণপদ্ধতি ভোজের ব্যবস্থানুসারে হইয়া থাকে। আর্য্য-যুগের তরী সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; যথা, সাধারণ বা সামান্য, এবং বিশেষ, তৃতীয় উন্নতা। সামান্য শ্রেণীর মধ্যে মন্থরা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল,

[illegible] এক শত বিংশ হস্ত, উর্দ্ধে ষাট হাত, প্রস্থেও ষাট হাত হইত। [illegible] মধ্যে বেগিনীর দৈর্ঘ্য এক শত ছেয়াত্তর হাত, প্রস্থ বাইশ হাত, উর্দ্ধ প্রায় আঠারো হাত হইত। উন্নতার মধ্যে স্বর্ণমুখী সুন্দর তরণী। আজ বাঙ্গালায় কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইতেছেন, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালার সমুদ্রতটভূমি কৈবর্ত্তেরই অধিকারে ছিল, কৈবর্ত্তই বাঙ্গালার গৌরব দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ করিত। বাঙ্গালার কৈবর্ত্তরাই মহারাজ রঘুর সহিত জলযুদ্ধ করিয়াছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আছে,—

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিষ্ঠস্থিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥"

বিদুর পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ বারণাবতে ভাগীরথীতীরে যে নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা "যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্" বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত আছে। অধ্যাপক হাভেল যবদ্বীপে সাঞ্চীস্তূপে যে সকল পুরাতন নৌকার চিত্র দেখিয়াছেন, তাহার অনেক যন্ত্রস্থান আছে। এ যন্ত্র কি? রীড বলেন,—ইহাই "মৎস্য-যন্ত্র" বা পালি ভাষার "মচ্ছযন্ত্র"; অর্থাৎ Mariners Compass। একখণ্ড অয়স্কান্তনিবিড়িত লৌহশলাকা তৈলপূর্ণ পাত্রে ভাসান থাকিত। সেই লৌহশলাকা সর্ব্বদাই উত্তর দিকে মুখ করিয়া থাকিত। এই মৎস্য-যন্ত্র যে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের নাবিকগণ ব্যবহাব করিতেন, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, প্রস্তর-উৎকীর্ণ অর্ণবযানের চিত্র সকলে মৎস্য-যন্ত্রের চিত্রও পাওয়া যায়। এই হেতু পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন যে, আর্য্য হিন্দুগণ Mariners' Compass নিয়মিত ব্যবহার করিতেন।

শ্রীযুত রাধাকুমুদ নৌ-গঠনের ও সমুদ্র-যাত্রার অনেক কথাই বলিয়াছেন। কেবল সামুদ্রিক পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ করেন নাই। যাহারা তিন হাজার বৎসরকাল সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাদের ভাষায় যে Bay, Strait, Creek, Gluf প্রভৃতির অনুরূপ শব্দ ছিল না, এমন অনুমান আমরা করিতেই পারি না। কাব্যে ও পুরাণে আমরা ডমরুমধ্য, সাগরকটী, সমুদ্রাঞ্চল, খণ্ডীক, সাগরবাহু প্রভৃতি গোটাকয়েক শব্দ পাইয়াছি, কিন্তু এক খণ্ডীক ছাড়া ইহার কোনটাই পারিভাষিক শব্দ নহে। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাগরিক পরিভাষা বাহির করিতে পারিলে, নৌকার অংশ সকলের সংজ্ঞা-সমূহের আবিষ্কার করিতে পারিলে ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিতে

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

পারিবেন। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের মনে হয় যে, সেকালের হিন্দুগণ পেরু, চিলি ও মেক্সিকো দেশে গিয়াছিলেন। অন্ততঃ যে দেশে আমাদের উষাকালে প্রদোষের ছায়া বিস্তৃত হয়, সে দেশের খবর তাঁহারা রাখিতেন। পুরাণের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় এমন সকল দেশের সমাচার পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগে ও মৌর্য্যপ্রাধান্যকালে ভারতের সভ্যতা মাদাগাস্কার হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সকল দেশেই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। যব, সুমাত্রা, বলী, লম্বক, বোর্ণিও, সেলিবিজ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, শ্যাম, কোচীন, এনাম, কাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, ফরমোজা প্রভৃতি দ্বীপে ও দেশে ভারতের হিন্দুগণ উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা গালগল্প নহে, ইহার প্রমাণ এখনও এই সকল দেশে পাওয়া যায়। এই সকল দ্বীপ উপদ্বীপের পুরাতন ইতিহাসে, ভগ্নস্তূপে, সমাধিমন্দিরে, উৎকীর্ণ তাম্রফলকে অতীত হিন্দু-গৌরব-কাহিনীর পরিস্ফুট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই পুস্তকে এবংবিধ অনেক কথা লিখিত আছে। শ্রীমান রাধাকুমুদ ফরাসীদিগের প্রত্নতত্ত্বের সমাচার পূর্ণভাবে রাখিলে, এনাম, টঙ্কিন ও কাম্বোডিয়ার হিন্দুদিগের অতীত কীর্ত্তির ভগ্নস্তূপ সকলের অনেক বর্ণনা দিতে পারিতেন। ফিলিপাইন দ্বীপে যে হিন্দুকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে, তাহা মার্কিণ পণ্ডিতগণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন। অনেক নষ্ট হইয়াছে, পরন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাও আমাদের পক্ষে শ্লাঘ্য। যাঁহারা ভারতের পুরাকালের হিন্দু ছিলেন. তাঁহারা ছোটখাট জাহাজ তৈয়ারী করিতেন না। এক একটা জাহাজে শত শত আরোহী থাকিবার স্থান পাইত। ইহা ছাড়া প্রায় কুড়ি হাজার মণ মাল বোঝাই থাকিত। এখন যেমন bulkheads ও water-tight compartments নৌগর্ভে নির্ম্মাণ করিবার পদ্ধতি হইয়াছে, দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুগণও তেমনই জাহাজ গড়িতে পারিতেন। গ্রন্থকার এ পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন।

ছিল সবই। উন্নত, সভ্য ও জগজ্জয়ী জাতি হইতে হইলে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, সে কালের হিন্দুদিগের সে সকলই ছিল। একেবারে আকাশ হইতে ষড়দর্শন-উদ্ভাবনার মনীষা কোনও জাতির মধ্যে আসিয়া পড়ে না। প্রথম বাহ্যোন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে; তবে ত অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়াছে; তবে ত পারলৌকিকী চিন্তার উন্মেষ সম্ভবপর হইয়াছে। যাঁহারা বলেন

যে, হিন্দুজাতি কেবল খেয়াল দেখিয়াছে, আর ষড়দর্শন ভাবিয়া বাহির করিয়াছে, তাঁহারা মনুষ্য জাতির ক্রমোন্নতির বিন্যাস বুঝেন না, বা জানেন না। এখনও শ্মশানচুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড সকল, যাহা ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহা দেখিতে ও চিনিতে জানিলে আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা যাঁহাদিগকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি, তাঁহারা কত বড় কত উন্নত, কত স^ং্য ও কেমন প্রবল ছিলেন। এক এক সময়ে ক্ষোভে সন্দেহ হয়, এবং আত্মজিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—আমরাই কি তাহাদের? না, ত'হারা আমাদের? ইচ্ছা করে, শ্রীমান রাধাকুমুদের পুস্তকখানি আগা-গোড়া বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিই; দেখিতে ইচ্ছা করে, এমন পুস্তক বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সবাই পড়িতেছে, এবং সকলকে পড়াইয়া শুনাইতেছে। এ সাধ মিটিবে কি? কে যেন বলিতেছে, এ সাধ মিটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

আমরা শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তকের অ^িসামান্য পরিচয়ই দিলাম। এই পরিচয়ে আকৃষ্ট হইয়া কেহ যদি তাঁহার পুস্তক পাঠ করে, তাহা হইলে বুঝিব, আমাদের এ সামান্য পরিচয়দানও ব্যর্থ হয় নাই। শ্রীযুত রাধাকুমুদ আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ভারতের অতীত-গৌরব-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি এমনই নিধি সকল আহরণ করুন, এবং স্বীয় ব্রাহ্মণ-জন্ম সা'র্থক করুন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

এখনকার দিনে সচরাচর দেখিতে পাই, রাজকর্ম্ম‌চারীরা রাজপ্রসাদলাভাশায় বিবেক-বুদ্ধিকেও পদদলিত করিতে সঙ্কুচিত হন না। দোষ ঠিক তাঁহাদের নহে; না করিলে অনেক সময় চলে না—চাকুরী থাকে না, তাই তাঁহারা করেন। কিন্তু এক এক জন মহাপু‌রুষ আছেন, তাঁহারা চাকরী অপেক্ষা বিবেকটাকে বড় মনে করেন—রাজপ্রসাদ অপেক্ষা আত্মপ্রসাদ শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন।

এই সকল মহাপুরুষদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও এক জন। তিনি রাজপ্রসাদ লাভাশায় কখনও নিজের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দেন নাই। এ সম্বন্ধে একটি

ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আঠারটি বাকী খাজনার মোকদ্দমা বিচারের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। তখনকার দিনে বাকী খাজনার মোকদ্দমার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেরা বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন। পরে মুন্সেফদিগের উপর
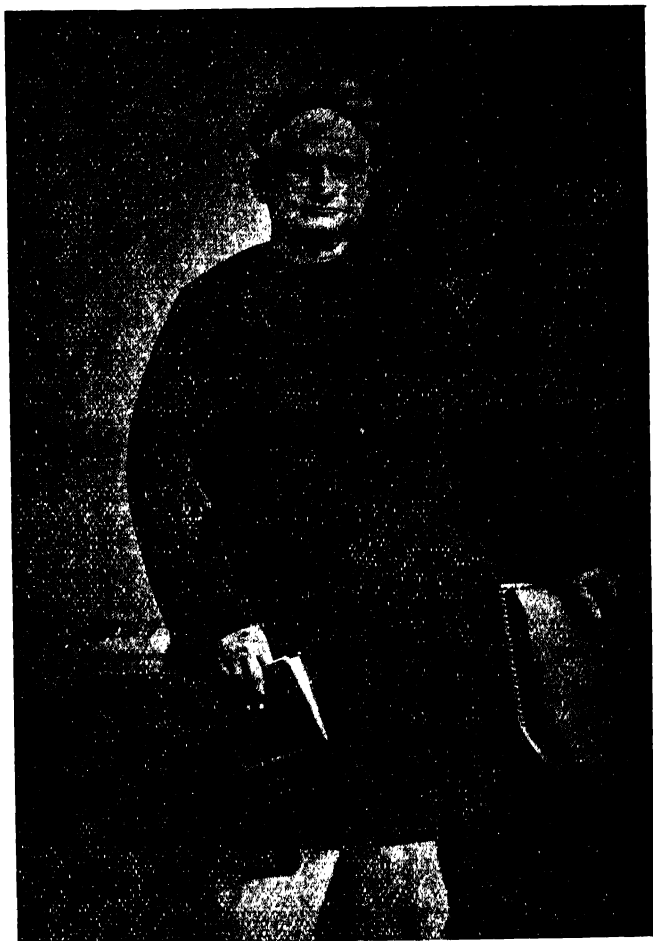
স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র।

সে ভার অর্পিত হয়। উক্ত মোকদ্দমা কয়টি কিছুদিন হইতে পড়িয়াছিল; বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষ ধনশালী জমীদার। এক পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন; অপর পক্ষে আমাদের

শ্রদ্ধাস্পদ, ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস বাবু সে সময় বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। এই প্রথিতমানা উকীলদ্বয় মোকদ্দমা কয়টি মুলতুবী রাখিবার জন্য হাকিমের নিকট এক-যোগে প্রার্থনা করিলেন। হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনারা সময়ের প্রার্থনা করিতেছেন ?"

উকীল বাবুরা উত্তর করিলেন, "মোকদ্দমা মিট্‌মাট হইবার কথা হইতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সময় দিয়া মোকদ্দমাগুলি মুলতুবী রাখিলেন।

পুনর্ব্বার মোকদ্দমা শুনানীর দিন উকীলদ্বয় পুনরায় সময়ের প্রার্থনা করিলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন. "আবার সময় কেন ?"

উকিল। মোকদ্দমা মিটাইয়া উঠিতে পারি নাই—আরও কিছু সময় পাইলে মিটাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

হাকিম। আপনাদের সময় দিতে আমার কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু কমিশনর সাহেবের বিশেষ আপত্তি আছে। গতবারে আপনাদের প্রার্থনা-মত সময় দিয়াছিলাম ; তজ্জন্য কমিশনর আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যটা শুনুন।

বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্যটা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মন্তব্যে কটাক্ষপাত ছাড়া একটু ভয়প্রদর্শনও ছিল। পাঠান্তে তিনি বলিলেন, "কমিশনরের আদেশ চুলোয় যাক্। আপনাদের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহা আমি করিব.— প্রার্থনামত সময় দিলাম।"

এরূপ সাহস ডিপুটিদিগের মধ্যে বিরল ; সাধারণের সুবিধার অন্বেষণ না করিয়া আমরা সচরাচর প্রভু-প্রীতির অন্বেষণ করিয়া থাকি। কর্ত্তার কর্ত্তা কমিশনরের হুকুম উপেক্ষা করিতে কয় জনের সাহসে কুলায় ?

কিন্তু এ তেজ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহেবেরা সম্মান করিতেন। একবার তদানীন্তন ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বহরমপুরে পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ছোটলাট অতিশয় তুষ্ট হইলেন ; বলিলেন তুমি "ষ্টীমারে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে "

সাহেব একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। লাট সাহেবের জাহাজ 'রোটস্' তখন মাঝ-গাঙ্গে। তথায় পঁহুছিতে হইলে নৌকা ভিন্ন উপায়

নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনিও লাট-দর্শনে চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের নৌকায় উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এক নৌকায় যান। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "আপনাকে রাখিয়া নৌকা ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোটলাটের নিকট পঁহুছিতে পারিব না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আর কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি আগে ছোটলাটের কাছে কার্ড পাঠাইব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা অচিরে 'রোটাসে' গিয়া লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্ড পাঠাইলেন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিশ্রুতিমত কার্ড পাঠাইতে বিরত থাকিলেন।

ছোটলাট সম্ভবতঃ জাহাজের গবাক্ষ-পথ দিয়া আগন্তুকদের দেখিয়া থাকিবেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্ড পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর—ডিপুটী বঙ্কিমবাবুকে আগে পাঠাইয়া দাও।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্কিমবাবুকে হুকুম দেখাইলেন। বঙ্কিমবাবু মুগ্ধ হইলেন। সম্মানটুকু বড় সামান্য নয়। বাঙ্গালীর পক্ষে এ সম্মান ঘটিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র ডিপুটীর ভাগ্যে এরূপ সম্মান বিরল।

যাঁহার আত্মসম্মানবোধ আছে, তিনি সচরাচর সকলের নিকট সম্মান পাইয়া থাকেন; যাঁহার সে বোধ নাই, তিনি অনেক স্থলে লাঞ্ছিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপলক্ষ—বেরা। বেরা-উৎসব খুব ধূমধামের সহিত প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইত—এখনও হয়; তবে সে জাঁক জমক এখন আর নাই। ভাগীরথী-বক্ষে প্রকাণ্ডকায়া ভেলা ভাসাইয়া, তাহাকে পত্রপুষ্পে সমাচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে। মাথার উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—স্তম্ভে স্তম্ভে উজ্জ্বল দীপালোক। মখমল-মণ্ডিত ভেলার উপর, রূপযৌবনপ্রফুল্ল নর্ত্তকীবৃন্দ। নর্ত্তকীর ভেলার চতুর্দ্দিকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের ভেলা; তার চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের ভেলা। শেষোক্ত ভেলার উপর মানুষ নাই—শুধু কলাগাছ। কলাগাছের গায়ে, মাথায়, অসংখ্য আলো। সুন্দর দৃশ্য! মাথার উপর ভাদ্রমাসের নির্ম্মল আকাশ—পদনিম্নে ভরা গাঙ্গের উদার উচ্ছ্বাস। ছোট ছোট ঢেউগুলির চুম্বন-আবেগে ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

সমারোহ শুধু গঙ্গাবক্ষে নয়—সমারোহ নবাবের প্রাসাদে—ভোজে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই উৎসবে ও ভোজে যোগদান করিতেন। বাঙ্গালীরাও নিমন্ত্রিত হইতেন। জেলার বড় বড় জমীদার, রাজকর্ম্মচারী ও উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। তবে তাঁহাদের ভাগ্যে সমান আদর বড় একটা জুটিত না। সাহেবেরা প্রত্যেকে এক এক ছড়া জরীর মালা পাইতেন বাঙ্গালী অতিথিরা তাহা পাইতেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে সবজজ বাবু দিগম্বর বিশ্বাস ও নবাবের উকীল শ্রীযুত [এখন সার] গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালা পাইতেন। দিগম্বর বাবু হ্যাট কোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া পাইতেন; গুরুদাস বাবু নবাবের উকীল বলিয়া পাইতেন। অন্যান্য উকীল এবং ডিপুটী, মুন্সেফদের ভাগ্যে মালা জুটিত না। মালা যে বিশেষ বহুমূল্য. তা নয়; তবে মালায় একটা সম্মান। তা' ছাড়া ভোজে ও অভ্যর্থনায় একটা পার্থক্য রক্ষিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া এ সকল ব্যাপার শুনিলেন।

তার কয়েক মাস পরে নবাবের কর্ম্মচারী যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আপনি আমায় নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া নয় আমি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া। শুনিতে পাই, আপনারা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সম্মান প্রদান করেন না। এরূপ অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।"

কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া কার্ড ফিরাইয়া লইয়া গেলেন; এবং নবাব ও দেওয়ানের নিকট সকল কথা বলিলেন। তাঁহাদের তখন নয়ন উন্মীলিত হইল। নবাবের আজ্ঞানুক্রমে দেওয়ান বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিলেন; বলিলেন, "আমাদের ত্রুটী হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর হইবে না। সাহেবেরা যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীরাও তদ্রূপ পাইবেন।"

বাঙ্গালীরা পাইয়াছিলেনও তাই। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, সকল হিন্দুই মালা পাইয়াছিলেন, এবং সাহেবদের সঙ্গে সমান আদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিদেশী গল্প

চিরপুরাতন।

সত্য বটে, আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখনও সে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য যায় নাই; কিন্তু সে জন্য তোমরা আমাকে পাগল বলিবে কেন? রোগে আমার ইন্দ্রিয়নিচয়ের অনুভূতি-শক্তি প্রখর করিয়া তুলিয়াছে—ধ্বংস করে নাই;—অথবা আমার সহজ জ্ঞানেরও হ্রাস হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রবণ শক্তিটাই প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গে অথবা মর্ত্ত্যে যতপ্রকার শব্দ আছে, সমস্তই আমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছে; নরকেরও বহু প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়াছি। তবে আমি পাগল কিসে? শুনিতেছ? লক্ষ্য করিয়া দেখিও, কেমন প্রশান্তভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি সমস্ত গল্পটাই বলিয়া যাইতেছি।

কেমন করিয়া সে কল্পনাটী আমার মস্তিষ্কে প্রথমে সঞ্চারিত হইল, সে কথা বলা অসম্ভব। কিন্তু এ কথা ঠিক, ধারণা হইবামাত্র, অহর্নিশ এই চিন্তা আমাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। তাহার প্রতি রাগ, দ্বেষ, অথবা ঘৃণা, কিছুই ছিল না। আমি বৃদ্ধকে ভালবাসিতাম। তিনি ভ্রমেও আমার কোনও অনিষ্ট করেন নাই, কখনও আমাকে অপমানিতও করেন নাই। তাঁহার চিরসঞ্চিত কাঞ্চনস্তূপের উপরও আমার লোলুপদৃষ্টি ছিল না। আমার মনে হয়, তাঁহার চক্ষুই এ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল! হাঁ, বাস্তবিক তাই বটে! গৃধ্রের চক্ষুর সহিত তাঁহার একটী নয়নের সাদৃশ্য ছিল;—ঈষৎ বিবর্ণ নীলাভ নয়ন, চখের উপর যেন একটা তরল যবনিকা, সূক্ষ্ম আবরণ বিস্তৃত। সে দৃষ্টিপাতে আমার শরীরের সমুদয় রক্ত যেন হিম হইয়া যাইত; মনে হইত, কে যেন আমার অস্থি ও মজ্জায় তুষাররাশি ঢালিয়া দিতেছে। ক্রমে ক্রমে আমি সংকল্প করিলাম, বৃদ্ধের জীবনসংহার করিতে হইবে। তাহা হইলে চিরকালের জন্য তাঁহার নয়নের দৃষ্টি এড়াইতে পারিব।

তোমরা আমাকে পাগল ভাবিতেছ। পাগলেরা সহজ-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। কিন্তু আমার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করিবার পূর্ব্বে আমার কার্য্যাবলী ও ব্যবহার লক্ষ্য করা তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে, আমি কেমন বিজ্ঞের ন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, কিরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলাম, কেমন সতর্কতা অবলম্বনে মিথ্যা অভিনয় দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলাম। হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে আমি যেরূপ

মমতা ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, এমন আর কখনও করি নাই। প্রত্যহ নিশীথকালে তাঁহার শয়নগৃহের অর্গলাবদ্ধ দ্বার সুকৌশলে নিঃশব্দে খুলিয়া ফেলিতাম। তার পর আমার মাথা গলাইবার মত দরজা ফাঁক করিয়া একটী আঁধারে-লণ্ঠন ভিতরে ধরিতাম। লণ্ঠনটি এমন ভাবে আবৃত থাকিত যে, বিন্দুমাত্র আলোকরেখা কোনও দিক দিয়া বাহির হইতে পারিত না। তার পর ক্রমে আমার মাথা ভিতরে বাড়াইয়া দিতাম। কেমন সুকৌশলে ও চতুরতার সহিত এ কাজটি করিতাম, যদি দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমরা হাস্যসংবরণ করিতে পারিতে না! ধীরে ধীরে—অতিধীরে, পাছে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় নিতান্ত সন্তর্পণে মাথাটি সরাইতাম। মুক্তদ্বার-পথে আমার মস্তকটি প্রবিষ্ট করাইতে ঠিক এক ঘণ্টা সময় লাগিত। আমি দেখিতাম, তিনি শয্যায় ঘুমাইতেছেন। কোনও পাগলকে কি তোমরা এমন বুদ্ধিমানের মত কাজ করিতে দেখিয়াছ? মাথাটি গৃহমধ্যে বিষ্ট হইলে, আমি লণ্ঠনের আবরণ সতর্কভাবে অতিধীরে অপসৃত করিতাম। পাছে কোনও শব্দ হয়, পাছে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্যই এত সাবধানতা। কেবল একটি সূক্ষ্ম আলোকরেখা বৃদ্ধের গৃধ্রবৎ নয়নের উপর পতিত হইতে পারে, ঠিক এমনই ভাবে লণ্ঠনের আবরণ উন্মোচন করিতাম। দীর্ঘ সাত রাত্রি ধরিয়া আমি এই ভাবে কাজ করিলাম। কিন্তু একবারও বৃদ্ধের নয়ন উন্মীলিত হইতে দেখিলাম না। সুতরাং আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। লোকটির প্রতি আমার কোনও আক্রোশ ছিল না; কিন্তু তাঁহার পাপ-চক্ষুর উপরই আমার বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্যালোকে ধরণী হাসিয়া উঠিলে, আমি সাহসসহকারে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতাম, তাঁহার সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে আলাপ করিতাম; আন্তরিক আগ্রহের ভাণ করিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। জিজ্ঞাসা করিতাম, রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল কি না, শরীরের অবস্থা ভাল ত? এখন তোমরা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছ, আমি যে প্রতি রজনীযোগে দ্বিপ্রহরকালে নিদ্রিত বৃদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, এ সন্দেহ বৃদ্ধের মনে কখনও উদিত হইত না।

অষ্টম রজনীতে দ্বার মুক্ত করিবার সময় আমি পূর্ব্বপেক্ষা সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। এত ধীরে আমি হাত দিয়া দরজা মুক্ত করিতেছিলাম যে ঘড়ীর মিনিট নির্দ্দেশক বড় কাঁটাটিও তাহার তুলনায় দ্রুত চলে। আমার যে

এমন বিচারবুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা ও মানসিক শক্তি আছে, সেই স্মরণীয় রজনীর পূর্ব্বে কখনও তাহা অনুভব করি নাই। জয়লাভের উল্লাস সংযত করা কঠিন হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে আমি দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি, তিনি আমার গুপ্তকার্য্য স্বপ্নেও লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না, আমার অভিপ্রায় কি, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। এ কল্পনা মানসপটে উদিত হইবামাত্র আমি হাসিয়া উঠিলাম! বোধ হয়, তিনি আমার অস্পষ্ট হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন; কারণ, আমার বোধ হইল, অকস্মাৎ তিনি যেন চমকিতভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। তোমরা ভাবিতেছ, আমি অমনই দ্বারপথ হইতে সরিয়া গেলাম? না গো, তা নয়! বৃদ্ধের শয়নাগার ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন (তস্কর-ভয়ে তিনি চারিদিকের দ্বার ও বাতায়ন অবরুদ্ধ করিয়া শয়ন করিতেন) সুতরাং আমি জানিতাম, আমি যে দরজা খুলিয়াছি, তাহা তিনি জানিতেও পারিবেন না। আমি ক্রমশঃ দরজা আরও খুলিয়া ফেলিলাম।

মাথাটি ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে বাড়াইয়া দিলাম। লণ্ঠনের আবরণ মুক্ত করিতে যাইতেছি, সহসা আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পিছলাইয়া লণ্ঠনের টিনের আবরণের উপর আহত হইল। বৃদ্ধ সলম্ফে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে ওখানে?"

আমি স্থিরভাবে দাঁড়াইলাম; কোন উত্তর করিলাম না। স্থাণুর ন্যায় প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীরের কোন মাংসপেশী সঞ্চালিত করিতে সাহস হইল না। তিনি যে পুনরায় শয়ন করিয়াছেন, এমন কোনও শব্দ আমি শুনিতে পাই নাই। শয্যার উপর তখনও বসিয়া বসিয়া তিনি শব্দ শুনিতেছিলেন। আমি যেমন রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গৃহপ্রাচীরে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিয়া আসিতেছি, বোধ হয়, তিনিও আজ সেইরূপ শব্দ উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন।

সহসা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, এ শব্দ ভয়ানক আতঙ্ক-জনিত। যন্ত্রণা অথবা দুঃখ হইতে এ শব্দের উদ্ভব হয় নাই। মানুষ যখন আতঙ্কে ভয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঐরূপ অস্ফুট কাতরধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে। শব্দ আমার চিরপরিচিত। বহু রজনীতে, যখন শব্দময় জগৎ গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন, সেই সময় এইরূপ শব্দ আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইয়া

ভীষণ প্রতিধ্বনিসহকারে আমাকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া ফেলিত। সুতরাং এরূপ আতঙ্ক আমার অপরিচিত নহে। বৃদ্ধের মনে তখন কি হইতেছিল, আমি তাহা স্পষ্ট অনুমান করিলাম। তাঁহার জন্য আমার দুঃখ হইল, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথম সামান্য শব্দ-শ্রবণের পর হইতে বৃদ্ধ যে আর নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, তিনি যে জাগিয়া আছেন, তাহা আমি জানিতাম। ক্রমেই তাঁহার আতঙ্ক বাড়িতেছিল। আশঙ্কা যে অমূলক, তিনি মনকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু মন প্রবোধ মানিতেছিল না। মনে মনে তিনি নিশ্চয় ভাবিতেছিলেন, 'ধূমনির্গমনের চিমনীর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করায় এইরূপ শব্দ হইয়াছে, অথবা মূষিক বিচরণ করিতেছে, এ শব্দ তজ্জন্যই হইয়াছে, কিংবা হয় ত ঝিল্লী প্রথম ঝঙ্কার করিয়া থামিয়া গিয়াছে।' এইরূপ অনুমানের দ্বারাই তিনি মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সব বৃথা, এ সব যুক্তি অনর্থক ! মৃত্যু ধীরে ধীরে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল ; ইতিমধ্যেই তাহার করাল ছায়া বৃদ্ধের চারি দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই অমূর্ত্ত, অলক্ষ্য ছায়ার প্রভাবে—তিনি দেখিতে শুনিতে না পাইলেও—গৃহমধ্যে আমার শিরোদেশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি যে পুনরায় শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; তখন সঙ্কল্প করিলাম, এবার লণ্ঠনের একটি ছিদ্রের আবরণ মুক্ত করিয়া দিব। তদনুসারে অতি সাবধানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের আবরণ সরাইয়া দিলাম। ঊর্ণনাভের সূক্ষ্মসূত্রের ন্যায় একটি অতি মৃদু আলোকরেখা ছিদ্রপথে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধের গৃধ্রবৎ নয়নের উপর নিপতিত হইল।

তাঁহার নয়ন তখন সম্পূর্ণ উন্মীলিত ছিল — আমি যতই সেদিকে চাহিতেছিলাম উত্তরোত্তর ততই আমার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছিল। চোখটি সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছিলাম—নীলাভ, জ্যোতিঃশূন্য, কুৎসিত—সে দৃশ্যে আমার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত যেন হিমে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বৃদ্ধের আনন অথবা দেহের অন্য কোন অংশ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। যেন সংস্কারবশতঃ আমি আলোকরেখা শুধু তাঁহার অভিশপ্ত নয়নটির উপরেই নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম।

এখন বুঝিয়া দেখ, আমি যে বলিয়াছিলাম, তোমরা যাহাকে উন্মত্ততা

বলিয়া ভ্রম কর, বাস্তবিক তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের তীব্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা সত্য কি না? তার পর, তুলা দ্বারা পকেট-ঘড়ীকে আবৃত করিলে যেমন একটা শব্দ হয়, আমার কর্ণে সেইরূপ একটা মৃদু, নিরানন্দ, দ্রুত-শব্দ প্রবেশ করিল। সে শব্দটা যে কি, তাহা আমি বেশ জানিতাম। এ শব্দ বৃদ্ধের হৃদয়স্পন্দনজনিত। জয়ঢাকের শব্দে রণসঙ্গীতের ধ্বনিতে সৈনিকের হৃদয় যেমন সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, আমার হৃদয়ও এই শব্দে তেমনই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

কিন্তু তথাপি আমি আত্মসংবরণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। লণ্ঠনটি স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিলাম। আলোকরশ্মি কিরূপে অলক্ষিতভাবে নয়নের উপর নিবদ্ধ রাখিব, সেই চেষ্টা করিলাম। এদিকে হৃদ্‌যন্ত্রের শব্দটা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই শব্দের গতি দ্রুততর ও ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উত্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধের আতঙ্ক নিশ্চয়ই চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ক্রমেই স্পষ্টতর,—প্রতিমুহূর্ত্তেই ধ্বনি পরিস্ফুট হইতে লাগিল! আমার কথা কি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে। সত্যই আমি তাই। রাত্রি গভীরা, পুরাতন বৃহৎ অট্টালিকা জনহীন, চারিদিকে গাঢ় নীরবতা। এ সময় এমন অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া অবর্ণনীয় অদমনীয় আতঙ্কে আমি অভিভূত ও উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তথাপি কয়েক মুহূর্ত্ত আমি আত্মসংবরণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হৃদ্‌-যন্ত্রের শব্দ ক্রমেই যে বাড়িয়া চলিয়াছে! ভাবিলাম, এইবার বক্ষঃস্থল বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যায়! তখন আর একটা নূতন উৎকণ্ঠা জন্মিল—প্রতিবেশী-দিগের কেহ যদি এই শব্দ শুনিতে পায়! বৃদ্ধের সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে! বিকট চীৎকার করিয়া লণ্ঠনের আবরণ আমি সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিয়া দিলাম,—একলম্ফে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম! বৃদ্ধ কেবল একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আমি তাঁহাকে শয্যা হইতে টানিয়া নীচে নামাইলাম, তার পর বৃহৎ শয্যার বোঝা তাঁহার উপর চাপাইয়া দিলাম! কার্য্যটা এত দূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে আমি হাসিয়া উঠিলাম। হৃদযন্ত্রের চাপা-শব্দ কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল। অবশ্য, তাহাতে আমার বিরক্তি জন্মিল না। সে শব্দ প্রাচীরভেদ করিয়া অপর কাহারও কর্ণে কখনই প্রবেশ করিবে না। ক্রমে শব্দ থামিয়া গেল। বৃদ্ধ এইবার মরিয়া গিয়াছেন!

শয্যার বোঝা সরাইয়া আমি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। হাঁ, লোকটা মরিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে হাত রাখিয়া পরীক্ষা করিলাম। না, নাড়ীর গতি আর অনুভূত হইতেছে না! দেহে প্রাণস্পন্দন বহুক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। আর তাঁহার দৃষ্টি আমাকে বিরক্ত ও বিব্রত করিবে না।

এখনও কি তোমরা আমাকে পাগল ভাবিতেছ? যদি তাই হয়, তবে সে তোমাদের ভয়ানক ভ্রম। কি কৌশলে আমি মৃতদেহটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, জানিতে পারিলে তোমরা বিস্মিত হইবে, আর আমাকে পাগল ভাবিতে পারিবে না। প্রায় প্রভাত হইয়াছে। আমি নীরবে ক্ষিপ্রগতিতে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমতঃ মৃতদেহটি খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। মস্তক, বাহু ও পদদ্বয় অগ্রে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করিলাম।

ভূমিতল হইতে তিনখানি তক্তা সরাইয়া ফেলিলাম। তারপর খণ্ডিত মৃতদেহ ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিলাম। এমন ভাবে তক্তাগুলি পুনরায় বসাইয়া দিলাম যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং তিনিও এই পাপানুষ্ঠানের চিহ্নমাত্র বুঝিতে পারিতেন না। ধৌত করিবার মত বিশেষ কিছুই ছিল না। রক্তের দাগ অথবা অন্য কোনপ্রকার চিহ্ন কক্ষ মধ্যে ছিল না। সে বিষয়ে আমি বিশেষ সতর্ক ছিলাম। একটি বড় পাত্রে সমস্ত রক্ষা করিয়াছিলাম, হাঃ! হাঃ!

এই সমস্ত কাজ করিতে করিতে রাত্রি চারিটা বাজিল-তখনও চারি দিকে গাঢ় অন্ধকার। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টাধ্বনি শেষ হইল। সদর দরজায় কেহ করাঘাত করিতেছে, শুনিতে পাইলাম। আমি প্রশান্তভাবে দরজা খুলিতে গেলাম। এখন আর আমার ভয় কি? তিনটি লোক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতি ভদ্রভাবে তাঁহারা আপনাদিগকে পুলিসকর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাত্রিকালে কোন প্রতিবেশী একটা চীৎকারধ্বনি শুনিতে পান; সেই শব্দে তাঁহাদের সন্দেহ হয়,—নিশ্চয়ই কেহ কাহাকেও হত্যা করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশের কাছে এ সংবাদ প্রেরিত হয়! তাই তাঁহারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য বাড়ীটা তদারক করিতে আসিয়াছেন।

আমি হাসিলাম—আমার ভয়ের কি কারণ আছে, বল? আমি ভদ্রলোকদিগকে আদর করিয়া গৃহে লইয়া চলিলাম। বলিলাম স্বপ্ন দেখিয়া আমি নিজেই ঐরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। বৃদ্ধ এখন বাড়ী নাই, পল্লী-

গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলাম। আগন্তুকত্রয়কে সমগ্র বাড়ীটা দেখাইলাম। বলিলাম, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাড়ীটা তদারক করিয়া নিঃসন্দেহ হউন। পরিশেষে আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধের শয়নকক্ষে লইয়া গেলাম। বাক্স, আলমারী খুলিয়া বৃদ্ধের সঞ্চিত ধন-রত্নাদি দেখাইলাম, কেহ তাহাতে হস্তার্পণ করে নাই। তাহাদের বিশ্বাস-উৎপাদনের নিমিত্ত আমি কক্ষমধ্যে চেয়ার আনয়ন করিলাম। বলিলাম, এই ঘরে বসিয়া তাঁহারা খানিক বিশ্রাম করুন। সাফল্যলাভজনিত গর্ব্বে আমি এমনই উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে, যেখানে মৃতদেহ স্থাপিত করিয়াছিলাম,ঠিক তাহারই উপরে সাহসসহকারে আমার চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া বসিলাম।

পুলিস-কর্ম্মচারীরা পরিতুষ্ট হইলেন। আমার ব্যবহারে তাঁহাদের সন্দেহ নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়াছিল। আমি অতিমাত্রায় প্রফুল্লতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। অত্যন্ত সহজভাবে, প্রফুল্লভাবে তাঁহাদের কথায় প্রত্যুত্তর দিতেছিলাম। তাঁহারাও নানারূপ গল্পগুজব করিতেছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার মুখমণ্ডল যেন বিবর্ণ হইয়া গেল; তখন মনে হইল, ইহারা চলিয়া গেলে বাঁচিতাম। আমার মস্তিষ্ক যেন বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, শ্রবণপথে যেন কত কি শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাঁহারা তখনও বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। শব্দ যেন ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত শব্দ—যেন তাহার বিরাম নাই—ক্রমেই যেন শব্দের বেগ প্রবল হইতেছে! মনের এই অবস্থা জয় করিবার অভিপ্রায়ে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা সরলভাবে অবিশ্রান্ত বকিতে লাগিলাম। শব্দ তাহাতে কমিল না, ক্রমশঃ যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, অবশেষে আমি বুঝিলাম, শব্দ আমার কর্ণের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে না।

বাস্তবিক, আমার মুখমণ্ডল তখন অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি সে সময় অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলাম, উচ্চস্বরে গলা চড়াইয়া গল্প করিতেছিলাম। তবু সেই শব্দ শুনিতে পাইলাম—আর আমি কি করিব? সে শব্দ মৃদু, কাতরতাপূর্ণ, অথচ দ্রুতবেগবিশিষ্ট—পকেট-ঘড়ী তুলা দ্বারা আবৃত করিলে যেমন চাপা শব্দ হয়, অনেকটা সেইরূপ! আমি হাঁপাইয়া উঠিলাম—কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা তখনও সে শব্দ শুনিতে পায় নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে উচ্চৈঃস্বরে আমি কথা কহিতে লাগিলাম, কিন্তু শব্দের প্রাবল্য কমিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমি হাত পা নাড়িয়া উচ্চস্বরে তর্ক করিতে

লাগিলাম, তবুও শব্দের গতি বাড়িতে লাগিল। ইহারা চলিয়া যাইতেছে না কেন? মানুষ আমাকে লক্ষ্য করিতেছে ভাবিয়া উত্তেজিত ভাবে দৃঢ়পদে আমি চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম - কিন্তু ক্রমেই শব্দ বাড়িতে লাগিল। হে ভগবান! এখন আমি কি করি? আমার মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতে লাগিল—আমি উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতে লাগিলাম, নানারূপ অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম! যে চেয়ারে আমি বসিয়াছিলাম, উহা তুলিয়া লইয়া সবেগে নিম্নস্থ তক্তার উপর নিক্ষেপ করিয়া যেন শব্দকে ডুবাইয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু সমস্ত শব্দ অতিক্রম করিয়া সেই শব্দ ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে লাগিল। উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে শব্দ যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল। লোকগুলি বেশ প্রফুল্লভাবে বসিয়া বসিয়া তখনও গল্প গুজব করিতেছিল, তাহাদের মুখে হাস্যরেখা। এও কি সম্ভব যে, তাহারা সে শব্দ এখনও শুনিতে পায় নাই? হে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা! না না! তাহারা শুনিতে পাইয়াছে। তাহারা সন্দেহ করিয়াছে—তাহারা জানিতে পারিয়াছে। আমার আতঙ্ক ও বিভীষিকা দেখিয়া তাহারা এতক্ষণ মজা করিতেছিল। আমি এইরূপই ভাবিলাম; আমার বিশ্বাস, তাহাই ঠিক। এ যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা অদৃষ্টে যাহা হয় হউক। এ বিদ্রূপ অসহ্য। তাহাদের ভণ্ডামিপূর্ণ হাস্য—আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম, হয় আমি চীৎকার করিব, নয় ত আমার মৃত্যু!—আবার—ঐ শুন! ক্রমেই শব্দ প্রবলতর হইতেছে।

চীৎকার করিয়া বলিলাম, "বদমাস, আর প্রতারণা করিস্ নে। আমি স্বীকার করিতেছি, এ কার্য্য আমিই করিয়াছি। কাঠের তক্তা তুলিয়া দেখ্। এইখানে, এইখানে! এ শব্দ তাহার কুৎসিত হৃদ্‌যন্ত্র হইতে উঠিয়াছে।"*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ।

গত ৩রা চৈত্র কলিকাতা ওভার্টুন হলে যশস্বী কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জাতি-সংঘাতে ও ভাব-সংঘাতে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই প্রদর্শন করা সম্ভবতঃ রবীন্দ্র বাবুর উদ্দিষ্ট বিষয়।

* প্রসিদ্ধ মার্কিন সাহিত্যিক এড্‌গার অ্যালান পো হইতে অনূদিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভাষার জটিলতায় ও মোহিনী কল্পনার বাহুল্যে তাঁহার সে উদ্দেশ্যে বিফল ও সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছে। তিনি যে ভাষায় ঐ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহা ঐরূপ সন্দর্ভের উপযোগিনী নহে; তিনি যে তথ্যের সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা অনুসন্ধানমূলক নহে; অধিকাংশ স্থলে অনুমানমূলক ও কল্পনাপ্রসূত। বলা বাহুল্য, যে কল্পনা কোমলভাবসর্ব্বস্ব কবিতায় সাফল্য লাভ করে, সে কল্পনা কখনই কঠোর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে সাফল্যলাভ করিতেই পারে না। কবির কল্পনা অস্ফুট চন্দ্রিকার ন্যায় যাহাকেই আশ্রয় করে, তাহারই স্বরূপকে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া এক নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেয়। সেই নূতন সৌন্দর্য্য কোমল ও উদ্দাম কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া পাঠকের চিত্তহরণ করিয়া থাকে। সেই জন্য কবি তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়কে সম্বোধন করিয়াই বলেন;—

I ask not proud philosophy
To teach me what thou art.

অবশ্য সকল কবিই যে ঠিক ঐরূপ কল্পনার প্রভাবে মানবমনকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু যে কবি "কামিনীকে" "শিথিল সাজে" সাজাইয়া, শেফালিকে "আলোক পরশে মারমে মরিয়া" সেই ভাবের লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির প্রভাবে পাঠকের চিত্ত হরণ করিবার প্রয়াসী,— যিনি পসারিণীকে নির্জ্জন বৃক্ষচ্ছায়ায় আঁচল পাতিয়া শোয়াইয়া তাহারই নগ্ন সৌন্দর্য্যে যুবকযুবতীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবের প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছুটাইয়া দিয়া আপনার কবিত্বশক্তিকে সফল করিতে চাহেন, তাঁহার কল্পনা যে এই শ্রেণীর কল্পনার অপচারমাত্র, নিরপেক্ষ বিচারে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কল্পনা যে বাহ্য, ভাক্ত সৌন্দর্য্যে প্রবৃত্তির মোহ উৎপাদন করিয়া মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকে,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ কল্পনা সত্যসন্ধানের পরিপন্থিনী ও মোহ-উৎপাদনে পটীয়সী। এ কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের ধারা-সন্ধান্ প্রয়াস নিতান্তই নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

ঐতিহাসিকের পক্ষে কল্পনা যে একবারেই অনাবশ্যক, এ কথা আমি বলি না। ঐতিহাসিকের কল্পনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। সে কল্পনা ভাবের আকাশে উদ্দাম ও উধাও হইয়া ছুটে না, বিচার শাস্ত্রের লৌহনিগড়ে নিবদ্ধ থাকিয়া উহা তথ্যের অনুসারী হইয়া সাবধানে ও সন্তর্পণে চলিতে বাধ্য ঐতিহাসিককে বৈজ্ঞানিকের ন্যায় অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে

তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হয়, সংগৃহীত তথ্যগুলির সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হয়। তথ্যগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া তাহা যথাক্রমে সজ্জিত করিতে হয়; সজ্জিত তথ্যগুলি দেখিয়া পুরাতন মানব-সমাজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রবাহ রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, শিল্পসাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি কি ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহ নিরপেক্ষভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্যে ও প্রতিকূলতায় ঐ সকল মানবীয় ব্যক্তিগত ও সমাজগত অবস্থা বিকশিত হইয়াছে, তাহাও দেখিতে হয়। বিচারবুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর রাখিয়াই এই কার্য্য করিতে হয়। এই সকল কার্য্য-সাধনে কল্পনাকে দূরে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। নতুবা সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে যদি কোথাও তথ্য-পরম্পরার মধ্যে একটি তথ্য লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, পূর্ব্বাপর তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া, প্রতিবেশ-অবস্থার প্রভাব স্মরণ রাখিয়া, সেই লুপ্ত তথ্যের কল্পনা করিতে হয়। সেই যুগযুগান্তরাগত তথ্য-শ্রেণীর সহিত কল্পিত তথ্য যদি মিলিয়া যায়, যদি অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী তথ্যের সহিত এই কল্পিত তথ্য সম্পূর্ণ সমঞ্জসীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐতিহাসিকের কল্পনা সার্থক ও সফল। শতসূর্য্যকরসমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকে ন্যায়ের নিগড়ে নিবদ্ধ হইয়া ঐতিহাসিকের কল্পনাকে কার্য্য করিতে হয়। ইহাকে অনুমান, inference, বা যে শব্দে অভিহিত কর, ইহা নিয়মনিষ্ঠ কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইতিহাসের ধারা-সন্ধানে ঐতিহাসিক এইরূপ কল্পনারই আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেখানে ঐতিহাসিক স্বীয় কল্পনাকে আবশ্যক সংযমে সংযত রাখিতে না পারিয়াছেন, যেখানে তিনি কল্পনাকে আপনার নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কাটিয়া অনুসন্ধানের ও বিচারের আসরে অনধিকার প্রবেশ করিতে দিয়াছেন,—সেইখানেই উপন্যাস অলক্ষ্যে আসিয়া ইতিহাসের স্থানে জুড়িয়া বসিয়াছে,—ঐতিহাসিকের সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া গিয়াছে।

কল্পনাকুশল রবি বাবু ইতিহাসের ধারা-সন্ধানে কেবল তাঁহার অসংযত কল্পনারই সাহায্য লইয়াছেন। জাতি-সংঘাতে ও ভাবসংঘাতে সভ্যতার বিকাশ—ইহা অবশ্য পুরাতন কথা। রবি বাবু ভারতের ইতিহাসে আদিতে আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য-জাতির সংঘর্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতি-সংঘাত আছে। * * * এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে

যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।" ভারতীয় ইতিহাসের ধারানুসন্ধিৎসু রবি বাবু প্রথমাঙ্কে পর্দ্দা তুলিয়াই প্রচণ্ড সংঘাত দেখিতে পাইয়াছেন। সে সংঘাত আর্য্যের সহিত অনার্য্যের! পুরাণ-বর্ণিত দেবাসুরের যুদ্ধে য়ুরোপীয়েরা আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘাত দেখিয়াছেন। রবি বাবুও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন। আমরা বাল্যকাল হইতে এই বিষয়টি পড়িয়া ও শুনিয়া আসিতেছি, সেই জন্য অভ্যাসদোষে তাহাতে আমাদের সহসা খট্‌কা লাগে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি তাদৃশ বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। পুরাণ-বর্ণিত অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞা[illegible]ী উভয়ে কশ্যপের সন্তান। কশ্যপের দুই পত্নী; দিতি আর অদিতি। ইঁহারা দুই সহোদরা ভগ্নী, উভয়েই দক্ষপ্রজাপতির কন্যা। দিতির সন্তানগণ দৈত্য বা অসুর; অদিতির সন্তানগণ দেবতা বা সুর। এক পক্ষের গুরু বৃহস্পতি, অন্য পক্ষের গুরু শুক্রাচার্য্য। অমৃত-বণ্টন লইয়াই উভয় পক্ষে বিবাদের উদ্ভব। দেবতা ও অসুর উভয়ে মিলিত হইয়াই সমুদ্র মন্থন ক[illegible]। ; শেষে অমৃত উঠিলে দেবতারাই তাহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। অমৃত অমরত্বজনক দ্রব্যবিশেষ। অমৃতের অন্য অর্থ,—অন্ন, ধন ও রত্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, দেবাসুরের যুদ্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া জ্ঞাতি-বিরোধ নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর যদিই উহা জ্ঞাতি-বিরোধই হয়, তাহা হইলে সমস্ত পুরাণে উহা জ্ঞাতি-বিরোধ বলিয়া বর্ণিত হইল কেন? রবি বাবু এ সকল তথ্যের মীমাংসা না করিয়াই পাশ্চাত্যদিগের এই কাল্পনিক সিদ্ধান্তটি নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত।

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের কাহিনীতে রবি বাবু একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে, দেখিতে পাইয়াছেন। "জন্মেজয় সর্প-উপাসক নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।" কিন্তু পুরাণে প্রকাশ,—ইন্দ্র নাগদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বেদের দেবতা ইন্দ্র আর্য্যদিগকে ছাড়িয়া অনার্য্যদিগের সহায়তা করিলেন কেন? রবীন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব।

ইহার পর রবীন্দ্র বাবু আপনার উদ্দাম কল্পনাবলে আর্য্য অনার্য্যের যোগবন্ধনের একটা যুগের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তিনি তিন জন ক্ষত্রিয়কে এই যোগবন্ধনের নেতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রই সেই নেতৃত্রয়। ঐ তিন জন ক্ষত্রিয় অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্য-

দিগের কি যোগবন্ধন করিয়াছিলেন, রবি বাবু তাহার কিছুমাত্র আভাস প্রদান করেন নাই। রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে আপনার মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্যদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন; অতএব, তিনি আর্য্যের সহিত অনার্য্যদিগের যোগবন্ধন করিয়াছিলেন, ইহাই রবি বাবুর কল্পনা। কিন্তু এই রামচন্দ্রই অন্যায়-যুদ্ধে বালিকে বধ করিয়াছিলেন, রাক্ষস-বংশ নির্ব্বংশ করিয়া বিভীষণকে বিধবা-পূর্ণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহাও কি যোগবন্ধনের উদ্যোগের অঙ্গ? ইহাই যদি মিত্রতা হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, আমেরিকা-প্রবাসী য়ুরোপীয়গণ ও অষ্ট্রেলিয়ার শেতাঙ্গগণ তথাকার আদিম অধিবাসীদিগকে উজাড় করিয়া এইরূপ যোগবন্ধনের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছেন!

রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের মিত্র ছিলেন, দেখিয়াই রবিবাবু আর্য্য-অনার্য্যের যোগবন্ধনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই গুহক চণ্ডাল যখন রামচন্দ্রকে খাদ্য দিয়াছিল, তখন তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

যত্ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্।
সর্ব্বং তদনুজানামি ন হি বর্ত্তে প্রতিগ্রহে॥

"তুমি প্রীতিসহকারে আমার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি না।" গুহক-ভবনে তিনি লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আনীত গঙ্গাজলমাত্র পান করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

ততশ্চীরোত্তর সঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্॥

"পরে সেই চীরোত্তরধারী রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আনীত জল পান করিলেন।" সুতরাং রামচন্দ্র লোকাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক কোনওরূপ অপূর্ব্ব যোগবন্ধনের উদ্যোগ করেন নাই। গহন বনে নির্ব্বাসিত ও নির্ব্বান্ধব অবস্থায় রাক্ষস কর্ত্তৃক সাধ্বী পত্নী অপহৃত হওয়াতে তিনি দায়ে পড়িয়া সুগ্রীবের সহিত যোগবন্ধন করিয়াছিলেন। রবিবাবু আর্য্য ও অনার্য্য দিগের মধ্যে যে ভেদের কল্পনা ও উভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষের ইঙ্গিত করিয়াছেন,—পুরাণাদিতে তাহার পোষক কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না ভরত সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন,—

ত্বমাস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ।
সৌহৃদাজ্জায়তে মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণং

"হে সুগ্রীব! উপকার দ্বারাই লোক মিত্র ও অপকার দ্বারাই লোক শত্রু হইয়া থাকে। (তুমি আমাদের উপকার করিয়াছ, সেই জন্য) আমাদের চারি ভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইলে।"

রবিবাবু আপনার উদ্দাম কল্পনাবলে এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রের দ্বারা আর্য্য-অনার্য্যের যোগবন্ধনের যে বিরাট 'থিওরী রচিয়াছেন, ভারতীয় পুরাণাদিতে তাহার ক্ষীণ আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সম্বন্ধ যেরূপ ছিল, পরেও সেইরূপ ছিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ হরিশ্চন্দ্র শ্মশান-চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। পুরাণে এইরূপ আরও দুই একটি উদাহরণ দেখা যায়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ সীতাকে লইয়া একটা বিরাট রূপকের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সীতা মানবী নহেন. "হলচালনরেখামাত্র।" "সীতা লাঙ্গলপদ্ধতিঃ," ইহাই অমরকোষের ব্যাখ্যা। জনক রাজা সীতার জনক; অর্থাৎ, তিনি হলচালনরেখার উৎপাদক, বা কৃষিবিদ্যার আবিষ্কর্তা। রবি বাবুর মতে, এই জনকই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই জনক এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন আর এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন।" এই উক্তিতেই রবিবাবুর পুরাণাদিতে বিরাট অজ্ঞতা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। মিথিলা রাজ্যে এক জন জনক ছিলেন না। মিথি জনক হইতে আরম্ভ করিয়া কৃতি জনক পর্য্যন্ত পঞ্চাশ জন রাজা জনক নামে অভিহিত। (১) ইঁহারা মিথিলার অধিপতি ছিলেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক রাজা আত্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। (২) বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথমেই যে "জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব" বলিয়া উল্লেখ আছে,—তিনি বৈদেহ জনক। ইনিই প্রথম জনক। বশিষ্ঠের শাপে ইক্ষ্বাকুতনয় নিমির যখন দেহান্ত হইয়াছিল,— তখন তাঁহার কোনও পুত্র ছিল না। মুনিগণ অরাজকতার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা অরণী-কাষ্ঠে নিমির মৃতদেহ মন্থন করিতে আরম্ভ

---

(১) বিষ্ণুপুরাণ; ৪র্থ অংশ; ৫ম অধ্যায়।

(২) ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ এতেষামাত্মবিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি— বিষ্ণুপুরাণ; ৪।৫।১৪

করিলেন। মন্থন-প্রবাহে সেই মৃতদেহ হইতে এক পুত্র জন্মে। বিষ্ণু-পুরাণকার লিখিয়াছেন,—

"অভূদ্বিদেহোঽস্য পিতেতৈ বৈদেহো মথনান্মিথিরভূৎ।"

বিদেহ (বিগত-দেহ) পিতা হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম বৈদেহ, এবং মন্থন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম মিথি হয়। ইঁহার কেহ জনক ছিল না বলিয়াই ইনি 'জনক' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বৈদেহ জনকই ব্রহ্মিষ্ঠ; ইনিই যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত ছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইনিই কি সীতার পিতা ছিলেন? না। ইঁহার ঊনবিংশ পুরুষ পরে সীরধ্বজ নামে এক জনক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি হ্রস্বরোমার পুত্র। ইনি পুত্র-কামনায় যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় হলমুখে সীতা নামে দুহিতা সমুৎপন্না হন। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে,—"তস্যাপি পুত্রো হ্রস্বরোমা ততঃ সীরধ্বজোঽভূৎ। তস্য পুত্রার্থং যজনভুবং কৃষ্টঃ সীরে সীতা দুহিতা সমুৎপন্নাসীৎ।"

এই সীরধ্বজ যে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাহার নিতান্তই প্রমাণাভাব। এই বংশের বহু রাজা আত্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেন,—ইহাতে সকলেই আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতেন, ইহা বুঝায় না। সীর শব্দের অর্থ,—সূর্য্য ও হল। এই জনক রাজার ধ্বজে সীর বা সূর্য্য (অথবা হল) অঙ্কিত ছিল। ইহারা ইক্ষাকুবংশ-সমুদ্ভূত। কারণ, নিমি ইক্ষাকুরই পুত্র।

রামচন্দ্রও ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত। তবে কি রাম সগোত্রে বিবাহ করিয়াছিলেন? লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সীরধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যাদিগকে বিবাহ করেন। কিন্তু এইরূপ সগোত্রে বিবাহ আর্য্য সমাজের সম্পূর্ণ আচার-বহির্ভূত। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ কখনই এরূপ অনার্য্যপ্রথার আশ্রয় লইতে পারেন না। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, অপুত্রক নিমির দেহান্তের পর ঐ বংশ লুপ্ত হয়। মুনিগণ তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ এক জনকে মিথিলার সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত ও অনুগৃহীত বংশে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকৃষ্টরূপে অনুশীলিত হইত।

এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, রবিবাবু কল্পনাবলে হস্তে লাঙ্গলের মুঠ ও মগজে ব্রহ্মবিদ্যা দিয়া যে Arcadian জনক রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন,—

তাহার সমর্থক কোনও তথ্যই হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বারান্তরে অন্যান্য কথার আলোচনা করিব।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

"When a nation begins to inquire into its past, it is already beginning to decay." অর্থাৎ, যখন কোনও জাতি অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অতীতের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়, তখনই জানিবে যে, সেই জাতির অধঃপতন আরব্ধ হইয়াছে। যখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়, তখনই অতীতের আলোচনা আরব্ধ হয়, তখনই জাতির অধঃপতনের সূচনা হয়। কেন না, কর্ম্মশক্তির হ্রাস হইলেই, জাতির জীবনে জড়তা দেখা দিলেই, আর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা চলে না। অতীত এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করিব, এই আকাঙ্ক্ষা যে জাতির আছে, সেই জাতিই ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারে; যে জাতির এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জাতিই অতীতের আলোচনায় সুখ ও শ্লাঘা বোধ করে। যে জাতি কেবল অতীত লইয়া ব্যস্ত, সেই জাতির পূর্ণমাত্রায় অধঃপতন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তটা লইয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডের বুধমণ্ডলে একটু আলোচনা চলিতেছে। সিদ্ধান্তটা জর্ম্মণ-মনীষাসঞ্জাত, তথাপি উহা এখন ইউরোপের সর্ব্বদেশের বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত। এই সিদ্ধান্তটা লইয়া বাঙ্গালা দেশে একটু আলোচনা হইলে ভাল হয়। সম্প্রতি বাঙ্গালীর বিদ্যাবুদ্ধি যেন কেবল অতীতের দ্বারোদ্ঘাটনে ব্যস্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতের দিকে তিলমাত্রও কাহারও দৃষ্টি নাই। বর্ত্তমানে অসন্তুষ্ট হইয়া অতীত ও অনাগতের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখিয়া যদি কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে জাতির কল্যাণসাধন সম্ভবপর হইতে পারে।

"Like the wind of a March dawn the spirit of a new epoch blows through high heaven from the unknown into the unknown." প্রথম বসন্তের প্রভাত-সমীর যেমন চক্রবালের এক

অজ্ঞেয় ক্রোড় হইতে প্রবাহিত হইয়া আর এক অজ্ঞেয় ক্রোড়ে চলিয়া যায় ; এবং যাইবার সময়ে ধরণী-বক্ষের উপর বাসন্তনবজীবনের নবানুরাগ ফুটাইয়া দিয়া যায়, তেমনই জাতির নবীনতা, নবযুগের নবভাব অজ্ঞেয় অতীত হইতে প্রবাহিত হইয়া অজ্ঞেয় ভবিষ্যতে মিলাইয়া যায়। যে জাতি কেবলই অতীতকে দেখে, সেই জাতি যে অধঃপতিত, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই, পরন্তু যে জাতি অতীতের আলোড়ন করিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করে, সেই জাতি যে সজীব ও উন্নতিশীল, সে পক্ষেও কোনও সন্দেহ নাই। পুরাণেতিহাসের চর্চ্চার কথা ধরিয়া "টাইম্‌সে"র সাহিত্যিক লেখকগণ এই সিদ্ধান্তের সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।

Victor Hugo. His Life and Work. By A, F, Davidson. ভিক্টর হিউগোর জীবনকথা, ইংলণ্ডের সাহিত্যের এই মাসের উল্লেখযোগ্য প্রধান পুস্তক। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ডেভিডসন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কাজেই এই পুস্তকখানি লইয়া বিলাতের বিদ্বজ্জন-সমাজে বেশ একটু সুমিষ্ট আলোচনা চলিতেছে। মিঃ ডেভিডসন ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ইতিহাস তিনি যেমন জানিতেন, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ব্যতীত অন্য কোনও সুধী ইংরেজ তেমন জানিতেন না বলিয়া মিঃ ডেভিডসনের খ্যাতি ছিল। ভিক্টর হিউগো ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী প্রতিভার অবতারস্বরূপ ছিলেন ; ঐ কালের দোষ ও গুণ তাঁহাতেই পরিস্ফুট ছিল ; ঐ শতাব্দীর ভাব—পাপ ও পুণ্য—বিলাস ও সন্ন্যাস—ভিক্টর হিউগোর উপন্যাসরাশিতে ন্যস্ত রহিয়াছে। যিনি ভিক্টর হিউগোকে বুঝিতে পারিবেন, তিনি গত শতাব্দীর ফরাসী ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন। ডেভিডসন নির্ম্মম ও নিরপেক্ষ সমালোচক—বিশ্লেষক হইয়া ভিক্টর হিউগোর জীবনের পাপ পুণ্য সবই উলঙ্গভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি ভিক্টর হিউগোর প্রশংসা করেন নাই, তাঁহার দোষের জন্য নিন্দাও করেন নাই ; গ্রন্থকার কেবল ভিক্টর হিউগোর জীবনের কার্য্যকারণশৃঙ্খলা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে, "objective method in biography" অর্থাৎ, বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসারে জীবনবৃত্ত-লিখনের ব্যবস্থা। ডেভিডসনের লিখিত ভিক্টর হিউগোর জীবনচরিত এই objective methodএর আদর্শ পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিক্টর হিউগোর সহিত সুপরিচিত ; তাঁহার এই

জীবনচরিতখানিও বাঙ্গালী কাব্যামোদিমাত্রই পড়িবেন। ফরাসী গতিয়ের (Gautier) লিখিত ভিক্টর হিউগোর জীবন-কথা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ডেভিডসনের পুস্তকে অনেক নূতন সামগ্রী পাইবেন।

Court Minutes of the East India Company 1635—1639; 1640—1643, 1644—1649, (Oxford, Clarendon Press) এই একখানি মজার বহি প্রকাশিত হইতেছে। সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত জয় করিয়াছিল, সিপাহী যুদ্ধের বহ্নিজ্বালায় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভস্মসাৎ হইয়াছিল, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ইংলণ্ডের রাজ-দরবারের সম্বন্ধ ও ব্যবহারের কথা দরবারের রোজনাম্চা হইতে সংগ্রহ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতসচিবের মহাফেজ বা রেকর্ড-কিপার ফষ্টার ইহার সম্পাদন ভার লইয়াছেন। ইহার সকল খণ্ড প্রকাশিত হইলে ভারতে ইংরাজ-বিজয়ের অনেকটা সত্য ইতিহাসকথা আমরা জানিতে পারিব। "টাইমসে"র সমালোচক বলিতেছেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবিজয় কার্য্যে এতটা সফলতা লাভ করিবার হেতু আছে; তাহা এই;— "The East India Company were not for king nor for Parliament, but for themselves, and for that reason for the English nation. In time of civil war they stood for continuity, for maintaining English interests abroad which were their own interests, not for the interests of this or that political party." অর্থাৎ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ জাতির অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেন; কোনও রাজা বা রাজনৈতিক দলের সহিত তাঁহারা স্বীয় স্বার্থকে বিজড়িত করেন নাই। তাই ইংলণ্ডের রাজবংশ-বিশেষের উত্থান পতনের সহিত কোম্পানীর স্বার্থের উত্থান পতন ঘটে নাই। ফরাসী ব্যবসায়িগণ ইংরেজ কোম্পানী অপেক্ষা মনীষায় ও অধ্যবসায়ে শ্রেষ্ঠতর হইলেও, তাঁহারা রাজনীতিক দলাদলীর সহিত নিজেদের স্বার্থ জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তাই ইংরেজ কোম্পানী, because they were at once private adventurers and adventurers under cover of the State, they did England's work as it could not otherwise have been done. যেহেতু তাঁহারা স্বীয় স্বার্থসাধন জন্য বিদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তার করিবার জন্য গিয়াছিলেন, এবং সে স্বার্থ সরকারের চার্টার বা সনন্দ দ্বারা

সুরক্ষিত ছিল, তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ভাবে ইংরেজ জাতির স্বার্থ-পুষ্টি করিয়াছিলেন, তেমন ভাবে স্বার্থপুষ্টি আর কিছুতেই হইতে পারিত না। কথাটা ঠিক। ইতিহাসতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী এই গ্রন্থের অনুশীলন করিলে উপকৃত হইবেন।

বিলাতে উপকথার বিজ্ঞান বা সায়ান্স রচিবার উদ্যোগ হইতেছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর Comparative Mythologyর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; এখন কেবল উপকথার বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হইতেছে। মিঃ ওয়ের্ণর লরি (Mr. Werner Laurie) ভারতের পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাকোষ, কথা-সরিৎসাগর, বত্রিশসিংহাসন, ভর্ত্তৃহরির বিজ্ঞানশতক প্রভৃতি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করিতেছেন। ইরাণ, তুরাণ, আরব, ইহুদা, চীন ও জাপানী উপকথা সকল যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা ভাষান্তরিত করান হইতেছে। এই কার্য্যে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজ এই অর্থ যোগাইবেন। অনুবাদের কার্য্য শেষ হইলে মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে গল্পগাছার শ্রেণীবিভাগ করা হইবে; পরে উহাদের উৎপত্তির বিবরণও লিপি-বদ্ধ হইবে। জর্ম্মণী ও ফ্রান্সের পণ্ডিতগণও এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা হইতেই Man and his moral sense মনুষ্যের ধর্ম্মভাবের ইতিহাস লিখিত হইবে, ধর্ম্মাধর্ম্মভাবের বিশ্লেষণ করা হইবে, এবং মনুষ্যজাতির উত্থান-পতনের হেতু নির্ণীত হইবে। জগতের সকল যুগের সকল ধর্ম্ম, সকল প্রকারের সভ্যতা যে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বিন্যস্ত, এক অপরের সাহায্যে ফুটিয়াছে, এক অপরের ভগ্ন স্তূপের উপর স্বীয় মহত্ত্বের মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে, ইহারই আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টায়, এই অনুবাদ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। ইউরোপ যে এখনও কতকটা সজীব, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যাইতেছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা, চৈত্র। গত চৈত্রে প্রতিভার প্রথম বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। মুদ্রাযন্ত্রের সূতিকাগার ত্যাগ করিয়া যে সকল মাসিক বাঙ্গলার কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মাসিকপত্রকে দীর্ঘজীবন দান করা কিরূপ কঠিন, তাহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন অন্যে জানে না। বিশেষতঃ, যাহাদের পশ্চাতে কোনও 'ঠেকো' নাই, যাহাদিগকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাদের পদে পদে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্ব-সাধারণের মনোরঞ্জন অসামান্য চেষ্টাসাপেক্ষ। আশা করি, প্রতিভা দীর্ঘজীবন লাভ করিবে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ যে পত্রিকা-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনাহারে জীবন্মৃত হইবার আশঙ্কা নাই, এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায়। প্রতিভার আলোচ্য সংখ্যায় রায় বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই, "হূণ ও মোঙ্গল জাতীর পরিচয় ও আচার ব্যবহারে"র আলোচনা করিয়াছেন; প্রবন্ধটি নানা তথ্যে পূর্ণ। রায়বাহাদুর বহুদর্শী দেশপর্য্যটক। তিনি অভিজ্ঞতা দ্বারা হূণ ও মোঙ্গল জাতি সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য হইবারই কথা। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বার্দ্ধক্যের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া যে আশা করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে কখনও পূর্ণ হইবে কি? তিনি লিখিয়াছেন,—"বঙ্গের কৃতবিদ্য যুবকগণ এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ যদি দেশভ্রমণাদি বিষয়ে যত্নবান হন, এবং যথাসম্ভব স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।" আমরা চাকরী দ্বারা স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তিনি যে প্রকার দেশভ্রমণাদির পথপ্রদর্শক তাহা বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর স্বপ্নের অতীত বলিয়াই মনে হয়। আমরা অনেকেই জানি না, আমাদের বাসগ্রামে কোন কোন ফসল উৎপন্ন হয়, কোন প্রাচীন বংশ কিরূপে সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমরা মঙ্গোলিয়া ও সাইবীরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের গতিনির্ণয় করিতে যাইব? তিব্বতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ প্রচারকগণের কীর্ত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব?—"ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণের একপৃষ্ঠা" শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়ের ভৌগোলিক সন্দর্ভ। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে, অথচ বর্ণনা নীরস নহে। শুষ্ক ভূগোলের কথা জ্যৈষ্ঠের এই কাঠফাটা রৌদ্রে শুষ্ক মৃত্তিকার মত সুকোমল! সেই কথা সরস করিয়া বলা যথেষ্ট শক্তির পরিচায়ক। প্রত্যেক জেলার এইরূপ ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করিলে অনেক লাভ হইতে পারে। 'উৎক্রোশ পক্ষী' কবি শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের কবিতা। কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত 'ফিলজফি'র উচ্ছ্বাস আছে; যথা,—

> তামসী পক্ষিণী এই স্তিমিত নয়নে ধ্যান ধরে,
> আছিল না এত কাল এই বিশ্ব ডিম্বের উপরে?

'বিশ্বডিম্বের উপর তামসী পক্ষিণীর ধ্যানে খুব 'ওরিজিনালিটী' আছে, তাহা অস্বীকার করিব না।। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে; কবি আরও বলেন,—'ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়-শাবক, তীব্র উৎকণ্ঠায় যেমন অজাতপক্ষে আলোকতৃষ্ণায় ফুকারে'—অমনই রাত্রি পোহাইয়া যায়! এরূপ ওজস্বিনী

কল্পনা সকলের মস্তিষ্ক-কোটরে অণ্ড প্রসব করে না, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় দেখি না।—"নামিকো" শ্রীমতী হেমনলিনী রায়ের 'সুপ্রসিদ্ধ সত্যঘটনামূলক আধুনিক জাপানী উপন্যাসে'র অনুবাদ। দুইটিমাত্র পরিচ্ছেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং মতামত-প্রকাশ অসম্ভব। তবে লেখিকা কিছুদিন অনুবাদে হাত পাকাইয়া সাহিত্য-মঞ্চে অবতরণ করিলে তাঁহার রচনা মধুর হইবার সম্ভাবনা ছিল। "যোষু প্রদেশান্তর্গত উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য প্রসিদ্ধ ইকাও সহরে সন্ধ্যা সমাগত প্রায়"—প্রকৃতির অনুবাদ মথিলিখিত সুসমাচারের ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নবীনা লেখিকাকে নিরুৎসাহ করিতে চাহি না; ভাষায় তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু "ছোট করিয়া কাটা চুলে আচ্ছাদিত তার মাথাটি চেস্‌নটের মত গোলাকার ও রৌদ্রদগ্ধ মুখ অ্যাপেলের মত লাল। * * এবং যদিও তার গোঁফ জোড়াটা শুঁয়া পোকার মত—তবুও" আমরা বঙ্গসাহিত্যে এরূপ ভাষা বর্জ্জনীয় মনে করি। যে সকল হতভাগ্য পাঠক চেস্‌নট ও অ্যাপেল কখনও দেখে নাই, তাহাদের কল্পনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া লাভ কি?—শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা"র জের এইবার শেষ হইল। কবি শ্রীকালিদাস রায়ের "নবীন সৃষ্টি" 'সঙ্গীত', বঙ্কনীর অনুগ্রহে এই সত্য অবগত হইলাম। মহাকবি কালিদাসও 'নবীন সৃষ্টি' করিতে সাহস করেন নাই। শুনিয়াছি, বিশ্বামিত্র সে সাহস করিয়াছিলেন, নারিকেলে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাই। কিন্তু কবি কলিদাসের 'নবীন সৃষ্টি' কিছু গোলমেলে। তিনি গায়িতেছেন,—

'এস নাথ মম হৃদয়-পদ্মে
তুলি বীণে আজি ঝঙ্কার।
গাহ দেব গাহ পরমানন্দ
প্রলয়াবসানে দেবের বৃন্দ,

নিনাদি অম্বু, জাগাক কম্বু
সৃজন মন্ত্র ওঙ্কার।
হৃদয় মহানভে কর হে স্রষ্টা
নবীন সৃষ্টি সূচনা'।—ইত্যাদি।

কোন্ কথাটা সত্য? হৃদয় "পদ্ম", না হৃদয় "মহানভ"? 'হৃদয়'-পদ্মটা যদি দেখিতে দেখিতে মহানভে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে কবির ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে কে অবিশ্বাস করিবে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বিশ্বামিত্রের 'নূতন সৃষ্টি' অপেক্ষা কবি কালিদাসের 'নূতন সৃষ্টি' অধিকমাত্রায় মৌলিক! কবি যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু প্রতিভার 'হল্‌মার্কে' তাহা সাহিত্যের বাজারে চালাইবার চেষ্টা করা বৃথা। শ্রীসুখরঞ্জন রায়ের "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" পূর্ণতেজে চলিতেছে, যেন হাজার-মনে সুঁদরীকাঠ-বোঝাই নৌকা। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমরা দৈনন্দিন সংসার-জীবনে অল্পবিস্তর গম্ভীর, তাহার কারণ আমরা অল্পবিস্তর সংসারের দাস, সংসারের পাকের মধ্যে জড়াইয়া আছি।" আমাদের 'সংসার-জীবনের অল্পবিস্তর গাম্ভীর্য্যে'র এত বড় গুরুতর কারণ আছে, তাহা জানিতে পারিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। "এবং চক্রবর্ত্তীর হাস্যরসসম্পৃক্ত ভাষা বিজেতার ভাষা, যিনি সংসারের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার ভাষা।" পড়িয়া মনে হয়, চক্রবর্ত্তীর ভাষা কিরূপ, তাহার সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে লেখকের বিবেচনা করা উচিত ছিল, তাঁহার ভাষাটা কিরূপ। "আনন্দের কাজ পরোক্ষে অন্তরের জাল জটিলতাকে শিথিল সরল করিয়া

দিয়া অন্তর্নিহিত আনন্দধারার প্রকাশ প্রবাহের পথকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া; অথবা, যাহা একই কথা, আনন্দের বার্ত্তা পাঠাইয়া অন্তরের আনন্দ নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দেওয়া"—প্রভৃতি শব্দসমষ্টি পাঠ করিয়া মনে হয়, লেখক ইংরাজীতে চিন্তা করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-সমালোচনার স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহার এরূপ ভাষার দৈন্য উপেক্ষার বিষয় নহে। বাঙ্গালা ভাষাটা যে দিনদিন কুজ্‌ঝটিকা-ময়ী হইয়া উঠিতেছে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পরিচালিত পত্রিকায় এরূপ ভাষা মঞ্জুর হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "গায়ক পক্ষী" বিহঙ্গরাজের পরিচয় দিয়াছেন। "মা ও মেয়ে" শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষের অনূদিত গল্প। আজ কাল অনেক মাসিকেই বিদেশী ছোট গল্পের অনুবাদ দেখিতেছি। মোপাঁসা বাঙ্গলায় আসিয়া দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন। "পরিবিবি" একটি ঐতিহাসিক কবিতা, শায়েস্তা খাঁর দুহিতার সমাধি-মন্দির-দর্শনে ভাবোচ্ছ্বাস। শ্রীরাজনারায়ণ দাস "পৃথিবী ও পরমাণু" নামক বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব নাই। অনেক কথা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তৃতীয় ভাগে আছে। শ্রীঅতুলচন্দ্র "পরি বিবির সমাধি" প্রসঙ্গে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেনের "বাণী পন্থা" চলিতেছে। বর্ষ শেষ হইল, কিন্তু 'ক্রমশঃ' বাড়িয়া চলিল। আমরা ইহার উপসংহারের প্রতীক্ষায় রহিলাম। শ্রীমতী রাজবালা দেবীর "অদৃষ্টের জয়" উপকথা, তোষিণীর যোগ্য।

ভারতমহিলা, বৈশাখ।—বর্ত্তমান সংখ্যায় ভারতমহিলা অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রথমেই একখানি চিত্র,—কিরাত ও অর্জ্জুনের ত্রি-বর্ণে মুদ্রিত ছবি। মল্লবেশী কিরাত ও অর্জ্জুন ক্রোধে আপাদমস্তক তাম্রবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত। বাঙ্গলা ভাষার সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাহারা ছবিখানি দেখিয়া আমেরিকার red indianএর ছবি বলিয়া ভ্রম করিবে। বীরদ্বয় যুদ্ধ করিতেছেন, কি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছেন, মুখ দেখিয়া তাহা অনুমান করা অসাধ্য। "নববর্ষে নিবেদন" একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস, অতীত বর্ষের খতিয়ান। "বর্ষ আবাহন" শ্রীহরিপদ দে নামক নবীন কবির চতুর্দ্দশপদী কবিতা। কবিতার শেষ দুই চরণ এইরূপ,—

"আর এক দূর কোন কুটীর-দুয়ারে
আগ্রহে দাঁড়ায়ে কবি আছে তব তরে।"

'দুয়ারে' ও 'তরে'র মিল 'যা পদ্য, যা মিলে যা!' মিলের জন্য কবি কিছুদিন বালির কাগজে 'মক্সো' করিতে থাকুন। "থেরীগাথা" শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের সুখপাঠ্য সন্দর্ভ। ইহাতে থেরীগাথা নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গাথা-গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীবিপিন-বিহারী চক্রবর্ত্তী মোপাঁস হইতে "ভুল" নামক গল্পটির অনুবাদ করিয়াছেন। মোপাঁসার এই গল্পটি বঙ্গভাষায় একাধিক লেখক কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অনুবাদ সেগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইল না। শ্রীপ্রমোদবালা সেন "গৃহজাত শাকশবজির বাগান" রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া ভারত-মহিলার পাঠিকাগণ যদি উল ও কাঁটি শিকায় তুলিয়া নিড়ানী ধরিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে লেখিকার শ্রম সফল হইতে পারে। "রাণী

সাধনা" শ্রীআনন্দ রায় চৌধুরীর রচিত আসামী গল্প। এই ঐতিহাসিক গল্পটি পাঠিকাদিগের মনোরঞ্জন করিবে। শ্রীকালীমোহন ঘোষ কবিবর রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নামক নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। লেখক কালীমোহন বাবুর 'শ্রী'-বিরাগের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। সমালোচক অসঙ্কোচে দৈববাণী করিয়াছেন,—"এইরূপ আধ্যাত্মিক-ভাবপূর্ণ নাটক বাঙ্গালায় আর নাই।" কিন্তু এই দৈববাণী সকলে ঘাড় পাতিয়া লইবে কি না সন্দেহ। "ঠাকুর্দ্দাই গ্রন্থের মূল সুরও" "মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়া গান জুড়িয়া নৃত্য করেন" প্রভৃতি অপরূপ বাঙ্গালা সমালোচনার অতীত। "মুক্তি ও বন্ধন—জন্ম ও মৃত্যু তাঁর সেই আনন্দের সঙ্গীতকেই বাজাইয়া তুলিতেছে।" 'সঙ্গীত'কে যিনি সমালোচনার জয়ঢাকে 'বাজাইয়া' তুলেন, তিনি সাধারণ সমালোচক নহেন! এই সমালোচক বাঙ্গালা ভাষাকে যে ভাবে 'তুলোধোনা' করিয়াছেন, ধুনুরীও সে ভাবে তুলো ধুনিতে পারে না। শ্রীঅনুরূপা দেবীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের গল্পের ভাষা অনাবশ্যক রসিকতায় ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে,—"পথে সে তাহাদের সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ ও তাহারো উর্দ্ধতন দু'এক জনের সবিশেষ সংবাদ প্রদান করিল।" চৌদ্দপুরুষের খবর অনেকেই দি'য়া থাকেন, কিন্তু লেখিকার মুসলমান পথপ্রদর্শক ফেরীওয়ালা সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত সাড়ে চৌদ্দ পুরুষের সংবাদ দেয়! রসিকতা সুপ্রযুক্ত না হইলে তাহা জ্যাঠামী'র মত অসহ্য হইয়া উঠে। "কিন্তু সেই সর্ব্বত্যাগী ফকির আজ যেমন উন্মাদের মত অধীর হইয়া লুকাইয়া পড়িল, যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন আর কেহ নয়।" এরূপ ভাষা উপন্যাসে অচল। শ্রীমনোমোহন মজুমদার "মানব দেহে"র বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন,—"খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করাই অজীর্ণ রোগের মহৌষধ।" যাঁহারা অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা পোলাও ও মাংসের অনুপান সহ এই মহৌষধটি ব্যবহার করিতে ভুলিবেন না। "ভূপালের বেগমের মক্কা-ভ্রমণে" বেগম সাহেবার ভ্রমণবৃত্তান্তের পরিচয় আছে "বর্ষারম্ভে" শ্রীসরলা দত্তের একটি বাজে কবিতা। "রাজা" শ্রীহেমলতা দেবীর রচিত একটি হেঁয়ালি, কবিতার ভাষায় গ্রথিত বটে।

সুপ্রভাত, বৈশাখ।—"তিনটি তত্ত্ব" শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর দার্শনিক সন্দর্ভ। অন্য এক জন লেখক মাঘের সুপ্রভাতে "বিজ্ঞানে অদৃষ্টবাদ" লিখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাহারই এক রকম প্রতিবাদ। নানা তত্ত্বের উৎকট ভারে প্রবন্ধের বিষয় ও ভাষা উভয়েই প্রপীড়িত; শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এখন" নামক কবিতাটি সুখপাঠ্য। কবিতায় ভাষা স্বচ্ছ, ঝঙ্কারও সুন্দর, কিন্তু এ রূপকের মর্ম্ম-আবিষ্কার করা সহজ নহে। শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্তের "স্যার টমাস রোর দৌত্য" নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ সঙ্কলিত প্রবন্ধ। 'সার টমাসের দৌত্য' বঙ্গসাহিত্যে নূতন নহে। "রূপ গোস্বামীর বৈরাগ্য" শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত কবিতা,—বিশেষত্বশূন্য। শ্রীগণপতি রায়ের চীনবাসিগণের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব" এখনও চলিতেছে। "বিচার" শ্রীসুরূপা দেবীর অনূদিত গল্প। গল্পে অনুবাদের বোটকা গন্ধ। "তখন আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি, আর সেই সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ দেখে সবাই 'আশ্চর্য্য' ও ভক্তিনত হয়ে যাবেন।" "ভগবানের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ" কিরূপ বাঙ্গালা? 'আশ্চর্য্য' ও 'ভক্তিনত' হইবার পূর্ব্বে একথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয়, পাষণ্ড

বলিয়া অভিহিত হইব না? মহম্মদ কে,চাঁদ "মোষলেম রাজনীতি" নিবন্ধে মুসলমান রাজনীতি-লেখকগণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এম্‌স বার্টন" পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "খরশান" কর্শিয়ঙ্গের সচিত্র বিবরণ। শ্রীঅনুরূপা দেবীর ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস "দ্বিপত্নীক" গুরুচণ্ডালী ভাষার লহরী তুলিয়া সমাপ্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। "দান" শ্রীগিরীজা (?) মোহন নিয়োগীর একটি চবৈতুহি। শ্রীক্ষীরোদকুমার ঘোষের "করুণা" কবিতাটি মন্দ নহে।

তোষিণী, বৈশাখ।—সম্পাদক শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী। ঢাকা হইতে এই শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছে। বৈশাখে তোষিণী তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া আশা হইতেছে, তোষিণী শিশুসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। প্রথমেই বনমাঝে 'ধ্রুবের হরি' আরাধনার ত্রিবর্ণমুদ্রিত চিত্র। চিত্রখানির পরিকল্পনা সুন্দর। শ্রীঅবনীকান্ত সেনের "নববর্ষ" কবিতাটি মন্দ নহে। "মিতব্যয়ী শশীপদ," শ্রীশশিভূষণ বসুর চরিত সচিত্র জীবনাখ্যায়িকা। ইহাতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মিত-ব্যয়িতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শশিপদ বাবু যে সকল গুণে সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন, তাহার আলোচনা না করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতারই প্রশংসা করা হইল কেন? মিতব্যয়িতার তুলাদণ্ডেই মানুষের মহত্ত্ব পরিমিত হয় না। "দার্জ্জিলিং" প্রবন্ধটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে প্রায় কিছুই নাই। দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে ছেলেদের কত কথা বলিবার আছে! শ্রীমতী পুষ্পলতা সেনের "ধ্রুব" কবিতাটি সুন্দর। শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তীর "কঙ্গো জাতির বিবরণ" পাঠে শিশুগণ কঙ্গোজাতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবে। কিন্তু কঙ্গোজাতির বিবরণ বলিবার পূর্ব্বে দেশের অজ্ঞাত বিষয়গুলির আলোচনা করিলে অধিক উপকার হয়। আমরা জানি, একটি ছেলে পৃথিবীর সকল মহাদেশের জনসংখ্যা অনর্গল মুখস্থ বলিতে পারিত কিন্তু বরিশাল বা জ্বালামুখীর সন্ধান জানিত না! আগে ঘরের কথা, তাহার পর পরের কথা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়ের "ছাতা" সুখপাঠ্য বটে, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়াছে। "শিক্ষাদান" শ্রীচিন্তাহরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতা। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি গল্প লইয়া এই কবিতা রচিত। কবিতাটির আদ্যোপান্ত উৎকট প্রাদেশিক-তায় পূর্ণ। গাঙ্গুলি কবি লিখিতেছেন,—'হর্ হর্ করে চলেছে গাড়ী ধূয়ায় আকাশ কালো।' কবি দক্ষিণ বঙ্গের লোক হইলে লিখিতেন,—হড়্ হড়্ করে চল্‌ছে গাড়ী ধোঁয়ায় আকাশ কালো।" তার পর, "মাঝে মাঝে খাচ্চে সিগার মেচ বাতিতে ধ'রে।" চুরোট বলিলে কি সিগারের জাতি যাইত?' 'মেচ বাতি' কি পদার্থ? সম্ভবঃ দীপশলাকা। কিন্তু সাহিত্যে বিশেষতঃ কবিতায় 'মেচবাতি' জ্বালিলে অচিরে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা। 'ধরে' ও ধরিয়ে একার্থবোধক নহে। 'চোখে আটা চশমা জোড়া'। 'আটা' বোধ হয়, 'আঁটার' চন্দ্রবিন্দুহীন সংস্করণ। আমরা লিখি 'হাঁপ'। পূর্ব্ববঙ্গের কবি লিখিয়াছেন,—'হাপ্"। শিশু-সাহিত্যে এরূপ প্রাদেশিকতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। স্থানমাহাত্ম্যে কথার সুর ভিন্নরূপ হইতে পারে কিন্তু ভাষায় সেই সুরের অনুসরণ করিলে, ভাষার সার্ব্বভৌমিকতা-রক্ষার আশা থাকে না। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার "আফ্রিকায় হাতী শিকার" লিখিয়াছেন। এক সংখ্যায় আফ্রিকা

মহাদেশ সম্বন্ধীয় দুইটি গল্প, কিন্তু দারজিলিং ভিন্ন দেশের কথা কিছুই নাই। কারণ, 'গেঁয়ো' যোগী ভিক্ পায় না।' শ্রীহেমন্তকুমার গুহের "যত্ন কর" কবিতাটি কবিতা-রচনার ব্যর্থ প্রয়াসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুষ্ক উপদেশ শিশুদের কাছে কুইনাইনের মত তিক্ত। শিবি-চরিতে প্রথমেই ভূমিকার ঘনঘটা। ছোট ছোট প্রবন্ধে এত গৌরচন্দ্রিকা অত্যন্ত অশোভন। আসল পত্রের অপেক্ষা 'পুনশ্চ" দীর্ঘতর হইলে যেমন দেখায়, সেইরূপ। শিক্ষানবীশ লেখকদের শিশুপাঠ্য কাগজে মক্সো করিতে দেওয়া উচিত নহে। শ্রীভুবনমোহন দাস গুপ্তের "তাই যদি হয় দাদা"। এইরূপ একখানি মক্সো। 'কেউ করবে না বাধা, তাই যদি হয় দাদা'—শিশুসাহিত্যেও এ রকম কবিতা ও মিল অমার্জ্জনীয়। শ্রীমতী কুমারী দেবীর "নববর্ষে প্রার্থনা" কবিতাটি তোষিণীর মনে রাখিয়াছে। প্রার্থনারত বালকটির ছবি দেখিয়া বুঝিলাম, সে মুসলমান। আরম্ভে হিন্দু ধ্রুবের ছবি, উপসংহারে মুসলমান ভক্ত বালকের চিত্র। তোষিণী দুই কুল বজায় রাখিয়া সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে।

অর্চ্চনা, বৈশাখ। অর্চ্চনার নবম বর্ষ আরব্ধ হইল। অর্চ্চনা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। "পথের কথা" ঐতিহাসিক হরিসাধন বাবুর রচনা। বেশ সুখপাঠ্য। হরিসাধন বাবুর গল্প বলিবার ভঙ্গী মনোহর। "অনুবাদে প্রমাদ" সম্পাদকের রচিত একটি কৌতুহলোদ্দীপক ক্ষুদ্র গল্প। কিন্তু কেশব বাবুর মত সুশিক্ষিত সুলেখক এই শ্রেণীর গল্পের রচনায় কেন শক্তিক্ষয় করিতেছেন? বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে, এরূপ গল্প কি আমরা তাঁহার নিকট আশা করিতে পারি না? শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'গিরিশচন্দ্র' চলিতেছে। লেখক শ্রদ্ধাভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে অর্ঘ্যদান করিয়াছেন। রচনা আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার মধুর রসে স্নিগ্ধ হইলে সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহী হয়। এই রচনাটি তাহার নিদর্শন। 'হংকঙ' শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত, সুখপাঠ্য ও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য "বৌদ্ধ সাহিত্যে রামায়ণী কথা" সঙ্কলিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের ক্রমশঃ প্রকাশ্য "বিষ্ণুসংহিতার দণ্ডনীতি" চলিতেছে; সম্পাদক স্বয়ং উকীল; দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ। প্রতীচ্য দণ্ডনীতির সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলেন না কেন? শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় "গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ" লিখিয়াছেন। মাইকেলের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কবি গায়িয়াছিলেন,—

"বীর সাজে, অম্বুনাদে কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদায়ে প্রমীলা সতী কেলিকাননে?"

হেমেন্দ্রকুমারের কবিতায় তাহার প্রতিধ্বনি আছে। তাহার অতিরিক্তও কিছু আছে। এমন মুক্তকণ্ঠে গিরিশচন্দ্রের প্রশংসা অনেকের ভাল লাগিবে না, কিন্তু মৃত॰ কবির প্রশংসা স্তুতিবাদ নহে। মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিবার শক্তিও সকলের নাই। বিশেষতঃ যাহারা 'রুচিবায়ু'-গ্রস্ত শুচিবেয়ে স্ত্রীলোকের মত সর্ব্বত্রই লাফাইয়া চলে, হেমেন্দ্রকুমারের কবিতা তাহাদের আচারকে ক্ষুণ্ণ করিবে।

দেবালয়, চৈত্র। এই ক্ষুদ্র মাসিকখানি দেশের লোকের নিকট সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের সুসমাচার বহন করিয়া আনে। কিন্তু কথা ও কাজে সর্ব্বত্র ঐক্য থাকিলেই সুখের বিষয়

হইত। সম্পাদক "কবি নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"হিন্দু সমাজের সংস্কার ব্যাপারে কবি নবীনচন্দ্রের আসন কাহারও নীচে নয়। জড়োপাসনা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, ব্রাহ্মণের অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সংস্কার চাহিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।" হিন্দুর 'জড়োপাসনা' যে জড়োপাসনা নহে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা আমেরিকাবাসী সুসভ্য মার্কিণ জাতিকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ কোনও না কোনও আকারে সকল দেশেই আছে; কোথাও জাতিভেদ কাঞ্চন-কৌলীন্যের ক্রীতদাস, কোথাও তাহা পেশাগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি। বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে সমর্থন-যোগ্য কি না, সে সম্বন্ধেও বিস্তর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। "ব্রাহ্মণের অত্যাচার" ঠিক অত্যাচার কি না তাহাও তর্কের বিষয়। কবি চিরকাল কবিই থাকুন, তাঁহার সংস্কারকের মুখোস অসহ্য। লেখক লিখিয়াছেন,—"পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদপূর্ণ সমাজে থাকিয়া এরূপ আদর্শ কাব্যে প্রচার করা অনেকে কপটতা বা নৈতিক দুর্ব্বলতা মনে করিতে পারেন। হয় ত এরূপ যুক্তির পশ্চাতে অনেক স্থলে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। থাকা সম্ভব।" অতএব দেখা যাইতেছে, লেখকও মানিয়া লইতেছেন,—"ইহা কপটতা বা নৈতিক দুর্ব্বলতা।" অথচ এই লেখকই প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছেন—"আমাদের দেবালয়েও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে কোনরূপ গালি দিবার নিয়ম নাই।" অবশ্য, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কপটতা ও নৈতিক দুর্ব্বলতার আরোপ গালি নহে, সমালোচনার পুষ্পাঞ্জলি। রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন,—"অনেকে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালীর মজ্জাগত দুর্ব্বলতা স্বরূপ যে ভাবপ্রবণতা, তাহার সংস্কারের জন্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশেষ উদ্যম করিয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাকি আবার সেই বৈষ্ণবকবিসুলভ ভাবপ্রবণতাকে বাঙ্গালী-চরিত্রে প্রশ্রয় দিয়াছেন।" "অনেকে বলেন"? এই 'অনেকে' কাহারা, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। ভাবপ্রবণতা বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ, তাহাকে 'বাঙ্গালীর মজ্জাগত দুর্ব্বলতা স্বরূপ' মনে করিয়া তাহার উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইলে কেবল বাঙ্গালী-চরিত্র নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যকেও 'জবাই' করিবার প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সেরূপ 'জবাই' করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবপ্রবণতার বাহুল্যবশতঃই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস অমর হইয়া আছেন। যে ভাবপ্রবণতা কতকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যকে সরস, সুকোমল ও পুষ্পিত করিয়া রাখিয়াছে, সে ভাবরস স্নিগ্ধ মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালী জীবনের মরুস্তর শ্যামল শস্যে সুশোভিত করিয়াছে, তাহার সংস্কারে বা সংহারে কোনও লাভ আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "হিন্দু উপাস্য দেবতার মঙ্গলময় ভাব" চিন্তাশীলতাপূর্ণ উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। তবে যাঁহারা হিন্দুর 'পৌত্তলিকতায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা এরূপ প্রবন্ধের রচনা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র মনে করিবেন। "কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুদিন স্মরণে" সম্পাদকের আর একটি উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের এক স্থানে পাঠ করিলাম, "জাতীয় জীবনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইল, সেই শক্তিসঙ্ঘ ও মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, পৃথিবী তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।"—স্বর্গীয়

ব্রহ্মানন্দের প্রতি অমর্য্যাদা-প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে সংযমহীন উচ্ছ্বাসে শক্তিসজ্ঞ ও মহাবীর্য্যের কেন্দ্র ও উৎকেন্দ্র হইয়া পড়ে; আর পৃথিবীটাও নিতান্ত 'মধুপর্কের বাটি নহে। "সমুদ্রতীরে" নামক কবিতার কবি শ্রীসুশীল কুমার দে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"বৃথা সে বেষ্টন ঘন, অনন্ত চুম্বন!
ভেঙ্গে চুরে কবে বুক হবে এ মিলন?"

'ঘন বেষ্টন' 'অনন্ত চুম্বন' প্রভৃতি অর্থহীন প্রলাপে 'কাব্যি' হয় বটে, কিন্তু ভাষা-সমুদ্রতীরে এই প্রকার কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া লাভ কি? 'অনন্ত চুম্বনে'র সহিত এমন বুকভাঙ্গা মিলন কবির উদ্ভট কল্পনার পরিচায়ক। "মিলনের সাধনক্ষেত্রে" শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল লিখিয়াছেন—"জগতের লোক দেখিবে, হিন্দু তাঁহার ঘোরতর ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানকে শ্রদ্ধা করিতেছেন, মুসলমান হিন্দুকে প্রীতি অর্পণ করিতেছেন। বিরুদ্ধভাবাপন্ন নরনারী অনন্ত-পথযাত্রী হইয়া পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দগান গাহিয়া চলিতেছেন।" শুনিতে বেশ, কিন্তু যে দেশে 'বার রাজপুতের তেরো চুলা', যে হতভাগ্য দেশে ভাইকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দেখিলে লোকের নেত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, সে দেশে 'সাম্য মৈত্রীর এমনি মহতী বাণী' ঘোষণা করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ বিড়ম্বনামাত্র। "পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসবে" সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"আমাদের 'দেবালয়ের' সহিত এই মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ—কত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ।" এই এক ছত্রে প্রচ্ছন্ন অহমিকার এত আস্ফালন! অমরা বিস্মিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন যুগধর্ম্মে চিন্তাশীল সুশিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ সেই আদর্শে পরিচালিত হইতেছেন। কিন্তু সে কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, ততটুকু উদরতাও যাঁহাদের নাই, তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের নিশান ঘাড়ে লইয়া বড়াই করিতেছেন, দেখিলে হাস্যসংবরণ কঠিন হয়। "ভারতবর্ষে ইসলাম" প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় ভারতীয় মুসলমান সমাজকে তৈলাক্ত করিবার প্রয়াসে দৈববাণী করিয়াছেন,—"সেই ত্রিভুবনকম্পকারী মহামিলন, নবভাবের সেই বিশাল জাতীয় জীবন হে ভারতবর্ষের ইস্‌লাম, আজ তোমাদের অপেক্ষায় চাহিয়া আছে।" স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এই তিন লইয়া ত্রিভুবন, সেই ত্রিভুবনকম্পকারী মহামিলনটি কি সামগ্রী, এবং ভারতবর্ষের ইসলামের অপেক্ষায় কিরূপে তাহা 'চাহিয়া আছে',—ইহা দেখিবার উপযুক্ত দূরবীণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা নাচার!

ম্যাডোনা ও শিশু।

চিত্রকর…মুরিলো।

K. V. Seyne & Bros

সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।
দ্বিতীয় সংস্করণ।

গৌড়রাজমালা।

উপক্রমণিকা।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই।" উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যা'য় না;—অনুসন্ধান-চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব।

ইংরাজ রাজপুরুষগণ ইহা অনুভব করিবামাত্র, অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শত-বর্ষব্যাপিনী অনুসন্ধান-চেষ্টায় যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানের প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই;—উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে, বংশানুক্রমে এ দেশে বাস করিতে শিখিয়া, নানাবিধ জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত দেশের ইতিহাসের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত পথে পরিচালিত হইতে পারে, ইহা এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

বিগত এক শত বৎসরের অনুসন্ধান-লব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব-কালবর্ত্তী বরেন্দ্র-মণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসের মূল-সূত্রের সন্ধান-লাভের আশা করা যাইতে পারে। বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন ভূমি বলিয়া,—বরেন্দ্র ভূমি "দেব-মাতৃক" বলিয়া,—[মহানন্দার পূর্ব্ব-তীর হইতে করতোয়ার পশ্চিম-তীর পর্য্যন্ত] নানা স্থানে এখনও অনেক রাজ-দুর্গের, অনেক রাজভবনের, অনেক দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিস্ময়-বিজড়িত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ডাক্তার বুকানন্ হামিল্টন্, জেনারেল (স্যর আলেক্জাণ্ডার) কনিংহাম, ওয়েষ্টমেকট্, রাভেন্সা, (স্যর উইলিয়ম) হণ্টার, অধ্যাপক ব্লক্‌ম্যান প্রভৃতি

বহুসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী বরেন্দ্রভূমির নানা স্থানে তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই বরেন্দ্র-তথ্যানুসন্ধানের প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু অবসরের অভাবে, কেহই ধারাবাহিকরূপে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত করিতে পারেন নাই।

এই সকল কারণে,—বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান-সঙ্কলনের আশায়—বরেন্দ্রমণ্ডলে ধারাবাহিক রূপে তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে,—দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্. এ. [১৯১০ খৃষ্টাব্দে] একটি "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" গঠিত করিয়া, তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার অকাতর অর্থব্যয়, অক্লান্ত অধ্যবসায়, প্রশংসনীয় ইতিহাসানুরাগ, অল্পকালের মধ্যেই, অনুসন্ধান-সমিতিকে সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

অনুসন্ধান-ক্ষেত্র ও অনুসন্ধানের অবসর অল্প হইলেও, অনুসন্ধানের ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই। প্রথম ফলই প্রধান ফল। দেশের লোকে দেশের ইতিহাসের উপাদান-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ প্রণালীতে অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে, প্রথম হইতেই তাহা সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছে। আন্তরিক অনুরাগপূর্ণ সহৃদয়তার সঙ্গে, দেশের লোকের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের সাহায্যলাভ করিতে না পারিলে, অনুসন্ধান-চেষ্টায় সম্যক্ সফলকাম হইবার আশা নাই। ইহা প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর,—অথচ তাহারাই পুরাকীর্ত্তির প্রকৃত সন্ধানদাতা। সহৃদয়তার অভাব থাকিলে, তাহাদিগের নিকট হইতে সকল বিষয়ের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সহৃদয়তার অভাব না থাকিলে, তাহারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নানা বিষয়ের সন্ধান প্রদান করে। অনুসন্ধান-সমিতি এই রূপেই অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সন্ধান-লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

অনুসন্ধান-সমিতি এ পর্য্যন্ত যত দূর অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতেই অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য অনেক স্থান আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে, অনেক চিত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য,—(১) পুরাতন স্থাপত্যের নিদর্শন, (২) পুরাতন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন,

(৩) পুরাতন জ্ঞান-ধর্ম্ম-সভ্যতার নিদর্শন [অপ্রকাশিত ও অপরিজ্ঞাত হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ]।

অনুসন্ধান-লব্ধ ও পূর্ব্বাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া, "গৌড়-বিবরণ" নামক [খণ্ডশঃ প্রকাশিতব্য] গ্রন্থ সংকলন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবামাত্র, অনুসন্ধান-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে আলোচিত হইবে বলিয়া, "গৌড়-বিবরণ" আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা যথাক্রমে—রাজমালা, শিল্পকলা, বিবরণ-মালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ত্ব ও উপাসক-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইবে।

"গৌড়-বিবরণে"র প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড [অনুসন্ধান- সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক] শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ বি. এ. প্রণীত "গৌড়রাজমালা" প্রকাশিত হইতেছে। তাহার সম্পাদন-ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া, অনুসন্ধান-সমিতি আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে নিরতিশয় শ্লাঘার বিষয় হইলেও, এই ভার যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিলেই ভাল হইত।

মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, গৌড়মণ্ডলে সেন-বংশীয় নরপাল-গণের বিজয়-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপূর্ব্বে পালবংশীয় নরপালগণ এ দেশের শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ কথা ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালার নিকটও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। ইহার সঙ্গে জনশ্রুতি অনেক অলৌকিক কাহিনী জড়িত করিয়া দিয়াছে; কল্পনালোলুপ লেখকবৃন্দ তাহাকে অনেক রচনা-মাধুর্য্যে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে পাল-নরপালগণের অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল;—কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে তাঁহাদিগের রাজ্য সেন-বংশীয় নরপালগণের করতলগত হইয়া, আবার কালক্রমে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল;—তাহার সহিত দেশের লোকের কত দূর পর্য্যন্ত কিরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল;—তাহা নানা তর্ক বিতর্কে আচ্ছান্ন হইয়া পড়িয়াছে! বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা [উপযুক্ত আলোচনা-প্রণালীর অভাবে] জন-সাধারণের নিকট শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায়, অনুসন্ধান-লব্ধ যৎসামান্য বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া, ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্কলন কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা স্মরণ করিয়াই, "গৌড়রাজমালা" অধ্যয়ন

করিতে হইবে। এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন "লেখমালা" ;—তাহাতে পুরাতন তাম্রশাসনের ও শিলালিপির পাঠ, বঙ্গানুবাদ ও টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য অবলম্বন,— ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের ও শিলালিপির পাঠ, পুরাতন পুস্তক-নিহিত ঐতিহাসিক জনশ্রুতি, এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐতিহাসিক গবেষণা। তাহা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা সঙ্গত হইয়াছেন, কি না, পাঠক-সমাজ তাহার বিচার করিবেন।

ইতিহাসের উপাদান সংকলিত না হইলে, ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে না ;—তাহা বহুব্যয়সাধ্য, বহুশ্রমসাধ্য, বহুলোকসাধ্য ;—এ সকল কথা বঙ্গসাহিত্যে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেই একমাত্র অন্তরায় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কিরূপ বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবি কহ্লণ "রাজতরঙ্গিণী"র উপোদ্‌ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন—

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থ-কথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী।

আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশ-বাক্য এখনও সম্যক্ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত, বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। পালবংশের ও সেন-বংশের নরপালগণের শাসন-সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যেন তুচ্ছ কথা,—তাঁহাদিগের জাতি কি ছিল, তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়া রহিয়াছে! জনশ্রুতির দোহাই দিয়া, [এক শ্রেণীর গ্রন্থে] দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী মর্য্যাদা লাভ করিতেছে না। এই সকল কারণে, "গৌড়রাজমালা"র লেখক মহাশয় ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই;

বলিয়া, বাঙ্গালীর জনশ্রুতি-মূলক ইতিহাসের প্রধান পাত্র [আদিশূর] ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও তাম্রশাসনে, বা শিলা-লিপিতে, বা সমকালবর্ত্তী গ্রন্থে আদিশূরের অসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। সমসাময়িক গ্রন্থে বা লিপিতে উল্লিখিত ঐতিহাসিক পাত্রগণের প্রকৃত বিবরণের সঙ্কলনেও কিরূপ সতর্ক দৃষ্টিতে বিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সুযোগ্য লেখক মহাশয় "গৌড়াধিপ শশাঙ্ক"র প্রসঙ্গে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, "গৌড়রাজমালা"য় দেখিতে পাওয়া যাইবে,—পাল-নরপাল-গণের অভ্যুদয়-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সমগ্র দেশ বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল; সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল না; বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সবলের কবলে দুর্ব্বলদল নিপীড়িত হইতেছিল; দেশ একেবারে 'অরাজক' হইয়া পড়িয়াছিল! সংস্কৃত-সাহিত্যে এরূপ অবস্থার নাম "মাৎস্যন্যায়"। তাহাকে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। তিনিই পাল নরপাল-বংশের প্রথম ভূপাল,—ইতিহাসে "প্রথম গোপালদেব" নামে উল্লিখিত।

এ দেশের প্রজাপুঞ্জ, অরাজকতা দূর করিবার জন্য, একবার এক জনকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া, প্রজাশক্তির বিধিদত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,—ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ সময়ে প্রজাশক্তির এরূপ উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য।

বাঙ্গালী ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! লামা তারানাথের [তিব্বতীয় ভাষায় নিবদ্ধ] গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক জনশ্রুতির উল্লেখ থাকিলেও, এবং বঙ্গদেশে এই জনশ্রুতির আভাস লৌকিক উপকথায় গ্রথিত রহিলেও, তাহাকে কেহ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের [মালদহের অন্তর্গত খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকায়, এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এই রূপে, [প্রজাশক্তির সাহায্যে] যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র উত্তরাপথে [আর্য্যাবর্ত্তে] প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল।

তাহার কথা এখনও বঙ্গসাহিত্যে যথাযোগ্য ভাবে আলোচিত হয় নাই। এই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথাই "গৌড়রাজমালা"র প্রধান কথা। গৌড়-বিবরণের অন্যান্য ভাগে [শিল্পকলায়, বিবরণমালায়, লেখমালায়, গ্রন্থমালায়, জাতিতত্ত্বে, প্রতিমূর্ত্তিতত্ত্বে, ধর্ম্মতত্ত্বে ও উপাসক সম্প্রদায়ে] যাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও প্রধান কথা,—এই গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা। কারণ, ইহার সকল কথাই বাঙ্গালীর কথা।

একটি কারণে এ সকল কথা বাঙ্গালীর নিকট যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পাল-নরপালগণের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাঁহারা কিরূপে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা মগধবাসী, মগধের অধিপতি ছিলেন; ক্রমে বঙ্গভূমিতে রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, "গৌড়েশ্বর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন;—বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের পদানত হইয়াই বাস করিত। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে পাটলিপুত্রে, দেবপালদেবের তাম্রশাসনে মুদ্গগিরিতে [মুঙ্গেরে], এবং নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনেও মুদ্গগিরিতে "জয়স্কন্ধাবার" সংস্থাপিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া [অনেকের ন্যায়] আমি নিজেও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম,—পঞ্চ-পাল-নরপাল বঙ্গভূমিতে বাস করিতেন না। বরেন্দ্রমণ্ডলে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবামাত্র, সে সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বরেন্দ্রমণ্ডলে সংস্থাপিত গরুড়স্তম্ভের দ্বিতীয় শ্লোকে, ধর্ম্ম [পাল] প্রথমে পূর্ব্ব দিকের অধিপতি থাকিয়া, পরে [মন্ত্রিবর গর্গের মন্ত্রণা-কৌশলে] "অখিল দিকে"র অধিপতি হইবার উল্লেখ আছে। তারানাথের গ্রন্থেও, প্রথমে গৌড়, পরে মগধ, বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "রামচরিত" কাব্যে বরেন্দ্রভূমিই পাল-নরপালগণের "জনকভূমি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং, পাল-নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে আর সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই।

পাল-নরপালগণ যদি বাঙ্গালী হইবেন, তবে তাঁহাদিগের রাজধানী কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল? বাঙ্গালা দেশের কোন্ নিভৃত নিকেতনে বাঙ্গালীর নির্ব্বাচিত বাঙ্গালী নরপাল [গোপালদেব] রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন? কোন্ ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের হৃদয় এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রজাশক্তি-বিকাশের প্রশংসনীয় গৌরবে স্ফীত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল? কেহ কেহ [গৃহে বসিয়াই] ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া, মীমাংসা-সাধনের

অন্য উপায় না দেখিয়া, অনুমান-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—পাল-নরপালগণের রাজধানী এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না ; তাঁহারা জয়স্কন্ধাবারেই বাস করিতে ভালবাসিতেন ; যেখানে যখন জয়স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইত, সেখানেই একটি তৎকালোচিত রাজনগর গঠিত হইয়া উঠিত।

রাজার পক্ষে এরূপ "যাযাবর-বৃত্তি" কখনও কখনও আনন্দপ্রদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, রাজ্যের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। যে রাজবংশ আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল, কোনও স্থানেই তাহার স্থায়ী রাজধানী বর্ত্তমান ছিল না,—এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহসী না হইয়া, অনুসন্ধান-সমিতি, বরেন্দ্র-মণ্ডলে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, বিবিধ রাজনগরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। "বিবরণ-মালা"য় তাহার বিবরণ ও প্রমাণাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পাল-রাজবংশের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, নবম, একাদশ ও সপ্তদশ নরপালের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন লিপির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়,—প্রথম নরপালের সময়ে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ;—দ্বিতীয় ও তৃতীয় নরপালের সময়ে তাহার প্রকৃত অভ্যুদয় ;—চতুর্থ ও পঞ্চম নরপালের সময় পর্য্যন্ত গৌড়মণ্ডলে পাল-নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণপ্রতাপে বর্ত্তমান। এই অভ্যুদয়-যুগ বাঙ্গালীর ইতিহাসের গৌরব-যুগ। এই যুগে, বরেন্দ্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, [ধর্ম্মপালদেবের ও দেবপালদেবের শাসনসময়ে] ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল গৌড়ীয় শিল্পে যে অনিন্দ্য-সুন্দর রচনা-প্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ "শিল্পকলা"য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার সন্ধানলাভে অসমর্থ হইয়া লেখকগণ এই যুগের মগধের ও উৎকলের শিল্প-নিদর্শনকে মগধের ও উৎকলের প্রাদেশিক শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। (১)

---

(১) এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার পর, ভারত-শিল্পের ইতিহাসবিষয়ক একখানি সদ্যঃ-প্রকাশিত গ্রন্থে, ভিন্সেন্ট স্মিথ (কোনরূপ প্রমাণের অবতারণা না করিয়া) লিখিয়াছেন,—"apparently in sculpture we may trace the mediævial Bihar-school back to Bitpal's and the Orissa School back to Dhiman." অনুসন্ধান-সমিতি ইহার যে সকল পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা "শিল্পকলা"য় সন্নিবিশিষ্ট হইয়াছে। তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন অধ্যায় বলিয়া কথিত হইতে পারে।

ইহার পরবর্ত্তী যুগের [খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর] বাঙ্গালীর ইতিহাসও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অনুসন্ধান-সমিতি এই যুগের যে সকল বিবরণ সংকলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদনুসারে এই দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কারণ, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে, পাঁচবার ভাগ্য-বিবর্ত্তনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রথম ভাগে, একটি প্রবল বিপ্লবের অবসানে, পাল-সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাব। তাহার নায়ক প্রথম মহীপালদেব, এবং ফলভোগী তদীয় পুত্র নয়পাল, এবং পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। তাঁহাদিগের কথাই একাদশ শতাব্দীর প্রধান কথা।

দ্বিতীয় ভাগে, একটি অচিন্তিত-পূর্ব্ব আকস্মিক প্রজা-বিদ্রোহ, রাজহত্যা এবং কিয়ৎকালের জন্য এক কৈবর্ত্ত রাজবংশের অভ্যুদয় ও তিরোভাব। তৎকালের প্রধান পাত্রগণের নাম [অনীতিকারম্ভ-রত] দ্বিতীয় মহীপালদেব, তাঁহার নিধনকারী [প্রজা-বিদ্রোহের নায়ক] কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক, তদীয় ভ্রাতা রুদোক, এবং রুদোকের পুত্র ভীম রাজা।

তৃতীয় ভাগে, কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের অবসানে, পালরাজগণের জনক-ভূমির [বরেন্দ্র] উদ্ধার-সাধনের পর, পাল-সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুদয়, এবং অধঃপতন। এই সময়ের নরপালগণের নাম—শূরপাল, রামপাল, রামপালের পুত্র কুমারপাল, পৌত্র তৃতীয় গোপাল ও কুমারপালের ভ্রাতা মদনপাল।

চতুর্থ ভাগে, সেন-রাজবংশের অভ্যুদয় ও রাজ্য-বিস্তার; তাহার নায়ক—বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, এবং পৌত্র লক্ষ্মণসেন।

পঞ্চম ভাগ শেষভাগ,—তাহাতে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান-অধিকার প্রচলিত হইবার সূত্রপাত।

এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত [খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর] বাঙ্গালার ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনাবলী দেশের লোকে বিস্মৃত হইয়া গেলেও, বরেন্দ্রমণ্ডলে তাহার নানা স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই সকল স্মৃতিচিহ্ন ধরিয়া, অনুসন্ধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে, এই দুই শত বৎসরের ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

প্রথম ভাগে যে বিপুল বিপ্লবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে [১৮০৬ খৃষ্টাব্দে] বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী গ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে তাহা

দিনাজপুর স্তম্ভ।
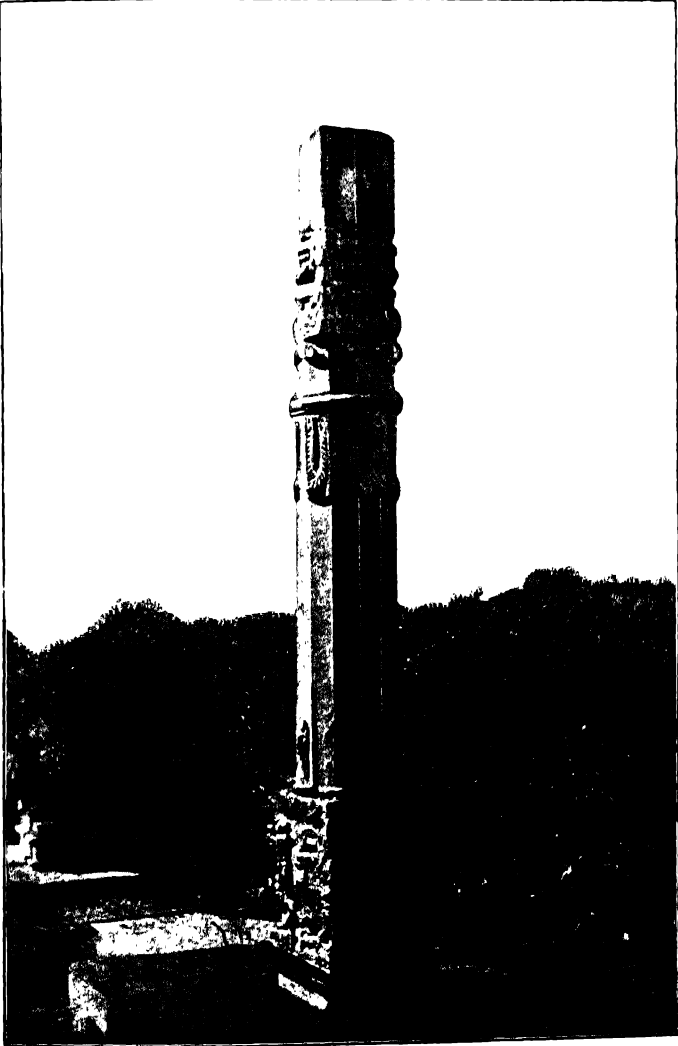
সূচিত থাকিতেও, অক্ষর-বিলোপের অত্যাচারে, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারে নাই। এই শ্লোকটি নবম নরপাল মহীপাল-দেবের [বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনেও উৎকীর্ণ থাকায়, উত্তরকালে ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছিল। যথা,—

হত-সকল-বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাৎ
অনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্।
নিহিত-চরণ-পদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি তস্মাৎ
অভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥

ইহাতে জানিতে পারা গিয়াছিল,—মহীপালদেবের পিতৃরাজ্য "অনধি-কারী" কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং তিনি তাহা পুনরায় বাহুবলে লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনধিকারী কে,—তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল।

সেই অনধিকারীর নাম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি ৮৮৮ শকাব্দায় [৯৬৬ খৃষ্টাব্দে] বরেন্দ্রমণ্ডলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপনাকে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" বলিয়া প্রস্তরস্তম্ভে যে শ্লোক উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেই শ্লোক-সংযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভটি অদ্যাপি গৌড়মণ্ডলেই [দিনাজপুরাধিপতির উদ্যানমধ্যে] বর্ত্তমান আছে। তাহার সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্বন্ধ কি, "গৌড়রাজমালা"য় তাহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালীর ইতিহাসে,—পালরাজবংশের অধিকারকালে,—কাম্বো-জান্বয়জ [আগন্তুক] গৌড়পতির সন্ধান-লাভের পর, অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সেই নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সমাচার একটি ইংরাজী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা [স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের কৃপায়] এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ "সাহিত্য" পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগে যে প্রজা-বিদ্রোহ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাল-রাজবংশের পঞ্চদশ নরপাল কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী [কামরূপাধিপতি] বৈদ্যদেবের [কমৌলীতে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে সূচিত হইয়াছিল। ভীমকে নিহত করিবার পর, বরেন্দ্রীর [জনকভূর] পুনরুদ্ধারসাধনের কথা এই শ্লোকে রামপালদেবের প্রধান কীর্ত্তি-কথা বলিয়া উল্লিখিত থাকিতেও, অধ্যাপক ভিনিস, তাহার ব্যাখ্যাকালে, "জনকভূমি"কে মিথিলা বলিয়া ব্যাখ্যা

করায়, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বরেন্দ্রমণ্ডলে এখনও এই প্রজা-বিদ্রোহের নানা স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "বিবরণমালা"য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এক সময়ে এই প্রজা-বিদ্রোহের কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুপরিচিত ছিল। শতবর্ষ পূর্ব্বেও বুকানন্ হ্যামিল্টন্ তদ্বিষয়ক জনশ্রুতির সন্ধানলাভ করিয়াছিলেন। সমকালবর্ত্তী বরেন্দ্র-নিবাসী রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় "রামচরিত" নামক একখানি কাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে, তাহা নেপাল হইতে আনীত হইয়া, [এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যত্নে] মুদ্রিত হইয়াছে। "গৌড়রাজমালা"য় এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের আদ্যন্তের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচনক্রমে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, প্রজাশক্তির সাহায্যে, সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—যে রাজবংশের প্রবল পরাক্রমশালী নরপাল দেবপালদেবও তদীয় মন্ত্রিবরের সম্মুখে সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন বলিয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, দ্বিতীয় মহীপালদেব [অনীতি-পরায়ণ হইয়াই] প্রজা-বিদ্রোহ প্রধূমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাহাতে স্বয়ং ভস্মীভূত হইয়া, বরেন্দ্রমণ্ডল হইতে পাল-রাজবংশের শাসনক্ষমতাও কিয়ৎকালের জন্য ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রমণ্ডলে পুনরায় অধিকারলাভ করিতে রামপালদেবকে বিপুল সমর-সজ্জার আয়োজন করিতে হইয়াছিল; বহু যুদ্ধে তিল তিল করিয়া বরেন্দ্র-ভূমিতে বিজয়-লাভ করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই তৎকালের লোকনায়ক-গণের প্রবল শক্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। বরেন্দ্রমণ্ডলের এই ক্ষণস্থায়ী প্রজা-বিদ্রোহের একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি-স্তম্ভ এখনও সমুন্নতশিরে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! তাহার কথা বাঙ্গালীর ইতিহাসে স্থানলাভ করিতে পারে নাই;—বরেন্দ্রমণ্ডলের সহিত পরিচয়ের অভাবে, "রামচরিত" কাব্য মুদ্রিত করিবার সময়ে, সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেও তাহা প্রতিভাত হইতে পারে নাই।

ভীমের নাম এখনও জনশ্রুতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি রামপাল-দেবের আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তভাগের

নানা স্থানে যে সকল মৃৎপ্রাকার রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও "ভীমের ডাইঙ্গ" ও "ভীমের জাঙ্গাল" নামে কথিত হইতেছে। কিন্তু কল্পনা-লোলুপ জনসাধারণ তাহাকে মধ্যম পাণ্ডবের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করিতেছে! কোনও কোনও আধুনিক ইতিহাস-লেখক তাহাকেই বরেন্দ্রভূমির অতি-প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়া ইতিহাস রচনা করিতেছেন!

তৃতীয় ভাগের প্রধান কথা, "রামাবতী"র কথা। প্রজা-বিদ্রোহের অবসানে রামপালদেব এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাই পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী—রামাবতী। সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" কাব্যে এই নগর-নির্ম্মাণের বিস্তৃত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা বরেন্দ্রভূমির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। যে ভূমি "অপুনর্ভবা" নামক মহাতীর্থে সুপবিত্র ও "জাগদ্দল-মহাবিহারে" সুশোভিত—সেই বরেন্দ্রভূমিতেই "রামাবতী" নির্ম্মিত হইয়াছিল। পণ্ডিতবর শাস্ত্রী মহাশয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাহাকে পূর্ব্ববঙ্গের "রামপাল" বলিয়া [রামচরিত কাব্যের ভূমিকায়] পার্শ্ব-টীকায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনুসন্ধান-সমিতি রামাবতীর, জগদ্দল-মহাবিহারের ও অপুনর্ভবা তীর্থের অনুসন্ধান করিয়া নানা ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। রামাবতীর নাম এখন বাঙ্গালীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, অনেক দিন পর্য্যন্ত সুপরিচিত ছিল। "সেখশুভোদয়া" নামক [মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার মস্‌জেদে প্রাপ্ত] হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে "রামাবতী"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তখন তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত পালরাজবংশের সপ্তদশ নরপাল মদনপালদেবের তাম্রশাসনে "রামাবতীপরিসরে" জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উল্লেখ দেখিয়া, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় [বরেন্দ্রমণ্ডলে পদার্পণ না করিয়াও] তাহাকে দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি স্থানের সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা যে সফল হয় নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই!

রামপাল প্রজা-বিদ্রোহের প্রকোপে জন্মভূমি হইতে তাড়িত হইবার পর, নানা ক্লেশে জন্মভূমির উদ্ধারসাধন করিয়া, যেরূপ অধ্যবসায়ের ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, রাজকবি

তাঁহাকে দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বাহুবলে ও মন্ত্রণা-কৌশলে রামপাল বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তিনি রামপালের মাতুল, এবং চির-সুহৃৎ অঙ্গাধিপতি মহনদেব। "সেখশুভোদয়া" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—

> শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্র গতে (?) কন্যাং গতে ভাস্করে
> কৃষ্ণে বাক্‌পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
> জাহ্নব্যাং জলমধ্যত স্তনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
> হা পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥

রামপাল ভাগীরথী-গর্ভে অনশনে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ আত্ম-বিসর্জ্জনের কারণ কি, "শেখশুভোদয়া" গ্রন্থে তাহার পরিচয়-লাভের উপায় ছিল না। রামচরিত কাব্যে সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—মহনদেবের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়াই, শোকার্ত্ত রামপালদেব আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার পর, কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলে, [বরেন্দ্রমণ্ডলে আরও কিয়ৎকাল পালরাজবংশের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিলেও] "অনুত্তর-বঙ্গে" ও কামরূপে বিদ্রোহ-বিকার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী বৈদ্যদেবের বাহুবলে তাহা দূরীভূত হইলেও, পালসাম্রাজ্যে আর পূর্ব্বপ্রতাপ সঞ্জীবিত হইতে পারে নাই। কুমারপালের মৃত্যুর পরে, তদীয় শিশুপুত্র তৃতীয় গোপাল, এবং [তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর] কুমারপালের ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই শেষ। তাহার পর বরেন্দ্রমণ্ডলে পাল-নরপালগণের প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই।

চতুর্থ ভাগে সেন-রাজবংশের অভ্যুদয়। তাহা এই সকল কারণেই সফল হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল। সেন-রাজবংশ বাঙ্গালার শেষ হিন্দু-রাজবংশ হইলেও, কিরূপে সে রাজবংশ এ দেশে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারসাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা-জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন-কাহিনীর ন্যায় ইহার অভ্যুদয়-কাহিনীও প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি [কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে] এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লালসেন-

দেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে নানা সংশয় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেনরাজবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনদেবের [রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—

বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা-সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য—
ক্ষৌণীন্দ্রৈ র্বীরসেনপ্রভৃতিভি রভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভি র্বভূব।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা-পরিচয়শুচয়ঃ সূক্তি-মাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্ব-শ্রবপরিণসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥

[পারাশর্য্য] ব্যাসদেব যাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনায় বিশ্বনিবাসিগণকে প্রীতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশীয় দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির বংশে সেনরাজগণ জন্মগ্রহণ করিবার এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও, [মহাভারতোক্ত নল রাজার পিতা বীরসেনের কথা চিন্তা না করিয়া] কেহ কেহ বীরসেনকে আদিশূর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বীরসেন-বংশধর বিজয়সেনদেবের পিতামহ সামন্তসেন যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন।

দুর্ব্বৃত্তানা ময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী—
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যাস্মদদ্যাপ্যবিহত-বসা-মাংস-মেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশাং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

তিনি "কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের কদন" বিধান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি গঙ্গাপুলিন-পরিসরের পুণ্যাশ্রমনিচয়েই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনদেবের [মাধাই নগরে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—সেনরাজগণ কর্ণাটক্ষত্রিয়-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনদেবের [কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজ্যলাভের পূর্ব্বে বিজয়সেনের পিতৃ-পিতামহ রাঢ়দেশকে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

"গৌড়রাজমালা"র লেখক মহাশয় এই সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়া, প্রাচীন লিপির "কর্ণাট" রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার পরিচয়-প্রদানের জন্য, [বিহ্লনদেবের বিক্রমাঙ্ক-চরিতের এবং কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীর উপর নির্ভর করিয়া], কল্যাণের চালুক্য-রাজগণের রাজ্যকেই "কর্ণাট" বলিয়া গ্রহণ করিয়া-

ছেন। "কর্ণাটেন্দু" বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক [১০৪০—১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে] গৌড়-কামরূপ পরাভূত হইবার একটি কাহিনী "বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে" উল্লিখিত আছে।

ইহাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে,—ইহাকেই কর্ণাটরাজের সহিত গৌড়রাজের প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া,—ইহার পূর্ব্বেও, [গৌড়াধিপ প্রথম মহীপালদেবের শাসন-সময়ে] আর একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সে সংঘর্ষে গৌড়াধিপ মহীপালদেব বিজয়লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার বিজয়োৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য "চণ্ডকৌশিক" নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। তাহার "প্রস্তাবনা"য় দেখিতে পাওয়া যায়,—

অলমতিবিস্তরেণ। আদিষ্টোঽস্মি দুষ্টামাত্য-বুদ্ধিবাগুরাঽলঙ্ঘ্য-সিংহরংহসা ভ্রূভঙ্গলীলা-সমুদ্ধৃতাশেষকণ্টকেন সমরসাগরান্তর্ভ্রমভুজদণ্ড-মন্দারাকৃষ্ট-লক্ষ্মীস্বয়ংবরপ্রণয়িণা শ্রীমহীপাল-দেবেন। যস্যেমাং পুরাবিদঃ প্রশস্তিগাথা মুদাহরন্তি—

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনা মার্য্যচাণক্য-নীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দ্দর্পাঢ্যঃ স পুন রভবচ্ছ্রীমহীপালদেবঃ॥

নান্দীপাঠ সমাপ্ত হইবার পরেই, সূত্রধার বলিতেছেন—থাক্, থাক, আর [পূর্ব্বরঙ্গের] অতি-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আমরা শ্রীমহীপালদেব-কর্ত্তৃক নাট্যাভিনয়ার্থ আদিষ্ট হইয়াছি। তিনি দুষ্টামাত্যবর্গের বুদ্ধিজালে আবদ্ধ হইবার অযোগ্য অলংঘ্য সিংহ-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া ভ্রূভঙ্গলীলায় অশেষ ক্ষুদ্র কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সমর-সাগর হইতে তদীয় মন্দররূপী ভুজ-দণ্ডের আকর্ষণ-বলে বিজয়-লক্ষ্মী উত্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বয়ংবর-প্রণয়ী করিয়াছে। পুরাবিদ্গণ তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রশস্তি-গাথা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

যে চন্দ্রগুপ্ত স্বভাব-দুর্ব্বোধ আর্য্যচাণক্য-নীতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, নন্দরাজগণকে পরাভূত ও কুসুমপুর অধিকৃত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি নন্দগণ কর্ণাটত্ব লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করায়, তাঁহাদিগের নিধনসাধনের জন্য, সেই চন্দ্রগুপ্ত আবার শ্রীমন্মহীপালদেবরূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, [রামচরিতের ভূমিকায়]

ইহাকে মহীপাল কর্ত্তৃক রাজেন্দ্র চোড়ের পরাভব-কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, কর্ণাট-রাজ্যকে চোল-রাজ্যের একাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বান্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, তাঁহাকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া, সেনরাজ-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণকে রাজেন্দ্র চোড়ের সেনানায়ক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। চোলরাজকে কর্ণাটরাজ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযোগী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, "গৌড়রাজমালা"-লেখক কল্যাণের চালুক্যরাজ্যকেই কর্ণাটরাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কর্ণাট-শব্দের এরূপ অর্থে চণ্ডকৌশিকের প্রস্তাবনা পাঠ করিলে, বলা যাইতে পারে,—অনেক দিন হইতেই প্রাচ্যভারতের গৌড়ীয়সাম্রাজ্য করতলগত করিবার জন্য অনেকের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কল্যাণের চালুক্যরাজগণের উচ্চাভিলাষের অভাব ছিল না; তাঁহারাও মহীপালদেবের সহিত একবার শক্তিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে "কর্ণাটলক্ষ্মী" লুণ্ঠিত হইয়াছিল,—মহীপালের বিজয়োৎসবে নাট্যাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সেনরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, কালক্রমে [দক্ষিণরাঢ়ে কর্ণাটরাজের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর,] বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচিত পালরাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্রমণ্ডলেও অধিকারবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিরূপে "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্রবংশোদ্ভব" সেন রাজবংশ এ দেশে প্রকৃত-প্রস্তাবে অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এখনও সেই চেষ্টায় লেখকবর্গ নানা প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া, ঐতিহাসিক কারণপরম্পরার মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপেই ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে,—যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা অলীক বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, তাহার প্রয়োজন অস্বীকৃত হয় না। "গৌড়রাজমালা"র লেখকও সেইরূপ প্রয়োজনেই, ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানলাভের আশায়, এই সকল প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া, ইহাকে সেইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া, প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কারসাধন করিতে পারিলে, এরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিবে। এ দেশে

আধিপত্যলাভ করিবার পূর্ব্বে, সেনরাজগণ যে দেশে থাকুন না কেন, তাঁহারা আমাদিগের দেশের পুরাতন অধিবাসী ছিলেন না,—তাঁহারা আগন্তুক,—তাঁহাদিগের গৌড়বিজয় গৌড়জনের পরাজয়,—তাঁহাদিগের অভ্যুদয় গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের প্রথম সোপান। "সেখশুভোদয়া" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—রামপালদেব তনুত্যাগ করিলে, মন্ত্রিবর্গ পরামর্শ করিয়া, শিবোপাসক কাঠুরিয়া বিজয়সেনকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত ইহার অনুকূল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পালসাম্রাজ্যের অধঃপতনসময়ে সেনরাজগণ যে কোনও না কোনও উপায়ে, পালরাজগণের শিথিলমুষ্টি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, গৌড়মণ্ডলে একটি আগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এ পর্য্যন্ত প্রাচীন লিপিতে যাহা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সেনরাজ্য বাহুবলের রাজ্য বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা পালরাজ্যের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচন-প্রণালীতে গঠিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

এই সাম্রাজ্য পাল-সাম্রাজ্যের ন্যায় সকল উত্তরাপথে প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। রণ-পাণ্ডিত্যের অভাব না থাকিলেও,—কাশীধামে, প্রয়াগধামে ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত করিবার প্রমাণ-শ্লোকের অসদ্ভাব না থাকিলেও,—সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত প্রাচ্যসাম্রাজ্য পতনোন্মুখ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এবং অল্পকালের মধ্যে, [মুসলমানের সহিত প্রথম সংঘর্ষেই,] পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কোন্ সময়ে, কাহার শাসনকালে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। "গৌড়রাজমালা"-লেখক তদ্বিষয়ে অনেক নূতন তর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহা বিচারসহ হইয়াছে কি না, ভবিষ্যতের তথ্যালোচনায় তাহা মীমাংসিত হইতে পারিবে। সুতরাং তাহাকে লেখক মহাশয়ের তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা-সূচক ব্যক্তিগত মত বলিয়াই পাঠকগণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন।

সেনরাজবংশের অভ্যুদয়লাভের মূল কারণ সহসা আবিষ্কৃত হইবার আশা না থাকিলেও, তাঁহাদিগের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্যই, অনুসন্ধান-সমিতি চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল
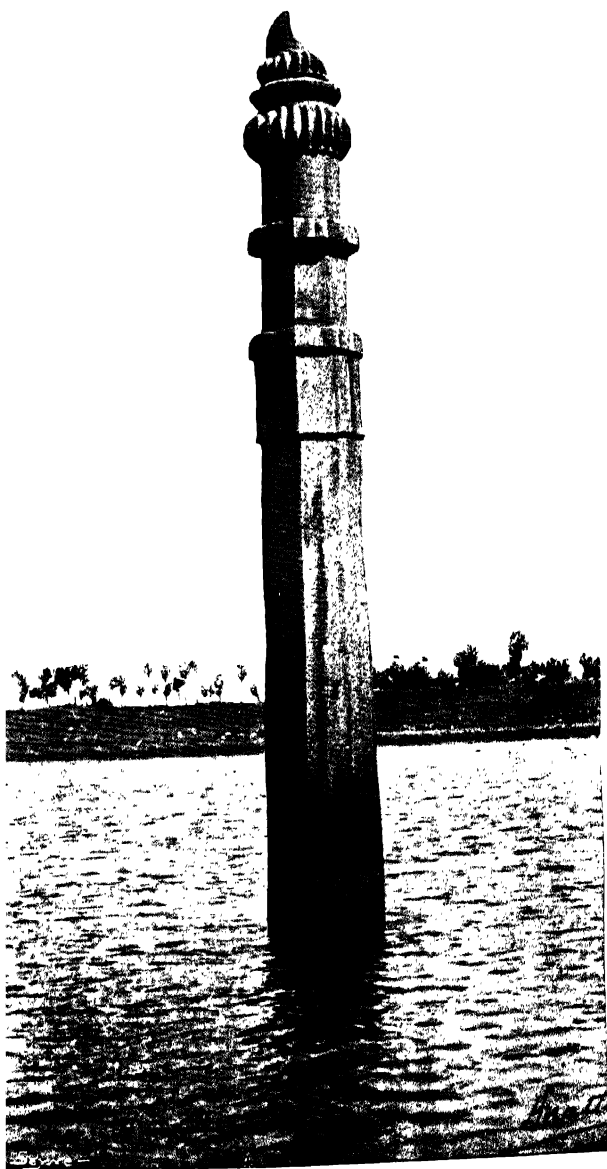
কৈবর্ত্তরাজের স্তম্ভ।

হইয়াছে। তাহাতে উৎসাহলাভ করিবার পরেই, অনুসন্ধান-সমিতি ক্রমে ক্রমে পালরাজবংশের বিবিধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত করিবারও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনেক দিন হইতে সেনরাজবংশের ও পালরাজবংশের ইতিহাস-সঙ্কলনের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সকল চেষ্টা পুস্তকালয়ের সাহায্যে, [গৃহে বসিয়া,] ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা বলিয়া কথিত হইতে পারে। তাহাতে নানা তর্ক বিতর্ক বিপুলতা লাভ করিয়াছে। যে সকল স্থানে অনুসন্ধান-কার্য্যে অগ্রসর হইলে, তর্কবিতর্ক নিরস্ত হইতে পারিত, তথায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন অনুভূত হইত না বলিয়া, পুরাতন লিপিতে উল্লিখিত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নানা পুস্তকে মুদ্রিত হইবার পরেও, [ব্যাখ্যা-বিভ্রাটে] তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুভূত হইতে পারে নাই। অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবামাত্র, ইহার বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এবং তাহা বিস্তৃতভাবে "লেখমালা"য় আলোচিত হইয়াছে।

ধোয়ী কবির "পবনদূত" আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল,—বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বল্লালসেন তাঁহার "দানসাগর" গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়সেনদেব "বরেন্দ্রে" প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট "শ্লাঘ্যে বরেন্দ্রীতলে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমাচার অবগত হইয়াও, অনেকেই নবদ্বীপকেই "বিজয়পুর" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাবক্ষেত্র অগৌরবে লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার [গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত] দেবপাড়া গ্রামে সেনরাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও, কেহ এখনও তাহার প্রাপ্তিস্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনুসন্ধান-সমিতি এই স্থান হইতেই অনুসন্ধানকার্য্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া, বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, নানা পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদি সহ "বিবরণমালা"য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রভূমির সকল স্থানে, বা তাহার বাহিরে কোনও স্থানে, অধিকারবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, এখনও তাহার

বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। এখনও কেবল বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, রাজসাহী জেলার [গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত] বিজয়নগর অঞ্চলেই, বিজয়রাজার নাম লোকমুখে শ্রবণ করা গিয়াছে; তাঁহার রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের সন্ধানলাভ করা গিয়াছে; এবং তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত বহুসংখ্যক "বিতত তল্ল" কেবল এই অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পুত্র-পৌত্রের শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারের কথা, এবং তাঁহার পৌত্রের শ্রীবিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবারে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, [মুসলমান অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া] পূর্ব্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার কথা তাম্রশাসনে ও মুসলমান-ইতিহাস-লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তজ্জন্য, বিক্রমপুর অঞ্চলেও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তথায়, [অনুসন্ধান-সমিতির উপদেশে ও উৎসাহে] শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, অশেষ অধ্যবসায়-বলে, অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন। "বিবরণমালা"য়, "শিল্পকলা"য় এবং "গ্রন্থমালা"য় তাহার নানা পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"গৌড়রাজমালা"য় নরপালগণের শাসনকাল-নির্ণয়ের জন্য অধিক আড়ম্বর প্রকাশিত হয় নাই। তাহা এখনও নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তথাপি, যে সকল প্রমাণের আলোচনা করিলে, নরপালগণের শাসনকালের আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার কথা যথাসময়ে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার সময়ে, পালরাজবংশের শাসনকাল-বিজ্ঞাপক অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন-লিপি কলিকাতার যাদুঘরে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে, পালনরপালগণের শাসনকালের সন তারিখ নির্ণয়ের নূতন উদ্যম প্রকাশিত হইতে পারিবে।

রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ ও জয় পরাজয়,—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙ্গালী জনসাধারণের সকল কথার প্রধান কথা তাহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা—ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তাহাকে একমাত্র কথা বলিলেও, অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ধর্ম্মবিশ্বাসই অধিকাংশ কার্য্যের গতিনির্দ্দেশ করিয়াছে;—ধর্ম্মের জন্য দেবমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে, দেবমূর্ত্তির জন্য বিচিত্র দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, দেবালয়ের প্রচলিত অর্চ্চনা-প্রণালীর জন্য উপচার-সংগ্রহের প্রয়োজন

অনুভূত হইয়াছে, দেবলোকের প্রীতি-সম্পাদনের আশায় জলাশয় খনিত হইয়াছে, চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যালয়ে শাস্ত্রালোচনা প্রচলিত হইয়াছে,—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যাপারে উপার্জ্জিত অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন সাধিত করিয়া, দেব-কার্য্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যে সকল আচার-ব্যবহার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। কোন্ পুরাকাল হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, এ দেশের অধিবাসিবর্গ তাহাদিগের শিক্ষা-দীক্ষার ও আচার ব্যবহারের প্রভাবে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার কথাই প্রধান কথা। অনুসন্ধান-সমিতি তদ্বিষয়ে যে সকল অনুসন্ধান-কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, "গৌড়ীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে তাহা আলোচিত হইবে। বঙ্গভূমি যে বহুযুগের বহুবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলন-ভূমি,—আপাত প্রতীয়মান মত-পার্থক্যের সমন্বয়ভূমি,—অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সার কৌতূহলপূর্ণ সাধন-ভূমি—তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! এই ভূমিকে স্বতন্ত্র কেন্দ্র করিয়া, ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দিগ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বঙ্গ-ভূমির চতুঃসীমাভুক্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় নাই। তাহা এক দিকে যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাস, অন্য দিকে সেইরূপ মানব-ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতিলাভের চেষ্টা করিলেও, তাহার অভ্যন্তরে সমগ্র মানব-সমাজের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে। সে ইতিহাস সন তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত না হইয়াও, অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে পারিবে। (২)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(২) বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি "সাহিত্যে" এই নিবন্ধটি মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

বর্ষায়।

১

গেছে নিশা! দুঃস্বপ্ন অনিদ্রা ল'য়ে তার।
হৃদয় বাঁচিল যেন ফেলিয়া নিঃশ্বাস।
সেই পরিচিত গৃহ—সম্মুখে আমার,
ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্নহাস।

ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি-গুঁড়ি, কভু বা ঝর্ঝরে;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে।
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম—তরু-ছায়ান্তরে;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্তপদে শূন্য দিন আসে!

অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা,
খসিছে হরিদ্র পত্র সিক্ত মৃত্তিকায়;
এলায়ে পড়েছে লতা, সঙ্কুচিয়া গ্রীবা
ভিজিছে বায়স দুটি বসিয়া শাখায়।

জনহীন গ্রাম্যপথ কর্দ্দমে পিচ্ছল;
গলেত-বনজ-গন্ধে বায়ু ওতপ্রোত।
অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে-কাণে' জল,
কোথা বা বুদ্বুদ উঠে, কোথা বহে স্রোত।

ক্ষীণা সরস্বতী আজ দুই কূল ভরি'
পড়ে' আছে গতিহীনা হরিত-বরণা;
ভাসিছে শৈবাল-দাম, ক্ষুদ্র তাল-তরী;
বংশ-সেতু'পরে ক্রৌঞ্চী মুদ্রিতনয়না।

তীর-বেণুবনে উঠে ভেক-কণ্ঠস্বর;
ডাকিছে চাতক দূরে আসার-পিপাসী।
সজল শ্যামল তৃণ, শ্যামল প্রান্তর;
বৃতিপাশে শেফালিকা,—মূলে পুষ্পরাশি।

ক্বচিৎ তড়িৎ-মুখে ম্লান হাসি লুটে ;
ক্বচিৎ বলাকা যায় নভস্তলে ভাসি,
ক্বচিৎ প্রভাত-আলো মেঘ ভেদি' ফুটে ;
ক্বচিৎ সমীর ছুটে গভীর নিঃশ্বাসি'।

সারা নিশা ঘুরিয়াছি কত গ্রহলোকে,
জন্মিয়াছি—মরিয়াছি কত শত বার !
কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে
খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার !

২

আবার দুঃস্বপ্ন সেই !—আবার পরাণ
জগতের দেহখানা জগতে ফেলিয়া
টিতেছে ঊর্দ্ধমুখে—উল্কার সমান,
রাশি রাশি বায়ুরাশি দু' হাতে ঠেলিয়া।

স্পর্শনে—ঘর্ষণে বায়ু উঠে জ্বলি'—জ্বলি',
দাপটে—ঝাপটে মেঘ দূরে সরে' যায় ;
ছুটে আসে অন্ধকার উচ্ছ্বসি'—উচ্ছলি' ;
বিজলী অশনি শিলা পায়ে আছড়ায়।

হ'তেছে নিঃশ্বাস-রোধ—নাহি বহে বায়,
ঘুরে ঘুরে সরে' গেছে পদ হ'তে ধরা !
সম্মুখে অসহ্য সূর্য্য—ক্রুদ্ধনেত্রে চায়,
তরল প্রলয়-অগ্নি ক্ষতবক্ষে ভরা।

কত গ্রহ উপগ্রহ, বিচিত্র-দর্শন,
বিচ্ছুরি' বিবিধ বর্ণ ঘুরে নিরন্তর !
কোথাও দহন সুধু, কোথাও বর্ষণ,
কোথা গিরি, কোথা মরু, কোথা বা সাগর।

কোথা আমি !—ল'য়ে ক্ষুদ্র গ্রহ-পরিবার
চক্রবালে ক্ষুদ্র রবি ধীরে অস্ত যায়

এ কি সেই ছায়াপথ—সম্মুখে আমার!
পড়ে মোর দেহচ্ছায়া তারায় তারায়!

ঊর্দ্ধে—ক্রমে ঊর্দ্ধে কোথা কিছু নাহি আর,
সুধু করি অনুভব ঈষৎ কম্পন!
সুধু শূন্য—চির শূন্য—অসীম অপার,
আলোক-আঁধার-হীন স্তব্ধতা ভীষণ!

কোথা তুমি প্রাণাধিকা!—প্রতিধ্বনি ছুটে,
কি তুমুল কোলাহল, শূন্য শতখান!
কোথা ফুঁসে, কোথা দুলে, কোথা ধ্বসে, টুটে!
চমকি' তরাসে—দেখি দিবা অবসান।

৩

আসে সন্ধ্যা, মুখে ল'য়ে দুরন্ত ঝটিকা,
রাশি রাশি শুষ্কপত্র ঘুরে উড়ে যায়।
ডুবিয়া গিয়াছে রবি, ছুটি রশ্মি-শিখা
লুটিতেছে পূর্ব্বাকাশে মৃত্যু-যন্ত্রণায়!

তর্-তর্—থর্-থর্ উঠে মেঘরাশি;
ছিন্ন ভিন্ন পিকদল নীড়মুখে ধায়;
মড়্মড়ে অরণ্যানী কাতরে নিঃশ্বাসি';
ঊর্দ্ধপুচ্ছে গাভীকুল ছুটে গায় গায়।

ঝোপে-ঝাপে তরুতলে আঁধার ঘনায়;
ঝিকিমিকি করে আলো নারিকেল-শিরে;
হাঁকিছে—ডাকিছে সবে আপন জনায়,
ফুলিয়া—ফুসিয়া নদী আছাড়িছে তীরে।

ঝাপটে—দাপটে বায়ু ছাড়িছে হুঙ্কার,
ভাঙ্গে শাখা, পাড়ে চাল, তরু উপড়ায়;
দেখিতে—দেখিতে ধরা নেয়ে অন্ধকার,
তড়তড় ঝরে বৃষ্টি মুষল-ধারায়।

উঠিতেছে চারি দিকে হাহাকার-ধ্বনি,
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে ঝলসে বিজলী ;
কড়্ কড়্ মুহুর্মুহু গরজে অশনি ;
তরু-শির, গৃহ-চূড়া উঠে ধূধূ জ্বলি'।

মনে হয়,—পাই যদি ওই বজ্রবল,
ধরারে গুঁড়ায়ে ফেলি ধূলার সমান !
ঘুচে যায় দুঃখ শোক ভাবনা সকল,
নাহি রহে বিশ্বে আর জন্মমৃত্যু-স্থান।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কীটতত্ত্ব।

জীব-জগতে মানব শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গর্ব্বিত। কিন্তু যে 'বুদ্ধি' তাহাকে এই গৌরব দান করিয়াছে, সেই 'বুদ্ধি' জীব-জগতে নিকৃষ্ট প্রাণিসমূহে কতটা বিকাশ-লাভ করিযাছে, তাহা না জানিলে, বুদ্ধির হিসাবে মানুষের যথাযথ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইতে পারে না।

প্রাণিরাজ্যে কীট প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম, এবং সম্ভবতঃ নিকৃষ্টতম বলিয়াই ইহারা সংখ্যায় বহু *। কীট আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিত্যসহচর—আহারে, শয়নে, ভ্রমণে আমাদের চিরসঙ্গী। ইহাদের তত্ত্ব জানিতে যাঁহাদের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য নাই, তাঁহাদেরও অন্ততঃ কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই দীন প্রতিবেশীদের একটু সংবাদ রাখা উচিত।

'কীট' শব্দটা আমরা সাধারণতঃ একটু শিথিলভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। যাহাদিগকে কীট বলি, তাহাদের মধ্যে অনেক পোকাই বৈজ্ঞানিক হিসাবে কীট-শ্রেণীভুক্ত নহে। মোটামুটি ছয়পদবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাণীই কীটপদবাচ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কেন্নো, বৃশ্চিক প্রভৃতি কীট নহে। গুটীপোকা, আরশুলা, প্রজাপতি কীট। কেন্নো অনেক-পদবিশিষ্ট। গুটীপোকা যদিও দৃশ্যতঃ বহুপদবিশিষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ছয়পদবিশিষ্ট,

---

* এই মন্তব্য বিজ্ঞানসম্মত। See Spencers' Principles of Biaology. vol. II. Secs. 343 at Seq.

বিশেষতঃ, গুটীপোকার অবস্থাই ইহার পরিণত অবস্থা নহে; প্রজাপতির অবস্থাই ইহার চরম পরিণতি। বিষয়টি ক্রমশঃ সহজ করিবার চেষ্টা করিব, এবং সেই সঙ্গে ইহাদের কৌতূহলোদ্দীপক কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব।

প্রায় সকল কীটই তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিণতি লাভ করে,—

১। ডিম্ব-অবস্থা;—ভিন্ন ভিন্ন কীট বিভিন্ন প্রকার স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বপ্রসবকালে ইহাদের স্থান-নির্ণয়ে তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অসহায় কীটশিশুর ভবিষ্যতের জন্য সুবন্দোবস্ত না করিয়া জননী কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। টেবেনস্ (Tabanus) নামক মক্ষিকাজাতীয় একপ্রকার পোকা (দৃঢ় শুণ্ডবিশিষ্ট; যাহা গরু প্রভৃতির দেহে দেখা যায়) জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট বৃক্ষের পাতায় ডিম পাড়িয়া থাকে; কারণ, নবাগত কীটশিশু জলযুক্ত কর্দ্দমে বর্দ্ধিত হইতে না পারিলে মরিয়া যায়। ডিমগুলি এরূপ স্থানে স্থাপিত হয় যে, উহারা ফুটিলেই টুপ্ টাপ্ করিয়া কর্দ্দমাক্ত জলে পতিত হইতে পারে।

কতকগুলি কীট অপর কীটের ভিতর ডিম পাড়িয়া থাকে। তাহাদের সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণ ডিম পাড়িবার যন্ত্র (Ovipositor) আছে। তাহা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেহাভ্যন্তরে ডিম্ব স্থাপন করে। ডিম্ব-স্থাপনের জন্য আক্রান্ত কীটের দেহের উপর এমন একটি স্থান পছন্দ করিয়া লয় যে, আক্রান্ত কীট আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অধোদেশে ডিম পড়িলে আক্রান্ত কীট গ্রীবাদেশ বাঁকাইয়া মুখ দ্বারা শত্রুর প্রতিরোধ করিতে পারে, সে জন্য কখনও কখনও গ্রীবাদেশের ঠিক অব্যবহিত পরেই ডিম পাড়িয়া থাকে। আক্রান্ত কীটের দেহাভ্যন্তর-স্থিত মাংসাদি খাইয়া কীটশিশু জীবনধারণ করে। এই ব্যাপারকে 'প্যারাসাটিজম্' (Parasatism) বলে। ইহা ফসলের পোকা-নিবারণের একটি শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এক এক প্রকার ফসলের এক এক প্রকার পরান্তঃপুষ্ট কীট (Parasite) আছে। কোনও বিশেষ ফসল-নাশক পোকার নিবারণার্থ উহার প্যারাসাইট্ আক্রান্ত শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে হয়। এক এক জাতীয় কীটের যে হারে বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও স্বাভাবিক বাধা না থাকিলে যে অচিরেই জগৎ কীটময় হইয়া যাইত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

২। কীড়া অবস্থা (Larval Stage),—

প্রায় সকল কীটই ডিম হইতে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহারা অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বুভুক্ষুর ন্যায় আহার করে। এই অবস্থায় নিঃসহায় কীট-শিশুর আত্মরক্ষার্থ নানাপ্রকার কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত উপায়কে ব্যঙ্গানুকরণ (Mimicry) বলা যাইতে পারে। ইহাতে শরীর, গ্রীবা প্রভৃতিকে বিচিত্র প্রকারে বাঁকাইয়া সন্ত্রস্ত কীট শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে। দুর্ব্বল
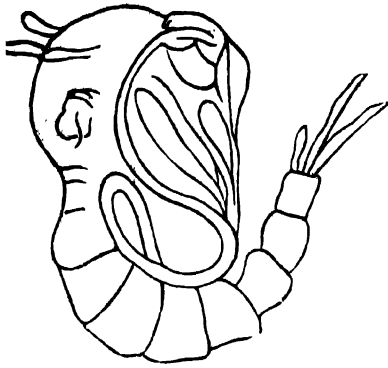
মশক-গুটী (Pupa of a mosquito)
[বর্দ্ধিত]
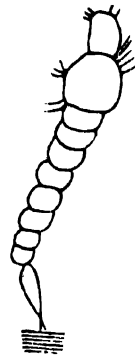
মশক-কীড়া (Larva)
[প্রায় ৫ গুণ বর্দ্ধিত।]
ইহা ম্যালেরিয়া-সংক্রামক মশকের কীড়া নহে, ইহা জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরাল নহে।

মশকের বসিবার ধরণ।

(১) (২)
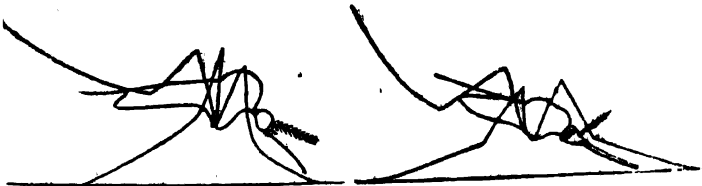
(১) ম্যালেরিয়া-সংক্রামক নহে (কুলেক্স—Culex)
(২) ম্যালেরিয়া-সংক্রামক (অ্যানোফেলিস—Anopheles)

অসহায় কীটের এই অদ্ভুত দেহসঞ্চালন দর্শন করিয়া লেখককে প্রথম অবস্থায় বেশ একটু ভয় পাইতে হইয়াছিল !

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এক কীড়ার অবস্থাতেই কীট ফসল নষ্ট করিয়া থাকে।

৩। গুটী-অবস্থা (Pupal stage).

এই অবস্থায় কীট নির্জীব হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে, এবং কিছুই আহার করে না। ইহারা বহুদিন এই অবস্থায় থাকিতে পারে। অনেক সময় উপরিস্থিত চর্ম্ম দ্বারা একটি দৃঢ় আবরণ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে অসাড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে। প্রায় সকল কীটই এ অবস্থায় মাটীর দুই তিন ইঞ্চি নিম্নে অবস্থান করে, এবং অবশেষে পরিণত হইয়া মাটী ও আবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। পরিণত অবস্থার প্রথম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাদের আয়তন স্থির থাকে। গৃহের মাছি, মশক প্রভৃতিরও সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাস এইরূপ ;—পক্ষবিশিষ্ট পরিণত অবস্থায় পঁহুছিতে ইহাদিগকেও এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। পরিণত অবস্থার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাপর্য্যায়ের সাদৃশ্য এত অল্প যে, উহারা যে একই প্রাণীর বিভিন্ন অবস্থা-মাত্র, ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে, বোধ হয়, কখনও তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হইত না।

পরিণত-অবস্থাপ্রাপ্ত কীটসমূহের বুদ্ধির বহু বিচিত্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

দলবদ্ধ।—বোম্বাই অঞ্চলে কোনও কোনও বৎসর পঙ্গপালের (Locust) অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই বিচ্ছেদ-মনোমালিন্যের দিনে ইহাদের একতা অনুকরণীয়। ইহারা যে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, তাহা নিশ্চয়ই পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু ইহারা কেন এরূপ দলবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা ভাবিবার বিষয়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহাদিগকে যথার্থ বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলেন, খাদ্য-অন্বেষণ ও ডিম পাড়িবার উপযুক্ত স্থানের আবিষ্কারই ইহাদের দলবদ্ধ হইবার কারণ। কিন্তু সে জন্য ইহারা একই শুভমুহূর্ত্তে তিথিনির্ঘণ্ট দেখিয়া দলবদ্ধ হইয়া কেন যাত্রা করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন।

আত্মরক্ষার উপায়।—কোনও কোনও প্রজাপতির পক্ষের নিম্নদেশে দুইটি 'প্রক্ষেপ' আছে। বৃক্ষাদির উপর বসিলে, ঐ প্রক্ষেপদ্বয়কেই মুখাংশ বলিয়া ভ্রম হয়। বহু পক্ষীই কীটপতঙ্গাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করে। তাহারা সাধারণতঃ প্রজাপতির মুখদেশই প্রথমতঃ আক্রমণ করে ; কিন্তু আততায়ী পক্ষী মুখভ্রমে লাঙ্গুল-দেশ আক্রমণ করিলেই সুচতুর প্রজাপতি পলায়ন করে।

কোন কোনও প্রজাপতির এই প্রক্ষেপদ্বয়ের সঞ্চালনশক্তিও আছে। প্রজাপতি তাহা মুখ-মণ্ডলের ন্যায় সঞ্চালিত করিতে পারে।

সঙ্গম।—কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে সঙ্কেতে পুংকীট স্ত্রীকীটের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহা যারপরনাই কৌতুকাবহ। এই পুষা কৃষিবিদ্যালয়েই সেদিন একটি আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সাইট্রোনেলা তৈল (Oil of citronella) মশক দূর করে। উহা দেহে মাখিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘ্রাণ থাকে, ততক্ষণ মশক দংশন করে না। এখানকার কোনও ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার রুমালে মশকদূরীকরণার্থ ঐ সুগন্ধ মাখাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, একজাতীয় মক্ষিকা তাঁহার পকেটের নিকটে বড়ই আনাগোনা করিতেছে, এবং তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে! এই সংবাদ তিনি ইংরেজ কীটতত্ত্ববিদ্‌কে জানাইলেন। কীটতত্ত্ববিদ্‌ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সফ্‌তালু (peach)-নাশক একজাতীয় মক্ষিকা ঐ তৈলে আশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষা কৃষিক্ষেত্রে অনেক সফ্‌তালু বৃক্ষ আছে, এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট ফল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর গড়ে শতকরা নব্বইটি ফলই পোকায় নষ্ট করিত। উক্ত পোকা নিবারণের একটি উৎকৃষ্ট সূত্র হস্তে পাইয়া কীটতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, অসংখ্য সফ্‌তালু-নাশক মক্ষিকা এই তৈলে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের সমুদয়ই পুং-জাতীয়। সহস্র সহস্র গন্ধাকৃষ্ট কীটের মধ্যে একটি স্ত্রীকীটও দেখা গেল না। উক্ত কীটের ডিম যোগাড় করিয়া তাহা হইতে অনেকগুলি কীট পোষণ (rear) করা হইল, এবং তন্মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া কতিপয় স্ত্রী-মক্ষিকাকে একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কাচপাত্রে ছিপি আঁটিয়া রাখা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ছিপি খুলিয়া শুঁকিয়া দেখা গেল যে, পাত্র হইতে মৃদুমধুর সাইট্রোনেলা তৈলের ঘ্রাণ নির্গত হইতেছে! ব্যাপার বুঝিতে আর বাকি রহিল না;—স্ত্রীকীট ঐ ঘ্রাণ দ্বারা পুংকীটকে আকর্ষণ করিয়া থাকে! অধুনা অনেকগুলি পরিচ্ছন্ন পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে কয়েক বিন্দু ঐ তৈল দিয়া উদ্যানে পাত্রগুলি বসাইয়া রাখা হয়, এবং সেই জলে বহু পুং-মক্ষিকা স্ত্রীকীট-দর্শনাশায় উড়িয়া পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই উপায়ে বহুসংখ্যক স্ত্রীকীট ডিম্ব-প্রসবের অবকাশ-লাভে বঞ্চিত হয়, এবং তাহার ফলে এ বৎসর পুষা কৃষিবিদ্যালয়ের শতকরা তেইশটি মাত্র সফ্‌তালু কীট কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছে।

আমাদের গৃহের চারি পার্শ্বে কীটরাজ্যে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছে, তাহা একটু জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা যথেষ্ট আমোদ পাই। কত বিচিত্র কীটপরিবার পুত্রকলত্রাদি সহ নির্ব্বিবাদে তাহাদের খাস-দখলের ভিটা আঁকড়িয়া ধরিয়া আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণেই বসতি করিতেছে। তাহাদের কত বিচিত্র রীতিনীতি, কত অদ্ভুত আদবকায়দা! পর্য্যবেক্ষণশীল পাঠক তাহা দেখিয়া নিশ্চিতই বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন! ইহাদের রণনীতি ও আহার্য্য-সংরক্ষণপ্রণালী, ইহাদের ভাষা ও ইঙ্গিত, ইহাদের সন্তান-স্নেহ ও দাম্পত্যপ্রেম, ইহাদের ক্রোধ ও আনন্দ, ইহাদের বেশবাস ও রঙ্গপ্রিয়তা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাগর্ব্বিত মানবকে প্রাণিজগতে সভ্যতা ও বুদ্ধি হিসাবে তাহার যথার্থ স্থান সম্বন্ধে অনিশ্চিত করিয়া তুলিবে।

আমাদের দেশের অত্যল্প স্থানই মশকবিহীন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রক্তপিপাসুর প্রকৃত জীবনেতিহাস সম্ভবতঃ অল্প লোকেই জানেন। অনেকেরই হয় ত বিশ্বাস যে, পক্ষযুক্ত মশক একবারে পক্ষযুক্ত মশকই প্রসব করে, অথবা বড় জোর ডিম্ব হইতে একবারেই ডানাদার মশক উদ্ভূত হইয়া থাকে। আবার অপরিষ্কৃত বদ্ধ জলাশয়, জলপূর্ণ বৃক্ষকোটর, ডোবা, নালা, ঝোপঝাপ ও জঙ্গলের সহিত যে ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেকেই জানেন, এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানমতে যে উক্ত ব্যাধি মশক কর্ত্তৃকই সংক্রামিত হইয়া থাকে, এইরূপ একটা স্থূল ধারণাও অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই আছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটির অভ্যন্তরে ভাল করিয়া দৃষ্টি করিলে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যে ম্যালেরিয়া আমাদের শান্তিপূর্ণ নিভৃত বঙ্গীয় পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে, তাহার নিবারণের উপায় যে আমাদেরই হাতে রহিয়াছে, এবং সে উপায় যে খুব কঠিনও নহে, তাহা ভাবিলে হৃদয় আশায় পূর্ণ হয়।

প্রায় সকল অবরুদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ডোবাতেই একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে মশকডিম্ব অথবা বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন বিবিধপ্রকার মশকশিশু দেখা যায়। ডিম্বগুলি দেখিতে সাধারণতঃ কালো, এবং উহা প্রায়ই সমষ্টিবদ্ধ হইয়া গুচ্ছাকারে জলে ভাসিতে থাকে। কখনও কখনও এইরূপ অসংখ্য ডিম্বগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র, লম্বা ও চিক্কণ। ডিম্ব হইতে উদ্ভূত কীড়াগুলি জলে মোচড় দিয়া (wriggling) চলাফেরা করে। উহাদের মস্তক হইতে অধোদেশ ক্রমেই সরু, এবং দেহ লম্বা লম্বা শুঁড়বিশিষ্ট। পরিণত অবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে গুটী অবস্থা প্রাপ্ত

'সরফস্' নামক মক্ষিকা।

ইহা ফসল-নাশক একপ্রকার কীটের উপরে ডিম পাড়ে ; সেই জন্য শস্যের পক্ষে হিতকারী।]
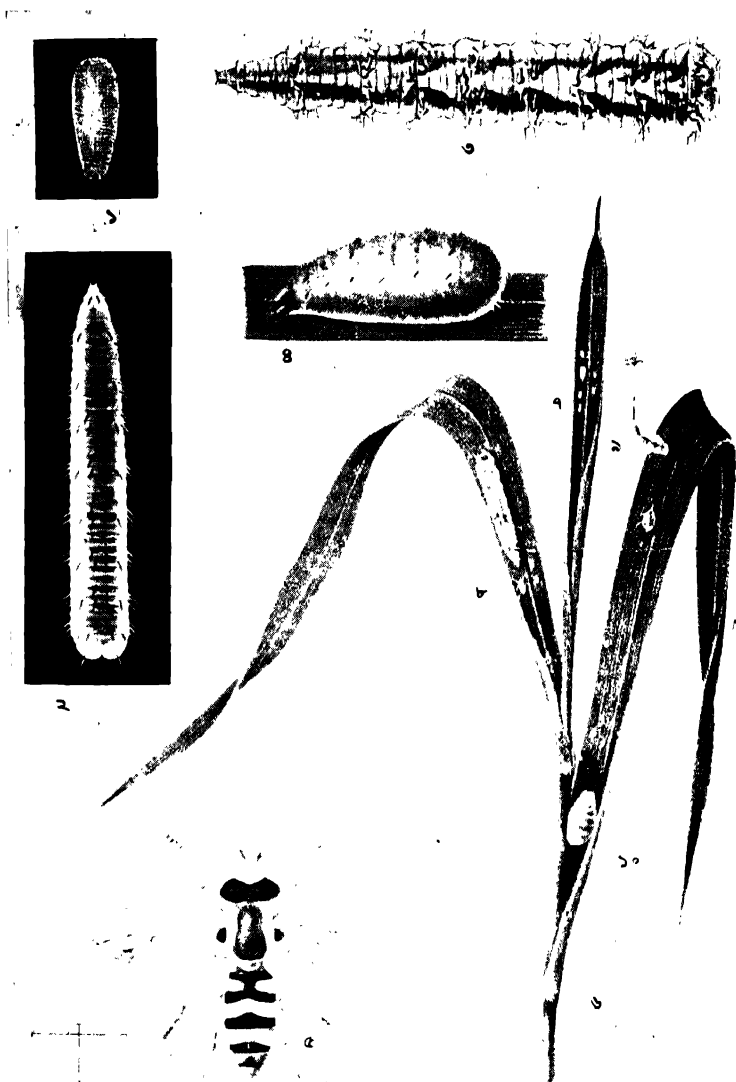
(১) ডিম্ব ; (২)ও(৩) ক্রমি বা কীড়া ; (৪) গুটী ; (৫) পরিণত মক্ষিকা,(বর্দ্ধিত) ;
(৬) পাতা। (৭) ইহাতে ডিম্ব ; (৮) ক্রমি ; (৯) গুটী।
[সকল মক্ষিকাই এবং অধিকাংশ কীটই এই ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিণতি লাভ করে।]

হইলে, উহাদিগকে কীড়া অপেক্ষা অধিকতর স্থূল ও অনেকটা 'কমা'র (,) ন্যায় দেখায়। ম্যালেরিয়া-সংক্রমণকারী মশকের কীড়া জলের উপরিদেশে ভাসিতে থাকে, এবং জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরাল থাকে। সুতরাং উহাদিগকে চিনিতে বেশী কষ্ট হয় না। অন্যান্য কীট-গুটীর সহিত মশক-গুটীর পার্থক্য এই যে, মশক-গুটীরা নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে—উহারা কীড়ারই ন্যায় উল্লাসে চলা ফেরা করে। কতকগুলি ভাসমান মশক-গুটী চামচে দ্বারা তুলিয়া একটি জলপূর্ণ কাচ পাত্রে ঢাকিয়া রাখিলে, কয়েক দিন পরে আমাদের ডানাদার মশক উদ্ভূত হইবে। পরিণত-অবস্থাপ্রাপ্ত মশকের মধ্যেও ম্যালেরিয়া-সংক্রামক মশকের বসিবার ধরণ দেখিলেই তাহাকে চিনিতে পারা যায়।

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে পীত-জ্বরের প্রদুর্ভাব নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, আমেরিকার কোনও কোনও প্রদেশ উক্ত ব্যাধিতে প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর "ষ্টেগোমাইয়া কেলোপস্" (Stegomyia calopus) নামক একপ্রকার মশক পীত-জ্বর সংক্রামিত করে, এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। ঐ মশক আমাদের ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। কিন্তু উহারা পীতজ্বর সংক্রমিত করে কি না, তাহা জানা যায় নাই। আমেরিকায় আক্রান্ত প্রদেশের সমুদয় বদ্ধ জলাশয় লবণ ও কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্বারা মশক-বিমুক্ত করিবার পর অচিরে পীতজ্বর তিরোহিত হইয়াছিল। আমেরিকার সকল প্রদেশের অধিবাসীরাই এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাদের চেষ্টা এত সফল হইয়াছিল। আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য কি এরূপ কোনও চেষ্টা হইতে পারে না ?

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, শুধু স্ত্রীমশকই রক্তপায়ী; পুংমশক প্রায় কখনও দংশন করে না। প্রত্যেক মশকের শোণিত-শোষক শুণ্ডটির উভয় দিকেই দুইটি সুবৃহৎ প্রক্ষেপ আছে। পুংমশকের এই প্রক্ষেপদ্বয় লোমশ, স্ত্রীমশকের প্রক্ষেপ লোমশ নহে। কোনও দংশনরত মশককে একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। স্ত্রীমশকের গীতধ্বনিজনিত বায়বীয় ঢেউগুলি পুংমশকের প্রক্ষেপস্থিত লোমরাশিতে পঁহুছিলে, ঐ লোমসমূহ সুচারুরূপে স্পন্দিত হয়। পুংমশক এই স্পন্দনজনিত ধ্বনি শুনিতে পাইলেই সমীপস্থ স্ত্রীমশকের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। বাদ্যযন্ত্রে স্ত্রীমশকের এই সকল বিচিত্র রাগিণীর অনুকরণ করিয়া পুংমশককে আকর্ষণ করা সম্ভবপর কি না, ইহা কীটবিজ্ঞানের একটি বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য যে, ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইলেই ইহা-দিগের অনিষ্টকারিতা-নিবারণের উপায়ও আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

আমাদের নিতান্ত 'ঘরো' কীটগুলির ইতিহাসও নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যে পূর্ণ। বারান্তরে ইহাদিগকে ধরিবার ও রক্ষা করিবার নানা উপায়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ-প্রদানের অভিপ্রায় রহিল। যাঁহাদের অবকাশ আছে, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির ইতিহাসের আলোচনা করিলে লাভবান হইবেন। ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে কীটতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। কীটতত্ত্ব অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা হীন হইলেও, বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীনতার অনুরোধেও ইহার উপযুক্ত আলোচনা কর্ত্তব্য।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

নস্য-পটকা।

[বঙ্গীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত।]

১

যে সময়ের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইতেছে, তখন বাজীরাও মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া। রঘুজী ভোঁসলা নাগপুরের অধিপতি। কলিকাতায় বর্গীর হাঙ্গামা চলে। তখন ভারতবর্ষে ইংরাজের শুভাগমন হইয়াছে। সে সময়ে বঙ্গদেশে প্রচুর শস্য জন্মিত। অন্নচিন্তার অভাবে শিষ্ট লোকের মধ্যে মিষ্টভাষে ধর্ম্মের ও প্রেমের চর্চ্চার প্রাবল্য ছিল। তখনও বঙ্গদেশে প্লীহা ও কম্পজ্বর প্রভৃতির আবির্ভাব হয় নাই। মেষ, ছাগল ও গবাদির ন্যায় মনুষ্যজাতীয় স্ত্রী পুরুষের শরীর বেশ সুন্দর, নধর, হৃষ্ট ও পুষ্ট ছিল। মনের আনন্দে দিবারাত্রি সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইত। মাঠ, মন্দির, থানা, ডোবা, সকলই সুদৃশ্য ছিল। সকল ঋতুই স্বাস্থ্যকর। অতএব বুঝিতে পারিতেছেন যে, সেই বৎসর ১৭৫২—৫৩ না হইয়া যায় না।

যাহা হউক, তখন বীরভূমের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে (আধুনিক সাঁওতাল পরগণা) কতকগুলি পরাক্রান্ত জায়গীরদার বাস করিতেন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রামনৃসিংহ। দেখিতে কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, যুবা পুরুষ; সাহিত্য, ব্যাকরণ,

কাব্য সঙ্গীতাদিতে ব্যুৎপন্ন। বীরনৃসিংহকে অনেকে আদর করিয়া কেবল নর্সিং বলিয়া ডাকিত। নর্সিংএর এক প্রিয়, চতুর, চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক-ভৃত্য ছিল। তাহার নাম 'ট্যাপা'। ট্যাপা নিতান্ত অনুগত দাস। সে প্রভুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। প্রভুকে দণ্ডবৎ না করিয়া ট্যাপা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিত না। প্রভুর চরণামৃত পান না করিয়া ট্যাপা অন্ন গ্রহণ করিত না। এ হেন ভৃত্য একালে পাওয়া দূরে থাকুক, নয়নগোচর হওয়াই অসম্ভব।

নর্সিং মধ্যে মধ্যে সৈন্যসামন্তাদি লইয়া ট্যাপার সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন। সাঁওতাল পরগণার বিস্তীর্ণ অরণ্যে শিকারের অভাব ছিল না। যখন প্রভু নর্সিং ট্যাপাকে কোনও নিরাপদ স্থানে রাখিয়া ব্যাঘ্র-শিকারার্থ শিকারীদিগের সহিত নিবিড় বনে প্রবেশ করিতেন, তখন ট্যাপা একাকী বসিয়া তসরের গুটীপোকা সংগ্রহ করিত। একদিন ভগবান মরীচিমালী প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী, অথচ প্রভু ব্যাঘ্র শিকার করিয়া প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া, শঙ্কিতচিত্তে ট্যাপা সন্নিহিত কালভৈরবের মন্দিরে আশ্রয় লইল। মন্দির অতিশয় পুরাতম ও ক্ষুদ্রায়তন। বহু দূর হইতে রাজন্যবর্গ সম্পদে বিপদে তথায় পূজা দিতে আসিতেন। ঘটনাক্রমে সেদিন কোনও জায়গীরদারের গৃহিণী শিবিকাযানে দাসদাসী-পরিবৃতা হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সুচতুর ট্যাপা সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া তাঁহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিল। দেখিল, পূজা সমাপ্ত হইলে এক বহুমূল্য-বসনাদি-পরিধৃতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা দেবকন্যার ন্যায় একটি বালিকার হস্তধারণ-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে, বিষণ্ণবদনে, অশ্রুসিক্তনয়নে, ভৈরবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। দাস-দাসী সকলেই অঞ্চল লইয়া চক্ষু মুছিতে আরম্ভ করিল।

সমবেদনা প্রকাশ করিয়া ট্যাপাও কাঁদিতে বসিয়া গেল। এক জন দাসী বলিল, "তুমি কে বাছা?" ট্যাপা যথার্থ পরিচয় গোপন করিয়া বলিল, "এই মন্দিরের সেবক।" ক্রমে দাসীর বাৎসল্যভাব আকর্ষণ-পূর্ব্বক ট্যাপা জানিতে পারিল যে, মন্দিরস্থ স্ত্রীলোকদ্বয় আনন্দগড়ের জায়গীরদারের স্ত্রী ও কন্যা। সম্প্রতি সীমান্ত-বিবাদ-সূত্রে একটি যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে বীরভূমের নৃপতি আনন্দগড়ের জায়গীরদারদিগের একমাত্র তনয় শ্যামলালকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।

২

পরদুঃখকাতর ট্যাপার মনে নিদারুণ আঘাত লাগিল। আনন্দগড়ের জায়গীরদার-বংশ বিখ্যাত। সেই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে বন্দী করিয়া রাখা নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য। ট্যাপার মনে ক্রমে ক্রমে বীরভূম-নরপতির প্রতি ঘোরতর বৈরিভাব সঞ্চারিত হইতেছিল। এমন সময় স্বয়ং নর্সিং অশ্বারোহণে সদলবলে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। নিমেষের মধ্যে ট্যাঁপা স্বীয় প্রভুকে সমস্ত ঘটনা অতীব উৎসাহের সহিত নিবেদন করিয়া কহিল, "প্রভু, আপনার ন্যায় বীর থাকিতে আমাদের দেশের একজন জায়গীরদারের পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যায়, ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা।"

নর্সিং একেই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শিকার করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর, তাহার উপর এই প্রাদেশিক অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া বীরদর্পে অসিনিষ্কাশনপূর্ব্বক বলিলেন, "কৈ? তাঁহারা কোথায়?"

আনন্দগড়ের জায়গীরদার-পত্নী তনয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করিবেন, এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে দেবতুল্যকান্তি বীর-মূর্ত্তি! ব্যাঘ্র-শোণিতসিক্ত অসি, কর্ণে স্বর্ণ-বলয়, মস্তকে শিরস্ত্রাণ। তাহা উন্মুক্ত করিয়া, অসি জায়গীরদার-পত্নীর পদতলে রাখিয়া, সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর যুবা ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দেবী, আপনি চিন্তা দূর করুন। আমি কুমার বীর নৃসিংহ, নাম শুনিয়া থাকিবেন। আপনার পুত্রকে দুই মাসের মধ্যে বীরভূম-কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া যদি না আনিতে পারি, তবে আমার ক্ষত্রিয়-বংশে জন্ম নয়।"

তখন এ অঞ্চলে অবরোধ-প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়-রমণীগণ নিঃসঙ্কোচে স্বজাতীয় পুরুষবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিতেন। বীর-নৃসিংহের পিতার বীরত্ব বিখ্যাত ছিল। তাঁহার তনয়ের বীরোচিত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আনন্দগড়-জায়গীরদার-পত্নীর নয়নে অশ্রুধারা বহিল। আশা জাগরিত হইল।

তনয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক জায়গীরদার-পত্নী কহিলেন, "বৎস, তুমি সন্তানতুল্য, এবং অসময়ের বন্ধু। কিন্তু তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা পালন করা দুর্ঘট। বীরভূমের নরপতি পরাক্রমশালী। সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহার দুর্গ জয় করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। কৌশলে আমার পুত্রকে যদি কারাগার হইতে

মুক্ত করিয়া আনিতে পার, তবেই প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সে বড়ই কঠিন ঠাঁই, সেই জন্য আমার ভয় হইতেছে যে, প্রতিজ্ঞাপালন করিতে গিয়া তুমি প্রাণ না হারাও।"

যতক্ষণ জায়গীরদার-পত্নী এই কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ বীরনৃসিংহ জায়গীরদার-ভামিনীর সঙ্গিনী বালিকাকে দেখিতেছিলেন। সেই ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া নর্সিং একেবারে আত্মহারা না হউন, অতিশয় মোহিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত।

"যদি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি, তাহা হইলে, সময়োচিত ও আপনার সাধ্যায়ত্ত একটি পুরস্কার চাহিয়া লইব।"

কুমার নর্সিংহের নতচক্ষু, রক্তিম কপোল ও সঘন দৃষ্টির বক্রগতি লক্ষ্য করিরা বালিকা মাতার পশ্চাতে লুকাইয়াছিল। জায়গীরদারপত্নী তাহা বুঝিলেন, এবং নিমেষমাত্র চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি প্রতিশ্রুত রহিলাম, এবং আমার বোধ হয়, সরমারও এ বিষয়ে অমত হইবে না।"

সুন্দরী সরমা তখন শিবিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মতামতের কথা বিশেষ প্রকাশিত হইল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মন্দিরে ক্ষীণ আলোক প্রজ্বলিত হইল। শিবিকা চলিয়া গেল। বীরনৃসিংহের জীবনে একটি অভিনব মধুর কল্পনা জাগরূক হইল।

নর্সিং কহিলেন, "ট্যাপা, অদ্য রাত্রি এই মন্দিরেই কাটাইব। শালবৃক্ষে অশ্ব বাঁধিয়া রাখ। আমার আহারের প্রয়োজন নাই।" ট্যাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, "আচ্ছা।"

৩

একে ক্ষত্রিয়যুবক, অপিচ বীরপুরুষ, এবং তাহার উপর মানসপটে অঙ্কিত প্রতিমা। এক সপ্তাহের মধ্যে নর্সিং দেশ-ভ্রমণের ও অজ্ঞাতবাসের দুর্জ্জয় অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা পিতার নিকট ব্যক্ত করিয়া, এবং মাতার নিকট বহু অনুনয়বিনয়পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া, অনুচর ট্যাপার সহিত অশ্বপৃষ্ঠে সাঁওতাল পরগণা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বীরভূম অঞ্চল সে স্থল হইতে শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী। বীর-নর্সিং সুচতুর ও সুনিপুণ ত্রিশ জন সাঁওতালকে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে তাঁহার অশ্বপদচিহ্ন অনুসরণ-পূর্ব্বক বরাবর বীরভূমে আসিতে কহিলেন। সকলেই তাঁহার প্রজা। আনন্দে জয়ধ্বনিপূর্ব্বক যোদ্ধৃগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। সর্দ্দার দলকা

মাঝিকে নর্সিং কহিলেন, "তোমরা কদাচ বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে যাইও না; আমরা যে কৌশল অবলম্বন করিব, তাহা কেবল ট্যাপার প্রমুখাৎ সময় মত জানিতে পারিবে। অরণ্যস্থিত বৃক্ষতলে কিংবা বৃক্ষোপরি রাত্রিযাপন করিবে।"

ট্যাপা স্বীয় বিশালকলেবরা ঘোটকীর পৃষ্ঠে একটি প্রকাণ্ড থলিয়ার মধ্যে সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। প্রয়োজনীয় উপকরণ সকলই ছিল; কেবল অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে প্রায় দশ সের বারাণসীর নস্য ও দশ সের লঙ্কামরীচ-চূর্ণ সংগ্রহ করিয়াছিল। নর্সিংকে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া ট্যাপা কহিল, "প্রভু! আমার পিতা এই নস্য ও মরীচের জোরেই আপনাদিগরে রাজত্বে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং মরণকালে কহিয়াছিলেন, 'ট্যাপা, অজ্ঞাত দেশে নস্যশূন্য ও লঙ্কাহীন হইয়া যাইও না।' পিতৃ-আজ্ঞা সন্তানের সতত পালনীয়।"

অনেক বন, নদ, নদী, নির্ঝরিণী ও গিরিসঙ্কট পার হইয়া ব্যাধ-বেশে বীরনর্সিং ও তদীয় বিশ্বাসী অনুচর ট্যাপা বীরভূমে আসিয়া পঁহুছিলেন। পথে শিকার করিয়া, গ্রামে গ্রামে মৃগয়ালব্ধ পশুর মাংস বিক্রয় করিয়া, উভয়ে জীবনধারণ করিতেন। সাঁওতাল যোদ্ধারা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া প্রভুর অনুসরণ করিত, এবং দুর্গম স্থানে মহাকৌশলে ব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহার শরীর রক্ষা করিত। এক সপ্তাহ পরে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে দূরস্থ একটি দুর্গের চূড়া সকলের নয়নগোচর হইল। ট্যাপা প্রভুকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত শিলার উপর উপবেশন করিতে বলিয়া দুর্গের দিকে গেল, এবং প্রায় চারি দণ্ডের পর প্রফুল্লমুখে মহা-উৎসাহে কহিল "প্রভু! ভৈরবের ইচ্ছায় আপনি সফল হইবেন, বোধ হয়। ঐ দুর্গেই কুমার শ্যামলাল বন্দী। কিন্তু রাজা স্বয়ং সপরিবারে কিছু দিন এখানে অবস্থিতি করিবেন। কল্য দলবল লইয়া তাঁহার ব্যাঘ্র-শিকারে বহির্গত হইবার কথা। সৈন্য সামন্ত অধিক নাই; কেবল এক শত যোদ্ধা, এবং ত্রিশ চল্লিশ জন দুর্গের প্রহরী।"

স্থানটি ঘোর অরণ্যে পরিবৃত। প্রভু ও ভৃত্য বহুক্ষণ ধরিয়া একটি অদ্ভুত উপায় স্থির করিলেন। সে উপায় ট্যাপার কল্পিত।

নিশাসমাগমে সকলেই বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্ব্বক বসিয়া থাকিল। গ্রীষ্ম কাল। বন্য পশু পক্ষী সকলেই কাতরভাবে কলেবর যথাসাধ্য বিস্তার-পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিল। কিন্তু সমীরণ কুত্রাপি সঞ্চারিত হইল না।

কদাচিৎ কোনও পক্ষী পক্ষ দ্বারা, কিংবা কোনও পশু কর্ণ ও লাঙ্গুল দ্বারা নিশ্চল বায়ুকে চঞ্চল করিয়া ব্যজনের 'ক্ষণিক' আনন্দ লাভ করিতেছিল। কিন্তু উপস্থিত মনুষ্যবর্গের পক্ষে বৃক্ষের উপর তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল।

প্রায় সারানিশি জাগরণের পর প্রত্যুষে ট্যাপা বৃক্ষস্কন্ধ হইতে প্রভুকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিল, "রাজা শীঘ্রই ব্যাঘ্রশীকারে বহির্গত হইবেন। এই দিকেই ব্যাঘ্র সকল আসিবে। আপনি সাবধানে নিরীক্ষণ করুন। আমি শিকারের পূর্ব্বেই তিন চারিটা ব্যাঘ্রের তদ্‌বির করিয়া দিতেছি।"

ট্যাপার তদ্‌বীর অত্যন্ত সহজ। সে ঝর্ণার নিকট ও বনপথের মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ কাগজের পটকা নস্যপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর হরিণের মাংসখণ্ড রাখিয়া দিয়াছিল। মাংসলোলুপ ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রশাবকসমূহ তাহার ঘ্রাণ অনুভব করিয়া নিকটে উপস্থিত হইল, এবং মাংসখণ্ডে দন্তসংযোজনা করিবা-মাত্র পটকা ফাটিয়া বারাণসীর অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ নস্যকণা সকল তাহাদিগের চক্ষু ও নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল!

যখন বীরভূম-নরপতি শিকারার্থ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন ছোট বড় প্রায় দশ বারোটি ব্যাঘ্র হাঁচিয়া হাঁচিয়া সারা হইয়াছে! প্রায় নিঃস্পন্দ, শক্তিহীন ও জড়ের ন্যায় মৃতকল্প। আর ক্ষুবণক্রিয়ার শক্তি নাই, অথচ রন্ধ্রের প্রদাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল!

এমন সময় ট্যাপা গলবস্ত্রে সম্মুখীন হইয়া কহিল, "মহারাজ! এগুলি আশ্রম-ব্যাঘ্র। বধ করিবেন না, প্রাণে মারিবেন না।"

বীরভূম-ভূপতি অস্ত্রসংবরণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

সুচতুর ট্যাপা কহিল, "মহারাজ! আমরা ব্যাধ জাতি। নিবাস সাঁওতাল পরগণা। নস্য দ্বারা ব্যাঘ্র জয় করিয়া থাকি। আমাদিগের বংশে ব্যাঘ্রহত্যা মহাপাপ, এই সংস্কার পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। আমাদিগের দলপতি বৃক্ষের উপর বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ অরণ্যে ইতস্ততঃ শিকারে বহির্গত হইয়াছে। মহারাজের অনুমতি হইলে এই ব্যাঘ্র সকল আমরা আশ্রমে রক্ষাপূর্ব্বক পোষণ করিব।"

মহারাজ ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র বীর নর্সিং ব্যাধবেশে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নরপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। নরপতি বীর নর্সিংহের কমনীয় কান্তি ও বিনম্র ভাবে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় হস্ত হইতে স্বর্ণাঙ্গুরী উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া কহিলেন,

"ব্যাধপ্রবর, তোমার ও এই বালকের অসাধারণ কৌশলে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, এই নিঃস্পন্দ ও শক্তিহীন ব্যাঘ্রগণকে বাঁধিয়া দুর্গে লইয়া যাই, এবং রাজপরিবারবর্গকে ইহার অদ্ভুত বিবরণ বিস্তৃতভাবে জ্ঞাপন করি।"

উভয়ে "তথাস্তু" বলিয়া ব্যাঘ্রগণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহারাজও পদব্রজে তাহাদিগের সঙ্গে চলিলেন।

পথিমধ্যে নরপতি কথোপকথনে ব্যস্ত হইলেন। "তাই ত, নস্য দ্বারা ব্যাঘ্র কাবু হয়, ইহা বীরভূমে পূর্ব্বে কেহ শুনে নাই।"

সুচতুর ট্যাপা কহিল, "যাহাদের বুদ্ধি সামান্য, অথচ বল অসামান্য, তাহারা নস্য গ্রহণ করিলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। নস্য অনেকটা দর্শন শাস্ত্রের ন্যায়, মন্ত্রী ও অমাত্যগণের বাক্‌চাতুরীর ন্যায়। মহারাজ বোধ হয় বঙ্গদেশ দেখিয়া থাকিবেন?"

নৃপতি।—হাঁ।

ট্যাপা।—সেখানে বাক্‌চাতুর্য্য অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম; বারাণসীর নস্যের মত। অরণ্যের ব্যাঘ্রের ন্যায় রাজন্যবর্গ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগত হাঁচিতে থাকেন। কথা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে না। কিন্তু উত্তরোত্তর প্রদাহ বর্দ্ধিত হয়। ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে সকলে বাহবা দিয়া থাকে।"

নরপতি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি রাজনৈতিক নস্যের কথা কহিতেছ?"

বীরনর্সিং নম্রভাবে কহিলেন, "মহারাজ! অরণ্যের ও রাজধানীর নীতি একই।"

বীরভূম-ভূপতি আনন্দসহকারে উভয়ের সহিত নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে অবশেষে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশের অন্তরালে একটি নীলবসনা বালিকা অপেক্ষা করিতেছিল। সে অপরিচিত পুরুষদ্বয়কে দেখিয়া পলায়নতৎপরা হইল।

নরপতি সস্মিতমুখে নর্সিংকে কহিলেন, "মঙ্গলা আমার একমাত্র কন্যা। আমার জীবনের আলোক। সংসারে আমার একমাত্র স্নেহ-বন্ধন।" রাজা ডাকিয়া কহিলেন, "মঙ্গলা, পলাইও না। ইহারা ব্যাধ। নস্য দ্বারা ব্যাঘ্র শিকার করে।"

রাজকন্যা মঙ্গলা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। ক্রমে ব্যাধগণ সম্মুখীন

হইলে, রাজমাতা, রাজরাণী ও রাজকন্যা মহাকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন। নিমেষের মধ্যে বীরনর্সিং ও ট্যাপা সকলের প্রিয় হইয়া পড়িল!

দুর্গের অন্তঃপুরের সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। তাহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফলের গাছ। প্রহরীদিগের গৃহের সন্নিকটে বীরনর্সিং ও ট্যাপার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। বীরনর্সিং রাজকন্যার নিকট দেশ বিদেশের অদ্ভুত কাহিনী কহিতেন। রাজকন্যা মঙ্গলা নীরবে বসিয়া শুনিত; কখনও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের, কখনও রক্তিম কপোলের ঈষৎ আকুঞ্চনের দ্বারা হৃদয়ের সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত। এমন স্থলে উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় সখ্য ও মমতার সঞ্চার খুব সম্ভব। না হওয়া অসম্ভব। রাজকন্যা মনে করিত, "কি সুন্দর ব্যাধ!" বীর নর্সিং মনে করিতেন, "কি সুন্দরী ও সুশীলা রাজকন্যা!"

তবে হঠাৎ ইহাকে 'প্রণয়ের সূত্রপাত' মনে করিবেন না। একে ত মহা উৎপাতের আশঙ্কা। কারণ, বীরভূম-রাজকন্যা ক্ষত্রিয়-বংশীয়া। ব্যাধের হস্তে মন প্রাণ সমর্পণ করা সর্ব্বনাশের কথা। অপর পক্ষে, বীর নরসিংহের সত্যপালন। সেই অরণ্যের ভগ্নমন্দিরের বালিকাপ্রতিমা। যাহার জন্য ব্যাধবেশ ও বনবাস, সেই আনন্দগড়ের জয়গীরদারতনয়া সরমা!

সুতরাং যখন মঙ্গলার মুখ দেখিয়া নর্সিংহের হৃদয় চঞ্চল হইত, তখন পূর্ব্ব-স্মৃতি ও সত্যভঙ্গভীতি সেটাকে চাপিয়া দিত। এইরূপ বারংবার দ্বন্দ্বে, বিপরীত ভাবের পরস্পর সংঘাতে, একটা অনির্ব্বচনীয় ও অনিশ্চিত কিছুর উৎপত্তি হইতে লাগিল। তাহা কখনও শান্তির ও কখনও বা অশান্তির কারণ হইয়া পড়িল।

বীরনর্সিং বিরক্ত হইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে তাহাই ভাবিতেছিল। ইত্যবসরে ট্যাপা উদ্যান পার হইয়া সঙ্গোপনে দুর্গের শেষভাগে চলিয়া গেল। সেই দিকে একটি প্রকোষ্ঠে শ্যামলাল বন্দী।

উদ্যানবেষ্টিত প্রকোষ্ঠের দ্বার অন্ধকারে ঈষৎ দেখা যাইতেছিল। বন্দী যুবক শ্যামলাল তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট। উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ, নিম্নে শুষ্কবৃক্ষপত্র ও শস্যপরিপূর্ণ নিম্নভূমি। তাহার পার্শ্বেই দুর্গের উন্নত প্রাচীর। প্রাচীরের এক দিকে বহুপুরাতন বটবৃক্ষের লম্বমান জটা ভূমির সহিত যুক্ত। সে দিক জনহীন, এবং প্রহরীর দৃষ্টির বহির্ভূত!

হঠাৎ একটি তীর আসিয়া যুবকের সম্মুখস্থ ভূমিতল বিদ্ধ করিল। তীরের শেষভাগে একখণ্ড পত্র সংলগ্ন।

বিস্মিত শ্যামলাল তীর উত্তোলন করিয়া পত্র পাঠ করিল। সাঁওতালী ভাষায় এই কয়টি কথা,—"একবার বটবৃক্ষের জটার নিকট আপনার আগমন বিশেষ আবশ্যক। আপনার মুক্তির বিলম্ব নাই।"

স্বদেশের ভাষা ও সেই ভাষায় লিখিত মুক্তির আশ্বাস কতই মধুর! পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন সাবধানে কর্ণ পাতিয়া শুনে, চক্ষু পাতিয়া দেখে, এবং হৃদয় পাতিয়া আশার আবাহান করে, শ্যামলাল সেইরূপ ধীরে ধীরে সাবধানে বটবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃক্ষকোটরাশ্রিত ট্যাপা অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, "আমার নাম ট্যাপা, জাতিতে নাপিত, জয়গীরদার বীরনর্সিংহের দাসানুদাস। এই দুর্গে ছদ্মবেশে স্বয়ং বীরনৃসিংহ ত্রিশ জন সাঁওতাল শরী লইয়া আপনার মুক্তির প্রয়াসী। আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করুন।"

শ্যামলালের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া ট্যাপা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটি অঙ্গুরী বাহির করিল। "এই আপনার মাতৃদেবীর অভিজ্ঞান।"

আর কোনও সন্দেহ রহিল না। নিবিড় অন্ধকারে নিরাশের মলিন চক্ষু পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় হইল। আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্যামলাল কহিল, "এখন উপায়?"

সুচতুর ট্যাপা তাহার অদ্ভুত মস্তিষ্কোদ্ভাবিত উপায় শ্যামলালের কর্ণে বিবৃত করিয়া পুনরায় বৃক্ষকোটরে বিলীন হইল।

রাত্রি এক প্রহর। প্রহরি-পরিবর্ত্তনের সময়। দূর হইতে প্রহরী ডাকিল, "বন্দী কেথোয়?"

শ্যামলাল কহিল, "এইখানে।"

নিমেষের মধ্যে বন্দী প্রকোষ্ঠের মধ্যে নীত হইল। সশব্দে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

৬

এক পক্ষ কাটিয়া গিয়াছে। দোলপূর্ণিমা আগতপ্রায়। ব্যাধবেশী বীর নৃসিংহের সঙ্গীতে উদ্যান প্রতিধ্বনিত। আনন্দময়ী প্রথমযামা নিশি সেই ধ্বনি লইয়া মঙ্গলার কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিতেছিল।

বৃক্ষস্থিত বিহঙ্গ প্রদোষে ডাকিয়া গিয়াছে, "প্রেমিকের নিকট এস। প্রেমই জগৎময়!" মৃদু মলয় ও পুষ্প-সুরভি সেই কথা পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিল।

মঙ্গলা তাহা জানে! মঙ্গলা বুঝিয়াছে। কিন্তু আজ মঙ্গলার বড় ভয়। মঙ্গলা একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইয়াছে। সেই বিশাল বীরভূম প্রদেশের রাজপরিবারের মধ্যে কেবলমাত্র মঙ্গলা সাঁওতালী ভাষা জানিত। মঙ্গলা জানিতে পারিয়াছে যে, ছদ্মবেশী ব্যাধ ক্ষত্রিয়বংশীয় বীরতনয়। যে দুর্দ্দান্ত জায়গীরদারের সহিত মঙ্গলার পিতার চিরশত্রুতা, সেই জায়গীরদার-বংশীয় এক জন যুবা আজ ছদ্মবেশে দুর্গমধ্যে বন্দীর মুক্তিমন্ত্রণায় রত। কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! কি ভয়ানক প্রতারণা!

কিন্তু আর একটি প্রতারণা মঙ্গলার হৃদয়ে তাহা অপেক্ষাও কঠিন আঘাত করিয়াছিল। তাহা সরমার পত্র। সরমা শ্যামলালের ভগ্নী। বীরনৃসিংহ তাহারই "ব্রতে সে ব্রতী"।

কিন্তু মঙ্গলা সে ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবে না; সে আঘাত কাহাকেও জানিতে দিবে না। মঙ্গলা ভাবিল, "বন্দী লইয়া উহারা পলাইয়া যাউক না কেন? বন্দী লইয়া আমাদিগের কি হইবে? জগতে সকলেই বন্দী। মুক্তি কোথায়? ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইলে ফলে ব্যাধের প্রাণদণ্ড। প্রাণদণ্ড! কি ভয়ানক কথা! বিশ্বের মধ্যে সেই জীবনের মূল্য কত, তাহা মঙ্গলা দিবানিশি গণিয়া ঠিক করিয়াছিল। বিবেক, বিজ্ঞান, নীতি—সকলই দূরে যাউক, কিন্তু মঙ্গলার নিকট সে প্রাণের এক কণার ধ্বংস হইতে পারে না। সে জীবন বিশ্বের একটি অংশ। মঙ্গলারও অংশ।

নৃসিংহের সঙ্গীত শেষ হইয়া গেল। মঙ্গলা সাহসে ভর করিয়া শিলাখণ্ডের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে এরূপ নির্জ্জন স্থানে ও এমন সময়ে পূর্ব্বে কখনও ব্যাধের নিকট আসে নাই।

ব্যাধ সসম্ভ্রমে কহিল, "রাজকুমারী! মঙ্গল ত?"

মঙ্গলা ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে কহিল, "ঘটনাক্রমে তোমার পরিচয় জানিতে পারিয়াছি। ব্যাধ! তুমি বন্দীকে মুক্ত করিয়া চলিয়া যাও। এই দুর্গের অন্তঃপুরে বিদ্রোহীর স্থান নাই। পুনরায় ভগ্নস্বরে মঙ্গলা বলিল, "এই পত্র আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি।" না জানিয়া পাঠ করিয়াছিলাম। মার্জ্জনা করিও।"

বীরনৃসিংহের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। পত্রপাঠ করিয়া তিনি নিঃস্পন্দের ন্যায় মঙ্গলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পত্র।—"যাহার ব্রতে আপনি ব্রতী, যাহার ভ্রাতা বন্দী, যে আশাপথ

চাহিয়া আছে, সেই দুঃখিনী কুমারী সরমার এই পত্রখণ্ড। বীরশ্রেষ্ঠ! সংসারের রঙ্গস্থলে অন্য দৃশ্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা ভুলিও না।"

মঙ্গলা চন্দ্রালোকে স্বীয় ছায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিল। "বীরশ্রেষ্ঠ! আমরা মরিলে এ ছায়াও জগতে থাকিবে না। তবে তুমি আমার নিকট প্রতারণা কেন করিয়াছিলে?" আবার বলিল, "ব্যাধ! তুমি সকল কাহিনী আমাকে কহিয়া সরমার কাহিনী কেন লুকাইয়াছিলে? বোধ হয়, তুমি জান না যে, সে কথা পূর্ব্বে শুনিলে আমি কত সুখী হইতাম। কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি যে, তুমি 'ব্যাধ'। ব্যাধ! তুমি চলিয়া যাও। তোমার ভবিষ্যতের কাহিনী আমাকে লিখিয়া পাঠাইও। বন্দীর মুক্তির জন্য ভাবিও না। তুমি যে শিলাখণ্ডে বসিয়া আছ, তাহারই নিম্নে সুড়ঙ্গ। এ পথে বন্দীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইতে পারিবে।"

বীরনর্সিং সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "রাজকুমারী মঙ্গলা, আমার ক্ষত্রিয়-বংশে জন্ম; ছলনা ও প্রতারণা আমাদিগের ধর্ম্ম নহে! যে পত্র লিখিয়াছে, তাহাকে একবারমাত্র দেখিয়াছি, এবং বন্দীর মুক্তির নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ. তাহাও সত্য। কিন্তু আমি তোমার নিকট প্রতারণা করি নাই। আমি এই দুর্গ হইতে অদ্যই চলিয়া যাইতেছি।"

৭

নর্সিং চলিয়া গেলেন। তাঁহার উন্নত দেহের লম্বমান ছায়া মঙ্গলার ছায়া দলিত করিয়া গেল। মঙ্গলা অধীর হইয়া শিলাখণ্ডে বসিয়া পড়িল। মঙ্গলার স্মরণ হইল যে, রাজ-জ্যোতিষী বহুপূর্ব্বে গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "শুক্লচতুর্দ্দশীর নিশাকালে যে বীরপুরুষের ছায়ার সহিত রাজকন্যার ছায়ার সংঘর্ষ হইবে, সেই মঙ্গলার স্বামী, এবং বীরভূমের ভবিষ্যৎ নরপতি।" মধুমাসে দোল-উৎসব। অরণ্যস্থিত দুর্গেও মহাসমারোহে উৎসব হইতেছে। কিন্তু মঙ্গলার মনে আনন্দ নাই।

বীরনৃসিংহ নিরুদ্দেশ। কোথায় গিয়াছেন, তাহা ট্যাপাও জানে না। এ দিকে বন্দীর পলায়নের উপযোগী সকল সরঞ্জামই প্রস্তুত।

অন্য কেহ হইলে মস্তকে হস্ত দিয়া বসিয়া পড়িত, কিন্তু সুচতুর ট্যাপা দুর্গের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া যাহা চিন্তা করিল, তাহা এই,—

"দৈবঘটনা ব্যতীত প্রভুর ন্যায় বীরপুরুষ কখনও সত্যপালনে পরাঙ্মুখ হন না। কেবল নারীর প্রেমই এ স্থলে দৈবঘটনা হইয়া পড়ে। এছেন

নারী রাজকন্যা মঙ্গলা ছাড়া ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। সুতরাং প্রভুর উদ্দেশ রাজকন্যাই জানেন।"

কিন্তু ট্যাপা রাজকন্যার দেখা পাইল না। অবশেষে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বন্দীর মুক্তির চেষ্টায় অগ্রসর হইল।

দুর্গ হইতে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে অরণ্যমধ্যে সাঁওতালগণ অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সেই অর্দ্ধ ক্রোশ যাইতে হইলে একটি পরিখা পার হইতে হয়। সেতুর উপর প্রহরী। অন্য দিক দিয়া গেলে সন্তরণ ভিন্ন উপায় নাই। অতএব অর্দ্ধঘণ্টাকাল দুর্গের প্রহরিগণকে কোনও প্রকারে নিশ্চিন্ত রাখিতে পারিলে বন্দী নির্ব্বিঘ্নে অরণ্যে গিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারে, ইহা স্থির জানিয়া পূর্ব্ব হইতে ট্যাপা দুর্গের প্রাচীরে, তোরণে ও বহু মুক্ত ও রুদ্ধ স্থানে নস্য ও লঙ্কামরীচের পটকা নির্ম্মাণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিল। সেই সকল পটকা বহু কৌশলে সূক্ষ্ম তসরের সূত্রে বদ্ধ করিয়া মূল রজ্জু হস্তে লইয়া, ট্যাপা বটবৃক্ষের কোটরে বসিয়া রহিল।

সারাদিন আবীর খেলিয়া দুর্গস্থিত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। চন্দ্রোদয় হইলে প্রহরিগণ আবীর খেলিবে, এবং সৈন্যগণের মধ্যে জনকতক লোক বন্দীর আগারের দ্বার রক্ষা করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল!

সৈনিকগণের আগমনের পূর্ব্বে মেড়ুয়াবাদী প্রহরিগণ বিলক্ষণ ওজনে সিদ্ধি ঘুঁটিয়া পান করিল, এবং পুরাতন বাদশাহী আমলের ঢোল ও করতাল লইয়া মত্ত হইয়া উঠিল।

এই সুযোগে শ্যামলাল বটবৃক্ষের জটা বাহিয়া ট্যাপার সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ পার হইয়া গেল।

শ্যামলালের প্রকোষ্ঠের পালঙ্কের উপর প্রহরিগণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত ট্যাপা একটি কৃত্রিম কাগজের মনুষ্যদেহ শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিল। প্রথম দর্শনে কেহই বুঝিতে পারে নাই। পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাকিল, "বন্দীর আহার প্রস্তুত।"

কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া ব্রাহ্মণ পালঙ্কের নিকট গেল। ক্রমে কৃত্রিম মানুষের গোঁফ ও ভ্রূ প্রভৃতি দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "সকলে আইস। বন্দী মরিয়া ভূত হইয়াছে।"

এ দিকে খচাখচ ঢোল বাজিতে লাগিল। ভূতের আভাস পাইয়া

সৈনিক ও প্রহরিগণ রণগর্জ্জনপূর্ব্বক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, এবং সকলে দেহ পরীক্ষা করিতে গেল। কি অপূর্ব্ব দেহ! স্পর্শমাত্র তাহার অভ্যন্তর হইতে নস্যের পটকা পটাপট্ ফাটিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ হাঁচির রোলে দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইল!

একজন হাঁচি-সংবরণপূর্ব্বক কহিল, "চালাকী নয়, বন্দী পলাইয়াছে।"

মহাশব্দে সকলে কহিল, "বন্দী পলাইয়াছে।"

সিদ্ধির নেশায় মত্ত মেড়ুয়াবাদী প্রহরিগণ তাহাতে কর্ণ না দিয়া ঢোলের চাঁটী দ্রুত করিয়া গভীরগর্জ্জনে কহিল. "হোলি হ্যায়!" তাহারা তালে তালে তালে আবীর লইয়া বীরভূম-সৈনিকগণের মস্তকে, চক্ষুতে ও নাসিকারন্ধ্রে মর্দ্দন করিতে লাগিল!

বন্দীর পলায়ন- বৃত্তান্ত প্রচারিত হইলে অবশিষ্ট সৈনিকগণ সেই দিকে ধাবিত হইল। পথিমধ্যে ট্যাপা কর্ত্তৃক বিস্তারিত নস্যপটকাজালে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের অবস্থাও শোচনীয় হইল!

তখন তিন শত বাঙ্গালী সৈনিকের সমাগম দেখিয়া মত্ত মেড়ুয়াবাদী প্রহরিগণ তাহাদিগের উপর বলপূর্ব্বক আবীর বর্ষণ ও মর্দ্দন করিতে লাগিল। হায়! কেহই জানিত না যে, সেই আবীর-রাশির অধিক ভাগই লঙ্কামরীচ-চূর্ণ ও নস্য!

৮

পাঠকগণের স্মরণ থাকে যেন, আমরা যে সময়ের গল্প করিতেছি, তখন অনেকটা পুরাকালের কায়দাকানুন প্রচলিত ছিল।

প্রণয়, বিশেষতঃ বীরপুরুষের গভীর প্রণয়, সেকালে বীরেরই উপযোগী বিভূতি ও প্রণয়প্রতিমার ভূষণস্বরূপা গণ্য হইত। বীরনৃসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের সমগ্র ভবিষ্যৎ ইতিহাস মঙ্গলার হস্তে ন্যস্ত। তাঁহার কেবল মঙ্গলার হৃদয় বুঝিতে বাকী ছিল। তিনি অবশেষে তাহাও বুঝিয়াছিলেন।

অতএব, তাঁহার পক্ষে কেবল দুই পথ উন্মুক্ত। প্রথম, সংসার-ত্যাগ। সেটা সন্ন্যাসীর পথ। দ্বিতীয় বলপূর্ব্বক রাজকন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ। তাহাই কর্ম্মযোগীর পথ।

সুতরাং বাক্যব্যয় না করিয়া বীরনৃসিংহ সেই দোলপূর্ণিমার নিশীথে ত্রিশ জন শরী লইয়া অসীমসাহসে দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বীরত্বপ্রকাশের অবকাশ ছিল না। কারণ, যখন তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তিন শত সৈনিক ও এক শত প্রহরী লঙ্কামরীচ-চূর্ণ ও নস্যের প্রসাদে ধূলিশয়ান, এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-গ্রহণ-শক্তিবিহীন নির্জীব জীব! বন্দী ও ট্যাপা বহুপূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছে।

বীরনৃসিংহ একবারে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সাঁওতাল যোদ্ধৃ-গণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিল।

গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রি। রাজরাণী ও রাজমাতা জপে নিযুক্তা ছিলেন। মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পূর্ণচন্দ্রালোকে বীরভূম-নরপতি দুর্গের ছাতের উপর উপবিষ্ট। মঙ্গলা পিতার নিকট সমগ্র কাহিনী কহিতেছিল। কথা সমাপ্ত হইলে রাজা তনয়াকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বৎসে! কৃষ্ণের কৃপায় তোমার মঙ্গল সুনিশ্চিত। আমি সেই জন্য তোমার নাম মঙ্গলা রাখিয়াছিলাম।"

সহসা বীরনৃসিংহ ধনুর্ব্বাণহস্তে উভয়ের সম্মুখীন হইলেন! নরপতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহাস্যে কহিলেন, "বৎস নৃসিংহ! এই মধুমাসে দোলপূর্ণিমায় বলপ্রকাশের ও বীরদর্পের কোনও প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশ চিরকালই প্রেমের মাহাত্ম্যে শীর্ষস্থানীয়। তুমি পূর্ব্ব মোহ বিস্মৃত হইয়া মঙ্গলাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, ইহা আমার গৌরবের বিষয়। বন্দীর পলায়নে তুমি প্রতিজ্ঞা-মুক্ত হইয়াছ। এখন মঙ্গলাকে বিবাহ করিয়া বীরভূম রাজ্যের মঙ্গলস্তম্ভনির্ম্মাণে যত্নবান হও। এই আমার আশীর্ব্বাদ!"

নরপতি সুবর্ণপাত্র হইতে দেবচরণে উৎসর্গীকৃত আবীর লইয়া উভয়ের ললাটে স্পৃষ্ট করিলেন, এবং দুর্গসোপান বাহিয়া নিম্নপ্রকোষ্ঠের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রালোকে প্রণয়িযুগলের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। তবে প্রভাতেই দামামা বাজিয়া উঠিল, "রাজকন্যা মঙ্গলার বিবাহ!" সপ্তাহের মধ্যেই বহু সহস্র সৈনিক ও বহু শত নরনারী সেই অরণ্যস্থিত দুর্গে আসিয়া রাজকন্যা মঙ্গলার সহিত বীরনৃসিংহের বিবাহ-সমারোহে যোগদান করিল।

ইতিহাস কহে যে, নবদম্পতী সাঁওতাল পরগণায় কিছুদিন বাস করিয়া-ছিলেন, এবং সরমা মঙ্গলার প্রিয়সখী হইয়া আজীবন স্নেহানুবদ্ধ ছিল।

সরমার সহিত অন্য একটি জায়গীরদারের বিবাহ হইলে, বীরভূম-রাজ সীমানার বিবাদ একবারে মিটমাট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ট্যাপা বীরভূম অঞ্চলে আসিয়া নস্তের দোকান খুলিয়া বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল। বীরনৃসিংহ বীরভূম-সিংহাসন অধিকার করিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সে রাজবংশ আর এখন নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কহিয়া থাকেন যে, তাহা অন্ধ্র-বংশের একটি শাখা, এবং বহু স্থান খনন করিয়া বীরনৃসিংহ ও মঙ্গলার মূর্ত্তিক্ষোদিত পুরাতন মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। ইতি।

আধুনিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম।*

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ইহা ইংরেজী ভাষায় লিখিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ভাষায় একটি সূচনা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নহে।

বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে এখনও যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, বরং স্থানে স্থানে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বিস্মৃত ও অতীত ইতিহাস-কথার উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টায় যখন শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ প্রত্নানুসন্ধিৎসু হইয়া গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন তিনি আকারান্তরিত বৈষ্ণব-আবরণ-সম্পুটিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সকল কথাই সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রাঢ়ে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সজীবভাবে রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজের পূজাই বৌদ্ধপূজার প্রকারান্তর-মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় এই সিদ্ধান্তই বিশদ করিয়া এই পুস্তকের সূচনায় লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ইংরেজী সূচনার সংক্ষিপ্তসার আমরা নিম্নে ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও বলিব।

---

* *The Budhism Modern by Nagendra Nath Basu Prachyavidyamaharnava with an introduction by M. M. Haraprosad Sastri. Price Rs. 3.*

লোকের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল, এখনও অনেকের এই ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য ভারতভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন! কথাটা কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে ঠিক নহে। খৃষ্টাব্দ নবম ও দশম শতাব্দীতে পালরাজগণ বৌদ্ধ নরপতিরূপে দেশ শাসন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য নিশ্চিহ্নভাবে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত হইতে মুছিয়া ফেলিলে, তাঁহার অত পরে বৌদ্ধনরপতি ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন না। ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে? শ্রাবস্তীতে একটি বৌদ্ধচৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল; ব্রহ্মদেশের নরপতি ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন; তমলুক হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আসাম আদি দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক সকল নিয়মিত পাঠ করিতেন; কাত্যায়নগোত্রের এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হইলে, দেশত্যাগী হইয়া সিংহলে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তীর পদ পাইয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর বাঙ্গালার বৌদ্ধগণই অধিকতর আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। খৃষ্টের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় এই সকল ঘটনা ঘটে, এবং এ সকলই যে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব এখন আর এ কথা বলা চলে না যে, শঙ্করাচার্য্য ভারতের বক্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন! ষোড়শ শতাব্দীর শেষে লামা তারানাথ তিব্বত হইতে ভারতে দূত পাঠাইয়াছিলেন, ভোট ভিক্ষু আসিয়া বাঙ্গালা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিল। তাহারা দেশে গিয়া বলে যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পশ্চিম বাঙ্গালায় (রাঢ়ে) এবং উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল ছিল। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ানচাঙ্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় দশ হাজার সঙ্ঘারাম ও এক লক্ষ ভিক্ষু ছিল। ইহাদের প্রতিপালন বিধর্ম্মী বৌদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহ করিবে না; সুতরাং হিসাব করিয়া বলিতে হইলে বলা চলে যে, বাঙ্গালায় এক কোটী গৃহস্থ বৌদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বাঙ্গালার প্রায় বারো আনা নরনারী বৌদ্ধ ছিলেন। এত বৌদ্ধ যে দেশে ছিল, সে দেশ যে একেবারে বৌদ্ধশূন্য হইবে, এমন অনুমান করাও ঠিক নহে।

পাঠানগণ যখন এ দেশে আসেন, এবং বঙ্গবিজয় করেন, তখন তাঁহারা এ দেশের বর্ণাশ্রমী ও সদ্ধর্ম্মী, অর্থাৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়কেই হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন! তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক মনে করিতেন না। বখতিয়ার খিলজী মগধের একটি বিহার লুণ্ঠন করেন।

মিনহাজ-উদ্দীন লিখিয়াছেন যে, এই বিহারে মুণ্ডিতমস্তক বা পুরোহিত ছিল, এই স্থানে অনেকগুলি পুস্তক ছিল। তব্‌কাৎ ই-নাশারি পুস্তকে লেখা আছে যে, "তামাম হিসার (দুর্গ) ও সহর একটা বিদ্যালয়, এবং হিন্দীভাষায় মদ্রসাকে বিহার বলে।" ইহা হইতেই বেশ পরিস্ফুট হয় যে, বখতিয়ার বৌদ্ধ-বিহার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আরবী ভাষায় পৌত্তলিকের এক প্রতিশব্দ "বোধ-পরস্ত"। আরবের প্রাথমিক মুসলমানগণ বিষম বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তাই বখ্‌তিয়ারের পরে যত পাঠান বাঙ্গালা জয় করিতে আসিয়াছিল, সবাই দেশহিসাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণকে কেবল হিন্দুনামেই আখ্যাত করিয়াছিলেন। এই কারণ মুসলমান-বিজয়ের পর বাঙ্গালার বৌদ্ধগণ হিন্দু নামের আবরণে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। এই হেতু মুসলমান-বিজয়ের পর মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে বাঙ্গালার বৌদ্ধদিগের পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায় না।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালায় যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য আসেন নাই, তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেই দিনযাপন করিতেন। বিশেষতঃ, তাঁহারা রাজানুগ্রহে গ্রামীন ও ধনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে থাকিয়া কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞ করিতেন। "ইহারা কেহই বাঙ্গালার বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিবার চেষ্টা করেন নাই। আমার বিশ্বাস, ইঁহারা পাঁচ জনেই অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন, নিজেদের অগ্নিহোত্র কার্য্যেই সতত ব্যস্ত থাকিতেন। ইঁহাদের সঙ্গে যে পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিল, তাহারা শূদ্র হইতে পারে না; কেন না, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের সংস্পর্শে আসিতেন না।" যাহা হউক, ইহা সত্য বটে যে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের চেষ্টায় বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটে নাই। তবে যাহা রাজধর্ম্ম হয়, ধীরে ধীরে তাহাই প্রজার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। তাই বর্ণাশ্রমী হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে বাঙ্গালার সজ্জনসমাজের ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল, পরন্তু বাঙ্গালার লোকমত বৌদ্ধধর্ম্মেরই অনুকূল ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের পুনর্বিস্তার দেখিয়া বল্লাল সেন বাঙ্গালায় আবার চাতুর্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। তবে বর্ণসঙ্করতার আধিক্য হেতু তিনি চারি বর্ণের প্রতিষ্ঠা না করিয়া, প্রথমে বাঙ্গালীকে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বিভক্ত করেন; শূদ্রদের মধ্যে সৎশূদ্র, নবশাখ বা জলাচরণীয় শূদ্র, এবং পতিত শূদ্র, এই তিন শ্রেণী ভাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-প্রভাবকালেও ব্রাহ্মণ অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে

পারিয়াছিল। বৌদ্ধদের পুরোহিত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, এই তিন শ্রেণীই শুদ্ধশোণিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগের নির্দ্দেশ ঠিক থাকাতেই বল্লালসেনকে ব্রাহ্মণের জাতিকুলবিচারে বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই। বিশেষতঃ হূণ ও শকদিগের উপদ্রবের সময় হইতে পশ্চিমের অনেক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। যখন গজনীর মামুদ ভারত আক্রমণ করেন, তখন—তিরৌরীর যুদ্ধের পর—কুরুক্ষেত্রের ও কান্যকুব্জের অনেক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বারো আনা অধিবাসী বৌদ্ধ হইলেও, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ এই হেতু চিরকালই ঠিক ছিল। তবে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল বলিয়াই কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন অগ্নিহোত্রীকে বাঙ্গালায় আমদানী করিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতির জন্য কোনও প্রশস্ত ব্যবস্থাই নাই। ব্রাহ্মণের অনুকরণ করিয়া অন্য জাতি সকল চলিবে; যে জাতি যত অধিক ব্রাহ্মণাচারের অনুকরণ করিতে পারিবে, ব্রাহ্মণের পর তাহার ততটা শ্রেষ্ঠতালাভ হইবে। শূলপাণি, ভবদেব হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যত ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, সবাই স্ব স্ব পুস্তকে কেবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণজাতির পবিত্রতা-রক্ষার জন্য নানা বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এইখানে ইহাও বলা উচিত যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ, মিথিলা ও দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণসমাজের আদর্শে রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার আচার ধর্ম্ম দক্ষিণদেশাগত। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতেন, এবং সাধন-ধর্ম্মে শাক্ত বা শৈব ছিলেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাঙ্গালার কুলীনসমাজে একটু যেন খাট, একটু যেন ছোট হইয়া থাকিতেন। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম যেন উপেক্ষিত শূদ্র-সমাজের জন্যই ছিল। এখনও বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজে কতকটা এই ভাবই পরিলক্ষিত হয়। এই উপেক্ষার কারণ কি? বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য জাতি নাই কেন? ইত্যাদি শঙ্কার সমাধান শাস্ত্রী মহাশয় বিশদভাবেই করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম কোনও কালেই লোপ পায় নাই। এখনও বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম সজীব আছে। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুও তাঁহার পুস্তকে এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম কতকটা শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসাদে, কতকটা

সহজিয়ার, আউলে-ভজার, বাউল সম্প্রদায়ের, কর্ত্তাভজার গুপ্ত আবরণে, কতকটা বা শাক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে, এবং কতকটা বা দেশাচারে প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজ করিতেছে। সহজিয়ার মত যে বৌদ্ধ মত, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় সপ্রমাণ করিয়াছেন। আউলের ও বাউলের কড়াসিদ্ধি, আলেখ-সাধন প্রভৃতিতে শূন্যবাদীদের মত পরিস্ফুট রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ধর্ম্ম-রাজের পূজা, চড়ক পূজা, রথযাত্রা প্রভৃতি যে বৌদ্ধ উৎসব, তাহা একটু খোঁজ করিলেই জানা যায়। পুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তি যে বৌদ্ধ দেবতা, তাহা প্রত্নবিদ্‌মাত্রই স্বীকার করিবেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথও জগন্নাথক্ষেত্রকে বৌদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের পার্শ্বেই যে বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। ভীমভইয়ের মহিমাধর্ম্মিগণ যে একবার জগন্নাথ মন্দির দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। আধুনিক অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাস যে, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম মহাযান ও বজ্রাচারী বৌদ্ধদিগের মতের সহিত পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের আপোষমাত্র। আমার বিশ্বাস, আধুনিক সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এইরূপ আপোষ-মাত্র। বল্লভাচার্য্যের শ্রীসম্প্রদায়ের লোকেরা জৈনদিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের জাতি ধর্ম্মের কোনরূপ অপহ্নব ঘটে না। আমিই যখন কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে কাজ করিতাম, তখন বল্লভকুলের এক জমীদার-পুত্রের সহিত এক জৈন ধনকুবেরের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মত একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহাতে বেজায় বৌদ্ধ গন্ধ পাওয়া যাইবে। মহামহোপাধ্যায় ৺রাম মিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় একবার এক বিচারসভায় বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও প্রেমসাধনা বৌদ্ধ মহাযানীদের সাধনার আকারান্তরমাত্র। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু বলরাম দাসের অনেক শ্লোক উঠাইয়া এ কথার অজ্ঞাতে সমর্থনই করিয়াছেন। পণ্ডিত রামমিশ্র বলিয়াছিলেন, পুরাণে কোনখানেই বিষ্ণু দ্বিভুজ মুরলীধর নহেন, সর্ব্বত্রই তিনি চতুর্ভুজ। কোনখানেই কান্তা-ভাবাসক্তির সাহায্যে তাঁহাকে সাধন করিবার পদ্ধতির উল্লেখ নাই। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীচৈতন্যের উদ্ভাবিত রূপ; পরবর্ত্তী গোস্বামিগণ এই রূপের বিকাশ ঘটাইয়াছেন মাত্র। আর এক কথা,—নাম, রূপ ও কাম, এই তিনটাই বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত-প্রসূত বিষয়। নাম-রূপের মহিমা চৈতন্য-চরণাশ্রিত গোস্বামি-ভক্তগণই প্রচার করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, জৈনগণ বাঙ্গালায় বিশেষ কিছু চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। অথচ হাজারিবাগে পার্শ্বনাথ (পরেশনাথ), ভাগলপুরে বাসুপূজ্য, রাজমহলে মহাবীর প্রভৃতি তীর্থঙ্করের সমাধি রহিয়াছে; বাঙ্গালা দেশই জৈনদিগের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল। রাঢ়ে পঞ্চকোটে এক দল নাথপূজক আছে; নেড়ানেড়ীদের মধ্যে নাথ-সাধনা আছে; যোগীজাতির মধ্যে জৈনাচার পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালার সকল প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায় একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলে জিন-পদাঙ্কও পাওয়া যাইবে। সুবর্ণবণিক জাতির কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

আচারের লক্ষণ পাওয়া যায়। যাউক, এই সকল বিষয়ের আলোচনা তজ্জ্ঞ ব্যক্তিরাই করিবেন। তবে এইটুকু বলিতে আমি বাধ্য যে, শ্রীযুত নগেন্দ্র-নাথের পুস্তকে যে ভাবের আলোচনার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, সেই ভাবের আলোচনা হইতে থাকিলে, বাঙ্গালী জাতিকে চিনিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা

হইবে। আমরা বাঙ্গালী বটে, পরন্তু বাঙ্গালায় কি আছে, কি নাই, তাহাই বলিতে পারি না; বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিন্যাসের কোনও সমাচার রাখি না, বাঙ্গালীর সমাজ-শরীরের কোনও পরিচয় জানি না। নগেন্দ্রনাথের পুস্তকখানি পাঠ করিলে বর্ত্তমান উড়িষ্যার একটু ঘরের খবর পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সূচনাসমেত এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইলে আমরা অধিকতর আনন্দলাভ করিতাম। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালী শিক্ষিতমাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য; কেবল পাঠ করিলেই হইবে না, বাঙ্গালীর সমাজ-ধর্ম্মের আলোচনাও করিতে হইবে। বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশের লোকসাধারণকে চিনিতে পারিলে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিক্রম জানিতে পারিলে, বাঙ্গালী জাতিরই কল্যাণ হইবে। নগেন্দ্রনাথ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সেই কল্যাণের মার্গ প্রশস্ত করিয়াছেন। উহাকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিলে তিনি বিদ্বজ্জনসমাজের ধন্যবাদার্হ হইবেন। নগেন্দ্রনাথ চিরজীবী হউন। যাঁহারা জাতির পরিচয় ও সমাজের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মবোধের উদ্বোধন ঘটাইতেছেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। আধুনিক বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অল্প শ্লাঘার পরিচায়ক নহে।

অনেক কথা বলিবার রহিল। পরে যদি সময় হয়, তবে সে সব কথার পরিচয় দিব। বিশেষতঃ, নগেন্দ্রনাথের পুস্তকগত অনেক বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সন্দর্ভের বিষয়; প্রয়োজন হইলে পরে তেমন চেষ্টা করিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদেশে প্রাচ্য-বিদ্যা।

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য বিদ্যার বহুল চর্চ্চা আরব্ধ হইয়াছে। সে বেশী দিনের কথা নহে, যে দিন জ্ঞানগৌরবময়ী জর্ম্মণী সুদূর পশ্চিম হইতে প্রভাত-গগনের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, "জ্ঞানের প্রথমোন্মেষ ওইখানে। প্রতীচী প্রাচীর নিকট চিরকালই আলোকের জন্য ঋণী।" প্রতীচী আজ তাহা বুঝিতে পারিয়া প্রাচ্য বিদ্যার আলোচনায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। যাহা আমাদের করা আবশ্যক, যাহা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত, আমরা তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া জীবন-সংগ্রামটা লঘু করিবার জন্য নিশ্চেষ্টভাবে পরের মুখ চাহিয়া

বসিয়া আছি! আমাদের ইতিহাস ও আমাদের জাতীয় গৌরব পরের হাত হইতে পরিম্লান অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া আজ আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। আমাদিগের দেশের ধনরত্ন লইয়া পরে বড়মানুষী করিতেছে, আর আমরা তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমাদের দেশের ইতিহাস পরের হাতে গিয়া যে কত দূর হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বোধ হয় ঐতিহাসিক পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। জাতির উন্নতি তাহার অতীত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে, ইহা চিরন্তন সত্য। আমাদের অতীত গৌরবই ভবিষ্যতের ভিত্তি। সাহিত্য ও ইতিহাস যে জাতির কীর্ত্তিকলাপকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করে নাই, তাহাদের জাতীয় জীবনের বিকাশ সুদূরপরাহত। আমরা নব্য পাঠক-বর্গকে আমাদের অতীতগৌরবকাহিনীর উদ্ধারব্রতে ব্রতী করিবার উদ্দেশ্যেই, পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনা সম্বন্ধে মাসিক পঞ্জী উপহার দিব। হয় ত ইহাতে তাঁহাদের মহদুদ্দেশ্যের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারিবে।

আমরা নিম্নলিখিত কয়টি সমিতির প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিষয় আলোচনা করিব।

Asiatic Society of Bengal.
Royal Asiatic Society, এবং ইহার শাখা সমিতি সকল।
L'Ecole Francaise d'Extrême-Orient
Société Asiatique de'Paris.
Deutsche morgenländische Gesellschaft.
Seminar für orientalische sprachen.
American Oriental Society.

১৮১২ খৃষ্টাব্দের জর্ম্মণ প্রাচ্য সমিতির পত্রিকার প্রথম খণ্ডে ইয়ারল কার্পেন্তির ভারতীয় জাতক সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার পূর্ব্ব প্রবন্ধের আনুক্রমিক। এই অংশে তিনি "গান্ধার-জাতকে"র (Faus. III.) সহিত অপরাপর জাতকমালার সম্বন্ধ বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উক্ত সংখ্যায় ডাক্তার গ্রিয়ার্সন পৈশাচী প্রাকৃত সম্বন্ধে একটি গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পৈশাচীভাষা, সৌরসেনী প্রাকৃত, পালি, কিংবা সংস্কৃত-ভাঙ্গা ভাষা নহে। তাঁহার মতে, ইহা একটা স্বাধীন অনার্য্য ভাষা।

মঁসিয় ফুশের ১৮১১ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের "জুর্ণাল আসিয়াতিকে" বৌদ্ধ-শিল্পকলার প্রারম্ভ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধকার তাঁহার এই চতুর্বিংশপৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধভাস্কর্য্যে বুদ্ধমূর্ত্তির বিরলতার কারণানুসন্ধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাসমূহ যে সকল ভাস্কর্য্যে প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতেও বুদ্ধমূর্ত্তির সম্পূর্ণ অভাব। ভর্হুত ও সাঞ্চী স্তূপের স্বল্পোত্তিন্ন ভাস্কর্য্যে জাতকাদি, এবং তাহাদের অলিন্দে গৌতমের সাংসারিক জীবনের অনেক ঘটনা চিত্রিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পর, অথবা বোধি-সত্বাবস্থার কোনও চিত্রই তৎসাময়িক বৌদ্ধ-ভাস্কর-কীর্ত্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ফুশের মনে করেন, বৌদ্ধদিগের চিরন্তন সংস্কার ও তাহাদিগের পূজ্যপাদ গুরুর গৌরব ক্ষুণ্ণ করিবার আশঙ্কাই ইহার প্রধান কারণ। যদিও মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে ও মিলিন্দ-পঞ্হে এ সম্বন্ধে নিষেধের সংকেত দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবন্ধ-লেখক সে সকল বচনকে ধর্ম্মগ্রন্থের সুস্পষ্ট নিষেধ বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যের প্রারম্ভ খৃঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় আমাদিগের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বড় কর্ত্তা মার্শ্যাল সাহেব ১৯০৯—১৯১০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে উদ্ধৃত মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যাদির সচিত্র বর্ণনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মতে, পুরাতত্ত্ব বিভাগের পরবর্ত্তী উদ্যম সিন্ধু নদের উপত্যকার দিকে পরিচালিত হইলে ভাল হয়। তক্ষশিলায় বিশাল ধ্বংসাবশেষ এখনও অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে।

"রেভ্যু দঃ লিস্তোয়ার দে রেলিজেঁ" নামক পত্রিকায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের সংখ্যায় মঁসিয় ওব্রামার শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সকল বক্তব্য ম্যাকৌলিফ্ প্রণীত "শিখধর্ম্ম" নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মূল ধর্ম্মমত ও তাঁহাদিগের রাজনৈতিক বিকাশ, এবং ইস্লাম ও হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অতি সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জলভাবে প্রবন্ধকার বর্ণনা করিয়াছেন।

মঃ এত্‌য়াড় শাবান ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের "জুর্ণাল আসিয়াতিকে" তুনানে প্রাপ্ত

চারিটি উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় এক জন তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। মঃ শাবান এই প্রতিবাদের একটি গভীরগবেষণাপূর্ণ উত্তর উক্ত সোসাইটীর জানুয়ারী মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া, য়ুনানের উৎকীর্ণ লিপি সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধান শেষ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয় জর্ম্মাণ প্রাচ্য সমিতির পত্রিকায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংখ্যায় অশোকের প্রস্তরস্তম্ভসমূহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সকল পুরাকীর্ত্তির এ পর্য্যন্ত কোনও তালিকা ছিল না। অধ্যাপক স্মিথ্ ফাহিআং ও উয়াং চোয়াং হইতে অশোকের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভসমূহের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অশোক-স্তম্ভ-সমূহের একটা সম্পূর্ণ তালিকা যথাযথ মন্তব্যের সহিত প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত পত্রিকায় স্পাইয়ারের "ইণ্ডোলোগিশে আনালেক্টা" এখনও চলিতেছে।

উক্ত পত্রিকায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় ডাক্তার গ্লাসের "ভারতীয় ছাত্র" (Der indische Student) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও গৃহ্যসূত্রসমূহ অবলম্বনে লিখিত। এই প্রবন্ধে বিদ্যারম্ভ হইতে স্নাতকের গৃহপ্রবেশ অবধি যে সকল নিয়ম ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতিপাল্য ছিল, তৎসমুদায়ই বর্ণিত হইয়াছে।

জর্ম্মন প্রাচ্য পত্রিকার ১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংখ্যায় তোর্ক্‌সীনের সেমিতীয় ক্রিয়াপদের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি হিব্রু, আরব ও আসীরীয় শাখায় ক্রিয়াপদসমূহ লইয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সকল ভাষার মূলে একইরূপ গঠনপ্রণালী বর্ত্তমান। উক্ত পত্রিকার ইহার ঠিক পরের প্রবন্ধে ডাক্তার বার্ট সেমিতীয় সংখ্যা-জ্ঞাপক শব্দসমূহের অনুশীলনে প্রয়াস পাইয়াছেন। অধ্যাপক রয়ার সেমিতীয় ভাষাসমূহের একখানি সাধারণ ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। ডাক্তার বেশের Arabische Studieu নামক প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে ফ্রাইতাগের Proverbia arabumএর তৃতীয়াংশের একটা সমালোচনা করিয়াছেন, এবং ইহার ভ্রমাদি-সংশোধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। পরের প্রবন্ধে ডাক্তার ফিশের অল-হবালিদের এক অংশের কয়েকটি পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তার সুবাইজ্ কোরানের ২য় সূরের ১৯১ পংক্তির একটা অনুশীলন

করিয়াছেন, এবং ভাব্রিজির এই পংক্তির উপর টীকার কতটা গ্রহণ সম্ভবপর, তাহা এই প্রবন্ধে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ডাক্তার গোল্ডসিহের কালিফ প্রথম জেজিদের মৃত্যু ও স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পরের প্রবন্ধে ডাক্তার দিনেস্ আণ্ডের্সেন পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত ধাতু ও শব্দসমূহের আকারগত ও অর্থগত বৈষম্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপুরাপ্রিয়।

প্রাচী-ভ্রমণ।

১

যাবা, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশে ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা আমার আকস্মিক চিন্তার ফল নহে। "মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার সময়" লিখিবার সময় আমি প্রাচ্য দ্বীপসমূহে ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ—যে দিন আমাদের দেশে লোকসংখ্যা-গণনার জন্য সর্ব্বত্র ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতেছিল,—সেই দিন আমি সিংহল হইয়া যাবা প্রভৃতি দর্শন করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হই। সন্ধ্যার সময় মান্দ্রাজ মেলে হাবড়া হইতে যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়া কতিপয় ঘণ্টা তথায় অবস্থান করিয়া আবার বোট-মেলে তুতীকরীণের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সে সময় দক্ষিণ-ভারতে বঙ্গবাসীর উপর পুলিসের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ ছিল, সুতরাং আমরাও তাহা হইতে বঞ্চিত হই নাই। প্লেগ-দুষ্ট স্থান হইতে সমাগত যাত্রীদিগের উপর স্বাস্থ্যবিভাগের দৃষ্টিও বড় কম ছিল না। এ দৃষ্টির প্রতীকারের উপায় ছিল, তাই রক্ষা পাইলাম। প্রথম উপায় ৫০৲ টাকা জমা রাখা; দ্বিতীয়, তুতীকরীণ হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয়। ডেকের যাত্রী কুলী শ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদের অসুবিধাও অনেক।

প্রথম চেষ্টা।

অপরাহ্নে ছোট ষ্টীমারে তুতীকরীণ পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থিত বড় জাহাজে আরোহণ করিয়া সিংহলের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। প্রভাতে আমাদের জাহাজ কলম্বো বন্দরে উপস্থিত হইল। ডাক্তার নাড়ী টিপিলেন; পুলিস নাম ধাম লিখিলেন, আর পুলিসের অনুচরবর্গ আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এখানে আর একটি কথা না বলিলে এই

প্রাথমিক কথাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমি আর এক জন বাঙ্গালীর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পঞ্জাবে সুপরিচিত। ৬০ বৎসরের উপর বয়স হইলেও, তিনি ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় অধ্যবসায়ী। বালি প্রভৃতি দ্বীপে সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধান তাঁহার উদ্দেশ্য। এরূপ ব্যক্তি যে আমাদের দেশের গৌরব, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের উদ্দেশ্য একরূপ বলিয়া আমরা উভয়ে এক সঙ্গে কলিকাতা হইতে বহির্গত হই।

আমার বরিষ্ঠ বন্ধুর এক জন ইয়ুরোপীয় থিয়সফিষ্ট বান্ধবী আমাদের জন্য বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কলম্বোর ইংরেজ-টোলাতে সমুদ্রের ধারে এক ইংরেজমহিলার আবাসে আমাদের জন্য দুইটি ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা সেখানে গিয়া দেখিলাম, এ স্থান আমাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তখনই আমি সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া দেশী পাড়ায় একটি মন্দিরে আশ্রয়স্থান নির্ব্বাচন করিলাম। মেমের বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের ফলস্বরূপ এক মাসের সমস্ত ভাড়া চুকাইয়া দিয়া মন্দিরে আগমন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। নানা কষ্টে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং স্থির হইল, তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, আর আমি একাকী গন্তব্য স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিব। টমাস কোম্পানীর নিকট টিকিটের জন্য টাকা দিলাম। জাহাজে খাইবার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইল। সমস্তই স্থির। এমন সময়ে শুনিলাম, পুলিস আমাদিগকে "সন্দেহভাজন ও বিভীষিকাপ্রদ" ব্যক্তির পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নজরটাও একটু অধিক পরিমাণে আমাদের উপর পতিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্থির হইল, আমার একাকী যাওয়া ঠিক নহে! অগত্যা আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এইরূপে আমার ভবিষ্যৎ সফলতার কারণস্বরূপ প্রথম চেষ্টা বিফল হইল।

পুনরায় গমনের উদ্যোগ।

এবার স্থির করিলাম, কলিকাতা হইতেই গমন করিব। বিদেশ হইতে জাহাজে চড়িলে, অপরিচিতকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে, সন্দেহের ভাজন হইতে হয়, ইহা স্বাভাবিক। এই সময়ে ঘটনাচক্রে কলিকাতার গুপ্তচর বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত টেগার্টের সহিত পরিচিত হই। তিনি বড় সজ্জন। আমার ভ্রমণ-প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইয়া রাখি। যখন আমি এইরূপে প্রস্তুত

হইতেছিলাম, সেই সময় শ্রীমতী Martine Tonnet নাম্নী এক ডচ্ বিদুষীর সহিত ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে আমার পরিচয় হয়। তিনি বহুদিন যাভায় ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হই।

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ Mr. A. J. Chapman. মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে যাভা প্রভৃতি স্থানে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। তিনি আমার অনুসন্ধান-কার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য ভারত গভর্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর অনুরোধপত্র আনাইয়া দেন, এবং স্বয়ং পরিচয়পত্র প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

যাভা ডচ্দিগের অধিকৃত। ডচ্ অধিকারে গমন করিতে হইলে বিদেশীর পক্ষে প্রবেশপত্র আবশ্যক। কলিকাতায় নেদার্ল্যাণ্ডের এক জন কনসল-জেনারল অবস্থান করেন। তিন টাকা দুই আনা দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একখানি প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করিলাম। ইহা সঙ্গে থাকিলে যাভাতে কোনও অসুবিধা হয় না। যদিও ইহা যাভায় ইংরাজ কন্সলের সাহায্যে সংগৃহীত হইতে পারে, তথাপি আমাদের পক্ষে ইহা কলিকাতায় সংগ্রহ করাই উচিত।

এখন টাকা-কড়ির কথা। যে সকল ধনী ব্যাঙ্কের বরাত-পত্র লইয়া যান, তাঁহাদের বিষয় স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে অন্য ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, আমাদের ভারতের টাকার ভারত ও ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যত্র প্রচলন নাই। কিন্তু আমাদের সম্রাটের স্বর্ণ-মুদ্রা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রচলিত। আমার সঞ্চিত ও সংগৃহীত নোট ও টাকা গিনিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলাম। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত করিতেছি, কাশিমবাজারের মহারাজ ও নাড়াজোলের রাজা যথাক্রমে এক শত ও পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে এক জন বিদেশীর উদ্যোগ-পর্ব্বের একটা কথা কহিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্বেন হিডেন হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার অভিপ্রায় লণ্ডনের বন্ধুগণের মধ্যে ব্যক্ত করিলে, এক সপ্তাহের মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল! ইহা ব্যতীত বড় বড় ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের দেশবাসীদের বিপদসঙ্কুল দূর প্রদেশে ভ্রমণ করিবার ক্ষমতা নাই, এ অপবাদ আমরা কখনও স্বীকার করিব না। সার্ভে-বিভাগের ভারতবাসীরা যে প্রকার অদ্ভুত নিপুণতা,

রেমব্রাণ্ট ও তাহার পত্নী

K. V. Seyne & Bros.

ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও বিপদকালে ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। আমাদের ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসিগণ যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এখন সুদিন আসিতেছে। যাঁহারা কায করিবার জন্য ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ধনবানেরাও কতকটা মুক্তহস্ত হইতেছেন।

আমার সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ আবশ্যক। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমার গুরুদেব পরমপূজ্যাস্পদ শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের আদেশক্রমে আমি মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধস্তূপ প্রভৃতি পরিদর্শন করিবার জন্য কাশী হইতে যাত্রা করি। অদৃষ্টক্রমে কোনও অপ্রতিবিধেয় কারণে বোম্বাই নগর হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হই। সে সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধবাদী হইয়াও তিনি আমাকে কেন অনুমতি দিলেন? উত্তরে স্বামীজী বলেন,—"বর্ত্তমান সমাজ নানাপ্রকার রোগে জীর্ণ, ইহার উপর আবার বিদেশী রোগের সংক্রমণ হইলে, ইহার অস্তিত্ব-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে। যিনি দেশের ও দশের হিতার্থ সমুদ্রযাত্রা করিবেন, তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার আমি পক্ষপাতী।" স্বামীজীর আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া দশের হিতাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রাখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই।

কলিকাতা হইতে যে জাহাজে আমি সিঙ্গাপুরে গমন করিয়াছিলাম, তাহার নাম "বজ্রশিখা" বা "লাইট্নিং"। আপ্কার কোম্পানীর একখানি ছোট জাহাজ। ছোট জাহাজে না গিয়া অন্য কোনও বড় জাহাজে গমন করিবার জন্য অনেক বন্ধু অনুরোধ করেন!

যাত্রা।

তাঁহাকে আমি বলি, প্রসিদ্ধ নাবিক ড্রেক যে কয়খানি নৌকা লইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, তাহার তুলনায় আমার তিন হাজার টনের "বজ্রশিখা" খুব প্রকাণ্ড জাহাজ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

২রা ডিসেম্বর আমি সিঙ্গাপুরে যাত্রা করি। গমনকালে আমাদের চঞ্চলা গরুর বিদায়-অভিনয় বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা সকলে যখন দরজায় গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময়ে সে দরজার সম্মুখে উঠানে শুইয়াছিল। আমার গমন-দৃশ্যটা দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, একটা একটা কিছু নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে, আর আমি সেই অভিনয়ের নেতা। তার ভাব ভঙ্গীতে বুঝিলাম, সে তাহা অনুভব

করিয়াছে। চঞ্চলা দাঁড়াইয়া ভাবপূর্ণনয়নে আমার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শ্রীযুত ঘনশ্যাম বাবু আমার এক জন উন্নতহৃদয় মাড়বারী বন্ধু। তিনি আমার জন্য প্রচুরপরিমাণ লাড্ডু, নিমকী, ফল, মূল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি একটা ষ্টোভ ও এক টিন কেরোসিন তৈল আমাকে প্রদান করিলেন। এই সকল দ্রব্য সহ এক জন ভদ্রলোক ইডেনগার্ডেনের সম্মুখে জাহাজের কাছে আসিলেন। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে ডাক্তার দেহ পরীক্ষা করেন। ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, সকল যাত্রীই আসিয়াছে; এক জন শাস্ত্রীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, সেই শাস্ত্রী আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। ডাক্তার হাত দেখিয়া নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। অপর এক জন ইংরেজ আমার অভীষ্ট সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করিলেন। সংক্ষেপে আমার উদ্দেশ্য জানাইয়া জাহাজে উঠিলাম।

আমার থাকিবার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারীকে টিকিট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এ আমার বিভাগ নয়, রাণী সাহেবের কাছে যান।" "রাণী সাহেব" কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আরও কয়েক জন ইংরেজকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করি। সকলেরই মুখে ঐ কথা। অবশেষে এক জনকে অনুবাদ করিয়া বলিলাম, "আমাকে কি 'কুইন' সাহেবের নিকট যাইতে বলিতেছেন?" আমার কথা শুনিয়া গোরা-মণ্ডলে হাস্যের তরঙ্গ উঠিল!

প্রশ্ন এই,—রাণী সাহেব কে?

সহৃদয় মাড়বারী বন্ধুর প্রেরিত লোকটি আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। দিবা ১১টার সময় আমি জাহাজে উপস্থিত হই। প্রায় ১টার সময় ইডেন গার্ডেনের সম্মুখ পরিত্যাগ করিয়া মেটেবুরুজে গমন করি। এখানে প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মাল বোঝাই করিয়া ৩রা রবিবার প্রাতঃকালে আমাদের জাহাজ সুদূর প্রাচীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

জয়-পরাজয়।

তাহার সহিত যখন প্রথম পরিচয় হইল, তখন আমার জ্যোতির্ম্ময়ী কবি-প্রতিভার হিরণ্ময়ী দ্যুতি চক্রবালরেখা ছড়াইয়া অধিক দূর প্রস্থত হয় নাই। বন্ধুমণ্ডলী ও পরিচিত অন্তরঙ্গগণের মুখে সবে আমার স্তুতিবন্দনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল; কমলকুঞ্জবাসিনী বাণীর চরণপদ্মে বহু মুকুলিত, অর্দ্ধবিকশিত পুষ্প নিবেদন করিয়া ধ্যানে বসিয়াছিলাম; দেবীর আশীর্ব্বাদপূত শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার শুভযোগ তখনও আসে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে আমি যে পবিত্র হইতেছিলাম, সে কথা অস্বীকার করিব না।

ভবতারণ আমার অপেক্ষা সাত আট বৎসরের ছোট। তাহার সুকুমার আননে তখনই একটা স্নিগ্ধ জ্যোতির বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অপর কয়েকটি ভক্তের ন্যায় সেও আমার কবি-প্রতিভার একান্ত অনুরক্ত ছিল। অন্যের ন্যায়, একান্ত নিষ্ঠাভরে সেও ভবিষ্যদ্বাণী করিত, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালার সারস্বতকুঞ্জে অমর কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির রত্নবেদীর সন্নিধানে আমারও আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে। আমার হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির যে বিরাট শক্তি প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় নিয়তই জ্বালা বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল, সে কল্পনানেত্রে তাহার দিব্যদ্যুতি যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এ জন্য তাহাকে অধিক স্নেহ করিতাম।

প্রতিদিন অপরাহ্নে সে আমাদের বাড়ী আসিত। তাহার সৌজন্য, বিনয় ও সচ্চরিত্রতায় বাড়ীর সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতেন। দাদা ত তাহার বিলক্ষণ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র বলিয়াই নহে—তাহার বিনয়নম্র ব্যবহারে ও সাহিত্যের প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগ দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অন্তঃপুরেও ভবতারণের অবারিতদ্বার ছিল। সদর অন্দর সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীর সকলেরই উদার মত ছিল। ভবতারণের পিতার সহিত আমার পিতৃদেবের সৌহৃদ্য-বশতঃ উভয় পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুর পর উভয় পরিবারের মধ্যে কিছু কাল তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ভবতারণ আসিয়া পুনরায় উভয় পরিবারের সৌহৃদ্যবন্ধন দৃঢ় করিয়া দি[illegible] সে আমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

আমাদের পরিবারস্থ সকলেই অল্পবিস্তর কলাবিদ্যার অনুরাগী। দাদার একখানি মাসিক পত্রিকা ছিল। আমাদের পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ, অনেকেরই রচনায় পত্রিকার কলেবর পুষ্ট হইত। দাদার অনুরোধে আমিও মাঝে মাঝে কবিতা, গান, গল্প, অথবা প্রবন্ধ লিখিয়া মাসিক পত্রিকার গৌরববৃদ্ধি ও দাদাকে চরিতার্থ করিতাম। বঙ্গের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট মাসিকের আমি নিয়মিত লেখক ছিলাম। আমার রচনার কলধ্বনি শুনিবার আশায় অনেকেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। যদি বলি, সে জন্য আমি আত্মগরিমা অনুভব করি নাই, তাহা হইলে নিতান্তই মিথ্যা কথায় প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কোনও কোনও কবিতার জন্য দুই চারি জন সমালোচকের নিকট হইতে তীব্র তাড়না পাইয়াছি সত্য, কিন্তু তুলনায় করতালির সংখ্যাই অধিক।

ভবতারণ সাহিত্যচর্চ্চার অত্যন্ত অনুরাগী ছিল সত্য, কিন্তু সে কবিতা রচনা করিত কি না, জানিতাম না। তবে সন্দেহ হইত, সে গোপনে রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাণীর আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে কোনও সাময়িক পত্রে তাহার রচনা মুদ্রিত হইতে দেখি নাই। আমি তাহাকে উৎসাহ দিতাম; কবিতা-রচনার রীতি সম্বন্ধে সে আমার উপদেশ আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইত। ভবতারণ ছেলেটি বেশ।

২

চারি মাস প্রবাস-যাপনের পর জ্যৈষ্ঠের শেষে দেরাদুন হইতে গৃহে ফিরিলাম। দীর্ঘকাল বাড়ীছাড়া, সুতরাং মনে হইল, এই কয় মাসে বাড়ীর যেন বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যে কি, তাহা সে সময় বুঝিতে পারি নাই।

বৈশাখের পত্রিকায় প্রথমেই আমার রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা বাহির হইয়াছিল। অনেক যত্নের সহিত কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। বন্ধুবর্গ কবিতাটির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সেই সংখ্যায় ভবতারণেরও একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্গের জনৈক প্রথিতনামা সম্পাদক আর একখানি সাময়িক পত্রে আমার ও ভবতারণের কবিতা দুইটির তুলনা করিয়াছেন। ভবতারণের কবিতাটিকেই তিনি প্রশংসার মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া লিখিয়াছেন,—কালে সে কবি-প্রতিভায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে। কোনও নবীন কবির প্রতি এতটা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে এই সমালোচক মহাশয়কে কখনও দেখি

নাই। ভবতারণের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু ভবতারণ আমাকে কবিতাটি সংশোধন করিতে দেয় নাই কেন? সে যে অকস্মাৎ এমন কবি হইয়া পড়িবে, সে সম্ভাবনা কোনও দিন ছিল না!

দাদাও দেখিলাম ভবতারণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ! বন্ধুবর্গের কেহ কেহ বলিলেন, "শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী!" আমি মৃদু হাসিয়া তাঁহাদের সকলেরই মন্তব্য শ্রবণ করিলাম। আজ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে একটা নূতন ভাবের আন্দোলন যেন অনুভূত হইতেছে। সে কি হর্ষ, আনন্দ, তৃপ্তি? অথবা অন্য কিছু?

সন্ধ্যার পর বাড়ীর সকলে একত্র বসিয়া নানারূপ গল্প করিতাম। এ প্রথাটা আমাদের পরিবারে বহুদিন হইতে প্রচলিত। আজিও যথাসময়ে আমাদের সান্ধ্য-বৈঠক বসিল। দাদা বলিলেন, "যোগেন, ভবতারণের কবিতাটি দেখিয়াছ? বড় চমৎকার লিখিয়াছে। আমি উহার খাতায় অনেকগুলি কবিতা দেখিয়াছি; অধিকাংশই উৎকৃষ্ট। এবার জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় উহার যে কবিতাটি বাহির হইতেছে—তাহার মত কবিতা আমি বহুদিন পড়ি নাই। উৎসাহ পাইলে এবং যত্ন থাকিলে, আমার বিশ্বাস, ভবতারণ ভবিষ্যতে কাব্যজগতে অতি উচ্চ আসন লাভ করিবে।"

আমি মৃদুহাস্যে দাদার কথার উত্তরে মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিলাম। শিষ্যের গৌরবে গুরুর হৃদয়ে কোন ভাবের উদয় হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না; বোধ হয়, সেদিনকার অতিরিক্ত গ্রীষ্মাতিশয্যই তাহার প্রধান কারণ।

দাদার কন্যা, আমাদের বংশের দুলালী, (আমারও কোন সন্তানাদি হয় নাই, দাদারও অন্য সন্তান ছিল না) আমার পরম স্নেহের পাত্রী ঊষারাণী মন্থরপদে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "কাকা বাবু, দেরাদুন থেকে আমার জন্য একটা হরিণের বাচ্ছা আনবেন বলেছিলেন, আন্‌লেন না?"

"সমস্ত দিনের মধ্যে, পাগ্‌লী, তুই পাঁচবার এই এক কথাই বল্‌ছিস। হরিণের বাচ্চা আনবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু এ সময় পাওয়া যায় না। আমার এক বন্ধুকে বলিয়া আসিয়াছি, তিনি পাঠিয়ে দেবেন। তোর হাতে ওখানা কি বই?"

ঊষার মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল; নতদৃষ্টিতে মৃদুস্বরে সে বলিল, "বৈশাখের আলো"। দাদার পত্রিকার নাম "আলো"। বইখানা

লইয়া দেখিলাম, উষা একটা কবিতা পাঠ করিতেছিল। আর সে কবিতাটি ভবতারণের। কিন্তু বালিকার মুখমণ্ডল সে জন্য আরক্ত হইল কেন? জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ভবতারণ আজ এখনও আসে নাই।

৩

দাদা গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন, "তোমার কি মত? পাত্রটি সর্ব্বাংশে যোগ্য। উষার বয়সও ষোল হইতে চলিল। এখন আর সে নাবালিকা নয়। বিশেষতঃ, তোমার বৌদিদি লক্ষ্য করিয়াছেন, উষা ভবতারণের অনুরাগিনী। ভবতারণের পক্ষ হইতেও আমার কাছে প্রস্তাব আসিয়াছে। এই বিবাহে তাহার একান্ত আগ্রহ। পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী। কিন্তু তোমার মতামতের উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তুমি কি বল?"

টেনিসনের কাব্যগ্রন্থখানি টেবিলের উপর রাখিয়া স্থিরদৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিলাম। তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলাম; বলিলাম, "আমার মত নাই।"

দাদা চঞ্চলভাবে আমার দিকে চাহিলেন; তাঁহার দৃষ্টিতে উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন, "কেন? ভবতারণ সর্ব্বাংশেই উষার যোগ্য পাত্র নয় কি? তাহার সহপাঠী সুশীল আমাকে বলিয়াছে, এ বিবাহ না হইলে ভবতারণের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। উষা তাহার কবিতার 'ডালিয়া'। ভবতারণের সহিত বিবাহ হইলে সে আমার পত্রিকাখানির জন্যও অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারিবে। তোমার অমত কেন?"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ব্যবহারে বিশেষ কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাতায়নের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "নিম্ন বর্ণের যাজক পুরোহিত-বংশে কন্যাসম্প্রদান করিলে আমাদের বংশমর্য্যাদার হানি হইবে। কেন, আর কি যোগ্য পাত্র নাই?"

দাদা আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পানে চাহিয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমিও ভাবিতেছিলাম। কিন্তু কি ভাবিতেছিলাম? মেঘাচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন আকাশের মত আমার মনও ভারাক্রান্ত ও অবসাদপূর্ণ বোধ হইতেছিল।

নবীন কবির যশোরাশি উষার স্নিগ্ধ দীপ্তির ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্ভাসিত করিতেছিল। ভবতারণ ধীরে ধীরে গুরুর প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া মৌলিক কাব্য-সৌন্দর্য্যে বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত

করিতেছিল। আমাদের একমাত্র বংশলতিকা উষারাণী তাহার অনুরাগিনী! দাদার অর্থবল, আমাদের বংশপ্রভাব, সুন্দরীর প্রেম, নিজের যত্ন, চেষ্টা ও প্রতিভা, ইহার সমবায়ে ভবতারণ কোন্ লোকে উন্নীত হইবে? কোথায় তাহার স্থান?

ঘনমসীলিপ্ত দূরদিগন্তের ক্রোড় হইতে ঝটিকার উন্মত্ত তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছিল। নারিকেল ও দেবদারুর উন্নত শীর্ষ নোয়াইয়া ঝটিকা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, "দাদা, এ বিবাহ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার আদৌ সম্মতি নাই। বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই।"

আমার সুপ্ত আভিজাত্যগর্ব্ব সহসা জাগিয়া উঠিল। আমি তাহার প্রবল আন্দোলন হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম। আজন্ম সাম্য নীতির উপাসক ছিলাম। কবিতায়, গানে ও গল্পে এই নীতির বীজ অসঙ্কোচে বিলাইয়াছি। জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ, এত দিন এ সকল কিছুই গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ বংশমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য একটা আকুলতা অনুভব করিলাম। কবির সহজ উদারতা সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করা যায় না, এ সত্যটা এতদিন আত্মপ্রকাশ করে নাই। ঠেকিয়া না শিখিলে যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, আজ এই শাস্ত্র-বাক্যটির অমূল্য সত্য উপলব্ধি করিলাম।

৪

ভবতারণ আমাদের বাড়ী আসা একেবারে বন্ধ করিয়াছে। উষার সহিত তাহার বিবাহ হইবে না, হইতে পারে না, অন্য লোকের দ্বারা সে সংবাদ তাহার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। কোনও কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারা সে দাদাকে আরও কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিল, আমার কাছেও বলিয়া পাঠাইয়াছিল। আমি সমস্ত দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া তাহাকে কবির ভাষায় জানাইয়াছিলাম, অনত্র উষার বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উপায় নাই। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ অলঙ্ঘনীয়। তার পর আর তাহার দেখা পাই নাই। মাসিকপত্রের কলেবরে তাহার উচ্ছ্বাসমূলক কবিতার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু মাসের পর মাস চলিয়া গেল, নবীন কবির কাব্যকলার স্ফুরণ ও বিকাশ আর দেখিতে পাইলাম না। দারুণ নিদাঘে মরু-ঝটিকার নিঃশ্বাসস্পর্শে পাত্রস্থ সলিল যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হয়, তাহার কবিত্বের উৎস কি অকস্মাৎ তেমনই শুকাইয়া গেল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। আমার কবি-প্রতিভা নানা দিকে নানা ভাবে অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছিল। হৃদয় তখন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছামত কল্পনালোকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সৌন্দর্য্যের ধ্যানে রাত্রি ও দিবা কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, বুঝিতে পারিতাম না। যাহা লিখিতাম, তাহাই ছাপিতাম। স্তাবকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে আমার সমকক্ষ প্রতিভাশালী কবি বিদ্যমান নাই বলিয়া আমার স্তাবকগণ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সে কি সুখ, কি আনন্দ!

ইতিমধ্যে উষার বিবাহ দিয়াছি। ভবতারণের ন্যায় সুশ্রী, প্রতিভাশালী ও সঙ্গতিপন্ন না হইলেও ছেলেটি বেশ। বিলাত হইতে আসিয়া সে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছিল।

ভবতারণের সংবাদ বহুদিন পাই নাই। মধ্যে একবার শুনিয়াছিলাম, তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তখন আমি ওয়ালটেয়ারে, সুতরাং ভবতারণের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারি নাই। আমার নূতন কাব্য-গ্রন্থখানির শেষ প্রুফে ছাপিবার আদেশ দিয়া এক দিন ভবতারণের বাড়ীর দিকে বেড়াইতে গেলাম। দূর হইতে দেখিলাম, বাড়ীর দরজা জানালা সমস্তই রুদ্ধ। দ্বারবানের কাছে শুনিলাম, ভবতারণ বহুদিন হইল পশ্চিমে কোথায় গিয়াছে, কেহ তাহার সংবাদ জানে না। এ যাবৎ সে বিবাহ করে নাই। বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিবার মত আত্মীয় বন্ধুও ইদানীং তাহার কেহ ছিল না। অনুগত শিষ্যের অভাব অকস্মাৎ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলাম। অন্তরতম প্রদেশে কোথায় যেন একটা ব্যথা অনুভূত হইল। কবি আমি, আমার হৃদয় নাই, এমন কথা কে মানিয়া লইবে?

আমার সাহিত্য-প্রতিভা মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় চারি দিক উদ্ভাসিত করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রশংসার কলগুঞ্জনে চারি দিক ধ্বনিত, 'পুলকিত' হইতেছিল। হৃদয়ের কাম্যফল লাভ করিয়াছি। একনিষ্ঠ সাধনা, আরাধনা ও পূজার ফলে ভারতীর নির্ম্মাল্য আমার শিরোদেশে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছিল। এখন সেই উল্লাসে আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করিতেছি। দাদার প্রতিষ্ঠিত মাসিক-পত্রের সম্পাদন-ভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকেই বহন করিতে হইতেছে। বিধিলিপি!

৫

এ পর্য্যন্ত শোক বা দুঃখের সহিত কোনও পরিচয় হয় নাই। অভাবই দুঃখ। কোনও অভাব এতদিন বোধ করি নাই। যাহা পাইলে আমার তৃপ্তি, যাহাদের লইয়া আমার সুখ, এতদিন তাহা পাইয়াছি; তাহাদিগকে অযাচিতভাবে লাভ করিয়াছি; সুতরাং বিবাহিত জীবনের আট বৎসর পরে শোকপরিম্লানা, নিদাঘতাপদগ্ধা লতার ন্যায় ম্রিয়মাণা, পতিবিয়োগ-বিধুরা ঊষা যেদিন আমার সম্মুখে বিসর্জ্জনের প্রতিমার মত আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিন মর্ম্মের প্রত্যেক তন্ত্রী যেন বেদনায় বাজিয়া উঠিল, যন্ত্রণায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিল! স্নেহের পুত্তলী মার আমার আর সে উজ্জ্বল কান্তি, সে স্নিগ্ধ হাসি নাই! কোন্ নিষ্ঠুর তোর সমস্ত সুষমা হরণ করিল? হায়! সে কি নির্দ্দয়, কি পাষণ্ড! এমন তীব্র ব্যথা, এমন সহনাতীত যন্ত্রণা কখনও পাই নাই।

ঊষাকে দেখিলেই চোখে জল আসিত। জীবনের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে তাহার সব সুখ, সব সাধ, সব আশা মিটিয়া গেল? ভবতারণ! আজ তাহার কথা মনে হইতেছে কেন?—এ দুর্দ্দিনে আর অতীতের স্মৃতি মনে করিয়া লাভ কি?

কবিতা আর আসিতেছে না! সাগর শুকাইয়া গিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে শান্ত করিব কিরূপে?

পত্নীর উপদেশে দেশ-ভ্রমণের আয়োজন করিলাম। তিনিও সঙ্গে থাকিবেন। দাদা বলিলেন, "ঊষাকে সঙ্গে লইয়া যাও। অভাগী যদি নানা স্থান দেখিয়া হৃদয়ে একটু শান্তি পায়।"

দাদার শোকগম্ভীর মুখচ্ছবি দেখিয়া আমার হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অশ্রুধারা বাধা মানিতে চাহিতেছিল না।

অভাগী জীবনে আর কি শান্তি পাইবে? তাহার ম্লান মুখখানি দেখিলে সংসারের কোনও সুখে মন বসিতে চায় না। এখন মনে পড়িতেছে, বিবাহের পর হইতে মার আমার হাসি মুখ দেখি নাই। তাহার মুখে মধুর তৃপ্তির উজ্জ্বল রেখা কে মুছিয়া লইয়াছিল? কিন্তু অনুশোচনায় অতীত ত আর ফিরিয়া আসিবে না।

৬

শীতের মাঝামাঝি পুরীধামে যাত্রা করিলাম। সাগরমেখলা পুরীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যদর্শনে মনটা কিছু শান্ত হইতে পারে। হে বিরাট, হে বিচিত্র! হে

অনন্ত-সৌন্দর্য্য রত্নাকর! আজ তোমার বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে! তোমার তরঙ্গাবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি! তোমার চিরগম্ভীর গর্জ্জন, অশ্রান্ত জলোচ্ছ্বাস, ফেনিল উর্ম্মিমালা, আলোকোজ্জ্বল অম্বুরাশির বিচিত্র বর্ণবিন্যাস দেখিতে দেখিতে শোকার্ত্তের হৃদয় প্রিয়জনবিরহের বেদনা, জ্বালা বিস্মৃত হইয়া যায়! হে যাদুকর, তোমার বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে যেন সান্ত্বনা লাভ করিতেছি।

কিন্তু মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গেন! জীবনের রঙ্গমঞ্চে নূতন শোকদৃশ্যের পটপরিবর্ত্তন ঘটিল। তিন দিনের পীড়ায় আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমার কবিতার প্রস্রবণ, স্নেহ প্রেম ভালবাসার নির্ঝরিণী অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল। আমার সর্ব্বস্ব দরিয়ায় ডুবিয়া গেল! সে বেদনা বজ্রাঘাতের ন্যায় অতর্কিত, তীব্র ও ভীষণ!

কেন গেল?—হে আমার সকল সুখ দুঃখের সর্ব্বস্ব, আমার হৃদয় চূর্ণ করিয়া তুমি কোথায় গেলে? অশ্রুধারায় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বুকে শুধু এক মহাশূন্য হা-হা করিতেছে! পৃথিবীতে কি আলো নাই? এত হাসি, এত বাঁশী, এত আনন্দ-কলরোল—কোথায় সে সব? কিছুই নাই, কিছুই নাই! শুধু বিরাট, অন্তহীন শূন্যে বৈচিত্র্যহীন ক্রন্দনের ভীষণ গর্জ্জন অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে!

কোথা দিয়া কেমন করিয়া শ্মশানে আসিয়াছি, মনে নাই। সমুদ্রগর্ভ হইতে আজ যেন মহাশোকের প্রলয়-ঝটিকা উঠিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে! তরঙ্গ-কল্লোলে শোকের বিষাণ বাজিতেছে!

লক্ষ রসনা মেলিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। থাম থাম; আর একবার শেষ দেখা দেখিয়া লই। মুখখানি এখনও যেন হাসিতেছে, স্মিতরেখা অন্তিম জ্যোৎস্না-লেখার ন্যায় এখনও যেন ওষ্ঠপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। আমাকেই মুখাগ্নি করিতে হইবে? রাশি রাশি শোকের কবিতা লিখিয়াছি; কত হৃদয়ভেদী দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু আজিকার এই মর্ম্মভেদী চিত্রের তুলনা কোথায়?

জীবনের শেষ সুখস্মৃতি ভস্ম করিয়া, বহ্নিদেব, তুমিও চলিলে? যাও, আজ তুমি পবিত্র হইয়াছ। দেবী! স্বর্গের দ্বারে এ অধমের জন্য প্রতীক্ষা করিও। যদি পার, পাপক্লিষ্ট এ অধম আত্মাকে তোমার পুণ্যস্পর্শে পবিত্র করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিও।

আর যে কিছু দেখিতে পাইতেছি না! নয়নে বন্যা আসিয়াছে। কর্ণ, তুমিও বধির হইয়াছ?

চারি দিকে লোকে দেখিতেছে, বাঙ্গালার প্রতিভাশালী কবি, পত্নী-বিয়োগে আজ বালকের ন্যায় রোদন করিতেছে! শোক পাত্রাপাত্র বিচার করে না!

* * * * *

শান্তি নাই, সান্ত্বনা নাই। এ তীব্র শোক ভুলিতে পারিতেছি না। বুকের হাড়গুলা সহস্রখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাহার কাছে সান্ত্বনা পাইব? অমৃতের সন্ধান কে বলিয়া দিবে?

সমুদ্রের কূলে কূলে ছুটিতেছি; তরঙ্গ পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে; মনে হইতেছে, কে যেন ডাকিতেছে! সাড়া দিতে পারি কই?

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। কবীর-আশ্রমের সম্মুখে এত জনতা কেন? গৈরিকবেশধারী সৌম্যমূর্ত্তি শালপ্রাংশু উনি কে? কেহ চরণবন্দনা করিতেছে, কেহ তাঁহার উদ্যত হস্তের আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হইয়া আনন্দপূর্ণ-নেত্রে আপনার পানে চাহিতেছে! আতুর, পীড়িত, দরিদ্র, ধনী,—সকলেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে অসঙ্কোচে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেছে। কি বলিলে—কি বলিলে?—শোকার্ত্তের পিতা, দরিদ্রের বন্ধু ও নিরন্নের অন্নদাতা? সিদ্ধ-পুরুষ? সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী?

আমার এ মহাশোকে তিনি সান্ত্বনা দিতে পারেন? মানুষের কাছে সে সান্ত্বনা পাওয়া যায় বলিয়া আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল না।

চতুর্দ্দশীর চন্দ্র আকাশে দুলিতেছে। একে একে সকলে কখন চলিয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। আমার চারি দিকে বিরাট নীরবতা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর করস্পর্শে দেহে তড়িৎ বহিয়া গেল! তাঁহার ইঙ্গিতে আশ্রম-মধ্যস্থ দীপালোকিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম! প্রেমযোগী, মহাপুরুষ কবীরের পবিত্র সমাধিতীর্থে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসিবর আমার পানে স্নেহদৃষ্টিতে চাহিতেছেন। গৃহ নির্জ্জন; কোনও ভক্তের নিবেদিত পুঞ্জীভূত পুষ্পের সৌরভে কক্ষমধ্যস্থ পবন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

সৌম্যদর্শন, সদানন্দ সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া হৃদয়ের সমুদয় দৈন্য, শোক, জ্বালাযন্ত্রণা প্রকাশ করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল।

প্রভু, এত লোকের দুঃখ সন্তাপ হরণ করিতেছ, শোকার্ত্তের অশ্রুজল মুছাইতেছ, আমার এই মহাশোকের ঔষধ দিবে কি? মানুষ মানুষের শোক হরণ করিতে পারে, এ বিশ্বাস আমার কোনও কালে ছিল না। আজ দারুণ শোকে আত্মহারা হইয়াছি, তোমার অযাচিত করুণায় ধনী দরিদ্র সকলেই শোকে সান্ত্বনা ও আশা লাভ করিয়াছে। তাই আজ তোমার চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমার প্রণাম গ্রহণ কর!

ধীরে ধীরে আমার মস্তক পুণ্যদর্শন মহাত্মার চরণতলে অবনত হইল। ক্ষিপ্রহস্তে আমাকে উঠাইয়া স্নেহস্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন, "এত কাতর হইতেছ কেন? শোক পায় নাই, নৈরাশ্যে ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় নাই, এমন একটি প্রাণীও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বোধ হয় নাই। অনন্ত প্রেমময় করুণাময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলে শোক তাপ চলিয়া যায়। শোকে সান্ত্বনা-লাভ ভগবানের অনুগ্রহ। এ দয়া সর্ব্বজীবে সমভাবে তিনি বিতরণ করিতেছেন।"

বহুবার এমন কথা শুনিয়াছি; কত প্রসঙ্গে, গল্পে ও কবিতায় লিখিয়াছি। কিন্তু এমন দৃঢ়ভাবে, নিষ্ঠাভরে পূর্ব্বে কাহারও মুখে এমন কথা উচ্চারিত হইতে শুনি নাই। সে স্বরে আশা যেন উছলিয়া উঠিতেছিল! কণ্ঠস্বর মধুর, স্নিগ্ধ। শোকের ঝড় বুকের মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপের পর যেন ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইল।

"বাবু, বাবু।"

ফিরিয়া চাহিলাম। দ্বারপ্রান্তে বৃদ্ধা রামের মা, ঊষা ও পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণদাস দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মৃদুকণ্ঠে বিষাদিনী বিধবা বলিল, "কাকা বাবু, ঘরে চলুন। দিনরাত এমন করে' বেড়ালে শরীর থাকবে কেন? আমরা আপনাকে কত খুঁজিয়াছি। চলুন।"

"আর ঘুরিব না। সান্ত্বনা পাইয়াছি। এই মহাপুরুষ আজ আমায় পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এস মা, ইঁহাকে প্রণাম কর।"

উজ্জ্বল দীপালোক সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখে কাঁপিতেছিল। সহিষ্ণুতার প্রতিমা মা আমার সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল, তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি কম্পিত হইতে লাগিল। বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে

পুনরায় সন্ন্যাসীর পানে চাহিলাম। এ কে! কে তুমি? এ যে বহুদিনের পরিচিত মুখ! বয়োধর্ম্মে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত, কিন্তু সংযম, সাধনায় ও পবিত্রতায় প্রসন্ন সে মুখে আমার যৌবনের কাব্য-জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভবতারণকে চিনিতে পারিলাম। তুমি কি সেই? বল বল, একবার বল!

মৃদুহাস্যে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সন্ন্যাসী আমাদিগকে পবিত্র করিয়া দিলেন। সে হাস্যে যেন অগাধ শান্তির সমুদ্র উছলিয়া উঠিল! সংসারের শোক, সুখ, আনন্দ, নিরানন্দ, কিছুই যেন সে মূর্ত্তি স্পর্শ করিবার অধিকারী নহে!

সংসার-যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করিয়া বিজয়গর্ব্বে হৃদয় একদিন উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু হে সন্ন্যাসী! তখন বুঝি নাই, তুমি হারিয়াও জিতিবে। আর আমি যে জয় অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তোমার জয়লাভের সহিত তাহার তুলনা হয় কি?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

চীনে প্রজাতন্ত্র।

জাপানের অধ্যাপক আয়েনাগা (Iyenaga বিলাতের একখানি মাসিকে চীনের প্রজাতন্ত্র বিষয়ে একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ডাক্তার সঙ্-যৎ-সেন (Sun-yat-sen) স্বীয় জীবন-কাহিনীর এক অংশ "ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে" লিখিয়াছেন। আর্চ্চিবল্ড্ কলকুহনের (Colquhoun) চীন-বিষয়ক পুরাতন সিদ্ধান্তের পুনরালোচনামূলক আর একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। গত মাসের ইউরোপীয় মাসিক সাহিত্যে চীনের কথা সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। আমরা উহার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিলাম।

অধ্যাপক আয়েনাগা বলেন যে, বাহিরের লোকের ধারণা আছে যে, চীনে এক ভাষা, এক জাতি ও এক ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সে ধারণা ভ্রান্ত। খাস চীন দেশে, অর্থাৎ, চীন সাম্রাজ্যের মধ্য ও দক্ষিণ অংশে, মোট আঠারোটি বিভাগ আছে। এই অষ্টাদশ বিভাগে অষ্টাদশ প্রকারের ভাষা ও আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে।—"So numerous and different are the languages and dialects spoken, that as has been humourously said, they can furnish a new tongue for every day of the year." পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেমন যোজনান্তর ভাষা ছিল, এখন চীনেও

তেমনই প্রত্যেক জেলায় এক একটি উপ-ভাষা প্রচলিত আছে। বরং লিখিত ভাষা অনেক বুঝিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ-বৈষম্য জন্য, এবং প্রাদেশিকতার প্রাচুর্য্যবশতঃ, মৌখিক ভাষা প্রত্যেক জেলায় স্বতন্ত্র, এবং অপর জেলার লোকদের পক্ষে দুর্ব্বোধ।

জাতি হিসাবে চীনে বহু জাতির বসতি আছে। দক্ষিণদেশীয় চীনেদের সহিত উত্তরের চীনেদের আকারগত বৈষম্য আছে; আবার চীনের পূর্ব্ব প্রান্তের যাযাবর চীনাগণ একেবারেই অন্য চীনে অপেক্ষা স্বতন্ত্র। বৌদ্ধ ও কনফুসের ধর্ম্ম চীনের প্রধান ধর্ম্ম হইলেও, চীনে এত উপধর্ম্ম আছে যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ধর্ম্মগত বৈষম্য জন্য আচার-ব্যবহার-গত বৈষম্য খুব প্রবল হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মগত সাম্যের মধ্যে এইটুকু আছে যে, চীনের প্রায় সকলেই পূর্ব্বপুরুষদের পূজা ও তর্পণাদি করিয়া থাকে। চীনদেশে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নাই। এক একটি পরিবার সমাজের ব্যষ্টিরূপে গণ্য; ব্যক্তি পরিবার বা সংসার-বিশেষের অঙ্গস্বরূপ। তবে চীনে 'এরিষ্টক্রাসী', বা নায়ক-সম্প্রদায়, বা অভিজাত-শ্রেণী নাই। সকল পরিবারের সকলেই উচ্চ পদে উন্নীত হইতে পারে। আয়তনে চীন ভারতের সমান হইলেও, চীনে চল্লিশ কোটী নরনারীর বাস। চীনে মোট তিন হাজার মাইলের অধিক রেলপথ নাই। আধুনিক হিসাবে শিক্ষিত চীনের সংখ্যা মোট চল্লিশ লক্ষ হইবে কি না সন্দেহ। তবে প্রাচীন রীতি অনুসারে চীনদেশে অনেকেই লেখাপড়া শিখে ও জানে। চীনের লোকসাধারণ দেশের রাজাকে ভগবানের অংশরূপে ভাবনা করিয়া পূজা করে।

"For centuries the monarchical idea has been the dominant principle of China. The Emperor was regarded as semi-divine, the "Son of Heaven" representing the Deity and ruling the people in His behalf. He was the Patriarch of the great patriarchal state, the Father and High Priest of the people." চীনের অধিবাসিগণ সম্রাটকে "ভগবানের পুত্র" বলিত, এবং ভগবানের প্রতিনিধিরূপে সম্রাট দেশ শাসন করিতেন। তিনিই চীনের বিশাল সংসারের কর্ত্তা ছিলেন।

এমন যদি চীনের অবস্থা, তাহা হইলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে,—চীনের সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল কেন? চীনে প্রজাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে কেন? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর জানিতে হইলে

সঙ্-যৎ-সেনের জীবনকথা আলোচনা করিতে হইবে। ডাক্তার সঙ্-যৎ-সেন বলেন, নিম্নলিখিত এই কয়টি কারণের জন্য তাতার সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়াছে।

১। চীনেদের অসহ্য দারিদ্র্য। তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যহ দশটা পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারে না। চীনেদের পক্ষে ইহা অসহ্য কষ্ট। তাহারা পরিশ্রমী, উদ্যমশীল, মিতব্যয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাহারা কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করে না। পরন্তু এই কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ-রক্ষার জন্য তাহারা রাজার বা গবর্মেণ্টের অপেক্ষা করে। এ পক্ষে রাজা বা শাসকসম্প্রদায় উদাসীন হইলেই, তাহাদের সকল রাজভক্তি কর্পূরের মত উপিয়া যায়।

২। চীনের সাধারণ লোকে সম্রাটকে অপরাজেয় মনে করিত। জাপানের সহিত যুদ্ধে, বক্সার-বিদ্রোহে, পিকিন-লুণ্ঠনে চীনেদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। তাহারা বুঝিল যে, তাহাদের তাতার সম্রাট অপরাজেয় নহেন; তিনিও মানুষের মত দুর্ব্বল। এই দৌর্ব্বল্য দেখিয়া তাহাদের রাজভক্তি হ্রাস পাইল।

৩। তাতার রাজবল্লভগণের অত্যাচার উৎপীড়ন অসহ্য হইয়াছিল। যাহারা দেশের রক্ষক হইবে, তাহারাই দেশের সর্ব্বভুক্ হইয়াছিল।

৪। জাপানের উন্নতি, রুসিয়ার পরাজয় ও বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার আদর, এই তিন কারণেই চীনে প্রজাতন্ত্র-প্রথার প্রবর্ত্তন অল্পায়াসসাধ্য হইয়াছে। চীন মার্কিণের কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতার আস্বাদ পাইয়াছে, নব্য চীন মার্কিণকেই আদর্শ বলিয়া মনে করে। মার্কিণ জাতির অনুচিকীর্ষা নব্য চীনদিগের মনে সদা জাগরূক আছে। ইহার উপর ডাক্তার সঙ্-যৎ-সেনের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী লোকশিক্ষকের অভাব চীনদেশে নাই। শিক্ষক আছে, শিক্ষা করিবার লোকও আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাই সুফলও ফলিয়াছে।

তবে এখনও সম্মুখে অনেক বিঘ্ন আছে। বিপদ আছে! প্রথম ও প্রধান,—বিরোধ; চীনের সেনাপতিগণের মধ্যে দ্রোহ হইবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়,—বর্ত্তমান অর্থাভাব দূর করিবার জন্য চীন যে ইউরোপের ষট্‌শক্তির কাছে ঋণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার পরিণামে ইউরোপের শক্তিনিচয় চীনদেশকে বাটোয়ারা করিয়া লইতে উদ্যত হইতে পারেন।

তৃতীয়,—জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। চতুর্থ,—চীনে এক নেপোলিয়নের উদ্ভব-সম্ভাবনা। পঞ্চম,—চীনজাতির সনাতন ঔদাসীন্য! বাস্তবপক্ষে চীন এখন সভ্যজগতের সম্মুখে এক বিরাট প্রহেলিকারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বিধাতা ভিন্ন আর কে এ প্রহেলিকার সমাধান করিবে?

ভৌতিক তত্ত্ব।

মার্কিণে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জর্ম্মণীতে অধুনা ভূতযোনির আলোচনায় একটু মাত্রাধিক্য ঘটিতেছে। সেকালের ভূতের গল্প ধরিয়া আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যানও হইতেছে। এই রকমের একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম The Fairy Faith in Celtic countries by W. Y. Evans Wentz. অর্থাৎ, আয়ারল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে যত পুরাতন ভূতের, জীনের, পরীর, উপদেবতার গল্প প্রচলিত আছে, তাহার সংগ্রহ করিয়া উহাদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া, 'লজিকে'র অনুসারে বিশ্লেষণ করিয়া, মিঃ এভান্স-ওয়েঞ্জ অনেক আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বের নিষ্কাশন করিয়াছেন। মিঃ ওয়েঞ্জ সুপণ্ডিত, নানাভাষাবিদ্ মনস্তত্ত্ববিদ্। তিনি ভূতযোনিতে প্রগাঢ় বিশ্বাসী; স্বয়ং কথনও ভূত দেখেন নাই; পরন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় ইঁহার অটুট বিশ্বাস আছে। পুস্তকখানির ভাষা অতি সুন্দর, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। "টাইম্‌সে"র সমালোচকগণ সাদরে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন।

রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়র।

Shakespeare on the stage (Unwin 10s. 6d.) William Winter. vol 1. ইহা একখানি অপূর্ব্ব পুস্তক। সেক্সপীয়রের নাটকগুলির বড় বড় অভিনেতৃগণ কে কেমন ভাবে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, কাহার অভিনয়-মাহাত্ম্যে সেক্সপীয়রের কোন কোন উক্তির কেমন অর্থ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, কুশীলবগণের হাবভাব; সাজপোষাক প্রভৃতির ইতিহাস ও সমালোচনা এই পুস্তকে লিখিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ উইণ্টার এক জন প্রাজ্ঞ মার্কিণ সমালোচক। তিনি জীবনের অনেকটা অংশ সেক্সপীয়রের পঠন-পাঠনে ও অভিনয়-সমালোচনায় কাটাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে আজ পর্য্যন্ত সেক্সপীয়রের নাটকগুলির কে কেমন ভাবে অভিনয় করিয়াছেন, কাহার অভিনয়ের ভঙ্গী কেমন, তাহারই ইতিবৃত্ত এই

পুস্তকে আছে। ইহা বোধ হয় তিন চারি খণ্ডে পূর্ণ হইবে। অভিনেতৃগণের পক্ষে এ পুস্তক বিশেষ সহায়ক হইতে পারে। ইংলণ্ডে অভিনয়-চাতুরীর যে কত সমাদর, তাহা এই পুস্তক-প্রচারেই বুঝা যাইতেছে।

গেটে ও তাঁহার বান্ধবীগণ।

Goethe and his woman Friends by Mary Caroline Crawford (Fisher Wnwin 10 s. 6d) গেটের চরিত্র বুঝিবার পক্ষে এ পুস্তকখানি সুন্দর সহায়ক হইয়াছে। অবশ্য পুস্তকে নূতন কথা কিছুই নাই, পরন্তু নূতন ভাবে লিখিত হইয়াছে। নারীর পক্ষ হইতে গেটের প্রেমবৈচিত্র্যের কথা কেমন ভাবে বলা চলে, তাহা লেখিকা বলিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা একটু অসংযত। লেখিকা ফ্রলীনের (Fraulein) কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন,—"She was a tremendously flesh and blood woman." এই পুস্তকখানি পড়িলে মনে হয়, যেন গেটেকে কতকটা চিনিতে পারিতেছি। গ্রন্থকর্ত্রী সুলেখিকা, গেটের মহিমায় মুগ্ধা, কাজেই তাঁহার এই পুঁথিখানি সুন্দর হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিদ্বজ্জনসমাজে এ পুস্তকের আদরও হইয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্যের নূতন ইতিহাস।

The Cambridge History of English Literature. Edited by A. W. Ward and A. R. Walter. ইহা এক বিরাট ব্যাপার। আমরা উহার এক খণ্ডের কতক অংশ দেখিতে পাইয়াছি। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস এমন ভাবে পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। ইহা ইতিহাসও বটে, বিশ্লেষণও বটে। এক একটি কবির প্রতিবেশ-প্রভাব, উন্মেষ-পারম্পর্য্য, তাঁহার কাব্যের বিনিয়োগ ও পরিণতি অতি উন্নতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের যুগপ্রবর্ত্তক, যুগপ্রতিচ্ছায়াপ্রদর্শক কবির ক্ষেত্র বা তাৎকালিক সমাজের ইতিহাস বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ইতিহাস লিখিত হইতেছে; কিন্তু ইহার সহিত তাহাদের তুলনা করিলে মনে হয়, বাঙ্গালার বাবু লেখকগণ কেবল খোসখেয়াল করিতেছেন; যাহা মনে হইয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। প্রভাব বা Influenceএর কথায় কেম্ব্রিজের লেখকগণ বলিয়াছেন,—"what is called Influence nowadays is very often only Debt. * * * * It follows that a large literary debt may co-exist with very

influence and a great deal of influence with very little explicit Debt. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া কেহ Influenceএর কথা ভাবেন নাই, Debtএর বিষয়ও হিসাব করিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, বা লিখিবেন, তাঁহারা এই পুস্তকরাশির অন্ততঃ সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডটি পড়িয়া দেখেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস হইতে "The Greek Genius and its meaning to us by R. W. Livingstone নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতেছে। আর আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসলেখকগণ মৈথিলী, হিন্দী, ব্রজবুলী, উড়িয়া, ফার্সি, উর্দ্দু,—ইহার কোনও ভাষারই সমাচার রাখেন না। বাঙ্গালা ভাষা ইহাদের কাছে যে কতটা ঋণী, তাহা জানেনও না। ফলে বিলাতী আদর্শে আমাদের ভাষার ইতিহাসকে লিখিতে পারেন নাই।

নিবেদিতা।

পূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য ত্যাগ ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রদর্শিত "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সর্ব্বস্বত্যাগরূপ 'পন্থা'র অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্যের যে সকল মহাপ্রাণা রমণী দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত ভারতের কল্যাণে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলেও, এক হিসাবে অত্যুক্তি হয় না। ব্রতাবলম্বন করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শীত ঋতুর অবসানে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের পরমধামে উপনীতা হয়েন। ঐ ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি যে কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন—কি অপূর্ব্ব একনিষ্ঠা, অনন্ত অধ্যবসায় ও তন্ময় ধ্যানে রত থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে কথা সাধারণে অবগত নহে। নিবেদিতাকে হারাইয়াই সে কথা জানিবার জন্য এখন সকলের প্রাণে একটা প্রবল বাসনা উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু ঐ বিষয়টি জানিতে হইলে আমাদিগকে নিবেদিতার বাহ্য-জীবন-যবনিকার, অন্তরালে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কেবল লোকনয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত তাঁহার বড় বড় কাজগুলি দেখিয়া বিচার করিলেই চলিবে না। দেখিতে হইবে—দৈনন্দিন জীবনে তিনি কি ভাবে তাঁহার দরিদ্র অশিক্ষিত পাড়া-প্রতিবাসীর সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন; কি ভাবে তিনি তাহাদিগের সকলপ্রকার সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সাঙ্ঘাতিক ব্যাধিগ্রস্তকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কি ভাবে নিজ অমূল্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় রত থাকিতেন; দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি নিজের অবস্থা সচ্ছল না হইলেও, কি ভাবে মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর হইতেন; দুর্ভিক্ষের তাড়ন হইতে গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কি ভাবে তিনি অনশন অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া দিনের পর দিন পদব্রজে বন্যার জল ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অক্ষুণ্ণ জ্ঞানসম্পদের সহিত বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সত্যসমূহের সম্মিলনে

Nivedita -

দেশের রমণীকুলের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার সম্প্রসারেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি একমাত্র সম্ভবপর—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি কি ভাবেই বা এক নূতন স্ত্রী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের কুলবধূগণের হৃদয় মনে বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারস্থাপনে সমর্থা হইয়াছিলেন!—আর দেখিতে ও পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নিত্যানুষ্ঠিত ঐ প্রকারের শত চেষ্টার পশ্চাতে বিরাজিত তাঁহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা, আয়-ব্যয়-হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত ভালবাসা—যে অসীম ভালবাসায় তিনি ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে কা কথা, প্রত্যেক উপলখণ্ডকেও পবিত্র ও আপনার হইতে আপনার বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন!

বাস্তবিক, মহতের মহত্ত্বের পরিচয় আমরা চিরকালই ঐ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন কার্য্যসহায়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। নতুবা দৈবাধীন ঘটনাচক্রের প্রবল প্রবাহে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া ভীরু কাপুরুষকেও অনেক সময় সংসারে বড় কাজ করিরা ফেলিতে দেখা যায়। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সকল প্রকার ক্ষুদ্র চেষ্টা ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই আমরা ঐরূপ যথার্থ মহত্ত্বের নিত্য পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকেই অদ্য তাঁহার অদর্শনে শোকে ম্রিয়মাণ, এবং সেই জন্যই সকলে আজি তাঁহার জীবন্ত শক্তিমতী মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নিত্যপূজা করিতেছে।

সারদানন্দ।

ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ।

২

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পুরাণমতে ব্রহ্মিষ্ঠ বৈদেহ জনক ও সীতার পিতা জনক একই ব্যক্তি ছিলেন না। যে সময় আদিম মানব পশু-হনন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র কৃষিকৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছিল, সে সময় ব্রহ্মজ্ঞান কথনই তাহার ধারণার মধ্যে আসিতেই পারে না। জনক রাজার সময় বর্ণাশ্রমী হিন্দুজাতির সভ্যতা বিলক্ষণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করিব না।

রবিবাবু সীতাকে মানবী মনে না করিয়া 'হলচালনরেখামাত্র' কল্পনা করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সীতা অযোনিসম্ভবা,—যজ্ঞভূমি-কর্ষণকালে যাজ্ঞিক জনকের হলমুখে সমুৎপন্না,—এইমাত্র পাঠ করিয়াই রবীন্দ্রবাবুর দুরধিরোহিণী কল্পনা এই রূপকের বিরাট সৌধ রচিতে সাহস করিয়াছে। রামচন্দ্রের সমসাময়িক আদিকবি বাল্মীকি যাহা বাস্তব ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় কল্পনাবল্লভ কবি তাহাতে রূপকের রাগ চড়াইতে যাইয়া বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। মিথিলার যজ্ঞপূতভূমিতে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্রই যে কেবল সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; পরন্তু ভরত মাণ্ডবীকে, লক্ষ্মণ সীরধ্বজতনয়া ঊর্ম্মিলাকে, এবং শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মাণ্ডবী, ঊর্ম্মিলা, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি শব্দের যৌগিক অর্থ ধরিয়া রূপকের কল্পনা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু এইরূপ রূপকের ভোজবাজীতে যদি সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! বাজিকরের করধৃত অস্থিখণ্ডের ন্যায় রূপকের স্পর্শে রবিবাবুকেই ভাবমূলক ব্যাখ্যায় উড়াইয়া দিতে পারেন, এরূপ 'আত্মারাম সরকার' এখনও এ দেশে দুর্লভ নহে। আর যদি ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, মিথিলায় ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন মানবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, আর হরধনুর্ভঙ্গকারী রামচন্দ্রই কেবল জনক রাজার "অমানুষিক মানস-কন্যাটি"মাত্র লইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তাহা হইলে হয় অনুমান করিতে হয়, রামচন্দ্র চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা পরিবেদন-দোষে দুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বংশে কেহ কখনও পাতিত্য-দোষের আরোপ করেন নাই, অথবা তিনি নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, এরূপ কথাও কেহ বলেন নাই। সুতরাং রবিবাবুর রূপক-কল্পনার কোনও মূল্যই নাই। আমাদের দেশে লোক এখনও বাদলের সময় সন্তান জন্মিলে তাহার নাম 'বাদল', ঝড়ের সময় জন্মিলে তাহার নাম 'ঝ'ড়ো, তুফানের সময় জন্মিলে তাহার নাম 'তুফ্‌নো', বারিধি-বক্ষে জন্মিলে তাহার নাম 'বারীন্দ্র' রাখিয়া থাকে ; সেইরূপ জনকের স্বহস্তে কৃষ্ট যজ্ঞক্ষেত্রে সীতার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া রাম-মহিষীর নাম সীতা হইয়াছিল। ইহাতে রূপক কল্পনা করিবার কিছুই নাই।

সীতাকে রূপক কল্পনা করিলে রামায়ণের ভাবমূলক ব্যাখ্যা বিষম জটিল হইয়া পড়ে। সীতাহরণ ও রাবণ-বিজয় ব্যাপার এই ভাবমূলক ব্যাখ্যায়

পরিস্ফুট করা যায় না। কিন্তু তাহাই রামচরিতের সর্ব্বস্ব। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, রামচন্দ্র কৃষি-বিস্তারের জন্য দণ্ডকারণ্যে প্রবাস করিয়াছিলেন, আর রাবণ তাঁহার কৃষি-বিদ্যাকে অপহরণ করিয়া অশোকবনে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইলে, সমস্ত ব্যাপারই একেবারে সামঞ্জস্যহীন ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। কৃষিস্থিতি-মূলক সভ্যতার বিস্তার ও আর্য্য অনার্য্যের যোগ-বন্ধনই যাঁহার জীবনের পুণ্যব্রত, তাঁহার পক্ষে এই ব্যাপার লইয়া লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া কখনই সম্ভবে না। বরং রাক্ষসগণ কৃষি-বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার আনন্দিত হইবারই কথা।

'হরধনুর্ভঙ্গ' অর্থে রবিবাবু 'শৈবপ্রভাবের নাশ' কল্পনা করিয়াছেন। তিনি অহেতুকী কল্পনা-বলে মনে করিয়াছেন, শিব অনার্য্যের দেবতা। রবিবাবুর এই কল্পনা নিতান্তই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও প্রমাণ-বিরুদ্ধ। শিব যদি অনার্য্যেরই দেবতা হইতেন, তাহা হইলে, বিশ্বামিত্র কখনই তাঁহার তপস্যা ও উপাসনা করিতেন না। রামায়ণের আদিকাণ্ডে ৫৫ সর্গে লিখিত আছে,—

স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ॥
কেনচিৎ ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বমিত্রং মহামুনিম্॥

সেই বিশ্বামিত্র কিন্নর ও সর্পসেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক মহাদেবের প্রাসাদার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর কিছুকাল পরে দেবেশ বৃষভধ্বজ বরদ হইয়া মহামুনিকে দর্শন দিয়াছিলেন।

কিন্তু রবিবাবুর কল্পনাময়ী ধারায় প্রকাশ,—বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে শৈব-প্রভাব নাশ করিতে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিবোপাসক বিশ্বামিত্রকে শৈব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী কল্পনা করিয়া রবিবাবু আপনার থিওরী-গঠনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। শিব যদি অনার্য্যের দেবতা হইতেন, তাহা হইলে বেদের অঙ্গীভূত উপনিষদে তিনি স্থান পাইতেন না। অতি প্রাচীন নারায়ণোপনিষদে আছে,—

নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়েঽম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ। ২২

এই স্থানে শিবকে অম্বিকাপতি, উমাপতি ও পশুপতি বলা হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বের শ্লোকেই সেই দেবদেবকে ঈশান, সর্ব্বভূতেশ্বর ও সদাশিব বলা হইয়াছে। আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ কি বলিতেছেন, দেখুন,—

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ৪।১৪

আবার ঋগ্বেদীয় নাদবিন্দূপনিষদে লিখিত আছে,—

ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্। অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিস্তথা।

ইহার অর্থ এইরূপ ;—যে সাধক ধ্যানকালে ষষ্ঠমাত্রায় প্রাণবিযুক্ত হন, তিনি ইন্দ্রের সাযুজ্যলাভ করেন ; যিনি সপ্তমীমাত্রাধারণকালে প্রাণবায়ু ত্যাগ করেন, তিনি বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন ; আর যিনি অষ্টমীমাত্রা-ধ্যানকালে কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি রুদ্র বা পশুপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, যিনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় নারায়ণোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এবং ঋগ্বেদীয় নাদবিন্দূপনিষদে পরব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত, সেই বৃষভধ্বজ শিবকে রবিবাবু অনার্য্যের দেবতা বলিতে সাহসী হইলেন কেন? তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে বিশ্বামিত্রকে রবিবাবু শৈবপ্রভাব খর্ব্ব করিবার সহায়ক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই বিশ্বামিত্রই শিবের আরাধনা করিয়া দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ; আবার যে রামচন্দ্রকে তিনি শৈবপ্রভাবের হন্তা ও একেশ্বরবাদের প্রচারক কল্পনা করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্রই লঙ্কায় রাবণ-সমরে প্রপীড়িত হইয়া যে স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা দেখুন,—

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ। পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমোহ্যপাং পতিঃ। বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্ত্তা প্রভাকরঃ॥
লঙ্কাকাণ্ডে ১০৬।৮-৯।

যে রাম বিপদকালে শিবাদি সর্ব্বদেবতার নামগ্রহণপূর্ব্বক সবিতৃদেবের স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, সেই রামকেই রবিবাবুর অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা শৈব প্রভাবের নাশক ও একেশ্বরবাদের প্রচারক বলিয়া বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই দেখিয়া আমরা বিস্মিত। ফলে হরধনুর্ভঙ্গ অর্থে রবিবাবু শিবোপাসকদিগের প্রভাব-নিরসন বুঝিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। শিব অনার্য্য দেবতা নহেন—আর্য্য দেবতা।

অহল্যাকে লইয়া কল্পনারসরসিক রবিবাবু আবার একটা অপূর্ব্ব রূপক রচিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি কিছুমাত্র সাফল্য

লাভে সমর্থ হন নাই। অহল্যার ব্যাপারটি রূপক কি না, উহার কোনওরূপ রূপকভাবের ব্যাখ্যা শাস্ত্রানুমোদিত কি না, এ স্থলে আমি তাহার আলোচনা করিব না। আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

জুতা।

বিগত বৈশাখ মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ 'পাদুকা' প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চর্ম্মনির্ম্মিত জুতা হিন্দুদিগের পুরাতন সম্পত্তি। এই প্রবন্ধে প্রকাশ,—বরেন্দ্রভূমিতে আবিষ্কৃত সূর্য্যমূর্ত্তির চরণে বুট-জুতা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি বিষ্ণুর চরণে আজানুলম্বিত বুটজুতা দেখিয়াছি। এই সংবাদ অনুসন্ধিৎসু সুধীগণের প্রয়োজনে আসিতে পারে, এই ভাবিয়া তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন পূর্ণিয়া জেলার বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন আমাকে একাধিকবার কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বাহাদুরগঞ্জ থানার প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে বড়িজান নামক গ্রামে গমন করিতে হইয়াছিল। বড়িজান এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, এবং কয়েকটি মুসলমান পরিবারের আবাসভূমি। এখানে পুরাতন গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। স্থানে স্থানে ইষ্টকের স্তূপ ও সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে সিংহদ্বারের এক প্রস্তরখণ্ডকে মুসলমানগণ সিন্দুরবিন্দু দিয়া পূজা করে। শুনিয়াছিলাম যে, দেবদেবীর অনেক মূর্ত্তি ইউরোপীয়গণ লইয়া গিয়াছেন। গড়ের মধ্যে দেখিলাম যে, যজ্ঞোপবীতধারী বনমালাবিভূষিত এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তখনও কৃষকের কৃষ্ট ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই যুবতী-মূর্ত্তি চামর ব্যজন করিতেছে। এই তিন মূর্ত্তিরই চরণে আজানুলম্বিত কারুকার্য্যখচিত বুটজুতা। তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, এ দেশ শৈলময় নেপালের সন্নিহিত; বোধ হয়, কোনও কালে বড়িজান নেপালের অন্তর্গত ছিল, এবং শীতপ্রধানদেশবাসী নেপালীগণ বহুকাল হইতে জুতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাই তাহারা তাহাদিগের দেবতাদিগকেও আপনাদিগের অনুরূপ করিয়া সাজাইয়া থাকিবে। কিন্তু এই অনুমান এক জন বিশেষানভিজ্ঞের কল্পনামাত্র।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

অর্ঘ্য, বৈশাখ।—প্রথমেই শ্রীবিহারীলাল সরকারের "বর্ষ-গীতি"।—বিদায় ও আবাহন মামুলী গান। আজকাল এমন মজলিস নাই, যেখানে বিহারী বাবুর গানের ঝঙ্কার নাই। 'ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজম্' গোছ! শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র "হুগলী জেলার কতিপয় স্থানে" হুগলী জেলার অন্তর্গত খলসিনি, ভুরস্থট, মাহেশ, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও সিঙ্গুর, এই কয়খানি প্রাচীন পল্লীর পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গদেশের প্রত্যেক গ্রামের এইরূপ প্রাচীন ইতিহাস সংগৃহীত হউক। 'অধ্যাত্মনীতি' শ্রীসত্যচরণ মিত্রের আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস। মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বাস্তবিকই নামাবলী গায়ে, অধ্যাত্ম-গ্রন্থ হাতে, পদ্মাসনে আসীন, জাহ্নবী-পরিপূত বাঙ্গালীর ছবি কি মনোহর! আহা সে আনন্দ আমরা নিজে 'আস্বাদ' করিয়া জগৎবাসীকে আস্বাদন করাই।" বাঙ্গালীমাত্রই যদি মিত্র মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে বঙ্গভূমি আধ্যাত্মিকতার বিশাল তপোবনে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু এই কর্ম্মের যুগে সারা বঙ্গের বানপ্রস্থ বাঞ্ছনীয় কি? শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের "ওমরের পথে" ওমর খায়মের কবিতার ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ। 'সাত নকলে আসল খাস্ত।' নিম্নে অনুবাদের একটু নমুনা দি;—

"ধূ ধূ মরু প'ড়ে হোথা ওড়ে বালুরাশি—
শুধু নীল বন হেথা—মৃদুবায়ু বাঁশী!
মধুরা মধুরা মরি, মেঘ ফাঁকে বিধু—
পাবে শীধু, বলে বধূ, আস্যে মধু হাসি!"

শ্রীভূপেন্দ্রনারাণ চৌধুরীর "পুরুষোত্তমের কথা" সুখপাঠ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত। "ধ্রুব" শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একখানি ক্রমশঃপ্রকাশ্য নাটক; আদ্যোপান্ত ছন্দে লিখিত; আশা করি, শীঘ্রই ইহা কোনও থিয়েটারে স্থানলাভ করিবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির প্রতি আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুলক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত "অষ্টেণ্ড কোম্পানির ইতিহাস" দুই পৃষ্ঠায় শেষ করিয়াছেন।

অর্চ্চনা, জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন "সাল ও সন কি এক?" প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—এ উভয় এক নহে। গুপ্ত বিদ্যারত্ন প্রাচীন লেখক, এমন বিষয় নাই, যাহাতে তিনি ওয়াকিবহাল নহেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর ও সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺রামদাস সেন মহোদয়গণের ভ্রম আবিষ্কার করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এবং "বিপ্রকুলকল্পলতা" নামক একখানি তথাকথিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে শালবান নামক যে বৈদ্য রাজা ছিলেন, শাল-অব্দ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত, এবং উহা একটি 'বৈদ্যাব্দ'। ভবিষ্যতে কোনও ব্রাহ্মণ উহা 'ব্রাহ্মণাব্দ' ও কোন 'দেববর্ম্মা' উহা 'ক্ষত্রাব্দ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন, আমরা এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি। নূতন সংস্করণের দ্বিজ 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের কি মত? "অর্মলা" শ্রীযতীন্দ্রমোহন সোমের রচিত চলনসই গল্প। পূর্ব্বে শুনিতাম, যাঁহার কোনও চাকরী না জোটে, তিনি মাষ্টারী করেন। এখন দেখিতেছি, যিনি লিখিবার কোনও বিষয়

খুঁজিয়া না পান, তিনিই গল্প লেখেন! বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প-লেখকের সংখ্যা পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষাও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সকলেই মোপাঁসা বা ম্যাক্সিম গোর্কি হইতে চান, কিন্তু তাহা কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। লেখকের ভাষাও অদ্ভুত!—"অমলার রূপনদী এখন কূলে কূলে উথলিয়া উঠিতেছে।" "বিবাহের নামে অমলা অন্ন গ্রহণ করিত না।" "অমলা আপনার রূপের আপনিই একছত্র সম্রাজ্ঞী হইয়া সেই ক্ষুদ্র পল্লী আলোকিত করিয়াছিল।" এইরূপ ভাষার বাহার এই গল্পের সর্ব্বত্র। ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "পথের কথা" চলিতেছে। গোবিন্দরাম মিত্রের কাহিনী সুখপাঠ্য। "উপবন" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রের একটি প্রহেলিকা, কবিতার আকারে লিখিত। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের "গিরিশচন্দ্র এই সংখ্যায় শেষ হইল। স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। সম্পাদকের "বিষ্ণু-সংহিতার দণ্ডনীতি" এখনও চলিতেছে। "কবিতাকুঞ্জে" শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর "সাধনা", শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "মাতৃহীনের সন্ধ্যা", শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর "তুমি ও আমি", শ্রীনলিনীমোহন মণ্ডলের "টাইটানিক পোত", এই চারিটি কবিতা আছে। প্রথম তিনটি মন্দ নহে, কিন্তু মণ্ডল কবির কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিল না।

দেবালয়, জ্যৈষ্ঠ।—প্রথমেই ইংরেজী ভাষায় দেবালয়ের বিরাট বিশাল বার্ষিক রিপোর্ট। দেশের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে, দেবালয়ের মত ধর্ম্মসঙ্ঘের বার্ষিক রিপোর্টও বিদেশী ভাষায় লিখিতে হয়, অথচ বাঙ্গালা মাসিকে তাহা না ছাপিলে চলে না। আবার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ আচার্য্য প্রেসিডেণ্ট মহাশয়কেও তাহাতে ইংরাজী ভাষায় সহি করিতে হইয়াছে। কবিবর দ্বিজেন রায়ের হাসির গানের 'বিলাত ফের্ত্তা ক' ভাই'-ই কেবল সাহেব সাজেন না, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য্য সতীশচন্দ্রকেও সাহেবী ধরণে ইংরেজী ভাষায় রিপোর্ট লিখিতে হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার ও সংস্করণ-প্রণালী" ক্রমশঃপ্রকাশ্য সন্দর্ভ। লেখকের নাম নাই, তবে তিনি ভরসা দিয়াছেন, তিনি ক্রমে রাজা রামমোহনের পতাকাধারী ব্রাহ্ম সংস্কারকগণের গুরুমারা বিদ্যার সমালোচনা দ্বারা পাঠক-সমাজকে আমোদিত করিবেন। পরচর্চ্চা সর্ব্বত্রই আরামজনক, তা ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়াই হউক, আর মুখুর্য্যে মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়াই হউক।—লেখক ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন,—রাজা রামমোহনের গোঁড়ামী ছিল না, তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়েরই পক্ষপাতী ছিলেন। যে সকল সংস্কারক পল্লবগ্রাহী নহেন, তুষটাকেই যাঁহারা শস্য অপেক্ষা মূল্যবান বোধ না করেন, তাঁহাদের চরিত্রগত বিশেষত্বের মধ্যে যে সার্ব্বভৌমিকতা পরিস্ফুট হয়, অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। আমের সহিত আমড়ার নামের সাদৃশ্য যতটুকুই থাক, উভয়ই এক পদার্থ নহে। রামমোহন রায়ের মত সংস্কারকের ধর্ম্মগত সার্ব্বভৌমিকতা জীর্ণ-প্রাসাদ ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী ছিল না, তাহা সংস্কারেরই পক্ষপাতী ছিল; তাই তিনি কিছু গড়িয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। এখনকার বচনসর্ব্বস্ব সার্ব্বভৌমগণ কেবল ভাঙ্গেন, ভাঙ্গিয়াই তাঁহাদের মহা উৎসাহ, দম্ভ, লম্ফ। হিন্দুসমাজকে গালি দিবার সময় তাঁহারা নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করেন। হিন্দু সমাজের নাড়ী-ভুঁড়ীতেই তাঁহাদের তৃপ্তি! লেখক বলিতেছেন,—'তাঁহার (অর্থাৎ রামমোহন রায়ের) সম্যক্‌চিন্তিত অথচ বহু জটিল সংস্কারের প্রণালী ঠিক ইহার ভিন্ন দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে।" এই প্রকার অপরূপ বাঙ্গলা পাঠ করিয়া যদি কোনও পাঠক লেখকের ভাষা-জ্ঞানের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে, তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না। প্রবন্ধের ভাষা স্থানে স্থানে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য; যথা,—"হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্য খৃষ্টানের ভয়ে তাহার দূর অতীত শতাব্দীর অন্ধকারের দিকে মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিল।" "রাজা

রামমোহন পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, খ্রীষ্টানসমাজে বাহ্যতঃ এই দুইটি প্রথা নাই।" মুসলমানসমাজে কি এই দুইটি প্রথা আছে? তিনি হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে পৌত্তলিকতা দূর করিবার চেষ্টা না করিলে এক জন রেভারেণ্ড রায় বলিয়া পরিচিত হইতেও পারিতেন, কিন্তু রামমোহন রায় হইতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সপ্রমাণ করিয়াছিলেন,—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। গায়ের জোরে তিনি বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। যাহারা গায়ের জোরে সমাজে একটা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে—তাহারা সংস্কারক নহে, 'সংহারক',—নরসিংহ। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের "গিরিশচন্দ্র" নামক প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও মনোজ্ঞ। যাঁহারা স্বর্গীয় নাট্যকার সম্বন্ধে বিপুল উচ্ছ্বাসের রচনা করিয়া মাসিকের স্থান ও পাঠকের সহিষ্ণুতা নষ্ট করিতেছেন, এ প্রবন্ধটি তাঁহাদের রচনার মত ফেনিল উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। যদিও লেখক কোনও নূতন কথা বলেন নাই, কিন্তু অল্প কথায় গিরিশচন্দ্রের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির তর্পণই যদি এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিরুদ্ধ সমালোচনায় তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার অসারত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ, "দেবালয়ে"র মত পত্রিকায় এরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা শোভন হয় নাই। "সাধনা" শ্রীইন্দিরা দেবী (শাস্ত্রীর) ক্ষুদ্র রচনা। এতটুকু ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 'সাত কাণ্ড রামায়ণে'র অবতারণা কোনও পুরুষ লেখকের সাধ্য হইত কি না সন্দেহ! শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বিদুষী, ব্রাকেটের মধ্যে 'শাস্ত্রী' উপাধি-ব্যাধি আত্মপ্রকাশ না করিলেও, আমরা পরমাগ্রহে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতাম। পড়িয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতাম। তবে 'শাস্ত্রী' না হইলে শাস্ত্রকার আলোচনা করিবার অধিকার নাই, এরূপ কেহ মনে করিতে পারে ভাবিয়া যদি এই ব্রাকেটের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব, শাস্ত্রী শব্দটি দেশবিশেষের অধিবাসিনী রমণীদের কাছার ন্যায় আমাদের দৃষ্টিকটু। কবি শ্রীহরিপদ দের "গোধূলি" কবিতায় কবিত্ব আছে! যথা,—

"অভিসার বেশে সন্ধ্যা এল ভয়ে ভয়ে,
আবরি 'গৌরিক' বপু আঁধার আঁচলে।"

দেবালয়ে "অভিসার বেশ!"—কানে আঙ্গুল দিবার মানুষ কি কেহ নাই? অভিসার-বেশে আসিতে সন্ধ্যার এত ভয় কেন? যিনি নাচিতে পারিলেন, তাঁহার ঘোমটার দরকার কি? ভয়টা বোধ হয় অভিসারিকাদের চিরসঙ্গিনী। কিন্তু 'গৌরিক' বপু'টি কি পদার্থ? সন্ধ্যার বপু যে 'গৌরিক', তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও কাব্যে, নাটকে, এমন কি, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রেও দেখিতে পাই নাই। 'বিজনের নীরবতা'ও এইরূপ উৎকট 'কাব্যি'। "তোমার পথ" শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়ের একটি কবিতা। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির অদ্ভুত অনুকরণ। কাঁচপোকার প্রভাবে তেলাপোকা যেন কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। নমুনা দেখিবেন কি?

"বিরাটের সনে রাখি আপনারে
যেন ভবে আমি থাকি,
দেওয়া ও নেওয়ার মাঝখানে আমি
যেন তোমারেই ডাকি!"

নিরাকার ব্রহ্মের দর্শন অপেক্ষাও এই সকল কবিতার ভাব-গ্রহণ অধিক দুরূহ। "জৈন-তত্ত্ব-জ্ঞান, জাতিবিচার" শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দত্তের এক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি সন্দর্ভ। "উদ্বোধন" বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ। ক্ষিতীন্দ্রনাথবাবু

ভগবদ্ভক্ত ও প্রেমিক, তাহা এই প্রবন্ধে সুপরিস্ফুট। ক্ষিতীন্দ্রনাথবাবু এই উপদেশের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে,—"কে অস্বীকার করিবে যে ব্রাহ্মসমাজের তেজ আর পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে না?"—সত্যই কি এ কথা অস্বীকার করিবার কেহ নাই? "পূর্ব্বে ব্রাহ্মেরা হিন্দুকে স্বজাতি মনে করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাহা স্বীকারও করিতেন। কিন্তু এখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা স্বতন্ত্র জাতি। কুসংস্কারান্ধ হিন্দুর প্রতি অনেক ব্রাহ্ম সোনার চশমার ভিতর দিয়া এমন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন যে, যেন তাঁহারা সম্মুখে একটা বিকটাকার ভূত দেখিতেছেন! তাহার পর, "বর্ত্তমান যুগে আমাদের প্রাণে পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় ব্রহ্মপ্রীতি নাই।" এ কথা ছাপিয়া দিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাবু ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়াছেন।

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ।—কেহ কেহ বলেন, যদি স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে" গোঁড়ামীর গন্ধ একটু কম হইত, তাহা হইলে, এই প্রবন্ধরত্নসম্ভারে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক পরিতৃপ্ত হইতেন। শিষ্য গুরুর—বিশেষতঃ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের মত গুরুর একটু আধটু গোঁড়ামী করিলেও তাহা দুঃসহ মনে করিবার কারণ নাই। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তির উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক! এই ধর্ম্মহীনতার যুগে এইরূপ উপাদেয় প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "স্বামিশিষ্য-সংবাদ" এই সংখ্যায় শেষ হইল। গত সাত বৎসর যাবৎ এই সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে "উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। এই প্রবন্ধমালা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তশিষ্য গ্রন্থসত্ব বেলুড় মঠের ট্রষ্টীগণকে দান করিয়া গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পড়িলে স্বামী বিবেকানন্দকে ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। আমেরিকায় ব্রুকলিন, বোষ্টন প্রভৃতির নগরের সভা ক্লব প্রভৃতিতে স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিরা যে সকল তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং স্বামীজী তাহার যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, "প্রশ্নোত্তর" নামক প্রবন্ধে তাহাই ধারাবাহিকরূপে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। ইহাতে স্বামীজীর উদার ধর্ম্মমতের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "রামানুজ-দর্শন" শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষের রচনা; বর্ত্তমান সংখ্যায় রামানুজ-সম্মত প্রমাণ-তত্ত্বের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটি বেশ চিত্তাকর্ষক, তবে কিছু গুরুপাক; লঘু সাহিত্যের পাঠকগণ সহজে পরিপাক করিতে পারিবে না। "ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস" শ্রীকানাইলাল পালের রচনা। গ্রীক দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক এবার সিনিক সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। "ভারতের সাধনা" প্রবন্ধে লেখক (লেখকের নাম নাই) প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয় "নেশনের স্থাপনা ও লক্ষ্যসাধনে সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য্য। সন্ন্যাস হইতেই কেন্দ্র-শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া দেশের লোককে প্রকৃত ভাবে পথ দেখাইয়া দিবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নূতন সন্ন্যাস আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।" লেখক এই প্রবন্ধে দেশের ত্যাগী পরমার্থনিষ্ঠ যুবকবৃন্দকে স্বামীজীর প্রাণস্পর্শী গম্ভীর আহ্বানে কর্ণপাত করিতে অনুরোধ করিতেছেন। "অদ্বৈত-প্রসঙ্গ" গবেষণাপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ সন্দর্ভ।

ঢাকা রিভিউ, বৈশাখ।—"মুসলমানী শব্দে অনুপ্রাস" নামক প্রবন্ধে রসরাজ শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরবী ও পারসী সাহিত্যের বেতসকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের "প্রার্থনা" মন্দ নহে। শ্রীবীরেশ্বর সেন "বাঙ্গলা ভাষা" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে প্রস্তাব করিয়াছেন, "স্কুলের ছাত্রদিগকে স্কুলের সময়ে বিদ্যাসাগরী বা সাধু ভাষায় কথা কহিতে বাধ্য করা হউক।" সাধু প্রস্তাব, সন্দেহ নাই; কিন্তু কে বিড়ালের গলায়

এই ঘণ্টা বাঁধিবে? আর এই বীরেশ্বরী প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারে কাজ করিবার প্রবৃত্তিই বা শিক্ষক-সম্প্রদায়কে কে দিবে? আজকাল স্কুলের ছেলেদিগকে এক গাড়ী কেতাব পড়িতে হয়; ম্যাকমিলান কোম্পানী ও তাঁহাদের ভাড়াটে গ্রন্থকারদের অনুগ্রহে সেই সকল কেতাবে মা সরস্বতীর দুর্দ্দশার সীমা নাই; তাহা সামলাইতেই পণ্ডিত-মহাশয়দের নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়; তাহার উপর এই বীরেশ্বরী 'ফরমাস'! নব্যবাঙ্গলার লেখকেরা মাসিকপত্রিকাগুলিতে বাঙ্গলা ভাষাকে যে ভাবে নাস্তানাবুদ করিতেছেন, তাহার একটু প্রতীকার হইলেই আমরা বাঁচিয়া যাই; কম্বলের লোম বাছিয়া ফেলিতে বিলম্ব হইলেও ক্ষতি নাই। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের "তুমি" কবিতাটি ভাষা ও ভাবে শিশিরসিক্ত কুমুদের ন্যায় ঝলমল করিতেছে। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের "মুসলমান ঐতিহাসিকগণ" সুখপাঠ্য সন্দর্ভ। শ্রীরাজকুমার সেন "অয়নগতি" নামক প্রবন্ধে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি সকলে দন্তস্ফুট করিতে পারিবে না। শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ীর "বাঞ্ছিত" কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহের "কবি ও ঋষি" উপভোগ্য। রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চভূত যতীন্দ্রবাবুর চতুর্ব্বেদের কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। "হিন্দু সাহিত্য-প্রচারক" শ্রীবিনয়ভূষণ সরকারের রচনা। প্রবন্ধটি গৌহাটী সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল। সরকার মহাশয় পণ্ডিত লোক, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। তিনি একটু চেষ্টা করিলেই এই ক্রুটী সংশোধিত হইতে পারে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "বসন্তের বীণা" বাজাইয়াছেন। ইহা একটি অনূদিত গল্প। গল্পে এমন ফেনিল ভাষা সচরাচর দেখা যায় না। গল্পেও ভাষার সংযম অপরিহার্য্য। শ্রীরাজনারায়ণ দাসের "শুকতারা" এইবার শেষ হইল। লেখক লিখিয়াছেন,—"আমাদের কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে যাহা নাই, আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না, তাই মনে হয়, শুক্রগ্রহে জীবের বাস নাই।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, লেখক প্রবন্ধে এই সত্যের সন্ধান না বলিয়া দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "গৌড়কবি মদনবাল সরস্বতী" প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। ইহাতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীআনন্দনাথ রায়ের "রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ" চলিতেছে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসুর "সর্ব্বত্যাগী" চলনসই গল্প। যে বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব ছোট গল্পের প্রাণ, তাহা ইহাতে নাই। নায়ক-নায়িকার চরিত্রাঙ্কনেও কোনও কৌশলের পরিচয় পাইলাম না। শ্রীমতী আমোদিনী দেবী "আনন্দযোগে" প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। লেখিকা সুখ ও আনন্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—"সুখ কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এই জন্য সুখের পথে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পথে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের ভিতরে অপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহার-মূর্ত্তির ভিতর আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে, এই জন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে।" এই ভাষার গোলকধাঁধায় পড়িয়া সুখ ও আনন্দ উভয়েই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে।

বঙ্গদর্শন, চৈত্র।—"চরিতচিত্রে" শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ, তাঁহার কবিপ্রতিভা, তাঁহার অন্তর্মুখীনতা, তাঁহার মায়িক দৃষ্টি ও মায়াশক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে সকল বাঙ্গালী লেখক রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার সমস্ত রচনার মোসাহেবী করেন, এই প্রবন্ধ-পাঠে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব আশ্রিত-মাসিকে

তাহার অবতারণা দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি। তবে বিপিন বাবুর সহিত সকলে সকল বিষয়ে একমত হইবেন, সে আশা নাই। পক্ষান্তরে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ভবিষ্যতে বিপিন বাবুর মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত-পরিবর্ত্তন-বিষয়িণী-প্রতিভার সহিত বিপিন বাবুর প্রতিভার যে সাদৃশ্য আছে, বিপিনবাবু বোধ করি, বিনয়ের খাতিরেই তাহার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুলপরিশ্রমসহকারে "সাহিত্যে অনুপ্রাসের" দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের "নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র" নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস হইতে উদ্ধৃত অংশমাত্র উপভোগ্য। লেখক চাঁদ দেখাইবার জন্য লণ্ঠন জ্বালিয়াছেন। "হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা" ও "জবরদস্তীর লেখাপড়া" বিপিন বাবুর আর দুইটি রচনা। এবার বিপিন বাবু "বঙ্গদর্শনে"র ভাঙ্গা আসর রাখিয়াছেন। চৈত্রের "বঙ্গদর্শনে"র প্রায় অর্দ্ধেক বিপিন বাবুর রচনায় পূর্ণ। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া "বঙ্গদর্শনে"র সেই জটাধারীর ভাষায় কেহ বলিতে পারে,—

—"তুমি জানো কত রঙ্গ,
ধান ভানো, চিঁড়ে কোটো বাজাও মৃদঙ্গ!"

লেখক যতই প্রতিভাশালী হউন, তিনি যদি একখানি মাসিকের অর্দ্ধাংশ স্বয়ং পূর্ণ করেন, তাহা হইলে সে মাসিক 'একঘেয়ে' হইয়া পড়ে। "জবরদস্তীর লেখাপড়া"য় বিপিন বাবু যে সকল কথার আলোচনা, করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। কিন্তু প্রবন্ধ রচনা করিয়া কালের গতি রুদ্ধ করিবার উপায় নাই। শ্রীশশধর রায়ের "মানবের জন্মকথা" হোমিও-প্যাথিক 'ডোজে' বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ সুখপাঠ্য। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "মুগ্ধা" নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্পটি বোধ হয় এই সংখ্যায় শেষ হইল। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের "আরতি" শীর্ষক কবিতাটি চুঁচড়ার সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত হইয়াছিল।

সুপ্রভাত, জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষের "ম্যাডেম গ্যাঁয়োর জীবনের এক অধ্যায়" একটি সঙ্কলিত প্রবন্ধ; ধর্ম্মকথা যেরূপ সরল হইলে সাধারণের চিত্তকর্ষক হইতে পারে, প্রবন্ধটির ভাষা সেরূপ সরল নহে। "তাহারা বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে মানুষ শুধু হৃদয় দিয়াই, সে রূপ সেই হৃদয়কে বশীভূত করিয়া তাঁহার রাজ্যের উন্নতি করা যায়।" মন্তব্য, —অন্তর—অন্তরের দিকে দৃষ্টিপতিত হউক,—অন্তরের প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হউক। শুধু বুদ্ধির উদ্ভাবন নহে—ঈশ্বরের ভাব হইতে যাহার উৎপত্তি।"—এরূপ অচল বাঙ্গলা খৃষ্টান মিশনারীদের কাগজ ভিন্ন অন্য কোথাও চলিতে পারে না। শ্রী—স্বাক্ষরকারী লেখক বহু-কোটেসন-কণ্টকিত "ভারতবর্ষে মিতাচারের ইতিহাস" লিখিয়াছেন। ঋগ্বেদের সোমরস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক 'ধান্যেশ্বরী'র পর্য্যন্ত সংবাদ পাইলাম। লেখক উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"এই মদ্য প্রস্তুতে যে চাউল বার্লি ইত্যাদি নষ্ট হইতেছে, তাহাতে যে দেশের 'সমূহ' ক্ষতি হইতেছে, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন।" লেখক শুনিয়া সুখী হইবেন, আমাদের দেশে এখন চাউল বার্লি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য মদ্যোৎপাদনে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। গুড়ই এখন দেশী সরাপের প্রধান উপাদান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী ৪৫৫৫৯৫ গ্যালন মদ্য হজম করিয়াছিল; দশ বৎসর পরে ১৯০৪ অব্দে সুমার লইয়া দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালীর স্ফূর্ত্তির জন্য সাত লক্ষ গ্যালন মদ্য তাহাদের উদর-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। কোথায় সাড়ে চারি লক্ষ, আর কোথায় সাত লক্ষ! কিন্তু আক্ষেপ করিয়া ফল নাই; স্ফূর্ত্তি-লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষা দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, ১৯১৭ অব্দের সুমারে দশ লক্ষ গ্যালন ছাড়াইয়া উঠিবে। হাতে পয়সা

না থাকিলে এ অর্থব্যয়ের পরিমাণ কিরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে?—এই অজুহাতে ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী এক শ্রেণীর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক ইহা বাঙ্গালীর প্রসপেরিটীর অভ্রান্ত নিদর্শন বলিয়া দুই বাহু তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে কুণ্ঠিত হন না! কিন্তু আমরা দিন দিন কিরূপ অধঃপাতে যাইতেছি, কত দূর অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছি, ইহা তাহার অকাট্য প্রমাণ। 'সমূহে'র অর্থ অত্যন্ত নহে! শ্রীগণপতি রায়ের "চীনবাসী-গণের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব" এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইল। বর্ত্তমান সংখ্যায় লেখক অনেকগুলি মনীষী চৈনিক সাধু ও পরিব্রাজকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন "বিবিধজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি তাওউ সিং মহাশয় সিংচৌ নগরের অধিবাসী, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত নাম 'চন্দ্রদেব' কিরূপে হইল, লেখক তাহা বলিয়া দেন নাই। চীনভাষায় 'সিং চৌ' শব্দটির অর্থই কি চন্দ্রদেব? পূর্ব্ববঙ্গের উদীয়মান ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিক্রমপুরের স্থাপত্য-চিহ্ন' নামক প্রবন্ধে প্রত্নতত্ত্বের পঙ্কোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু এ জন্য মাতৃভাষাকে জবাই করিবার কি আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে দেশের প্রাচীন স্থাপত্য গৌরব চিহ্ন জীবিত থাকা অসম্ভব।" বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার অন্য কোনও ঐতিহাসিক 'চিহ্ন'কে জীবিত রাখিবার জন্য এমন অসাধ্যসাধন করেন নাই। এহেন 'খ্যাতিমান' বংশে স্বর্গীয় কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।" এইরূপ অদ্ভুত বাঙ্গালায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া লেখক শীঘ্রই 'খ্যাতিমান' হইবেন, সন্দেহ নাই। লেখক "সতী ঠাকুরাণী"র সতীত্ব-গৌরব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখনী পবিত্র করিয়াছেন। বঙ্গীয় লেখকগণ স্ব স্ব জেলার প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনীগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস পুষ্ট হইতে পারে। শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদারের "প্রত্যক্ষ" একটি চলনসই ক্ষুদ্র কবিতা। কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়—"ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই চতুর্দ্দশপদী কবিতার অবতারণা। "ফলের উপকারিতা" একটি অনূদিত প্রবন্ধ। লেখক বলেন, "যাঁহাদের মাংস খাওয়া অভ্যাস, তাঁহাদের বর্ণ সাধারণতঃ মলিন হয়, কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা ফলাহার করেন, তাঁহাদের বর্ণ উজ্জ্বল ও 'পরিস্কার' হয়।"—মাংসাহারে অভ্যস্ত বলিয়াই কি ইউরোপীয়গণের বর্ণ এত মলিন, আর আমাদের দেশের ফলাহারী তপস্বিগণ এমন ফুট-ফুটে সাদা? এই দারুণ গ্রীষ্মে অতিরিক্ত স্থূল লোকের বড় কষ্ট। লেখকের উপদেশ,—তাঁহারা প্রতিদিন তিন চারি গ্লাস লেবুর সরবৎ পান করুন, দেহের ওজন বহু পরিমাণে হ্রাস হইবে।" "আশীর্ব্বাদ" কবি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্রের ও "পাপপুণ্য" কবি শ্রীরমেশচন্দ্র বর্ম্মণের চারি ছত্রের চবৈতুহি। "ফলের উপকারিতা" নামক প্রবন্ধটির নীচে চারি ছত্র ধরিবার স্থান ছিল, সে স্থানটুকু খালি ফেলিয়া রাখিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীঅনুরূপা দেবীর ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপকথা "দ্বিপত্নীক" সাবানের ফেনার মত পুঞ্জ পুঞ্জ বুদ্বুদেব সৃষ্টি করিয়া পূর্ণতেজে অগ্রসর হইতেছে। ভাষা ফেনাইয়া তুলিবার ঘটা কত দেখুন, "নিজের ভিতরকার আস্বাচ্ছন্দ্যকে সে ছোট ছেলেটির মত করিয়াই দোলাইয়া দোলাইয়া শতছন্দে সান্ত্বনা রচনা করিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হার মানিয়াছে, তবুও যেন সে তাহার সেই একটু ক্রন্দনমাখা সুর কিছুতেই থামাইতে পারে নাই। সে আরও একটু সন্দেহে পড়িয়া গিয়া মনে করিল, হয় তো যামিনী তাহার কাজটা পছন্দ করে নাই।" বাঙ্গালা রচনার এই প্রকার উৎকট ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সাগরেদদিগের একচেটিয়া অধিকার, তাহা জানি; কিন্তু সাম্মার্জ্জনীর সাহায্যে এই আবর্জ্জনাস্তূপ নর্দ্দমায় নিক্ষেপ না করিয়া "সুপ্রভাতে"র সুশিক্ষিতা সম্পাদিকা কেন যে সযত্নে পত্রিকায় সঞ্চিত করিয়া পাঠকগণের সহিষ্ণুতায় দণ্ডাঘাত করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। যিনি 'অস্বাচ্ছন্দ্যকে ছোট ছেলেটির

মত দোলাইতে' পারেন, 'সান্ত্বনা রচনা করিতে' পারেন,। তিনি মহাকবি, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহার এই উচ্ছ্বাস রচনার খাতায় সমাহিত থাকিলে পাঠকগণের কোন ক্ষতি ছিল না।—"ইনি আমার খুব সম্মানিতা বন্ধু, যদিও আমরা দুজনে অনেকদিন বিচ্ছিন্ন হয়েছিলুম।"—দু জনে অনেক দিন বিচ্ছিন্ন হইলে কি 'সম্মানিতা বন্ধু'র বন্ধুত্বের সম্মান খাটো হইয়া যায় ? যদিও শব্দটি ব্যবহার করিবার সার্থকতা কি ?—"কিন্তু তথাপি স্বাবলম্বনের অত্যুগ্র সুখ প্রলোভন সমুদয় জীব-চিত্তকেই গোপন মায়াডোরে ভিতরে ভিতরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহারি ভাবময় উচ্ছ্বাসে সে এ অধীনতা পাশ নিজেদের মধ্যে এতদিন কিছুতেই যেন টানিয়া আনিতে পারিতেছিল না। নিজেদের মমতার ও একতার একান্ত অভাবে শেষে একদিন যখন তাহাকে একান্ত অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল, সেই সময় একটা দিব্য জ্ঞানজ্যোতি হঠাৎ তাহার ভরা চিত্তের অন্তরাল হইতে অন্ধকার কাটাইয়া ছিল।"—'দিব্য জ্ঞানজ্যোতি হঠাৎ হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ না করিলে এ হেঁয়ালীর কুজ্ঝটিকা কাটাইতে—অর্থ আবিষ্কার করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। শ্রীচারুহাসিনী দেবীর "করুণার প্রকাশ" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। "নারীজীবনের লক্ষ্য" শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর রচনা। ইহাতে কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না। শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী "ময়ূরভঞ্জের মহারাজ ৺শ্রীরাম-চন্দ্রের অপমৃত্যুর প্রসঙ্গে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেকেই জানেন, স্বর্গীয় মহারাজ নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু না লিখিলেও, যতটুকু লিখিয়াছেন, তাহাতেই স্বর্গীয় ময়ূরভঞ্জপতির চরিত্রগত বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। "আশ্বাস" শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্রের ছয় চরণের কবিতা। "ডাক্তার" দুই পৃষ্ঠার একটি বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্র গল্প, ইংরাজী গল্পের ছায়া লইয়া লিখিত। লেখকের নাম নাই।

———

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীবংশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শিশু।

চিত্রকর···র‍্যাফেল।

আর্য্য।

'কাহারা আর্য্য', এই কথা লইয়া পণ্ডিতসমাজে এখনও অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। ইউরোপে এরূপ বাদানুবাদ পণ্ডিতসমাজেই নিবদ্ধ থাকে, জনসমাজের তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদের দেশে পণ্ডিতসমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া জাতিবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বাদানুবাদের ঝঞ্ঝা জনসমাজকেও অনেক সময়ে আন্দোলিত করিয়া থাকে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; এবং সেইরূপ আলোচনার সূচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ঋগ্বেদে 'আর্য্য' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে 'আর্য্যে'র অর্থ,—ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী; এবং আর্য্যের প্রতিযোগী, 'অদেব' ও 'অব্রত'; অর্থাৎ, যাগযজ্ঞহীন 'দস্যু' বা 'দাস'। যথা—(৩৷৩৪৷৯)

"হত্বী দস্যূন্ প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ।"

"(ইন্দ্র) দস্যুগণকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।"

তার পর ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণ যখন 'আর্য্যবর্ণে'র স্থান লাভ করিল, তখন 'আর্য্য' শব্দের অর্থেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে এই অর্থান্তর প্রকাশ পাইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতার এক স্থলে (১৪৷২৮৷৩০) উক্ত হইয়াছে,—"ব্রহ্মাসৃজ্যত", [ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন], ক্ষত্রমসৃজ্যত" [ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন], এবং "শূদ্রার্য্যাবসৃজ্যেতাম্" [শূদ্রের ও অর্য্যের বা আর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন]। এক স্থলে (২৬৷২) "ব্রাহ্মণরাজন্যাভ্যাং; শূদ্রায় চার্য্যায় চ।" অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণকে, রাজন্যকে, শূদ্রকে এবং অর্য্যকে" একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে আছে (১৯৷৩২৷৮),—

"প্রিয়ম্। মা। দর্ভ। কৃণু। ব্রহ্মঃরাজন্যাভ্যাম্। শূদ্রায়। চ। আর্য্যায়। চ।"

"হে দর্ভ! তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, শূদ্র ও আর্য্যের প্রিয়পাত্র কর।"

এই কয়টি মন্ত্রে 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' শব্দ স্পষ্টই বৈশ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের ও অথর্ব্ববেদের কোনও কোনও স্থানে 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' শব্দ কেবল

'শূদ্র' শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে 'ব্রাহ্মণ' বা 'ক্ষত্রিয়' উল্লিখিত হয় নাই। যথা, অথর্ব্ববেদ (৪।২০।৪)—

"তয়া। অহম্। সর্বম্। পশ্যামি। যঃ। চ। শূদ্রঃ। উত। আর্য্যঃ॥"

"হে ঔষধি! (তোমাকে ধারণ করিয়া) আমি শূদ্র ও আর্য্য সকলকে দেখিতেছি।" অথর্ব্ববেদ (১৯।৬২।১)—

"প্রিয়ম্। মা। কৃণু। দেবেষু। প্রিয়ম্। রাজসু। মা। কৃণু।
প্রিয়ম্। সর্ব্বস্য। পশ্যতঃ। উত। শূদ্রে। উত। আর্য্যে॥"

"আমাকে দেবগণের, নৃপতিগণের, যাহারা দেখিতে পায়, তাহাদের সকলের, শূদ্রের ও আর্য্যের প্রিয়পাত্র কর।"

এই সকল স্থানে 'শূদ্র' শব্দের অর্থ-নিরূপণ করিয়া 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' শব্দের অর্থ অনুমান করিতে হইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শূদ্রের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে (৭।৩৫।৩)—"যে অন্যের আজ্ঞাবহ, যে অপর কর্তৃক যথেচ্ছ বিতাড়িত হইবার যোগ্য (কামোত্থাপ্য) বা বধ্য (যথাকামো বধ্যঃ)।" মীমাংসা-দর্শনে বিচারিত হইয়াছে, সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞে 'শূদ্র'ও দক্ষিণারূপে দেয় কি না? জৈমিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (৬।৭।৬)—

"শূদ্রশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাৎ।"

"পরিচারক শূদ্র দেয় নহে; কেন না, সে ধর্ম্মের শাসনানুসারে শুশ্রূষা করে।"

যে যথেচ্ছ 'উত্থাপ্য' ও 'বধ্য', এবং যজ্ঞের দক্ষিণারূপে দেয় কি না, যাহার সম্বন্ধে এরূপ বিতর্ক চলিত, সেই 'শূদ্রে'র অবস্থা পাশ্চাত্য জগতের 'স্লেভে'র (slave) বা দাসের সহিত তুলনীয়। মনুস্মৃতিতে শূদ্রের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা পাঠে মনে হয়, আদৌ 'শূদ্র' শব্দে কোনও স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইত না, দাস বুঝাইত। যথা,—

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায় বৈ হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥

* * * *

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥"—৮।৪১৩,৪১৪,৪১৭।

"শূদ্র ক্রীত হউক আর না হউক, তাহার দ্বারা দাস্য কর্ম্ম করাইবে। ব্রাহ্মণের দাস্য করিবার জন্যই শূদ্র বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে

"স্বামী বা প্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও শূদ্র দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কারণ, দাসত্ব তাহার স্বাভাবিক; কে তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারে?

* * * *

"ব্রাহ্মণ অসঙ্কোচে শূদ্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবেন; কারণ, তাহার নিজস্ব কিছুই নাই, প্রভু তাহার ধন গ্রহণ করিবেন।"

সুতরাং 'শূদ্রে'র পাশে যেখানে কেবল 'অর্য্য বা 'আর্য্য' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে 'অর্য্য' বা 'আর্য্যে'র অর্থ প্রভু বা স্বামী বুঝিতে হইবে।

বেদে যেমন 'অর্য' ও 'আর্য্য' একই শব্দের রূপান্তর বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা করা হয় নাই। 'নিঘণ্টু' নামক প্রাচীন বৈদিক অভিধানে (২।২২) 'অর্য্য' শব্দের অর্থ ঈশ্বর, এবং 'অর্য্যতি'র অর্থ 'গচ্ছতি' লিখিত হইয়াছে (২।১৪)। 'পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—"অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ" ॥৩।১।১০৩॥ অর্থাৎ, স্বামী ও বৈশ্য অর্থে গমনার্থক ঋ ধাতুর উত্তর যৎ করিয়া নিপাতনে 'অর্য্য' পদ সিদ্ধ হয়। ঋ ধাতুর উত্তর 'ণ্য' প্রত্যয় করিয়া 'আর্য্য' পদ সিদ্ধ হয়। পাণিনি আর একটি সূত্রে (৬।২।৫৮) কর্ম্মধারয়-সমাস-বদ্ধ 'আর্য্যব্রাহ্মণ' ও 'আর্য্যকুমার' এই দুইটি পদের স্বর-ব্যবস্থা করিয়া 'আর্য্য' শব্দের অর্থও সূচিত করিয়াছেন। 'আর্য্য' শব্দের অর্থ 'প্রাপ্তব্য', 'গন্তব্য', বা যাহার নিকট যাওয়া যায়, এমন ব্যক্তি। এই হিসাবে অমরকোষকার 'আর্য্য' শব্দের পর্য্যায় লিখিয়াছেন,—

"মহাকুল কুলীনার্য্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ।"

আবার বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ সংস্কৃত সাহিত্যেই 'আর্য্য' শব্দ ভাষাবিশেষের সংজ্ঞা, এবং সেই ভাষায় কথোপকথনকারিগণের সংজ্ঞা-রূপেও ব্যবহৃত দেখা যায়; এবং অনার্য্য ভাষাকে ম্লেচ্ছভাষা, এবং উহার ব্যবহারকারীকে 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা, মনুসংহিতা (১০।৪৫)—

"মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥"

ম্লেচ্ছ সম্বন্ধে "শতপথ ব্রাহ্মণে" উক্ত হইয়াছে (৩।২।১।২৩-২৪),—

"তেঽসুরা আত্তবচসো হেঽলবো হেঽলব ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ।
উপজিজ্ঞাস্যাং স ম্লেচ্ছস্তস্মান্ন ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছেৎ।"

"সেই অসুরগণ দেবভাষা (হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ) উচ্চারণ করিতে অশক্ত হইয়া 'হে অলবঃ হে অলবঃ' বলিতে বলিতে পরাভূত হইয়াছিল।

"যাহার অর্থ সন্দেহজনক, এরূপ ভাষা ম্লেচ্ছ (ভাষা), অথবা এরূপ ভাষা যে ব্যবহার করে, সে ম্লেচ্ছ। অতএব ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করিবে না।"

"মহাভাষ্যে" পতঞ্জলি এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন (১।১।১)—

"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবু স্তস্মাদ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছোহবং বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

মহাভাষ্য-কার এখানে অপশব্দকে ম্লেচ্ছভাষা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, এবং "ম্লেচ্ছ না হই, এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে", এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের অসম্মত প্রাকৃত ভাষাকেও ম্লেচ্ছভাষার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনে "ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্য" নামক একটি অধিকরণ আছে (১।৩।১০)। এই অধিকরণের সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী লিখিয়াছেন,—

"অথ যান্ শব্দান্ আর্য্যা ন কস্মিংশ্চিদর্থে আচরন্তি, ম্লেচ্ছাস্তু কস্মিংশ্চিদর্থে প্রযুঞ্জস্তে, যথা পিক-নেম-সত-তামরসাদিশব্দাঃ, তেষু সন্দেহঃ।"

সন্দেহ এই,—এই সকল শব্দ ম্লেচ্ছগণ যে অর্থে ব্যবহার করে, সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থ-কল্পনা করিতে হইবে? সিদ্ধান্ত,—ম্লেচ্ছগণের মধ্যে যে অর্থ প্রসিদ্ধ, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আর্য্যসমাজে অপ্রচলিত, ম্লেচ্ছসমাজে প্রচলিত, অথচ বেদে ব্যবহৃত, শব্দের মধ্যে শবর নিম্নোক্ত শব্দগুলি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—পিক (কোকিল), নেম (অর্দ্ধ), তামরস (পদ্ম), সত (দারুময় পাত্রবিশেষ)। শবর ম্লেচ্ছ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অভিযুক্ততরাঃ পক্ষিণাং পোষণে বন্ধনে চ ম্লেচ্ছাঃ।"

"ম্লেচ্ছগণ পক্ষী সকলের বন্ধনে ও পোষণে খুব পটু।" পক্ষিবন্ধনের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, অমরকোষ-কার যাহাদিগকে ম্লেচ্ছজাতি বলিয়াছেন, "কিরাত-শবর-পুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ",—সেই পর্ব্বত্য বর্ব্বরগণকেই শবর ম্লেচ্ছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট "তন্ত্রবার্ত্তিকে" জৈমিনির এই সূত্রের বার্ত্তিকে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণকে আর্য্য, এবং তাহাদের ভাষাকে আর্য্য-ভাষা বলিয়াছেন, এবং দ্রাবিড় ভাষাকে ম্লেচ্ছভাষা, এবং পারসীক, যবন, রোমক ও বর্ব্বরগণকে ম্লেচ্ছ জাতির শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত মনু-বচনের ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন—"অসদবিদ্যমানার্থ-সাধুশব্দতয়া বাক্ ম্লেচ্ছোচ্যতে। যথা শবরাণাং কিরাতাণামন্যেষাং বান্ত্যা-নাম্। আর্য্যবাচ আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ।"

ইরাণের বা পারস্যের অধিবাসিগণও এক সময়ে আপনাদিগকে 'অইর্য্য' বলিতেন, এবং অবেস্তা গ্রন্থে 'অইর্য্য' শব্দ পাওয়া যায়।

পারস্যসম্রাট দরয়স (Darius) শিলালিপিসমূহে 'আইর্য্য' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

'অর্য্য' বা 'আর্য্য' শব্দের প্রয়োগের যে সকল দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল, তাহা হইতে দেখা যায়, আদৌ 'আর্য্য' শব্দ বৈদিক সভ্যতার জন্মভূমি পঞ্চনদ প্রদেশের দেবোপাসকগণের ও ইরাণের অহুরমজদ-উপাসকগণের সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইত। চতুর্বর্ণের অভ্যুদয় হইলে, 'অর্য্য' বা 'আর্য্য' শব্দ আর্য্যাবর্ত্তে কখনও বৈশ্য অর্থে, কখনও বা ক্রীতদাসতুল্য শূদ্রের প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হইত, এবং সেই সূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণ বুঝাইত। পরে 'অর্য্য' শব্দ সংজ্ঞাশব্দের ন্যায় প্রভু ও বৈশ্য অর্থে, এবং 'আর্য্য' শব্দ যৌগিক পূজনীয়, সভ্য, বা সজ্জন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভাষার হিসাবে আদৌ সংস্কৃতব্যাকরণবিরুদ্ধ অপশব্দের প্রয়োগকারিমাত্রই ম্লেচ্ছ বা অনার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। পরে আর্য্যাবর্ত্তবাসী ও আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাভাষি-মাত্রই আর্য্য, এবং আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগের অধিবাসী এবং এই আর্য্যগণের অবোধ্য ভাষাভাষিগণ ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন 'আর্য্য' শব্দের সহিত নূতন অর্থের যোজনা করিয়াছেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্‌স সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, টিউটনিক, কেল্‌টিক প্রভৃতি ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, এবং এই সকল ভাষা একই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সার উইলিয়ম জোন্‌স্ এই বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর কোনও নামকরণ করিয়া যাইবার অবসর নাই। পরবর্ত্তী কালের পণ্ডিতগণের কেহ বা এই ভাষাগোষ্ঠীকে 'ইন্দু-ইউরোপীয়' (Indo-European), কেহ বা 'ইন্দু-জার্ম্মনিক' (Indo-Germanic) নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ম্যাক্‌সমুলার এই ভাষাগোষ্ঠীকে 'আর্য্য' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্যে 'আর্য্য' শব্দকে স্থানদান করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ম্যাক্‌সমুলারের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা এই বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীকে

ইন্দু-ইউরোপীয় নামেই অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু ম্যাক্‌সমুলারের নাম-করণ হইতে এক অনর্থের সূচনা হইয়াছে। আর্য্য 'ভাষাগোষ্ঠী'র নামানুসারে আর্য্য 'রেস' (Race) নামে একটা স্বতন্ত্র জাতি বা মানব-বংশ কল্পিত হইয়াছে, এবং সেই আর্য্য-বংশের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি লইয়া পণ্ডিতসমাজে ঘোর বাদানুবাদ চলিতেছে।

'রেস' ভাষাবিজ্ঞানের কথা নহে, জীববিজ্ঞানের কথা। এক প্রকার জন্তুর মধ্যে আকৃতিগত স্থায়ী বা বংশানুযায়ী লক্ষণের ভেদানুসারে যে শ্রেণীভেদ হয়, তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর নাম 'রেস'। বর্ণিয়ার, লিনিয়স, ব্লুমেনবেচ, কিউভিয়ার প্রভৃতি আচার্য্যগণ মানবাকৃতির এইরূপ বংশানুযায়ী লক্ষণের ভেদানুসারেই মনুষ্য জাতিকে বিভিন্ন 'রেসে' বিভাগ করিবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ অবধি এক দল পণ্ডিত প্রচার করিতেছেন যে, ভাষাভেদানুসারে মানুষের 'রেস' বিভাগ করিতে হইবে। ম্যাক্‌সমুলার আর্য্য-ভাষাগোষ্ঠীপ্রসঙ্গে কখনও কখনও 'আর্য্য রেস' কথাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। সুতরাং 'আর্য্য রেস্' অর্থাৎ আর্য্যবংশ লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, তাহাতে 'আর্য্য-রেস্'-কল্পনার দোষ ম্যাক্‌সমুলারের স্কন্ধেই আরোপিত হইল। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভাষা-বিজ্ঞানের ও মানবাকৃতি-বিজ্ঞানের এইরূপ অসঙ্গত মিশ্রণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে * ম্যাক্‌সমুলার লিখিয়াছেন,—

"Aryas are those who speak Aryan languages, whatever their colour, whatever their blood. In calling them Aryas we predicate nothing of them except that the grammar of their language is Aryan."

এই গ্রন্থের আর এক স্থানে ম্যাক্‌সমুলার লিখিয়াছেন,—

"I have declared again and again that if I say Aryas, I mean neither blood nor bones, nor hair, nor skull; I mean simply those who speak an Aryan language"......To me an ethnologist who speaks of Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary or a brachycephalic grammar."

ইহার মর্ম্ম এই,—আর্য্য বলিলে ম্যাক্‌সমুলার আর্য্যভাষা-ভাষীই বুঝিয়া থাকেন। তিনি আর্য্যবংশ, আর্য্যশোণিত, বা আর্য্য আকৃতি বুঝেন না। ম্যাক্‌সমুলারের মতে, 'আর্য্যবংশ' বা 'আর্য্যজাতি' প্রভৃতি শব্দ 'কাঁঠালের আমসত্ত্বে'র মত অর্থশূন্য।

---

* Biography of words and the Home of the Aryas.

নবপ্রকাশিত "মানব-বিজ্ঞানের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের * লেখক ডাক্তার হেডন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"The protest was in vain. The belief in an 'Aryan race' became an accepted fact both in linguistics and in ethnology, and its influence vitiates the work of many anthropologists even at the present day.

"Naturally the question of the identity of the Aryan race was soon a subject of keen debate. The French and German schools at once assumed opposite sides, the Germans claiming that the Aryans were tall, fair, and long-headed, the ancestors of the modern Teutons; and the French, mainly on cultural evidence, claiming that language, together with civilisation, came into Europe with the Alpine race, which forms such a large element in the modern French population."

অর্থাৎ, 'আর্য্য' শব্দের অপব্যবহার সম্বন্ধে ম্যাক্‌সমুলার প্রমুখ পণ্ডিতগণের আপত্তিতে কোনও ফল হয় নাই। 'আর্য্যবংশ' বা 'আর্য্যজাতি'তে বিশ্বাস এখনও অনেক ভাষাতত্ত্ববিদের ও জাতিতত্ত্ববিদের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। আর্য্যজাতির আকৃতি কিরূপ ছিল, এই প্রশ্ন লইয়া ঘোর বাদানুবাদ চলিতেছে। জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—আদিম আর্য্যগণ আকারে দীর্ঘকায়, শ্বেতাঙ্গ ও দীর্ঘকরোটীবিশিষ্ট, অর্থাৎ জর্ম্মণগণের অনুরূপ ছিলেন। ফরাসী পণ্ডিতেরা দেখাইতে চাহিতেছেন,—আদিম আর্য্যগণ আকারে ফরাসীদের অনুরূপ ছিলেন। অধ্যাপক রিজোয়ে (Ridgeway) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন,—ইউরোপের জর্ম্মণ (টিউটন), ফরাসী ও গ্রীক, ইটালীয় ও স্পেনদেশীয়ের মধ্যে যে আকৃতিভেদ লক্ষিত হয়, তাহা বংশভেদ-মূলক নহে, বাসভূমির জলবায়ুর ভেদমূলক। সুতরাং আকারভেদানুসারে বংশভেদ বা শোণিতভেদের কল্পনা কর্ত্তব্য নহে। ভাষার হিসাবেই মানবের বংশবিভাগ সঙ্গত। যাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আকারগত ভেদ থাকিলেও, তাঁহাদিগকে একবংশোদ্ভব মনে করা উচিত। এই হিসাবে যাঁহারা চিরকাল আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই আর্য্যবংশোদ্ভব। †

ভারতীয় জাতিতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের মধ্যে সিভিলিয়ান রিসলি জর্ম্মণপণ্ডিতগণের মতানুসারে আদিম আর্য্য দীর্ঘকায়, শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ

---

* A. C. Haddon's History of Anthropology, London, 1910, p. 146.

† The Journal of the Anthropological Institute. Vol. XL, 1910. pp. 10—22.

করোটীবিশিষ্ট ধরিয়া লইয়া ভারতবাসিগণের আকৃতিগত জাতিবিভাগ করিয়াছেন। রিসলির মত মানবতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আদরলাভ করে নাই, এবং এ দেশেও স্কুলপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে এখনও স্থানলাভ করে নাই। স্কুলপাঠ্য ভারতেতিহাসে পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্‌গণের মতই চলিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদে পাশাপাশি আর্য্য ও দস্যু, বা দাস, এবং যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে পাশাপাশি অর্য্য বা আর্য্য ও শূদ্র উল্লিখিত দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের আর্য্যবংশীয় ঔপনিবেশিকগণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণ উৎপন্ন, এবং আদিম অধিবাসী দস্যুগণের বংশে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি। চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত, এবং অপর দিকে কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন আর কোনও বর্ণ বিদ্যমান নাই, স্মৃতিনিবন্ধকারগণের এই মত। এই উভয় মতের অসঙ্গত মিশ্রণ হইতে "আর্য্য কাহারা" এই সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রসূত হইয়াছে। অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে, ব্রাহ্মণগণ আর্য্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন্ন অন্যান্য হিন্দুগণ অনার্য্য। এই মতের যথোচিত সমালোচনা করিতে গেলে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাসের আলোচনা করা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এরূপ আলোচনার স্থানাভাব। কিন্তু ঋগ্বেদে যাঁহারা "আর্য্য" বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে একরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ও একদেশোদ্ভব ছিলেন কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ঋগ্বেদে দুই শ্রেণীর লোক 'আর্য্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন; এক শ্রেণী—অথর্ব্বা, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গোতম, কশ্যপ, অগস্ত্য, কণ্ব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষির বংশধরগণ। আর এক শ্রেণী—যদু, তুর্বস, অনু, পূরু, দ্রহ্যু, ক্রিবি, রুশম, চেদি, ভরত-ত্রিৎসু, সৃঞ্জয় প্রভৃতি বংশীয় যোদ্ধা বা যজমানগণ। এই সকল আর্য্যগণ ঋগ্বেদে আপনাদিগকে একই বীজপুরুষের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন নাই। যদিও ঋষিরা অনেক স্থলে বৈবস্বত মনুকে 'পিতা মনু' বা 'আমাদের পিতা', অর্থাৎ মানবজাতির বীজপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের মধ্যে অধিকাংশকেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেববংশাবতংস বলা হইয়াছে। এক স্থলে (ঋগ্বেদ ৪।২।১৫) আঙ্গিরসগণকে "দিবস্পুত্রঃ" বলা হইয়াছে। আর এক স্থলে (১০।৬২।৫)—

"তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ"

আঙ্গিরসগণ অগ্নির সন্তান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের একটি সূক্তে (৭।৩৩।১১—১৩) মিত্র ও বরুণ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে—(৫।১১।১১) বরুণ অথর্ব্বা ঋষির জন্মদাতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভৃগুকে 'বারুণি' বা বরুণের পুত্র বলা হইয়াছে। অঙ্গিরা, ভৃগু ও অত্রির জন্ম সম্বন্ধে শৌনকের "বৃহদ্দেবতা"য় বর্ণিত হইয়াছে (৬।৯৭—১০১)—প্রজাপতি এক সময় তিন বৎসর ব্যাপী একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে বাগ্দেবী ভারতী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতীকে দেখিয়া প্রজাপতি ও বরুণের বীর্য্য স্খলিত হইয়াছিল। বায়ু সেই বীর্য্য যজ্ঞাগ্নির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই অগ্নি হইতে ভৃগু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এবং ভারতীর অনুরোধে প্রজাপতি অত্রিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। কণ্ব ও বিশ্বামিত্র, এই দুই জন গোত্র-প্রবর্ত্তক বৈদিক ঋষি সম্বন্ধে এরূপ কোনও আখ্যান প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে, দুই জনই ক্ষত্রিয়-বংশজাত ব্রাহ্মণ, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৭) বিশ্বামিত্র 'রাজপুত্র' ও 'ভরত-ঋষভ', অর্থাৎ ভরতবংশীয়-(ক্ষত্রিয়)-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে কণ্বকেও ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে,—(৪।১৯।১০) পূরুর বংশে অজমীঢ় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ কণ্বাৎ মেধতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।" ঋগ্বেদোক্ত যদু, অনু, পূরু প্রভৃতি বংশীয় যোদ্ধগণ পরবর্ত্তী কালে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণে ইঁহারাই বৈবস্বত মনুর বংশধর বলিয়া বর্ণিত। ক্ষত্রিয়-গণের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা বৈবস্বত-মনুসম্বন্ধীয় বৈদিক-কাহিনী-মূলক।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখিতে গেলে ঋষিগোত্রনিচয়ের ও অন্যান্য গোত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কল্পিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কল্পিত হইলেও এই সকল উপাখ্যান একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই সকল উপাখ্যান হইতে জানা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদোক্ত আর্য্যগণ আপনাদিগকে এক বীজপুরুষ হইতে উৎপন্ন, বা এক-বংশোদ্ভব

বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না; অর্থাৎ, আর্য্য শব্দটি তাঁহারা বংশ বা 'রেস্' অর্থে ব্যবহার করিতেন না।

মানবতত্ত্ববিদেরা যেরূপ আকারগত ভেদ থাকিলে কোনও জনসঙ্ঘকে এক 'রেসে'র সামিল মনে করিতে চাহেন না, বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে এরূপ আকারগত ভেদও বর্ত্তমান ছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (৭।৩৩।১) বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ "শ্বিত্বং চ" বা শ্বেতাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং আর একটি সূক্তে (১০।৩১।১১) কণ্ব 'শ্যাব' অর্থাৎ শ্যামবর্ণ বা 'কৃষ্ণ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে প্রকৃত শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পতঞ্জলির "মহাভাষ্যে"ও পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের লক্ষণ-প্রসঙ্গে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন (পাণিনি ২।২।৬; ৫।১।১১৫)—"গৌরঃ শুচ্যাচারঃ পিঙ্গলঃ কপিলকেশঃ ইত্যেতানপ্যভ্যন্তরান্ ব্রাহ্মণ্যে গুণান্ কুর্ব্বন্তি।" ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ ও কপিলকেশ, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গগণের মত কটাচুল হইতে পারে, এ কথা "মহাভাষ্যে"র "প্রদীপ"-কার কৈয়ট বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাই তিনি গৌরত্বাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে কল্পান্তরে প্রেরণ করিয়াছেন। যথা,—

"গৌরত্বাদয়ো ব্রাহ্মণস্য পুরাকল্পদর্শনেনাদ্যত্বেপি ক্বচিত্তদন্বয়দর্শনেন ব্যঞ্জকা ইতি।"

এক আধটি গৌরবর্ণ ও কপিলকেশ লোক থাকিলে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। এরূপ শ্বেতাঙ্গ পরিবার এখনও এ দেশে কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু পতঞ্জলি গৌরত্ব ও কপিলকেশত্ব ব্রাহ্মণ্যের সাধারণ লক্ষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদোক্ত বশিষ্ঠ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের "শ্বিত্বং চ", এবং পতঞ্জলির এই উক্তি একত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, বৈদিক আর্য্য-সমাজে এক দল লোক শ্বেতাঙ্গ ছিল; এবং কণ্বের "শ্যাব" বিশেষণ হইতে দেখা যায়, আর এক দল শ্যামাঙ্গ ছিল। শ্যামাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ জনসঙ্ঘের মধ্যে নিকট জ্ঞাতিত্বের কল্পনা কঠিন। এই নিমিত্তই হয় ত আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা বরুণ, প্রজাপতি, বা অগ্নির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, এবং শ্যামাঙ্গ আর্য্যগণকে বৈবস্বত মনুর বংশধর সাধারণ মানবের শ্রেণীতে গণনা করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক আর্য্যসমাজে এক দল শ্যামাঙ্গ লোক যে ছিল, তাহার আর এক প্রমাণ,—শ্যামাঙ্গ-অধিষ্ঠিত পশ্চিম এসিয়া হইতে কতক ঔপনিবেশিক পঞ্চনদ

প্রদেশে আগমন করিয়াছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে যাদবগণ ও তুর্ব্বসগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (৬।২০।২)—

"প্রবৎসমুদ্রমতিশূর পর্ষি পারয়া তুর্ব্বসং যদুং স্বস্তি।"

"হে শূর (ইন্দ্র)! যখন তুমি (সমুদ্র) পার হইয়াছিলে, তখন তুর্ব্বস ও যদুকে সমুদ্র পার করিয়া আনিয়াছিলে।" আর একটি সূক্তে আছে (৬।৪৫।১)—

"য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্ব্বসং যদুং ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা।"

"যে ইন্দ্র দূর হইতে সুনীতিবলে তুর্ব্বস ও যদুকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের যুবক বন্ধু।" এই সমুদ্র অবশ্যই আরবোপসাগর, বা পারস্যোসাগর, এবং এই দূরতর দেশ পশ্চিম এসিয়ার কোনও প্রাচীন সভ্য জনপদ।

এই সকল প্রমাণ হইতে দেখা যায়, যাঁহারা "আর্য্য" নামের আবিষ্কারক, সেই ঋগ্বেদোক্ত আর্য্যগণ আপনাদিগকে এক বীজপুরুষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের মধ্যে যেরূপ আকারভেদ বিদ্যমান ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগকে একবংশোদ্ভব বলা যায় না। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণ হয় ত কোনও শীতপ্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এবং শ্যামাঙ্গ আর্য্যগণ গ্রীষ্মপ্রধান পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। অবশ্যই এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই দুই আকারের আর্য্যের এক দল প্রকৃত আর্য্য; এবং অপর দল আদৌ অনার্য্য ছিলেন, পরে আর্য্যের ভাষা ও আর্য্যের আচার গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। আরও বলা যাইতে পারে যে, শ্বেতাঙ্গ ও কপিলকেশ ঋষিগণই আদৌ আর্য্য ছিলেন, এবং পরে শ্যামাঙ্গ আগন্তুকগণকে আর্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল কথা স্বীকার করিতে গেলেও বলিতে হয়, কণ্বের ও বিশ্বামিত্রের ঋষিত্ব-লাভের ফলে শ্বেতাঙ্গ ঋষির আর্য্যশোণিত প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পঙ্কিল হইয়া গিয়াছিল। ঋগ্বেদের আমোল হইতে 'আর্য্য' আর বংশের নাম ছিল না; একভাষাভাষী একাচারী জনসঙ্ঘের নামে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সেই হিসাবেই কুমারিল ভট্ট ও মেধাতিথি প্রভৃতি মনীষিগণ 'আর্য্য' নাম আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যিনি 'আর্য্য' নামটি পণ্ডিতসমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, সেই ম্যাক্‌সমুলারও ভাষার হিসাবে আর্য্যভাষাভাষিমাত্রকেই

'আর্য্য' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আর্য্যাবর্ত্তবাসী ; প্রকৃত হইলেও, কোনও সুদূর অতীতে বিলীন আর্য্যশোণিতের ধূয়া ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের এখন উচিত যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যভাষাভাষিমাত্রকেই আর্য্য-ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করি। *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বর্ষা-প্রাতে।

১

প্রভাত প্রশান্ত স্থির ;
সম্মুখে বিহগ-নীড়,
বিহগী পড়িয়া তরুমূলে,—
ঘোলা চোখ, কাদা-মাখা পাখা দু'টা তুলে'।

২

অন্ধক শাবকগুলি,
জিহ্বা মেলি', মুখ তুলি',
নড়ে চড়ে, চীৎকারে কাতরে—
প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্ম্মরে।

৩

হৃদয় কেমন করে—
শিশুগুলি মনে পড়ে।
আশঙ্কায় ঘরে ছুটে যাই,
চাপিয়া—চাপিয়া বুকে, মুখে চুমো খাই।

৪

মরেছে তাহার দেহ,
মরে নি ত প্রেম-স্নেহ—
রেখে যেন গেছে সমুদয় !
সেই ক্ষুদ্র সুখ, দুখ, আশা, তৃষা, ভয়।

---

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কামাখ্যা অধিবেশনে পঠিত।

৫

তারি হৃদি হৃদে ধরি'
তারি গৃহকার্য্য করি ;
প্রতিকার্য্যে স্মরি অনুক্ষণ,
মরমে মরমে কাঁদি, মুছি দু' নয়ন।

৬

সদা কাছে কাছে রই,
কত হাসি, কত কই,
রাখি চোখে চোখে, কোলে কোলে,
কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে।

৭

তেমনি পাতিয়া কোল
দিতেছি আদর-দোল—
কত সুরে করি গুন্‌গুন্‌ !
দিন দিন আমি কত স্নেহে সুনিপুণ !

৮

ভালবাসি বুক পূরে,
তবু তারা দূরে দূরে ;
প্রাণ পূরে তেমন না হাসে !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে তারে খোঁজে আশেপাশে।

৯

বকাবকি ঘুষাঘুষি—
কভু যদি আমি রুষি,
এক জোটে সবে ওঠে কাঁদি' ;
আমি শেষে অপরাধী, জনে জনে সাধি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বংশানুক্রম।

৩

যে সাদৃশ্য ও বৈষম্যের নাম বংশানুক্রম, তাহার হেতু পশ্চাৎ আরও বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এখন হইতেই এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বংশরক্ষক কোষের মধ্যে যে জীব-বস্তু আছে, তাহাতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু অথবা দানা আছে; এবং কেন্দ্র-বিন্দু নামে প্রধান ও অপেক্ষাকৃত বড় একটি বিন্দু আছে।

এক্ষণে বংশানুক্রম কত প্রকার হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

আমরা কখনও কখনও জন্তুতে উদ্ভিদে বিভিন্নপ্রকার বংশানুক্রম দেখিতে পাই।

প্রকার-ভেদ।

যদ্যপি কতকগুলি দীর্ঘকায় ব্যক্তির পুত্রগণকে পরিমাপ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ঐ পুত্রগণের দৈর্ঘ্য নানাপ্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘকায় ও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দীর্ঘকায় পিতার মধ্যবর্ত্তী নানাপ্রকার দৈর্ঘ্য ঐ পুত্রগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। আবার যদি দীর্ঘ পুরুষ ও খর্ব্ব রমণীর সংস্রবে অপত্য জাত হয়, সেই অপত্য-গণও নানা প্রকার দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোনও অপত্য অধিক দীর্ঘ, এমন কি, পিতা হইতেও অধিক; কেহ বা তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম, কেহ আরও কিঞ্চিৎ কম, এইরূপ দৃষ্ট হয়। এ এক প্রকার বংশানুক্রমের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মটর গাছও দুই প্রকার আছে; এক প্রকার লম্বা, এক প্রকার খর্ব্ব। এই দুই প্রকার মটরের ফুলের পরাগরেণু গর্ভকেশরে মিশাইয়া দিলে যে সকল বীজ উৎপন্ন হয়, ঐ বীজের গাছ পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, কতকগুলি গাছ লম্বা ও কতকগুলি খর্ব্ব হইয়া থাকে। মাঝামাঝি নানাবিধ প্রকারের দৈর্ঘ্য হয়ই না। ঐ গাছগুলি কেবল দীর্ঘ ও খর্ব্ব, ঐ দুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মানবের বংশানুক্রম এক প্রকার; মটরের বংশানুক্রম অন্য প্রকার। সুতরাং জীবরাজ্যে বংশানুক্রমের প্রক্রিয়া নানাবিধ, ইহা সহজেই জানা যায়।

বংশানুক্রম প্রধানতঃ ত্রিবিধ। মিশ্র, অমিশ্র, এবং উভ-চিহ্নিত। কোনও

একটি লক্ষণ পিতার ও মাতার যেরূপ থাকে, অপত্যে যদ্যপি তাহা মিশিয়া গিয়া মাঝামাঝি, অথবা পৃথক এক প্রকার হইয়া উঠে, তবে তাহাকে মিশ্র বংশানুক্রম বলা যায়। যেমন শ্বেতবর্ণ পিতা ও কৃষ্ণবর্ণা মাতার অপত্যের কটা বর্ণ হয়। আবার যদি অপত্যের এক অবস্থায় পিতৃলক্ষণ, অন্য অবস্থায় (সেই স্থলেই) মাতৃলক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহাকেও মিশ্র বংশানুক্রম বলে। যেমন শান্ত অবস্থায় অপত্যের মুখ পিতার ন্যায়, কিন্তু ক্রুদ্ধাবস্থায় মাতার ন্যায় হওয়া কখনও কখনও দেখা যায়। যে সকল স্থলে পিতার অথবা মাতার লক্ষণের প্রবলতা হেতু অপত্যে পিতার অথবা মাতার লক্ষণমাত্র প্রকাশিত হয়, উভয়ের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না, সে সকল স্থলে অমিশ্র বংশানুক্রম বলা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে পিতৃ-মাতৃ-লক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া যায়। উপরে যে মটরের উল্লেখ করিয়াছি, উহা অমিশ্র বংশানুক্রমের লক্ষণ। কিন্তু অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়া থাকে যে, অপত্যে প্রথমতঃ মিশ্র বংশানুক্রম প্রকাশিত হইয়া পরবর্ত্তী বংশে পিতৃ-মাতৃ-লক্ষণ পৃথক হইয়া যায়; তখন অমিশ্র বংশানুক্রম প্রকাশ পায়। ইহাকে মেণ্ডেলের বিধান বলে। এ বিষয় পশ্চাৎ আলোচিত হইবে। উভ-চিহ্নিত বংশানুক্রমের স্থলে পিতার লক্ষণ ও মাতার লক্ষণ দুইই পৃথকরূপে অপত্যে প্রকাশিত হয়। ঐ উভয় লক্ষণ মিশ্রিতও হয় না, একের প্রাবল্য হেতু অপরটি লুপ্ত হইয়াও যায় না। একটি কুকুরের এক চক্ষু পিতার ন্যায়, অপর চক্ষু মাতার ন্যায় হইয়াছিল। আমার একটি বিড়ালের ছানার মস্তকের বর্ণ পিতার ন্যায়, এবং দেহের অবশিষ্টাংশের বর্ণ মাতার ন্যায় হইয়াছিল। এরূপ স্থলে পিতা ও মাতা উভয়ের লক্ষণই প্রকাশিত হয়, কিন্তু পৃথকরূপে।

বংশানুক্রম ত্রিবিধ।

এইরূপে বুঝা যায় যে, বংশানুক্রম যাহার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ শুক্র-শোণিত, যাহাকে পূর্ব্বে স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ বলিয়াছি, তন্মধ্যস্থ উপকরণ কখনও ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়; কখনও একে অপরকে পরাভূত করে; তখন ঐ অপরটি লুপ্ত অথবা পরিত্যক্ত হয়; এবং কখনও বা উভয়েই পৃথক্‌ভাবে স্ব স্ব শক্তি প্রকাশিত করে।

জীবরাজ্যে কখনও কখনও দেখা যায় যে, অপত্যের কোনও একটি লক্ষণ অতি দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় হইল। ইহাকে পুনরাবৃত্তি বলা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে, ঐ লক্ষণটি দীর্ঘকাল লুপ্ত হইয়া থাকিবার পর, প্রকাশিত হইল; কিংবা ঐ লক্ষণ খণ্ডিত হইয়া ভিন্ন

পুনরাবৃত্তি।

ভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল, বহুবংশ পরে ঐ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংমিশ্রণে পুনরায় উৎপন্ন হইল,—এই উভয় প্রকারই বলা যাইতে পারে। নানাবর্ণের পারাবত একত্র রাখিয়া স্বাধীনভাবে বংশবৃদ্ধি করিতে দিলে, উহাদিগের অপত্য-শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে, অনেকগুলি আস্‌মানী রঙ্গের হইয়াছে। ঐ রং যে সকল উপকরণে প্রস্তুত হয়, পিতৃ-মাতৃ-দেহে তাহা পৃথক্‌রূপে বিদ্যমান ছিল। অপত্য-শ্রেণীতে সে সকল মিশ্রিত হইয়া আস্‌মানী রং উৎপন্ন করিল। অনেক স্থলে বহুপুরুষ-পূর্ব্বে যে লক্ষণ ছিল, অপত্যে পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক কারণবশতঃ তাহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহাকে প্রকৃত পুনরাবৃত্তি বলি না। প্রকৃত পুনরাবৃত্তি বংশগত ; বাহ্যিক কারণ হইতে উদ্ভুত নহে।

বংশানুক্রম প্রধানতঃ যে তিন প্রকার হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ঐ ত্রিবিধ বংশানুক্রমই কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া চলে। তন্মধ্যে গুরুতর কয়েকটির এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

বংশানুক্রমের নিয়ম।

কখনও কখনও কতিপয় লক্ষণ লিঙ্গগত হইতে দেখা যায়। নাসিকার রক্তস্রাব, বর্ণান্ধতা ইত্যাদি পুংজাতীয় অপত্যে সংক্রমিত হয় ; কিন্তু স্ত্রীজাতীয় অপত্যের মধ্য দিয়া সংক্রমিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির ঐ সকল লক্ষণ থাকিলে, তাঁহার দৌহিত্রে উহা প্রকাশিত হইতে পারে ; কিন্তু কন্যায় প্রকাশিত হয় না। এ সকল লক্ষণ পুরুষের ; কিন্তু স্ত্রীজাতির যোগে সংক্রমিত হয়। অথচ স্ত্রীজাতির দেহে প্রকাশিত হয় না। আবার কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় যে, স্ত্রীজাতীয় অথবা পুংজাতীয় পূর্ব্বপুরুষের কোনও এক লক্ষণ পর-পর-বংশে তত্তৎ জাতিতে উৎপন্ন হইল ; অর্থাৎ, পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তীর লক্ষণ পুরুষ পরবর্ত্তীতে, এবং স্ত্রী পূর্ব্ববর্ত্তিনীর লক্ষণ স্ত্রী পরবর্ত্তিনীতে সংক্রমিত হইল। কখনও বা এ নিয়মের ব্যভিচারও দেখা যায়। অধিক অঙ্গুলি থাকিলে তাহা পুংজাতীয় অপত্যেই অনেক স্থলে সংক্রমিত হয় ; স্ত্রীজাতীয় অপত্যে তদ্রূপ নহে। কখনও বা এক জাতিতে সংক্রমিত হইতে হইতে অন্য জাতিতেও চলিয়া যায়। এ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী প্রমাণ অনেক আছে। সে সকলের সমালোচনা করিয়া ডারুইন্‌ মীমাংসা করিয়াছেন যে, (স্ত্রী অথবা পুরুষ) যে জাতীয় পূর্ব্বপুরুষে এই শ্রেণীর লক্ষণ অধিক বয়সে প্রথম উৎপন্ন হয়, সেই জাতীয় পরবর্ত্তীর দেহে উহা সংক্রমিত হওয়া অধিক সম্ভব। কিন্তু অল্পবয়স্ক পূর্ব্বপুরুষে প্রথম উৎপন্ন হইলে, উভয়-জাতীর পরবর্ত্তীতেই তাহা সংক্রমিত হইতে পারে। এইরূপ বংশানুক্রমকে লিঙ্গগত বংশানুক্রম বলা যায়।

আর এক প্রকার বংশানুক্রম আছে; তাহা বয়োগত। এরূপ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তীতে যে বয়সে কোনও একটি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, পরবর্ত্তীতে উহা প্রকাশিত হইলে, সেইরূপ বয়সেই হইয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, এক জনের পিতার বাম পদযষ্টিতে ৪০ বৎসর বয়সে একটি দাগ উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহার পুত্রেরও ঐ বয়সেই, অর্থাৎ ৪২।৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ঐ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কতিপয় পীড়া পিতা ও পুত্রে এক বয়সেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। একটি পরিবারে পিতামহ, পিতা ও পুত্রদ্বয়, সকলেই ৪০ বৎসর বয়সে বধির হইয়াছিল। আর একটি পরিবারে সাতাইশটি পুত্র পৌত্র, সকলেই ২২ বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়াছিল। তৃতীয় একটি পরিবারে তিন পুরুষ সকলেই ৫০ বৎসর বয়সে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। চতুর্থ একটি পরিবারে পিতামহ, পিতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, সকলেরই যৌবনের প্রারম্ভে এক প্রকার চর্ম্মরোগ হইত; উহা ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে আরোগ্য হইত। এইরূপ বহু উদাহরণ অনেকেই মনোযোগ করিলে দেখিতে পাইবেন। এ সকল স্থলে বংশানুক্রম বয়োগত।

বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ গ্যাল্টন্ একটি বিধানের আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং বহু ব্যক্তির পরিমাপ দ্বারা তাহার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। ঐ বিধান এক্ষণে পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। বিধানটি এই,—

গ্যাল্টনের বিধান।

কোনও একটি লক্ষণ বহু ব্যক্তির থাকিলে, উহার গড় করিয়া দেখা যায় যে, ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও এক জনের লক্ষণ গড়ের সহিত যত পৃথক, তাহার অপত্যের ঐ লক্ষণ তত পৃথক নহে। অপত্যের লক্ষণ তদীয় পিতার ও গড়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকে। কতকগুলি ব্যক্তির উচ্চতা পরিমাপ করিয়া দেখা গেল যে, তাহার গড় ৩৷৷০ সাড়ে তিন হাত; ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জনের উচ্চতা ৪ চারি হাত; এ স্থলে তাহার পুত্রের উচ্চতা ৩৸ পৌণে চারি হাত হইতে পারে। তাহা হইলে গড়ের সহিত পিতার দৈর্ঘ্যের যত ব্যবধান, পুত্রের তত নহে। পুত্র গড়ের কিছু অধিক নিকটবর্ত্তী। ইহা অব্যভিচারী নিয়ম নহে, তবে অধিক ক্ষেত্রে ইহা সাধারণ নিয়ম। এ নিয়ম ব্যক্তিগতরূপে সর্ব্বত্র প্রযোজ্য না হইতে পারে, কিন্তু বহু ব্যক্তির তুলনায় সত্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই নিয়ম অনুসারে জনসাধারণের তুলনায় কেহ যদি অতিরিক্তমাত্রায় কোনও লক্ষণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপত্য উহা তত দূর প্রাপ্ত হইবে না; অপত্যের অবনতি হইবে, সে ঐ লক্ষণে জনসাধারণের

গড়-লক্ষণের নিকটবর্ত্তী হইবে। আবার যদি কোনও ব্যক্তির কোনও লক্ষণ জনসাধারণের অপেক্ষা নিতান্তই ন্যূন হয়, তাহার পুত্র তাদৃশ ন্যূন হইবে না। অর্থাৎ, পুত্র পিতা অপেক্ষা উন্নত হইবে। গ্যাল্টনের হিসাবানুসারে, জনসাধারণের অপেক্ষা পুত্রের বৈষম্যের পরিমাণ পিতার এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ, জনসাধারণের কোনও একটি লক্ষণের গড় যদ্যপি গ হয়, এবং উহাদিগের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তির ঐ লক্ষণের পরিমাণ যদি গ অপেক্ষা ক পরিমাণ অধিক বা অল্প হয়, তবে তাহার পুত্রের লক্ষণের সহিত গ এর প্রভেদ ⅓ ক হইবে। এই বিধান বুঝিবার সময় পিতা অর্থে পিতা মাতা উভয়কেই বুঝিতে হইবে। এতদনুসারে বংশানুক্রমের পরিমাণ এক দিকে যেমন আশাপ্রদ, অন্য দিকে তেমনই নিরাশাজনক। অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহিত জনসাধারণের অনেক প্রভেদ। তাঁহার পুত্র জনসাধারণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় প্রতিভার পরিমাণ কমিয়া গেল; সে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিভাশালী হইল। কিন্তু তথাপি সে জনসাধারণ অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে। এ ফল মোটের উপর নিরাশাজনক। কিন্তু যে স্থলে পিতা জনসাধারণ অপেক্ষা নিতান্তই নির্ব্বোধ, সে স্থলে তাহার পুত্র উন্নত হইবে, এমন আশা করা যায়। আর, পিতা মাতা উভয়ই যদ্যপি অধিকপ্রতিভাসম্পন্ন হন, তবে পুত্র তাঁহাদের অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী হইলেও, জনসাধারণের অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী হওয়া সম্ভব। আর যদি পিতা ও মাতা উভয়ই জনসাধারণের অপেক্ষা ন্যূন হন, তবে পুত্র জনসাধারণের দিকে অগ্রসর হওয়ায়, পিতা মাতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত হইতে পারে। বলিয়াছি, এ নিয়ম নিত্য সত্য নহে, কিন্তু মোটের উপর সত্য।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোনও লক্ষণে পিতা জনসাধারণ অপেক্ষা যত দূর উন্নত অথবা অবনত, পুত্র তাহা অপেক্ষা কম হওয়াই সাধারণ নিয়ম। অর্থাৎ, পুত্র জনসাধারণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়। এই বিধানকে সংক্ষেপে “সাধারণ-সন্নিকর্ষ” বলা যাইতে পারে। * অর্থাৎ, পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তিগণ সাধারণের অধিকতর সন্নিহিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তীর সহিত সাধারণের অতিরিক্ত প্রভেদ কেন হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে গেলে, বংশানুক্রমিক বৈষম্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। এ সম্বন্ধে

---

* Filial regression,

উপরে কিছু বলিয়াছি ; পশ্চাৎ আরও বিশদ করিব। কিন্তু যেরূপেই হউক, অকস্মাৎ কেহ জনসাধারণের অপেক্ষা অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া গেলে, তাঁহার পুত্র যে সাধারণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বহু বংশপরম্পরার পর যে জাতক জন্মগ্রহণ করিল, তাহার দেহে বহু পুরুষের শুক্রশোণিত আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। যদি কেবল জাতকের উর্দ্ধতন তিন পুরুষ বিবেচনা করি, তবে পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে মোট ১৪ জন ব্যক্তির শুক্র-শোণিত জাতকের দেহে বর্ত্তমান থাকে, জানা যাইবে। যদি চারি পুরুষ বিবেচনা করি, তবে ৩০ জনের ; ৫ পাঁচ পুরুষ বিবেচনা করিলে ৬২ জনের শুক্রশোণিত জাতকের দেহে বর্ত্তমান থাকা বুঝা যায়। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বহু পুরুষ গণনা করিলে, শত শত ব্যক্তির শুক্রশোণিত জাতকের দেহে বিদ্যমান থাকে, জানা যাইবে। এই শত শত ব্যক্তি জনসাধারণের অপেক্ষা অধিক পৃথক হইতে পারে না ; কারণ, উহারা জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ। সুতরাং জাতকের লক্ষণ জনসাধারণের নিটকবর্ত্তী হয়, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু জাতকের পিতৃলক্ষণ সাধারণের অপেক্ষা অধিকতর বিভিন্ন কেন হইয়াছিল ? তাহার কারণ স্ত্রীকোষ ও পুংকোষের সম্মিলনের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। ঐ সম্মিলনের ফলে কোষস্থ দানাগুলির অবস্থা, স্থান ও শক্তিবিকাশের পরিবর্ত্তন হয়। ঐ পরিবর্ত্তনের উপরই পিতৃ-লক্ষণের অধিক বৈষম্য নির্ভর করে। কোনও স্থলে বা অকস্মাৎ গুরুতর প্রভেদ উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ডি ভ্রিস্ প্রথমে আবিষ্কৃত করেন। তিনি ঐরূপ গুরুতর বৈষম্যের নাম দিয়াছেন—Mutation। ইহার কারণ অদ্যাপি ভালরূপ বুঝা যায় নাই।

শ্রীশশধর রায়।

সাগরিকা।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

ভারত-দ্বীপপুঞ্জে সংস্কৃত গ্রন্থ।

মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রোপকূল হইতে অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত, বহুবিস্তৃত মহাসাগরবক্ষে যে অসংখ্য দ্বীপাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনও কোনও গ্রন্থে ও মানচিত্রে "ভারত-দ্বীপপুঞ্জ" নামে উল্লিখিত। দ্বীপগুলি

পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে, একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়াই কথিত হইতে পারিত। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে একত্র এরূপ দ্বীপ-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষুব-রেখার উপরে ও সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত হইলেও, এই সকল দ্বীপ প্রকৃতির লীলা-নিকেতন বলিয়া কথিত হইতে পারে। উত্তর-পশ্চিমের ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের সাগর-সমীরণ গ্রীষ্ম-তাপ প্রশমিত করিয়া বৃষ্টিপাত নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্য প্রকৃতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। বৃক্ষলতার প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে বাহ্যদৃশ্য মনোরম হরিদ্বর্ণে সুশোভিত;—অল্পায়াসলভ্য ফলশস্যে অধিবাসিগণ নিয়ত আত্মতৃপ্ত;—বাণিজ্য-বিপণীর অগণ্য পণ্য-সম্ভারে বেলাভূমি ক্রয়বিক্রয়-কোলাহলে নিরন্তর মুখরিত।

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে আমেরিকার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইবার সমসময়ে, এই প্রাচ্য পণ্য-বীথিকার অস্তিত্বও আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে যে সকল পাশ্চাত্য নাবিক সমুদ্রপথে ভূপ্রদক্ষিণে বহির্গত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট ইহার সন্ধানলাভ করিবামাত্র, বহু বণিক্‌-সমিতি প্রাচ্য বাণিজ্য করতলগত করিবার প্রবল প্রলোভনে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কালক্রমে সমগ্র প্রাচ্য সাগর-বক্ষে তাহাদিগের অপ্রতিহত অধিকার সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

তৎপূর্ব্বে,—বহুকাল পর্য্যন্ত—প্রাচ্য সাগরবক্ষে ভারতবর্ষের প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের লুপ্তাবশিষ্ট পুরাতন গ্রন্থে তাহার সম্যক্‌ পরিচয়লাভের উপায় নাই। কিন্তু ভারত-দ্বীপপুঞ্জের শিল্পে, সাহিত্যে, আচারে, ব্যবহারে, এখনও তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব, ভারত-বাণিজ্যের অনুযাত্রী হইয়া, মরুগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপৎ-সঙ্কুল স্থলপথে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সকল স্থলে তাহার স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহা উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া, জলপথেও কত দূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে তাহার অনেক স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের যেরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য-সম্বন্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। তদুপলক্ষে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়া, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরে একটি বৃহত্তর ভারতবর্ষ গঠিত করিয়াছিল। তাহার অনুকূল

কারণপরম্পরার অভাব ছিল না। নৈসর্গিক শোভায় ও অপর্য্যাপ্ত শস্য-সম্পদে, এই নাতিশীতোষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পক্ষে উপনিবেশ-সংস্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। যে যুগে এই উপনিবেশ-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা মানব-সমাজের ইতিহাসের পূর্ব্বতন যুগ ;—তৎকালে উপনিবেশ-সংস্থাপন-ব্যাপারেও ভারত-বর্ষ সকলের অগ্রগণ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে দ্বীপপুঞ্জে বাস করিত, তাহারা "নিগ্রিটো"-জাতীয়,—খর্ব্বাবয়ব, কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিতকেশ, অসভ্য মানব। তাহাদিগের পক্ষে ভারতীয়গণের উপনিবেশ-সংস্থাপন-চেষ্টার গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা বরং ভারতীয়গণের আশ্রয়লাভ করিয়া শিক্ষায় সভ্যতায় সমুন্নত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎসূত্রে তাহা-দিগের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে "মঙ্গোলীয়" ও "ককেশীয়" মানবের সংমিশ্রণ সাধিত হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের সুদীর্ঘ সংসর্গ-প্রভাবে তাহাদিগের অবস্থা এইরূপে কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রভাবাপন্ন হইলেও, অনেক বিষয়ের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সা ও অপরিহার্য্য নৈসর্গিক পার্থক্য এখনও তদ্দেশে সভ্যাসভ্য দুইটি পৃথক্ মানব-সমাজের উৎপত্তি-তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে।

ভারতবর্ষের সহিত ভারত-দ্বীপপুঞ্জের এই সুদীর্ঘ সংসর্গ মানবসমাজের ইতিহাসে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। ইহাকে উপেক্ষা করিলে, মানব-সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। দ্বীপপুঞ্জের সন্ধানলাভের পর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায়, তদ্দেশের ভূতত্ত্বের, জীবতত্ত্বের ও উদ্ভিজ্জতত্ত্বের আলোচনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে ;—প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারত-সংসর্গ-সূচক পুরাতত্ত্বের আলোচনা এখনও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ন্যায় ভারত-দ্বীপপুঞ্জেও, লিখিত ইতিহাসের অভাবে, পুরাকাহিনী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে! কোনও কোনও পুরাতন ক্ষোদিত লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে ভারত-লিপি ভারত-দ্বীপপুঞ্জেও প্রচলিত হইয়াছিল। এখন তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা এখনও পুরাকালের ভারত-সংসর্গের অভ্রান্ত নিদর্শনরূপে

বর্ত্তমান আছে। একটি দ্বীপে ইহার পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্বাচার্য্যগণ [ইংরাজী হইতে অক্ষরান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়া] "বালি-দ্বীপ" বলিয়া এই দ্বীপটির নামকরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম [বলবানগণের বাসস্থান] বলী দ্বীপ। "উশনবলী" ও "বলী-সংগ্রহ" নামক তদ্দেশের দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পর, এই নাম-রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। (১)

এই দ্বীপের সমুদ্রোপকূল নিয়ত তরঙ্গ-সঙ্কুল বলিয়া, তাহা সহসা শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারিত না;—অধিবাসিগণও শিক্ষায়, সভ্যতায় ও বাহুবলে পরাক্রান্ত বলিয়াই পরিচিত ছিল। তজ্জন্য এখানকার হিন্দু-রাজ্যের গৌরব-দীপ অনেক দিন প্রজ্বলিত থাকিবার পর, সম্প্রতি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন রাজশক্তি ওলন্দাজগণের করতলগত। কিন্তু হিন্দুসমাজ এখনও পূর্ব্ব প্রতাপেই বর্ত্তমান আছে। এখানে কিরূপে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার লিখিত ইতিহাস এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হয়। তাহার প্রথম উপক্রমে, যাঁহারা যবদ্বীপে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া, বলী দ্বীপে আসিয়া, তথায় হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এই দ্বীপে এখনও হিন্দু-সভ্যতার প্রধান নিদর্শন—সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে ভারতীয় উপনিবেশনিচয়ের পুরাকাহিনীর সন্ধান লাভ করিতে হইলে, বলী দ্বীপ হইতেই তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিতে হইবে। আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, এই কারণে, বলী দ্বীপের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

যাঁহারা, বলী দ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম-সংরক্ষণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে স্বধর্ম্ম-রক্ষক সংস্কৃতগ্রন্থাবলী রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আয়োজন করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। মাতৃভূমির

(1) The name Bali signifies, thus a hero, and the name of the country, given in Usanabali, Bali Angka, the lap (birth place) of heroes, is a very beautiful denomination of the holy land, and one which expresses the bold spirit of the nation.—Dr. Friederich in the Journal of the Royal Asiatic Society (New Series) Vol. VIII. p. 158.

সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর, বলী দ্বীপের হিন্দুসমাজের পক্ষে গ্রন্থ-রক্ষার চেষ্টা একটি অবশ্য-প্রতিপালনীয় পবিত্র ব্রতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এখনও সংস্কৃত গ্রন্থ বংশানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা তথ্যানুসন্ধানের অধিক সুযোগ লাভ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই সকল সযত্নরক্ষিত সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয়-গ্রহণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্নে অনেক গ্রন্থের পাঠ ও প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, তাহার ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার আশা নাই। তাহা স্মরণাতীত পুরাকালের কথা। রামায়ণের ন্যায় অতি পুরাতন গ্রন্থে যবদ্বীপের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, রামায়ণের রচনাকালে তাহার জনশ্রুতি কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখন হয় ত কেবল বাণিজ্য-সম্বন্ধই বর্ত্তমান ছিল। উত্তরকালের উপনিবেশ-সংস্থাপন সেই সুদীর্ঘ বাণিজ্য-সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণামমাত্র। তাহাকে এক দিনের বা এক যুগের ঘটনা বলিবার উপায় নাই। তজ্জন্যই ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় উপনিবেশ-সমূহে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তর-বিন্যাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক স্তরে, প্রবল পরাক্রান্ত পাশ্চাত্য প্রভাব পূর্ব্বকালবর্ত্তী সকল প্রভাবকেই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তৎপূর্ব্বে আরবগণের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। তাহাতেও, তৎপূর্ব্বকালবর্ত্তী ভারতীয় প্রভাব কিয়ৎ-পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ভারতীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে বর্ত্তমান ছিল, ভাষা ও সাহিত্য হইতে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই; আচার ব্যবহারে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, জনসমাজের পরম্পরা-গত বিবিধ মতে ও বিশ্বাসে, এখনও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে। তাহার সাহায্যে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারত-সংসর্গের বিবরণ-সঙ্কলনের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল, এবং তৎসূত্রে নানা স্থানে ভারতীয় উপনিবেশও সংস্থাপিত হইয়াছিল,—এ সকল কথা সর্ব্ববাদিসম্মত পুরাতন কথা। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোকে ভারত-দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। তাহাই অনুসন্ধান-

যোগ্য প্রথম কথা, এবং প্রধান কথা ;—"সাগরিকা"র পক্ষে তাহাই একমাত্র কথা।

পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে"র সমালোচনা উপলক্ষে [১২৮১ সালের বঙ্গদর্শনে] মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"বাস্তবিক একদিন, বাঙ্গালীরা আর কিছুতে না হউক, ঔপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ (?) বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন।" অনুমানমাত্রের উপর ইতিহাসের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না বলিয়া, ছয় বৎসর পরে, [১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শনে] প্রমাণ না পাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রই আবার লিখিয়াছিলেন,—"বালী (?) ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ কি?"

একালের বাঙ্গালীর নিকট সেকালের বাঙ্গালীর বিজয়-গৌরবের কথা স্বপ্নকথার ন্যায় অলীক বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এখন বাঙ্গালী কাঙ্গালী। তাহারাই যে এক সময়ে সমগ্র উত্তরাপথের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া, ভারত-সীমার বাহিরেও, নানা দিগ্দেশে বিজয়-গৌরব সংস্থাপিত করিয়াছিল, একালের বাঙ্গালী তাহা চিন্তা করিতেও অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা—প্রমাণ কি? প্রমাণ-অনুসন্ধানের উপযোগী ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকিলে, অতীতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। এইরূপেই মানব-জ্ঞান উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অতীতানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবার অন্তরায়ের অভাব নাই। যাহাদিগের অতীত-গৌরব কেবল সাগর-সৈকতের শুক্তি-সংগ্রহের চেষ্টা ভিন্ন অন্য চেষ্টার পরিচয় প্রদান করিতে পারে না, তাহারা অতীতানুসন্ধানে বীতরাগ হইয়া, সে চেষ্টাকে অধঃপতনের সোপান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে সেই চেষ্টাই আত্মোন্নতিলাভের প্রধান চেষ্টা। তাহাতে এখনও অধিক লোক অগ্রসর হয় নাই।

যাঁহারা বলী দ্বীপে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের অবস্থাও এইরূপ। ইতিহাস নাই; জনশ্রুতি তমসাচ্ছন্ন; অতীতানুসন্ধানের প্রয়োজন পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত! তাঁহারা যবদ্বীপ হইতে বলী দ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারত-

বর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের জনশ্রুতি হইতেও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাঁহারা তদ্বিষয়ে কিছু-মাত্র সন্ধান প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারা কেবল "কলিঙ্গে"র নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষই "কলিঙ্গ";—তাহা মহাসাগরের পরপারে অবস্থিত!

এই জনশ্রুতি-মূলক যৎসামান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারত-দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশনিচয়কে "কলিঙ্গের উপনিবেশ" বলিয়াই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না। সেকালে কলিঙ্গ বলিতে বঙ্গোপসাগরকূলের অধিকাংশ স্থানই সূচিত হইত। এরূপ সাধারণ ভাবের পরিচয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। বলী দ্বীপের সংস্কৃত গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে হতাশ্বাস হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ সে সকল গ্রন্থের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত প্রমাণের অনুসন্ধান-চেষ্টার পরিচয় প্রদান করেন নাই। সেই পথ এখনও অনাবিষ্কৃত—তিমিরাচ্ছন্ন—দুরধিগম্য। সেই পথেই অনুসন্ধান-চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে, এবং তাহার সন্ধান-লাভের উপযোগী বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহা প্রথমে দুষ্কর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু শ্রমসাধ্য হইলেও, ইহাকে অসম্ভব চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। দ্বীপপুঞ্জে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা ভারতবর্ষের গ্রন্থ; ভারতবর্ষ হইতেই তাহা আনীত হইয়াছিল। যাঁহারা গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের যে প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশের লিপিপদ্ধতির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মাতৃভূমির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর, গ্রন্থগুলি পুরুষানুক্রমে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" প্রণালীতে লিখিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া, তন্মধ্যে পুরাতন লিপি-পদ্ধতির পরিচয়-লাভের সম্ভাবনা আছে। অন্য প্রমাণের অসদ্ভাবে, ইহা একটি নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; এবং ইহার সাহায্যে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের হিন্দু-উপনিবেশনিচয়ের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

অমরকোষের [১।১।১৮-২২] ঊনচত্বারিংশৎ বিষ্ণুনামাবলী সংস্কৃতজ্ঞ-

গণের নিকট সুপরিচিত। কোনও কোনও অমরকোষে আরও সাতটি নাম অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। নামগুলি যথাবৎ উদ্ধৃত হইল।—

"বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ।
দামোদরো হৃষীকেশঃ কেশবো মাধবঃ স্বভূঃ॥
দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ।
পীতাম্বরোঽচ্যুতঃ শার্ঙ্গী বিষ্বক্‌সেনো জনার্দ্দনঃ॥
উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজ শ্চক্রপাণি শ্চতুর্ভুজঃ।
পদ্মনাভো মধুরিপু র্বাসুদেব স্ত্রিবিক্রমঃ॥
দেবকীনন্দনঃ শৌরিঃ শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ।
বনমালী বলিধ্বংসী কংসারাতি রধোক্ষজঃ॥
বিশ্বম্ভরঃ কৈটভজি দ্বিধুঃ শ্রীবৎস-লাঞ্ছনঃ।" (২)

[অতিরিক্ত নামাবলী]

"পুরাণপুরুষো যজ্ঞপুরুষো নরকান্তকঃ।
জলশায়ী বিশ্বরূপো মুকুন্দো মুরমর্দ্দনঃ॥ (৩)

ইহার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য, বলী দ্বীপের সংস্কৃত-গ্রন্থোক্ত বিষ্ণুনামাবলী নিম্নে যথাবৎ উদ্ধৃত হইল। তাহার সাহায্যে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের হিন্দু উপনিবেশ-নিবাসিগণের উচ্চারণ-পার্থক্যের পরিচয় ও কারণ প্রকাশিত হইতে পারিবে। বলী দ্বীপে শৈব-প্রভাব প্রবল বলিয়া, তথায় বিষ্ণুর সাতাইশটিমাত্র নাম প্রচলিত আছে। যথা ;—

"বিষ্ণু নারায়ণ সোরি চক্রপাণি জনার্দ্দনঃ।
পদ্মনাব রেসিকেশঃ বেকুন্ট বিষ্টরশ্রব॥
ইন্দ্রাবরজ হুপেন্দ্র গোহবিন্দ গরুড়ধ্বজ।
কেশব পুণ্ডরীকাক্ষঃ ক্রেষ্ণঃ পীতাম্বরোচাতঃ॥
বিষক্‌সেনঃ স্বব্ সঙ্গী দানবার হনোক্ষজঃ।
ত্রেসংকপি বাসুদেবঃ মাদব মদুসূদন॥" (৪)

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—নামগুলি ভারতবর্ষে সুপরিচিত। কিন্তু কোনও কোনও নামের উচ্চারণগত পার্থক্যের জন্য বর্ণবিন্যাসেও বিকৃতি সংঘটিত হইয়াছে। (১) ধ-কারের এবং ভ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ প্রচলিত না থাকায়, [দ-কারের এবং ব-কারের ন্যায় উচ্চারণের প্রভাবে] বর্ণবিন্যাসেও

(২) ভানুজিদীক্ষিত-কৃত টীকা সংযুক্ত অমরকোষ।

(৩) বোম্বে সেণ্ট্রাল বুকডিপো হইতে প্রকাশিত অমরকোষ।

(৪) J. R. A. S. (New Series,) Vol VIII. p. 208.

দ-কার এবং ব-কার ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া, পদ্মনাভ "পদ্মনাব", "স্বভূ" স্ববূ, মাধব "মাদব", এবং মধুসূদন "মদুসূদন" হইয়াছে। (২) শৌরি "সৌরি" রূপেও লিখিত হইতে পারে; তাহা প্রাকৃতে "সোরি" রূপেও লিখিত হইত, এবং বৈকুণ্ঠও প্রাকৃতে "বেকুণ্ঠ" রূপে লিখিত হইত। কিন্তু ঠ-স্থালে "ণ্ট" উচ্চারণ-বিকৃতির ফল। (৩) বিষ্টরশ্রবার স্থলে "বিষ্ঠরশ্রব" এবং অচ্যুতের স্থলে "অচ্যত" হয় ত লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন। (৪) কিন্তু উপেন্দ্র স্থলে "হুপেন্দ্র", গোবিন্দ স্থলে "গোহবিন্দ", কৃষ্ণ স্থলে "ক্রেষ্ণ", অধোক্ষজ স্থলে "হনোক্ষজ", বৃষ স্থলে "ব্রেস" লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কেবল ব্রেস-শব্দের বিসর্গ-চিহ্নটি লিপিকর-প্রমাদে সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। (৫) হৃষীকেশ স্থলে "রেসিকেশ"ও লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই সকল শব্দ পুরাকালে দ্বীপনিবাসি-হিন্দুসমাজে যে ভাবে উচ্চরিত হইত, সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। ইহাকে তৎকাল-প্রচলিত লিপি-প্রণালী বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহা কি আকস্মিক? এরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইবার কারণ কি? ইহার মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এরূপ উচ্চারণ ও লিপিপদ্ধতি কোনও যুগে ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে প্রচলিত ছিল কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার অসনুন্ধানকার্য্য আরব্ধ হয় নাই। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে বঙ্গভূমিতেই এইরূপ উচ্চারণ ও লিপিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ও বিদ্যালয়ের তাড়নায়, বাঙ্গালী সে পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে গিয়া, তাহার ঐতিহাসিক সূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! কথোপ-কথনেও যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। রামমাণিক্যের "কল্‌কাত্তাই সাজিবার" উচ্চাভিলাষের ন্যায় হাস্যাস্পদ উচ্চাভিলাষে, অনেকেই চিরপরিচিত উচ্চারণ-রীতি ছাড়িয়া দিতেছে। তথাপি এখনও অনেকে টিয়া পাখীকে বুলি শিখাইবার সময়ে "ক্রেষ্ণ ক্রেষ্ণ রাম রাম" বলিতে কুণ্ঠিত হয় না;—এখনও অনেকে "ব্রেসকার্ট", "ব্রেসকেতু" বলা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই;—এখনও "পদ্মনাব, মাদব, মদুসূদন" একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। হৃষীকেশ অতি অল্পদিন-মাত্র বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে লিখিত হইতেছে, উচ্চারণে এখনও কিন্তু সেই চির-পরিচিত "রিসিকেশ"ই বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এ সকল নিতান্ত একালের উচ্চারণ-দোষ বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত [দিনাজপুর জেলার] বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিও [খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে] লিখাইয়াছিলেন,—

"মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্য-যসোভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারক মুদ্দিশ্য পরাশর-সগোত্রায় পরাশর-প্রবরায় যযুর্ব্বেদ-সব্রহ্মচারিণে···চাবটিগ্রাম-বাস্ত-ব্যায় ভট্টপুত্র-রিষিকেশপৌত্রায় ভট্টপুত্র-মধুসূদনপুত্রায় ভট্টপুত্র-কৃষ্ণাদিত্য-শর্ম্মণে বিশুব-সংক্রান্তৌ বিধিবৎ গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।" (৫)

ইহাতেও সকারের গোলযোগ, ইহাতেও সেই চিরপরিচিত "রিষিকেশ!" এ সকল কখনও লিপিকরের ব্যক্তিগত লিপি-প্রমাদ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ইহার সহিত বলী দ্বীপের সংস্কৃত গ্রন্থের লিপি-পদ্ধতির যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি আকস্মিক? মহীপাল দেবের তাম্রশাসনে "যশে"র ও "যজুর্ব্বেদে"র যেরূপ বর্ণবিন্যাস (৬) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অদ্যাপি বলী দ্বীপে প্রচলিত আছে। তাহা কি আকস্মিক?

বাঙ্গালী তন্ত্রকে "তন্‌তর" বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। বলী দ্বীপে তাহার উচ্চারণ "তুতুর"। "তুতুরে"র মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূজার্হ "তুতুরে"র নাম—"শিবশাসন"। তাহাই বলী দ্বীপে একাধারে রাজবিধি ও ধর্ম্মানুশাসন। বঙ্গদেশে এই তন্ত্র গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা কি কখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না? বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি শঙ্কর-বিরচিত "তারারহস্যবৃত্তি" নামক তন্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন,—এক সময়ে বঙ্গদেশেও "শিবশাসন" তন্ত্র প্রচলিত ছিল। (৭) ডাক্তার ফ্রিডেরিস্‌ বহু ক্লেশে বলী দ্বীপ হইতে [১৭৬০ খৃষ্টাব্দের লিখিত] একখানি "শিবশাসন" হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার সমাপ্তি-বাক্য এইরূপ,—

---

(৫) মহীপালদেবের তাম্রশাসন—বাণগড়লিপি—লেখমালা (৯১—১০০ পৃষ্ঠা)।

(৬) Yajur Veda is commonly inaccurately spelt Yayar Vede. Dr. Friedrich.

(৭) অনুসন্ধান-সমিতি-সংগৃহীত এই সকল পুরাতন গ্রন্থের পরিচয় "গৌড়গ্রন্থপরিচয়" নামক গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইবে। বাঙ্গালার তন্ত্র-সাহিত্যের প্রভাব কত দূর ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহারও বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

"সিদ্দির্ অস্তু তৎ অস্তু অস্তু
ওঙ্ সরস্বতিয়ে নমঃ
ওঙ্ গম্'ঙ্ গণপতয়ে নমঃ
ওঙ্ শ্রীগুরুব্যো নমঃ
ওঙ্ ওঙ্ কামদেবায় নমঃ।"

গ'মুঙ্ শব্দটি ব্যতীত, এই সমাপ্তি-বাক্যের সমগ্র পাঠ অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতেও সেই রীতি;—সিদ্ধি স্থলে "সিদ্দি", গুরুভ্যো স্থলে "গুরুব্যো"। প্রণবের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, [হয় ত তান্ত্রিকতার প্রভাবে] তাহা বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত ভাবে উচ্চরিত হয় না;—ওঙ্-রূপেই উচ্চরিত হইয়া থাকে। গ'মুঙ্-শব্দটি ডাক্তার ফ্রিডেরিস্ কর্ত্তৃক অনূদিত হয় নাই। তিনি বরং বলিয়া গিয়াছেন,—ইহা দুর্বোধ, এবং অসংস্কৃত শব্দ।(৮) কিন্তু ইহা যে কোন্ শব্দের বিকৃত রূপ, তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহা বাঙ্গালীর নিকটে প্রতিভাত হইবার যোগ্য। তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"পঞ্চান্তকং শশিযুতং বীজং গণপতে র্ব্বিদুঃ।"

"পঞ্চান্তক"-শব্দের অর্থ,—গ-কার। তাহাই গণপতির বীজ। তদনুসারে [বীজ-সংযুক্ত বাক্যে] গণপতিকে প্রণাম করিবার সময়ে, বাঙ্গালী তান্ত্রিক-উপাসকগণ এখনও "ওঙ্ গাঙ্ গণপতয়ে নমঃ" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহা একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। ইহাতে বাঙ্গালার ও বলী দ্বীপের পূর্ব্ব সংসর্গের যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কি আকস্মিক বলিয়া কথিত হইতে পারে?

ডাক্তার ফ্রিডেরিস্ বলী দ্বীপে "শিবশাসন" তন্ত্রের পূর্ব্বারম্ভের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহা বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। তাহাতে, লিপিকর-প্রমাদের অসদ্ভাব না থাকিলেও, বলী দ্বীপের চিরপ্রচলিত লিপিপদ্ধতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"অবিঘ্নং অস্তু ॥ নিহন্ (?) পূর্ব্বাদিগম-শাসন-শাস্ত্রসারেদ্রেত পূর্ব্বারম্ভ **** ব্রেদাচার্য্য-রাজপুরোহিত-সর্ব্বগুণজ্ঞ-বাস্নুরশ্মিসদ্রেশ- সর্ব্বজনহ্রেদয়- তমিস্রহরণ-সকলাগ্রচূড়ামণি শিরসি প্রতিষ্ঠিত ত'কপ (?) সহন-পরাচার্য্য-শিবকবেঃ।" ইত্যাদি।

(৮) The word is not very clear, nor Sanskrita.—Dr Friederich.

ইহাতেও অবিঘ্নং স্থলে "অবিগ্নং", সারোদ্ধৃত স্থলে "সারোদ্রেত", পূর্ব্বারম্ভ স্থলে "পূর্ব্বারম্ব", বৃদ্ধাচার্য্য স্থলে "ব্রেদ্দাচার্য্য", ভানুরশ্মি স্থলে "বানুরশ্মি", হৃদয় স্থলে "হ্রেদয়" দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বাঙ্গালী এখনও ঘৃতকে "ঘ্রেত", মৃতকে "ম্রেতা" বা "ম্রেত," তৃষ্ণাকে "ত্রেষ্ণা", ঘৃণাকে "ঘ্রেণা," [ঘেন্না] বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। ডাক্তার ফ্রিডেরিস্ "ভানুরশ্মিসদৃশ-সর্ব্বজন-হৃদয়-তমিস্রহরণ"-বিশেষণ পদের পরিবর্ত্তে, "ভানুরশ্মিসদৃশ-সর্ব্বজনহৃদয়ত-মিশ্রহরণ" পাঠ করিয়া, এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—"শিবশাসন" মিশ্র উপাধিধারী "হরণ" নামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত। (৯) ইহা অবশ্যই পাঠ-শৈথিল্যের ও ব্যাখ্যা-বিভ্রাটের নিদর্শন। ইহাতে "পূর্ব্বাদিগম-শাসনশাস্ত্র" বলিয়া একটি পূর্ব্ববর্ত্তী আগম-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে; তাহারই "সারোদ্ধৃত" গ্রন্থ "শিবশাসন" নামে কথিত। বাঙ্গালা দেশে যে "শিবশাসন" গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহাও "শৈবাগম" নামক পূর্ব্ব-প্রচলিত গ্রন্থের সারাংশ বলিয়াই কথিত হইত। সুতরাং বলী দ্বীপের শিবশাসনের ও বাঙ্গালা দেশের [পূর্ব্বপ্রচলিত—অধুনা-বিলুপ্ত] শিবশাসনের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি আকস্মিক ?

এই সকল উচ্চারণবিকৃতি-মূলক লিপি-প্রণালীর কারণ কি, তদ্বিষয়ে কোনরূপ তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া, ডাক্তার ফ্রিডেরিস্ একটি অনুমান-মূলক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া, সকল অনুসন্ধিৎসা নিরস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—যবদ্বীপে উপনীত হইবার পর, উপনিবেশ-নিবাসিগণ [যবদ্বীপে বসিয়াই] এই সকল উচ্চারণ-বিকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। (১০) বলা বাহুল্য, ইহার অনুকূল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহাকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী আর তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। এক সময়ে বাঙ্গালা দেশেও যে এইরূপ উচ্চারণ-বিকৃতি প্রচলিত ছিল, তাহার সন্ধানলাভ করিলে, ডাক্তার ফ্রিডেরিস্ তাঁহার অনুমান-মূলক সিদ্ধান্তের উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করিতে সাহসী হইতেন না। এই সাদৃশ্যের মূল কোথায়, তাহার অনুসন্ধান-

---

(৯) Mirsra-Harana is a genuine Indian Brahminical name; Misra is found in many names, it signifies a person of distinction.—Dr. Friederich.

(১০) I, therefore, believe that the few changes in Sanskrita words have had their origin in Java.—Dr. Friederich

কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও বঙ্গভূমির দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইতেন।

ভারত-দ্বীপপুঞ্জে একবার ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত হইবার পর, তথায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই লোকসমাগম হইয়া থাকিতে পারে। কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে উত্তরকালে লোকসমাগম হইয়াছিল, তাহা তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃত বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান যুগে আমেরিকার উপনিবেশে সকল দেশের লোকই আশ্রয় লাভ করিতেছে, কিন্তু উপনিবেশটি ইংরেজের উপনিবেশ বলিয়াই পরিচিত। যাহারা প্রথমে উপনিবেশ সংস্থাপিত করে, তাহাদিগের প্রভাব প্রবল থাকিলে, তাহাদিগের ভাষাই প্রাধান্য লাভ করে; নবাগতগণ তাহাকেই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। ভারত-দ্বীপপুঞ্জেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং উত্তরকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া, কেহ কখনও ভারত-দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় লাভ করিয়াছে কি না, তাহা প্রধান কথা নহে। যাহাদিগের প্রভাব সে দেশের গ্রন্থে অদ্যাপি দেদীপ্যমান, তাহারা ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল, তাহাই তথ্যানুসন্ধানের প্রধান কথা। তাহা, এই সকল কারণে, বঙ্গভূমির কথা বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বিদেশী গল্প।

পারিবারিক চিত্র।

বন্ধুবর সাইমন রাঁদেভির সহিত দেখা করিতে যাইতেছি। বিগত পনের বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত একবারও সাক্ষাৎ হয় নাই। এক সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। প্রতিদিন অপরাহ্নে অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত পরমানন্দে ও শান্তিতে যাপন করিতাম। তিনি যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে লোকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাছে অন্তরের অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কারণ, কোনও প্রসঙ্গের আলোচনাকালে লোকে সহজেই বুঝিতে পারিত, তিনি অসাধারণ চতুর, বুদ্ধিমান ও মার্জ্জিত-

রুচি। তাঁহার শ্লীলতাপূর্ণ বাক্য, প্রগাঢ় অন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সহজেই লোকের মন সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইত, এবং একান্ত বিশ্বস্তভাবে তাঁহার কাছে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া পরম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিত।

বহু বৎসর আমাদের মধ্যে একদিনের জন্যও বিচ্ছেদ হয় নাই। উভয়ে একত্র আহার, বিহার, ভ্রমণ ও শয়ন করিতাম। উভয়ে একই বিষয়ের কল্পনা করিতাম, একই স্বপ্নে বিভোর থাকিতাম। আমাদের উভয়ের চিন্তাপ্রণালী একই পথ অবলম্বন করিত। তিনি যে দ্রব্যটি মনোনীত করিতেন, সেটি আমারও পছন্দ হইত। একই পুস্তক উভয়ে পাঠ করিতে ভালবাসিতাম। উভয়েই কোনও এক নির্দ্দিষ্ট লেখকের গ্রন্থের সমানভাবে আদর করিতাম। একই ভাবাবেশে উভয়ের হৃদয় শিহরিয়া উঠিত। এমন কি, হয় ত কোনও লোক দেখিয়া উভয়েরই মনে একই সময়ে হাস্যরসের সঞ্চার হইত। সেরূপ লোক উভয়েই একদৃষ্টিপাতে চিনিয়া লইতে পারিতাম।

তার পর তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহটা খুব তাড়াতাড়ি হইয়াছিল। সুদূর পল্লীপ্রান্ত হইতে একটি ক্ষুদ্রকায়া যুবতী ভর্ত্তৃ-শিকারার্থ প্যারী নগরীতে আসিয়াছিল। যুবতী শীর্ণা, রূপসম্পদবর্জ্জিতা। তাহার বাহুযুগল শীর্ণ; নয়ন ভাববৈচিত্র্যশূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন; কণ্ঠস্বর মধুরতাবর্জ্জিত। তাহার ন্যায় লক্ষ লক্ষ বিবাহযোগ্য সজ্জিত পুত্তলিকা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ যুবতী কি করিয়া এমন বুদ্ধিমান যুবককে মুগ্ধ করিল? কেহ কি এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন! কোনও পতিপ্রাণা, কোমলহৃদয়া, মধুরস্বভাবা রমণীর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া তিনি অক্ষুণ্ণ শান্তি, আনন্দ ও সুখের আশা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই বিরলকেশা কিশোরীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি এই সব লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কোনও কর্ম্মী, সজীব, ভাবপ্রবণ ব্যক্তির সম্মুখে সত্য, বাস্তব যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাঁহার হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অথবা তাঁহার এমন মানসিক অধঃপতন হয়, তিনি এমন পশুত্বে উপনীত হন যে, তখন তাঁহার আর অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না।

এবার দেখা হইলে, তাঁহার প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, জানিতে পারিব। এখনও কি তিনি পূর্ব্বের ন্যায় রহস্যপ্রিয়, স্ফূর্ত্তিবাজ,

সহৃদয় ও উৎসাহশীল আছেন? অথবা পল্লীবাসহেতু মানসিক প্রফুল্লতা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন? পনের বৎসরে লোকের বহু পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

ট্রেণ একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিবামাত্র এক স্থূলদেহ, আরক্তবদন ও বিপুলোদর ব্যক্তি বাহুবিস্তার করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিলেন! বলিলেন, "জর্জ্জ!"

আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম, কিন্তু সত্য বলিতে কি, প্রথমে আমি তাঁহাকে চিনিতেই পারি নাই! সবিস্ময়ে বলিলাম, "তুমি মোটেই রোগা হও নাই দেখিতেছি!" তিনি সহাস্যে বলিলেন, "তুমি কি ভাবিয়াছিলে? পয়সা উপার্জ্জন করিতেছি, আহারের সময় উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন, এবং রাত্রিতে সুনিদ্রা! খাই আর ঘুমাই, এই তা আমার কাজ!"

আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম। সেই পুষ্ট প্রকাণ্ড মুখে আমি পূর্ব্বকালের পরিচিত চিহ্নগুলি খুঁজিতেছিলাম। তাঁহার নয়নযুগলের এখনও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই বটে, কিন্তু সে উদার দৃষ্টি আর দেখিলাম না। তখন মনে মনে ভাবিলাম, নয়নে মানব-মনের প্রতিবিম্ব পড়ে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে তাঁহার মস্তিষ্কে যে প্রকার চিন্তা ও ভাব সঞ্চারিত হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। তাঁহার তখনকার মনোবৃত্তিগুলির সহিত যে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল!

তবু তাঁহার নয়নযুগল এখনও বন্ধুত্ব-রাগে রঞ্জিত ও আনন্দদীপ্তি-সমুজ্জ্বল; কিন্তু তাহাতে সে ভাষাময়ী দৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশক দীপ্তি, উন্নত সহৃদয়তা দেখিলাম না। অকস্মাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই দুইটি আমার পুত্র—কন্যা।" একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা—এখনই তাহাকে যুবতী বলিয়া ভ্রম জন্মে,—এবং একটি ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক কুণ্ঠিতভাবে জড়ভরতের ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "এ দুইটি তোমারই সন্তান?" হাসিতে হাসিতে বন্ধু বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

"কয়টি সন্তান তোমার?"

"পাঁচটি। বাকী তিনটি বাড়ীতে আছে।"

কথাগুলি বলিয়া যেন তিনি গর্ব্ব,—আত্মতৃপ্তি অনুভব করিলেন। বন্ধুর জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। পল্লীগ্রামে বসিয়া তিনি কেবল সন্তান উৎপাদন

করিতেছেন, এবং তজ্জন্য জয়গান ও আনন্দ অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট আছেন দেখিয়া, তাঁহার প্রতি কেমন একপ্রকার অশ্রদ্ধা জন্মিল।

নিকটে গাড়ী ছিল; তাহাতে আরোহণ করিলাম। বন্ধুবর স্বয়ং অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিলেন। আমাদের গাড়ী নগরের মধ্য দিয়া চলিল। নগরটি অত্যন্ত বিরল। পথে দুই চারিটি কুক্কুর ও কদাচিৎ দুই একটি পরিচারিকা চলিতেছে, দেখিলাম। সেখানে সজীবতা ও উৎসাহের কোনও চিহ্নই দেখিলাম না। মাঝে মাঝে দুই একটি দোকানে দোকানদার দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা বন্ধুকে দেখিয়া টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল। সাইমনও প্রত্যভিবাদন করিয়া আমার কাছে তাহাদের নাম ধাম প্রভৃতির পরিচয় দিতেছিলেন। ভাবে বোধ হইল, তিনি যেন সকলকেই চিনেন। আমার মনে হইল, ভবিষ্যতে তিনি নগরের ডেপুটী পদপ্রার্থী হইবেন। পল্লীগ্রামে এই পদলাভই পল্লীবাসীর চরম লক্ষ্য।

অবিলম্বে আমরা নগরের বহির্ভাগে আসিয়া পড়িলাম। ক্রমে আমাদের গাড়ী উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটি বহুচূড়াবিশিষ্ট অট্টালিকা, অনেকটা দুর্গের অনুকরণে নির্ম্মিত।

সাইমন বলিলেন, "এই আমার কুটীর।" তাহার বিনয় প্রশংসনীয়। আমি বাড়ী দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম।

সোপানোপরি একটি মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন। অতিথির অভ্যর্থনার উপযোগী বেশভূষায় তিনি সজ্জিত। কেশরাশি আলুলায়িত। অতিথির অভ্যর্থনাসূচক মামুলী বচনগুলিও যেন তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজিত। পনের বৎসর পূর্ব্বে বিবাহকালে ধর্ম্মমন্দিরে আমি যে বিরলকেশা,অশোভনা যুবতীকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বন্ধু-পত্নীর দেহ এখন বিলক্ষণ স্থূল দেখিলাম। মস্তকের কেশরাজি কুঞ্চিত। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত বয়স নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। সে আকৃতিতে বুদ্ধিমত্তার কোনও চিহ্ন নাই; নারীত্বের কোনও সৌন্দর্য্যই যেন তাঁহার দেহে নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি শুধু সন্তানের জননী, তাঁহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কার্য্য অথবা চিন্তা নাই।

তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তিনটি বালকবালিকা দেহের উচ্চতা অনুসারে পাশাপাশি সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেয়রের সম্মুখে অগ্নিনির্ব্বাণকারী ভৃত্যগণ যেমন কুর্নিশ

করিয়া দাঁড়ায়, বালকবালিকারা তেমনই ভাবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তোমার বাকী ছেলে মেয়েরা বুঝি ইহারা?" সাইমনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি একে একে তাহাদের নাম বলিলেন, "জীয়েন, সোফি, গঁত্রাঁ।"

উপবেশনাগারের দ্বার মুক্ত ছিল। সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একখানি সুখসেব্য আরাম-কেদারায় একটি পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। শ্রীমতী রাদৈঁভি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ইনি আমার পিতামহ; বয়ঃক্রম সাতাশী বৎসর।" কম্পিতদেহ বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "দাদা মহাশয়, ইনি সাইমনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।" বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যেন আমাকে নমস্কার করিতে গেলেন, কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কেবল একটু অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইল। অগত্যা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তিনি আমাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। উপবেশনকালে আমি বলিলাম, "আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ, মহাশয়।"

সেই সময় সাইমনও কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সহাস্যে বলিলেন, "তুমি দেখিতেছি দাদামহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছ। বৃদ্ধটি এক অপূর্ব্ব রত্ন! বালকবালিকাদিগের আনন্দের উৎস। উনি এমন পেটুক যে, রোজই আমাদের মনে হয়, অতিলোভে কখন উনি প্রাণ হারাইবেন। বৃদ্ধের ইচ্ছামত যদি তাঁহাকে আহার করিতে দেওয়া যায়, তবে উনি যে কত খাইতে পারেন, তা তুমি কল্পনাও করিতে পরিবে না। তোমাকে সব দেখাইব; ক্রমে সমস্ত দেখিতে পাইবে। মিষ্টান্নগুলির প্রতি উনি এমন লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, যেন এক একটা মিঠাই এক একটি সুন্দরী যুবতী! জীবনে এমন মজা তুমি কখনও দেখ নাই। এখনই তোমাকে সমস্ত দেখাইতেছি।"

আহারের পূর্ব্বে বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তনের জন্য আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলাম। সোপানোপরি পদধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, বন্ধুর সন্তানবর্গ পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। সম্ভবতঃ আমাকে সম্মান-প্রদর্শন করিবার জন্য।

গৃহের বাতায়নসন্নিধানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সম্মুখে তৃণশ্যামল, অন্তহীন, সীমাহীন প্রান্তর বিস্তৃত; যব ও গম শস্যে পরিপূর্ণ। সেই দিগন্তবিস্তৃত

প্রান্তরে বৃক্ষ অথবা অন্য কোনও কিছু নাই। এই গৃহবাসীরা যেরূপ উপায়-হীন-ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, এই বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য যেন তাহারই অনুরূপ।

ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। আহারের সময় হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমিও নিম্নে নামিয়া গেলাম। শ্রীমতী রাদেঁভি আড়ম্বরসহকারে আমার হস্ত গ্রহণ করিলেন। উভয়ে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলাম। জনৈক ভৃত্য বৃদ্ধের আসনখানি ঠেলিয়া টেবিলের কাছে লইয়া গেল। দেখিলাম, তিনি লোলুপ-দৃষ্টিতে সজ্জিত ফলমূল ও অন্যান্য আহার্য্যের প্রতি চাহিতেছেন। অতিকষ্টে তিনি এক পাত্র হইতে অপর পাত্রের দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার শরীর কাঁপিতেছে।

সাইমন করে কর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি ভারি আমোদ পাইবে।" বালকবালিকারা সকলেই বুঝিতে পারিল, আমার চিত্তবিনোদনের জন্য আজ পেটুক প্রপিতামহকে লইয়া মজা করা হইবে। সুতরাং পিতার কথায় তাহারা হাসিতে লাগিল। তাঁহাদের জননী একটু মুচকিয়া হাসিলেন! সাইমন বৃদ্ধকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ চমৎকার পিষ্টক তৈয়ার হই-য়াছে।" বৃদ্ধের রেখাঙ্কিত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার সর্ব্বদেহ ঘনঘন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি যে কথাটা বুঝিতে পারিয়া-ছেন, এবং তজ্জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলে ইহা বুঝিতে পারিল। আমরা আহার করিতে বসিলাম।

সাইমন আমার কাণে কাণে বলিলেন, "একবার চেয়ে দেখ!" বৃদ্ধ স্যূপ খাইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য উহা পান করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং একজন ভৃত্য চামচের সাহায্যে জোর করিয়া তাঁহার মুখবিবরে স্যূপ ঢালিয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধ উৎসাহসহকারে নিশ্বাস-ত্যাগ করিতে লাগিলেন; তাঁহার অভিপ্রায়, তিনি উহা পান করিবেন না। সুতরাং তাঁহার মুখ-নির্গত স্যূপ চারি দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এ দৃশ্যে বালক বালিকারা যেন আনন্দে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তাহাদের জনকও অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধটি কি খুব মজার লোক নন?"

আহারকালে সকলেই সেই চিররুগ্ন জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে লইয়া পড়িল। টেবিলের উপরিস্থিত আহার্য্যপূর্ণ পাত্রগুলির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া

চাহিয়া বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ হস্তের সাহায্যে তাহাদিগকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। তাহারা পাত্রগুলি প্রায় তাঁহার হাতের কাছেই রাখিয়াছিল। তাঁহার নিষ্ফল চেষ্টা, শীর্ণ কম্পিত হস্ত পাত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, অথচ নাগাল পাইতেছে না; আহার্য্যের সুগন্ধে রসনায় লালা ঝরিতেছে; নাসিকা বিস্ফারিত; নয়নে ক্ষুধার তীব্র তাড়না; তাঁহার সমগ্র দেহ ও প্রকৃতি যেন ঈপ্সিত খাদ্যের জন্য লালায়িত, ব্যাকুল; একান্ত আগ্রহে টেবিলের আচ্ছাদনবস্ত্রই জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন; কণ্ঠে অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া বালক-বালিকারা আনন্দে বিহ্বল হইল। জনক জননী ও সমাগত সকলেই এই বীভৎস দৃশ্যে পরম আনন্দ লাভ করিতেছে!

তার পর তাহারা এক টুকরা খাদ্য তাঁহার পাত্রে অর্পণ করিল। তিনি আরও পাইবার আশায় বুভুক্ষু জনোয়ারের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা খাইয়া ফেলিলেন। এ দিকে যখন পিষ্টক আনীত হইল, বৃদ্ধের তখন মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। লোভহেতু তিনি নানারূপ অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিলেন। গৃহিণী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি অনেক খেয়েছ, আজ আর পাবে না।" তাঁহাকে আর দেওয়া হইবে না, তাহারা যেন এমনই ভান করিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যে বালক বালিকারা হাসিয়াই আকুল। অবশেষে তাহারা অতি অল্পমাত্রায় তাঁহাকে পিষ্টক অর্পণ করিল। প্রথম গ্রাস ভোজন করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে অতিলোভজনিত একপ্রকার অপূর্ব্ব শব্দ নির্গত হইল। হংস যখন কোনও বৃহৎ পদার্থ গ্রাস করে, তখন তাহার কণ্ঠে যেমন একপ্রকার শব্দ হয়, হাঁস যেমন গলদেশ আকুঞ্চিত প্রসারিত করে, তাঁহার গ্রীবাদেশের অবস্থা তখন সেইরূপ হইল। পাত্রের পিষ্টকটুকু শেষ হইয়া গেলে তিনি আরও পাইবার আশায় পুনঃপুনঃ পদতাড়না করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখবোধ হইল। আমি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিলাম, "উঁহাকে আর একটু দিবে না?" সাইমন বলিলেন, "না বন্ধু, বেশী খাইলে, উঁহার শরীরের অপকার হইবে। এ বয়সে বেশী খাওয়া ভাল নয়।"

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু বলিলাম না। কথাটা পুনঃপুনঃ

ভাবিয়া দেখিলাম। কি চমৎকার তত্ত্বজ্ঞান, কি অপূর্ব্ব নীতি, কি বিচিত্র বুদ্ধি! এই বয়সে! বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের অনুরোধেই ইহারা তাঁহাকে তাঁহার জীবনের চরম সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে? এই জরাজীর্ণ, অকর্ম্মণ্য দেহ লইয়া বৃদ্ধের কি হইবে? তাহারা বৃদ্ধের জীবন-রক্ষার জন্যই বিব্রত! তাঁহার জীবন আর কতকাল? দশ, বিশ, পঞ্চাশ, অথবা আর এক শত দিনই হউক? তাঁহার জীবনধারণের প্রয়োজনই বা কি? নিজের জন্য কি? অথবা আরও কিছুকাল পরিবারের মধ্যে পেটুক বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিলে সকলের মজা করিবার সুবিধা হইবে?

এ জীবনে তাঁহার আর কিছু করিবার অবশিষ্ট নাই। এখন তাঁহার একমাত্র কামনা, একমাত্র আনন্দ,—ভোজনে। যতদিন তাঁহার মৃত্যু না হয়, ততদিন তাঁহাকে এ আনন্দে বঞ্চিত রাখিবে কেন?

কিছুকাল তাস খেলিবার পর আমি শয়নাগারে ফিরিয়া গেলাম। আমার মন অত্যন্ত অপ্রফুল্ল ও উৎসাহহীন। বাতায়নসমীপে বসিলাম। বহুদূরে কোথায় কোন বৃক্ষে বসিয়া একটা পাখী বড় মধুর ডাকিতেছিল, আমি শুধু তাহাই শুনিতেছিলাম। সম্ভবতঃ পাখীটি তাহার সঙ্গীটিকে ঘুম পাড়াইবার জন্য নিশাকালে এমনই মৃদুকণ্ঠে গাহিতেছিল।

তখন আমার হতভাগ্য বন্ধুর পাঁচটি সন্তানের কথা মনে পড়িল। কল্পনা-নেত্রে দেখিলাম, তিনি তাঁহার কুৎসিতা পত্নীর পার্শ্বে নাসিকাগর্জ্জনসহকারে নিদ্রাগত।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রেমার্থিনী।

এ বিশ্বের মধুময় সৌন্দর্য্য-মেলায়,
কে তুমি মদিরেক্ষণা মোহিনী সুন্দরী,
রূপ-পুষ্পে সঞ্চারিণী লাবণ্যবল্লরী,
ঢলিয়া গলিয়া পড়ে মরি কি লীলায়!

---

* গীদে মোপাসাঁ রচিত কোনও ফরাসী গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

চন্দ্র-চন্দনের লেখা শোভে দিব্য ভালে,
সীমন্তে অম্লানজ্যোতি শুভ্র শুকতারা,
কি স্বপনে কার ধ্যানে মুগ্ধ আত্মহারা,
জ্বলিছে রতন-রাজি মুক্ত কেশজালে।

অসংবৃত নীলাম্বর,—চঞ্চল অঞ্চল,
অঙ্গের মন্দার-গন্ধে মোদিত ভুবন,
তরলিত রত্নহার,—জ্যোতিষ্ক-কঙ্কণ,
কটীতে কনককাঞ্চী করে ঝলমল।

হাতে লয়ে নব-ফুল্ল যূথিকার মালা—
শুচিশোভা দীর্ঘ-দীপ্ত ছায়াপথখানি—
কার লাগি ভ্রমিতেছ, অয়ি রূপ-রাণী,
কাহার প্রণয়-স্বপ্নে মুগ্ধা তুমি বালা ?

কত বর্ষ, কত যুগ, কত কল্প ধরি'—
দুর্লভ সে বল্লভের মিলন-আশায়
ফিরিতেছ কুঞ্জে কুঞ্জে মত্ত-বাসনায়
একাকিনী প্রেমার্থিনী, ছায়া-সহচরী !

আমরা ধূলির শিশু ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী,
বুঝি না ও প্রেম তব,—তপস্যা কেমন,
একবার প্রেমমন্ত্র কর উচ্চারণ,
ধন্য হোক, পুণ্য হোক এ দগ্ধ পৃথিবী !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাহিত্যের উন্নতির বাধা

অমর কমলাকান্ত বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা যদি ঠিক্ আজিকার তারিখে নূতন প্রকাশিত হইত,—আমাদের সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্ত্তক যদি এই সম্মিলনীতে তাঁহার সুহৃদের নিমন্ত্রণে আজ 'বড়বাজার' প্রবন্ধটি পাঠ করিতেন, তাহা হইলে কি ঐ প্রবন্ধের প্রত্যেক ছত্র পঠিত হইবামাত্র এই সভা হইতে করতালিধ্বনি উত্থিত

হইত না? স্বীকার করি যে, এখন সাহিত্যের বড়বাজারে বড় মহাজনের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু যদি আমরা একটুখানি আত্মাদরের মোহ কাটাইয়া আমাদের অক্ষরময়ী কীর্ত্তির সমালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এখনও কমলাকান্ত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সেই প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিক্রেয় পদার্থ আমরা নিজেরাই বেচিতেছি, নিজেরাই কিনিতেছি। অনেক পত্রিকাদির লেখকেরা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা স্বরচিত প্রবন্ধটি ছাড়া পত্রিকার অন্য অংশে অবহিত হয়েন না। এখনও অনেক সাহিত্যে আমাদের বিক্রেয় যশের গন্ধ এত বিকট যে, পথিকদিগকে নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতে হয়। আমরা আত্মমহিমায় মুগ্ধ হইয়া অনেক প্রশস্তির রচনা করিয়া থাকি; কিন্তু সজাগ হইয়া আপনাদের দোষ ও ক্রটী-গুলির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে না।

"বাগর্থপ্রতিপত্তি"র রাজ্য অতিক্রম করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর অনেকেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যে বঙ্গসাহিত্য ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা অবলাদের হিত-কামনায় উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে। আফিস আদালত প্রভৃতি পুরুষদিগের সময়ের যে অংশটুকু অধিকার করিয়া থাকে, একমাত্র নিদ্রার সাহায্যে তাহার ধ্বংস করিতে না পারিলে অবলাকুল এই সাহিত্যরূপ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। লেখাপড়ায় অনুরাগ নাই বলিয়াই যে কর্ম্মক্ষেত্রের পুরুষগণ বঙ্গসাহিত্যের অনাদর করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা তাঁহাদের পড়িবার মত সামগ্রী দিতে পারি না বলিয়াই তাঁহারা কিছু পড়িতে চাহেন না। যোগ্যতার অভাবে বিচারককে নিজের মনের কথা বুঝাইতে না পারিয়া উকীলেরা যখন বিচারপতিকে 'গাধা' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন গায়ের জ্বালা একটু কমে; কিন্তু মক্কেলের কিছু উপকার হয় না। দেশ-কাল-পাত্র জানিয়া আমরা যদি সাহিত্যকে মনোহর করিয়া তুলিতে না পারি, তবে সে অপরাধ পাঠকের নহে।

লেখকেরা এ কথা বিলক্ষণ জানেন যে, তাঁহাদের রচনা শিক্ষিত ও বিচারদক্ষ পাঠকেরা পড়েন না। তাঁহারা এ কথা জানেন বলিয়াই সপ্তাহে সপ্তাহে ও মাসে মাসে সাহিত্যের বিপুল স্তূপ রচনা করিতে সাহস পান। শ্রোতা কে, অথবা পাঠক কে, এ কথা জানার উপর বক্তা ও লেখকের কীর্ত্তি অনেকপরিমাণে নির্ভর করে। সুশিক্ষিতেরা পড়িবেন জানিলে, কদাচ

সরলা

চিত্রকর—জে, বি, গ্রুজ্‌।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

এত নিঃসঙ্কোচে সাহিত্যের অবয়ব ফুলিয়া উঠিতে পারিত না। সুরচিত কবিতা অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য; কিন্তু সুরচিত না হইলে পদ্যের মত আবর্জ্জনা অতি অল্পই আছে। সুরচিত কবিতা দুর্লভ বলিয়া ইউরোপীয় সাময়িক পত্রিকাদিতে ক্বচিৎ ক্বচিৎ উহার দর্শনলাভ করা যায়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায় প্রতিমাসে ন্যূনপক্ষে তিন চারিটি কবিতা প্রকাশিত হয়। একটু স্থান ফাঁক পাইলেই সম্পাদকেরা ছাপাখানার 'কোয়াডে'র পরিবর্ত্তে কবিতা সাজাইয়া দিয়া থাকেন! অনেক ইংরেজী গল্প বিকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়া ধারাবাহিকভাবে অনেক পত্রিকার সৌন্দর্য্য-বিধান করিয়া থাকে। এ সাহিত্যের প্রতি যদি কেহ বীতরাগ হয়, তবে সে দোষ কাহার? বিদেশীয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য যদি ভাষান্তরিত হইয়া জ্ঞান-চর্চ্চার সহায় হয়, সে ভাল কথা। কিন্তু Skylarkকে ভারুই পাখী সাজাইয়া নূতন সৃষ্টি করিলে অতি অপাঠ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বঙ্গ-সরস্বতী যদি কিছু দিন তপঃশীর্ণা গৌরীর মত ক্ষীণ অঙ্গযষ্টি ধারণ করেন, তবে তাঁহার মহিমা ও প্রভা বাড়িয়া উঠিবে।

আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলি পড়িলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, শিক্ষিত লোকেরা আমাদের পাঠক হয়েন না কেন? কোনও লেখক কোনও একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া প্রাণের টানে কিছু প্রচার করিতে আসিয়াছেন, বা লিখিতে আসিয়াছেন, প্রায়শঃ কোনও প্রবন্ধে সে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন সম্পাদকের অনুরোধে যা তা লিখিয়া পত্রিকা পূরাইবার জন্য, অথবা সুবিধা পাইয়া যা তা দু' কথা লিখিয়া একটা 'জীবিত লেখক',—Living author—বলিয়া সংজ্ঞা পাইবার জন্য লেখকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন। যাঁহারা কিছু লিখিবার জন্য আহূত বলিয়া অনুভব করেন নাই, প্রাণের টানে সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন নাই, কদাচ তাঁহারা সুবুদ্ধি ও সুশিক্ষিতদিগের আদর-লাভ করিতে পারিবেন না। উদ্দেশ্যহীন বলিয়া আমাদের অধিকাংশ লেখকেরা প্রয়োজন অনুসারে খোসনবীশের পুত্রের মত বর্ণপরিচয় হইতে রোম দেশের ইতিহাস ও শশিরম্ভা নাটক পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন! আমরা একটি অতি সহজ সর্ব্ববাদিসম্মত কথা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই; মনে থাকে না যে, যে সকল গুণে মানুষের মনুষ্যত্ব, সেই সকল গুণেই সাহিত্যের সাহিত্যত্ব। কল্পনার খেয়ালে যে কোনও বিষয়ে যাহা কিছু লিখিলেই সাহিত্য হয় না।

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বঙ্গসাহিত্যের কিঞ্চিৎ সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন।

কি কারণে সংসার-অনভিজ্ঞ বালকদিগের নিকট বঙ্গসাহিত্যের কোনও কোনও অংশ প্রীতিপ্রদ হয়, তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেই, ঐ সাহিত্যের প্রকৃতি ও উৎপত্তির আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বালকেরা ইউরোপীয় প্রেমবিষয়ক কবিতা ও গল্প পড়িয়া একটা অস্বাভাবিক নূতন ধরণের মধুরতার পিপাসু হইয়া উঠে; লেখকেরাও যখন ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠে উদ্বুদ্ধ হইয়া কোনও কল্পিতা নলিনীর নামে প্রেমের হা-হুতাশ রচনা করেন, তখন পাঠশালার কক্ষ দীর্ঘনিশ্বাসে তপ্ত হইয়া উঠে! যখন নিরূপিত পাঠের কঠোরতা অতিক্রম করিয়া—

"কাব্যরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে মন্‌টা
(এবং) পয়ার লিখেই কেটে যায় Geometryর ঘণ্টা"—

সে সময়ে যে সাহিত্য বালকের আদরের সামগ্রী হয়, সংসারের অভিজ্ঞতার দিনে তাহা কেবল উপহাসের জিনিস হইয়া দাঁড়ায়। রামী-বর্ণিত বসন্ত রান্নাঘরের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। বালক-পূজিত সাহিত্যিকেরাও অল্প দিনেই মর্ম্মে মর্ম্মে গেটের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির সত্যতা অনুভব করেন যে,—

What dazzles, for the moment spends its spirit;
What's genuine, shall posterity inherit.

এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে আমাদিগকে পদে পদে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যকে বিকৃত করিয়া আমরা দেশের সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিব না। এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যকেও বিকৃত করিয়া নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিব না। আমাদের দেশের অবস্থা, দেশের ভাব, দেশের সমাজ গভীর-ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে যে উপাদান সংগৃহীত হইবে, তাহা দিয়াই যথার্থ সাহিত্য গড়া যাইতে পারিবে। দেশের প্রাণকে না চিনিলে, এবং সে প্রাণের প্রাকৃতিক আকর্ষণের দিক্‌টি অনুভব করিয়া না লইলে, খাঁটী ইংরেজী সুরে গান গাহিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিব না। আমাদের সমাজ কি, এবং সমাজের অভাব কি, তাহা যখন বুঝিয়া লইতে পারিব, এবং তাহা বুঝিয়া যথার্থ প্রেমে উদ্দীপ্ত হইব, তখন কবিতায় হউক, গল্পে হউক, ইতিহাসে হউক, আমাদের প্রাণের টানে যে সাহিত্য উদ্ভূত হইবে, শিক্ষিত অশিক্ষিত কোনও পাঠক তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমরা যখন ভাষাকে অযথা ফুলাইয়া প্রাণের টানের অকৃত্রিমতা বুঝাইয়া আসর জমকাইতে চাই,

তখন ভুলিয়া যাই যে, পাঠকেরা আওয়াজ শুনিয়া অনায়াসেই খাঁটী ও মেকীর প্রভেদ বুঝিতে পারেন। আমাদের ছোট বড় সকল উৎসাহের কথাই একটা সপ্তমে বাঁধা "প্যাটেণ্ট ঔষধ-বিক্রয়ের ভাষা"য় লিখিতে গিয়া ভাবের কৃত্রিমতাকে অতিরিক্তমাত্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলি। যেখানে সত্যনিষ্ঠা আছে, এবং প্রাণের টান আছে, সেখানে ভাব অসংযত হয় না, ভাষাও অসংযত হয় না। এখানে এই সহরের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের নাম করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না। যাঁহার নাম করিতে চাহিতেছি, তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি জীবিত নহেন বলিয়াই দৃষ্টান্তস্থলে সেই সাহিত্যিকের নাম করিলাম। যদিও আমি স্বর্গীয় মহাপুরুষের সামাজিক অনেক মতবাদ কখনও অবলম্বন করিতে পারি নাই, তবুও তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ"কে আমি এ দেশের সাহিত্যে অমূল্যরত্ন বলিয়া মনে করি। অগাধ জ্ঞান, গভীর চিন্তাশক্তি, তীক্ষ্ণ বিচারপ্রণালী, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম, অদম্য উৎসাহ ও গভীর সত্যনিষ্ঠা গ্রন্থখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান। অথচ ভাষা কি সংযত, কি সরল, কি চিত্তাকর্ষক! কুত্রাপি "আমাদের গৌরবের নামে" প্যাটেণ্ট ঔষধ-বিক্রয়ের ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা নাই, অথচ ভাবের প্রাণস্পর্শিতা সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয়। তিনি যে বহুল ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দিগের রচনা পরিপাক করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থখানিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের আওতায় পুঁতিয়া ক্ষীণপ্রাণ করেন নাই।

ভূদেব বাবুর মত পণ্ডিত না হইলে কেহ কিছু লিখিতে পারিবেন না, এ কথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের সত্য কোনও জাতি-বিশেষের জিনিস না হইলেও, এবং উহার প্রসার বিশ্বব্যাপী হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তখন সেই দেশের জলবায়ুতে তাহা খাঁটী ভাবে বর্দ্ধিত হওয়া চাই। যিনি সাহিত্যক্ষেত্রের লেখক হইবেন, তাঁহার যদি প্রাণের টানে কিছু লিখিবার বা প্রচার করিবার না থাকে, তবে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া পদরচনা করিলেও সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারিবেন না। উদ্বুদ্ধ-কৌতূহলে যদি সত্যনিষ্ঠার সহিত সাহিত্যের প্রতিপাদ্য সত্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেই সফলতার আশা করা যায়, নহিলে নহে। কখনও বা কোকিলের প্রতি, কখনও বা নলিনীর নামে, বাছা বাছা শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রাণহীন কবিতা কিংবা গল্প লিখিলে,

সে সাহিত্য কেবল "নীলাকাশ", "সমীরণ" ও "কুহু"র কুহকে টিকিতে পারিবে না। যেখানে স্থিরপ্রাণতা (Seriousness) নাই, অকপটতা (Sincerity) নাই, সেখানে সাহিত্য কেন, উচ্চদরের ভাঁড়ামীও চলে না।

আমি পূর্ব্বে সমাজ-পর্য্যালোচনা ও উপাদান-সংগ্রহের কথা বলিয়াছি। উহাই সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান ও প্রথম ভিত্তি। আমরা যদি সাহিত্যে একটা ক্ষণস্থায়ী ভেল্কিবাজি করিতে না চাই, তবে নূতন সৃষ্টির উপায়স্বরূপে জীবন- ও সমাজের সমালোচনার একটি স্তর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। দুই একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিব। যে প্রাচীন প্রাকৃতভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে একালের বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এখনও তাহার সমালোচনা হয় নাই। বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত এমন অনেক দেশী শব্দ আছে, প্রতিবেশী আর্য্যেতর জাতির ভাষা হইতে যাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রতিবেশী জাতির সেই ভাষা বা ভাষাগুলি শিখিয়া লইবার এখনও কোনও উদ্যোগ হয় নাই। অথচ যদি দেখিতে পাই যে, এই সকল যথার্থ উপাদান উপেক্ষা করিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাস ও শব্দাদির ব্যুৎপত্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হইতেছে, তখন কি বলিব? উপাদান-সংগ্রহই যে একটা সৃষ্টিকার্য্য, এ কথা ভুলিয়া গিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা ঐ সংগ্রহের জন্য বসিয়া না থাকিয়া বরং কিছু লিখিয়া ফেলি ; পরে না হয় উহার ভ্রমসংশোধন হইবে! কথাটি আপাততঃ শুনিতে মন্দ নয় ; কিন্তু যাহা ভাষার উৎপাদক ও পরিবর্দ্ধক, তাহার সহিত পরিচয় না হইলে লিখিবার যে কিছুই থাকে না! অসার মৌলিকতার পূর্ব্বে শ্রমসাধ্য সমালোচনা ও সংগ্রহ আবশ্যক। প্রকৃত উপাদান চিনিয়া ফেলিলে যে এখন-কার মন-গড়া তত্ত্ব সমূলে বিনষ্ট হইবে! সংশোধন করিয়া রক্ষা করিবার যে কিছুই থাকিবে না! তবুও কি সাহিত্যের নামে ঊর্ণনাভ-জালের বিস্তার করিব?

সমাজতত্ত্ববিদেরা (Sociologists) এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, এ নূতন যুগে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিভার (Geniusএর) স্থান নাই। মানুষ যাহা লইয়া চিন্তা করিবে, যাহা লইয়া সাহিত্য গড়িবে, তাহার প্রত্যেক বিভাগে সাধারণবুদ্ধি লোকের পরিশ্রমে এত ঘটনা বা উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, বা হইতেছে যে, সেগুলি পরিশ্রমসহকারে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া না লইলে, কেহ কোনও তথ্যের নির্ণয় করিতে পারিবেন না, সত্যের

উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না, সাহিত্যকে নবসৃষ্টির মহিমায় গৌরবান্বিত করিতে পারিবেন না। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, অনেক বড় বড় বুদ্ধিমান্ কেবল কথার তুলাই ধুনিতেছেন, এবং অসার রচনা সুপাঠ্য করিবার প্রয়াসে অতি সহজ কথাগুলিকে কেবল বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া প্রকাশ করিতেছেন!

উপাদান-সংগ্রহ ও সমালোচনার কার্য্য অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ত বটেই, তাহা ছাড়া ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন সত্যমুখাপেক্ষিতার সাধনা চাই। যে জিনিসটি যেমন, তাহাকে ঠিক্ তেমনই করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ কিংবা অন্ধ স্বদেশপ্রেমের মোহ যদি মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তবে আমরা উপকরণসংগ্রহ ও সমালোচনা করিতে পারিব না। যদি আমরা পূর্ব্বকালে কোনও ভাব বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমাদের প্রথাপদ্ধতির কোনও অংশ প্রতিবেশী অনার্য্যদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি, যদি দেশের কোনও প্রাচীন ভাব বা প্রথা আমাদের এ কালের প্রিয় ব্যবহারের বিরোধী বলিয়া জানিতে পারি, যদি জাতিশরীরে বিবিধ রক্তমিশ্রণের কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে সত্যকাম জাবালের মত তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ধর্ম্ম ও সমাজের পবিত্রতা-রক্ষার নামে প্রাচীনতা কিংবা নবতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ যাহা করিতেছেন, তাহার সহিত আমাদের কোনও সংস্রব নাই। যিনি যাহা ভাল মনে করেন, তিনি তাহা করিতেছেন, এবং করিবেন। আমরা সে সকল কথায় কিছুমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া সাহিত্যের জন্য নির্ভীকভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিব। সত্য কখনও অসত্যের সঙ্গে তিলমাত্র সন্ধিস্থাপন করে না। কাজেই আমরা কোনও পক্ষের মনস্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিব না। সকল সামাজিক অনুষ্ঠানেরই ইতিহাস আছে ; সমাজতত্ত্ব (Sociology) নামক সাহিত্যের জন্য আমরা সে ইতিহাস সংগ্রহ করিব। প্রেমের ইতিহাসের বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, উহার জন্ম কোনও খাঁটী কুলীনের বংশে নহে। কিন্তু সমাজের সুবিকশিত প্রেম সকল মাণিক্যমুক্তা অপেক্ষা মূল্যবান্। কাজেই ইতিহাস ও তথ্যের বিশ্লেষণ দেখিয়া কাহারও শঙ্কা করিবার কিছুই নাই।

আমার বক্তব্য কথাগুলি এই ঃ—

(১) আমরা এখন ইউরোপীয় সাহিত্যের চাপে পড়িয়াছি। আমাদের জ্ঞানবিকাশ ও সুশিক্ষার পক্ষে উহা প্রতিকূল নহে, বরং অবশ্য-অবলম্বনীয়

সহায়। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্য যে মাটীতে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিশেষত্বটুকু কেবল সেই দেশের জন্য। জ্ঞানের অংশ হইতে আমরা এই অংশকে সর্ব্বদা পৃথক্ করিতে পারি না। সবই আমাদের উপযোগী মনে করিয়া, উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আমরা কখনও বা ঐ সাহিত্যকে বিকৃত করিয়া বঙ্গসাহিত্য নামে প্রচারিত করি, কখনও বা ইউরোপীয় সাহিত্যের আওতায় আমাদের সাহিত্যের চারাগাছটি লাগাইয়া উহাকে অল্পজীবী করিয়া থাকি।

(২) জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, কাব্য ও সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি জন্মিতে পারে না; কেন না, ঐ অভিজ্ঞতাই উহাদের প্রাণ। প্রাচীন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ইতিহাস না জানিলে, যে সকল সাহিত্য ও অনুষ্ঠান প্রাচীন সময় হইতে বর্দ্ধিত, তাহাদের সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। কাজেই এখন গভীর ও বিস্তৃত অনুসন্ধান দ্বারা উপাদানসংগ্রহ ও সমালোচনার কার্য্য করিতে হইবে। নহিলে নূতন সৃষ্টি অসম্ভব।

(৩) উপাদান-সংগ্রহ করিতে হইলে সত্যনিষ্ঠা চাই, নির্ভীকতা চাই; যে জিনিসটি ঠিক্ যেমন, তাহাকে সেইরূপে দেখিয়া লওয়া চাই। আমাদের কোনও প্রকার স্বার্থের অনুরোধে যেন আমরা সত্যকে আপনাদের মতের অনুকূল করিয়া ব্যাখ্যা না করি।

(৪) যদি প্রাণের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতে যাই, যদি একটা লক্ষ্য বা Mission থাকে, তাহা হইলেই সাহিত্যিক হইতে পারিব—নহিলে নহে। *

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

* চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি।]

প্রশস্তি-পরিচয়।

ঢাকা জেলার [ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতললক্ষার মধ্যবর্ত্তী] মহেশ্বরদি পরগণার অন্তঃপাতী 'বেলাব' নামক গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থ নিজকুটীরের নিকট গর্ত্ত খনন করিবার সময়ে [বিগত এপ্রেল মাসে] এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয়। সে এই শাসন-খানিকে আকাশ হইতে পতিত সুবর্ণপত্র মনে করিয়া ইহাকে গোপনে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রফলকের শীর্ষদেশস্থ রাজমুদ্রাটি চাঁছিয়া ফেলিয়াছিল। সেটেল্‌মেণ্ট কার্য্যোপলক্ষে সব-ডেপুটী-কালেক্টার শ্রীযুত প্রমথনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয় এই তাম্রশাসনের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া [গত জুন মাসে] ইহা হস্তগত করিয়া ঢাকা নগরীতে আনয়ন করিলে, ইহার কথা প্রকাশিত হয়। তৎকালে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আমি ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলাম। দত্তমহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য এই তাম্রশাসনখানি আমার পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীমান শ্যামলাসুন্দর করের ও শ্রীমান নিকুঞ্জবিহারী সেনের দ্বারা আমার নিকট [বিগত ২৪শে জুন তারিখে] প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি আশাতীত সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যেরূপ আবিষ্কার-কাহিনী অবগত হইয়াছিলাম, তাহাই লিখিত হইল।

আবিষ্কার-কাহিনী।

আমার পূর্ব্বে আর কেহ এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার-সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আমি গদ্যাংশের অধিকাংশ পাঠ উদ্ধৃত ও লিপিবদ্ধ করিবার পর, দত্ত মহাশয় আমার নিকট হইতে উদ্ধৃত পাঠ সহ তাম্রশাসনখানি [তাঁহার উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুত এফ্. ডি. আস্কলি মহোদয়কে দেখাইবার জন্য [বিগত ২৬শে জুন তারিখে লইয়া গিয়াছেন। মূল তাম্রশাসন দেখিবার আর সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। তাহা দুই দিবসমাত্র আমার নিকট ছিল। তৎকালে পেন্সিলের সাহায্যে যে ছাপ ও ফটোগ্রাফের সাহায্যে যে ছবি তুলিয়া পাঠোদ্ধারের আয়োজন করিয়াছিলাম, তাহাই আমার অবলম্বন। তাহাতে দুই এক স্থলে দুই একটি অক্ষর উঠে নাই, এবং মূল ফলকের প্রথম

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

পৃষ্ঠার ১২-১৪।১৭।২১ পংক্তির যে সকল অক্ষর কালপ্রভাবে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারও পরিষ্কার ছাপ গৃহীত হইতে পারে নাই। মূল তাম্রশাসনের সহিত মিলাইয়া লইতে না পারায়, সেই সকল স্থলে নিঃসংদিগ্ধ হইবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় পাঠোদ্ধারের চেষ্টা কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যালয়ে আসিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট নানা বিষয়ে উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করিয়া যে ভাবে পাঠ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই সুধীগণের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। কোনও ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করিলে, তদ্বিষয়ে আমাকে অবগত করাইলে কৃতজ্ঞ হইব।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

পাঠোদ্ধারের পর আমাকেই ব্যাখ্যা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তাম্রফলকে যে সকল "রাজপাদোপজীবী"র উল্লেখ আছে, তাঁহারা কে কোন্ রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। অন্যান্য তাম্রশাসনের সাহায্যে এতদ্বিষয়ক ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই তাম্রশাসনের দ্বারা যে স্থানে ভূমিদান করা হইয়াছিল, তাহার সন্ধান করিবার অবসর প্রাপ্ত হই· নাই। যাঁহাকে ভূমিদান করা হইয়াছিল, তাঁহার বংশে কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না, তাহারও অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। কোনও কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যা-কার্য্যে অন্যান্য তাম্রশাসনের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, এবং তাহা যথাস্থানে পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে গৃহস্থ এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে ইহার রাজমুদ্রাটি চিহ্নহীন করায়, তাহার "লাঞ্ছন" কিরূপ ছিল, তাহা আর দর্শন করিবার উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ৪৮ পংক্তিতে রাজমুদ্রাটির যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজমুদ্রায় "বিষ্ণুচক্র" মুদ্রিত ছিল; তন্মধ্যে রাজার নাম ক্ষোদিত ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

"দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যন্তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলিখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ॥
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥"

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির [যন্ত্রস্থ] "গৌড়-লেখমালা" গ্রন্থে পূজ্যপাদ শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাম্রশাসন-সম্পাদনের যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান তাম্রশাসন তদনুসারেই সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং দানকালে যথাবিধি উদকপূর্ব্বক [৪৫ পংক্তি] গ্রহীতাকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই তাম্রপট্টখানির আয়তন ১০¼ × ৯½ ইঞ্চ। ইহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ দানলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই। আরম্ভে—"ওঁ সিদ্ধি" লিখিত আছে। তাহাতে বিসর্গ চিহ্নের অভাব। বংশবিবৃতি-সূচক ১৫টি শ্লোকের শেষে ২৪ পংক্তি হইতে ৪৯ পংক্তি পর্য্যন্ত গদ্যাংশ এবং সর্ব্বশেষে একটি শ্লোক, তৎপরে লিপিকাল ও স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর। কৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও, দুই এক স্থলে লিপিকর-প্রমাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

লিপি-পরিচয়।

এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া [চন্দ্র-বংশীয়] "মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্ম্মদেব-পাদানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক- মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্ভোজ" [২৫।২৬খৃ পংক্তি] তদীয় রাজ্যসংবতের পঞ্চম সংবৎসরে ১৯ শ্রাবণ দিনে [৫১ পংক্তি [সাবর্ণ-গোত্রীয়-ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবৎ-ঔর্ব্ব-জমদগ্নি-প্রবরের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব পীতাম্বরদেব-শর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র শ্রীরাম-দেবশর্ম্মাকে [৪১—৪৫ পংক্তি] "সপাদনবদ্রোণাধিকপাটক" পরিমিত ভূমি [২৮—২৯ পংক্তি] ভগবান বাসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [৪৬—৪৭ পংক্তি] দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ম্মরাজগণের স্থান কোথায়, [উপযুক্ত প্রমাণাভাবে] তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদ্যঃপ্রকাশিত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে [৫৯—৬০ পৃষ্ঠায়] বন্ধুবর শ্রীযুত রামপ্রসাদ চন্দ্র বি. এ. মহাশয় বর্ম্মরাজবংশের উদ্ভব ও তিরোভাব সম্বন্ধে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় [১৩১৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যায়

লিপি-বিবরণ।

১৩৭ পৃষ্ঠায়] সমালোচক মহাশয় যেরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে এই তাম্রশাসনে কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে।

ক্রমশঃ।

১৮ই আষাঢ়; ১৩১৯ সাল।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

ধর্ম্মকর্ম্মে অনুপ্রাস।

ধরাধামে সর্ব্বধর্ম্মেই অনুপ্রাসের অধিকার। খৃষ্টানের যীশামূশা, ক্রুশকাষ্ঠ, মাতৃমূর্ত্তি মরিয়ম, দেবদূত, সুসমাচার, প্রভাতপ্রার্থনা, বাইবেল, ট্রিনিটি, মারটার; মুসলমানের আল্লা খোদা তাল্লা, আল্লা আল্লা বিসমোল্লা, আল্লা হো আকবর, হজরত মহম্মদ, কোরাণ-শরীফ, দিনদুনিয়ার মালেক, ইমাম, হোসেনহাসান, মহরম, পীরপয়গম্বর, পাঁচপীর, শিয়া ও সুন্নি, মক্কা মদিনা, জেদ্দা জেমো, মোল্লা মুয়াজ্জিন, জুম্মা মসজিদ, মতি মসজিদ, রমজানে রোজা, ফতে দোয়াজ দাহান, মাদ্রাসা মুখতাব মুসাফিরখানা; বৌদ্ধের বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ, কুরুকুল্লা, পদ্মপাণি, প্রজ্ঞাপারমিতা, ত্রিতত্ত্ব বা চীনের সেং-ফেণ-ফণ, দিব্যাবদান, দালাইলামা; শিখের নানক, গুরুগোবিন্দ, গুরুজীর জয়, গুরুদরবার; জৈনের পুণ্যপীঠ পার্শ্বনাথ পাহাড়; আর্য্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী; ব্রাহ্মসমাজের রাজা রামমোহন রায়; সৎপথী সম্প্রদায়, আউল-বাউলের দল, কেহই অনুপ্রাসের উপরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন না। প্রাচীন প্রথার প্রেতপূজা পিতৃপূজাও অনুপ্রাসভজা। সার্ব্বভৌম ধর্ম্মে, সর্ব্ববাদিসম্মত স্তোত্রে অনুপ্রাস। বকধার্ম্মিক ও ধর্ম্মধ্বজীও অনুপ্রাসে গররাজী নহেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে, নির্গুণ নিরুপাধি নিরাকার শুদ্ধবুদ্ধ ব্রহ্মই বলুন, আর সগুণ সোপাধি সাকার ব্রহ্মাই বলুন, কেহই অনুপ্রাসের অতীত নহেন। উপনিষদের আত্মতত্ত্বে, ব্রহ্মবিদ্যায় অনুপ্রাস। জ্ঞানযোগে অনুপ্রাসের আমেজ আসে। কর্ম্মকাণ্ডে, মুক্তিমার্গে, জ্ঞাননেত্রে, অনুপ্রাস সুস্পষ্ট। গভীর প্রণব উচ্চারণের পর যে তৎ সৎ, তাহাতে অনুপ্রাসের রূপ মূর্ত্তিমৎ; তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, সত্যং শিবং সুন্দরং, পরাৎপর, সারাৎসার, সৎচিৎ, আনন্দ, রসো বৈ সঃ, সব অনুপ্রাসরসে ওতপ্রোত। শ্বেতাশ্বতর (উপনিষদ্), যজুঃ (বেদ), তৈত্তিরীয় (শাখা), মাধ্যন্দিন (শাখা), শতপথ (ব্রাহ্মণ), কেন

কঠ, মুণ্ডকমাণ্ডুক্য, পুরুষসূক্ত, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। শুনঃশেফ, শ্বেতকেতু, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, আত্রেয়ী-মৈত্রেয়ী (যুগলে), অনুপ্রাসের অধীন। জীবে শিবে অভেদ, জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ, অনুপ্রাসের অবচ্ছেদ। সাধনায় সিদ্ধি অনুপ্রাসের শ্রীবৃদ্ধি। 'ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি',—অনুপ্রাসের প্রভাবে অকাট্য।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুপ্রাস পদে পদে। ব্রহ্মা বিষ্ণু, কৃষ্ণবিষ্ণু, বিধিবিষ্ণুশিব, ত্রিমূর্ত্তি, দত্তাত্রেয়, ইন্দ্রচন্দ্র, বায়ুবরুণ, স্বাহাস্বধা, পিতৃপতি, প্রজাপতি, বিশ্বেদেবাঃ, দিতিঅদিতি, দেবদৈত্য, দৈত্যদানব, যক্ষরক্ষঃ, নারায়ণ, নরনারায়ণ, বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু, সকলেই অনুপ্রাস-শৃঙ্খলে বদ্ধ। পঞ্চোপাসকও অনুপ্রাস-নাশক নহে।

ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি দেবাদিদেব চন্দ্রচূড় ত্রিনেত্র পিণাকপাণি বৃষভবাহন নীললোহিত পশুপতি পরমপিতা সদাশিব। তিনিই তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, নকুলেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, বীরেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শৈলেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, আবার তিনিই চুঁচুড়ায় ষাঁড়েশ্বর শিব। বাবা বিশ্বনাথ ও বাবা বৈদ্যনাথেও জাগ্রৎ অনুপ্রাস। সদাশিবের শ্মশানে মশানে বিল্ববৃক্ষতলে বাস। তাল-বেতাল-ত্রিশৃঙ্গী তাঁহার অনুচর।

শিবের শক্তি নগনন্দিনী গিরিশগৃহিণী বিন্দুবাসিনী ত্রিতাপতারিণী তারা মহামায়া সিদ্ধেশ্বরী শ্যামা মা জগজ্জননী দয়াময়ী মূর্ত্তিমতী মাতৃমূর্ত্তি। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জয়া-বিজয়া। তিনিই ষোড়শী রাজরাজেশ্বরী। মা কখনও বিন্ধ্যবাসিনী, কখনও কৈলাসবাসিনী, কখনও কাশীবাসিনী বিশ্বেশ্বরের অন্ন-পূর্ণা। আবার কখনও বা শ্রীমন্ত সদাগরের কমলে-কামিনী।

সুরশৈবলিনী শৈলসুতাসপত্নী পতিতপাবনী কলিকলুষনাশিনী জহ্নুকন্যা গঙ্গা। শ্বেতসরোজবাসিনী শারদাম্ভোজবদনা সারদা সরস্বতী বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি। চঞ্চলা কমলার কৃপাকটাক্ষেও অনুপ্রাসের লক্ষ্য আছে।

শৈব 'শিবায় শান্তায়' বলিয়া স্তবস্তুতি করিতেছেন, 'শিব শিব শম্ভো বম বম ভোলা' বলিয়া গদ্গদকণ্ঠ। ভবানীভক্ত শাক্তের শ্মশানবাসিনী শবাসনা দিগ্‌বসনা কালী করালী কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী রণরঙ্গিনী মহিষমর্দ্দিনী হেতিপেতিশোভিতা, গলে দোলে মুণ্ডমালা। ভক্ত শাক্ত 'চণ্ডিকে, চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি' মন্ত্রে তাঁহাকে ভক্তিভরে ভজনা করিতে-ছেন, পিশাচসিদ্ধ হইবার জন্য তন্ত্রমন্ত্রবলে পঞ্চ-মকার-সহযোগে শবসাধনা

করিতেছেন। মহামাংসও ক্বচিৎ পূজার উপচার। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা। শুধু সন্ন্যাসী কেন, সংসারীও 'কালী কুলাও' বা 'কালীকল্পতরু' বলিয়া কল্যাণ কামনা করিতেছেন। তন্ত্রমন্ত্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপেও 'হিং-টিং-ছট' 'তট তট তোতয়' অনুপ্রাসের উদয়!

জ্ঞানের মাত্রা বাড়িলে, কালীকৃষ্ণ কৃষ্ণকালী একাকার, কভু মুণ্ডমালী কভু বনমালী, কভু শ্যাম কভু শ্যামা, করে কভু অসি কভু বাঁশী। অথবা হরিহর রূপে তনু আধ আধ, আহা কিবা মুরহর পুরহর একদেহে বিরাজে। আবার তারা মা কখনও শবশিবা, কখনও হরগৌরী মিলিতাঙ্গ দুইএ একে বিরাজে। পুরুষ-প্রকৃতি একাকার।

সৃষ্টিস্থিতিসংহারে অনুপ্রাস। নারায়ণ যুগে যুগে দানবদর্পদমন বা দনুজদলন ও ভূভারহরণ করিতে ধরাধামে অবতরণ করেন। কলিতে কল্কী অবতারে পরিপূর্ণ অনুপ্রাস। গৌরী-গিরিশের পুত্র বিঘ্নবিনাশন গণেশের ধ্যানে, নারায়ণের ধ্যানে, মহাদেব ও মহামায়ার ধ্যানে, মহিম্নস্তবে, সূর্য্যস্তবে, সুপবিত্র সাবিত্রী-মন্ত্রে, লক্ষ্মীর নিকট ধনধান্যপ্রার্থনায়, সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে, অখণ্ড-মণ্ডলাকারং মন্ত্রে গুরুর অর্চ্চনায়, পাপমুক্তিপ্রার্থনায় পুণ্ডরীকাক্ষের শরণ-গ্রহণে, অনুপ্রাস-মহিমা প্রকট।

হিন্দুর শাস্ত্রশাসনে শ্রুতিস্মৃতি আগমনিগম, বেদউপনিষদ্, বা বেদবেদাঙ্গ-বেদান্ত ও স্মৃতিসংহিতার তিথিতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, হিন্দুর প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে শাস্ত্রসিদ্ধ বিধিনিষেধ, হিন্দুর শাস্ত্রবক্তা শুকসনকাদি সাধু এবং দ্বৈপায়ন ও তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্বের প্রবর্ত্তয়িতা সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার এই চতুঃসন, হিন্দুর সাধুসন্ন্যাসী ত্রিগুণাতীত, (শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ং) শঙ্করস্বামী, শিবানন্দ-স্বামী, শিবনারায়ণস্বামী, শ্রীধরস্বামী, শৃঙ্গেরী মঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শিবানন্দস্বামী, সোহংস্বামী, রামস্বামী, ব্রহ্মানন্দভারতী (লাট), বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, মোহান্ত মহারাজ, মাতাজী মহারাণী (মণ্ডনমিশ্রে অনুপ্রাস, উভয়ভারতীতেও অনুপ্রাস), হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়ামক বেদবিধি বেদবাক্য, হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রের সংস্কারক স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন। হিন্দুর হৃদিস্থিতহৃষীকেশ, হিন্দুর গতিমুক্তি গয়াগঙ্গাগদাধর, হিন্দুর আরাধ্য শালগ্রাম শিলা ও বটবৃক্ষ, হিন্দুর শপথের সহায় তামা-তুলসী, হিন্দুর পুণ্যযুগ সত্যত্রেতা, হিন্দুর পুণ্যবারি জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতী যুক্তবেণী ও মুক্তবেণী,

হরিদ্বার গঙ্গাসাগর, হিন্দুর তীর্থ কাশী কাঞ্চী কামরূপ কামাখ্যা বা কাণের কাছে কালীঘাট, সাগরসঙ্গম মহামুনি (ব্যাসকাশী!), হিন্দুর কাম্য জাহ্নবী-জীবনে নারায়ণ-স্মরণ করিয়া তনুত্যাগ, বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস ও পতিতপাবনের পাদপদ্ম মরণে শরণ।

হিন্দুর আচার বিচার, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, ধ্যানধারণা, জপতপ, যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি, স্তবস্তোত্র, স্তুতিনুতি, পূজাপদ্ধতি, ঋদ্ধিসিদ্ধি, ভজনপূজন, স্নানদান, দানধ্যান, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চারণ চান্দ্রায়ণ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধশান্তি, শ্রাদ্ধসপিণ্ডীকরণ, পিতৃপ্রেতকৃত্যে পিণ্ডপ্রদান, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু মন্ত্রে স্বস্তিবাচন, হোতা পোতা, শিষ্যসেবক, গুরু-পুরোহিত, গুরুগৃহে শিক্ষাদীক্ষা, পালপার্ব্বণ, পূজাপার্ব্বণ, পূজাপাঠ, প্রতিমা-পূজা, ঘটে পটে পূজা, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ফলফুলে বিল্বদলে গঙ্গাজলে পূজা, বারব্রত, দোলদুর্গোৎসব, রথরাস, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণবৈষ্ণববন্দনা, দেবসেবা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, সজ্জনসেবা, সাধুসেবা, ভগবানের ভোগরাগ, পরে ভক্তিভরে প্রসাদপ্রাপ্তি, ভক্তের ভগবান্, ডাক ডুব মুটো আর সব ঝুটো, সর্ব্বত্র অফুরন্ত অনুপ্রাস।

হিন্দুর পুরাণে ব্রহ্মার বর শিবের বর, ব্রহ্মাবাক্য বিফল হয় না, হিন্দুর দেবাদেশ দৈববাণী, হিন্দুর দেবদ্বারে দেবদাসী, হিন্দুর পিতৃপুরুষের পুণ্যে সুখসৌভাগ্য, হিন্দুর পরপীড়নে পাপ, হিন্দুর নরককুণ্ডের নাম রৌরব, হিন্দুর সশরীরে স্বর্গলাভ, স্বর্গসুখ নন্দনকানন, মর্ত্ত্যসুখ মানসসরোবর, হিন্দুর ঐশ্বর্য্য কুবেরভাণ্ডার, হিন্দুর সুশাসন রামরাজ্য, হিন্দুর প্রজারঞ্জক রাজা চারচক্ষুঃ। হিন্দুর প্রভুভক্তি বা প্রভুপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা বীরবর, হিন্দুর সুন্দরীশিরোমণি তিলোত্তমা, হিন্দুর আদর্শদম্পতী সুরলোকে শিবসতী (রোমরাজ্যে জুপিটার-জুনো!), ও নরলোকে সাবিত্রী-সত্যবান্। হিন্দুর পতিব্রতা-রমণীরত্ন সতী-সীতা-সাবিত্রী-শৈব্যা-শকুন্তলা। এই জন্যই হিন্দুকবি অনুপ্রাসের আশ্রয় লইয়া গাহিয়াছেন—'পতিপদে মতি যার তারে বলি সতী।'

অনুপ্রাসের তাড়নায় শিবশূন্য যজ্ঞ পণ্ড। অনুপ্রাসের চাপে পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ-পিতা। শিবকবচ, কালীকবচ, কৃষ্ণকবচ, অনুপ্রাসের প্রভাবে অমোঘ। নৈবেদ্যে ছোলাকলা, কলামূলা বা চালকলা, তিলতণ্ডুল, শ্বেতসর্ষপ, তিলতর্পণ, ষোড়শোপচারে উপাসনা, পঞ্চপল্লব, ত্রিপত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্পপাত্র, পূর্ণপাত্র, কুশাসন, কোশাকুশী, ধূপধূনা, গুগ্গুল, ধূপদীপ, দীপদান, সায়ংসন্ধ্যা,

রাত্তিরেতে প্রাতঃপ্রণাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, স্পর্শদোষ, উৎসব উপলক্ষে ঢাকঢোল, রামরাজা, মেড়াপোড়া, মুণ্ডমালা, চালচিত্তির, বিবাহে প্রজাপতি, লাল চেলী, চেলীর পুঁটুলি, বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ, মলমাস, বারবেলাবিচার, কালবেলা কুলিকবেলা, দগ্ধাদোষ, শনির শেষ, বিষ্যুৎ বারের বারবেলা, পরদায় পরদায় অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের গুণে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ঘরে ঘরে আদর।

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকপূজা, চৈত্রে চড়ক, ফাল্গুনে ফাগুয়া ও ফুটকড়াইমুড়কী, মাঘমাসে মাঘমেলা, জ্যৈষ্ঠে জামাইষষ্ঠী ও যুগলের মেলা, পৌষপার্ব্বণ, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, শীতলা-ষষ্ঠী, গোষ্ঠ-অষ্টমী, চম্পকচতুর্দ্দশী, পটপূর্ণিমা, চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক, শুভস্থচনী, সাঁজপূজনী, তুষতুষলী, কুলকুলতী, চাঁপাচন্দন, পুণ্যিপুকুর, মাঘমাসে মাঘমণ্ডল, ফাল্গুনে ফাগুনকোণা ব্রত, সূতিকা ষষ্ঠী, কসাই-কালী, ফণী মনসা. কালীঘাটের কাঙ্গালী, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস-মাহাত্ম্য। রবিবারে মৎস্যমাংস মাষকলাই নিষেধ ও তৈলতরুণীবর্জ্জন, ভূতপ্রেতের ভয়ে রামনাম, কথকতা, বারইয়ারী ব্যাপার, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু, বিশকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশকর্ম্মা, প্রিয়পরিজনের কল্যাণকামনায় পাঁচশিকার পূজা ও পাঁচ-পীরের কাছে বা সত্যনারায়ণের সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি—এততেও কি অনুপ্রাস-মাহাত্ম্যে সন্দেহ করেন ?

এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। বৈষ্ণব বাবাজীর হৃৎকমলে রাইরাজা আর রাখালরাজা। সখ্যরস, দাস্যরস, মধুর মধুর রাসরস, কোথায় না অনুপ্রাস? বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরামদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ—সমস্তভাবে অনুপ্রাসের দাসানুদাস। চণ্ডীদাসের রামী রজকিনী অনুপ্রাসরসে ডগমগ। প্রভুপরম্পরার আবির্ভাব-তিরোভাবে অনুপ্রাস। পুরুষোত্তম পণ্ডিত অনুপ্রাস-মণ্ডিত। শ্রীনন্দনন্দনের আনন্দকানন শ্রীবৃন্দাবন বৈষ্ণবের তীর্থ, ইহলোকে বৃন্দাবন বাস ও পরলোকে বৈকুণ্ঠবাস তাঁহার স্বর্গসুখ, পাটপর্য্যটন তাঁহার কাম্যকর্ম্ম, রথরজ্জুধারণ রথারোপণ রথারূঢ়-জয়-জগন্নাথ-দর্শন তাঁহার পূর্ণপুণ্য, কৃষ্ণকলি ফুলে 'কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং' মন্ত্রে তাঁহার দেবপূজা। গিরি-গোবর্দ্ধনধারণ তাঁহার শ্রীগুরু গোপেশ্বরের শৌর্য্যবীর্য্য, নবনারীকুঞ্জর ব্রজবিহার বৃন্দাবনবিলাস কেলিকুঞ্জ কেলিকদম্ব বংশীবাদন ষোল-শ' গোপীর কালিন্দীর কূলে বসনহরণ বা যমুনার জলে জলকেলি তাঁহার দেবতার লীলাখেলা, জটিলা কুটিলা তাঁহার শ্রীরাধার সাধনার শত্রু, পরকীয়াপ্রীতি তাঁহার মধুররসের

উৎস, কানাই বলাই শ্রীদাম সুদাম সুবল তাঁহার সখ্যরসের সাধনার সম্বল, (রাখাল বালক ল'য়ে বনে বনে ধবলী শ্যামলী গরু চরান), ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর তাঁহার বাৎসল্যের আধার, দধিদুগ্ধ ক্ষীরসর নবনীত তাঁহার দামোদরের ভোগরাগ, বৃন্দাবনের মাখমমাটী তাঁহার অমৃত আহার, ধড়া চূড়া শিখিপাখা চূয়াচন্দন কুঙ্কুমকস্তূরী তাঁহার বংশীধারী হরির প্রসাধন, মুকুন্দমুরারি রাধামাধব শ্যামসুন্দর মদনমোহন যুগলজীবন বংশীবদন বঙ্কুবিহারী বাঁকেবিহারী বালগোপাল নন্দদুলাল নীলমণি তাঁহার দেবতার নিত্য নব নব নাম। কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণকথা, বৈষ্ণববিধান, বৃন্দাবনবিলাস, বৃন্দাবনধ্যান, ব্রজবিহার, বিবর্ত্তবিলাস, পাটপর্য্যটন, প্রাচীন পদাবলী, গোপীগীতা, গোপীগোষ্ঠ, চমৎকারচন্দ্রিকা, উজ্জ্বলনীলমণি, সখীসংবাদ, মানমাথুর, তাঁহার দেবতার গুণগানগ্রথিত সৎসাহিত্য, ব্রজবুলি তাঁহার ভাবের ভাষা, নামগান তাঁহার ধ্যানজ্ঞান, ষট্সন্দর্ভ তাঁহার দর্শনশাস্ত্র, প্রভুপাদ তাঁহার পূজ্যপদবী, পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী কৃতহরিসেব শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ তাঁহার কর্ণকুহরে মধুধারা বর্ষণ করে—আর ভাবের আবেশে এই মাটীতে মৃদং হয় বলিয়া তিনি গড়াগড়ি দেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের সাধনায়, শচীসুত নদীয়ার নিতাই নিমাই নাটের গুরু, নীলাচলে গৌরহরির নবলীলা, জগাই-মাধাই-উদ্ধার নিত্যানন্দ গৌর-চন্দ্রের মহামহিমা। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, গীতগৌরাঙ্গ, চৈতন্যচৌতিশা, চৈতন্যচরিত, চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত) চৈতন্যচন্দ্রিকা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় (কবিকর্ণপূর-প্রণীত)—সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের অভ্যুদয়। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় যন্ত্রে ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রেমপ্রচারিণী সভায়ও অনুপ্রাস।

এ ঘোর কলিকালেও অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, খড়দহের ফুলদোল, শিব-নিবাসে মাঘমাসে মদনমোহনের মেলা, রামানন্দের রাস, জ্যৈষ্ঠে যুগল, সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তনে খোল করতাল খঞ্জনী, মৃদঙ্গমন্দিরা, ভেক নিয়ে ভিখ মাগা, ফোঁটা কাটা, চৈতন-চুটকি, বহির্বাস, সেবাদাসী—নিজে নদের নোক হ'য়ে আর নেড়ানেড়ীর নাম নিব না—অনুপ্রাস-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

ছাতা।

মহাভারতের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে জানা যায়,—জুতার ন্যায় ছাতাও সূর্য্য-লোক হইতেই মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রখর সূর্য্য-কিরণে মানব-দেহ উত্তপ্ত হয়, এবং সূর্য্যপ্রভব বৃষ্টিধারায় মানবদেহ ভিজিয়া যায়, সুতরাং এইরূপ গ্লানি-প্রতিষেধক ছাতার আবির্ভাব জগৎপূজ্য সূর্য্যঠাকুর হইতে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। "শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্!"

ছাতা প্রথমে কেবল রৌদ্র-বৃষ্টির উৎপীড়ন হইতে দেহ-রক্ষার্থই উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কালক্রমে তাহা [সভ্যতার নিদর্শনরূপে] শিল্পোৎকর্ষের সমুন্নত স্থানও অধিকার করিয়াছিল। ভোজরাজের "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে দুই শ্রেণীর ছাতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) ছাতা দুইপ্রকার;—"সামান্য" ও "বিশেষ"। তন্মধ্যে রাজার ছাতা "বিশেষ" ছাতা; অন্যের ছাতা "সামান্য" ছাতা। সেই "বিশেষ" ছাতা আবার "সদণ্ড" ও "নির্দণ্ড" ভেদে দুই প্রকার। (২) "নির্দণ্ডে"র আকুঞ্চন-প্রসারণ হইত না; তাহা বোধ হয় সেকালেও আধুনিক কৃষক-সমাজে সুপরিচিত "মাথাইলে"র মত দণ্ডহীন মস্তকাবরণ-রূপেই ব্যবহৃত হইত। "সদণ্ড" ছাতা প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করা যাইত। তাহা সভ্য-সমাজে ব্যবহৃত আধুনিক ছাতার অনুরূপ ছিল বলিয়াই বোধ হয়। যে দেশে কোনও পদার্থই যুগধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, সে দেশে এই অচেতন ছাতা বেচারীও যুগ-ধর্ম্মের নিয়ম হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারে নাই;—তাহার দণ্ড প্রভৃতি অবয়বগুলি যুগানুসারে ক্রমে হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। (৩) যথা,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে যথাক্রমে ছাতার দণ্ড দশ হইতে আট, আট হইতে ছয়, এবং ছয় হইতে চারি হাতে পরিণত হইয়াছিল। ছাতাকে "ষড়ঙ্গ" বলা যাইতে পারে। কারণ, [যুক্তিকল্পতরু

---

(১) "বিশেষ শ্চাথ সামান্যং ছত্রস্য দ্বিভিদা ভিদা।
রাজ্ঞ শ্ছত্রং বিশেষাখ্যং সামান্য ঞ্চান্য দুচ্যতে॥"

(২) "সদণ্ড ঞ্চাথ নির্দণ্ডং তজ্জ্ঞেয়ং দ্বিবিধং পুনঃ।
সদণ্ডং তত্র বিজ্ঞেয়ং সারণাকুঞ্চনাত্মকম্॥"

(৩) "দিগষ্ট-ষট্-চতুর্হস্তদীর্ঘো দণ্ডো যুগক্রমাৎ।"

শৈশব

চিত্রকর···সার যশুয়া রেণল্ড।

গ্রন্থে] তাহারও দণ্ড, কন্দ, শলাকা, রজ্জু, বস্ত্র ও কীলক নামক ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) "দণ্ডে"র ন্যায় "কন্দের" পরিমাণও যুগানুসারে ছয়, পাঁচ, চার ও তিন বিতস্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এবং শলাকার সংখ্যাও, যুগ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্যরক্ষার্থ, যথাক্রমে এক শত, অশীতি, ষাট্ ও চল্লিশ হইয়াছিল। (৫) শলাকার পরিমাণ ছয়, পাঁচ, চার ও তিন হাত। ইহাতেও যুগ-ধর্ম্মের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নয় তন্তুতে এক সূত্র, নয় সূত্রে এক গুণ, নয় গুণে এক পাশ, নয় পাশে এক রশ্মি। রজ্জু-পরিমাণও যুগানুসারে নয়, আট, সাত ও ছয় রশ্মি করিবার বিধান আছে। (৬) বস্ত্রের পরিমাণ শলাকা অপেক্ষা দ্বিগুণ। (৭) কীলকের পরিমাণ যুগানুসারে বারো, দশ, আট ও ছয় অঙ্গুলী। (৮)

রাজার ছাতা অপেক্ষা যুবরাজের ছাতা পরিমাণে এক-চতুর্থাংশ হীন হইত; এবং অন্যান্যের ছাতার পরিমাণ যুবরাজের ছাতার পরিমাণের অর্দ্ধ হইত। (৯)

এইরূপে নিয়মবদ্ধ বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,—সেকালে ছাতার ব্যবহারও রাজশাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল; ছাতা দেখিয়াই রাজা, যুবরাজ ও সাধারণ লোক অনায়াসে চিনিয়া লওয়া যাইত।

রাজাদিগের বিবিধ প্রকার ছাতা ছিল; এবং কার্য্যবিশেষে তাহা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইত। এই সকল ছাতার উপাদান ও উপাদানের বর্ণ ভিন্ন প্রকার হইবার রীতি ছিল। রাজাদিগের "প্রসাদচিহ্ন"-ছত্রে

---

(৪) "দণ্ড কন্দঃ শলাকা শ্চ রজ্জু র্ব্বস্ত্র শ্চ কীলকম্।
ষড়্ভি রেতৈঃ সুসন্দিষ্ট শ্ছত্র মিত্য ভিধীয়তে।"

(৫) "শতান্যশীতিঃ ষষ্টি শ্চ চত্বারিংশ দনুক্রমাৎ।"

(৬) "নবভিস্তন্তুভিঃ সূত্রং সূত্রৈ স্তৈ র্নবভি র্গুণঃ।
গুণৈ স্তন্নবভিঃ পাশো রশ্মি স্তৈ র্নবভি র্ভবেৎ।
নবাষ্টসপ্তষট্‌সংখ্যৈ রশ্মিভী রজ্জবঃ ক্রমাৎ।"

(৭) "বস্ত্রং শলাকাদ্বিগুণ মায়ামেন প্রতিষ্ঠিতম্।

(৮) "ভানুদিগ্‌গ্রহবসুভি রঙ্গুলীভিস্তু কীলকঃ।"

(৯) যন্নাং যন্না মনুদিতং তদ্রাজ্ঞা মেব ভূতয়ে।
পাদোনং যুবরাজস্য অন্যেষাস্তু তদর্দ্ধতঃ।"

বিশুদ্ধ বাঁশের শলাকা ও বিশুদ্ধ কাঠের দণ্ড ব্যবহৃত হইত; এই ছাতার রজ্জু ও বস্ত্র রক্তবর্ণ হইবার নিয়ম ছিল। (১০) রাজাদিগের এক প্রকার মনোরম ছত্রে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড ও কন্দের ব্যবহার ছিল; তাহার রজ্জু ও বস্ত্র শুক্লবর্ণ হইত, এবং সেই ছাতার উপরিভাগে স্বর্ণকুম্ভ সংযুক্ত হইত। (১১) "কনক-দণ্ড-" নামক সর্ব্বার্থসাধক আর এক শ্রেণীর ছাতায় শুক্লবর্ণ রজ্জু ও বস্ত্র ব্যবহৃত হইত; এবং উপরিভাগে স্বর্ণকুম্ভ সংযুক্ত হইত।

অভিষেককালে ও বিবাহসময়ে ব্যবহার্য্য ছাতায় সমধিক জাঁক জমকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রেণীর ছাতার দণ্ড প্রভৃতি অবয়বগুলি বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হইত, এবং বস্ত্রের ও রজ্জুর বর্ণ শুক্লেতর হইত। (১২) এইরূপ ছাতার উপরিভাগে কুম্ভ, হংস, অথবা চামর প্রভৃতি চিহ্ন-স্বরূপ নিহিত হইত। কুম্ভ-চিহ্নিত অথবা হংস-চিহ্নিত ছত্র [নয়টি রত্নে ও বত্রিশটি মুক্তায় গ্রথিত] বত্রিশটি মালায় খচিত হইত; সকলের উপরিভাগে "ব্রহ্ম"-জাতীয় বিশুদ্ধ হীরক, এবং দণ্ডের মূলভাগে "কুরুবিন্দ" ও "পদ্মরাগ-মণি" বিন্যস্ত হইত। (১৩) চামর-চিহ্নিত ছাতার চামর শুভ্রবর্ণ এবং

---

(১০) "বিশুদ্ধকাষ্ঠস্য তু দণ্ডকন্দৌ তথা শলাকা অপি শুদ্ধবংশজাঃ।
রজ্জুশ্চ রক্তা বসনঞ্চ রক্তং ছত্রপ্রসাদঃ নৃপতে র্ব্বদন্তি॥"

(১১) "চান্দনৌ দণ্ডকন্দৌ চেৎ শুক্লে রজ্জুবাসসী।
ছত্রং মনোহরং রাজ্ঞাং স্বর্ণকুম্ভোপশোভিতম্॥"

(১২) "দণ্ডকন্দশলাকাশ্চ শুদ্ধস্বর্ণেন নির্ম্মিতাঃ।
কীলকং স্বর্ণঘটিত মশুক্লে রজ্জুবাসসী॥"

(১৩) "কুম্ভাদিরথহংসাদি শ্চামরাদি র্যথাক্রমম্।
কুম্ভাদৌ বথ হংসাদৌ নবরত্নানি রক্ষয়েৎ।
দ্বাত্রিংশ ন্মৌক্তিকী মালা দ্বাত্রিংশ ত্তত্র দাপয়েৎ।
সর্ব্বোপরি ব্রহ্মজাতিং বিশুদ্ধং হীরকং ন্যসেৎ।
দণ্ডাগ্রে কুরুবিন্দাংশ্চ পদ্মরাগাংশ্চ বিন্যসেৎ॥"

ছত্র-স্বামীর হাতের এক হাত পরিমাণ হইত। (১৪) "নবদণ্ড"-সংজ্ঞক এইরূপ ছাতার ব্যবহারে [অভিষেক-কার্য্যে ও বিবাহে] গ্রহগণ প্রীতিযুক্ত হইতেন। (১৫) যুবরাজদিগের "প্রতাপ" নামক ছাতায় নীলবর্ণ বস্ত্র ও দণ্ড ব্যবহৃত হইত, এবং উপরিভাগ স্বর্ণকুম্ভসংযুক্ত হইবার রীতি ছিল।

এই সকল প্রমাণানুসারে ছাতার শলাকার সংখ্যা ও বস্ত্রের বর্ণ বিভিন্ন হইবার নিয়ম থাকিলেও, নানা গ্রন্থে শত-শলাকাযুক্ত ও শুভ্রবর্ণ ছত্রেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামের ছাতা না দেখিয়া কৌশল্যা [রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে ২০ সর্গ] বলিয়াছিলেন,—

"ন তে শত-শলাকেন জলফেননিভেন চ।
আবৃতং বদনং বল্গু চ্ছত্রেনাভিবিরাজতে।"

রাবণের শতশলাকাযুক্ত ছত্রের উল্লেখ আছে। (১৬) রঘুবংশে চন্দ্রের মত শুভ্রবর্ণ ছত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১৭) নৈষধচরিত ও শিশুপাল-বধেও শুভ্রবর্ণ ছত্রের উল্লেখ আছে।(১৮)
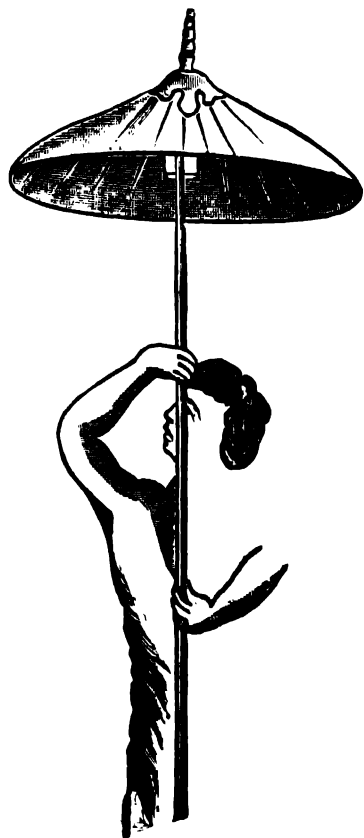
(১৪) "স্বামিহস্তৈকমানেন চামরঃ সিত ইষ্যতে।"

(১৫) "ইত্যয়ং নবদণ্ডাখ্য শ্ছত্ররাজো মহীভৃতাম্।
অভিষেকে বিবাহে চ গ্রহাণাং প্রীতিবর্দ্ধনঃ।"

(১৬) "ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমালোপশোভিতম্"

(১৭) "শশিপ্রভচ্ছত্র মুভে চ চামরে।"

(১৮) "নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্ত্তিমণ্ডলঃ।"

বিকসৎকলায়কুসুমাসিতদ্যুতে রলঘূড়ু পাণ্ডু জগতামধীশিতুঃ।
যমুনাহ্রদোপরিগহংসমণ্ডল-দ্যুতিজিষ্ণু জিষ্ণুরভূতোকবারণম্॥"—শিশুপালবধ; ১৩।২১

কাদম্বরীতে চন্দ্রাপীড়ের ছাতা অত্যন্ত শুভ্র ও শতশলাকাযুক্ত, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (১৯)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শুম্ভাসুরের একটি কাঞ্চনস্রাবী ছত্রের উল্লেখ আছে। (২০) "কাঞ্চন-স্রাবী" শব্দটি শুনিয়া, মদস্রাবী বারণের কথা মনে পড়িতে পারে। বারণের যেমন মদজলের স্রাব হয়, সেইরূপ বরুণদেবতার ছাতা হইতেও কি দ্রবীভূত কাঞ্চনের স্রাব বা বর্ষণ হইত? একটু প্রণিধানসহকারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়,—"কাঞ্চনস্রাবী" শব্দে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়মাত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কৌশলে সোনার কারুকার্য্য বিন্যস্ত হইয়াছিল যে, দেখিবামাত্র দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইত, এবং বোধ হইত, যেন ছাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া স্বর্ণবর্ণ সলিলধারা ধরণীতলে পতিত হইতেছে!

বাজপেয়ী ব্রাহ্মণদিগের "বাজপেয়-যজ্ঞে" ব্যবহারার্থ এক প্রকার ছাতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, রামায়ণে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বনবাসে প্রস্থিত রামচন্দ্রের অনুগমনকামী ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন,—"আমাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাজপেয়-সমুথ অর্থাৎ বাজপেয়-যজ্ঞে ব্যবহার্য্য, জল-রহিত মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছত্র দর্শন কর; আমরা এই ছত্রের দ্বারা তোমার উপরে ছায়া বিধান করিব।" ২১)

কাদম্বরী পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে রমণীদিগের মস্তকেও ছত্র ধরিবার রীতি ছিল: এবং ভদ্রমহিলাদিগের নির্দ্দিষ্ট 'ছত্রধারিণী' ছিল। আত্মবৃত্তান্ত-কথনসময়ে মহাশ্বেতা বলিয়াছিলেন,—"ইত্থম্ভূতে চ ব্যতিকরে ছত্রগ্রাহিণী মামবোচৎ।"

সিদ্ধান্তসংগ্রহোক্ত শ্রীবিষ্ণার ধ্যানে ছত্রের উল্লেখ আছে।—

"কল্পবৃক্ষে গিরেঃ পার্শ্বে ছত্রং তন্মণ্ডলোপরি"

---

(১৯) "অচলরেচকচক্রীকৃতক্ষীরোদাবর্ত্তপাণ্ডুরেণ দশবদনবাহুদণ্ডাবস্থিতকৈলাসকান্তিনা মুক্তাফলজালিনা শতশলাকেন আতপত্রেণ নিবার্য্যমাণাতপো নির্গত্য যাবেত্তে।"

(২০) "ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।"

(২১) "বাজপেয়সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রয়াতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বৈশ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ।"—রামায়ণ, অযো, ৪৫।২৩।

মেরুতন্ত্রোক্ত গঙ্গার ধ্যানে শ্বেতছত্রের উল্লেখ আছে।—

"চামরৈর্ব্বীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্ "

গৃহদেবতা শালগ্রাম চক্রের স্বর্ণ-রজতাদি-নির্ম্মিত ছত্র এখনও সকলের নিকট সুপরিচিত।

ছত্রের উৎপত্তি ও নির্ম্মাণপ্রণালী যেরূপ হউক না কেন, উহা রাজশক্তির প্রধান চিহ্নরূপে পরিচিত হইয়াছিল; এবং রাজসম্মান যখন চতুর্দ্দিকে সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তখন তাহা "একচ্ছত্র"-শাসন নামে মর্য্যাদা লাভ করিত। এক সময়ে গৌড়েশ্বরগণও এইরূপ "একচ্ছত্র-শাসন" সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল-নরপালগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের ভ্রাতা বাক্‌পাল দিক্ সকলকে শত্রু-পতাকিনীশূন্য করিয়া দশ দিক্ একাতপত্রা করিয়াছিলেন। যথা,—

"রামস্যেব গৃহীতসত্যতপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রে রুদপাদি তুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতি ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভি রকরোদেকাতপত্রা দিশঃ॥"

এখন সে দিন নাই। এখনকার সাহিত্য পর্য্যন্ত "ছত্রভঙ্গ"! বোধ হয়, আধুনিক রচনা-সৌন্দর্য্যের অভিরুচি ছত্রের ন্যায় কদাকার পদার্থকে সাহিত্য-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে! কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বেও ছত্রের ও ছত্রধারের বর্ণনা পরিত্যাগ করিলে, রাজসভার বর্ণনা সম্পূর্ণতা লাভ করিত না। প্রমাণ,—মেঘনাদবধ কাব্য। সেকালে ছত্রধারের পদমর্য্যাদা নিতান্ত অল্প ছিল না। পঞ্চতন্ত্রে [৩।৬৭] দেখিতে পাওয়া যায়,—ছত্রধারও এক জন উল্লেখযোগ্য রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

এবার রাজা রাণী ভারতে শুভাগমন করিয়া, বহুকালের পর, পুনরায় ছত্রের মর্য্যাদা সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে ছত্রধারগণের সুপরিচিত পদমর্য্যাদাও ক্ষণকালের জন্য স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

ছত্রের ব্যবহার যে কেবল ঐহিক সুখের সম্পাদক, তাহা নহে;—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে (২২) ও বিবিধ ব্রতাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে (২৩) 'ছত্রদান'-

---

(২২) "আবরণার্থং তচ্ছত্রং ব্রাহ্মণায় প্রদীয়তে।"—শুদ্ধিতত্ত্বে বরাহ পুরাণ।

(২৩) "ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বূল মেবচ।
গন্ধ শ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা শৃঙ্গী চ দ্বাদশ।"
মতান্তরে—"ভূমি রন্নং জলং হেম রজতং বস্ত্র মেব চ।
গন্ধো মাল্যং ফলং ছত্রং তাম্বূল মাসনং তথা।
দ্বাদশৈতানি দানানি কর্ম্মাঙ্গানি বিদো বিদুঃ।"—ব্রতপ্রতিষ্ঠা-পদ্ধতি।

বিধায়ক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গা-পূজার সময়ে দেবীর উদ্দেশে ছত্রদানের বিধান ও তাহার মন্ত্র "পদ্ধতি"তে উক্ত হইয়াছে। (২৪)

ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তি।

সে কালের ছত্র কিরূপ ছিল, ভাস্কর্য্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। যবদ্বীপের বরবুদুর মন্দিরের প্রস্তর-শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে যে সকল ছত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তদবলম্বনে দুইটি চিত্র সংযুক্ত হইল। প্রথম চিত্রে ছত্রের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে নিম্ন হইতে যথাক্রমে দণ্ড, কন্দ, বস্ত্র ও শলাকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেকালের দেবমূর্ত্তির মস্তকেও ছত্র সংযুক্ত হইত। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত এইরূপ একটি ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তির চিত্র সংযুক্ত হইল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

(২৪) "ওঁ ছত্রং সুনির্ম্মিতং দেবি বৃষ্টিরৌদ্রনিবারকম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা ছত্রঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্।"

গৌড়-রাজমালা।

বৈষ্ণব ভাবুকগণ গান করিয়াছেন,—

"মনে পড়িল রে,—আমার সেই ব্রজভূমি !"

মথুরার রাজবিলাসের মধ্যে থাকিয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্য উপভোগ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের যখন মনে পড়িত সেই বৃন্দাবন, সেই শান্তস্নিগ্ধ নিত্যশ্যামল ব্রজমণ্ডল, সেই ব্রজবিলাস, তখন তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন, বর্ত্তমানের প্রতি উপেক্ষা করিয়া অতীতের সুখস্মৃতির নীলাম্বুবিস্তারে যেন ডুবিয়া যাইতেন। হায় স্মৃতি ! একবার উহার উদ্রেক হইলে, মানুষ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়ে। যাহাদের স্মৃতি আছে—সুখের, বিলাসের, দর্পদম্ভের, শ্লাঘাস্পর্দ্ধার স্মৃতি আছে,—গৌরবগর্ব্বের অনন্ত অতীত সুবিস্তীর্ণ রহিয়াছে,—একবার মনে পড়িলে তাহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, সুখস্মৃতির মদিরাধারাপানে যেন প্রমত্ত হইয়া উঠে। সেই স্মৃতি গৌড়ীয়গণের জীবনের অবলম্বন, স্বপ্নের সুখ, অন্ধের যষ্টি ;--সেই স্মৃতি নিরাশ নিরাকাঙ্ক্ষের আশার দ্যুতি ; নির্জ্জিত নিগৃহীতের চন্দনপ্রলেপ ; উপেক্ষিত উৎপীড়িতের বসন্ত-সমীর ;—সেই স্মৃতি নিদাঘতাপের বারিবিন্দু ; বর্ষাবিক্ষোভে দামিনীদীপ্তি ; শারদপঙ্কবিস্তারে শতদল কমল ; হৈমজাড্যের শ্রীপঞ্চমী। সেই স্মৃতির উদ্বোধন যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা জাতীয় জীবনযজ্ঞের হোতা। যে মাথুর সঙ্গীতের ঝঙ্কার শুনিলে মনে পড়ে "সেই ব্রজভূমি", সে মাথুর গীতি যিনি গান করেন, তাঁহার কণ্ঠরব ধন্য, তাঁহার জীবনের দূতীয়ালীও সার্থক।

আমাদের অতীত স্মৃতি ছাড়া ত আর কিছু নাই। পরিতাপের বিষয়, সে স্মৃতিও এতকাল অশেষ কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিল। পরের মুখে ঝাল খাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস নাই,—যে ইতিহাসের আলোচনায় শ্লাঘার উদয় হয়, গৌরবের স্পর্দ্ধায় দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে,—বাঙ্গালীর তেমন ইতিহাস নাই। বাঙ্গালী চিরভীরু, চিরপদানত, চিরপরাজিত। বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যসমাজের একটা ব্রণস্বরূপ —আগাছার তুল্য—বাঙ্গালী উদ্ভূত হইয়াছে।

গারো জাতি যেমন, বাঙ্গালীও তেমনই একটা অসভ্য জাতি, উহারা কেবল বর্ত্তমান সুখে সুখী থাকে, ইহাদের অতীতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই। সার হার্ব্বাট রিজলী আবার সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর

দেহে শুদ্ধ আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হয় না। দরিদ্রের কাঙ্গালের "ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলী" আমাদের অতীত ইতিহাস,—তাহাও আমাদের বুদ্ধির দোষে, স্থবিরতার হেতু অবহেলার পঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রদীপ্ত বিলাস-আলোকে আপন-হারা হইয়া আমরা কেবল ধূলায় লুটাইতেছিলাম, নিজমুখে নিজেদের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছিলাম। ইউ-রোপের আধুনিক বিদ্যাপ্রমত্ত কত জটিলা-কুটিলা আমাদিগকে কত কলঙ্কে লাঞ্ছিত করিতেছিল, কত রকমে যে গালি দিতেছিল, তাহার হিসাব করিয়া দেখিলে আমাদের বাঙ্গালীর শীতল শোণিতপ্রবাহও উষ্ণ হইয়া উঠে। এই কলঙ্কের মসীলেপ যাঁহারা ধৌত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বাঙ্গালার পলি-মাটীতে ঢাকা কাঁচা সোনা যাঁহারা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, বাঙ্গালীর অতীত স্মৃতির সুখেন্দুবিভাকে যাঁহারা গ্লানির কুজ্ঝটিকা-মুক্ত করিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, কি বলিয়া কোন ভাষায় তাঁহাদিগের প্রশংসা করিব, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। ভাষা এখানে স্থবিরা, ভাব এখানে মূক।

বড়ই শ্লাঘার কথা এই যে, যাঁহারা বাঙ্গালার কলঙ্কভঞ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা বিদেশীয় নহেন, তাঁহারাও বাঙ্গালী—এই বাঙ্গালার সহস্র বৎসরের অধিবাসী বাঙ্গালী। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের লেখনীজাত আর্য্যগণের গৌরবগান, অলকট ব্লাভাস্কির মুখনিঃসৃত হিন্দুত্বের বলিহারি, আমাদের ভাল লাগে না। মনে হয়, ঐ যশোগানের স্তরে স্তরে কৃপার ধারা প্রবাহিত হইতেছে, বিকট মুরুব্বিয়ানার ভাব প্রকট হইতেছে। জীবনের সর্ব্বস্বই ত বিদেশীয়ের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাইতেছি। পিতৃপরিচয়ের শ্লাঘা-টুকুও কি ইউরোপ-শুকমুখনির্গলিত না হইলে আমাদের গ্রাহ্য হইবে না? ইহা অত্যন্ত বেদনার চিন্তা হইয়াছিল। কৃষ্ণকলঙ্ক কৃষ্ণ ছাড়া আর কে ঘুচাইতে পারে? বাঙ্গালার "কৃষ্ণকলঙ্ক" কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীই দূর করিতে উদ্যত হইয়াছেন;—বলিলে একেবারেই অত্যুক্তি হইবে না যে, সে কলঙ্ক তাঁহারা দূর করিয়াছেন। "গৌড়রাজমালা" এই কলঙ্কভঞ্জনের প্রথম হেমকুম্ভ। কালদুহিতা কালিন্দীর ঐতিহাসিক নীল সলিলে এ কুম্ভ পূর্ণ করিয়া শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বাঙ্গালার ভাব-বৃন্দাবনের গৌরবমালঞ্চের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হেমকুম্ভে সহস্র ছিদ্র থাকিলেও, উহা হইতে এক বিন্দুও সত্যের সলিল চোঁয়াইয়া বাহির হইতেছে না। তোমরা যদি ভাবুক হিন্দু হও, তবে হুলুধ্বনি দিয়া এমন হেমঘটকে রত্নবেদীর উপর বসাও।

অতীতের এই শীতল কালিন্দীনীরে শ্রীবিষ্ণুর স্নান হইবে, বৈষ্ণবীশক্তি সদ্যঃস্নাতা জগন্ময়ীরূপে তোমার চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া বসিবেন। ধর—ধর—বাঙ্গালী, তোমার শ্লাঘার, স্পর্দ্ধার, গৌরবগর্ব্বের হেমকুম্ভ মাথায় ধরিয়া ঘরে তোল।

"গৌড়বিবরণ" বাঙ্গালীর বিজয়স্তম্ভ হইবে। উহার বনীয়াদে কষ্টীপাথরের "গৌড়রাজমালা" বসাইয়া "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র অধ্যক্ষগণ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহা দশাশ্বমেধের তুল্য অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বাঙ্গালার চিরকালের এক প্রবচন আছে,—"বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা"; ইহা সত্য প্রবচন, বাঙ্গালার পাণ্ডিত্যের আদর্শ অনুকূল প্রবচন। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র পণ্ডিতগণ সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহারা ভাগ্যধর পুরুষ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেহান্তের ক্ষণ হইতে বাঙ্গালী আজ পর্য্যন্ত যে আশ্রয়ে বঞ্চিত ছিলেন, বিধাতার কৃপাবিধানে অঘটন ঘটিয়াছে, তাঁহারা তেমনই আশ্রয় পাইয়াছেন। বনবল্লরী বনস্পতির আশ্রয় পাইলে যে কুসুমরাগপ্রমত্তা হইয়া নীল আকাশকেও চুম্বন করে। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র পণ্ডিতগণ বনস্পতির আশ্রয় পাইয়া সত্যই অজ্ঞেয় নীলাম্বরকে চুম্বন করিয়াছেন—বাঙ্গালার অতীত অজ্ঞেয় ইতিহাসকে চুম্বনের আকর্ষণে প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর করিয়া দিয়াছেন। এই আশ্রয়বৃক্ষ আর কেহই নহেন, দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীমান শরৎকুমার রায় এম্. এ.। যিনি এমন অতুল্য সৎকীর্ত্তিলতিকার আশ্রয়, অবলম্বন, বাহক-ধারক, যিনি উহার সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপ, তাঁহাকে কোন ভাবায় যে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহা ত আমাদের ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের পেটিকা খুঁজিয়া পাই না। তিনি বাঙ্গালার অক্ষয়বট হউন, বাঙ্গালীর শ্লাঘাব্রততী তাঁহাতে জড়াইয়া থাকিয়া লোকনন্দিনী হউক। গৌড়-বিবরণের সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রশংসা কি করিব? তিনি সোদরপ্রতিম সখা, সুখদুঃখের ভাগী মিত্র, এবং জ্ঞানগবেষণায় গুরু ও অধ্যাপক। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব কলঙ্কভঞ্জনে তিনিই বৃন্দাদূতী—চটুলচাটুবচনবিন্যাস-পরায়ণ একনিষ্ঠ প্রেমপ্রবণ স্থিরচপলাতুল্য-মনীষাবিভূষিত বৃন্দাদূতী। বলিতে পারি না, তিনি না থাকিলে এমন ভাবে কলঙ্কভঞ্জন হইত কি না। গত বিংশতিবর্ষকাল বাঙ্গালার সাহিত্যকুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনিই বাঙ্গালার মাথুরগীতি গান করিতেছেন। তাঁহারই গৌড়সারঙ্গ সুরের ঝঙ্কারে লুপ্তস্মৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, গৌড়গাথার শ্লাঘার তানে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

রোদনে এ আকুলতার সম্যক্ অভিব্যঞ্জনা হয় না, হাস্যে উহার বিকাশ নাই। কাজেই বলিতে হয়, লিখন-চাতুরীর সাহায্যে অক্ষয়কুমারের পর্য্যাপ্ত প্রশংসা ব্যক্ত হয় না।

"গৌড়রাজমালা" পাঠ করিয়া আমরা তিনটি নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি,—

(১) গৌড়ের অতীত ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস গৌরবাস্পদ ও শ্লাঘ্য; সেই ইতিহাসের কথা ধরিয়া গাথা রচনা করা চলে; সে গাথা শুনিয়া দর্পদন্ত করা অশোভন হয় না।

(২) গৌড়ীয়গণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে দেশশাসন করিয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ে প্রজাশক্তির উন্মেষ ঘটিয়াছিল, প্রজার নির্ব্বাচনে রাজা মনোনীত হইয়াছিলেন।

(৩) বাঙ্গালী চিরপরাধীন ও চিরপরাজিতের জাতি নহে। বাঙ্গালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, শত্রু মর্দ্দিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী শিল্পকলায় পারদর্শী হইয়া এসিয়া মহাদেশকে শিল্পের আদর্শ দিয়াছিল। বাঙ্গালার ধীমান ও বীতপাল ভাস্কর্য্যে ও বিগ্রহনির্ম্মাণে এসিয়ার আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন।

এই তিনটি সিদ্ধান্ত যথারীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মনে পড়ে কবি হেমচন্দ্রের কথা,—

> "তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
> সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
> হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
> সেই পূর্ব্বপানে কভু গর্ব্বে চায়,
> এ জাতি কখন জঘন্য নহে।"

চাহিয়া থাকি বৈ কি! নির্নিমেষনেত্রে, উদাস-দৃষ্টিহীন-নয়নে চাহিয়া থাকি বৈ কি! সেই পূর্ব্ব-শ্লাঘার, স্পর্দ্ধার অতীতের প্রতি সগর্ব্বে ও সদম্ভে চাহিতে সাধ যায় বৈ কি! "গৌড়রাজমালা" সে সাধ পূর্ণ করিয়াছে। আর সঙ্কোচের সহিত অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না, আর ভয়ে-ভয়ে বিস্মৃতির ভস্মস্তূপকে আশার ফূৎকারে উড়াইয়া মর্য্যাদার বহ্নিকণা খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। "গৌড়রাজমালা" সে সঙ্কোচ ও সে ভয় দূর করিয়াছে।

মিথিলা, মগধ, অযোধ্যা, কাশী, পাঞ্চাল ও কাশ্মীরের ধার-করা গৌরব লইয়া যে বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত হইতে হইবে না, আর্য্যাবর্ত্ত ও পঞ্চনদ প্রদেশের আর্য্যগণের জয়গানের সহিত গলা মিলাইয়া যে বাঙ্গালীকে ভারতের কুলীন-সমাজভুক্ত হইতে হইবে না, এ কথাটা "গৌড়রাজমালা" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। বাঙ্গালীর নিজের কিছু আছে; সেটা বড় অল্প কিছু নহে; তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতের অন্য প্রদেশের কিছু হইতে ওজনে ও দামে কম হইবে না, বরং অনেক বিষয়ে গরীয়ান ও মহীয়ান্ হইবে। "গৌড়রাজমালা" পাঠ করিয়া আমরা ইহাও ধারণা করিতে পারিয়াছি। এ ধারণার মূল্য শতকোটী কোহ-ই-নূর অপেক্ষাও অধিক। এ ধারণা ঠিকমত হইলে পক্ষাঘাত রোগ নিমেষের মধ্যে দূর হয়, আত্মবোধ বালারুণবিকাশের ন্যায়, অনুরাগপ্রদীপ্ত শতময়ূখমালায় হৃদয়-আকাশে ফুটিয়া উঠে। এ ধারণা হৃদয়ে জাগিলে জাতিস্মর হওয়া যায়, কোটী জন্মের কথা মনে পড়ে, কোটী যুগের গৌরবগাথা ঐক্যতানবাদনের সমবেত ঝঙ্কারের ন্যায় হৃৎতন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে। ইহাই মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র, ইহাই ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থিত অমৃতধারা। এতদিন হারাইয়াছিলাম, "গৌড়রাজমালা"র লেখকের কল্যাণে আবার পাই-লাম। জানি না, ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিব কি না; জানি না, এ অমৃতবিন্দু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বণ্টন করিতে পারিব কি না।

এইবার, মনে আশা হয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও হইতে পারে; স্থবির, নিশ্চেষ্ট, অসাড়, নিঃস্পন্দ, কলঙ্কবিষে জর্জ্জরিত, বিহ্বল, বিভ্রান্ত বাঙ্গালীজাতি এইবার বোধ হয় সহস্র বৎসরের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। মাতা বসুমতী স্বীয় হৃদয় দীর্ণ করিয়া কতকালের প্রচ্ছন্ন শ্মশানস্তূপ সকল খুলিয়া দেখাইতেছেন। অতীতের এই সব শ্মশানচুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড সকল আহরণ করিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ বুঝাইয়া দিতে পারিতেছেন যে, সে সকল চিতায় বাঙ্গালার কত নরদেবতা ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন। যে রাজবংশ আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল, সেই রাজবংশের পালনরপালগণের জন্মভূমি বরেন্দ্র। "গৌড়রাজমালা"র এই একটা সিদ্ধান্ত শুনিলে শ্লাঘার বিস্ময় শতবহ্নিজিহ্বায় হৃদয়-খানা জুড়িয়া বসে। এত বড় কথা—গালভরা—বুকপোরা কথা—বাঙ্গালীকে কেহ শুনায় নাই। অতীতের চিতাভস্ম হইতে আহৃত ইহাই অর্দ্ধদগ্ধ

বিষ্ণুপঞ্জর। বাঙ্গালী যদি মানুষ হয়, তবে এই বিষ্ণুপঞ্জরকে অবলম্বন করিয়া আবার পুরুষকারের রত্নবেদীর উপরে পুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—পারিবে কি? নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে সে মানবতা আছে কি? বুঝি বা তাই স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালীকে মানবতার মহিমা বুঝাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতীতের গুপ্ত কুক্ষি হইতে আবার এই দিব্য বাণী উদ্ভূত হইবে বলিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষিগণ মনুষ্যত্বের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়াছিলেন।

ভয় নাই—ভাবনাও নাই; বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ পুরুষোত্তম-নির্ম্মাণের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। "গৌড়বিবরণ" আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা,—রাজমালা, শিল্পকলা, বিবরণমালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ত্ব, শ্রীমূর্ত্তিতত্ত্ব ও উপাসক-সম্প্রদায়। এই আট লহরের গজমতির মালা যখন বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর গলে দুলিবে,তখন পুরুষোত্তমের প্রতিমা গড়িতে হইবে না, তিনি স্বয়ং আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়বেদীতে আসন পরিগ্রহ করিবেন। ইহাই Nation-building, ইহাই রাষ্ট্রীয়তার উদ্বোধন, আত্মাশক্তি জগদ্ধাত্রীর বোধন। ইহাই অষ্টাঙ্গযোগ; এ যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে ঋদ্ধি ও অষ্টসিদ্ধি করামলকবৎ হস্তগত হইবে। ইহার বিশ্লেষণ-বিদারণ নাই, ভালমন্দের বিচার নাই, তুলনায় সমালোচনা নাই। কেন না, ইহা যে পিতৃপরিচয়, মর্য্যাদার দ্যোতক; ইহা অতুল্য ও অনুপম। ইহাতে ভালমন্দ থাকিতেই পারে না। যে ভৈরব-ভৈরবী রাগরাগিণীর আলাপে নিদ্রিতের সুষুপ্তি দূর হইবে, যাহা জগজ্জীবনের জয়মঙ্গলগাথাপূর্ণ, তাহা যে অতি মধুর, অতি মনোহর, অতি উত্তম, অতি শুভকর। সে সামগানে ভাল মন্দের বিচার করিতে নাই। যে জাগায়, মধুর কথায় ও মধুচ্ছন্দে যে জাগাইয়া তোলে, তাহাতে মন্দ থাকিতে পারে না। তাই "গৌড়রাজমালা"য় মন্দ খুঁজিয়া পাইলাম না।

"গৌড়রাজমালা" গৃহে গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য; উহা নিত্য পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার বিদ্বজ্জনসমাজ, দেবতার নির্ম্মাল্য জ্ঞানে, "গৌড়বিবরণ" ও "গৌড়রাজমালা" মাথায় করিয়া লউন। ভারতীর শ্রীচরণে ইহাই বঙ্গমনীষার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি; ইহা খাঁটী বাঙ্গালার খাঁটী বাঙ্গালীর সামগ্রী। "গৌড়রাজমালা"-নিবদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল যতই গৌড়ীয় সমাজে প্রচারিত হইবে, ততই বাঙ্গালী হৃদয়ের বিস্তৃতি লাভ করিবে, সে

আর আত্মগোপন করিবে না, সুজলা শ্যামলা বাঙ্গালা ছাড়িয়া প্রবাসী হইবে না। অষ্টাঙ্গ "গৌড়বিবরণ" প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালী আত্মপরিচয়ে পরিচিত হইতে পারিবে। কিন্তু সে অষ্টাঙ্গ প্রচারের সহায়তা বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র সদস্যগণ যাহা আহরণ করিতেছেন, যে সকল পুষ্পগুচ্ছ বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালী আদর করিয়া গ্রহণ না করিলে, পরিশ্রম সার্থক হইবে কিসে! সাহিত্য-সেবায় রত থাকিয়া কখনও সাহিত্যের প্রসাদকামী হইয়া কাহারও কৃপা ভিক্ষা করি নাই। আজ "গৌড়-বিবরণে"র প্রচার জন্য, "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র পুষ্টির জন্য বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনসমাজের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ভিক্ষা মিলিবে কি?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড।

জীবনকথা লিখিবার পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশে, স্যর সিডনে লী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যাহার সমালোচনা আমরা যথাসময়ে করিয়াছি, সেই পুস্তকের নির্দ্দেশ অবলম্বনে সার সিডনে লী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। বিলাতের জাতীয়-চরিতাখ্যানের পর্য্যায়ে (National Biography series) ইহা স্থান পাইয়াছে। এই রাজ-জীবনচরিত লইয়া বিলাতের সুধী-সমাজে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, দুই বৎসর হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তাঁহার জীবনকথা লইয়া এমন নির্ম্মম আলোচনা, এমন কঠোর সত্যের বিন্যাস যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহাই অনেকে শঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু স্বয়ং সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, সার সিডনে লীকে উপাদান সকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, মৃত সম্রাটের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পাঠ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এমন অবস্থায় ইহা ত বলা যায় না যে, সার সিডনে এই পুস্তক রচনা করিয়া হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

সার সিডনে লী তাঁহার পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড

ইতিহাসবিশ্রুত জগন্নায়ক সম্রাটদিগের মধ্যে এক জন হইতে পারেন না! তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা এ পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জর্ম্মনীদেশে পণ্ডিতসমাজের বিশ্বাস ছিল যে, বালকগণকে *সংসারের পাপ তাপ হইতে*, আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে রাখিয়া লেখাপড়া *শিখাইতে হইবে।* মৃতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট এই দলের অনুরাগী ছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহার শিক্ষক ব্যারণ ষ্টক্‌মার এই দলের উদ্‌যোগী নেতা ছিলেন। প্রিন্স এলবার্ট সপ্তম এডওয়ার্ডের শৈশবের শিক্ষা-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে এডওয়ার্ডকে সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস সকল পড়িতে দেওয়া হয় নাই; যে সে ছেলের সঙ্গে মিশিতে দেওয়া হয় নাই; সংসার দেখিতে দেওয়া হয় নাই। এডওয়ার্ড কুড়ি বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এডওয়ার্ডকে অতিমাত্রায় আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন এডওয়ার্ডকে ছোট্ট ছেলেটি ভাবিতেন। এডওয়ার্ড আবার রাজকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিবেন, সে আবার রাজনীতির কূটচাতুরী বুঝে, বা বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারে! সে পিতৃহীন বালক, সাজিয়া গুজিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এডওয়ার্ডের বিষয়ে এই ধারণারই বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখন এডওয়ার্ড ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ, তখন একবার গ্লাডষ্টোন প্রস্তাব করেন যে, যুবরাজ এডওয়ার্ড ভারত-দপ্তরে যাইয়া ভারত-শাসন-পদ্ধতি বুঝিবার চেষ্টা করুন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। শেষে যুবরাজ এডওয়ার্ড যখন পঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রৌঢ় পুরুষ হইয়াছিলেন, তখন লর্ড সল্‌স্‌বরীর জেদে যুবরাজকে শাসনঘটিত বাজে চিঠিপত্র খুলিতে এবং পাঠ করিতে দেওয়া হইত। জননীর এই স্নেহাধিক্য-বশতঃ সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসন-আরোহণের কাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে একরূপ অনভিজ্ঞই ছিলেন।

সার সিডনে লী বলেন, শিক্ষার এই ত্রুটী জন্য সপ্তম এডওয়ার্ড চিরকালই খোস্‌মেজাজী, খোষপোষাকী, আমোদপ্রিয় বাবু ছিলেন। তিনি ধীরভাবে কোনও বিষয়ের চিন্তা করিতে পারিতেন না; কোনও বৃহৎ পুস্তক পড়িতে পারিতেন না; এমন কি, লম্বা চিঠি পাইলে তিনি সে চিঠি পড়িয়া উঠিতে

পারিতেন না। তাঁহার চরিত্রে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশ ছিল না; তিনি একনিষ্ঠা-বর্জ্জিত ছিলেন। তিনি অধিকক্ষণ রাগ করিয়া থাকিতে পারিতেন না; অধিকক্ষণ কোনও কিছু শুনিতে বা দেখিতে পারিতেন না। শৈশবের শিক্ষার দোষে তাঁহার চরিত্রে এ চাপল্যটুকু সংস্কারবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন; লোক চিনিতে খুব পারিতেন; লোকের মুখে মুখে শুনিয়া জ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানিয়া লইতেন; এমন কি, বৈজ্ঞানিক কঠোর তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার তিলমাত্র অহঙ্কার ছিল না; সকল অবস্থার মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতে পারিতেন; দেশের সকল সমাজের সকল রকমের লোকের সহিত মিশিয়া তিনি মনুষ্য-চরিত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা ছিল না। তিনি ভাবিতেন, ভগবান যেমন আমাকে হাসিতে খেলিতে, বৈভব উপভোগ করিতে দিয়াছেন, আমি তাহাতেই তুষ্ট থাকিয়া হাসিয়া দিন কাটাইব; অন্যে যদি পারে, তবে আমার সঙ্গে হাসুক, আমি তাহাতে বাদ সাধিব কেন? এবম্প্রকারের খোস্‌মেজাজী সদানন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়া সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কেহ শত্রু ছিল না; তিনি কাহাকেও শত্রু থাকিতে দিতেন না। যে যত ক্রোধ করিয়া তাঁহার কাছে আসুক না কেন, তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময়ে সে হাসিয়া প্রফুল্লমনে চলিয়া যাইত। শোকে তিনি দীর্ঘকাল অবসন্ন হইয়া থাকিতেন না; জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ এলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যুর পর, তিনি কয়েক দিন "কাটা কই মাছের মত" ছট্‌ফট করিয়াছিলেন বটে, তাহার পর সে বেগ সাম্‌লাইয়া তিনি পরের দুঃখ সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী মেরীকে দ্বিতীয় পুত্র বর্ত্তমান সম্রাট জর্জ্জের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

এবম্প্রকারের খোস্‌মেজাজী পুরুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া নূতন পথে যে চলিবেন না, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। নবীনতার হাঙ্গামা সহিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। তবে তিনি ফরাসী জাতির অনুরাগী ছিলেন, তাই সর্ব্বাগ্রে ইংরেজে ও ফরাসীতে বিরোধের ও ঈর্ষ্যার ভাব দূর করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে বড় একটা কূট রাজনীতির চাতুরী নিহিত ছিল না; সে চিন্তা তাঁহার মনে আসিতেই পারিত না। জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় জর্ম্মণ সম্রাটকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; এক এক সময়ে তাঁহার

অসংযত কথা ও ব্যবহারের জন্য চটিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু দেখা হইলে আবার যে-কে সেই—যে মাতুল, সেই মাতুল! সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মন্ত্রীদের সহিত কখনও রুক্ষ ব্যবহার করেন নাই; কখনও তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লর্ড হাউসের সহিত যখন লিবারল দলের মনোমালিন্য ঘটে, তখন তিনি লর্ড হাউসের নেতাদের ডাকিয়া মিটমাট করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড কডর প্রমুখ স্থিতিশীল নেতৃবৃন্দ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; তিনি প্রথমে একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, পরে সে সব ভুলিয়া গিয়া যে-কে সেই হইয়াছিলেন। তিনি তেমন জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা রাজা হইলে সে সময়ে লর্ড হাউসকে বিলক্ষণ শাসন করিতে পারিতেন। সে হাঙ্গামা পোহাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। তাঁহার মায়ের মত প্রকৃতি ছিল। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছেন, কোলে পিঠে করিয়া আদর করিয়াছেন, সে আবার রাজমন্ত্রী হইবে? তাই তিনি উইনষ্টন চর্চ্চিলকে আমোল দিতেন না, খোকার মত আদর করিতেন। উইনষ্টনের পিতা লর্ড রাণ্ডলফ্ তাঁহার বন্ধু ছিলেন, সমবয়স্ক ছিলেন; তাই সম্রাট উইনষ্টনকে খোকা বলিয়া ভাবিতেন। জন বর্ণস্ শ্রমজীবীদিগের প্রতিনিধিরূপে যখন পার্লামেণ্টের সদস্য হইলেন, তখন সম্রাটকে অভিবাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে যাইতে হয়। সম্রাট তাঁহাকে পদযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া এতটা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন যে, জন বর্ণস্ শেষে সম্রাটের অনুরাগী ও পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তবে সম্রাট রঙ্গ করিতে ছাড়িতেন না। জন বর্ণস্ চলিয়া গেলে এক জন স্থিতিশীল লর্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। যে কেদারায় বর্ণস্ বসিয়াছিলেন, সেই কেদারায় লর্ড মহাশয় ব'সিতে যান। তখন সম্রাট আতঙ্কিত শঙ্কাশুষ্ককণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ঐখানে, ঐ কেদারায় বর্ণস্ বসিয়াছিল। আপনি বসিবেন কি?" এইরূপ রঙ্গ করিয়া তিনি অনেকের বিরোধভাব ঘুচাইয়াছিলেন।

ইউরোপের শান্তিরক্ষক সম্রাট বলিয়া যাঁহার সুনাম ছিল, তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ এমন ভাবে হইলে লোকের মনে যেন একটা ধাক্কা লাগে। বাস্তবিক এই পুস্তকের প্রচারে, কেবল ইংলণ্ডে কেন, সমগ্র ইউরোপের সুধী-সমাজ একটা যেন ধাক্কা খাইয়াছে। কিন্তু সত্যকথনের এমনই মহিমা, সার সিডনে লীর কেহ নিন্দা করিতে পারিতেছে না; তাঁহার লিখিত পুস্তকের

তীব্র প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না। সত্যের প্রভাব যে দেশের সাহিত্যে এতটা প্রবল, সে দেশের সাহিত্যের অবনতি ঘটিতে যে এখনও বিলম্ব আছে, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে। ইংলণ্ডে যে দলাদলির সাহিত্য নাই, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য নহে, সমাজের সামগ্রী নহে, তাহা দলাদলির লেখালেখি মাত্র। তাহা আদর্শ নহে, অনুকরণযোগ্য নহে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সম্রাটের জনক, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জীবনকথা, সত্যের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া এমন ভাবে লোকলোচনের গোচর করা কম বুকের পাটার কথা নহে। সাহিত্য সত্যের বেদীতে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত; সাহিত্যে মোসাহেবীর স্থান নাই; সাহিত্যে মেকী চলে না; সাহিত্যে সুবিধাবাদীরও আসন নাই;—এই নিত্যসত্য সিদ্ধান্তটা সার সিডনে লী যেমন পরিস্ফুটভাবে দেখাইয়াছেন, তেমন ভাবে, কার্লাইল ব্যতীত আর কোনও ইংরেজ লেখক দেখাইতে পারেন নাই। লী কথায় ও কাজে এক করিয়াছেন, সাহিত্যের প্রতিভা-দেবীকে ধ্রুবলোকে স্থান দিয়াছেন, ইংলণ্ডের মনস্বিতাকে দেবভোগ্য করিয়াছেন। এমন তেজস্বিতা ইংলণ্ডেই সম্ভবপর। বাঙ্গলার সাহিত্যসেবিগণ সার সিডনে লীর তেজস্বিতার মহিমা ধারণা করিতে পারিলে, তাঁহাদের সাহিত্যজীবন সার্থক হইবে।

স্থাপত্য।

Renaissance Architecture, a history of architectural development, by F. M. Simpson Vol. III. The Renaissance in Italy, France and England (Longmans.)—ভিক্টর হিউগো প্রতিভাপ্রভাবে পুরাতন প্রাসাদের শিল্পচাতুরীর ভাষা বাহির করিয়াছিলেন। "নোৎর দেম্" পুস্তকে তিনি পুরাতন গির্জ্জার প্রত্যেক প্রস্তর হইতে এক একটি ভাষা, এক একটি কাহিনী বাহির করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব ভাষা, অদ্ভুত কাহিনী। ভিক্টর হিউগো বলিয়া গিয়াছেন যে, যে মহাত্মা জাতির পুরাতন ভাস্কর্য্যের ভাষা বুঝিতে পারেন, তিনিই জাতির উত্থান-পতনের মহিমা বুঝেন, এবং লোকসমাজকে বুঝাইতে পারেন। ভিক্টর হিউগোর এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া সিম্‌সন প্রমুখ বিলাতের এক দল মনীষী ও মনস্বী লেখক ইউরোপের গৃহনির্ম্মাণ ও ভাস্কর্য্য-কলার ইতিহাস লিখিতেছেন। ইহার মোট তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে; আমরা এক খণ্ডের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাই ইংলণ্ডের মনস্বিগণের এই বিশাল চেষ্টার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে পারিব।

সাহিত্য জাতির ভাবকে ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া রাখে। সাহিত্যে দ্যোতনা-মাত্র থাকে; উহা যেন বীণার ঝঙ্কার; যে বাজিয়ে, সেই উহা বাজাইয়া লোককে মুগ্ধ করিতে পারে। কাব্য মানসপটে চিত্রের উন্মেষ করে, আলেখ্য প্রতিমার উদ্ভব ঘটায়। সাহিত্যের ভাব অশরীরী। ভাস্কর্য্যে অভিব্যঞ্জনা-মাত্র থাকে। উহা দর্শকের নয়নের সাহিত্য, দৃষ্টির সাহায্যে ভাবের উন্মেষ ঘটায়। যে দেখিতে জানে, সে কুতবমিনার দেখিয়া ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারে; সে বুঝিতে পারে, কেন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী হিন্দু পাঠানের পদানত হইয়াছিল। যে দেখিতে জানে, সে ফিডিয়াসের একটা মর্ম্মর-প্রতিমা দেখিয়া গ্রীকযবন-গণের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভাবতরঙ্গের মহিমা বুঝিতে পারে। আগ্রার তাজমহল মোগলবিলাসের ও ভাবমাধুরীর সাকার ও সাবয়ব আলেখ্যমাত্র। অত মাধুর্য্য যে জাতি সমাহরণ করিতে পারে, তাহার আশু অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যে তাজমহল দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে যে, এই "মর্ম্মর-স্বপ্ন" যাহাদের মনীষাসঞ্জাত, তাহারা ভাবের কালিন্দীকল্লোলে গলিয়া যাইবেই। এই মোহময়ী মাধুরীর প্রতিক্রিয়া যখন আরদ্ধ হইবে, তখনই মোগলজাতির অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হইবে। অলমগীর সে প্রতিক্রিয়ার অবতার, অলমগীর মোগল সাম্রাজ্যের শনি। এ সব ত মোটা কথা; ইহার ভিতরে আবার সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে। ভাস্কর্য্যের যেমন অভিব্যঞ্জনা, তেমনই দ্যোতনা আছে। সেই দ্যোতনা হইতে উন্নতির পারম্পর্য্য বা আধোগতির শৃঙ্খলা নির্দ্দিষ্ট হয়। সিম্‌সন্ এই সকল তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কেন গ্রীক ভাস্কর্য্যের অবনতির উপর রোমক ভাস্কর্য্যের উন্নতি, কেন রোমক পদ্ধতিকে কতকটা ব্যাহত করিয়া আদি খৃষ্টীয় ভাস্কর্য্যের বিকাশ হইল; তাহার পর ইটালী দেশে কলাবিত্মার অভ্যুত্থান ও সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুদয় কিসে ও কাহাদের দ্বারা সংসাধিত হইল; ফরাসীদেশের আভিজ্‌ননে পোপের আবাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কেমন করিয়া ফরাসী শিল্পের উদ্ভব হইল, তাহার পর লম্বার্ডীর সরল 'পন্থা' কেন প্রচলিত হইল, সে 'পন্থা' ইংলণ্ডে যাইয়া কেমন আকার ধারণ করিল, স্পেনেই বা কেমন বিবর্ত্তন ঘটিল; রুসের শিল্পের বনিয়াদ কোথায়, পর্য্যবসান বা কিসে হইবে, জর্ম্মনী দক্ষিণ ইটালী ও পশ্চিম ফ্রান্সের প্রভাবে ভাস্কর্য্যের কেমন আকার দিয়াছে, ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশ্লেষণ এই বিশাল পুস্তকে নিবিষ্ট হইবে।

ইউরোপের গৃহনির্ম্মাণ ও প্রতিমাপ্রস্তুতির মধ্যে সারাসেনদের প্রভাব এখনও বিদ্যমান আছে। খুঁজিলে এখনও তাহাদের লেখা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনে সে লেখা এখনও পরিস্ফুট আছে। ইটালীর শিল্প-অভ্যুদয়ের কালে শিল্পী সকল সারাসেনদের পদ্ধতির কতকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। নির্ম্মাণের উন্মুক্ততায় ও ঔদার্য্যে সে লেখা যেন সমুদ্ভাসিত হইয়া আছে। কিন্তু ইটালী সারাসেনদের বিলাসমোহ ও উল্লাসবিকার বর্জ্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রাবল্য এ পক্ষে তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য ও প্রগাঢ়তা জন্যই গথিক পদ্ধতির আদর বাড়ে। এখনও গথিক গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ইউরোপে বিশাল স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভজনালয়, বিচারালয়, সমাধিমন্দির প্রভৃতি ভবন সকল গথিক পদ্ধতি অনুসারে প্রায়শঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা ত গেল ইতিহাসের কথা। এমনই ভাবে এক একটি যুগ ধরিয়া, ভাব-স্তরের বিশ্লেষণ করিয়া, এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

শিল্পের প্রাণ পারম্পর্য্য, বিশেষতঃ স্থাপত্য-শিল্প পরম্পরা ছাড়া হইতে পারে না। অথচ যাহা বিদেশ হইতে আমদানী, তাহা দেশের পারম্পর্য্যকে ছিন্ন করেই। পরন্তু যাহা জাতীয় শিল্প, তাহা ধীরে ধীরে প্রকট হইয়া থাকে। এক জন সমালোচক বলিয়াছেন যে, If it were possible to analyse the spring of the achievements of the greatest artists we should find that all of them had been influenced at some time or in some particular place, by their forerunners and were consequently imitators. অর্থাৎ, যদি শিল্পীর কীর্ত্তিকলাপের মূল তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, অল্লায়াসেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সকল শিল্পীই কোনও সময়ে বা কোনও স্থানে পূর্ব্বগামিগণের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই এক হিসাবে শিল্পীদিগকে অনুকারী বলা চলে। কথাটা ঠিক; কোনও জাতিবিশেষের জাতীয় শিল্পের পর্য্যালোচনা করিলে, পদে পদে এই পারম্পর্য্য পরিলক্ষিত হয়। তাই শিল্পের তিনটি স্তর অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

(১) Deductive (২) Formative (৩) Subjective, অর্থাৎ, প্রথমে দেখিয়া শুনিয়া রীতির নির্দ্ধারণ করিতে হয়; পরে শিল্পকলাকে গড়িয়া তুলিতে হয়; শেষে আদর্শ অনুসারে বিকাশ ঘটাইতে হয়। সিম্‌সন এই

হিসাবে ইউরোপের শিল্পের ইতিহাস লিখিতেছেন। তাই তিন খণ্ড শেষ হইতে না হইতে তাঁহার ইতিহাস জাতির সাহিত্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে।

মনে হয়, এ ভাবে ভারতের শিল্পের ইতিহাস লেখা যায় না। কেন না, ভারতে জাতিস্থিতির অক্ষুণ্ণ পারম্পর্য্য নাই। ভারতে বহুকাল হইতে পাশাপাশি দুইটা ভাবের নদী বহিতেছে; এক স্বদেশী, দ্বিতীয় বিদেশী। অনেক স্থানে দুইয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাই ফার্গুসন, বর্জ্জেস, কনিংহ্যাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইতিহাসের ধারা ঠিক করিতে পারেন নাই। দেশের বুধগণ যদি চেষ্টা করেন, তবে অঘটন ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সেবকগণ ভারতের শিল্প পুঁথির একখানা হারাণ পাতা খুঁজিয়া পাইয়াছেন! তাই আশা হয়, তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইলেও হইতে পারে। সেই আশায় প্রবুদ্ধ হইয়া বলিতেছি—একবার ইউরোপের দিকে তাকাইয়া দেখ! ইউরোপ কেমন ভাঙ্গা পাথর সংগ্রহ করিয়া তাহাদের স্থবির দেহ হইতে পুরাতন ও বিস্মৃত কাহিনী বাহির করিতেছে। উপলের অপূর্ব্ব ভাষা! ইউরোপকে ভিক্টর হিউগো সে ভাষা শুনাইয়াছেন। আমাদিগকে কেহ শুনাইবে না কি?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদেশে প্রাচ্যবিদ্যা।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের "জুর্নালাসিয়াতিকে"র (Journal asiatique) জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মঃ ফুষের্ শ্রাবস্তীর বৌদ্ধমহাপ্রাতিহার্য্য সম্বন্ধে একটি সুবিস্তৃত ও সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার ভস্মীভূত দেহাবশেষ তখনকার আট জন নরপাল আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। পরে এই অষ্টধাবিভক্ত দেহাবশেষের উপর আটটি মহাস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধকাহিনীর এই অংশ অবিশ্বাস করিবার কারণ প্রবন্ধকার দেখিতে পান না। কিন্তু এই আটটি মহাস্তূপ আটটি ঐতিহাসিক চৈত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মধ্যদেশের আটটি নগরী বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, এবং মহাপ্রাতিহার্য্যের লীলাক্ষেত্র হওয়ায় পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। মহাপরিনির্ব্বাণ-

সুত্তের একটি পুরাতন শাখায় ইহাদের মধ্যে চারিটি স্থানের নির্দ্দেশ থাকায় তাহাদের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব প্রামাণ্য। বৌদ্ধকাহিনীর অনুসারে এই চারিটি স্থান জাতি, অভিসম্বোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও পরিনির্ব্বাণের লীলাভূমি। গান্ধার-স্তূপের ও অমরাবতী-স্তম্ভের পাদদেশে এই চারিটি প্রাতিহার্য্যের চিত্র অঙ্কিত আছে। মঃ ফুষের্ বলেন যে, জাতি বলিলে শিশুবুদ্ধের ভৌতিক দেহের জন্ম বুঝায় না। তাঁহার মতে, ইহার অর্থ,—গৌতমের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রারম্ভ। গয়া, বারাণসী, কপিলবস্তুর উপকণ্ঠ ও কুশীনার, এই চারিটি স্থান মহানির্ব্বাণোক্ত প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ। তার পর যখন অলৌকিকত্ব বৌদ্ধধর্ম্মে স্থান প্রাপ্ত হইল, তখন দেবাবতারাদি আরও চারিটি অভিনব প্রাতিহার্য্য পূর্ব্বোক্ত কয়টির সহিত সংযুক্ত হইয়া রাজগৃহ, বৈশালী, মথুরা ও শ্রাবস্তীকে তীর্থপদে উন্নীত করিল। শ্রাবস্তীর মহাপ্রাতিহার্য্যই মঃ ফুষেরের সুদীর্ঘ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আমাদিগের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সারনাথের উৎখনন কার্য্যে এই মহাপ্রাতিহার্য্যের একটি স্বল্পোস্থিন্ন ভাস্কর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে উদ্ধৃত একটি প্রস্তরস্তম্ভ আমাদিগের প্রত্নতত্ত্বপণ্ডিত শ্রীযুত মার্শালের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই স্তম্ভটিতে আটটি চিত্র বর্ত্তমান। এগুলির মধ্যে সাতটি আমাদের পরিচিত; অষ্টমটি সম্পূর্ণ নূতন। শ্রীযুত মার্শাল্ প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এই অপরিচিত ভাস্কর্য্যটির সহিত শ্রাবস্তীর কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। আচার্য্য ফুষের্ ইহাকে শ্রাবস্তীপ্রাতিহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে উক্ত মহাপ্রাতিহার্য্যের সহিত বর্ত্তমান ভাস্কর্য্যের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য আছে। শ্রাবস্তীর মহাপ্রাতিহার্য্য নবম শতাব্দীর বোরোবোদোরেও ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। সারনাথের কাল খৃষ্টীয় প্রায় পঞ্চম শতাব্দী।

উক্ত সংখ্যায় মঃ লাবালে পুসঁ্যা বসুমিত্র-কৃত অভিধর্ম্মের তিব্বতীয় অনুবাদের পংক্তিবিশেষের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বাসিলীফ্, শিফনের্ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এইটুকুর জর্ম্মন অনুবাদে কিঞ্চিৎ প্রমাদ করিয়াছেন। আমাদের শ্রীযুত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরও ইহার সংস্কৃত প্রতিবাক্য দিতে গিয়া কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়াছেন। তিব্বতীয় এই কথাটি "ক্যোন্‌মে পা"। বাসিলীফ্ ও শিফনের্ ইহাকে "wahre Sündlosigkeit" দ্বারা অনুবাদ করেন। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় এই জর্ম্মণ বাক্যংশের অনুবাদ হইবে,

"নিষ্পাপাবস্থা" (sundlose Wahrheit)। অভিধানে এই তিব্বতীয় কথার নিম্নলিখিত প্রতিবাক্যগুলি পাওয়া যায়,—"অনবদ্য, অচ্ছিদ্র, নিরাময়, অনপায়িন্" ; কিন্তু এই সকলের কোনটাই এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। শরৎ বাবু তাঁহার তিব্বতীয় অভিধানে ইহার প্রতিবাক্য দিয়াছেন "ন্যাসঃ"। কিন্তু লাবালে পুসঁ্যা বলেন যে, ইহা ভুল ; এবং তাঁহার মতে, এই তিব্বতীয় বাক্যাংশের সংস্কৃত প্রতিবাক্য ন্যাসঃ নহে, "ন্যামঃ"। অসঙ্গের বোধিসত্বাভূমি, অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা, মহাব্যুৎপত্তি ও পালি সংযুক্তনিকায়ের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা তিনি স্বীয় ব্যাখ্যা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা জ্ঞানপ্রস্থান-কৃত অভিধর্ম্মমহাবিভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অভিধর্ম্মের সংস্কৃত মূল গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। কিন্তু কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে নেপালাক্ষরে লিখিত একখানি সভাষ্য পুঁথি আছে ; বোধ করি, স্থানটা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমাদিগের দেশের প্রাচ্যবিৎগণ এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পরিতেন।

উক্ত পত্রিকায় ১৯১০ সালের মে-জুন সংখ্যায় আমোলিনো মিশরের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়,—মিশরীয় প্রেত-গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। উক্ত গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদটি অতি পুরাতন, এবং ইহাতে মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা হেলিওপলিসের যাজকদিগের বড় আদরের সামগ্রী ছিল। প্রবন্ধলেখকের মতে, ইহা প্রায় খৃঃ-পূঃ ৪০০০ অব্দে রচিত।

এই সংখ্যায় ইণ্ডিয়া আফিসের সংস্কৃত-গ্রন্থ-রক্ষক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত টমাস প্রণীত "অশোক-বিবাসাঃ" নামক প্রবন্ধটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত। এই সকল মত-পার্থক্যের প্রধান কারণ এই যে, "বিবাসাঃ" শব্দের অর্থ অনেকে ঠিক প্রণিধান করিতে পারেন নাই। পিয়দশির অনুশাসনে যে কয়টি পাঠ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ব্যবহৃত "বিবাসেতবিয়", "ব্যঠেন", "বুঠেন" ও বিবুথেন", এই কয়টি কথার অর্থ লইয়া একটু গোল বাধিয়া আছে। এ কয়টি কথা যে একই ধাতু হইতে উৎপন্ন, এবং ইহারা যে একার্থবাচক, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। টমাস্ দেখাইয়াছেন যে, বি পূর্ব্বক বস্-ধাতু অভিনিষ্ক্রমণ বা গৃহত্যাগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

ভাগবতপুরাণ	...	"ময়ি ব্যুষিতে শোককর্ষিতা।"
ছন্দোগ্যোপনিষৎ	"	"ব্রহ্মচর্য্যং বিবস্যামি।"
রামায়ণ	"	"বিবাসন্তবারণ্যে।"
মহাভারত	"	"অস্ত্রহেতো র্বিবাসশ্চ পার্থস্য।"

মিঃ টমাস বলেন যে, সহস্রামে প্রাপ্ত অশোকানুশাসনের "দুবে সপংনা লাতিসতা" (দ্বে ষট্পঞ্চাশে রাত্রিশতে) অশোকের গৃহ-পরিত্যাগ ও তীর্থ-ভ্রমণের কালজ্ঞাপক। ইহার সহিত তারিখের কিংবা অশোকের গৃহপরিবর্ত্ত-নের কোনও সংস্রব নাই। ভিন্সেণ্ট স্মিৎ প্রমুখ প্রাচ্যবিৎগণ এতদিন এই ২৫৬ কে বুদ্ধের মৃত্যুর পর-বর্ষ-সংখ্যা বলিয়া ধরিয়া আসিতেছিলেন, এবং সেই হিসাবে ইঁহারা বুদ্ধের আবির্ভাবকাল গণনা করিতেন। অতএব বুদ্ধের অভির্ভাবকাল-নিরূপণ সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তার মাত্রা আরও একটু বাড়িয়া গেল।

মঃ ফসি বেন্নুক্কালে প্রাপ্ত আসীরীয় লেখমালায় মিত্র ও বরুণের নাম পাইয়াছেন। আসীরীয় ভাষায় এই দেবদ্বয়ের নামের কিঞ্চিৎ পরি-বর্ত্তন দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিদেশীয় শব্দবিন্যাসের মধ্য হইতে ইহাদিগকে পরিচিত আকারে গ্রহণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। আসীরীয় ভাষায় ইহাদের নাম মিত্রাশ্ শিল ও উরুণাশ্ শিল।

সমুদ্রপারে ভারতীয় উপনিবেশ-স্থাপনের কথা এখন অনেকটা ঠাকুরমার গল্পের মত হইয়া পড়িয়াছে—কিন্তু বাস্তবিক এমন এক দিন ছিল, যখন ভারতবাসী পোতসাহায্যে সুদূর অর্ণবপারে আপনাদের জ্ঞান, সভ্যতা ও কাব্যকাহিনী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শ্যাম রাজ্যের এক কোণে চম্পা-কাম্বোজের ধ্বংসাবশেষ ইহার সাক্ষী। কাম্বোজের এই অবজ্ঞাত হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে ফরাসী পুরাতাত্ত্বিকগণ গবেষণা দ্বারা আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিসর বর্দ্ধিত করিতেছেন। আজ আমরা আমাদিগের পুরাতত্ত্বের সম্ভারে এই সকল গবেষণার একটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিব। কাম্বোজের ফান্‌রাং উপত্যকার দক্ষিণে টাকসিং নামক গ্রামের অনতিদূরে একটি কেল্লার বুরুজের ধ্বংসাবশেষের নিকটে একটি অপরিষ্কৃত প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ০ম ৬৫ × ০ম ৩৭। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এই স্তম্ভটিকে য়ংকুর বলে। ইহার পশ্চাতে একটি উৎকীর্ণ লিপি বর্ত্তমান। উপরের মঙ্গলাচরণ (শ্রীঃ) না ধরিলে এই

লিপিখানি ছয় ছত্রে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমাংশ সংস্কৃত ও দ্বিতীয়াংশ চম্ ভাষায় লিখিত। এই সংস্কৃত অনুশাসনটি আমাদের আলোচ্য। সংস্কৃত লিপি চারিটি শ্লোকে গ্রথিত। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি অনুষ্টুভ। মধ্যেরটি উপজাতি। এবং শেষেরটি অনুষ্টুভ বৃত্তে রচিত। বের্গায়ঁ পূর্ব্বোক্ত চম লিপির অনুশীলন করিয়া বলেন যে, ইহা চম্পারাজ বিক্রান্তবর্ম্মার রাজত্বকালে ৭৭৬ শকে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনও রাজকীয় অনুশাসন নহে। ইহাতে রচনা-চাতুর্য্য বা কোনও প্রকার লিপি-সৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না। পংক্তিগুলিও ঠিক নাই। লিখন-প্রণালী দেখিয়া ইহাকে অষ্টম শকের বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমরা লিপিটি এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

শ্রীঃ

১ বিক্রান্তেশ্বর লোকৌ যৌ
তয়োর্গুপৌ (১) স নায়ক [ঃ]।
সমন্ত [ঃ] প্রথিতো নাম্না
তস্য পুণ্যমিদং মতম্॥

২। বিহারৌ দেবকুলে দ্বৌ দ্বে
জিনশঙ্করযো স্তয়োঃ।
স্বজনার্থং প্রকুরুতে
তন্নতিং প্রগত শ্ শুভং॥

৩। হুমাতবো-(২) সংগণিতস্ত পাংপ্ল ঃ (৩)
ক্ষেত্রন্তু খার্য্যাঃ দশমন্তাঙ্কে (৪)।
পরত্র ভূরীচ্ছতি ভোগমার্য্যং
প্রদাজ্জিনায়ৈব মনশ্ শুভেন॥

৪। সমন্তপুত্রঃ স্থবিরঃ
বুদ্ধনির্ব্বাণসংজ্ঞকঃ
কাব্যস্য করণঞ্চক্রে
জ্ঞাতয়ে ভূতলে ন্ ণাং

শ্রীপুরাপ্রিয়।

---

(১) গুপ্তৌ? বের্গায়ঁ বলেন, গতৌ বলিলে অর্থটা ঠিক হয়। কিন্তু এরূপ সংশোধন অযৌক্তিক।

(২) কেহ ইহাকে হমাতাবোব্ পাঠ করেন। স্থানবিশেষের নাম।

(৩) ইহাও কোনও স্থানীয় নাম।

(৪) বের্গায়ঁ বলেন যে, ইহা লিপিকর-প্রমাদ। ইহার শুদ্ধ পাঠ দশমন্তকাঙ্কে। দশমন্তক স্থানবিশেষের নাম।

পল্লী-পলিটিক্‌স।

১

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা সজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় চাকরী করিয়া জমীদারী কিনিয়াছিলেন। এ কালে চাকরী দ্বারা উদরান্নের সংস্থান হওয়াই দুরূহ, জমীদারী ক্রয় করা ত দূরের কথা। কিন্তু সে কালে সাধারণ লোক মাসিক পনের টাকা বেতনের চাকরী করিয়াও যখন দোল দুর্গোৎসব করিয়াছেন, তখন যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি বেতন বাদ 'সালিয়ানা' আট দশ হাজার টাকা উপরি পাইতেন, তাঁহারা কিছু দিনের মধ্যে জমীদারী কিনিয়া অভিজাত-পর্য্যায়-ভুক্ত হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। রজনীকান্ত সেকালে নবাবের 'কারকুনী' ও সজনীকান্ত পেস্কারী করিতেন। এই উভয় পদের তুলনায় পুলিসের দারোগা-

---

* আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, গত বৈশাখের সাহিত্যে প্রকাশিত "ডাক্তারের নির্ব্বুদ্ধিতা" নামক হৃদয়গ্রাহী পল্লী-কথানকটি বঙ্গীয় পাঠকসমাজের ও সমালোচকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলেও, তাহা পাঠ করিয়া, কোনও কোনও পাঠক লেখকের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন! তাঁহাদের ধারণা, ঐ গল্পে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। এমন কি, কোনও মফস্বল-কোর্টের কোনও কোনও "আপকাওয়াস্তে" উকীল মহামহিম হাকিম মহোদয়ের এজলাসে গল্পটির সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের হুজুরকে জানাইয়াছিলেন, এই গল্পে তাঁহাকে অত্যন্ত অভদ্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে! মফস্বলের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ধর্ম্মাবতার—বাহাল-বরতরফের কর্ত্তা হাকিমদের কথা লইয়া কাগজে কলমে ঠাট্টা! ধর্ম্মাবতার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। আশঙ্কার কথা বটে!—উক্ত গল্পে কোনও কাল্পনিক মহকুমার দেশীয় হাকিমদের ব্যবহার-প্রসঙ্গে যে দুই একটি কথা রহস্যচ্ছলে নিতান্ত সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে হাকিমবিশেষের গাত্রদাহের কারণ কি? দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে ঘটীরামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই চিত্র যে সর্ব্বাংশে কাল্পনিক, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সে জন্য কি কোনও ঘটীরাম এজলাসে বসিয়া দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া স্বীয় "ঘটীরামত্ব" প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন? হাস্যরসিক কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত-ফের্ত্তাদের বিদ্রূপ করিয়া হাসির গান রচিয়াছেন; সে জন্য কি "বিলাত-ফের্ত্তা ক ভাই" তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছেন? মনুষ্য-চরিত্রের চিত্রাঙ্কণে মনুষ্য ভিন্ন পশুর আদর্শ গ্রহণ করিবার উপায় নাই; কিন্তু কোনও রচনায় যদি সম্প্রদায়বিশেষের কোনও খেয়ালের প্রতি ইঙ্গিত থাকে, টুপী যদি ব্যক্তিবিশেষের মাথায় মানানসই হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

সাহিত্য-সম্পাদক।

গিরি, এমন কি, পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ারীও তুচ্ছ। রজনীকান্ত ও সজনীকান্ত যে জমীদারী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক 'মুনফা' প্রায় বত্রিশ হাজার টাকা!

সে কালে ও এ কালে প্রভেদ বিস্তর; সুতরাং উভয় ভ্রাতায় বেশ সদ্ভাব ছিল। চাকরী ছাড়িয়া বৃদ্ধ বয়সে উভয়কে কিন্তু চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। সজনীকান্তের পাঁচ পুত্র, রজনীকান্তের একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। উভয়ের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লইয়া উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটিতে পারে, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে যে সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে উকীল, মোক্তার, আমলা ও আইনের বাহন পেয়াদাগণের সেবায় নিঃশেষিত হইতে পারে ভাবিয়া, অনেক দিন হইতে উভয় ভ্রাতার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। অনেক চিন্তার পর জমীদারী ভাগ বাটোয়ারা করাই তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। সম্পত্তিতে উভয়ে পৃথক হইলেন। রজনীকান্ত জ্যেষ্ঠ, তিনি যে ভাবে এজমালী সম্পত্তি বিভক্ত করিলেন, তাহাতে সজনীকান্তের কোনও আপত্তি হইল না। রজনীকান্ত স্বয়ং নিজাংশে ছয় আনা রাখিয়া অবশিষ্ট দশ আনা ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন।

রজনীকান্ত ও সজনীকান্ত কালধর্ম্মে সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিলে, রজনীকান্তের জামাতা অনিলকুমার শ্বশুরের পরিত্যক্ত ছয় আনা সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইলেন; তাঁহার পুত্র অসিতকুমার মাতামহের সংসারে রাজনন্দনের ন্যায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। সজনীকান্তের প্রত্যেক পুত্র দুই আনা সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কেহ কলিকাতায় বাগানবাড়ী কিনিলেন; কেহ ষ্টীমলঞ্চ কিনিয়া পদ্মাবক্ষে জলবিহার আরম্ভ করিলেন; কেহ বা স্বগ্রাম জনার্দ্দনপুরে অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও লোক্যাল বোর্ডের ভাইস্‌চেয়ারম্যান হইয়া রায় বাহাদুর খেতাবের প্রত্যাশায় হগসাহেবের বাজার উজাড় করিতে লাগিলেন; পেলিটীর হোটেলে ও কেলনারের মধুচক্রেও তাঁহারা গুঞ্জন আরম্ভ করিলেন। ক্ষুদ্র জনার্দ্দনপুর নিত্য নূতন 'গাড়ী ঘোড়ার আবির্ভাবে প্রায় সহর হইয়া উঠিল।

২

অনিলকুমার তাঁহার একমাত্র পুত্র অসিতকুমারের বিবাহে যেমন ঘটা করিয়াছিলেন, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, দিল্লীর দরবারের পূর্ব্বে তেমন ঘটা বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডে আর কখনও হয় নাই! সেই ঘটার চোটে ভুবন মালী ও তস্য ভাগিনেয় নিতাই মালী আতসবাজীর বারুদের আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছিল, এবং সেই আগুন গ্রাম্য বাজারের 'খড়ে'র দোকানে লাগিয়া এমন 'রোশ্‌নাই'য়ের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বহু পল্লীবাসীকে জগৎ অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল। সে বড় সহজ ঘটা নহে! গ্রামের লোক এক সপ্তাহ ধরিয়া পেট ভরিয়া লুচি সন্দেশ খাইয়াছিল; বুড়া মাণিক ঘোষ আড্ডায় বসিয়া গল্প করিত,—অনিল বাবু তিন দিন শিবু শাহার সরাপের দোকানে 'জলছত্র' দিয়াছিলেন; দেশের যত মাতাল তিন দিন কাল আকণ্ঠ 'কার্গো' বোঝাই করিয়াছিল; কিন্তু এই কার্য্যে তিনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন নাই; কারণ, (মাণিক ঘোষের মতে) অনিল বাবু যদি তাহাদের জন্য আড্ডাঘরে গুলির একটি পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকর' জনার্দ্দনপুরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিতেন।

পরের ছেলে অনিলকুমার জ্যেঠা মহাশয়ের পরিত্যক্ত ছয় আনা সম্পত্তির মালিক। জনার্দ্দনপুরে তাঁহার মান সম্ভ্রম সম্মান প্রতিপত্তির সীমা নাই; জেলার কালেক্টার পর্য্যন্ত তাঁহার সদনুষ্ঠানে মুগ্ধ; গ্রাম্য স্তাবকগণের কণ্ঠে কেবল অনিলকুমারের বন্দনাগান ভিন্ন অন্য শব্দ নাই; অনিলকুমারের 'ব্রুহাম' 'ভরোচে'র চক্রশব্দে—ঐরাবততুল্য ওয়েলারসমূহের ক্ষুরধ্বনিতে জনার্দ্দন-পুরের রাজপথ দিবানিশি প্রতিধ্বনিত,—দেখিয়া শুনিয়া ছোট তরফের বাবুরা ঈর্ষ্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারা পৈত্রিক বাসগ্রাম জনার্দ্দনপুরের বাস একরূপ ত্যাগ করিলেন। কেবল ন কর্ত্তা যোগেশ বাবু অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটী, মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও লোকালবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানগিরির মায়া কাটাইতে না পারিয়া গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন; সুতরাং অনীল-কুমারের সহিত নানা বিষয় লইয়া তাঁহার নিত্য সংঘর্ষণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অন্যান্য সরিকেরা গ্রামত্যাগ করিয়া ক্রমাগত কলিকাতা, দারজিলিং, ওয়াল-টেয়ার ও ঘাটশিলায় হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন; ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের বৈষয়িক অবস্থা গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য হইয়া উঠিল। প্রথমে জমীদারী, তাহার পর পরিবারবর্গের অলঙ্কার পর্য্যন্ত 'বাঁধা' পড়িল। কেবল পল্লীগ্রামে বাস হেতু যোগেশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ সচ্ছল রহিল। কিন্তু দীর্ঘকালের চেষ্টায় সাধ্যাতিরিক্ত তৈলদান করিয়াও যখন তিনি চির-আকাঙ্ক্ষিত রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করিতে পারিলেন না,

তখন তাঁহার মনে নিরতিশয় বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল! সংসার অসার বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। কিন্তু গ্রাম্য উকীল মোসাহেব শ্রীযুত একাদশী চক্রবর্ত্তী বি. এল্. মহাশয় পুনঃপুনঃ তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে', অতএব ভাই! হতাশ না হইয়া অনবরত তৈল সরবরাহ করিতে থাকহ, সবুরে মেওয়া ফলিবে।"

একাদশী চক্রবর্ত্তী জনার্দ্দনপুরের স্বনামধন্য পুরুষ। 'কঞ্জুষে'র অগ্রগণ্য বলিয়া গ্রামের লোক প্রভাতে তাঁহার নাম করিত না। গ্রামে তাঁহার নাম ছিল 'বোগ্‌নো ফাটা' উকীল। তিনি মাসের অধিকাংশ দিন একাদশী করিতেন বলিয়া, কি প্রভাতে তাঁহার মুখ-দর্শনে একাদশী করিতে হইত বলিয়া তাঁহার নাম 'একাদশী' হইয়াছিল, তাহা জনার্দ্দনপুরের 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' ভবকিঙ্কর দত্ত দেববর্ম্মাই আবিষ্কার করিতে পারেন। গল্প-লেখকের প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগ নাই, সুতরাং আমরা তাহা বলিতে পারিব না। তবে আমরা এইটুকু জানিতে পারিয়াছি, চক্রবর্ত্তীর পিতা জমীদারদের পুরোহিত ছিলেন; ন বাবুর অনুগ্রহেই একাদশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইয়াছিলেন। এখন ন বাবু একাধারে তাঁহার যজমান ও মক্কেল। একাদশী চক্রবর্ত্তী জনার্দ্দনপুরের আদালতে ওকালতী করিতেন, এবং ঘরে বসিয়া ন বাবুর 'রায় বাহাদুর' খেতাবের আশায় শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও নারায়ণের মস্তকে প্রত্যহ তুলসীপত্র প্রদান করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংরাজী দৈনিক পত্রসমূহে ন বাবুর সুখ্যাতিসূচক সুদীর্ঘ প্রেরিত পত্র মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু তুলসীপত্র বা প্রেরিত পত্র—কিছুতেই কোনও ফল হইল না।

ইতিমধ্যে রাজার জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে আনন্দোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল, চক্রবর্ত্তী দেখিলেন, এইবার একটা 'দাঁও' যায়, তিনি মহা উৎসাহে ইংরাজী অভিধান-সিন্ধু মন্থন করিয়া দেড়গজ বহরের শব্দ-চয়নপূর্ব্বক, প্রয়াগের পাইয়োনীয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া চৌরঙ্গীর চেরাগ্ ও কয়লাঘাটার প্যাগম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণীর ইংরাজী দৈনিকে ন বাবুর অর্থে তাঁহার রাজভক্তির বার্ত্তা টেলিগ্রামযোগে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল টেলিগ্রাম-পাঠে দেশ বিদেশের লোক জানিতে পারিল, রাজকীয় উৎসব উপলক্ষে ন বাবু তাঁহার বৈঠকখানার 'ছ্যাতলাধরা' কার্ণিশে সাড়ে সতের গণ্ডা 'চেরাগ্' জ্বালিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রজাদের পেট ভরিয়া লুচি সন্দেশ খাওয়াইয়াছেন। কিন্তু ন বাবুর কোনও কোনও নিমকহারাম প্রজা

লোকের কাছে গল্প করিয়াছিল,—টাকাটা ন বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাহাদের নিকট "মাথট" রূপে আদায় করা হইয়াছিল, এবং ফলারটা রাজার জন্মতিথি-উৎসবের নহে, ন বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবের। ক্ষুদ্র জনার্দ্দনপুরে একাদশী চক্রবর্ত্তীর মত অন্য কোনও ব্যক্তি এক ঢিলে তিন পাখী মারিতে পারিত না।

যাহা হউক, দীর্ঘকালের সাধনা প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। নবাবু অবশেষে জনার্দ্দনপুরের 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট বেঞ্চে'র দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ন বাবুও 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' এই নীতি বাক্যের সার্থকতা দেখিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিলেন। একাদশী চক্রবর্ত্তীর লম্ফ-ঝম্পে জনার্দ্দনপুর টলমল করিতে লাগিল।

৩

ন বাবু 'ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট' হাকিম হইবার পর একাদশী চক্রবর্ত্তী উকীলের ফলার 'পাকিল!' ন বাবু যখন তৃতীয় শ্রেণীর হাকিম ছিলেন, তখন বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসনের মত এক দল হাকিম মামলা করিতে বসিতেন, আর জোড়ায় জোড়ায় মিলিয়া মামলার রায় দিতেন। সে সকল অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মামলা। কোনও গাড়োয়ান সন্ধ্যার পর হয় ত তাহার গাড়ীতে টিনের 'ঝাঁঝরা' লণ্ঠনটা জ্বালিতে ভুলিয়া গিয়াছিল; লণ্ঠনের ভিতর যে 'টিমি'টা জ্বলিত,—তাহা হইতে আলো অপেক্ষা ধূমই অধিক নিঃসৃত হইত, এবং লণ্ঠনটা গোরুর গাড়ীর 'ফড়ের' নীচে 'হাতসত্বা' দিয়া বাঁধা থাকিত বটে, কিন্তু পথের অন্ধকার বিদীর্ণ করিবার তাহার শক্তি ছিল না। ফল যাহাই হউক, গাড়োয়ান বেচারা সেই 'টিমি' প্রজ্বলিত না করায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইল। তাহার হাতে পয়সা থাকিলে চৌকিদার-হাকিম তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিত; দুই চারিটি তাম্রমুদ্রা 'রোশ্‌নাই'-এর অভাব দূর করিত। অতঃপর মহকুমার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গাড়োয়ানকে অনরারী বেঞ্চে বিচারার্থ সমর্পণ করিলেন। বেঞ্চের বিচারে গাড়োয়ান চারি আনা জরিমানা দিয়া অব্যাহতিলাভ করিল। কেহ মাতাল হইয়া নর্দ্দামায় পড়িয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিল, এবং নর্দ্দামার পাঁক চন্দন-বোধে অঙ্গে মাখিতেছিল। পুলিস তাহাকে ফৌজদারীতে দিয়াছে। সে মামলাও অনরারী কোর্টে আসিল। এইরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মামলার রায় দিয়া তৃতীয় শ্রেণীর অনরারী হুজুরেরা শ্রমখিন্নদেহে মলিনমুখে গৃহে ফিরিতেন; এবং

পুরস্কারস্বরূপ এক একটি বন্দুক বিনা লাইসেন্সে ঘরে রাখিতে পারিতেন। কুড়োরাম বারিক (বারুজীবী) অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পানের 'বরজ' বিক্রয় করিয়া একটা বন্দুক কিনিয়াছিল, এবং পান বিক্রয় ছাড়িয়া দিয়াছিল; কারণ সে বলিত, "আমার বাপ দাদা পান বেচ্‌তো; কে তাদের নাম জান্‌ত! আর আমি সখের ম্যাজিষ্টার, মস্ত হাকিম, কলা চুরী মুলো চুরীর বিচার করি, আমার কি পানের ব্যবসা করা সাজে?" কুলীনশ্রেষ্ঠ মজুমদার-বংশাবতংশ শ্রীনারায়ণ বাবু বলিতেন, "ছোট লোকের সঙ্গে বসে হাকিমী করতে হচ্ছে, ইজ্জৎ আর বজায় থাকে না। এমন মানে কাজ নেই।" কিন্তু মনের কামনা, 'চরণ-সরোজে পরাণ মধুপ চিরমগন যেন রয় হে,' সুতরাং সখের হাকিমী জীবনের ব্রত হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হাকিমীতে প্রমোশন পাইয়া ন বাবুর কাজ অনেক বাড়িয়া গেল। এখন আর ঘটী বাটি চুরী নয়, মাথা ফাটাফাটি লাঠালাঠীর ত কথাই নাই, এমন কি, সিঁদেল চোরের পুলিস-চালানী মামলার পর্য্যন্ত বিচারের ভার ন বাবুর উপর পড়িতে লাগিল। উকীল মোক্তারেরা ন বাবুর এজলাসে সাক্ষী লইয়া সওয়াল জবাব করিতে লাগিলেন। চাপরাশী যখন "ময়েস মাঝি সাক্ষী হাজির!" বলিয়া হাঁকিত, তখন এজলাসে বসিয়া ন বাবুর হৃদয় আনন্দে ফুলিয়া উঠিত। ন বাবু দক্ষতার সহিত বিচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার লক্ষ্য প্রথম শ্রেণীর হাকিমী।

একদিন একাদশী ন বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "দেওয়ানী মামলার অবস্থা আজ কাল বড়ই শোচনীয়, ফৌজদারীতে ঝোঁক না দিলে ত আর চলে না। আরে ভাই, দুঃখের কথা বলবো কি? টাকায় জোড়া মামলা নিতে আরম্ভ করেছি দেখে' 'বারে'র সকলে একঘরে করবার উপক্রম করেছে! তার চেয়ে ফৌজদারী আদালতে দিন চারটে টাকাও হ'বে তো? তোমার কোর্টে কিন্তু আমি পাঁচ টাকার কমে যাচ্ছিনে।"

ন বাবু সহাস্যে বলিলেন "one-third of a guinea not a bad bargain!" দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রোমোশন পাইয়া ন বাবু শয়নে স্বপনে ইংরাজীতে কথা কহিতেন।

একাদশী একটা মামলায় ইচ্ছা করিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। আসামী ভাবিয়াছিল, তাহার জেল অনিবার্য্য। একাদশী এমন নৈপুণ্যের সহিত তদ্বির করিলেন যে, আসামী মুক্তি লাভ করিল। মামলায় জিতিয়া একাদশী

মক্কেলের নিকট যে সকল উপহার লাভ করিল, তন্মধ্যে একটি খাসী ছিল। খাসীটা কিসের নিদর্শন, বলিতে পারি না ; তবে এই পর্য্যন্ত জানি, এই খাসী খাইয়া খুসী হইয়া একাদশী ন বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, "তুমি শীঘ্র first-class 'পাউয়ার' পাও ; তখন আর খাসীতে মানাইবে না, 'মহিষ' দাবী করিব।" যাহা হউক, আসামী মুচী অব্যাহতি পাইল ; সে বিষ-প্রয়োগে গো-বধের অভিযোগে ফৌজদারীতে পড়িয়াছিল। এই কার্য্যে সে বহু দিন হইতেই অভ্যস্ত, এইবার ধরা পড়িয়াছিল। উকীল একাদশী সাক্ষীদের এমন জেরা করিতে লাগিলেন যে, সাদা কাল, এবং হাঁ না হইয়া গেল। মহেশ মাঝি সাক্ষী জবানবন্দী দিল, "আসামী হারু 'ইষিপুত্তুর' আমার সামনে নাছের সর্দ্দারের গরুকে বিষ দিয়াছিল ; বিষ কি না, বলিতে পারি না, আঁখ্‌ড়ো কলা-পাতায় জড়াইয়া কিছু দিয়েছিল। পর দিন বলদটা টুঁটি ফুলে মরে গেল। আমি নাছের সর্দ্দারকে বল্‌লাম, 'তোমার বলদ মরবে, তা জানতাম।' সব কথা তাকে খুলে বলায় সে আমাকে সাক্ষী মেনেছে।"—জেরায় প্রতিপন্ন হইল, মহেশ মাঝি ঘটনার দিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল। নাছের সর্দ্দারের গরুর কি রং, তাহাই সে জানে না। বিষেই বলদটির মৃত্যু, তাহার অব্যর্থ প্রমাণ ছিল ; কিন্তু হারু যে বিষ দিয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইল না। হারু সপ্রমাণ করিল, সে সেদিন সনাতনপুরে এক জোড়া চামড়া কিনিতে গিয়াছিল।

হারু খালাস পাওয়ায় জনার্দ্দনপুরের এলাকার যত চোর একাদশী উকীলকেই তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা মনে করিতে লাগিল। ন বাবুর এজলাসে প্রায় প্রত্যহই মামলা থাকিত। একাদশী এক পক্ষে আছেনই। দুই হাতে তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন! এতদিনে তাঁহার আশা-লতায় রূপার ফল ফলিতে লাগিল।

অবস্থা ফিরিলে বুদ্ধি যোগায়! একাদশীর বুদ্ধি যোগাইল। তিনি মহাজনী কারবার আরম্ভ করিলেন। তাহার আয়ে সংসার চলিতে লাগিল। পুত্র-কন্যাগণের দুধের যোগান বর্দ্ধিত হইল। বাড়ীতে দুই এক শিশি এসেন্স, কেশ-তৈলেরও আমদানী হইল। কিন্তু একাদশী কোনও ভাগ্যবান স্বদেশী পারফিউমারকে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। ন বাবু অল্পদিনের মধ্যেই একাদশীকে গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ও লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর করিয়া লইলেন। ন বাবু বুঝিয়াছিলেন, পর-বৎসরের মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সনে চেয়ারম্যানীর ক্যাণ্ডিডেট্ হইতে হইলে দল পুষ্ট

থাকা একান্ত আবশ্যক। ঢাক অধিক বাজিবার প্রত্যাশায় পিঠে তেল মালিশ করিতে লাগিল।

৪

সাংসারিক সুখ দুঃখের কবল হইতে সংসারীর মুক্তিলাভের উপায় নাই। ন বাবু দৈনিক কার্য্যে উপেক্ষা করিয়া সরকারী কার্য্যে আয়ুঃক্ষয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহার কন্যা বীণাপাণি দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছিল। ন বাবু কন্যার পাত্র খুঁজিবার জন্য বঙ্গদেশ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। অবশেষে একটি পাত্র স্থির হইল। পাত্র চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রুড়কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এল্. সি. ই. পাশ।—ন বাবুর পারিষদ একাদশী এক মুখ দন্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলিলেন, "রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী" ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্থ!

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশ করা বরের দাম এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে আজ কাল অল্প নহে। ন বাবু যে ছেলেটি নিলামে কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার দাম ছয় হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এক জন সব জজ তাহাকে ছয় হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া জামাই-রূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ছেলেটির পিতা পেন্সনপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার রামশঙ্কর বাবু এত অল্প মূল্যে 'বিড্' করিতে সম্মত হন নাই। জজ আদালতের নাজিরের মত তিনি হাতুড়ী তুলিয়া ক্রমাগত হাঁকিতেছিলেন, "ছয় হাজার রূপেয়া এক—ছয় হাজার রূপেয়া দুই—আর কেউ ডাকবে?" এমন সময় ন বাবুর পক্ষ হইতে সাত হাজার টাকা 'ডাক্' হইল।

বরের পিতা রামশঙ্কর বাবু বন্ধুগণকে জানাইলেন, যদিও একালে বরের বাজারের খুব তেজ, এখন ছেলেটিকে লইয়া নিলাম হাঁকিলে আট দশ হাজার টাকা উঠিতে পারে, কিন্তু পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থোপার্জ্জনে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই; তবে তাঁহার সামাজিক সম্মান ও পুত্রের Academic distinctionএর মর্য্যাদাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সাত হাজার টাকা নগদ গণিয়া লইয়া ন বাবুর সহিত পবিত্র বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে তাঁহার আপত্তি নাই।

ন বাবুর শত্রুরা রামশঙ্কর বাবুকে জানাইলেন, "ন বাবুর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, এত টাকা তিনি দিতে পারিবেন না, টাকা লইয়া বিবাহ দিবেন।" রামশঙ্কর কিছু ধাঁধায় পড়িলেন।

কিন্তু মনের অন্ধকার শীঘ্রই কাটিয়া গেল। চক্ষুর্লজ্জা করিলে বাণিজ্য ব্যবসায় চলে না। রামশঙ্কর বাবু ন বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন, পাকা দেখার দিন তিন হাজার, আর বিবাহের রাত্রে কন্যা-সম্প্রদানের পূর্ব্বে অবশিষ্ট চারি হাজার টাকা দিতে হইবে।

ন বাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু টাকা কোথায়?

"শূন্য তহবিল, কাঁদে হাহারবে,
বাজার দেনায়, বাজারে প্রবেশ দায়।"

ন বাবু দশ দিক শূন্য দেখিলেন; জমীদারীটুকু বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অগত্যা জমীদারী বন্ধক দিতে হইল। একাদশী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "সাত হাজার টাকায় জামাই পাওয়া যাচ্ছে—হীরের টুক্‌রো, 'ড্যাম চীপ'! এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যদি জমীদারী বন্ধক না দেবে ত কি পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের জন্য জমীদারী বন্ধক দেবে?"

ন বাবুর তালুক দুর্গাপুর বন্ধক দিয়া বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

জগজ্জ্যোতিঃ। জ্যৈষ্ঠ। বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহার চতুর্থ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিকপত্র; শ্রীযুক্ত জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ শ্রীগুণালঙ্কার মহাস্থবির কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে প্রকাশিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ 'বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ' নামক চারি-পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' এই নীতির অনুসরণ করিয়া লেখক যদিও 'হিন্দু-বৌদ্ধ' সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন অপব্যাখ্যা-কারিগণকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদই লেখকের বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ। কবি শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'বর্ষশেষে' বর্ষবিদায় সম্বন্ধে মামুলী রোদন। বৎসর আসে, বৎসর যায়, কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় কবিগণ নানা ছন্দে যে সকল বর্ষ-বিদায়-গাথার রচনা করেন, অনন্ত কালসাগরের জলবুদ্বুদের ন্যায় তাহাও বিস্মৃতির অতল-তলে বিলীন হয়। 'বৈশাখী পূর্ণিমোৎসবে' যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তনে ও সভার কার্য্যবিবরণে 'উৎসব' পরিপূর্ণ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ 'দুকূল ও পাত্রিকা'র বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায়ের

তাহার গুণে গল্পের করুণ রস হাস্যরসে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষার একটু নমুনা দিতেছি—'সে তখন হঠাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে আরম্ভ করিল,

ও হে চিত্তচোর! এবার ফাঁসি তোর—
মরি মরি—আহা মরি—প্রীতির বন্ধন!

জয় ত্রিরত্নের। এতদিনে আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে—আমি স্বর্গে চলিলাম।' তর্কভূষণ মহাপাধ্যায় তর্ক শাস্ত্রের সমালোচনা করুন, আমরা তাহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিব না। কিন্তু তিনি গল্প লিখিবেন না। অনধিকারচর্চ্চা কাহারও, এমন কি, মহামহোপাধ্যায়েরও শোভা পায় না। গল্প লিখিবার 'আর্ট' আছে, এবং তাহাও সাধনাসাপেক্ষ।

অর্চ্চনা। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের 'আদি দম্পতি' নামক গাথাটি সুখপাঠ্য। নবীন কবির সাধনা সফল হউক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অযোধ্যা' নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। 'শ্যাংহাই' শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোমের রচিত সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী; কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত যে তৃপ্তি হয় না। 'কাব্যে গন্ধ' শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের রচনা। এই প্রবন্ধে লেখক নিপুণভাবে কবিবর রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটি নির্ভীক, সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ। আমরা সকলকে, বিশেষতঃ কবিবরের অন্ধ স্তাবকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লেখক লিখিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা পড়িতে আমরা বড়ই ভয় পাই। তাঁহার পাকান ঘোরাণ প্যাঁচওয়ালা ভাষাব্যূহ যদি বা কোন প্রকারে ভেদ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার মর্ম্মকোষের গন্ধ, ঘনানন্দ প্রভৃতি কবিত্বকুহেলিকা মনে এমন একটা বিষম বিভীষিকা জন্মাইয়া দিয়াছে যে, সে জন্য তাঁহার আধুনিক রচনাগুলি পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত কবিবরের এই 'জীবনস্মৃতি'র স্থলবিশেষ আমাদের কাছে দুরধিগম্য, যেন ভাষার গোলকধাঁধা; এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভক্তগণ হয় ত একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন,—ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ!'—গন্ধই বটে! বিনয়ের বেড়ায় ঘেরা আত্মম্ভরিতার এমন ঝাঁঝাল তীব্র গন্ধ আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত পাই নাই।'—নিরপেক্ষ পাঠকেরা এ কথা অস্বীকার করিবেন না। তবে রবিভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র। কবিবরের অসামান্য প্রতিভার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মত 'নিতুই নব'। কবিবরের নিকট আজ যাহা 'হাঁ' কাল তাহা 'না'। রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি, কাব্যনীতিতেও কবিবরের মত নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লেখক কবিবরের রচিত আধুনিক ও অতীত কালের নানা প্রবন্ধের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে কবিবরের যে মত ছিল, এখন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং কাব্য কাহাকে বলে, কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এবং তাহার অস্পষ্টতার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, আমরা আজ সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা 'প্রমাণ' করিয়া দিব। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যাঁহাদের পক্ষে বেদবাক্য বলিয়া ধারণা, তাঁহাদের সে ভুল ধারণা ভাঙ্গিতে পারে।' কিন্তু ভাঙ্গিবে কি? যাহারা জাগিয়া ঘুমায়, তাহাদের ঘুম

ভাঙ্গিবার নয়। রবীন্দ্রনাথ বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, একদিন কোনও নবীন লেখক তাঁহারই অস্ত্রে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিবে। ইহাকেই বলে, 'যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!' শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'শিল্পীর প্রেম' গল্পটি সুখপাঠ্য। গল্প লিখিবার 'আর্টে' তাঁহার লক্ষ্য আছে, কিন্তু ভাষা কাঁচা। ভাষার প্রসাধনে উদাসীনতা গল্পের পক্ষে অত্যন্ত সাংঘাতিক। কথাবার্ত্তার ভাষায় অত্যন্ত ন্যাকামী অসহ্য।—'কিন্তু বিয়ে কর্ত্তে ভুল করনি তুমি!' ভাষার এরূপ প্রয়োগ শিষ্টও নহে, মিষ্টও নহে, স্বাভাবিকও নহে। 'এবং তাহার বিবাহে অমত লইয়া সকলে নানারূপ কারণ ও অকারণের সৃষ্টি করিত।' 'অকারণের সৃষ্টি'টা নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া বলিয়াই মনে হয়। অস্তাচলগামী রবীন্দ্রনাথকে এমন করিয়া ভ্যাংচাইয়া কোনও লাভ নাই। 'দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশ', 'ক্রমতিস্মৃচী বনপথ', 'চুম্বিত-মৃত শ্যামলতা' প্রভৃতি লেখকের 'আজগুবী' সৃষ্টি, কিন্তু 'দুধারে তাহার "সার মিলানো" তালীকুঞ্জ ও আশে পাশে "থোকো থোকো" ফুল ফুটিয়াছে' দেখিয়া মড়াদাহ ও শব-পোড়া নামক একযোড়া গুরুচণ্ডালী মনে পড়ে। 'ঊর্দ্ধে রমণী, নিম্নে যুবক—মাঝে বড় ব্যবধান, ওগো বড় ব্যবধান!' ব্যবধানকে এরূপ করুণ রসে সিক্ত করিবার শক্তি আদিকবি বাল্মীকিরও ছিল না! 'দু'জনে দু'জনার দিকে চাহিয়া রহিল—এমনি অনেক ক্ষণ!' ভাষার এরূপ ভঙ্গী সুস্থ সবল রচনার লক্ষণ নহে।—'বঞ্জুল মঞ্জুল শ্যামলিতা ভূমি', 'নীলাজ-নীল আকাশে শুভ্র রেখা "অর্পণ" করিয়া "হাঁসের সার" উড়িয়া যাইতেছে' প্রভৃতি নূতন বটে। এরূপ স্থলে 'হাঁসের সার' শ্রুতিমধুর, না 'হংসশ্রেণী' সুশ্রাব্য? 'হাঁসের সার' যে নীল আকাশে শুভ্র রেখা 'অর্পণ' করে, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। লেখকের রচনাশক্তি আছে; তাই আমরা তাঁহাকে সাবধান করিলাম। আশা করি, লেখক ভবিষ্যতে ভাষা-সংযমে অবহিত হইবেন। 'প্রাচীন কলিকাতা' নামক সঙ্কলিত প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। সেকালে কলিকাতায় পাল্কীর বেহারাদের সমস্ত দিনের পারিশ্রমিক ছিল চারি আনা! একালে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বহুবাজার যাইতে এক জন মুটে তিন চারি আনা দাবী করে! হায় রে সেকাল!

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী। আষাঢ়। কটকের শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বঙ্গভাষা' নামক প্রবন্ধে বঙ্গভাষার নাড়ী-নক্ষত্র লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গলা ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে চাহেন। আমরা এরূপ ঢালিয়া সাজিবার পক্ষপাতী নহি। এরূপ রূপান্তর ও পরিবর্ত্তন সহসা সম্ভব নহে। আমরা বুড়া বয়সে নূতন করিয়া বানান অভ্যাস করিতে পারিব না। তবে 'নূতন কিছু' না করিলে যাঁহাদের অন্ন পরিপাক হয় না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের 'মুসলমান ঐতিহাসিক ফৈজী' বহু পাদটীকায় কণ্টকিত হইলেও সুখপাঠ্য। ফৈজীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে একখানি রসাল উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বুদ্ধ ও জিনমণ্ডলী' নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়ের 'বর্ষা-আবাহন' কবিতাটির ঝঙ্কার মধুর, ছন্দেও বর্ষার ধারাসিক্ত ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের 'বিসর্জ্জন' নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য গল্প দেখিয়া মনে হইল, কর্ম্মকারের কুম্ভকার-বৃত্তি কোনও মতে শোভা পায় না। গল্প-রচনায় তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে

দেখিয়া দুঃখ হয়। টিকির উপর হ্যাটের মত তর্কভূষণ মহাশয়ের ভাবাও গল্পে খাপ খায় নাই। তথাকথিত গল্প বা উপন্যাস লিখিবার লোকের অভাব নাই। তর্কভূষণ মহাশয় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করুন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু 'অমরেন্দ্র' নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাসে 'সমাজ-ব্যাধির' চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন! 'আশা বলবতী রাজন্ শল্যো জেষ্যতি পাণ্ডবান্।' এক জন সমালোচক 'গৌড়-রাজমালা'র সমালোচনায় চন্দ্রে কেবল কলঙ্কই দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম অভিযোগ,—রাজমালায় references নাই। আমরা বলি, কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে—শুনিবামাত্র কাকের পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া কাণে হাত দিয়া দেখিলে সমালোচক সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। 'গৌড়রাজমালা'র কলেবর সাতাত্তর পৃষ্ঠার অধিক নহে। এই আয়তনে এক শত চুয়াল্লিশটি reference আমরা গণিয়া পাইতেছি। ইহার অপেক্ষা অধিক 'রেফারেন্স' না হইলে যদি ঢাকাই লালসা না মেটে, তাহা হইলে আমরা নাচার! 'লেখমালা' নামক আর একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। তাহাই যে 'রাজমালা'র প্রধান অবলম্বন, 'উপক্রমণিকা'য় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন। তবু 'সম্মিলনী'র সমালোচক 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' নাই দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনে ঢাকা প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। 'সম্মিলনী'র মতে, 'রাজমালা'র দ্বিতীয় ক্রটী,—আদিশূরে সংশয়! অক্ষয় বাবু উপক্রমণিকায় কারণনির্দ্দেশ করিয়া তাহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনুসন্ধান-সমিতি প্রমাণ পান নাই, জনশ্রুতি পাইয়াছেন; তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দ-সংযুক্ত লিপি যে কেন আলোচিত হয় নাই, সমালোচকের বোধ হয় তাহা বুঝিবার ইচ্ছা নাই। এক ভট্টাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—'যে এই ন্যায়ের ফাঁকিটি আমাকে বুঝাইয়া দিবে, তাহাকে আমার সর্ব্বস্ব দিব।' ব্রাহ্মণী চটিয়া বলিলেন,—'সর্ব্বস্ব ত এই ভাঙ্গা কুঁড়ে—তার পর কি গাছতলায় পড়িয়া থাকিবে?' ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—'ক্ষেপী! আমি যদি না বুঝি, কার সাধ্য—আমাকে বুঝায়?' এই সমালোচকেও সেই ভট্টাচার্য্যের ভাব দেখিতেছি। তৃতীয় অভিযোগ এই যে, সূচীপত্র নাই, সার-সঙ্কলন নাই। উপক্রমণিকাই যে সারসঙ্কলন, গম্ভীরবেদী সমালোচক তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সমালোচক ক্রটীর আবিষ্কারে এত মশ্‌গুল ছিলেন যে, গ্রন্থখানি যে প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড, এবং গ্রন্থশেষে 'সমাপ্ত' বা সমাপ্তসূচক বাক্য নাই, তাহাও তাঁহার গোচর হয় নাই! রাম জন্মিবার পূর্ব্বেই রামায়ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু একালে সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গ্রন্থের সূচী হয় না! সমালোচক বিলাপ করিয়াছেন,—তাঁহাদের বঙ্গে এরূপ কোনও চেষ্টাই হইতেছে না! কিন্তু রাজমালার উপক্রমণিকায় প্রকাশ, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিই সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শেষ অভিযোগ এই যে, গ্রন্থের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি কিরূপ ব্যয়সাধ্য, গ্রন্থকারের সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। ইহা সুখপাঠ্য উপন্যাস নয়, জ্ঞানার্থীর উপজীব্য। গ্রন্থের মূল্যে গ্রন্থের সঙ্কলন ও মুদ্রণের ব্যয়ও উঠিবে না,—সমালোচক তাহা জানেন কি? সমালোচক ক্রটীর ব্রাহ্মস্পর্শকে 'সম্মিলনী' তুরগীর পৃষ্ঠে সোয়ার করিয়া পাঠকসমাজে পাঠাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কি কি নূতন তথ্য বাঙ্গালীকে উপহার দিলেন, সমালোচনায় তাহার নামগন্ধও দেখিলাম না। একটু বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? সঙ্কীর্ণতা কি আমাদের সকল শুভানুষ্ঠানে বিষ বর্ষণ করিবে?

স্থানাভাবে এবার আমরা 'ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ' ও 'প্রাচী-ভ্রমণ' পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। আগামী মাসে প্রকাশিত হইবে।—সাহিত্য-সম্পাদক।

মুকুল

চিত্রকর,···আলবার্ট মুর।

Seyne Press Calcutta

পল্লী-পলিটিক্স্।

৬

ন বাবুর ঋণের পরিমাণ কিছু দিনের মধ্যেই সুদে আসলে বার হাজার দাঁড়াইল। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বেও তাঁহার কয়েক সহস্র মুদ্রা ঋণ ছিল। সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে জমীদারী বিক্রয় করিতে হয়; অথচ জমীদারী বিক্রয় করিলে তাঁহাকে সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হয়। দুশ্চিন্তায় ন বাবুর শরীর দিন দিন কাহিল হইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বন্ধুবর্গ পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইলেন; উকীল একাদশী চক্রবর্ত্তী ন বাবুর মনে উৎসাহ-সঞ্চারের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ন বাবুর ঋণ যত স্ফীত হইতে লাগিল, মানের চাকরীগুলিতে তিনি ততই অধিকপরিমাণে মনঃসংযোগ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে গৃহিণীর নানা অভিযোগ, সেখানে তাঁহার দু' দণ্ড জুড়াইবার স্থান ছিল না। বৈঠক-খানার পাশার আড্ডায় পাওনাদারদের সঘন তাগিদ; তাগিদে তাগিদে সেখানকার সকল আমোদ পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। অগত্যা তিনি কখনও মিউনিসিপালিটীর, কখনও লোক্যালবোর্ডের আফিসে, কখনও বা তাঁহার অনরারী বিচারালয়-প্রকোষ্ঠে সরকারী কার্য্যস্তূপে নিমগ্ন হইয়া সংসারের কোলাহল ও দেনাপাওনার গণ্ডগোল ভুলিয়া থাকিতেন। তথাপি সময়ে সময়ে কবির সেই গানটা তাঁহার মনে পড়িত,—

> "বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা
> আসে যেন প্রবল বন্যা!
> পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত,
> প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত!"

মন স্থির করিবার জন্য ন বাবু আর একটি মানের চাকরীর উমেদারী করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দনপুরে একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল ছিল। স্কুলের সম্পাদক বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; নানা রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া সম্পাদক যামিনীভূষণ বাবু সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিতে উদ্যত হইলেন। ন বাবু স্কুল-কমিটীর মেম্বর ছিলেন। তিনি দুই এক জনকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, স্কুলের সম্পাদকীয়

ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি জনার্দ্দনপুরের শিক্ষা-বিভাগের পঙ্কোদ্ধার করিবেন। ন বাবুর মোসাহেব একাদশী চক্রবর্ত্তী স্কুলকমিটীর মেম্বরগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করিলেন; ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যামিনীভূষণ গাঙ্গুলী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মিউনিসি-পলিটীর চেয়ারম্যান ও লোক্যালবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ন বাবু জনার্দ্দনপুর স্কুলের সর্ব্ববাদিসম্মত সেক্রেটারী হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপর সাড়ে ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে তাঁহার অপ্রিয় কোনও কোনও শিক্ষকের চাকরী যায় যায় হইয়া উঠিল; তাঁহার আশ্রিত কোনও কোনও শিক্ষক স্কুলের টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রাভিভূত হইলেন; সেক্রেটারীর ভয়ে হেড্‌মাষ্টার নিদ্রাতুর শিক্ষকগণের সুনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারিলেন না।

জনার্দ্দনপুরের স্কুলে অনেকদিন হইতেই একটি লাইব্রেরীর অভাব ছিল। ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী যামিনীভূষণ বাবু মহকুমার জমীদারদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া লাইব্রেরীর জন্য একটি কুঠুরী-নির্ম্মাণের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ন বাবুর তত্ত্বাবধানে কুঠুরীটি নির্ম্মিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রসমূহে একাদশী চক্রবর্ত্তী দুন্দুভিনিনাদে ন বাবুর জয়ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রে একাদশী চক্রবর্ত্তীর সুদীর্ঘ প্রেরিতপত্রগুলি পাঠ করিয়া দেশের লোক জানিতে পারিল, ন বাবুর প্রাণপণ যত্নে ও অর্থব্যয়ে জনার্দ্দনপুর স্কুলের লাইব্রেরীর অভাব এত দিনে পূর্ণ হইল। ন বাবু স্কুলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ না করিলে, এই গুরুতর ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান কখনও সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সাধারণের হিতকর কার্য্যে ন বাবুর উৎসাহ ও পরিশ্রমে গ্রামবাসিগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়াছে; জনার্দ্দনপুরের ইতিহাসে ন বাবুর নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য। ইত্যাদি।— বড় সরীকের জামাতা অনিলকুমার বাবু শ্বাশুড়ীর আদেশে এই গৃহনির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। তিনি অর্থসাহায্য না করিলে লাইব্রেরী-গৃহ নির্ম্মিত হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু তাঁহার দানের কথা কোনও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইল না। কারণ, তাঁহার জয়ঢাক স্কন্ধে বহন করে, এমন লোক জনার্দ্দনপুরে ছিল না। সুতরাং একাদশীর ঢাক তুমুলশব্দে বাজিতে লাগিল; সেই শব্দে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গ্রামের লোক কানে তুলা গুঁজিল!

৭

ইতিমধ্যে ডিভিসনাল কমিশনর 'ইনস্পেক্সন' উপলক্ষে জনার্দ্দনপুরে পদার্পণ করিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটও সঙ্গে আসিলেন। ক্ষুদ্র জনার্দ্দন-পুরের আফিস্ অঞ্চলে বিলক্ষণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। সরকারী ডাক-বাঙ্গলার দরজায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের জটলা আরম্ভ হইল! কমিশনর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সৌজন্যে গ্রামবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন।

কমিশনর যখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় হইতে তিনি অনিলকুমারকে জানিতেন। অনিলবাবু শ্বাশুড়ীর পক্ষ হইতে স্থানীয় দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; সেই উপলক্ষে অনিল বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয়। অনিলবাবুর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। কমিশনর গ্রাম্য ডাক-বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অনিলবাবু টমটমে চড়িয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। ন বাবু তাহার পূর্ব্বেই ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ডাক-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কোনও পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। ন বাবু কার্ড পাঠাইয়া অগত্যা টুলের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন; তৈলাক্ত সামলাটা তাঁহার জানুর উপর বিশ্রাম করিতেছিল; এবং তাঁহার টুলের অদূরে একখান 'ক্যাম্প চেয়ারে' সাহেবের দুগ্ধফেনশুভ্র 'টেরিয়ার'টি সুখসুপ্তিতে মগ্ন ছিল।

অনিল বাবু ডাক-বাঙ্গলায় পদার্পণ করিলে আর্দ্দালী সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, এবং তাঁহার কার্ড সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সাহেব তৎক্ষণাৎ অনিল বাবুকে ভিতরে ডাকিলেন, সাদরে করকম্পন করিয়া স্মিত-মুখে তাঁহার পরিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহার গাড়ীতে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। ন বাবু টুলের উপর হইতে উঠিয়া আভূমিনতমস্তকে সাহেবকে সেলাম করিলেন; কমিশনর বাহাদুর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ললাটস্পর্শ করিয়া অনিল বাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলেন। ন বাবু বজ্রাহতের ন্যায় পুনর্ব্বার টুলের উপর বসিয়া পড়িলেন, জগৎসংসার তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে মসীমলিন আকার ধারণ করিল, এবং তাঁহার অনরারী হাকিমী ও মিউনিসি-পালিটীর চেয়ারম্যানী নিতান্ত ব্যর্থ ও কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর ন বাবু বাড়ী ফিরিয়া চোগা চাপকান ও সামলা খুলিয়া ফেলিয়া

শয্যা গ্রহণ করিলেন ; এমন নৈরাশ্য জীবনে তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন "হে ভগবান! এ অপমান, এত উপেক্ষা কি করিয়া সহ্য করি? আমি জনার্দ্দনপুরের চাটুর্য্যে-বংশের কুলপ্রদীপ, বংশের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি এখন আমার উপরেই নির্ভর করিতেছে ; আজ কি না কমিশনর সাহেব আমাকে উপেক্ষা করিয়া চাটুয্যে-বংশের জামাইকে সঙ্গে লইয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন? 'বেঙ্গলী'তে এ সংবাদ বাহির হইলে আমি কি করিয়া সভাসমিতিতে মুখ দেখাইব? এতদিনের রাজসেবার কি এই ফল?"

সন্ধ্যার পর বিদূষক একাদশী চক্রবর্ত্তী ন বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, "নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী!" কালি-পড়া ফরাসের উপর একটি হরিকেন-লণ্ঠন মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে ; পাশার আড্ডায় জনমানবের সমাগম নাই ; ন বাবু ফরাসের এক পাশে প্রসারিত একখানি মেদিনীপুরের মছলন্দের উপর শয়ন করিয়া ধীরে ধীরে গড়গড়া টানিতেছেন, আর কাশিতেছেন ; এবং একটা প্রকাণ্ড কালো বিড়াল জানালার পাশে বসিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে একটি উড্ডীয়মান চর্ম্মচটিকার গতি নিরীক্ষণ করিতেছে, এক একবার তাহার চক্ষুঃতারকা যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে।

চক্রবর্ত্তীর নিকট ন বাবু তাঁহার মনের বেদনা জানাইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরামর্শ শেষ হইলে ন বাবু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন ; প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছে। তিনি ডাকিলেন, "রামা, তামাক দিয়ে যা!"

৮

আজ জনার্দ্দনপুরে বড় সমারোহ। কমিশনর সাহেব আজ স্কুল লাইব্রেরীর দ্বার উন্মোচন করিবেন ; লাইব্রেরীর সম্মুখে স্থানীয় ভদ্রসাধারণের সমাগম হইল। ন বাবু রূপার কুলুপের সোনার চাবি কমিশনর সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে, একাদশী চক্রবর্ত্তীর লিখিত রিপোর্ট ন বাবু সভাস্থলে পাঠ করিলেন। লাইব্রেরীর গৃহনির্ম্মাণের জন্য ন বাবু কতখানি আত্মত্যাগ করিয়াছেন, কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া কত কষ্টে মজুর খাটাইয়াছেন, তাহার সকরুণ কাহিনী পাঠ করিবার সময় ন বাবুর কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বাসবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। কমিশনর সাহেব প্রীতিলাভ করিলেন।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট বিজয়মাধব বাবু উপসংহারে বলিলেন, "লাইব্রেরীর গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে স্কুলের সম্পাদক বাবু যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি যেরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই; তিনি আমাদের মহকুমার অলঙ্কার, এ দেশের প্রত্যেক সাধু অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে কমিশনর সাহেব ন বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। একাদশী চক্রবর্ত্তী উৎকৃষ্ট রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। অনিলকুমার লাইব্রেরীর অধিকাংশ ব্যয় বহন করিয়াছিলেন, এবং লাইব্রেরীর পুস্তক-ক্রয় ফণ্ডে আড়াই শত টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন। কিন্তু রিপোর্টে তাঁহার এই দান সম্বন্ধে একটি কথাও ছিল না। তিনি প্রশংসার অধিকারী হইলেন না। অনেকেরই 'এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার' অভাস আছে, কিন্তু জনার্দ্দনপুরের উকীল একাদশী চক্রবর্ত্তী 'এক ঢিলে তিন পাখী বধ' করিতে পারিতেন।

সভাভঙ্গে ন বাবু আনন্দে গদগদ হইয়া একাদশীকে আলিঙ্গন করিলেন। একাদশী বলিলেন, "ধরতে জান্‌লে কাঠের বিড়ালেও ইঁদুর ধরতে পারে, ঘরজামাইটাকে খুব 'মুখ ছোপ' দেওয়া গিয়াছে। এবার 'বার্থডে গেজেটে' সোনার কৈসর-ই হিন্দ পদকের তালিকায় নিশ্চয়ই তোমার নাম বাহির হইবে।"

কমিশনর আসিয়া অনিলকুমারকে যথেষ্ট আদর করিয়াছিলেন, ইহাতে জনার্দ্দনপুরের নেতার দল মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা ন বাবুকে লইয়া একটি দল বাঁধিলেন, এবং অনিলকুমারকে অপদস্থ করিবার জন্য নানা আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনিলকুমারের গোয়েন্দার অভাব ছিল না। তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হইয়াছে, ন বাবুই তাহার মূলাধার। অনিলকুমার ন বাবুর উপর খড়্গহস্ত হইলেন। নানাপ্রকার খুঁটীনাটী লইয়া তাঁহার সহিত ন বাবুর বিরোধ চলিতে লাগিল। এজমালী জমীদারীর অনেক প্রজা ন বাবুর পক্ষ ত্যাগ করিল।

এ দিকে ন বাবু কৈসর-ই-হিন্দ পদক-লাভের আশায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুরীর স্বপ্নে বিভোর হইয়া দুই হস্তে সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মত সরকারী কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ঋণ-পরিশোধের উপায় হইল না। মাধবপুরের দিগম্বর চাকীর নিকট ন বাবুর জমীদারী বন্ধক ছিল। দিগম্বরের পিতা নীলাম্বর চাকী মুড়ি ও মুড়কীর

দোকান করিয়া পয়সা জমাইয়া মহাজনী করিত; ক্রমে সে জমীদারী ক্রয় করিয়াছিল। কোনও অধমর্ণ তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না। ন বাবুও ঋণ শোধ করিতে পারিলেন না। দিগম্বর সব্যসাচীর ন্যায় এক হস্তে মহাজনী ও অন্য হস্তে জমীদারী করিত; সে ন বাবুকে নালিশের ভয় দেখাইল। জমিদারীটুকু যায় যায় হইল।

ন বাবু ঋণ-পরিশোধের জন্য অধিক টাকায় অন্য এক জন মহাজনের নিকট জমীদারী বন্ধক রাখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। জেলার সবজজ-কোর্টে দিগম্বর নালিশ রুজু করিল।

মামলায় ডিক্রী পাইয়া দিগম্বর চাকী জমীদারী নিলাম করিল। অনিল-কুমারের মোক্তার তাঁহার শ্বাশুড়ীর পক্ষ হইতে জমীদারী ডাকিয়া লইলেন। জমীদারী হারাইয়া ন বাবু ঢোঁড়া সাপের মত গর্জ্জন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি উত্থিত হইল। দেখিয়া শুনিয়া ন বাবুর পারিষদ একাদশী চক্রবর্ত্তী সরিয়া দাঁড়াইলেন।

৯

ন বাবুর স্ত্রী সৌধকিরীটিনী দেবী এতদিনে বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই ছেলে মেয়েগুলিকে লইয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু এখন উপায় কি?—অবশেষে তিনি অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনিলকুমারের শ্বাশুড়ী কাত্যায়নী দেবী সৌধকিরীটিনীর জ্যেট্‌শ্বাশুড়ী হইতেন; কিন্তু ভিন্ন সরিক বলিয়া সৌধকিরীটিনী কখনও কাত্যায়নী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। উভয় সরিকে কথাবার্ত্তাও ছিল না। যে কাত্যায়নী একদিন কিশোরী সৌধকিরীটিনীকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছিলেন, সে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করায় কাত্যায়নীর মনে কষ্টের সীমা ছিল না। সরিকী বিবাদে উভয় সংসারের মনোমালিন্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল।

কিন্তু আর অভিমান করিয়া চুপ করিয়া থাকা চলে না। ন-বৌ যেদিন শুনিলেন, বড়তরফ তাঁহাদের সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করিয়াছে, সেইদিন হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, আর ভদ্রস্থতা নাই, স্বামী অনরারী হাকিমীই করুন, আর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানগিরিই করুন, সখের চাকরীতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ন-বৌ স্বামীর নিকট অনেক রোদন ও আক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন-

তুল্য বৃথা হইল। ন বাবু রোরুদ্যমানা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদো কেন?"

ন-বৌ বলিলেন, "কি করে' সংসার চল্‌বে?"

ন বাবু বলিলেন, "না চলে, অচল হোক, গাছতলায় আশ্রয় নেব।"

ন-বৌ বলিলেন, "গাছতলায় আশ্রয় নিতে যাবে কেন? সম্পত্তি ত অন্য লোকে কেনেনি, জ্যেঠীমার সঙ্গে একবার দেখা কর না কেন? তিনি কি একেবারে গলায় পা দেবেন?"

ন বাবু বলিলেন, "ন-বৌ, তুমি নিজে স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোককে এতদিনে চিন্‌লে না?—নাতি নাত্‌নী মেয়ে জামাই থাক্‌তে বুড়ী আমার সম্পত্তি এত টাকায় খরিদ করে' আমাকে ফেরত দেবে?—আর তার ইচ্ছা থাক্‌লেও অনিল মুখুয্যে যে আমার সম্পত্তি আমাকে দিতে দেবে, এমন ত বোধ হয় না; সে আমার প্রকাণ্ড 'রাইভ্যাল', আমার সম্পত্তি গ্রাস করেছে, এইবার আমার মানের চাকরীগুলিও হস্তগত করবে! আমি বরং ভিক্ষা করে খাব, সে বুড়ীর কাছে যাব না।"

কিন্তু অবশেষে যাইতে হইল। ন বাবু সাবালক হইবার পর কোনওদিন কাত্যায়নী দেবীর দ্বারস্থ হন নাই; নানা ভাবে তাঁহার শত্রুতা-সাধনেরও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একদিন শ্রাবণের ঘনঘটাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে ন-বাবু ধীরে ধীরে অবনতমস্তকে কাত্যায়নী দেবীর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দাসদাসীরা এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখে নাই! তাহারা বিস্ফারিতনেত্রে ন বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল, যেন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বড় গিন্নী কাত্যায়নী দেবী তখন তেতালার বারান্দায় একখানি আসনে বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন; তাঁহার নাতি অনিলকুমারের শিশু পুত্র একটা কাঠের ঘোড়ার গলায় সুতা বাঁধিয়া বারান্দায় ছুটাছুটি করিতেছিল; এবং সমস্ত দিনের বৃষ্টিতে ভিজিয়া একটা ভিজে কাক তেতালার আলিসায় বসিয়া কাতরকণ্ঠে কা-কা করিয়া ডাকিতেছিল। ন বাবুর মনে হইল, তাঁহার অবস্থা ঐ কাকটার মতই শোচনীয়।

বড়গিন্নী ন বাবুকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, মালাজপ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "যোগেশ? আজ বিশ বৎসর পরে তুমি এ বাড়ীতে পা দিয়াছ, ব্যাপার কি বল দেখি; ঝি, একখান আসন নিয়ে আয়। বসো, বাবা, বোস।"

নবাবু জেঠীমার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, অবনতমস্তকে বলিলেন, "জেঠীমা, আমি না বুঝিয়া চিরদিন আপনার অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, আপনি সে সকলই জানেন, কিন্তু আপনি কখনও আমার কোনও ক্ষতি করেন নাই, আপনি মা, আমি আপনার কুপুত্র, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বড়গিন্নী বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, আমার তিন কাল গিয়াছে; এখন কোন্‌দিন গোবিন্দ শ্রীচরণে স্থান দিবেন, এই আশায় বৈতরণীর তীরে বসিয়া আছি। তোমাদের সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না; একমুঠা আতপ চাউল আর আধখানা কাঁচ-কলা হইলেই আমার দিন চলিয়া যায়। আমার তুমি কি অনিষ্ট করিবে বাছা? আর যদি অনিষ্ট করই, তবে যেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মরিতে পারি। তোমরা যখন ছেলে-মানুষ ছিলে—তখন তোমাদের ক' ভাইকে কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছি। বড় হয়ে তোমরা সাহেব সুবোদের চিনেছ, বুড়ো জেঠীমাকে একবার বিজয়ার প্রণামটাও করতে আস না! তা বাছা এক শ' বছরের হয়ে বেঁচে থাক। আমার অনিলকে আর তোমাদের ক' ভাইকে ভিন্ন চক্ষে দেখিনে; অনিল মধ্যে মধ্যে আমাকে বলে বটে, যোগেশ বাবু আমাকে নানা রকমে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে, তুমি সখের হাকিম হয়েছ—বেশ, কিন্তু আমার ভোলা চাকরটাকে জেলে দিলে কেন বাবা! ওপরে গিয়ে ত তোমার রায় টিকলো না, ভোলা খালাস পেলে, মধ্যে থেকে আমার কতকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। অনিল সেই থেকে তোমার উপর ভারি চটে গিয়েছে। বলে, যেমন ক'রে পারি, যোগেশ চাটুয্যেকে জব্দ করবো। আমি তাই শুনে তাকে কত বকেছি। সংসারে কে কাকে জব্দ করে বাবা! দীনবন্ধু মধুসূদন, তিনিই সকলের মূল, তিনি যাকে রাখেন, তাকে কি কেউ মারতে পারে? তা, কি মনে ক'রে আমার কাছে এসেছ বাবা?"

ন বাবু বলিলেন, "বড়খুকীর বিয়ে দিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি; আমার দেনার দায়ে জমীদারী নিলাম হয়ে গিয়েছে; আপনার নামে আপনার জামাই তা খরিদ করেছেন। আজ আমি পথের ভিখিরী, আপনি আমার কাচ্চাবাচ্চাগুলোর ভার নেন। যে দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে আমি চলে যাই। ন-বৌকে আপনি ভালবাস্‌তেন, তাকে দু বেলা দু মুঠো খেতে দেবেন।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "আমি তোমার জমীদারী কিনেছি? রাধেকৃষ্ণ! এ কথা ত আমি একদিনও শুনিনি। অনিল কি করে না করে, তা আমাকে ত বলে না। এ কালের ছেলেপুলেগুলোর মেজাজ বোঝা ভার! ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরী মারতে ছাড়ে না। ক' দিনের জন্যে সংসার? টাকাই কি এত বড় বস্তু? আচ্ছা, আমি অনিলকে ডাকাচ্ছি, ব্যাপার কি, শুনি।"

ন বাবু বলিলেন, "এখন আমার সম্মুখে আর তাঁকে ডাকাবেন না, ডাকাতে হয়, পরে ডাকাবেন। আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলছিনে; আপনার টাকায় আপনার নামে আমার জমীদারীটুকু কেনা হয়েছে। এখন আমার ছেলেমেয়েগুলোর উপায় কি, বলুন। তারা কি না খেয়ে মরবে?"

বড় গিন্নী হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, "তাও কি কখনও হয়? হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের যে আঙ্গুল কাটুক, তাতে সমানই ব্যথা। তোমার ছেলে মেয়ে অন্নের 'ভিকিরী' হবে, আর তোমার জমীদারী আমার অসি (অনিলের পুত্র) ভোগ করবে, এত অধর্ম্ম কি ভগবান সইবেন? আমি অনিলকে ডেকে বলছি, তোমার জমীদারী যেন কালই তোমাকে ফেরত দেওয়া হয়।"

ন বাবু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে রকম মন, আপনি ঠিক সেই রকম কথাই বললেন; কিন্তু আমি জমীদারী যে ফেরত নেব, কি দিয়ে ফেরত নেব? যদি আমার হাতে টাকা থাকবে, তবে জমীদারীই বা নিলাম হবে কেন?"

বড় গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই বাছা, তোমার কাছে আমি টাকা চাইনে। তুমি যে সম্পত্তি এতদিন ভোগ করে এসেছ, তা তোমার জেঠা মশায়ই তোমার বাপকে দিয়েছিলেন; তোমার সম্পত্তি যদি আমি কিনে থাকি, তবে আমি তোমাকে তা দান করলেই ত গোলমাল চুকবে? দশ পনের হাজার টাকা তহবিলে থাকলে, তা আমার অসি খেতো, না হয় তোমার ছেলে মেয়েরাই খাবে। দীনবন্ধু মধুসূধন! তুমিই সত্য। তা বাছা তোমার আর কোনও কথা আছে?"

ন বাবু হর্ষগদ্গদস্বরে বলিলেন, "না জেঠীমা, আর কোনও কথা নেই, তবে আপনার কথা থাকবে কি না সন্দেহ। আপনার জামাই আপনার হুকুমে কাজ করবেন বলে' বিশ্বাস করতে পাচ্ছি নে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সে জন্য ভেবো না বাছা, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার হুকুম তামিল হবে। কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে?"

ন বাবু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "কি বলুন! আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করি, আমার এত শক্তি নেই।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "তোমার এই সখের চাকরীগুলো ছাড়তে পারবে? শুনেছি, তুমি মুনিসিয়ালের কর্ত্তা হয়ে আমার ট্যাক্স অনেক বাড়িয়েছ, সখের হাকিম হয়ে আমার লোক জনকে নানা রকমে জব্দ করবার চেষ্টা করেছ, আর কি করেছ না করেছ, তা তুমিই জান; বানরের হাতে খন্তা দিলে সে আগে নিজের পা কাটে, তুমি খন্তাখানা ছাড়তে পারবে? এ সকল সখের চাকরীতে ইস্তফা দিতে পারবে? দরকার কি বাপু, ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়িয়ে? তার শেষ ফল তো এই! তার চেয়ে ঘর গৃহস্থালী কর, জমীদারীর উন্নতির চেষ্টা কর, যাতে দু' পয়সা আয় বাড়ে, তার ব্যবস্থা কর। লোকের অভিসম্পাত কুড়িয়ে লাভটা কি?"

ন বাবু বলিলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, এ বানরের হাতে খন্তাই বটে; আমি এই মাসেই মানের চাকরীগুলোতে ইস্তফা দেব। নিজের কাজ কর্ম্ম দেখবো। আর পরের অভিসম্পাতের মধ্যে যাব না।"

১০

সেইদিন রাত্রেই বড় গিন্নী জামাতাকে ডাকাইয়া ন বাবুর জমীদারী-ক্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, ন বাবুর সকল কথাই সত্য, অনিলকুমার সরিকী জমীদারী পনের হাজার টাকায় নিলামে ক্রয় করিয়াছেন, কর্ত্রীর নামেই তাহা ক্রীত হইয়াছে।

কর্ত্রী বলিলেন, "কাজটা ভাল কর নাই। আমি যত দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন বিষয়সংক্রান্ত কোনও কাজ আমার মত না লইয়া তোমার করা উচিত নয়। লোকে বলিবে, বড় গিন্নী সরিকের বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে, তার ছেলে মেয়েদের পথে বসিয়েছে! এই দুর্নাম কিন্‌বার জন্যই কি তোমার হাতে আমার জমীদারীর ভার দিয়াছি? তুমি আমার জামাই, কিন্তু যোগেশও আমার পর নয়।"

অনিলকুমার কর্ত্রীর এই মৃদু তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "ন বাবু আপনার নিতান্ত আপনার, সেই জন্য তিনি পদে পদে আমাদের অপদস্থ

করিবার চেষ্টা করিতেছেন ; সেই জন্যই যাহাতে আপনার ক্ষতি হয়, দিনরাত্রি তাহার চেষ্টা করেন। আপনার লোকের ইহাই কাজ বটে !"

কর্ত্রী বলিলেন, "লেখাপড়া শিখিয়া তোমার ধর্ম্মজ্ঞান খুব টনটনে হইয়াছে। যোগেশ যদি আমাদের কোনও ক্ষতি করিয়া থাকে, তবে তার সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে? ইতরের তাহাই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু মহতের ধর্ম্ম অন্য রকম। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছ বাপু, বাঘ ভালুকের প্রবৃত্তি ত্যাগ কর, মহৎ হইতে শেখ।—আমার কথা শোন, কালই একখান দানপত্র লেখ, আমি যোগেশের জমীদারী তাহাকে দান করিয়া যাইব।"

অনিলকুমার বলিলেন, "তহবিল হইতে নগদ পনের হাজার টাকা দিয়া জমীদারী কিনিয়াছি।"

কর্ত্রী বলিলেন, "সে কথা আমার জানা আছে ; সম্পত্তি খরিদ করিতে হইলে টাকা লাগে—এ কথা আমি বুঝি না, আমাকে এত নির্ব্বোধ মনে করিও না। টাকা তোমারও নয়, আমারও নয়, কর্ত্তারা টাকা উপার্জ্জন করিয়া জমীদারী কিনিয়াছিলেন। তোমার শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিলে তিনি যোগেশকে পথে বসাইতে পারিতেন না। আমিও তাহা করিব না।—দানপত্র কালই রেজিষ্ট্রী হউক। বুঝিয়াছ?"

অনিলকুমারের সাধ্য ছিল না—তিনি শ্বাশুড়ীর অবাধ্য হন। সম্পত্তি হস্তচ্যুত হয় দেখিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে মুরুব্বী ধরিলেন। মায়ে ও মেয়েতে রাত্রে অনেক কথা হইল, কিন্তু বড় গিন্নীর সঙ্কল্প অটল! তিনি বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব যায়, তাহাও স্বীকার, যে ছ্যাপ পানের ছিব্ড়ে) ফেলিয়াছি, তাহা আর গিলিব না। যোগেশকে কথা দিয়েছি, তাহার জমীদারী তাহাকে ফেরত দিব।"

বড় গিন্নী পরদিন দানপত্র স্বাক্ষর করিলেন ; যথারীতি তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া তিনি তাহা ন বাবুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ; বলিলেন, "যাহাতে সম্পত্তির উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা কর ; আর ঘরের খাইয়া বনের মহিষ চরাইও না।"

ন বাবু এক মাসের মধ্যেই সখের চাকরীগুলিতে একে একে ইস্তফা দিলেন।

একাদশী চক্রবর্ত্তী হতাশভাবে বলিলেন, "তোমার কোর্টে দু টাকা

উপার্জ্জন করিয়া খাইতেছিলাম, ব্রাহ্মণের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইল, এখন উপায় ?”

ন বাবু বলিলেন, “তুমি দুঃখিত হইও না ; আমি চেষ্টা করিয়া তোমাকে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও লোক্যালবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান করিয়া দিব। আমার কোর্টে তোমার যে আয় ছিল, তাহার অপেক্ষা তোমার আয় অধিক হইবে দুই এক বৎসরের মধ্যে একটা রায়-বাহাদুরীও মিলিতে পারে।”

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রম।

৪

এক্ষণে বংশানুক্রমের পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা স্থির করিবার জন্য অনেক ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হয়। গ্যাল্টন সর্ব্বপ্রথমে জীব-তত্ত্বে মাপের ও গণনার নিয়ম প্রচলিত করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতেও অব্যভিচারী সত্যের আবিষ্কার কঠিন। কেবল সাধারণ সত্যই আবিষ্কৃত হয়। এই উপায় ভিন্ন অন্য কোনও সন্তোষজনক উপায়ও দেখা যায় না।

বংশানুক্রমের পরিমাণ।

জাতক উর্দ্ধতন প্রথম পুরুষ অর্থাৎ পিতা মাতা, দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ পিতামহ পিতামহী, তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ প্রপিতামহ প্রপিতামহী ইত্যাদির লক্ষণ কত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, তাহা গ্যাল্টন বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতক উর্দ্ধতন প্রথম পুরুষ হইতে অর্দ্ধেক ; দ্বিতীয় পুরুষ হইতে এক-চতুর্থাংশ ; তৃতীয় পুরুষ হইতে এক-অষ্টমাংশ প্রাপ্ত হয়। পিতা ও মাতার প্রত্যেক হইতে জাতক এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয় ; কারণ, তাঁহারা উভয়ে অর্দ্ধেক দিয়া থাকেন। পিতামহ ও পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহী, এই চারি জনে একচতুর্থাংশ দেওয়ায় প্রত্যেকে জাতককে $\frac{১}{১৬}$ অংশ দিয়া থাকেন। তৃতীয় পুরুষে মোট ৮ জন ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রপিতামহের পিতামাতা, প্রপিতামহীর পিতামাতা, মাতামহের পিতামাতা, মাতামহীর পিতামাতা। জাতক তৃতীয় পুরুষ হইতে $\frac{১}{৮}$ অংশ

প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা প্রত্যেকে $\frac{১}{৬৪}$ অংশ দেন। এইরূপে ক্রমে উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে ন্যূনতর অংশ জাতক প্রাপ্ত হয়। এই কথাই অন্য ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করা যায়;—জাতকের কোনও একটি লক্ষণ দেখিয়া সাধারণতঃ এইরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত যে, সে উর্দ্ধতন

১ম	পুরুষ	হইতে	...	...	$\frac{১}{২}$
২য়	”	”	...	...	$\frac{১}{৪}$
৩য়	”	”	...	...	$\frac{১}{৮}$

প্রাপ্ত হইয়াছে।

১ম	পুরুষের	প্রত্যেক	ব্যক্তি	হইতে	$\frac{১}{৪}$
২য়	”	”	”	”	$\frac{১}{১৬}$
৩য়	”	”	”	”	$\frac{১}{৬৪}$

প্রাপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং জাতকের ঐ লক্ষণকে ল বলিলেন।

$$ল = \frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬} \text{ ইত্যাদি।}$$

গণিতজ্ঞ জানেন, এইরূপ অন্তহীন সংখ্যার শ্রেণীগুলির স্বধর্ম্ম এই যে, উহাদিগের কোনও একটি তৎপরবর্ত্তী সমস্ত সংখ্যার যোগ-ফলের সমান। সুতরাং

$$\frac{১}{২} = \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬} \text{ ইত্যাদি}$$

$$\frac{১}{৪} = \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{৩২} \text{ ইত্যাদি।}$$

সম্প্রতি অধ্যাপক পিয়ার্সন বংশানুক্রমের পরিমাণ-গণনায় উক্ত ফল হইতে কিছু পৃথক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, জাতক পিতা হইতে লক্ষণের $\frac{১}{২}$; পিতামহ হইতে তাহার $\frac{২}{৩}$ অর্থাৎ $\frac{১}{২} \times \frac{২}{৩} = \frac{১}{৩}$; প্রপিতামহ হইতে তাহার $\frac{২}{৩}$ অংশ অর্থাৎ $\frac{১}{৩} \times \frac{২}{৩} = \frac{২}{৯} =$ প্রায় $\frac{১}{৫}$ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে উর্দ্ধ-উর্দ্ধতন পুরুষেও $\frac{২}{৩}$ অংশ পরিমাণ কমিয়া যায়। এই কথা অন্য ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করা যায়; যথাঃ—উর্দ্ধতন প্রথম পুরুষের ১ জন হইতে জাতক $\frac{১}{২}$ পায়; দ্বিতীয় পুরুষের ১ জন হইতে $\frac{১}{৬}$ পায়; তৃতীয় পুরুষের ১ জন হইতে $\frac{১}{৫}$ পায়। * যদি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কাহারও শুক্র অথবা শোণিতের (পুং-কোষ অথবা স্ত্রী-কোষের) শক্তি অপরের অপেক্ষা প্রবল থাকে, তাহা হইলে এই বিধানের ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু বহুপুরুষ

---

* দেখা যাইতেছে, গ্যাল্টন ও পিয়ার্সন বিভিন্ন বিষয়ের ফল গণনা করিয়াছেন।

ধরিয়া মোটের উপর গড় করিলে, ঐ কারবণশতঃ গণিত ফল ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। এ নিমিত্ত এই সাধারণ নিয়ম মোটের উপর সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

এতদনুসারে পূর্ব্বপুরুষ যতই দূরবর্ত্তী হন, জাতক তাহা হইতে ততই কম অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই নিয়মের ফলে পূর্ব্বপুরুষের দৈহিক ও মানসিক দোষ অর্থাৎ মন্দ লক্ষণ সকল, জাতকে পূর্ণমাত্রায় সংক্রমিত হয়না; তেমনই গুণও পূর্ণমাত্রায় সংক্রমিত হয় না। ইহা সমাজের উন্নতিকর বিধান বলিয়া গণ্য না হইলেও, সমাজ-রক্ষক বিধান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। গুণী ব্যক্তির আবির্ভাববশতঃ সময় সময় উন্নতি হয়; নিরন্তর নহে।

এক্ষণে বংশানুক্রমের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পুংকোষ ও স্ত্রী-কোষ মিশ্রিত

প্রক্রিয়া।

হইয়া অপত্যের গঠন করে। তাহাদিগের মধ্যস্থ জীব-বস্তু দানাদার, অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু। ঐ সকল বিন্দুর মধ্যে একটি বড়। কিন্তু ইহা ব্যতীতও ঐ কোষের মধ্যে বায়ুপূর্ণ বিন্দু থাকে। পার্শ্বে
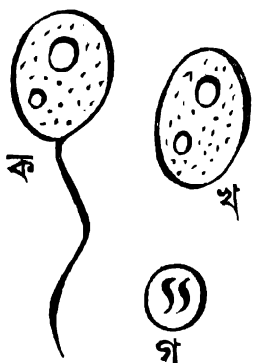
উহাদিগের চিত্র প্রদত্ত হইল। ক পুং কোষ, খ স্ত্রী-কোষ; উহাদিগের মধ্যে বড় বিন্দুটি কেন্দ্র-বিন্দু; * ছোট বিন্দুটি বায়ুপূর্ণ বিন্দু; † কেন্দ্র বিন্দুটিকে পৃথক করিয়া গ চিত্রে দেখান হইল। উহার মধ্যে যে কাল দুইটি বক্র রেখা দেখা যাইতেছে, সেগুলি আঁশের মত সূত্র। কতিপয় দানা অথবা বিন্দু শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত হইয়া আঁশ গঠিত হয়। ঐ বিন্দুর অনেকগুলি অণুবীক্ষণে দেখা যায়। বিভিন্ন জীবের স্ত্রী-পুং-কোষস্থ কেন্দ্র-বিন্দুর আঁশ সংখ্যায় বিভিন্ন; এবং আঁশের বিন্দুগুলিও সম্ভবতঃ বিভিন্নরূপে সজ্জিত। মানবের আঁশ-সংখ্যা ১৬, কেহ বা ১৪টির অধিক গণিয়া পান নাই। ঐগুলিই অথবা উহার মধ্যস্থ বিন্দুগুলিই বংশানুক্রমের প্রবর্ত্তক। স্ত্রী-পুং-কোষের মিশ্রণকালে বিন্দুগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সজ্জিত হইয়া পুরুষানুক্রমিক সাদৃশ্য

* Nucleus. † Vacuole.

ও বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এক একটি বিন্দু যখন স্বীয় শক্তি অব্যাহত রাখিয়া পর পর বংশে বিশেষ বিশেষ স্থলে লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন অমিশ্র অথবা উভ-চিহ্নিত বংশানুক্রম দেখা যায়। একটি গরুর কপালে একটি সাদা দাগ ছিল, এবং ল্যাজের অগ্রভাগ ও ক্ষুরের নিকটবর্ত্তী ভাগ সাদা ছিল। উহার বাছুরেরও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। আমার একটি বন্ধুর কপালের দক্ষিণ ভাগে চুলের মধ্যে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত পাক আছে; তাঁহার প্রত্যেক পুত্রেরও ঐরূপ হইয়াছে। এ সকল স্থলে দেখা যাইতেছে যে, বংশরক্ষক কোষের কেন্দ্র-বিন্দুর মধ্যে যে সকল আঁশ আছে, তাহার বিন্দুগুলির যেটির অথবা যে কয়েকটির অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা উল্লিখিত সাদা দাগ অথবা দক্ষিণাবর্ত্ত পাক উৎপন্ন হইয়াছিল, সেটি অথবা সেই কয়েকটি অন্য বিন্দুর সহিত মিশ্রিত না হইয়া পৃথকরূপে স্বীয় শক্তির প্রকাশ করিয়াছে, এবং ঐ কোষের মধ্যে উহার স্থানও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিলে, এবং পশ্চাৎ মেণ্ডেলের বিধানের আলোচনা করিলে, বুঝা যাইবে যে, স্ত্রী-কোষের ও পুং-কোষের মধ্যে এমন সকল বিন্দু আছে, যাহারা ঐ কোষদ্বয়ের মিশ্রণ-কালে অন্য বিন্দুর সহিত মিশ্রিত হয় না; স্বস্থান হইতে চ্যুত হয় না; এবং অপত্য-দেহে পৃথকরূপে আত্মশক্তির বিকাশ করে। অমিশ্র ও উভ-চিহ্নিত বংশানুক্রম উহাদিগেরই কর্ম্ম।

প্রত্যেক কেন্দ্র-বিন্দুর আঁশের সংখ্যা প্রথমে যত থাকে, বংশরক্ষক কোষে পরিণত হইয়া অপত্যোৎপাদনের যোগ্য হইবার সময়, তাহার অর্দ্ধেক হইয়া যায়। অবশেষে যখন স্ত্রী-কোষ ও পুং-কোষ মিশ্রিত হয়, তখন আবার সংখ্যা পূর্ণ হয়। মানবীর বংশরক্ষক কোষের মধ্যে যে ১৬টি আঁশ থাকে, তাহারা ঐ কোষ অপত্যজননযোগ্য হইলে, সংখ্যায় ৮টি হইয়া যায়। পরে স্ত্রী-কোষের ৮টি ও পুং-কোষের ৮টি মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ১৬ সংখ্যা পূর্ণ হয়। আঁশের সংখ্যা অর্দ্ধ হইবার সময় কোষস্থ বিন্দুগুলির ও আঁশের বিন্দুগুলির সংস্থানও পরিবর্ত্তিত হয়। এই সকল প্রক্রিয়াকে কোষের "পরিণতি" * বলিব। যখন স্ত্রীকোষ ও পুংকোষের সংমিশ্রণ হয়, তখন আঁশের ঐ বিন্দুগুলির সংস্থান আরও গুরুতররূপে পরিবর্ত্তিত হয়। অবশেষে স্ত্রী-কোষ ও পুং-কোষের মিশ্রণে যে যুক্ত-কোষ উৎপন্ন হয়, তাহা বহু ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে যখন ভ্রূণ-দেহের স্তর তিনটির রচনা করে, তখন ঐ বিন্দুগুলির

* Maturation.

সংস্থানের ও বৃদ্ধির, এবং কোনও কোনও স্থলে সংমিশ্রণের, অত্যন্ত গুরুতর প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। ভ্রূণের বয়স যত বর্দ্ধিত হয়, ততই পরিবর্ত্তন বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইহাতেই ব্যক্তিগত সাদৃশ্য ও প্রভেদ, এবং জাতিগত সাদৃশ্য ও প্রভেদ উৎপন্ন হয়।

সংক্ষেপে এই জটিল বিষয়ের প্রকাশ একরূপ অসম্ভব। তবে পাঠকগণ এইমাত্র স্মরণ রাখিলেই প্রথমে যথেষ্ট হইবে যে, বংশরক্ষক কোষের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু আছে; উহা অন্যান্য বিন্দু অপেক্ষা বড়। উহার মধ্যে আঁশবৎ কতিপয় সূত্র আছে; তাহার সংখ্যা বিভিন্নজাতীয় জীবের বিভিন্ন প্রকার; বিভিন্ন গণ-*-ভুক্ত জীবেরও বিভিন্ন। কোষ পরিণতবয়স্ক হইলে আঁশের সংখ্যা অর্দ্ধ হইয়া যায়। যখন স্ত্রী-পুং-কোষের মিশ্রণ হয়, তখন সংখ্যা পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে সমস্ত বিন্দুগুলির সংস্থানে ও বৃদ্ধিতে, এবং স্থানবিশেষে মিশ্রণেও গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

যেমন তাস খেলিবার সময় তাস বণ্টন করিয়া দিবার পূর্ব্বে লোকে অত্যন্ত 'তাসিয়া' তাসগুলির পূর্ব্ব সংস্থান গুরুতররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন, যুক্তকোষের মধ্যেও তদ্রূপই হইয়া থাকে। যুক্তকোষমধ্যস্থ বিন্দুগুলিরও ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু তাহা হইলেও, প্রত্যেক গণ-ভুক্ত ব্যক্তির যে নির্দ্দিষ্ট গঠন আছে, তাহা ঠিক থাকে। মানবের স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ মিশ্রিত হইল। যুক্তকোষের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন হয় না, যাহাতে ভ্রূণের গঠন অন্য প্রাণীর ন্যায় হইতে পারে; উহা মানবের ন্যায়ই হইবে। প্রত্যেক গণের গঠন নির্দ্দিষ্ট আছে। বিন্দুগুলি 'তাসিয়া' লইবার সময়ও তাহার ব্যভিচার হয় না। কারণ, যে গণভুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ মিশ্রিত হইল, তাহার গণ-গত আকৃতি দীর্ঘকালের বংশপরম্পরানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সাধারণতঃ আর পরিবর্ত্তিত হয় না। তবে যদি কখনও হয়, তাহা হইলে, ঐ গণ-ভুক্ত জীব অন্য জীবে বিবর্ত্তিত হয়। নচেৎ গণের মূর্ত্তি ঠিক থাকিয়া যায়; কেবল ব্যক্তির আকৃতিতে অল্প স্বল্প বৈষম্য উৎপন্ন হয়। যে যে বংশের ব্যক্তিদ্বয়ের কোষ মিশ্রিত হয়, তাহাদিগেরও বংশপরম্পরা সুদীর্ঘ। এ নিমিত্ত বংশানুক্রমের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য অল্পাধিকপরিমাণে থাকিয়া যাইবেই; কেবল পুরুষানুক্রমে 'তাসা'র প্রভেদবশতঃ, অথবা বিভিন্ন বংশে বিভিন্ন প্রকার 'তাসা'র জন্য, ব্যক্তি-গত ও

* Species.

ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন।

[প্রথম পৃষ্ঠা।]

দ্বিতীয়

K. V. Seyne & Bros.

বংশ-গত বৈষম্য উৎপন্ন হয়; কখনও বা 'তাসা'র প্রক্রিয়া তুল্যরূপ হইলে, বিভিন্ন বংশের ব্যক্তিতেও তুল্য আকৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে আমার পরিচিত একটি বারেন্দ্র শ্রেণীর ডাক্তার ও রাঢ়ীর শ্রেণী সবজজের প্রায় তুল্য মুখাবয়বের কথা উল্লিখিত হইতে পারে।

শ্রীশশধর রায়।

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি।]

প্রশস্তি-পাঠ। *

[প্রথম পৃষ্ঠা।]

ওঁ সিদ্ধি [ঃ] ॥

১। স্বায়ম্ভুব মিহাপত্যং মুনি রত্রি দি (র্দি)বৌকসাং।
তস্য যন্নায়নং তেজ স্তেনাজা-

২। য়ত চন্দ্রমাঃ ॥ (১)
রৌহিণেয়ো বুধ স্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ [।]
জজ্ঞে স্বয়ংবৃতঃ কী[র্ত্ত্যা]

৩। চোর্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ ॥ (২)
সোপ্যায়ুং সমজীজনন্মনুসমো রাজ্ঞ স্ততো জজ্ঞিবান্
ক্ষমা-

৪। পালো নহুষ স্ততোজনি মহারাজো যযাতিঃ সুতম্ [।]

---

* তাম্রপট্টের যে সকল স্থান কালপ্রভাবে কিঞ্চিৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের স্পষ্ট ছবি উঠে নাই বলিয়া, সমগ্র লিপির মধ্যে পাঁচটিমাত্র অক্ষর সংশয়পূর্ণ;—সুতরাং আনুমানিকরূপে তাহা যে ভাবে পঠিত হইতে পারে, তাহা উল্লিখিত হইল না; সেই সকল স্থলে * * * চিহ্ন ব্যবহৃত হইল। শিল্পীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং যে সকল অক্ষর ছবি তুলিবার ত্রুটীতে ছবিতে উঠে নাই, তাহা [ ] এইরূপ বন্ধনী-মধ্যে প্রদর্শিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি ( ) এইরূপ বন্ধনী-মধ্যে সংশোধিত হইল।

(১—২) অনুষ্টুভ্। দ্বিতীয় শ্লোকের "কীর্ত্ত্যা" তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ আছে, প্রতিলিপিতে "র্ত্ত্যা" উঠে নাই।

সোপি প্রাপ যত্নং ততঃ ক্ষিতি [ভু]-

৫। জাং বংশোয় মুজ্জন্ততে

বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বস্তু(হু)শঃ প্রত্যক্ষ মেবৈক্ষ্যত ॥ (৩)

সোপী [হ]

৬। গোপীশত-কেলিকারঃ

কৃষ্ণো মহাভারত-সূত্রধারঃ [।]

অর্ঘ্যঃ পুমানংশ-কৃতাবতা-

৭। রঃ

প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃত-ভূমিভারঃ ॥ (৪)

পুংসা মাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি

৮। ত্রয্যান্(ং) চাদ্ভুত-সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদ্গমৈ র্বর্ম্মিণঃ [।]

বর্ম্মাণোতি-গভীর-নাম দধতঃ

৯। শ্লাঘ্যো ভুজৌ বিভ্রতো

ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরে র্বান্ধবাঃ ॥ (৫)

১০। অভবদথ কদাচিদ্যাদবীনাং চমূনাং

সমর-বিজয়যাত্রা-মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা [।]

শম-

১১। ন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং

কবি রপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ [প]ণ্ডিতানাম্ ॥ (৬)

জা—

১২। ত-বর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ [।]

দয়া ব্রতং রণঃ ক্রীড়া [ত্যা]গো যস্য মহো-

১৩ ৎসবঃ ॥ (৭)

---

(৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। এই শ্লোকের "ভু" অক্ষরটিও ছবির দোষে প্রতিলিপিতে উঠে নাই।

(৪) ইন্দ্রবজ্রা। এই শ্লোকের "হ" অক্ষরটির অবস্থাও ঐরূপ।

(৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(৬) মালিনী।

(৭) অনুষ্টুভ্। এই শ্লোকের "ত্যা" অক্ষরটি তাম্রপট্টে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

গৃহ্ণন্ বৈণ্য-পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যো * * প্রথয়ঞ্ছ্রিয়ং পরিভবং—
১৪। স্তাং কামরূপ-শ্রিয়ম্ [।]
নিন্দন্দিব্য-ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়-
১৫। সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ যাং সার্বভৌম-শ্রিয়ম্ ॥ (৮)
বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্মদেবঃ
১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ-প্রথম-মঙ্গল-নামধেয়ঃ [।]
কিম্বর্ণয়াম্যখিল-ভূপ-গুণোপপন্নো
দোষৈ—
১৭। [র্ম্ম]নাগপি পদং ন কৃতঃ প্রভু র্ম্মে। (৯)
তস্যোদয়ী-সূনু রভূৎ প্রভূত
* * * বীরেষ্বপি সঙ্গ-
১৮। রেষু [।]
য শ্চন্দ্রহা[স]-প্রতিবিম্বিতং স্ব-
মেকং মুখং সম্মুখ মীক্ষতে স্ম ॥ (১০)
তস্য মালব্যদেব্যা-
১৯। সীৎ কন্যা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী [।]
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥ (১১)
পূর্ব্বে প্যশে-
২০। ষ-ভূপাল-পুত্রীণা মবরোধনে [।]
তস্যাসীদগ্র-মহিষী [সৈব] সামলবর্ম্মণঃ ॥ (১২)

---

(৮) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

(৯) বসন্ততিলক। এই শ্লোকের "র্ম্ম" অক্ষরটি ছবিতে উঠে নাই।

(১০) ইন্দ্রবজ্রা। এই শ্লোকে শিল্পীর অনবধানতায় "চন্দ্রহাস" শব্দ "চন্দ্রহা" রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(১১—১২) অনুষ্টুভ্। দ্বাদশ শ্লোকের "সৈব"-শব্দ ছবিতে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

আসী-

২১। ত্তয়োঃ স্থ(সূ)নু রিহান্তরং (?) যঃ

শ্রীভোজবর্ম্মোভয়-বংশ[দী]পঃ [।]

২২। পাত্রেষু সর্বাস্থ দশাস্থ যে-

ন

স্নেহো ন লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ ॥ (১৩)

হা ধিক(ক)ষ্ট মবীর মত্ত ভুবনং ভূয়োপি কং (কিং) রক্ষসা-

২৩। মুৎপাতোয় মু[প]স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কাস্ব-লঙ্কাধিপঃ॥ (১৪)

ইতি যং গুণগাথাভি স্তুষ্টা-

২৪। ব পুরুষোত্তমঃ [।]

মজ্জয়ন্নিব বাগ্‌ব্রহ্ম-ময়ানন্দ-মহোদধৌ ॥ (১৫)

স খলু শ্রীবিক্রমপু-

২৫। র-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ

মা (ম) হারাজাধিরাজ-শ্রীসামলবর্ম্ম-দেবপা-

২৬। দানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-

মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্ভোজ [ঃ]

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।]

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতি-অধঃপত্তনমণ্ডলে কৌশাম্বী-

অষ্টগচ্ছ-খ-

২৮। গুল-সং[বদ্ধ] (১৬) উপ্যালিকা-গ্রামে গুবাকাদিসমেত-সপাদ-

নবদ্রোণাধি-

২৯। ক-পাটকভূমৌ সমুপগতাশেষ-রাজরাজন্যক-রাজ্ঞীরাণক-রা-

---

(১৩) ইন্দ্রবজ্রা। এই শ্লোকের "দী" অক্ষরটি তাম্রপট্টে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

(১৪) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত—অর্দ্ধশ্লোক মাত্র। শিল্পীর অনবধানতায় "ক্ক" ও "কিং" যথাযথ-ভাবে উৎকীর্ণ হয় নাই; ২৩ পংক্তিতে "প" অক্ষরটি আদৌ তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হয় নাই।

(১৫) অনুষ্টুভ্।

(১৬) এই পংক্তির 'বদ্ধ' অক্ষর দুইটি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ নাই।

৩০। জপুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-পীঠিকাবিত্ত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-
মহাসান্ধিবি-

৩১। গ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গবৃহদুপরিক-
মহাক্ষপ-

৩২। টলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোগিক-মহাব্যূহপতি-
মহাপীলুপতি-মহাগ-

৩৩। ণস্থ-দৌস্সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্ব-
গোমহিষাজাবিকাদি-

৩৪। ব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীন্
অন্যাংশ্চ সক-

৩৫। ল-রাজপাদোপজীবিনো ধ্যক্ষ-প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্
চট্টভট্টজাতী-

৩৬। য়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্
যথার্হম্মানয়তি

৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভ [ব] তাম্। (১৭)
যথোপরিলিখিতা ভূমি রিয়ং স্ব-

৩৮। সীমাবচ্ছিন্না তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তা সতলা সোদ্দেশা
সাম্রপনসা স-

৩৯। গুবাক-নালিকেরা (নারিকেলা) সলবণা সজলস্থ [লা] (১৮)

৪০। সগর্ত্তোষরা সহ্যদশাপরাধা পরি-
হৃতসর্বপীড়া অচাডভডপ্রবেশা
অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্ত-রাজভোগ(গ্য)ক-

৪১। র-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা
সাবর্ণ-সগোত্রায় ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান্-ঔ-

৪২। র্ব্ব-জমদগ্নি-প্রবরায়

---

(১৭) শিল্পীর অনবধানতায় "ভবতাম্" শব্দটি "ভতাম্" রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(১৮) "সজলস্থলা" শিল্পীর অনবধানতায় "সজলস্থ"-রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

বাজসনেয়-চরণায় যজুর্ব্বেদ-কণ্বশাখাধ্যায়ি-

৪৩। নে মধ্যদেশ-বিনির্গত [স্য] (১৯) উত্তর-রাঢ়ায়াং সিদ্ধলগ্রামীয়-পীতাম্বরদেব-

৪৪। শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বিশ্বরূপদেবশর্ম্ম-

৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারাধিকৃত-শ্রীরামদেবশর্ম্মণে। শ্রীমতা ভোজ-

৪৬। বর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেবভ-

৪৭। ট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষি-

৪৮। তি-সমকালং যাবদ্ভু(দ্ভূ)মিচ্ছিদ্রন্যায়েন শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্র-মুদ্রয়া তাম্রশা-

৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ (?)॥ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥

৫০। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ [।]
স বিষ্ঠায়াং কৃ(কৃ)মি ভূ'ত্বা পিতৃভিঃ সহ প-

৫১। চ্যতে॥ (২০)
শ্রীমদ্ভোজবর্ম্মদেবপাদীয় সম্বৎ ৫ শ্রাবণদিনে ১৯
নি অনু মহাক্ষ নি

(১৯) স্য-অক্ষরটি তাম্রপট্টে নাই।
(২০) অনুষ্টুভ্।

বঙ্গানুবাদ।*

(১)

এই বিশ্বে দেবর্ষি অত্রি (১) স্বয়ম্ভূর অপত্য [ছিলেন]। তাঁহার নয়ন হইতে যে তেজঃ (২) সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২)

সেই [চন্দ্রমা] হইতে রোহিণী-নন্দন (৩) বুধ [জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন], এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিয়া কীর্ত্তি (৪), এবং উর্ব্বশী এবং বসুন্ধরা কর্ত্তৃক [স্বয়ংবৃত] স্বয়ংবরে পতিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

---

* এই প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ থাকার সময়, 'ঢাকা রিভিউ' পত্রের শ্রাবণ-সংখ্যায় এই তাম্রশাসনের যে পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যে সকল অংশের সহিত একমত হইতে পারি নাই, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল। উক্ত পাঠ ও ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ 'ঢাকা-প্রকাশে'ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) দেবর্ষি "অত্রি" ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্রের একতম বলিয়া, "স্বায়ম্ভুবং অপত্যম্"। যথা পাদ্মে (স্বর্গখণ্ডে ১ অধ্যায়), -

মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ॥

(২) অত্রি নেত্র-সঞ্জাত তেজঃপুঞ্জ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে পৌরাণিকী কাহিনী প্রচলিত আছে, তদবলম্বনে এই শ্লোক রচিত হইয়াছে। যথা হরিবংশে,—

"নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধা দ্যোতয়ন্দিশঃ।
তদ্গর্ভ-বিধিনা হৃষ্টা দিশো দেব্যো দধুস্তদা॥
সমেত্য ধারয়ামাসুঃ ন চ তাঃ সমশক্নুবন্।
স তাভ্যঃ সহসৈবাথ দিগ্ভ্যো গর্ভঃ প্রভাবিতঃ॥
পপাত ভাসয়ন্ লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ।"

রঘুবংশে (২।৭৫) এবং লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনেও ইহার উল্লেখ আছে।

(৩) এই শ্লোকে বুধ রোহিণী-গর্ভোৎপন্ন বলিয়া "রৌহিণেয়" নামে উল্লিখিত; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে [৪র্থ অংশের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে], তথা মৎস্যপুরাণে [২৪ অধ্যায়ে], বুধ "তারা-গর্ভোৎপন্ন" বলিয়াই বর্ণিত।

(৪) পুরূরবার রূপে মোহিতা হইয়া, উর্ব্বশী তাঁহাকে স্বয়ংবরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চামর-গ্রাহিণীর নাম "কীর্ত্তি" বলিয়া পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। যথা মাৎস্যে [২৪ অধ্যায়],—

'উর্ব্বশী' যস্য পত্নীত্বমগাৎ সরূপ-মোহিতা॥
সপ্তদ্বীপা 'বসুমতী' সশৈল-বন-কাননা।

(৩)

সেই মনুপ্রতিম [পুরূরবাও] আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই রাজা [আয়ু] হইতে পৃথিবী-পালক নহুষ জন্মগ্রহণ করেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে যে রাজবংশ বিস্তৃতি (৫) লাভ করিয়াছিল, সেই রাজবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট (৬) হইয়াছিলেন।

(৪)

[ইহ] এই বংশে, সেই পূজ্য (৭) পুরুষ, [বলরামের] অংশাবতার (৮), মহাভারত-সূত্রধার (৯) শ্রীকৃষ্ণও প্রাদুর্ভূত হইয়া, শত শত গোপীর সহিত কেলি করিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মেণ পালিতা তেন সর্ব্বলোক-হিতৈষিণা।
চামর-গ্রাহিণী 'কীর্ত্তিঃ' সম্পন্নৈকাজবাহিকা।"

এই শ্লোকে কবি পৌরাণিকী প্রসিদ্ধির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদে "কীর্ত্তি" Fame বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৫) তাম্রপট্টে "উজ্জয়তে" পাঠ উৎকীর্ণ থাকায়, প্রশস্তি-পাঠে তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে। "উজ্জয়তে"=উজ্জৃম্ভতে। "জভ্" ধাতুর প্রয়োগ অপেক্ষা "জৃম্ভ্" ধাতুর প্রয়োগ অধিক পরিচিত। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে ইহা became renowned বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদু হইতে 'যদু-বংশ' বিস্তৃত হইবার কথাই কবি "জভতে"-ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন।

(৬) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে মুদ্রিত "ঐকান্ত" পাঠ লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

(৭) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে "আদ্যঃ" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রফলকে "আ" দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৮) এই শ্লোকে অষ্টম অবতার বলরামের অংশ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লিখিত আছে। প্রশস্তি-রচনা-কালে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে এ দেশের লোকসমাজে কিরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, ইহাতে তাহার ঐতিহাসিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদে "অংশকৃতাবতারঃ" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা,—he Krishna * * * * descended on earth with a part of his energy". এরূপ ব্যাখ্যার কারণ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই!

(৯) শ্রীকৃষ্ণ "মহাভারত-সূত্রধার" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহার কারণ বোধ হয়,—

"বেদে রামায়ণে পুণ্যে ভারতে ভরতর্ষভ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

(৫)

ত্রয়ী [বেদবিদ্যাই] পুরুষের [প্রকৃত] পরিধেয় (১০)। তাহার অভাব ছিল না বলিয়া অনগ্ন (১১) অপিচ, [বেদবিদ্যা-সংযুক্ত বলিয়া বৌদ্ধক্ষপণকাদি হইতে বিভিন্ন], বেদ-চর্চ্চায় (১২) এবং অদ্ভুত সমর-ক্রীড়ায় অনুরাগবশতঃ যে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইত, তাহাতেই ['বর্ম্মিণঃ'] বর্ম্মাবৃত-কলেবর [বলিয়া প্রতিভাত] হরির জ্ঞাতিবর্গ, বর্ম্মা-[উপাধিধারী]-গণ অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া, সিংহ-বিবর-তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

(৬)

অনন্তর কোনও এক সময়ে, যাদব-সেনার সমর-বিজয়যাত্রা-মঙ্গলরূপী (১৩) বজ্রবর্ম্মা [নামক ব্যক্তি] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রিপু-কুলের পক্ষে শমন (১৪), বান্ধব-কুলের পক্ষে [প্রিয়দর্শন] চন্দ্র, কবি-কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং পণ্ডিত-কুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

(১০) 'শীলমাবরণং স্ত্রিয়াঃ', 'চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ' ইত্যাদি সুপরিচিত প্রয়োগের অনুকরণে, এই শ্লোকে বেদবিদ্যা ["আবরণম্"] পরিধেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(১১) "নগ্ন"—শব্দে বিবস্ত্র এবং বৌদ্ধক্ষপণকাদি নিগ্রন্থ সম্প্রদায় সূচিত হইয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণে,—

"ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতি দ্বিজ।
এতাং যস্তু জহাতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ॥"

তথাহি, মার্কণ্ডেয়পুরাণে,—

যেষাং কুলে ন বেদোঽস্তি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতম্।
তে নগ্নাঃ কীর্ত্তিতাঃ সদ্ভিঃ তেষামন্নং বিগর্হিতম্॥"

(১২) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে "ত্রয্যাং" শব্দ 'ত্রয্যা" রূপে, "বর্ম্মিণঃ" শব্দ "বর্ম্মণঃ" রূপে ও "গভীরনাম দধতঃ" প্রয়োগটি "গভীরতামদধতঃ" রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ইংরেজী অনুবাদে লিখিত হইয়াছে,—"the texture of whose armour was loosened and rendered thin by horripilation on account of zeal and ardour in wondrous battles (in the cause of the Vedas) !!

(১৩) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'বিজয়যাত্রা'-শব্দ 'বিজয়ধারা' রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তদনুসারে ইংরেজী অনুবাদে "auspicious and unbroken series of victories" লিখিত হইয়াছে।

(১৪) বিরুদ্ধ-গুণসমাবেশে নায়কের চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করে বলিয়া, কবিগুরু তাঁহার পথ-প্রদর্শন করিয়া, রামচরিত্র-বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥"

এই শ্লোকেও সেইরূপ রচনা-কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭)

শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্ম্মা হইতেও জাতবর্ম্মা (১৫) জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল, এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল।

(৮)

তিনি (১৬) বেণের পুত্র পৃথুর (১৭) শ্রীকে ধারণ করিয়া, কর্ণের [কন্যা] (১৮) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * * * শ্রীকে বিস্তৃত করিয়া, সেই

---

(১৫) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে জাতবর্ম্মার নাম "জৈত্রবর্ম্মা" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আক্তলি মহোদয়-লিখিত উপোদ্ঘাতে, তথা শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে, অপিচ ইংরেজী অনুবাদে, জৈত্রবর্ম্মা পাঠই পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে লিপিকর-প্রমাদ বলা যাইতে পারে না। ২৬ পংক্তিতে "মহারাজাধিরাজ" শব্দে 'জা' এবং 'জ' যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই, ১১ পংক্তির শেষ অক্ষরটি যে 'জা', তাহা প্রতিভাত হইবে। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বশ্লোকের সমাপ্তি-বিজ্ঞাপক দুই দাঁড়ির (॥) চিহ্ন আছে, তাহার শেষটিকে ঐকার-চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ১ম এবং ৫ম পংক্তিতে এবং অন্যান্য স্থানেও 'জা' তদ্রূপেই উৎকীর্ণ হইয়াছে। "ঢাকা রিভিউ" পত্রে "রণঃ" শব্দের বিসর্গ-চিহ্ন পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(১৬) এই শ্লোকে দ্বিতীয়-চরণের প্রথম অক্ষর 'বো' দেখিতে পাওয়া যায়; তৎপর দুইটি অক্ষর অস্পষ্ট; তৎপর যাহা ঈষৎ-প্রতিভাত হয়, তাহা "প্রথয়ন্ত্রিং" বলিয়া পঠিত হইতে পারে। কিন্তু এই অংশের অর্থ [অক্ষর-বিলোপে] প্রতিভাত হয় না। এই শ্লোকে রাজকবি সমসাময়িক কোনও কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৭) 'পৃথুশ্রিয়ং'—পৃথুর শ্রীকে, তথা বিপুলশ্রীকে সূচিত করিতে পারে।

(১৮) তৃতীয় বিগ্রহপালের পিতা নয়পালের শাসনসময়ে, কর্ণের সহিত যুদ্ধে গৌড়-সেনার প্রথমে পরাজয়ের এবং পরে বিজয়লাভের, ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে মৈত্রী সংস্থাপিত হইবার একটি কাহিনী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের [তিব্বতীয় ভাষায় রচিত] জীবন-চরিতে উল্লিখিত আছে। 'গৌড়রাজমালা'য় [৫৫ পৃষ্ঠায়] তদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য। এই কর্ণ কর্ণচেদী নামে কথিত। রামচরিত কাব্যে [১।৯ শ্লোকে] লিখিত আছে,—তিনি পরাজিত হইয়া, গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপালকে "যৌবনশ্রী" নাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কন্যা "বীরশ্রী"র সহিত "জাতবর্ম্মা"র পরিণয়ের কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়া, "জাতবর্ম্মা"র অভ্যুদয়-কালের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে, কৈবর্ত্তনায়ক "দিব্যো"র বা "দিব্বোকে"র বিদ্রোহে, বরেন্দ্রী হইতে পালরাজগণের শাসন উন্মূলিত হয়, এবং পালসাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সেই সুযোগে পালসাম্রাজ্যভুক্ত 'কামরূপ' অধিকার করিয়া জাতবর্ম্মা

[সুবিখ্যাত] কামরূপ-[রাজ্য]-শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্য [নামক কৈবর্ত্তনায়কের] ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের (১৯) শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় [ব্রাহ্মণগণকে] ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

(৯)

জগতে প্রথম মঙ্গলনামধারী শ্রীমান্ সামলবর্ম্মদেব বীরশ্রীর (২০) গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক আর কি বর্ণনা করিব? অখিল-নরপাল-গুণ-বিভূষিত আমার প্রভুতে (২১) দোষসমূহ কিয়ৎপরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

(১০)

উদয়ী সূনু (২২) তাঁহার [সামলবর্ম্মদেবের] * * * * ছিলেন। তিনি

পূর্ব্ববঙ্গে "সার্ব্বভৌমশ্রী" বিস্তৃত করিয়াছিলেন। 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে এই শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ;—

"গৃহ্নৈষণা পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যো * ০ প্রণয়স্থি যং পরিভবং স্তাং কামরূপশ্রিয়ম্।
নিন্দন্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয় ন্সোব (?) ধনসা শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছিয়ং বিততবান্ন্যাং সার্ব্বভৌমশ্রিয়ম্॥"

অনুবাদে ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হয় নাই, বরং 'কামরূপ' [সংশয়সহকারে] 'কামের রূপ' বলিয়া, এবং 'দিব্যভুজশ্রী' 'দেবগণের ভুজশ্রী' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(১৯) 'গোবর্দ্ধন' সেই সময়ের ব্যক্তিবিশেষের নাম।

(২০) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত 'বীরশ্রী' যে কর্ণের কন্যার নাম, এই শ্লোকোক্ত 'বীরশ্রী' হইতে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিভাত হয়।

(২১) সামলবর্ম্মদেবের মৃত্যুর অল্পকাল পরে এই তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া রাজকবি সামলবর্ম্মদেবকে 'প্রভু' বলিয়াছেন, এবং তিনি সামলবর্ম্মদেবের সময়েও রাজকবি ছিলেন বলিয়া ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(২২) এই শ্লোকের 'উদয়ী' শব্দ কোনও যোদ্ধ্-পুরুষের নামবাচক সংজ্ঞাশব্দ বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার 'সূনু'র সহিত সামলবর্ম্মার সেনা-বিভাগের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অস্পষ্ট অক্ষরগুলি পাঠোদ্ধারের অসুবিধা করায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে এই শ্লোক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয় নাই। বরং ইহা 'ছন্দে, ব্যাকরণে এবং ভাষায়'—ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাজকবি এতগুলি দোষের প্রশ্রয় দান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে, "his son was a rising hero" বলিয়া "তস্যোদয়ী সূনুঃ" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা সঙ্গত বা মূলানুগত হইলে, ইহা সামলবর্ম্মার পুত্রকে সূচিত করিত, এবং পরশ্লোকোক্ত ["তস্য মালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী"]

বীর [পরিপূর্ণ] যুদ্ধক্ষেত্রেও [বহুভয়ুত] (২৩) খড়্গা-ফলকে (২৪) তাঁহার আপন মুখই কেবল সম্মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন (২৫)।

(১১)

তাঁহার (২৬) মালব্যদেবী নাম্নী, জগদ্বিজয়-মত্ত কামদেবের বিজয়-বৈজয়ন্তী-রূপিণী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন।

'মালব্যদেবী'কেও সামলবর্ম্মার পৌত্রী বলিয়া প্রতিপন্ন করিত। সুতরাং ১২শ শ্লোকে 'মালব্য দেবী' সামলবর্ম্মার 'অগ্রমহিষী' ছিলেন বলিয়া যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ১০-১১শ শ্লোকের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত না। ইংরেজী অনুবাদে ১১শ শ্লোকে 'তস্য' শব্দটি সুকৌশলে পরিত্যক্ত না হইলে ১০ম শ্লোক "his son was a rising hero" ইত্যাদি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত না। ১২শ শ্লোকের 'তস্য' শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে কেন, তাহার কারণ লিখিত হয় নাই। এই সকল কারণে, 'উদয়ী'কে ['rising hero' না বলিয়া,] মালব্যদেবীর জনককুলের ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ না করিলে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। ১০ম শ্লোকের বিশুদ্ধ পাঠ 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে উদ্ধৃত হইতে পারিলে, ইহার আরও একটি কারণ প্রতিভাত হইত। ঐ শ্লোকে ভোজবর্ম্মা "উভয়বংশদীপঃ" বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোনও শ্লোকে তাঁহার মাতামহ-বংশেরও উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়াই প্রতিভাত হইত, এবং ১০ম শ্লোকেই তাহা থাকিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনুভূত হইত।

(২৩) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে এই শ্লোকের ইংরেজী অনুবাদে "সম্মুখ" শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং লিখিত হইয়াছে,—"in battle who saw the reflection of his own face alone—in the swords [of his enemies] i. e. who never turned his back on his foes" মূলে এইরূপ অর্থ গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার সম্মুখে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বীর দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিত না। সুতরাং তিনি তাঁহার খড়্গ-ফলকে প্রতিবিম্বিত একমাত্র নিজের মুখই সম্মুখে দর্শন করিতেন, ইহাই মূলানুগত শ্লোকার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

(২৪) এই শ্লোকে অনবধানতাবশতঃ শিল্পি-কর্ত্তৃক 'চন্দ্রহাস' শব্দ 'চন্দ্রহা' রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রহাস—খড়্গ।

(২৫) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'ঈক্ষতে স্ম' পাঠটি 'ঈক্ষতে হ'-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। পাদপূরণে 'হ' ব্যবহৃত হইবার বাধা না থাকিলেও, বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কোনও তাম্রশাসনেই তাহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই। তাম্রপট্টে এই স্থলে 'হ' অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্পষ্ট হইলেও, যুক্তাক্ষররূপে এবং 'স্ম' রূপেই প্রতিভাত হয়।

(২৬) 'মালব্যদেবী' ১০ম শ্লোকোক্ত ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে তাঁহাকে 'Princess of Malwa' বলিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়াছেন, কেন, তাহার কোনও কারণই উল্লিখিত হয় নাই, এবং এই তাম্রশাসনেও তাহার কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(১২)

অশেষ-ভূপাল-কন্যাগণ কর্তৃক রাজান্তঃপুর পরিপূর্ণ থাকিলেও সেই [মালব্য দেবীই] এই সামলবর্ম্মার "অগ্র-মহিষী" [প্রধানা মহিষী] ছিলেন।

(১৩)

অনন্তর (২৭) [পিতৃ-মাতৃ] উভয়কুল-প্রদীপ শ্রীভোজবর্ম্মা নামক তাঁহাদের পুত্র (২৮) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল প্রকার অবস্থাতেই (২৯) উপযুক্ত-পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না, [হৃদয়ের] অন্ধকার বিনষ্ট (৩০) করিয়া দিতেন।

(১৪)

হা ধিক্! কষ্টের বিষয়! অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে! রাক্ষসকুলের

(২৭) এই শ্লোকে ভোজবর্ম্মা 'উভয়বংশদীপ' রূপে কথিত হইয়াছেন বলিয়া, দীপের সহিত তুলনাটি পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য, রাজকবি পাত্র, দশা, স্নেহ এবং তমঃ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রদীপ-পক্ষে "পাত্র" তৈলাধার, "দশা" বর্ত্তি, "স্নেহ" তৈল, এবং "তমঃ" অন্ধকার। ভোজ-পক্ষে, "পাত্র" অনুগ্রহের পাত্র, "দশা" অবস্থা, "স্নেহ" প্রীতি, এবং "তমঃ" চিত্তের মালিন্য।

(২৮) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে,—

"আসীত্তয়োঃ স্বরবিহারস্বরায়ঃ
শ্রীভোজবর্ম্মোদ্ভববংশদীপঃ।"

এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং অনুবাদে লিখিত হইয়াছে,–Bhojavarma the light of the race, was the issue of the couple, an obstacle to the extinction of their property and continuity)." ইহাতে বোধ হয় যে, 'উদ্ভব-বংশ' race শব্দ দ্বারা অনূদিত হইয়াছে। এই পাঠ যদি মূলানুগত হইত, তাহা হইলেও এইরূপ অনুবাদ সঙ্গত হইত কি না, তাহা চিন্তনীয়। 'স্বরবিহারস্বরায়ঃ' পাঠটি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাতন লিপিতে কখনও কখনও 'উ'কার 'ব'-ফলার ন্যায় প্রতিভাত হয়; তৃতীয় শ্লোকে 'সুতং' সেই ভাবেই উৎকীর্ণ আছে, এবং 'ঢাকা রিভিউ' পত্রেও তাহা যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তথাপি এই শ্লোকে 'সুসু' 'স্বস্ব'-রূপে পঠিত হইয়াছে। শিল্পী 'সু' স্থানে 'স্ব' উৎকীর্ণ করায়, পাঠোদ্ধারে এই গোলযোগ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

(২৯) এই শ্লোকের 'সর্ব্বাসু দশাসু' প্রয়োগে, ভোজবর্ম্মদেবের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ধ্বনিত হইয়াছে; এবং তাহাতে ইঙ্গিতে ঐতিহাসিক তথ্য সূচিত হইয়াছে।

(৩০) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'হতং শব্দ 'হৃতং'-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনে 'ঋ'-কার দৃষ্ট হয় না। 'হৃ' কিরূপে লিখিত হইত, তাহা ৪০শ পংক্তিতে 'পরিহৃত-সর্ব্বপীড়া'য় দ্রষ্টব্য।

উৎপাত-বিধাতা ["অলঙ্কাধিপঃ] রাম পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন কি ? [এই] শঙ্কাকুল অবস্থায় [অয়ং] ভোজবর্ম্মদেব কুশলী হউন (৩১)।

(২৫)

এইরূপে বাগ্-ব্রহ্মানন্দ-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া যাঁহাকে পুরুষোত্তম (৩২) গুণগাথা-সমূহে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ;—

(৩১) এই [শ্লোকার্দ্ধ] 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে "শ্লোক" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং 'hopelessly indistinct' বলিয়া অনুবাদিত হয় নাই।

"হা ধিক্ বুধবীর মন্যাভুবনং ভূয়োপি কং বক্ষসা।
মুৎপাতোয়মুস্থিতোস্তু কুশলী শঙ্কাস্বলকাধিরঃ ॥"—

এইরূপ পাঠ কল্পিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সত্যই 'hopelessly indistinct' বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পীর অনবধানতাবশতঃ 'ক্ত' 'ক'-রূপে, 'উপস্থিত' 'উস্থিত'-রূপে উৎকীর্ণ হইয়াছে ; এবং 'কিং' শব্দে 'ই'-কারের চিহ্ন মাত্রার বামদিকে বিন্দুমাত্র সূচিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ চিহ্নটি উৎকীর্ণ হয় নাই। 'কং' অক্ষরটি যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, অন্য স্থানে উৎকীর্ণ 'ক' অক্ষরের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে, যে রূপেই হউক, (২৭শ পংক্তির 'অষ্টগন্ধ' শব্দটি বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ষ্ট' অক্ষরটি 'ষু' রূপে পঠিত হয় নাই। 'হা ধিক্‌ষু' প্রকৃত ভাবে পঠিত হইয়া থাকিলে, 'অষ্টগন্ধ' শব্দটি 'অষুগন্ধ'-রূপে পঠিত হওয়া উচিত ছিল। এক ভাবে উৎকীর্ণ অক্ষর দুই স্থানে দুই ভাবে পঠিত হইয়াছে কেন, তাহার কোনও কারণ উল্লিখিত হয় নাই। এই শ্লোকার্দ্ধ গভীরার্থদ্যোতক বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ইহার সহিত সমসাময়িক ঘটনার তুলনা করিলে যেরূপ অর্থের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনুবাদে তাহাই গৃহীত হইল। 'শঙ্কা' ও 'লঙ্কা', এই উভয় শব্দের 'ঙ্ক' ঠিক একরূপেই উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে তাহা এক স্থানে 'ঙ্ক'-রূপে, ও অন্য স্থানে 'ক'-রূপে গৃহীত হইয়াছে কেন, তাহারও কারণ উল্লিখিত হয় নাই। আধুনিক লিপিতে 'ব'-কার এবং 'ব-কার' একত্র সংযুক্ত হইলে, ডাহিন দিকে যুক্তাক্ষরের সহিত একটি স্বতন্ত্র রেখা যুক্ত হয়। প্রাচীন লিপিতে 'ব'-কার ও 'ব'কার একত্রিত হইলে, তাহা 'ব'-এর' নীচে 'ব'-এর ন্যায় আকার ধারণ করিত ; কেবল নীচের অক্ষরটি বাম দিকে ত্রিকোণাকার না হইয়া ঈষৎ বক্রভাব ধারণ করিত। অক্ষর-তত্ত্বের নিয়মানুসারে পূর্ব্ব শব্দটি 'শঙ্কাব' বলিয়া পাঠ করিলে পরের শব্দটিকে 'লঙ্কাধিপঃ' বলিয়াই পাঠ করিতে হইবে ; এবং তদ্দ্বারা 'শঙ্কাহ অলঙ্কাধিপঃ' সূচিত হইবে। 'অলঙ্কাধিপ' শব্দটি 'রাম'কে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে, এবং তদ্দ্বারা 'রামপাল' নামক পালরাজবংশীয় নরপাল সূচিত হইয়া থাকিলে, এই শ্লোক আর 'hopelessly indistinct' বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা এই তমসাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক যুগের একটি তর্কশূন্য কথা।

(৩২) 'ঢাকা-রিভিউ' পত্রে 'মন্তয়রিব' শব্দটিতে বোধ হয়, মুদ্রাকর-প্রমাদেই, "ং" যোজিত হইয়াছে। রাজকবির নাম 'পুরুষোত্তম' ছিল। তিনি ১০ম শ্লোকে সাবলবর্মার রাজকবি ছিলেন বলিয়াও ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (৩৩) (সেনা-নিবেশ) হইতে, মহারাজাধিরাজ-শ্রীসামলবর্ম্মদেব-পাদানুধ্যাত, পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্‌ভোজ—শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্তির (৩৪) অন্তঃপাতী অধঃপত্তন-মণ্ডলে কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ খণ্ডল [সম্বন্ধ] উপ্যালিকা গ্রামে, ১ পাটক, ৯¼ দ্রোণ (পরিমিত) (৩৫) ভূমিতে,—সমুপগত (৩৬) (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক (৩৭), রাজ্ঞী, রাণক (৩৮), রাজপুত্র, রাজামাত্য, রাজপুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত (৩৯), মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ বিচারাধিপতি), মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত (৪০) (রাজকীয় 'মোহরে'র রক্ষক), অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক (৪১) (রাজাপ্তজনদিগের

---

(৩৩) "জয়স্কন্ধাবার" শব্দে রাজধানীকেও বুঝাইতে পারে।

(৩৪) বিস্তৃতি বিষয়ে "ভুক্তি" অপেক্ষা "মণ্ডল" ছোট, এবং মণ্ডল অপেক্ষা "খণ্ডল" ছোট। বর্ত্তমান সময়ের ডিভিসন, জেলা এবং সব্‌ডিভিসন স্মরণীয়।

(৩৫) উৎসৃষ্ট ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯¼ দ্রোণ ছিল। "ভূপাটকঃ গ্রামৈকদেশঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। "দ্রোণ" পরিমাণবিশেষের নাম। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে ইহার অনুবাদে a little over 9 drones and a quarter of village'—বলিয়া লিখিত হইয়াছে কেন, তাহা বোধগম্য হয় না।

(৩৬) 'সমুপগত'—শব্দকে কিল্‌হর্ণ প্রভৃতি মনীষিগণ 'সমুপাগত' শব্দের সমানার্থবোধক মনে করিয়া, 'assembled' বলিয়া অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অমরকোষে [৩।২।৫৮] 'উপগত' শব্দ সংবিদিত পর্য্যায়ে গৃহীত। যথা,—

'সঙ্গীর্ণঃ সংবিদিতং সংশ্রুতং সমাহিতোপশ্রুতোপগতম্'।

(৩৭) 'রাজন্যানাং সমূহঃ' এই অর্থে বুঞ্‌ প্রত্যয়ে 'রাজন্যক' শব্দ সিদ্ধ। a collection of warriors or Kshatriyas বলিয়া আপ্তের অভিধানে ব্যাখ্যাত।

(৩৮) ওয়েষ্টমেকট 'রাজ্ঞী-রাণক' যুক্তপদরূপে গ্রহণ করিয়া (J. A. S. B. Vol. XLIV) বলিয়া গিয়াছেন,—Ranaka probably means queen's relation! 'রাণক' এক শ্রেণীর সামন্ত নরপালের পদ-বিজ্ঞাপক উপাধিমাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

(৩৯) 'পীঠিকাবিত্ত' 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'পীঠিকা-রিত্ত' বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এই রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ অজ্ঞাত।

(৪০) 'মহামুদ্রাধিকৃত'কে ওয়েষ্টমেকট 'great mint-master' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মুদ্রাশব্দে সংস্কৃত সাহিত্যে তঙ্কা বুঝায় না, সিল বা মোহর বুঝায়।

(৪১) ল্যাসেন 'অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিকে'র অর্থ করিয়াছেন,—'Overseer of the officers of the Criminal Law.' দশকুমারচরিতের 'অন্তরঙ্গেষু রাজ্যভারং সমর্প্য' প্রয়োগ দেখিয়া এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে সাহস হয় না।

অধিনায়ক), মহাক্ষপটলিক (অধিকরণিক, অথবা রাজকীয় লেখ্যের রক্ষক), মহা প্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ) মহাভোগিক (৪২) (প্রধান অশ্বরক্ষক), মহাব্যূহপতি (৪৩), মহাপীলুপতি (প্রধান গজ-রক্ষক), মহাগণস্থ (৪৪) ('গণ' নামক সেনা-মণ্ডলীর নেতা) দৌঃসাধিক (৪৫) (দ্বারপাল অথবা গ্রাম-পরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক (দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিস-কর্ম্মচারিবিশেষ), নৌবলব্যাপৃতক (নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ), হস্তি-ব্যাপৃতক (হস্ত্যধ্যক্ষ), অশ্বব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ), মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজ-ব্যাপৃতক (ছাগাধ্যক্ষ) ও অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ('গুল্ম' নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক), দণ্ডপাশিক (বধাধিকৃত পুরুষ), দণ্ডনায়ক (৪৬) (চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষ), বিষয়-পতি ('জেলা'ধিপতি) প্রভৃতি (রাজকর্ম্মচারীদিগকে), এবং অধ্যক্ষ-প্রচারে উক্ত (৪৭) (অধ্যক্ষ-তালিকাভুক্ত) কিন্তু এই শাসনে (পৃথগ্ভাবে) অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবীদিগকে, চট্ট-ভট্ট-জাতীয় (৪৮) জনপদ-

---

(৪২) ওয়েষ্টমেকট 'মহাভোগিকে'র অর্থ করিয়াছেন,—'in charge of the revenue.' সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভোগিক' শব্দ অশ্বরক্ষককেই বুঝায়। 'পীলুপতি' শব্দের ব্যাখ্যাকালেও ওয়েষ্টমেকট সংস্কৃত-সাহিত্যে সমস্ত সুপরিচিত 'গজরক্ষক' অর্থ গ্রহণ না করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—'head of the forest department.'

(৪৩) এই শব্দটি আর কেবল 'হরিবর্ম্মা'র তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

(৪৪) 'একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা' ইত্যাদি অমরকোষের সুপরিচিত পর্য্যায়ক্রমে একটি সেনা-মণ্ডলীর নাম 'গণ'। ২৭টি গজ, ২৭টি রথ, ৮১টি অশ্ব, এবং ১৩৫টি পদাতি লইয়া একটি 'গণ' সংঘটিত হয়। এবং ৯টি গজ, ৯টি রথ, ২৭টি অশ্ব, এবং ৪৫টি পদাতি লইয়া একটি 'গুল্ম' সংঘটিত হয়। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'মহাগণস্থ' presidents of guilds বলিয়া এবং 'গৌল্মিক' keeper of passes বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৪৫) এই শব্দটি 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'দৌস্সাধিক' রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। মূলে 'দৌস্সাধিক'রূপে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

(৪৬) 'দণ্ডং রাজ্ঞাং চতুর্থোপায়ং নয়তীতি দণ্ডনায়কঃ চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষঃ' ইতি হেমচন্দ্রঃ। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে এই পুরাতন ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং wielders of the rod of punishment বলিয়া একটি নূতন অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৪৭) অধ্যক্ষ-প্রচারোক্তান্—যাঁহারা অধ্যক্ষ-তালিকাভুক্ত। প্রচার—তালিকা। এই শব্দটি 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৪৮) 'চট্ট-ভট্ট-জাতীয়ান্'কে ওয়েষ্টমেকট কৃষক-শ্রেণীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন। ('probably the bulk of the cultivating population')। বটব্যাল

ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।]

বাসিগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণগণকে ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে (৪৯), যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন,—(নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলের অভিমত হউক—যথা,—স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণ-পূতি-গোচর পর্য্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষ সমেত, লবণোৎপাদক ভূমির সহিত (৫০), জল ও স্থলের সহিত, গর্ত্ত ও উষর ভূমির সহিত, যাহার (অর্থাৎ, যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে (৫১), সর্ব্বপ্রকার

মহাশয় ধর্ম্মপাল দেবের তাম্র-শাসনের ব্যাখ্যায় (J. A. S. B. 1891.) বলিয়াছেন যে, বোধ হয়, এই 'চট্ট-ভট্ট-জাতীয়' লোকেরা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া গুপ্তবার্ত্তার সংগ্রহ করিত। ডাক্তার ভোগেল 'চার' (পরগণা দপতি) শব্দ হইতে 'চাট' শব্দ আসিয়াছে মনে করিয়া, যে চার শ্রমজীবীদিগকে একত্র করিয়া দিত, এবং দণ্ডনীয় অপরাধের নিবারণ করিত, 'চাট' শব্দ দ্বারা তাহাকেই বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। কোনও কোনও শাসনে 'চাটভটজাতীয়ান্' পাঠও দৃষ্ট হয়। এ স্থলে 'ভট্ট' শব্দ দ্বারা রাজস্তুতিপাঠক ভাটজাতিকে বুঝাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। 'ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোঽনুবাচকঃ'। ভট্টজাতির উৎপত্তি এইরূপে বর্ণিত। আবার কোনও কোনও মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা রাজার সৈন্য-বিশেষ ছিল ('regular and irregular troops')। 'ভট' অর্থে সৈনিক হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাঁহারা এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু 'ভট' শব্দ একটি হীনজাতির নামও হইতে পারে, বেতনভোগী লোকও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে 'ভট' শব্দ 'name of a degraded tribe' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'চাট' শব্দের অর্থ লিখিতে যাইয়া আপ্তে মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্যের (১।৩৩৬) উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—'চাটাঃ প্রতারকাঃ।' 'বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি' ইতি মিতাক্ষরা। অর্থাৎ, যাহারা বিশ্বাসের উৎপাদন করিয়া পরধন অপহরণ করে। 'চাট-তস্কর-দুর্বৃত্তৈস্তথা সাহসিকাদিভিঃ। পীড়্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কূটচ্ছদ্মাদিভিস্তথা' ॥ ১।৩৪৩ পঞ্চতন্ত্রে।

(৪৯) ব্রাহ্মণোত্তরান্—ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে। "উপর্য্যুদীচ্য-শ্রেষ্ঠেষু প্যুত্তরঃ স্যাদনুত্তরাঃ" ইত্যমরঃ ৩।৩।১৯০। "উত্তরং প্রতিবাক্যে স্যাদূর্দ্ধ্বোদীচ্যোত্তমেঽন্যবৎ" ইতি বিশ্বঃ। এই শব্দটি 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে 'castes other than the Brahmins' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৫০) 'সলবণা'—উৎসৃষ্ট ভূমি 'সলবণা' বলিয়া উক্ত হওয়াতে মনে হয় যে ভূমিটি সমুদ্র-জলধৌত হইত, এবং তাহাতে লবণ উৎপন্ন হইত। তাম্রপট্টের "সোদ্দেশা সাম্রপনসা" 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে "সোদ্দেশাম্রপনসা" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫১) যে দশটি অপরাধ করিলে ভূমি 'বাজেয়াপ্ত' হইতে পারে, সেই দশটি অপরাধ করিলেও, রাজা (এই উৎসৃষ্ট গ্রাম সম্বন্ধে) তাহা সহ্য করিবেন, অর্থাৎ 'বাজেয়াপ্ত' করিবেন না।

উৎপীড়ন-রহিত, চাট-ভাট জাতির প্রবেশাধিকার বিরহিত (৫২), যাহা হইতে কোন প্রকারের করাদি গৃহীত হইবে না, রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদি (সর্ব্বপ্রকারের) আয়ের সহিত (৫৩), উপরি লিখিত ভূমিখণ্ড, সাবর্ণ-গোত্রোৎপন্ন, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান্-ঔর্ব-জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, যজুর্ব্বেদের কণ্বশাখা-ধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত (৫৪) উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত—সিদ্ধল-গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্তি-গৃহাধিকৃত (৫৫) শ্রীরাম দেবশর্ম্মাকে—এই পুণ্য দিবসে যথাবিধি উদকস্পর্শপূর্ব্বক ভগবান বাসুদেব-ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া, মাতা পিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ-সূর্য্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতিসমকাল পর্য্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে (৫৬),

(৫২) উপরি-আলোচিত চট্টভট্টজাতির প্রবেশাধিকার এই উৎসৃষ্ট গ্রামে থাকিবে না।

(৫৩) 'রাজভোগ্য-কর-হিরণ্য-প্রত্যায়সহিতা' কর শব্দে প্রভৃতি। "ভাগধেয়ো করো বলিঃ" ইত্যমরঃ। হিরণ্য = ধন। "হিরণ্যং রজতং ধনম্" ইতি শব্দরত্নাবলী। প্রত্যায়—আয়। অর্থাৎ, শস্যাদের দ্বারাই হউক, অথবা রজতাদি দ্বারাই হউক, যে কোনরূপ রাজপ্রাপ্য সর্ব্ববিধ 'প্রত্যায়' (প্রাপ্য বস্তু) অনুশাসন-গৃহীতাকে প্রদান করিবে। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে, এই সমাসবদ্ধ পদটি 'with the royal right to gold (mines),' বলিয়া কেন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

(৫৪) 'বিনির্গত' শব্দটি সন্ধিবিচ্ছেদবোধ করিয়া পঠিত হইবে। এবং ইহা 'সিদ্ধল-গ্রামীয়-পীতাম্বর-দেবশর্ম্মণঃ' পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইবে। তাহা না হইলে, প্রতিগ্রহীতা শ্রীরামদেবশর্ম্মা যদি মধ্যদেশ-বিনির্গত হইয়াই থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রপিতামহ পীতাম্বর-দেবশর্ম্মা রাঢ়দেশস্থ সিদ্ধলগ্রামীয় হইতে পারিতেন না। তিনিই মধ্যদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক সিদ্ধল-গ্রামবাসী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে শ্রীরামদেবশর্ম্মাকেই 'a native of village Siddhala in the northern Radh hailing from Madhyadesa,' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

(৫৫) 'শান্ত্যাগার'—শব্দে, যজ্ঞান্তে শান্তিকুম্ভজল দ্বারা যে গৃহে স্নান করা হয়, সেই গৃহ বুঝিতে হইবে।

(৫৬) 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন'—"কৌটিলীয়ং অর্থশাস্ত্রম্" [দ্বিতীয়াধিকরণ, ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা] দ্রষ্টব্য। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে so long as there are holes in the earth বলিয়া যে ব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা "সাহিত্যে" প্রকাশিত বল্লালসেনের তাম্রশাসনের অনুবাদে ভিন্ন অন্য কোনও স্থলে মুদ্রিত হয় নাই। "কৌটিলীয়-অর্থশাস্ত্র" মুদ্রিত হইবার পর, সে ব্যাখ্যা আর গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্বিষ্ণু-চক্র-মুদ্রা দ্বারা (৫৭) তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীমান ভোজবর্ম্ম-দেব প্রদান করিলাম। এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোকও আছে ঃ—ভূমি স্বদত্তই হউক, আর অন্য-দত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্ ভোজবর্ম্ম-দেব-পাদীয় সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে, (৫৮) নি (বদ্ধ)। অনু। মহাক্ষ (পটলিক) নি (বদ্ধ) (৫৯)।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

শিখধর্ম্মের উন্মেষ

গুরু নানকের সময় হইতে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেমন সকল অবস্থার সঙ্ঘাতে ও কি ভাবে শিখধর্ম্মের উন্মেষ ও নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহারই বিশ্লেষণ ও ইতিহাস-কথা এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত। ডাক্তার নারাঙ্গ এক জন মনীষী ও মেধাবী লেখক। তিনি অল্পের মধ্যে বেশ গুছাইয়া ভারতেতিহাসের একটা বড় ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভারতের বিদ্বজ্জন-সমাজ তাহার

(৫৭) 'বিষ্ণুচক্রমুদ্রয়া'—এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপির যে পাঠ আম্বলি সাহেবের জন্য প্রমথ বাবু আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং যাহা এখনও তাঁহাদের নিকটই আছে, সেই পাঠে আমি অনবধানতাবশতঃ 'বিষ্ণুচক্র' শব্দটিকে 'বিষ্ণুবক্ত্র'রূপে লিখিয়া দিয়াছিলাম। 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে শব্দটি 'বিষ্ণুবক্ত্র'রূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং অনুবাদেও 'with the royal seal of Vishnu's face' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৫৮) 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে সন এবং তারিখ যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয় নাই। 'সংবৎ ৫' কে 'সংবৎ ৫১' পাঠ করিয়া, শ্রীযুত ভট্টশালী মহাশয় ভোজবর্ম্মদেবের রাজ্যকাল দীর্ঘ ছিল বলিয়া এক ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। উৎসর্গের দিবসটিও ['১৯' স্থলে] '১৪' বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৫৯) এই তাম্রশাসনের শেষের সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে ঠিক উদ্ধৃত হয় নাই, অনুবাদেও ব্যাখ্যাত হয় নাই। তাম্রপট্টে 'অনু'তে 'ণ' দৃষ্ট হয় না। প্রথম 'নি' অক্ষরটি (রাজা কর্ত্তৃক) নিবদ্ধ হইল, অনু [তৎপশ্চাৎ] মহাক্ষপটলিক (রাজলেখ্য-রক্ষক) কর্ত্তৃক নিবদ্ধ হইল, এইরূপ অর্থ সূচিত করিতেছে।

* *Transformation of Sikhism. By Dr. G. C, Narang. Pushtak Bhandar, Lohari Mandi, Lahore. Price Rs. 2.*

পুস্তক পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। এইবার পুস্তক-গত ইতিহাসের একটু আলোচনা করিব।

কোনও উন্নত ও সুসভ্য জাতির মধ্যে যখন দেশাত্মবোধের ভাবটা ভোগায়তন দেহের তোষণ পোষণ জন্য অপেক্ষাকৃত সঙ্কোচলাভ করিতে থাকে, যখন বিলাসজন্য সমাজশরীরে স্থবিরতা প্রবেশ করে; যখন সমাজের ব্যষ্টি, সমষ্টির কল্যাণচিন্তায় উদাসীন হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডীটি বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করে; যখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কপটতা ও শঠতা সামাজিক-গণের অঙ্গের ভূষণস্বরূপ হয়; যখন ঐশ্বর্য্যভোগই মনুষ্যত্বের নিদানস্বরূপ পরিগণিত হয়;—তখনই সেই উন্নত সমাজের অধঃপতন সূচিত হয়, তখনই এক প্রবল নবীন জাতি সেই পুরাতন জাতিকে পরাজিত করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমায় সহস্র বৎসরকাল ভারতবাসী এশিয়া মহাদেশকে যেন মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। জগদ্ব্যাপী ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের উপভোগ করিয়া ভারতবাসীর অধঃপতন ঘটে, বৌদ্ধধর্ম্ম ম্লানদ্যুতি হইয়া পড়ে। এই সময়ে নবীন হিন্দুত্বের উদ্ভব হয়। এ হিন্দুত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত আপোষমত, সমাজ-শরীরের দুরারোগ্য রোগসমূহকে চাপা দিয়া উহার তীব্রতার হ্রাস করিবার চেষ্টা-মাত্র। এই নবীন হিন্দুত্বের প্রভাবে ভারতের সমাজ-শরীরে মৃতসঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হয় নাই; ভারতবাসী বিলাসের স্থবিরত্বকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, নবভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া, নূতন সাধনায় ব্রতী হইতে পারে নাই। ফলে, হূণ শকরাদি বর্ব্বরজাতি সকল ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছিল; তোরাণশা ও মিহিরকুলের পদতলে ভারতবাসীকে সংক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছিল; ভারতের অপচীয়মান জাতি-শক্তি যেন অধিকতর সঙ্কোচলাভ করিয়াছিল। তাহার পর, নবভাবোদ্ধত, নবশক্তিসম্পন্ন, নবধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ, জিগীষা-পরায়ণ হইয়া, এবং স্বধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া, ভারতে প্রবেশ করিল। স্থবির ভারতবাসী—সহস্র বৎসরের বিলাসজীর্ণ, স্বার্থান্ধ ভারতবাসী এই দুর্দ্দার ইস্‌লাম-প্রবাহতরঙ্গে, জলে বালুকা-বিলয়ের ন্যায় যেন মিশাইয়া গেল; ভারত চিরকালের জন্য পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল কণ্ঠহার করিয়া পরিধান করিল।

কিন্তু যে জাতির মেরুদণ্ড ভগ্ন না হয়, যে জাতির বনীয়াদ মজবুত থাকে, সে জাতি এমন জগদ্বিপ্লবের সময়ে হেঁটমুখে তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করে বটে, পরন্তু প্রবাহবেগ একটু স্থির হইলে, আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা

করে। "আমি আছি"—এই জ্ঞানটুকু যতদিন প্রদীপ্ত থাকিবে, ততদিন সে জাতি মরিবে না। এই বোধই জাতির মহাপ্রাণ, পরমাত্মশক্তি। পাঠান-মুসলমানগণ ভারত-কুসুম-কাননকে মত্তমাতঙ্গযূথের ন্যায় দলিত মথিত পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাননকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ভারতবক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। উদ্‌ভ্রান্ত ও বিহ্বল ভারত নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্যের মুখে সর্ব্বাগ্রে "আমি আছি" এই অভয়বাণী শুনিয়াছিল। এই বিশাল জগদ্ব্যাপী সংঘর্ষে ভারতের ভারতীয়তা যে পারস্য, তাতার, মিশর, গান্ধারের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হয় নাই, এই সুসমাচারটুকু নানক প্রমুখ ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবাসীকে সর্ব্বাগ্রে শুনাইয়াছিলেন। প্রথম পাঠান-উপপ্লবের পর হইতে হিন্দু ভারতকে আত্মরক্ষার জন্য অহরহঃ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। তখন সমাজের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই, সমাজ-অঙ্গের রোগ-উপশমের জন্য কাহারও চিন্তা হয় নাই। যখন মুসলমান ভারতে স্থায়ী হইয়া বসিলেন, যখন হিন্দু মুসলমানে একটা চলনসহি বুঝা-পড়া হইয়া গেল, তখনই হিন্দুসমাজের আত্মবোধ যেন একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তখন যেন সমাজদেহের মহাপ্রাণ বলিয়া উঠিল,—যখন বাঁচিয়া আছি, তখন এমন করিয়া—এমন পক্ষাঘাতপঙ্গু রোগীর-মত, অর্দ্ধমৃত-অর্দ্ধজীবিত-ভাবে বাঁচিয়া থাকি কেন? যখন আছি, তখন থাকার মত থাকিব। ইহাই গুরু নানকের শুভ-বার্ত্তা, ইহাই গুরু নানকের অভয়বাণী।

ভারতে প্রথম মুসলমান-উপপ্লবের পর হইতে একে একে ভারতের সকল প্রদেশেই যে কি ভীষণ যুগ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা এখন অনুমান করিয়া উঠিতে পারি না। হিন্দুকে যেন মুছিয়া চাঁচিয়া ফেলিবার জন্য পাঠানগণ প্রাণপণ করিয়াছিল। হিন্দুর দেবমন্দির সকল, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, চতুষ্পাঠী, গ্রামচত্বর প্রভৃতি শ্লাঘার সর্ব্বস্ব একেবারে ধূলিসাৎ করা হইয়াছিল। এই উপদ্রবটা পঞ্জাবে একটু অধিকমাত্রায় ঘটিয়াছিল; পঞ্জাব এ বিপ্লবের প্রথম ঢেউ খাইয়াছিল; পঞ্জাবের পুরাতন হিন্দুসমাজের বনীয়াদ পর্য্যন্ত যেন টলিয়া গিয়াছিল। গুরু নানকের পূর্ব্বে কাশীতে রামানন্দ, উত্তর-ভারতে গোরক্ষনাথ ধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও সাধনা-পদ্ধতি পঞ্জাবের উপযোগী হয় নাই। ধর্ম্মের প্রভাবে লোকে যদি কেবল সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের রক্ষা কে করিবে? গোরক্ষনাথ যোগ-

ধর্ম্মের প্রচার করিলেন; তাঁহার শিষ্যগণ বড় বড় যোগী হইয়া হিমালয়ের কন্দরে আশ্রয় লইল। রামানন্দ ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিলেন; তাঁহার শিষ্যগণ রামভক্ত হইয়া সংসারবিলাস ত্যাগ করিল। কবীর নিজে সংসারী গৃহস্থ হইলেও, তিনিও ত্যাগের ও সন্ন্যাসের মহিমার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যুগ্র ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার করিয়া ত্যাগ ও সন্ন্যাসের মহিমা বাড়াইয়া গিয়াছিলেন। গুরু নানক ইহার কোনও একটা পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি সাধন ভজনকে বড় করিয়াছিলেন বটে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমকেও বড় করিয়া গিয়াছেন। গুরু নানক পুরাতন জাতিভেদকে উঠাইয়া একবার সমাজের সকল স্তরকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে সত্যের ও সাধুতার সমাদর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, যতী সন্ন্যাসী নাই, হিন্দু মুসলমান নাই, যে সাধু, সেই বড়; যে কপট, সেই হীন, হেয়, অন্ত্যজ। সত্যের ও সরলতার আদর করিয়া, কপটতা ও মিথ্যার নিন্দা করিয়া, উদার উন্নত ঈশ্বরভক্তিকে শিরোধার্য্য করিয়া, গুরু নানক একটি নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী ছিলেন; তিনি জাতি-বিচার করিতেন না, কর্ম্মপদ্ধতি মানিতেন না।

কিন্তু কেবল ধর্ম্ম গড়িলেই হয় না, মানুষ গড়িতে হয়। ইচ্ছা করিলে মানুষ গড়া যায় না। সাধক ভাবুক অনেক হয়, ত্যাগী সন্ন্যাসী অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু কর্ম্মবীর সাধক, যাহার কর্ম্মপ্রভাবে উচ্চ নীচ সমান হইবে, সমাজের শিথিলীকৃত অঙ্গ সকল এক সূত্রে গ্রথিত হইবে,—ইচ্ছা করিলেই কেহ গড়িয়া তুলিতে পারে না। যখন সমাজ-সমুদ্র মথিত হইতে থাকে, যখন আর্ত্তের—পীড়িতের—সর্ব্বস্বহীনের কাতর ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিয়া যায়, তখনই তিনি আসেন। গুরু নানকের পরে আরও আট জন গুরু প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল শিখ-সমাজকে সাধনার ও ধর্ম্মের বেদীতে শক্ত করিয়া বসাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা কেহই শিখগণকে জাতিতে পরিণত করিতে পারেন নাই। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এই অসাধ্য-সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনিই শিখগণকে জাতিতে—'নেশনে' পরিণত করিবার প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জর্ম্মণ-দেশের সমাজতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতগণের Theory of Nationalisation

বা জাতিতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি পড়িয়া, গুরুগোবিন্দের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, গোবিন্দ সিংহ রাষ্ট্রীয়তার পদ্ধতি জানিতেন। অথবা বলিব কি, নিত্য সত্যের সমাচার সকল তাঁহার তপঃসিদ্ধ মস্তিষ্কে স্বয়মেব প্রতিভাত হইয়াছিল। শিখগণকে সমরকুশল করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদিগকে জাতিতে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষায়, গোবিন্দ সিংহ তিনটি উপায় অবলম্বন কবিয়াছিলেন ঃ—

(১) শিখমাত্রকেই তিনি সিংহ উপাধি দিয়া রাজপুতদিগের তুল্য করিয়া তুলিলেন।

(২) শিখ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার করিলেন। ইহাকে পাহুন বলে।

(৩) শিখদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেশ, কাঙ্গা (চিরুণী), কড়া, কৃপাণ ও কচ্ছ—এই পঞ্চ ক-কারে তাহাদের পরিচ্ছদ নির্ণীত হইল।

স্বধর্ম্মীদের মধ্যে অভিবাদনের ভাষাও স্বতন্ত্র হইল। এই ভাবে গুরুগোবিন্দ শিখদিগকে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রচিত দশম গ্রন্থে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সম্মিলিত করিয়া লইলেন। কৃপাণ প্রতীকে মায়ের পূজা করিবার উপদেশ দিলেন। ভাগবত হইতে কংসবধ, রামায়ণ হইতে রাবণ-বধ, মহাভারত হইতে পাণ্ডব-বিজয়-গাথা সকল তিনি ধর্ম্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত করিলেন। হিন্দী ভাষায় পৌরাণিকী কথা সকল ভাষান্তরিত করিয়া, মুখে মুখে তাহার প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। গো-স্ত্রী-গৃহ-ক্ষেত্র,এই চারিটির রক্ষার জন্য তিনি শিখগণকে উপদেশ দিলেন। জয়দেব-রচিত দশাবতার-স্তোত্র শিখধর্ম্মের গাথার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

এইরূপে তিনি শিখসম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়তার ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। বন্দার হাতে শিখসম্প্রদায়কে সমর্পণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি ত সাধ্যমত ভাল ধাতুর তরবারি গড়িয়াছি, তুমি ইহার ব্যবহার করিয়া দেখ, উহা চোট সহে কি না। এখন আঘাত সহ্য করিবার সময় আসিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের ভীম ভয়ানক আঘাত সহ্য করিয়া দেবীর কৃপাণ, এই শিখ জাতি, যদি টিকিয়া যায়, তবে জানিও, উহারা বড় হইবে। ইহার জন্য তোমাকে সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। দেহ মনঃ প্রাণ স্নেহ মমতা—ইহকালের সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। তিন শত বৎসরের

কারিগরির হাতিয়ার কেমন হইল, তাহার যাচাই করিয়া লইতে হইবে।" বন্দা তথাস্তু বলিয়া শিখজাতির নেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং সত্যই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া উহার পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। ইতিহাসের সে পৃষ্ঠা অত্যন্ত মর্ম্মদাহিনী, অত্যন্ত ভীষণ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও বান্দার পরিণাম পড়িতে পড়িতে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে। বান্দা ধৃত হইয়া সদলবলে সম্রাট সম্মুখে নীত হন।—

"He was dragged from his cage like a wild beast and then dressed in a princely robe embroidered with gold and a scarlet turban. The heads of his followers, who had been previously executed, were paraded on pikes all round him. The executioner with drawn sabre stood behind him in readiness to carry out the sentence of the Judges. All the Omerahs of the Court tauntingly asked him why he, a man of such unquestionable knowledge and abilities had committed such outrageous offences. He retorted that he was a scourge in the hands of the Almighty for the chastisement of evil-doers and that power was now given to others to chastise him for his transgressions. His son was now placed on his lap and he was ordered to cut his throat, a knife being handed to him for that purpose. He did so silent and unmoved; his own flesh was then torn with red hot pincers, and amid these torments he expired."

অর্থাৎ, বন্য জন্তুর ন্যায় পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া বন্দাকে সম্রাট ফরোক শেয়ারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল; বন্য জন্তুর মতন তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া রাজপরিচ্ছদ পরাইয়া দেওয়া হইল। সে রাজ-পোষাক পরিয়া, রক্ত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন তাহার সম্মুখ দিয়া একে একে তাহার বীর শিখ সহচরবর্গের মুণ্ড ভল্লে গ্রথিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। নির্নিমেষনেত্রে বন্দা দেখিল, যাহারা তাহার বল বুদ্ধি ভরসা ছিল, যাহারা শিখ সম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, তাহাদের সকলেরই ছিন্ন মুণ্ড, সিপাহীরা যেমন কাতার দিয়া দাঁড়ায়, তেমনই ভাবে কাতার দিয়া ভল্লোপরি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। মুক্ত-কৃপাণ-হস্ত ঘাতুক তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে, ইঙ্গিত পাইলেই এক আঘাতে বন্দার সজীব দেহ হইতে মুণ্ড পৃথক করিয়া দিবে। এমন অবস্থায় সম্রাটের

আমীর ওমরাহগণ ব্যঙ্গস্বরে বন্দাকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এমন পণ্ডিত, এত বড় যোধ পুরুষ, তুমি এমন কাজ করিলে কেন? নির্ভীক বন্দা তখনও উত্তর করিল,—দেখ, আমি ভগবানের হস্তের সম্মার্জ্জনী, সংসার হইতে পাপ তাপ দূর করিবার জন্য আমি আসিয়াছি। কিন্তু মনে হয়, আমি আমার কর্ত্তব্যে কোনও প্রকার ত্রুটী করিয়াছিলাম, তাই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। এইবার বন্দার শিশু পুত্রকে বন্দার ক্রোড়ে দেওয়া হইল, এবং বন্দার হস্তে একখানি ছুরী দিয়া বলা হইল, তুমি স্বহস্তে উহার কণ্ঠচ্ছেদ কর। নীরবে বন্দা সম্মুখের সারিবদ্ধ স্বজনগণের মুণ্ড-শ্রেণীর প্রতি তাকাইল; নীরবে পুত্রমুখ দর্শন করিল; অকম্পিতহস্তে নীরবে সেই শাণিত ছুরিকার দ্বারা পুত্রের কণ্ঠচ্ছেদ করিল। পুত্রের শোণিতে তাহার বক্ষঃস্থল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তখন অগ্নিদগ্ধ লোহিতাভ চিম্‌টা আনিয়া বন্দার দেহ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া বাহির করিতে আরম্ভ করা হইল, উত্তপ্ত অগ্নিসম শলাকার সাহায্যে বন্দার দুইটি চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলা হইল। এইবার বন্দা হাসিল; দুই বাহু তুলিয়া, অন্ধ নেত্রযুগল উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া বলিল,—ধন্য তুমি করুণাময় নারায়ণ, তোমার কৃপায় এখন আমি তোমা ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। স্থিরদামিনী জগন্ময়ী নারায়ণের প্রতিমা মানসপটে দেখিতে দেখিতে বন্দা দেহত্যাগ করিল। সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিল, গুরু গোবিন্দের নির্ম্মিত ভবানীর কৃপাণ শিখ সম্প্রদায় কাঁচা লোহার অস্ত্র নহে। গুরুগোবিন্দের "টেগ" বা কৃপাণ কেমন?

> "ভুজদণ্ড-অখণ্ডম্ তেজ প্রচণ্ডম্।
> জ্যোতিমণ্ডম্ ভানুপ্রভম্।
> সুখশান্তিকারণম্ কিল্বিষহরণম্।
> দুর্ম্মতিদারণম্, অতিশরণম্।
> জয় জয় জগকারণ সৃষ্টি উভারণ,
> মম প্রতিপালনম্ জয় টেঘম্।"

ইহাই গুরুগোবিন্দের খড়্গস্তুতি, হিন্দী ও সংস্কৃতে মিশ্রিত। এই স্তোত্র এখনও অমৃতসরের কনকমন্দিরে নিত্য গীত হয়।

বন্দার মৃত্যুর পর খালসার পুষ্টি, মিসল্ বা শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়ে শিখদিগের উপর অতিমাত্রায় উৎপাত উপদ্রব আরব্ধ হইয়াছিল। শিখ দেখিলেই তাহাকে কাটিতে হইবে, যে কাটিবে, সেই

বখ্‌শিস্‌ পাইবে। স্ত্রী, পুরুষ, শিশুর বিচার ছিল না। এই সময়ের শিখগণ রঙ্গ করিয়া বলিতেন, আমরা যেন উলু ঘাস্‌, মোগল যেন কাস্তে, আমাদের যত কাটে, আমরা তত বাড়িয়া উঠি। বন্দার মৃত্যু ব্যর্থ হয় নাই, সে দৃষ্টান্তে শিখজাতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল, সবাই শিখের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। একটা শিখ মরিলে যেন তাহার স্থানে দশটা শিখ-সিংহ গজাইয়া উঠিতে লাগিল। শিখ-দমন কার্য্যে মোগলকে হার মানিতে হইল। নাদির শাহের ভারত-আক্রমণ, আমেদ শাহ আবদালির অভিযান সকল শিখজাতির পুষ্টির পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিল। যাহারা মরিতে জানে, তাহারাই বাঁচিতে পারে। বন্দা শিখদিগকে মরিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাঁচিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হকিকৎ রায়ের ন্যায় বালকেও হেলায় ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। পঞ্জাবের হিন্দীকবি কালিদাস হকিকৎ রায়ের ঘটনা অবলম্বনে যে কাব্যের রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অতুলা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই ভাবে শিখজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জাতিকে পাইয়া মহারাজ রণজিৎ ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দুরাকাঙ্ক্ষা বলিলাম, কেন না, বিধাতা এই আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। বন্দার মৃত্যুর পর শিখসমাজে আর এক জন কর্ত্তা রহিলেন না। গুরুগোবিন্দের পর শিখসমাজে আর গুরু হয় নাই; বন্দা গুরু ছিলেন না, তবে গুরুবৎ পূজিত হইতেন। ইহার ফলে, শিখগণের প্রভাববিস্তারের কালে শিখসমাজে তেমন জমাটের ভাব বজায় রহিল না। ফলে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিখপ্রধানগণ বিলাসী হইয়া পড়িলেন। আর রণজিৎ সিংহের উদ্ভবের পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজশক্তি ভারতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফলে শিখ-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা স্বপ্নের খেয়ালেই রহিয়া গেল। পরন্তু যে উপাদানে গুরু গোবিন্দ শিখসমাজে মানুষ গড়িয়াছিলেন, সে উপাদান এখনও বজায় আছে; তাই পঞ্জাবের জাঠশিখগণ যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না, রাজপুত ক্ষত্রিয়ের দোসর স্বরূপ তাহারা এখনও যুদ্ধব্যবসায়ী হইয়া আছে।

এই সকল কথা সংক্ষেপে ও অতি সরলভাবে ডাক্তার নারাঙ্গের পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা অল্পের মধ্যে শিখসমাজের খবর লইতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। মনে সাধ যায়, এমন পুস্তক বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপঢৌকন দিই।

বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়া ভারতের ভাবনা ভাবিতে ভুলিয়াছেন, ভারতের সমাচার রাখেন না। বাঙ্গালী এখন ইউরোপের ভাবে মুগ্ধ। তাই এখন প্রাদেশিক-কথাপূর্ণ পুস্তক সকল বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত করিলে, বাঙ্গালী পাঠক উহা পাঠ করিলে, ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী ভারতের অন্য সকল প্রদেশকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালীর মধ্যে ডাক্তার নারাঙ্গের পুস্তকের আদর হইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

চীন-কাহিনী।

পিকিনের সমস্ত রাজপথ পূর্ব্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। পিকিন হইতে চারি ক্রোশ দূরে সম্রাটের গ্রীষ্ম-প্রাসাদ। ইহার নাম ইউয়েন-মিং-ইউয়েন। এই স্থান পরম রমণীয়; পদ্মহ্রদের তটে অবস্থিত। হ্রদে একটি মর্ম্মর-সেতু। প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সহিত শিল্পসুষমা-বৈভবের অপূর্ব্ব সমাবেশ,—যেন 'সোনার উপর মিনের কাজ'। এই গ্রীষ্ম প্রাসাদে কোনও ইটালীদেশীয় চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি চিত্র দেখিয়াছি। তাহার পরিকল্পনা অত্যন্ত সুন্দর। অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী রূপের প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া মেষপাল চরাইতেছে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত প্রান্তর; মধ্যে মধ্যে দুই একটি বৃক্ষ। প্রখর রবিকরে তাপিত হইয়া কুমারী বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মেষগুলিও যেন অসহ্য উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়া কুমারীর নিকটে আসিয়া শয়ন করিয়াছে। কুমারীর আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান, ঈষৎ বায়ুসঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মুখে গভীর চিন্তারেখা। যুবতী বামকরে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না। চিত্রকরের তুলিকাকৌশলে কুমারীর মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেষশাবকগুলি যেন যুবতীর বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া রোমন্থনে বিরত। এ চিত্রের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। দুই ইঞ্চি পুরু, মানুষের সমান উচ্চ একখানি কাচের অপর দিকে চিত্রখানি অঙ্কিত। চিত্রখানি দেখিয়া আমার নিতান্ত নীরস মনেও কবিত্বের উদয় হইয়াছিল। ইটালীয়ান-গণ এক সময়ে চিত্রশিল্পে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; সুতরাং মনে

হয়, সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ফল তাহাদের আকারেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। যত ইটালীয় দেখিয়াছি, সকলেই সুপুরুষ; সুনীল ভ্রূযুগ, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, যেন তুলিকায় চিত্রিত! সাধারণ ইটালীয় সৈন্যদিগের মধ্যেও কখনও কুৎসিত দেখি নাই। আমার মনে হয়,—যে জাতি চিত্র-শিল্পে যত উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের আকৃতিও তদনুপাতে উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।

সম্রাট ইয়াং-লোর সমাধিমন্দির পিকিন হইতে প্রায় সাড়ে এগার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহা ত্রিতল, এবং প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ। প্রথম তলে একখানি প্রকাণ্ড সমাধি-প্রস্তরফলক, এবং সম্ভবতঃ ইহারই নিম্নে সম্রাটের কবর। খিলানদ্বার দিয়া এই সমাধিস্থানে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার ছাত হরিত বর্ণে রঞ্জিত, সোনালী রঙ্গে উদ্ভাসিত।

গ্রীষ্মকালে শশা, মূলা, পেয়ারা, খোবানী ও ছোট ছোট কালো কুল পিকিনের বাজারে প্রচুরপরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।

তিয়েন-সিনে অবস্থানকালে গরম জল বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি। দরিদ্র লোকে কাঠ কিনিতে পারে না, অথচ সে গরম জল না হইলেও চলে না। সুতরাং ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ।

তিয়েন-সিনের চীন সহরও প্রাচীর-বেষ্টিত। আবার সমস্ত সহরের চতুর্দ্দিকে মাটীর বাঁধ। বাঁধের বাহিরে পরিখা। সাঙ্-কো-লিন-সিন নগররক্ষার জন্য এই বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; কিন্তু চীনেরা বিদ্রূপচ্ছলে ইহাকে "সাঙ-কো-লিন-সিনের মূর্খতা" নামে অভিহিত করে। এই বাঁধের নির্ম্মাণে যথেষ্ট অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের চাঁদায় এই বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চীন দেশে বালক-সমষ্টি লইয়া বিদ্যালয়ের শ্রেণী গঠিত হয় না। এক একটি ছাত্র লইয়া এক একটি শ্রেণী কল্পিত হইয়া থাকে। ছাত্রেরা শিক্ষকের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া পাঠ আবৃত্তি করে। মুখস্থ করিবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য; এক একটি বালক একখানি বহির আদ্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারে। নীতি-শিক্ষাদান শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে উহা যেন কর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। নীতিশিক্ষা ব্যতীত চরিত্র গঠিত হয় না। চরিত্রগঠন ব্যতীত যে কোনও জাতি কস্মিন্ কালেও জাতি নামে পরিচিত হইতে পারে না, তাহা আমরা কবে বুঝিব?

শিক্ষককে চীন ভাষায় সিয়েন-সুন বলে। বি. এ.র সমান ডিগ্রীকে "ছিউ-ছি" বলে; ইহার অর্থ, যাহার মেধা বিকশিত হইয়াছে। এম. এ. উপাধির তুল্য "কিউ-জিনে"র অর্থ,—অত্যধিক উন্নত মেধাশালী। ইহার পরের ডিগ্রী ডি এল্.-এর সমান। নাম স্মরণ নাই।

প্রধান মাজিষ্ট্রেটকে শান্-তি-এন্-কু বলে। কিউজিন ডিগ্রী না পাইলে কেহ জেলার মাজিষ্ট্রেট হইতে পারে না। চীন দেশে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে 'কু-ইউয়েন' বলে।

চীনেদের একখানি বিরাট গ্রন্থ আছে; ইহার নাম 'টু-শু-জি-টাং'। ইহাকে চীনের সাহিত্য-কল্পদ্রুম বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ পাঁচ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত পুস্তকের সারমর্ম্ম ও দেশের মানচিত্রাদি আছে।

চীনেদের নামের কার্ড লোহিতবর্ণ। ইহার পশ্চাতে ঠিকানা লিখিত থাকে।

চীনে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু যৌবন-বিবাহই সমধিক প্রচলিত। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বহু-বিবাহ অপ্রচলিত। সাধারণতঃ ঘটক বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকে। কনেকে বরের বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। কখনও কখনও ক'নের বাড়ীতেও বিবাহ হইয়া থাকে। রক্ত-রেশম-মণ্ডিত চেয়ারে উপবেশন করিয়া কনে স্বামীর বাড়ীতে যায়। বিবাহের তিন দিনের মধ্যে কোনও আগন্তুকের সঙ্গে কনে কথা কহিতে পারে না; ত্রিশ দিনের মধ্যে পিত্রালয় ব্যতীত বাহিরে কোথাও যাইতে পারে না। চীন দেশে অবরোধপ্রথা নাই। আমাদের দেশে যেমন বিবাহান্তে তত্ত্ব ও যৌতুকাদি পাঠাইবার নিয়ম আছে, চীনদেশেও সেইরূপ কনে ও বরের বাড়ীতে চেয়ার, টেবিল, বড় আয়না, ফুলদান, বাতিদান, খেলনা ইত্যাদি যৌতুক বিচিত্রবর্ণপরিচ্ছদধারী বাহকের দ্বারা প্রেরিত হয়। বাহকগণ মাথায় লালপালকযুক্ত মোচাকৃতি নামদার টুপী পরে।

চীন দেশেও আমাদের দেশের মত কন্যাসন্তানের আদর অল্প। চীনেরা এখনও শিশুহত্যা করে। শুনিয়াছি, ভারতবর্ষে রাজপুতানাতেও এই নৃশংস প্রথা অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত আছে; তবে লোকানুপাতে তাহা সামান্য বলিয়াই মনে হয়। স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী, কিন্তু গৃহকর্ম্মে স্ত্রীই "সর্ব্বে-সর্ব্বা"। গৃহস্থালীতে স্বামীর হুকুম খাটে না। অস্বাভাবিক

উপায়ে শিশুকন্যার পা ছোট করিয়া জোর করিয়া সুন্দরী করিবার প্রথা ছিল, কিন্তু চীনের নব অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই আসুরিক নিয়মও তিরোহিত হইয়াছে। প্রবাদ এই, তৃতীয় শতাব্দীতে সিন রাজবংশের "তা-কি" নাম্নী এক রাজ্ঞী স্ত্রীলোকদের পা ছোট করিবার জন্য সম্রাটকে দিয়া এই রাজাজ্ঞা প্রচারিত করেন যে, "রাজ্ঞীর ক্ষুদ্র পদের আদর্শে চীনের সকল স্ত্রীলোকের পদ ক্ষুদ্র করিতে হইবে।" কেহ বলেন, উক্ত রাজ্ঞী পদ্মোপরি নৃত্য করিতে পারিতেন বলিয়া স্ত্রীলোকগণ ক্ষুদ্র পদের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়া পা ছোট করিতে আরম্ভ করেন। চীনদেশে তাতার স্ত্রীলোকেরা কৃত্রিম উপায়ে পা ছোট করিত না। রাজপরিবারেও এই প্রথার অস্তিত্ব ছিল না।

চীনেরা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। সমগ্র জান্তব পদার্থই তাহাদের খাদ্য-মধ্যে পরিগণিত। জগতের প্রত্যেক জাতি কোনও না কোনও বস্তুকে অখাদ্যরূপে গণ্য করে। কিন্তু এই জাতির নিকট খাদ্যবিচার বিদ্রূপাস্পদ। ইহাদের মধ্যে জাতিবিচার নাই।

চীনেরা চা সুগন্ধি করিবার জন্য নানা প্রকার সুরভি পুষ্পের পাপড়ী চা'য়ের সহিত মিশাইয়া থাকে। চীনের চা সৌরভে মন হরণ করে। চীনের "গ্রীন টী" জগদ্বিখ্যাত।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, চীনের সকল স্ত্রী-পুরুষেরই নাক খাঁদা। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। আমরা বড়-ঘরের কতিপয় স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, তাঁহাদের নাসিকা বেশ সমুন্নত, তবে চক্ষু দুটি ঈষৎ ক্ষুদ্র। রূপের কথা আর কি বলিব? বিধাতা যেন "চাঁদ নিঙ্গাড়ি' কইল দেহা!" ঈষৎ দীর্ঘ দেহযষ্টি, গঠন-সুষমাও কবি-বর্ণনার অনুরূপ। মৃণাল ভুজ, কেশরী জিনিয়া কটী, ও সুন্দর চরণকমল, আপাদলম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ, ঈষৎরক্তিমাভ নিটোল মুখ।

শ্রীআশুতোষ রায়।

আকবর শাহের হিন্দু সেনাপতি।

১

মোগলকুলরবি আকবর শাহ পরাক্রান্ত সম্রাট। তিনি ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। আকবর শাহ হিন্দু মুসলমানে সমদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গৌরবান্বিত সাম্রাজ্যের গঠন কার্য্যে হিন্দুর বাহুবল অনেকপরিমাণে কার্য্যকর হইয়াছিল। বহুসংখ্যক হিন্দুবীর আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আকবর শাহের গৌরববর্দ্ধনের জন্য সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। আকবর শাহের ৪১২ জন সেনাপতির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আমরা ৫৫ জন হিন্দু সেনাপতির নাম দেখিতে পাই। আমরা এই সকল হিন্দু সেনাপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ব্লকম্যান কর্ত্তৃক সম্পাদিত আইন-আকবরী আমাদের প্রধান অবলম্বন।

রাজা বিহারীমল।

রাজা বিহারীমল জয়পুরের অধিপতি ছিলেন। আকবর শাহ হিন্দু রাজন্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা বিহারী-মলই সর্ব্বাগ্রে আপনার কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। শের শাহের হস্তে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পলায়নকালে বিহারীমল জনৈক মোগল সেনানায়কের উপকার করেন। আকবর রাজ্য-লাভান্তে এই বিষয় অবগত হইয়া বিহারীমলকে স্বীয় দরবারে আমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে বিহারীমল মোগল-রাজসভায় উপনীত হন। বাদশাহ ও রাজা আলাপ পরিচয় করিতেছেন, এমন সময়ে একটি হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অশান্তভাবে দৌড়াইতে থাকে। চতুর্দ্দিগবর্ত্তী লোকজন ভয়-ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু রাজা বিহারীমলের অনুচরগণ আপন আপন স্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। আকবর শাহ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হন, এবং রাজপুত সৈন্যগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে মালবের মোগল শাসনকর্ত্তা জয়পুর রাজ্যের কয়েক জন গৃহশত্রুর সাহায্যে বিহারীমলকে আক্রমণ করেন। জয়-পুর রাজ্য মোগল অধিকারভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর শাহ এই যুদ্ধ রহিত করিবার আদেশ

দেন, এবং রাজা বিহারীমলকে স্বীয় সকাশে আহ্বান করেন। তদনুসারে বিহারীমল মোগল-দরবারে উপনীত হইলে, আকবর শাহ তাঁহাকে পাঁচ-হাজারী সেনাপতির পদে বরণ করেন, এবং এই বন্ধন সুদৃঢ় করিবার মানসে বিহারীমলের দুহিতৃরত্নের পাণিপ্রার্থী হন। রাজা বিহারীমল বাদশাহের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যা অর্পণ করিয়াছিলেন। আগ্রা নগরীতে বিহারীমলের মৃত্যু হইয়াছিল।

রাজা ভগবান দাস।

রাজা ভগবান দাস রাজা বিহারীমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার ন্যায় পুত্রও আকবর শাহের এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজা ভগবান অতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যশালী ছিলেন একবার যুদ্ধক্ষেত্রে আকবরের জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন। আকবর শাহ ইদরের রাণার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে রাজা ভগবান দাস অতিশয় প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েন। বাদশাহ তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে পঞ্জাবের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত, এবং পাঁচ-হাজারী সৈনাপত্যে উন্নীত করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েন, এবং তরবারি দ্বারা আপন দেহে আঘাত করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মোগল দরবারস্থ হাকিমদের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার দুরূহ রাজকার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে থাকেন। ৯৯৮ হিজিরী অব্দের প্রথম ভাগে লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজকুমার সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রাজা মানসিংহ।

মানসিংহ ভগবান দাসের পুত্র, এবং আকবরের পুত্র সেলিমের শ্যালক। আকবর যে সকল রাজপুত বীরকে গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তন্মধ্যে মানসিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বাহুবল আকবর শাহের প্রবল প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণস্বরূপ ছিল। গুণগ্রাহী আকবর শাহ তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, ফরজন্দ নামে সম্বোধন করিতেন। ফরজন্দ শব্দের অর্থ,—পুত্র। ৯৮৪ হিজিরী অব্দে আকবর শাহ রাণা কিকা নামক এক জন রাজপুত রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সৈন্য মানসিংহের সৈনাপত্যাধীন ছিল। মোগল সৈন্য গোগন্দ নামক স্থানে,

রাজপুত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। প্রবল যুদ্ধের পর রাজপুত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়। মানসিংহের এই প্রথম যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার এই প্রথম-লব্ধ যশোরাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে তাঁহাকে আকবর শাহের সেনাপতিকুলের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

গোগনদ যুদ্ধের পর মানসিংহ সেনানায়ক-রূপে পঞ্জাবে গমন করেন। তৎকালে তদীয় পিতা রাজা ভগবান দাস এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। পঞ্জাবে মানসিংহ নানারূপে অসাধারণ মনস্বিতা ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় তাঁহার যশোরাশি বালসূর্য্যের কিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।

অতঃপর আকবর শাহ তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। কাবুলের অধিবাসীরা হিন্দুর শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই কারণে আকবর শাহ মানসিংহকে কাবুল হইতে বিহারে স্থানান্তরিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তদীয় পিতা রাজা ভগবান দাস পরলোকে গমন করেন, এবং বাদশাহ মানসিংহকে রাজা উপাধি ও পাঁচ-হাজারী সৈনাপত্য প্রদান করেন। মানসিংহ বিহারে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বিদ্রোহী জমীদারকে বশীভূত করেন, এবং তাঁহার কৃত কার্য্যে বাদশাহ সন্তুষ্ট হন।

অতঃপর মানসিংহ বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দেশে তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘকাল অর্থাৎ একবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। মানসিংহ যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন উড়িষ্যা পাঠানগণের হস্তগত ছিল; বঙ্গদেশেরও অনেক স্থলে মোগলের শত্রুগণ প্রবল ছিল।

"কর্ম্মঠ রাজপ্রতিনিধি খাঁ আজিম, তৎপরে সাহবাজ খাঁ, কেহই শত্রু-বিজিত দেশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে এই আয়াসসাধ্য কার্য্যোদ্ধার জন্য"* রাজা মানসিংহ নিযুক্ত হইলেন। মানসিংহ প্রথমতঃ উড়িষ্যার পাঠানদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহার ফলে পুরী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই পাঠানগণ পুরী আক্রমণ করিল। ইহাতে মানসিংহ উত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন, এবং পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া সমগ্র উড়িষ্যা মোগল-দণ্ডাধীন করিয়া লইলেন। অতঃপর ভাটী অর্থাৎ সুন্দর-

* বঙ্কিমচন্দ্র।

বনের পূর্ব্বাংশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে আপন বিজয়বাহু উত্থিত, এবং রাজমহলের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বঙ্গদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তাঁহার বাহুবলে পূর্ব্ববঙ্গের বিপুল অংশ মোগলরাজের অধীন হইল। মানসিংহ পাঠানদিগকে দমন করিয়া কোচবিহারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কোচবিহারের ভূপতি লক্ষ্মীনারায়ণ বশ্যতাজ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বীয় ভগিনীকে রাজা মানসিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই নব পরিণয়ের অব্যবহিত পরেই রাজা ঘোড়াঘাট নামক স্থানে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। পাঠানেরা সুযোগ দেখিয়া ঘোড়াঘাট আক্রমণ করিল। কিন্তু মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহ তাহাদিগকে অচিরে দূরীভূত করিয়া দিলেন। রাজা মানসিংহ আরোগ্যলাভ করিয়া বাদশাহের আদেশে দক্ষিণাপথের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য গমন করিলেন। অনুপস্থিতি-সময়ে তদীয় পুত্র জগৎসিংহ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অত্যল্প-কালমধ্যেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন, এবং মহাসিংহ (রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র অথবা পৌত্র) প্রতিনিধিত্ব লাভ করিলেন। পাঠান নায়ক ওসমান মানসিংহকে অনুপস্থিত দেখিয়া পুনর্ব্বার অভ্যুত্থিত হইলেন, এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। এই দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা মানসিংহ তাড়াতাড়ি বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন, এবং পাঠানদিগকে সেরপুর আটাই নামক স্থানে পর্য্যুদস্ত করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। পাঠানগণ নিরুপায় হইয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা মানসিংহ পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বাদশাহের সমীপে গমন করিলেন। বাদশাহ তাঁহার কার্য্যে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাত-হাজারী মনসব প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। সাত-হাজারী মনসব কেবল রাজকুমারগণের প্রাপ্য ছিল। আকবর মানসিংহের শৌর্য্য-বীর্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। রাজা মানসিংহ এই অভূতপূর্ব্ব রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে আগমন করিলেন, এবং হিজিরী ১০১৩ অব্দে পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রহিলেন।

অতঃপর মানসিংহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজকুমার সেলিমকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় ভাগিনেয় খুসরুকে মোগল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কৌশলী আকবর মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সেলিমকে সিংহাসনপ্রদানপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিলেন। রাজকুমার সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং মানসিংহের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা সমীচীন বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষেই তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। অতঃপর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বর্ষে তিনি পরলোকগত হইলেন। মানসিংহের পত্নীর সংখ্যা ১৫ শত ছিল। তন্মধ্যে ষাট জন রাণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।

রাজা টোড়রমল ক্ষেত্রী।

রাজা টোড়রমলের জন্মস্থান লাহোর। তিনি দরিদ্র পিতা মাতার সন্তান ছিলেন। টোড়রমল শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে বহুকষ্টে মানুষ করিয়া তুলেন।

টোড়রমল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কেরাণীগিরি কার্য্য লাভ করিয়া মোগল রাজসরকারে প্রবেশলাভ করেন। তিনি অচিরে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মনস্বিতা ও কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া আকবর শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন, এবং ক্রমশঃ পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া অবশেষে আকবর শাহের রাজসভার অন্যতম প্রধান অমাত্যের পদ লাভ করেন।

ক্রমান্বয়ে তিন বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া টোড়রমল বীরকুলের বরেণ্য হইয়াছিলেন। পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁর হস্ত হইতে বঙ্গদেশ কাড়িয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়া আকবর শাহ সেনাপতি মনাইম খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা টোড়রমল তাঁহার সহকারিরূপে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি খান আলম শত্রুহস্তে নিহত হয়েন। মনাইম খাঁর অশ্ব অশান্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু টোড়রমল যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকিয়া বিজয়লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া রাজধানীতে গমন করেন। পাঠানগণ মোগলের নিকট পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় লয়, এবং বঙ্গদেশে নানা প্রকার উপদ্রব করিতে থাকে। এই সংবাদ রাজধানীতে পঁহুছিলে আকবর শাহ জাহা খাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। এবারও রাজা তোড়রমল সহকারিরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। জাহা খাঁ নিহত হইলেন। এই যুদ্ধকালে টোড়রমল অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। ফলতঃ

অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তাঁহারই সাহসে দ্বিতীয় বারও জয়শ্রী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, যুদ্ধ-অন্তে টোড়রমল লুণ্ঠিত সামগ্রী সহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। আকবর শাহ কর্ত্তৃক নূতন রাজস্ব-বিধির প্রবর্ত্তনে বঙ্গদেশে অতি দুর্দ্দম্য রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সম্রাট তাঁহাকে তৃতীয় বার বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। এবার তিনি প্রধান-সেনাপতি-রূপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌশলে ও সাহসে বিদ্রোহিগণ অচিরে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করে।

টোড়রমল দীর্ঘকাল গুজরাটে ছিলেন। এই সময় তিনি বিদ্রোহ-দমনে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ধোলকার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেনাপতি ভিজার খাঁ পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু টোড়রমল তাঁহাকে বাধা দিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মোগল সেনার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

এইরূপ বহু যুদ্ধে ও কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া রাজা টোড়রমল যশো-মন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রাজস্বের বন্দোবস্তই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

৯৯০ হিজিরী অব্দে তিনি রাজস্বমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মোগলশাসনাধীন সমস্ত সাম্রাজ্যের রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত দ্বারা এক দিকে রাজকোষে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, অপর দিকে তৎসমুদয় প্রজার পক্ষেও হিতকর হইয়াছিল। এই রাজস্ব-বন্দোবস্ত উপলক্ষে তিনি ভাষা সম্বন্ধে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। মোসলমানের অধীন রাজস্ববিভাগে হিন্দু কর্ম্মচারিগণের একাধিপত্য ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহারা হিন্দীতে সমস্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করিতেন। রাজা টোড়রমল এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া সমস্ত রাজকীয় হিসাব পারসীতে রাখিবার আদেশ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুদের মধ্যে পারসী ভাষার প্রচলন হয়, এবং উর্দ্দু ভাষা জন্মলাভ করে।

রাজা টোড়রমল অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। এই জন্য অনেক মুসলমান অমাত্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন। টোড়রমল প্রথমতঃ প্রাতঃকালে দেবার্চ্চনা করিতেন; তার পর বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতেন; পরে আহারাদি করিতেন। একবার দিল্লীশ্বরের সঙ্গে পঞ্জাব-গমনকালে দ্রুতগমনবশতঃ

তাঁহার দেবার্চ্চনার বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। এই কারণে তিনি সমস্ত দিন উপবাসী ও সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন। স্বয়ং আকবর শাহ বহু অনুরোধ করিয়াও তাঁহার উপবাসভঙ্গ, অথবা তাঁহাকে কার্য্যে রত করিতে পারেন নাই। তিনি জীবনের সায়াহ্নে সমস্ত বিষয়কার্য্য ও সম্মানে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া গঙ্গালাভের অভিলাষে রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিদ্বারে বাস করেন। রাজা টোড়রমল চারি-হাজারী মনসবদার ছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

তার কথা।

১

হে প্রিয়, ভাবিয়াছিলে,—হয়েছি কাতর
প্রিয়ার মরণে;
তার কথা—দুটি কথা, কথা অবান্তর
কহিনু দু' জনে।

২

হয় ত একটি শ্বাস,—নহে দীর্ঘ স্পষ্ট,
ছিলে তুমি শুনি'।
বলেছিনু,—"বড় কষ্ট!—কি এমন কষ্ট?"
কথা গুণি' গুণি'।

৩

নহি শিশু, নহি নারী,—ছুটি দিশি দিশি
করিয়া ক্রন্দন;
নহি নির্ব্বিকার-চিত্ত জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি—
বিমুক্ত-বন্ধন।

৪

এ দুঃখ বরেণ্য ভূমা—জীবনের সাথী,
মরণ-সম্বল,
অসহ্য, অপরিহার্য্য—বক্ষে দিবারাতি
জ্বলে যজ্ঞানল।

৫

ইষ্ট মন্ত্র কেহ যথা করে না প্রকাশ—
গুপ্ত অতিশয়,
নাহি রয় পবিত্রতা দৃঢ়তা বিশ্বাস,
সিদ্ধি নাহি হয় ;

৬

ধরণী অন্তরে ধরে প্রচণ্ড অনল,
বক্ষে শস্পভার ;
প্রকৃতির ধীর শ্বাস সুবাস-চঞ্চল,
প্রাণে হাহাকার ;

৭

আকাশের ছায়া যথা সমুদ্র-হিয়ায়
রহে সদা পড়ি' ;—
তেমনি তাহার স্মৃতি বিবিধ মায়ায়
মনঃপ্রাণ ভরি' !

৮

উড়ে পাখী, স্রোতে যথা ক্ষুদ্র ছায়া তার
নিমেষে মিলায় ;
অন্য সুখ দুঃখ আজ হৃদয়ে আমার
আশ্রয় না পায়।

৯

এ নয় কল্পনা, তর্ক, কবিত্ব-বিচার,
নিমেষের ভান ;
হয়েছি উন্মত্ত কি না—দুঃখ ধারণার
নহে পরিমাণ।

১০

চক্ষে স্বপ্ন-কুহেলিকা, বক্ষে মরীচিকা,
মৃত্যুর তিমিরে—
নিঃশব্দে তাহার প্রীতি—দীপহীন-শিখা
ধূমাইছে ধীরে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বিদেশী গল্প।

উপেক্ষিতা।

পুরাতন স্মৃতি কি বিচিত্র! শত চেষ্টাতেও ভুলিতে পারা যায় না!

যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহা অতি পুরাতন। এত দিন পরেও তাহার স্মৃতি কি করিয়া আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে উজ্জ্বলবর্ণে মুদ্রিত হইয়া আছে, বুঝিতে পারি না। তদবধি যখনই কোনও করুণ, বীভৎস, বা কুৎসিত দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইত, অমনই বৃদ্ধা বেলফ্লাওয়ারের মুখমণ্ডলের স্মৃতি আমার মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিত। আমার দশম অথবা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাহার যেরূপ মুখাকৃতি দেখিয়াছিলাম, এখনও ঠিক সেই মুখের ছবি নিয়তই আমার মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠে।

বৃদ্ধা সীবনের কার্য্য করিত। সপ্তাহের মধ্যে একবার, প্রতি বৃহস্পতি-বারে আমাদের বাড়ী আসিয়া সে ছিন্ন বস্ত্রাদির সংস্কার করিয়া যাইত। আমাদের বাড়ী গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত। গ্রামটিকে একটি ক্ষুদ্র নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রামের রক্তবর্ণাভ-ইষ্টকরাজি-গঠিত ধর্ম্মমন্দিরটি কালের প্রভাবে মলিন হইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা বেলফ্লাওয়ার প্রত্যেক বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে সাড়ে ছয়টা অথবা সাতটার মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইত; কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিত না। যেমন আসিত, অমনই সূচীকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিত। সে দীর্ঘাকারা, ক্ষীণাঙ্গী; তাহার সর্ব্বাঙ্গে রোমরাজির অত্যধিক প্রাচুর্য্য ছিল। মুখমণ্ডল দীর্ঘ ঘন কুঞ্চিত শ্মশ্রুরাজিতে সমাচ্ছন্ন। দেখিলেই মনে হইত, যেন কোনও বাতুল, স্ত্রীবেশে সজ্জিত পুলিসপ্রহরীর প্রকাণ্ড আননে গুম্ফশ্মশ্রু বসাইয়া দিয়াছে! তাহার নাসিকার উপরিভাগে রোমাবলী, নিম্নভাগে শ্মশ্রুগুচ্ছ, নাসারন্ধ্রমধ্যে, গণ্ডদেশে ও কপোলে অসংখ্য রোম বিরাজিত। বৃদ্ধার ভ্রূযুগলও ঘন দীর্ঘ শ্বেত রোমে সমাচ্ছন্ন। যেন কেহ একযোড়া বৃহৎ গুম্ফ নয়নের উপর ভ্রমক্রমে বসাইয়া দিয়াছে!

সে খোঁড়াইয়া হাঁটিত। কিন্তু খঞ্জগণ সাধারণতঃ যে ভাবে চলে, বৃদ্ধা তেমন ভাবে হাঁটিত না। নোঙ্গর ফেলা অবস্থায় জাহাজ যেমন তরঙ্গাঘাতে দুলিতে থাকে, তাহার গতি সেই প্রকার ছিল। সুস্থ চরণের উপর সে যখন তাহার দীর্ঘ, অস্থিবহুল বক্র দেহের সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া দাঁড়াইত,

তখন বোধ হইত,সে যেন একটা উত্তাল তরঙ্গের উপরে আরোহণ করিতেছে। পর মুহূর্ত্তেই দেখা যাইত, সে যেন একেবারে ভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

তাহার গমনভঙ্গী দেখিলে, অর্থাৎ যখন সে শরীর ও মস্তকের টাল রাখিয়া দাঁড়াইত, তখন লোকের মনে ঝটিকার কথা উদিত হইত। তাহার মস্তকে সর্ব্বদাই একটা বৃহৎ টুপী দেখিতে পাওয়া যাইত; টুপীর ফিতাগুলি পশ্চাদ্দেশে বায়ুপ্রবাহে সঞ্চালিত হইত। তাহার প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে মনে হইত, টুপীটি একবার উত্তর হইতে দক্ষিণে, এবং পুনরায় দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলাফেরা করিতেছে।

আমি বৃদ্ধা বেলফ্লাওয়ারকে মনে মনে পূজা করিতাম। নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা হইতে উঠিয়াই আমি বৃদ্ধার কাছে যাইতাম; দেখিতাম, সে নিবিষ্টমনে সীবন কার্য্যে নিযুক্ত। তাহার চরণযুগল একখানি গরম কাপড়ে আবৃত থাকিত। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেই সে আমাকে গরম কাপড়খানি পাতিয়া বসিতে অনুরোধ করিত। কারণ, সেই বৃহৎ শীতল কক্ষে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিলে আমার সর্দ্দি হইতে পারে।

দীর্ঘ, শীর্ণ, বক্র অঙ্গুলি দিয়া বস্ত্র শেলাই করিতে করিতে সে আমাকে নানারূপ গল্প শুনাইত। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইয়াছিল; এ জন্য সে চশমা ব্যবহার করিত। চশমার অন্তরাল হইতে তাহার চক্ষু দুটিকে অতি দীর্ঘ বলিয়া আমার মনে হইত। তাহার নয়নের দৃষ্টি অতি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ!

সে আমাকে যে সকল গল্প বলিত, তাহাতে আমার শিশু-হৃদয় বিচলিত, মুগ্ধ হইত; ইহাতে বুঝিতে পারিতাম, দরিদ্র হইলেও তাহার হৃদয় অতি মহৎ ও গভীর। সামান্য সামান্য ঘটনার বিষয় সে এমন গুছাইয়া, এমন চমৎকার করিয়া বলিত যে, চিরদিনের জন্য কাহিনীগুলি আমার মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাহিনী নাটকীয় ভাবে পরিপূর্ণ। এক একটা গল্প বিচিত্র রহস্যময় কবিতার ন্যায় সুন্দর ও চমৎকার। কিন্তু আমার জননী সন্ধ্যাকালে শ্রেষ্ঠ কবিদিগের উদ্ভাবিত যে সুন্দর গল্পগুলি আমাকে বলিতেন, আমার তাহা আদৌ মধুর লাগিত না। এই কৃষকরমণীর সামান্য কাহিনীর মত সে গল্পগুলি তেমন সম্পূর্ণ, তেমন সুসঙ্গত বোধ হইত না।

এক বৃহস্পতিবারের সমস্ত প্রভাত আমি বৃদ্ধার নিকট বসিয়া বসিয়া গল্প শুনিলাম। তার পর উপরে উঠিয়া গেলাম। সেদিন বাদাম কুড়াইবার

প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন বিস্তৃত উদ্যানে পরিচারকের সহিত বাদাম সংগ্রহ করিতে গেলাম। সেদিনের ঘটনা আমার এখনও চমৎকার মনে আছে। বোধ হইতেছে, সে যেন কল্যকার ব্যাপার!

অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া যে ঘরে বসিয়া বৃদ্ধা শেলাই করিতেছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একখানি কেদারার পার্শ্বে বৃদ্ধা ভূমিতলে পড়িয়া আছে। তাহার মুখ ভূমিসংলগ্ন, বাহুযুগল সম্মুখে প্রসৃত। কিন্তু তখনও তাহার দক্ষিণ মুষ্টির মধ্যে সূচ সূতা রহিয়াছে। বাম করে একটি জামা। দীর্ঘ পদটি কেদারার নিম্নে বিস্তৃত; চশমা জোড়া দেয়ালের পার্শ্বে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

আমি চীৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। বাড়ীর সকলে দৌড়াইয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরে শুনিলাম, বৃদ্ধা বেলক্লাওয়ার মরিয়া গিয়াছে।

সে সংবাদে আমার শিশু-হৃদয় কি গভীর দুঃখে, কি তীব্র বেদনায় অভিভূত জর্জ্জরিত হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি ধীরে ধীরে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকোণে একটি প্রাচীন আরাম-কেদারার উপর মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ বহুক্ষণ আমি সেখানে ছিলাম; কারণ, তখন রাত্রি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। সহসা কেহ একটি প্রজ্বলিত দীপাধার লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে দেখিতে পাইল না। গৃহ চিকিৎসকের সহিত আমার পিতা ও মাতা কি কথা কহিতেছেন, শুনিতে পাইলাম।

ডাক্তারকে তখনই আনিবার জন্য লোক গিয়াছিল। বৃদ্ধার এই আকস্মিক মৃত্যুর হেতু সম্বন্ধে ডাক্তার তাঁহাদিগকে কি বুঝাইতেছিলেন, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিলাম না। তার পর তিনি বসিয়া এক গ্লাস সুরা ও বিস্কুটের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তিনি গল্প করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সেদিন যে কথা বলিয়াছিলেন, আমার স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে। আমার বিশ্বাস, তাঁহার প্রত্যেক শব্দটি আমি অভ্রান্তভাবে আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারি।

তিনি বলিলেন, "হায়, হতভাগী বৃদ্ধা! যেদিন প্রথম আমি এই গ্রামে আসি, ঠিক সেইদিন তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সমস্তদিন পরিশ্রমের পর আমি হস্তপ্রক্ষালনের অবকাশ পাই নাই, এমন সময়

আমি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। সে অতি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল।

"তাহার বয়স তখন সপ্তদশ, তখন সে খুব সুন্দরী ছিল! এখন কি তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে? তাহার জীবনের এ কাহিনী আমি ইতিপূর্ব্বে কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই। আমি এবং আর এক ব্যক্তি,—সে এখন এ দেশে নাই,—ব্যতীত তৃতীয় আর কেহ এ ঘটনার বিষয় জানিত না। এখন বৃদ্ধা জীবিত নাই, সুতরাং এখন গুপ্তকাহিনীটি প্রকাশ করায় তেমন কোনও বাধা নাই।

"সেই সময়ে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে একটি নূতন শিক্ষক আসিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ। বিদ্যালয়ের যুবতী ছাত্রীরা তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। যুবক শিক্ষকটি কিন্তু সকলকেই উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি প্রধান শিক্ষক বৃদ্ধ প্রবিনকে বড় ভয় করিতেন।

"বৃদ্ধ গ্রাক্ সুন্দরী হর্ত্তেসিকে সীবন-শিক্ষয়িত্রী-রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য যুবতীগণের মধ্যে নবীন শিক্ষক এই সুন্দরীকেই মনোনীত করিলেন। যুবতী এই অপরাজেয় শিক্ষকটির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে মনে অবশ্যই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। সে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। কয়েক দিন পরে নবীন শিক্ষকের অনুরোধে ও প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া যুবতী সীবন-শিক্ষয়িত্রী একদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যালয়গৃহের পার্শ্বস্থ শুষ্ক তৃণস্তূপের অন্তরালে প্রণয়পাত্রের সহিত বিশ্রাম্ভালাপে, প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণে সম্মত হইল।

"সে বাড়ী যাইবার নাম করিয়া বিদ্যালয়গৃহ ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু নীচে না নামিয়া দ্বিতলে উঠিয়া প্রণয়পাত্রের প্রতীক্ষায় তৃণপুঞ্জের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। শিক্ষকও অবিলম্বে তাহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি প্রণয়িণীর সহিত দুই চারিটি প্রণয়-সম্ভাষণ করিতেছেন, এমন সময়, সেই কক্ষের একটা রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল; প্রধাম শিক্ষক মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, 'সিস্‌বার্ট, আপনি ওখানে কি কচ্ছেন?' ধরা পড়িবার আশঙ্কায় যুবকের উপস্থিতবুদ্ধি লোপ পাইল; তিনি নির্ব্বোধের ন্যায় বলিলেন, 'বসিঁয়ে গ্রাক্, শুক্‌নো ঘাসের উপর নির্জ্জনে দু' দণ্ড বিশ্রাম করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি।'

"তৃণস্তূপটি বৃহৎ, এবং ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। সিস্‌বার্ট ভীতা যুবতীকে

কোণের দিকে ঠেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ঐ কোণে গিয়া লুকাইয়া থাক। তুমি না লুকাইয়া থাকিলে আমার চাকরী যাইবে।'

"বৃদ্ধ প্রধান শিক্ষক মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিলেন, 'বা, আপনি একা নন, দেখিতেছি?' 'হাঁ মসিয়ে গ্রারু, আমি একাই আছি!' 'কখনই নয়, আপনি আর এক জনের সহিত কথা কহিতেছেন।' 'আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি একা আছি।' বৃদ্ধ বলিলেন, 'আচ্ছা আমি দেখিতেছি।' এই বলিয়া তিনি দরজা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া দিয়া আলো আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেলেন।

"নবীন শিক্ষকটি ঘোরতর কাপুরুষ। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেকেই এমন হয়। তাঁহার বুদ্ধি লোপ পাইল, অতর্কিত বিপদের সম্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া তিনি বলিলেন, 'শীঘ্র এমন ভাবে লুকাও, বৃদ্ধ কোনও মতেই যেন তোমাকে খুঁজিয়া না পায়। তোমার জন্য দেখিতেছি আমার চাকরী গেল, চিরকালের জন্য আমার সর্ব্বনাশ হইল। আমার ভবিষ্যৎ মাটী হইল, দেখিতেছি! লুকাও, লুকাও!' তাহারা শুনিতে পাইল, রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইতেছে! হর্ত্তেসি দ্রুতবেগে বাতায়নসন্নিধানে উপস্থিত হইল। তাহার নিম্নেই রাজপথ। সে ত্বরিতে বাতায়ন মুক্ত করিয়া ফেলিল; তার পর দৃঢ়স্বরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'উনি চলে গেলে তুমি আমাকে তুলিয়া আনিও।' সঙ্গে সঙ্গে যুবতী লম্ফপ্রদান করিল।

"বৃদ্ধ গ্রারু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বিস্মিতভাবে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। পনের মিনিট পরে মসিয়ে সিস্‌বার্ট আমার কাছে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। যুবতী তখনও প্রাচীরের পার্শ্বে পড়িয়া ছিল; তাহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। দ্বিতল হইতে সে লম্ফপ্রদান করিয়াছিল। আমি যুবকের সহিত তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলাম। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি যুবতীকে বাড়ী লইয়া আসিলাম। তাহার দক্ষিণ পদের হাড় তিন জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মাংস ভেদ করিয়া হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। যুবতী একবারও কোনও অভিযোগ করিল না, কাহারও দোষ দিল না। শুধু বলিল, 'আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।'

"আমি যুবতীর আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিলাম। সকলে আসিলে বলিলাম যে, আমার বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী চাপা পড়িয়া যুবতীর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। সকলেই আমার কল্পিত কাহিনী বিশ্বাস করিল। পুলিস এক মাস ধরিয়া কল্পিত অপরাধী শকট-চালকের বৃথা অনুসন্ধান করিল।

"এইখানেই গল্পের শেষ। ইতিহাসে যে সকল রমণী অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, এই নারী তাঁহাদেরই অন্যতমা।

"তাহার প্রণয় ব্যাপারের এইখানেই আরম্ভ ও এইখানেই সমাপ্তি। সে আজীবন চিরকুমারীই ছিল। তাহার আত্মত্যাগ অপূর্ব্ব, তাহার হৃদয় অতি মহৎ, অতি পবিত্র! তাহার নিষ্ঠা, প্রেম স্বর্গের জিনিস। আমি যদি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে শ্রদ্ধা না করিতাম, তাহা হইলে আজ এ কাহিনী আপনাদিগকে শুনাইতাম না। আজ পর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করি নাই। বুঝিলেন, কেন?"

ডাক্তার নীরব হইলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন; বাবা মৃদুস্বরে কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমি জানু পাতিয়া বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলাম। শুনিতে পাইলাম, সোপানাবলীর উপর দিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া একটা ভারী জিনিস লইয়া যাইতেছে।

তাহারা বৃদ্ধার মৃতদেহ নীচে নামাইয়া লইয়া যাইতেছে। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

গৌড়লেখমালা।

"In the scarcity of authentic materials for tho ancient; and even for the modern, history of the Hindu race, importance is justly attached to all genuine monuments, and especially inscriptions on stone and metal, which are occasionally discovered through various accidents. If these be carefully preserved and diligently examined, and the facts ascertained from them, be judiciously employed towards elucidating the scattered information, which can be yet collected from the remains of Indian literature, a satisfactory progress may be finally made in investigating the History of the Hindus. That the dynasties of princes who have reigned paramount in India, or the line of Chieftains who have ruled over particular tracts, will be verified, or that the events of war or the effects of policy, during a series of ages, will be developed, is an expectation which I neither entertain, nor wish to excite. But the state of manners, and the prevalence of particular doctrines, at different periods, may be deduced from a diligent perusal of the writings of authors whose age is ascertained

* গী দে মোপাঁসার গল্প হইতে অনূদিত।

and the contrast of different result, of various and distinct periods, may furnish a distinct outline of the progress of opinions. A brief history of the nation itself, rather than of its government, will thus be sketched; but if unable to revive the memory of great political events, we may at least be content to know what has been the state of arts, of sciences, of manners, in remote ages, among this very ancient and early civilized people."—*H. T. Colebrooke.*

এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত যে সকল পুরাতন শিলালিপি ও ধাতুপট্টলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহার সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অধিক না হইলেও, কোন্ লিপি কোন্ গ্রন্থে বা প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লাভ করিতে পরিশ্রান্ত হইতে হইত। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের (১) চেষ্টায় এই অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, এই সকল পুরাতন লিপির সম্যক্ পরিচয়লাভের উপায় নাই। তজ্জন্য লেখমালা-সঙ্কলনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

আরও একটি কারণ আছে। যে সকল পুরাতন লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত বরেন্দ্রমণ্ডলের সম্পর্কই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, তাহার সহিত বরেন্দ্রমণ্ডলের [পালবংশীয় এবং সেনবংশীয়] নরপালগণের সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে; অনেক লিপি বরেন্দ্রমণ্ডলেই আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং অনেক লিপির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বরেন্দ্রমণ্ডলের বিবিধ বিপ্লব-কাহিনীর তথ্যানুসন্ধান করিতে হয়। এই সকল লিপি একত্র সঙ্কলিত না হইলে, গৌড়-বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল হইতে পারে না।

এই লেখমালায় যে সকল প্রাচীন লিপি সঙ্কলিত হইল, তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এক শ্রেণী "শিলালিপি," এবং অপর শ্রেণী "তাম্রপট্টলিপি" নামে কথিত হইতে পারে। "তাম্রপট্টলিপি" অপেক্ষা "শিলালিপি"র সংখ্যা অল্প। কিন্তু বঙ্গ-লিপির বিকাশ-পদ্ধতির আলোচনা করিবার পক্ষে "শিলালিপি"র মূল্য অধিক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কারণ, তাহাতে অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ।

---

(১) List of Northern Indian Inscriptions in the Appendix to the Epigraphia Indica Vol. V, by Prof. Kielhorn and Supplement to the same in Vol. VIII, এই তালিকা প্রকাশিত হইবার পরেও অনেক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতে পারে নাই।

শিলাপট্টে ও ধাতুপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করাইবার প্রথা কত পুরাতন, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এখনও বঙ্গদেশে কোনও অতিপুরাতন লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে ধাতুপট্টলিপি অপেক্ষা শিলাপট্টলিপি যে সমধিক পুরাকালে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই পরিচয় ভারতবর্ষের নানা স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার কারণ কি, তাহা কৌতূহলের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশায় তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—শিলাপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি এক শ্রেণীর, এবং ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি পৃথক্ শ্রেণীর,—পৃথক্ প্রয়োজনে, পৃথক্ সময়ে উদ্ভাবিত।

শিলাপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি কোনও না কোনও শ্রেণীর স্মারক-লিপি। তাহাতে কুল-প্রশস্তি, রাজাজ্ঞা, ব্যক্তিগত-পুণ্যকীর্ত্তি-ঘোষণা, বিজয়-গৌরব অথবা উৎসব ব্যাপার উৎকীর্ণ হইত। তাহা "স্থাবর" বলিয়াই কথিত হইতে পারে। কারণ, তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে—একের নিকট হইতে অন্যের নিকটে—পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হইবার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয় নাই।

ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপিগুলি সেরূপ নহে। তাহা দানপত্ররূপে অথবা ক্রয়বিক্রয়ব্যাপারের নিদর্শনপত্ররূপে—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, একের নিকট হইতে অন্যের নিকটে,—পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত হইবার প্রয়োজনেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লিপির নিয়ত এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে প্রদেশের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধ, তথা হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও তাহা অনেক সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর লিপি ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ করাইবার প্রথা কত পুরাতন, এখনও তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। যে লিপি সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া কথিত হইতেছে, সেরূপ একখানি তাম্রপট্টলিপি (১) বরেন্দ্রমণ্ডলেই আবিষ্কৃত

---

(১) রাজসাহীর অধীন নাটোর মহকুমার অন্তর্গত ধানাইদহ গ্রামে এই তাম্রপট্টলিপি একটি পুষ্করিণী-খননকালে আবিষ্কৃত হইবার পর, নাটোরের উকীল পরমস্নেহাস্পদ শ্রীমান জগদীশ্বর রায় আমাকে ইহার সংবাদ দান করেন। জমীদার শ্রীযুক্ত মৌলবী এরশাদ আলি খাঁ চৌধুরী

হইয়াছে। তাহা প্রথম কুমারগুপ্তের শাসন-সময়ের ১১৩ গুপ্ত-সংবৎসরে [৪৩৩ খৃষ্টাব্দে] উৎকীর্ণ ভূমিদানপত্র। এরূপ ভূমিদানপত্র "তাম্রশাসন" নামে, অথবা কেবল "শাসন" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "শাসন" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, "মিতাক্ষরা"টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়া গিয়াছেন,—ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎকালের নৃপতিবৃন্দ অনু-শাসিত হইবেন বলিয়া, ইহার নাম "শাসন" হইয়াছে। যথা,—

"शिष्यन्ते भविष्यन्तो नृपतयः अनेन।"

কিরূপে এই সকল "শাসন" উৎকীর্ণ করাইতে হইবে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় [আচারাধ্যায়ে রাজধর্ম্ম-প্রকরণে] তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে—ভবিষ্যতে যে সকল সাধু নরপাল আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য, রাজা ভূমি দান করিয়া, তাহার একটি লেখ্য প্রস্তুত করাইবেন। পটে অথবা তাম্রপট্টে রাজমুদ্রা-পরিচিহ্নিত করিয়া, রাজা তাহাতে আত্মবংশের কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ করাইবেন। যথা,—

"दत्वा भूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यन्तु कारयेत्।
आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः॥ ३१८॥
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्नितम्।
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानञ्च महीपतिः॥ ३१९॥
प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम्।
स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं कारयेत् स्थिरम्" ॥ ३२०॥

টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর এই শাস্ত্র-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে তৎকাল-প্রচলিত রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"কার্পাস-নির্ম্মিত পটে অথবা তাম্রপট্টে, বা ফলকে, প্রপিতামহ-পিতামহ-পিতৃদেবের বংশবীর্য্যশ্রুতাদি-গুণাবলীর ও আত্ম-গুণাবলীর উল্লেখ করাইয়া, গ্রহীতার এবং দত্তভূমির পরিচয়সূচক সীমাচিহ্নাদির বিবরণ লিখাইয়া, গরুড়-বরাহাদি-চিহ্নসংযুক্ত স্বকীয় রাজমুদ্রা সংযুক্ত করাইয়া,

---

তাম্রপট্টখানি আমাকে প্রদান করিবার পর, আমার অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় [ষোড়শ ভাগ—১১২ পৃষ্ঠা] প্রকাশিত করিয়াছেন। তাম্রফলকখানি আপাততঃ কলিকাতা-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

শক-বৎসরের ও আপন রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ করাইয়া, রাজা তাম্রশাসন সুসম্পন্ন করাইবেন। যথা,—

"কার্পাসিকে পটে, তাম্রপট্টে, ফলকে বা, আত্মনো বংশ্যান্, প্রপিতামহ-পিতামহ-পিতৄন্, বহুবচনস্যার্থবত্ত্বায় বংশ্যবীর্য্যশ্রুতাদিগুণোপবর্ণনপূর্ব্বকং, অভিলিখ্যাত্মানং, চ-শব্দাৎ প্রতিগ্রহীতারং প্রতিগ্রহপরিমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং চাভিলিখ্য, প্রতিগৃহ্যত ইতি প্রতিগ্রহো নিবন্ধঃ, তস্য রূপকাদিপরিমাণং, দীয়তে ইতি দানং ক্ষেত্রাদি, তস্য ছেদঃ, ছিদ্যতে যেনেতি ছেদঃ; নদ্যাঘাটী নিবর্ত্তনং তৎপরিমাণঞ্চ তস্যোপবর্ণনং; অমুকনদ্যা দক্ষিণতোঽয়ং গ্রামঃ ক্ষেত্রং বা, পূর্ব্বতোঽমুকগ্রামস্যৈতাবন্নিবর্ত্তনং ইত্যাদি নিবর্ত্তন-পরিমাণং চ লিখ্যং; এবং আঘাটস্য নদী-নগর-বর্ত্মাদিঃ সম্যারিত্বেন ভূমিগ্রামাধিক-ভাবমন্তরেণ তন্নিরূপ্যং; স্বহস্তেন স্বহস্ত-লিখিতেন, মতং মে অমুকনাম্নঃ অমুকপুত্রস্য যদত্রোপরিলিখিতমিত্যনেন সম্পন্নং যুক্তং; কালেন চ দ্বিবিধেন, শকনৃপাতীত-রূপেণ সংবৎসররূপেণ চ কালেন, চন্দ্রসূর্য্যো-পরাগাদিনা চৈতন্যং, স্বমুদ্রয়া গরুড়-বরাহাদি-রূপয়োপরি বহি-র্লাঞ্ছিতং চিহ্নিতং; স্থিরং; দৃঢ়ং, শাসনং, ভবিষ্যতো ভবিষ্যন্তো নৃপতয়ঃ যেন; দানাচ্ছেদোপালনমিতি, শাসনং কারয়েৎ মহীপতিঃ শ্রীমান্নতিঃ সন্ধিবিগ্রহাদিকারিণা ন যেন কেনচিৎ।

সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।

স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্ রাজ-শাসনম্॥

ইতি স্মরণাৎ। দানস্যৈতেন দানফলং লিখেৎ, শাসনকারকং ভোগাদিকৃত্যা ফলানিত্যর্থম্।"

তাম্রশাসনগুলি যে এইরূপ ভাবেই সম্পাদিত হইত, তাহার পরিচয় সকল তাম্রশাসনেই কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্যাদিতেও তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। "শিশুপালবধ" কাব্যের চতুর্দ্দশ সর্গের ৩৬ শ্লোক তাহার একটি সুপরিচিত নিদর্শন। যথা,—

"স স্বহস্তকৃতচিহ্নশাসনঃ পাকশাসন-সমানশাসনঃ।

আ-সমুদ্রতপনার্থবহ্নিনে বিপ্রসাদকরৎ ভূয়সী ভুবঃ॥"

কোন্ সময় হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, এই শ্রেণীর লিপি-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোনরূপ লিখিত প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিবার উপায় নাই।

যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই, সে দেশের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলিত করিতে হইলে, এই শ্রেণীর পুরাতন লিপিকে প্রধান উপাদান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শতবর্ষপূর্ব্বে পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধারের

জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া, অনেক পুরাতন-লিপির প্রকৃত পাঠ জনসমাজে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর লিপি "ইতিহাস" বলিয়া কথিত হইতে পারে না ;—সেরূপ প্রয়োজনেও ইহা উদ্ভাবিত হয় নাই। তথাপি ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক নানা বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। এই সকল লিপির পাঠোদ্ধারে ও ব্যাখ্যাকার্য্যে পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় প্রকাশিত করিয়া, মনীষিগণ [শত বর্ষের চেষ্টায়] যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপরেই পুরাতন রাজবংশ-বিবরণের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়,—জনশ্রুতি হইতে, পুরাতন সাহিত্য হইতে, পুরাতন মুদ্রা হইতে, পুরাতন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন হইতে, পুরাকালের যাহা কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার পক্ষেও এই সকল প্রাচীন লিপি প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। *

এই সকল পুরাতন লিপি একত্র সঙ্কলিত না হইলে, লিপি-লিখিত সকল বিবরণের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না। এক এক যুগের বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, সেই সেই যুগের নানা বিবরণের প্রকৃত মর্ম্ম সহজে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে ;—এক লিপি অন্য লিপির পাঠোদ্ধারের ও ব্যাখ্যাসাধনেরও সহায়তা-সাধন করিতে পারে। যে লিপি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইবার সময়ে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়, কালক্রমে অন্য লিপির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। অনেকবার ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

---

*Rich as have been this bequests to us in other lines, the Hindus have not transmitted to us any historical works which can be accepted as reliable for any early times. And it is almost entirely from a patient examination of the inscriptions, the start in which was made more than a century ago, that our knowledgo of the ancient political history of India has been derived. But we are also ultimately dependant on the inscriptions in every other time of Indian research, Hardly any defenite dates and identifications can be established except from them. And they regulate everything that we can learn from tradition, literature, coins, art, architecture, or any other source.—j. F. Fleat in the Imperial Gazetteer of India, vol 11.

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত কেবল বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত, এবং ভারতসীমার বাহিরেও নানা স্থানের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। প্রাচীন লিপি হইতে তাহার সন্ধানলাভ করিতে হইলে, বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপি একত্র সঙ্কলিত করিতে হইবে। তাহা বহু-শ্রমসাধ্য ও বহুব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার। প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, বাঙ্গালার রাজবংশনিচয়ের শাসনসময়ে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাই একত্র সঙ্কলিত হইতেছে।

এই সকল প্রাচীন লিপি হইতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানলাভ করা যাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয়। তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে না; কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহাসিক তথ্যানু-সন্ধানের প্রথম যুগে, রাজার ও রাজবংশের পরিচয়-সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সমধিক প্রবল থাকায়, এ পর্য্যন্ত কেবল তাহার কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্য প্রাচীন-লিপি-নিহিত অন্যান্য তথ্যের যথাযোগ্য আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে নাই। এখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

যে সকল প্রাচীন লিপি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, তন্মধ্যে কোনও কোনও লিপি রচনা-মাধুর্য্যে সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বলিয়াও কথিত হইতে পারে। ভাষার ও রচনা-পারিপাট্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, জনসমাজের কথোপকথনের ভাষা যেরূপ থাকুক না কেন, [মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত] বাঙ্গালা দেশের রাজসভায় ও বিদ্বৎসমাজে সংস্কৃত ভাষাই রচনাকার্য্যে সমাদর লাভ করিত। তৎকালে এ দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট সংস্কৃত ভাষা সুপরিচিত না থাকিলে, এরূপ হইতে পারিত না। রচনা-পারিপাট্যের মধ্যে যেরূপ ভাষাজ্ঞান বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুশীলন প্রবল না থাকিলে, তাহা সেরূপ বিকশিত হইতে পারিত না। ধর্ম্মসম্প্রদায়-গুলির গ্রন্থনিহিত উপদেশ সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত, অধীত ও অধ্যাপিত হইত। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষাই যে তৎকালে এ দেশে উচ্চশিক্ষা বলিয়া সুপরিচিত ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৎ-কালের জনসমাজ উচ্চশিক্ষা লাভ করিত, প্রাচীন লিপিতে প্রসঙ্গক্রমে তাহারও

কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে,—প্রসঙ্গক্রমে অনেক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের, পৌরাণিক আখ্যান-বস্তুর, ঐতিহাসিক জনশ্রুতির ও প্রচলিত লোকব্যবহারেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই,সে দেশের পক্ষে প্রাচীনলিপি হইতে এই সকল বিবরণ-সঙ্কলনের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

সকল দেশেই দুইটি শক্তি জনসাধারণের উন্নতির ও অবনতির গতিনির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহা রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি নামে সুপরিচিত। বাঙ্গালা দেশে এই উভয় শক্তির মধ্যে পুরাকালে কিরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, কি কারণে এই উভয় শক্তির সমন্বয় বা সংঘর্ষ সংঘটিত হইত, কোন্ প্রণালীতে শাসন-সংরক্ষণ-কার্য্য পরিচালিত হইত, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

কাহারও প্রার্থনাক্রমেই হউক, অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, রাজা কাহাকেও ভূমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া "মতমস্তু ভবতাম্" বলিয়া তাহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতেন। ইহাকে অন্তঃসারশূন্য সৌজন্য-বিজ্ঞাপক শিষ্টাচারমাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। কোন্ গ্রামে কাহারা বাস করিবে, কাহারা ভূমিকর্ষণ করিবে, কাহারা উৎপন্ন শস্য উপভোগ করিবে, তাহার সহিত প্রথমে রাজার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না; গ্রামের লোকেই তাহার একমাত্র নিয়ামক ছিল। ভূমিবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না;—কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। কাহাকেও ভূমিদানের পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করিবার অধিকার রাজার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিলেও, প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদারক্ষার্থ, ভূমিদান করিবার সময়ে রাজাকেও প্রজাবর্গের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত;—প্রজাশক্তিকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিবার নিয়ম ছিল না। সে শক্তিকে তুচ্ছ করিবার সম্ভাবনাও বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সে শক্তি কখনও কখনও রাজা নির্ব্বাচন করিত, (১) কখনও বা রাজশক্তির অপব্যবহারে অসহিষ্ণু

(১) পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব এইরূপে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া তারানাথ যে জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [চতুর্থ শ্লোকে] তাহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই উল্লিখিত আছে।

হইয়া, রাজসিংহাসন আক্রমণ করিত। (২) এরূপ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়,—প্রকৃতিপুঞ্জের চিরসঞ্চিত অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া রাজ্যপালন করিতে হইত বলিয়াই, দানকালে তাহাদের সম্মতিগ্রহণের জন্য রাজাকে "মতমস্ত ভবতাং" বা তদনুরূপ বাক্যাবলী দানপত্রে উৎকীর্ণ করাইতে হইত!

ভূমি কাহার,—রাজার কি প্রজার,—তাহা লইয়া মানবসমাজে অনেক কলহ বিবাদ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে রাজা ভূমির প্রতিপালক (রক্ষা-কর্ত্তা) বলিয়া প্রতিভাত;—রক্ষা করিতেন বলিয়া (প্রতিদানরূপে) উৎপন্ন শস্যের অংশ লাভ করিতেন। শস্য উৎপন্ন হউক বা না হউক, ভূমি অধিকার করিতে হইলেই প্রজাকে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতে হইবে, এরূপ শাসন-নীতি রাজাকেই ভূমির অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। প্রজা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া, ভূমি কর্ষণ করে; তদ্দ্বারা ভূমিতে স্বামিত্ব লাভ করিতে পারে না। এরূপ শাসন-নীতি ভূমির বর্গফলের অনুপাতে কর ধার্য্য করিয়া থাকে, তজ্জন্য দানপত্রাদিতেও তাহা উল্লিখিত হয়। পাল-নরপালগণের তাম্রশাসনে ভূমির পরিচয় আছে; চতুঃসীমার উল্লেখ আছে; কিন্তু বর্গফলের উল্লেখ নাই। সেকালের রাজস্ব-নীতির প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ইহাতে তাহার কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা চিন্তনীয়।

শাসন ও সংরক্ষণ কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইত, তাম্রশাসনে তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা "মহতী দেবতা", তিনি "নর-রূপে" অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেও, সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজাপালন করিতেন না। সে কার্য্য নানাশ্রেণীর রাজপুরুষের সাহায্যে সম্পাদিত হইত। তাঁহাদিগের পদবিজ্ঞাপক-উপাধিগুলি তাম্রশাসনে উল্লিখিত থাকায়, তাহা হইতে তাঁহাদিগের রাজকার্য্যের পরিচয় লাভ করা যায়। এই সকল পদবিজ্ঞাপক-উপাধি এখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, তাহার ব্যাখ্যা-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া সুধীগণ নানা বিচারবিতণ্ডার অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পর বঙ্গাক্ষর কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলের নিকটেই সুপরিচিত। বঙ্গাক্ষরের এরূপ আকার চিরদিন

---

(২) দ্বিতীয় মহীপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিবার যে আখ্যায়িকা "রাম-চরিত" কাব্যে উল্লিখিত আছে, রামপালদেবের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-প্রদানের সময়ে, বৈদ্যদেবের [কমৌলিতে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৪ শ্লোকে] তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রচলিত ছিল না। কিরূপে, কত দিনে, বঙ্গাক্ষর তাহার বর্ত্তমান আকার লাভ করিয়াছে, তাহা সকলের নিকট সুপরিচিত হইতে পারে নাই। তাহার ক্রমবিকাশের পরিচয় প্রাচীন লেখমালায় সন্নিবিষ্ট থাকিয়া, অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গ-লিপি কত পুরাতন, তাহার সীমানির্দ্দেশের উপযোগী লিখিত প্রমাণ অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বঙ্গলিপিকে একটি পুরাতন প্রাদেশিক লিপি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির "গৌড়লেখমালা"য় কোনও কোনও শিলালিপির আদর্শ মুদ্রিত হইয়াছে। যে সকল পুরাতন লিপি সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার আবিষ্কার-কাহিনী, পাঠোদ্ধার-কাহিনী, ব্যাখ্যা-কাহিনী, লিপি-পরিচয় ও লিপি-বিবরণী-সংযুক্ত ভূমিকাসহিত মূলানুগত পাঠ ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ মূলানুগত পাঠ সঙ্কলিত করিবার অন্তরায়ের অভাব নাই। সকল লিপি এক স্থানে সুরক্ষিত হইতেছে না; কোনও কোনও লিপি নিতান্ত জরা-জীর্ণ; এবং একখানি লিপি এখন আর সন্ধান করিয়াও বাহির করিবার উপায় নাই; তাহা আবিষ্কৃত হইবার পর, আবার লোকলোচনের অতীত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল প্রাচীন লিপির অনুবাদ-কার্য্য বিলক্ষণ আয়াস-সাধ্য ব্যাপার; যত্ন চেষ্টার অভাব না থাকিলেও, ইহাতে পদে পদে বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কা আছে। কেহ কেহ তজ্জন্য নানা মনঃকল্পিত ব্যাখ্যার অব-তারণা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বাপর যে সকল ব্যাখ্যা সূচিত হইয়া, সুধী-সমাজে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে, এখনও তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা হয় নাই। তজ্জন্য অনেক মনঃকল্পিত পাঠ ও ব্যাখ্যা সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইতেছে। * "গৌড়লেখমালা"য় যথাস্থানে তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন লিপির সঙ্কলন ও তাহার ব্যাখ্যাসাধন এরূপ শ্রমসাধ্য কঠিন ব্যাপার যে, তাহাতে ভ্রম-ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। তৎসম্বন্ধে নিবেদন—

"ধৌর্ষ্ট্যোঽয়ং-করুণাবদ্ভিঃ ক্ষন্তিভি র্মে পরিশ্রমঃ।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

*বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির "গৌড়লেখমালা" গ্রন্থের এই অবতরণিকাটি "সাহিত্যে" মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়া অনুসন্ধান-সমিতি "সাহিত্য"-সম্পাদকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রাচীন কবিওয়ালা।

১

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জয়দেব কবির আবির্ভাব। তাঁহার রচিত গানসমূহ ঠিক বাঙ্গালা ভাষা নহে; কিন্তু সেই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী আমাদের এই মাতৃভাষার অগ্রদূত। সেইটুকু দীর্ঘ মরুকান্তারে উর্ব্বরা ভূমি!

ইহার পর বঙ্গদেশ মুসলমানের হইল; ২৫০।৩০০ বৎসর দেশের গান গল্প লোপ পাইয়াছে বোধ হয়। পুঁথিপত্র কিছুই মিলে না।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী বৈষ্ণবকবিগণের যুগ—সে গীতিগানের এক অনন্ত উৎস।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাল্‌কা গীত গান অপেক্ষা স্থূল কিছু—মঙ্গলকাব্য—শাস্ত্রানুবাদ ও লৌকিকধর্ম্ম-প্রচারের নিদর্শনই প্রচুরপরিমাণে মিলে। কিন্তু তৎসমস্তও পাঁচালী—তাহারও "গায়ন" "বায়ন" ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের অভ্যুদয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর-রচনা শেষ হয়, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর অভিনয়। বঙ্গের ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল। বঙ্গদেশ ইংরেজের হইল। এই পরিবর্ত্তনে বঙ্গবাসীর প্রাণে আঁচড়টি লাগে নাই। বাঙ্গালী তখন গীত গান তোটক-ছন্দ লইয়া উন্মত্ত।

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিণীর তরঙ্গে চালিতা তরণীর ন্যায় এই গীত গানের ভাব তখন দুলিতেছিল; একবার উপরে উঠে। সে সময়ে ধ্বনিত হইতেছিল—

বাসনায় দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই মনের ময়লা ফেল কাটি।

আবার তখনই নামিয়া আসে।—কাণে বাজিতেছিল,—

যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পর ফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥

তলগামী হইবার উপক্রম হইয়াছিল; ভাগ্যক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পাকা মাঝির হাতে হাল পড়িল, তরী বাঁচিয়া গেল।

গুণী, গুণগ্রাহী সমালোচকগণ বলেন, ভারতচন্দ্রের পর পঞ্চাশ বৎসর বঙ্গ-ভাষাতে উন্নতি অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই; তাহা বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল।

আমরা এই পঞ্চাশ বৎসর এবং ইহার পরের পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাচীন ভাগ ধরিয়াছি; কেন না, এই পর্য্যন্তই খাঁটী বাঙ্গালা ভাব। ইহার পর হইতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব, এবং সেই প্রভাবে নবশক্তি-সঞ্চারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এই শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গে তেমন গণনীয় কাব্য বা কাব্য-রচয়িতা কবি নাই। কিন্তু "কবি" পাওয়া যায়। চলিত কথায় ইহাঁরা "কবিওয়ালা" নামেই পরিচিত। ইহাঁদের ভিতর কেহ কেহ কবি-নামের সকল অর্থেরই উপযুক্ত পাত্র। ইহাঁদের রচনার মধ্যে কোনও কোনও স্থল এত মধুর, এমন মর্ম্মস্পর্শী যে, বরং দু একখানা বড় বড় কাব্যের লোপ হয়, বাঙ্গালী তাহাও সহিতে পারে, কিন্তু সেই কবিগানগুলি নষ্ট হইতে দিতে পারে না।

ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী গীত-রচয়িতৃগণের নাম গ্রহণ করিবার আগে এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের নাম ও তাঁহার সমকালিক কবি—কাব্যক্ষেত্রে তাঁহার নিকট পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী, গীতি-ক্ষেত্রে সম্যক্ বিজয়ী সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদের উল্লেখ করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গানের যুগ বলা যাইতে পারে।

এইবার আমরা আর এক জাতীয় গানের পরিচয় দিব। বাঙ্গালী বহুকাল ধরিয়া মাণিকপীর, সত্যপীর, জারীগান, গাজীর গীত, হাবু গীত, নলে গীত; ঘেঁটু গান, সারি গান, তরজা গান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান-রচিত খাঁটী দেশীয় গীতগানে আনন্দানুভব করিয়া আসিতেছিলেন। মুসলমান রাজত্বের শেষাশেষি সময়ে বঙ্গবাসী অত্যন্ত সৌখীন হইয়া উঠিলেন। তখন কবি-গান আসর গ্রহণ করিল।

কবি-গানের সূত্রপাতের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ঘেঁটুগান ও সারিগানই অধিক প্রচলিত ছিল। বোধ হয় সারিগানই প্রথম উদ্ভাবিত হয়।

মুসলমান নবাবগণের আমলে "তরজা" গীতের বড় কদর ছিল। তরজা শব্দটা পারসী—ইহা সঙ্গীতসংগ্রামবিশেষ। এক দল গানে প্রশ্ন করে, অপর এক দল গান গায়িয়া তাহার উত্তর দেয়; যে দল ভাল উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। কালক্রমে তরজা গানের নিশ্চিতই অবনতি ঘটিয়াছে। এখন অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই প্রায়শঃ এই গীতগানে মাতিয়া থাকে। এখনকার তরজা অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ; তবে গান-বাঁধুনী হইতে উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

শস্ত্র-সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইলেও বঙ্গবাসী কণ্ঠ-সংগ্রামে কোনও কালেই হীন নহে।

তর্জ্জার অনুকরণে হউক বা না হউক, দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভদ্রলোকের মজলিসে এক-জাতীয় গীত মাথা তুলিতেছিল। এই সময়ে আমাদের দেশে—বিশেষতঃ কলিকাতার ধনিসম্প্রদায়ের ভবনে কবি-গাহনা প্রচলিত হয়। প্রথমটা ওস্তাদী আখড়াই গাহনা রূপে ছিল; ক্রমে কবি-গীতি-রচয়িতৃগণ দুইটি দল সাজাইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন, এবং সদ্যঃপ্রস্তুত গীত দ্বারা পরস্পর প্রশ্নোত্তর প্রদানপূর্ব্বক রসভাবজ্ঞ সামাজিকগণের মনোরঞ্জন করিয়া সঙ্গীত-সমরে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া যশোলাভ করিতেন।

এই সকল কবিগণের অনুপম রসভাব, সুললিত শব্দবিন্যাস-চাতুরী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাস্তবিক অনেক স্থলেই প্রশংসার্হ।

বাদ্যের কেরামতিও কবিগাহনার অঙ্গ ছিল; সঙ্গৎ না হইলে কবি-গাহনা চলিত না। প্রথমে ছিল ঢোল আর কাঁশী; এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়—ঢোল কাঁশীর সঙ্গতে উচ্চ অঙ্গের গাহনা কিরূপে সকলের মনোরঞ্জন করিত। প্রথম প্রথম মাদলের তালও না কি পড়িত। কিন্তু উন্নতি হইতেছিল; আখড়াই গাহনার "সাজবাদ্য" প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁশী গেল। ঢোলের সঙ্গে তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল, সিটি প্রভৃতি দেখা দিল; ক্রমে জলতরঙ্গ, সপ্তস্বরা, বীণা, বেণু, সেতারা প্রভৃতি যোগ দিয়াছিল। চুঁচুড়ার দলে নাকি হাঁড়ি কলসীও বাজিত।

অনেকের মতে কবির গানও বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি-কল্পে সাহায্য করিয়াছে।

কবি গান বাঁধিবার ও গাহিবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে;—প্রথম চিতান, পরে পরচিতান, ফুকা, ডবল ফুকা, মেলতা, মহড়া, এবং মহড়ার শেষে খাদ। খাদ-সমাপনে দ্বিতীয় ফুকা, এবং দ্বিতীয় মেলতা; সর্ব্বশেষে অন্তরা। কিন্তু সে সকল এ প্রবন্ধে বুঝানো চলে না। আমরা ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যই দেখাইতে [illegible]পারি।

কবি-স[illegible] [illegible]দকতা প্রধানতঃ বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহরেই প্রবল ছিল; ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে আখড়াই গাহনার নাম বাজিয়া উঠে। কবির দল সঙ্গীত-সংগ্রামের [illegible] বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত।

প্রবাদ আছে, স্বনামধন্য বঙ্গাধিপ সীতারাম রায়ের আমলেও কবি-গান প্রচলিত ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সে সময়কার কোনও 'কবি'র নাম অথবা কবি-গানের নমুনা—কিছুই পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সার্দ্ধ শতাধিক, কিংবা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের ভদ্রসন্তানগণই আখড়াই গানের প্রথম সূত্রপাত করেন। শান্তিপুরের দেখাদেখি চুঁচুড়ায়, এবং পরে কলিকাতায় আখড়াই সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত হয়। বহু রসজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—মফঃস্বলের এই গহনা আর কলিকাতার আখড়াইয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল।

ভারতচন্দ্রের পরেই হুগলী জেলায় এক জন গীত-রচয়িতার আবির্ভাব হয়। তিনি ঠিক কবিওয়ালা নহেন, কিন্তু অনেক কবিওয়ালার গুরু। তাঁহার রচিত প্রণয়সঙ্গীত বঙ্গীয় গীতি-সাহিত্যে বিলক্ষণ উচ্চ স্থান অধিকার করে। আমরা প্রথিতনামা নিধু বাবুর কথা বলিতেছি। ইঁহার গীতিমালা "নিধুর টপ্পা" নামে পরিচিত। প্রণয়-গানকে গীতি-ভাষায় টপ্পা বলে। নিধু বাবু "বঙ্গের সরিমিঞা" আখ্যা পাইয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম—রামনিধি গুপ্ত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম—প্রায় ১৭০ বৎসর হইল। নিধুর টপ্পা আদিরস-ঘটিত প্রেমগীতি—অথচ তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ নাই।

নিধু বাবুর পর রাম বসুর নাম আসিয়া পড়ে। রাম বসুর বিরহগান প্রসিদ্ধ। রাম বসু কবিওয়ালা ছিলেন। রাম বসুর পূর্ব্বে 'কবি'গণের আখড়াই গাহনাই ছিল; কবির লড়াই—অর্থাৎ আসরে বসিয়া গাহনায় উত্তর প্রত্যুত্তর দিবার প্রথা ইনিই প্রবর্ত্তিত করেন। রাম বসুর এক একটি গান বাস্তবিকই চিত্ত মুগ্ধ করে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন,—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।"

আমরা কবির একটি আগমনী গান হইতে কিয়দংশ শুনাই—

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গার দুর্গতি, এ কি প্রাণে সয়॥
তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা।
সে কথা আছে শেল সম মম হৃদয়ে গাঁথা॥

আমার লম্বোদর মা কি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনার কার্ত্তিক, ধূলায় পড়ে লুটাতো॥

আর এক স্থল :—

যদি কেহ বলে, ওগো উমার মা, উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধাইয়া যাই, আনন্দে হয়ে বিভোর॥

প্রাণের কথা কবি রাণীর মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন :—

আছে কন্যা যার, সেই শুধু জানে, অন্যে কি জানিবে তার?

কিন্তু যে জন্য রাম বসুর নাম, এখন সেই গান আমরা একটি দেখাই :- বাঙ্গালা ভাষায় অতীব হৃদয়গ্রাহী একটি গীত—কুলবধূর মর্ম্মকাতরতা-ব্রীড়াসঙ্কুচিত মাধুরী—

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বলে' হাসিত লোকে,
সখি, ধিক ধিক আমারে, ধিক সে বিধাতারে,
নারী-জনম আর যেন করে না।
একে আমার এ যৌবনকাল তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
হাসি হাসি যখন সে "আসি" বলে,
সে "আসি" শুনিয়া ভাসি নয়নজলে;
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না॥
তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি।
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি॥

মর্ম্মাহতার কবিত্ব-মাখা, কারুণ্য-মাখা একটি শ্লেষ—

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি, তাই চোকের দেখা দেখতে চাই,
'কিছু কাল থাক থাক'—বোলে ধরে রাখবো না॥
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল,
তোমার পরের প্রতি নির্ভর আমি ত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ হলো এ পথে আগমন,
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন ;
পিরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি ?
এমন ত প্রেম-ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি,
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলেম না॥

প্রেমের মন্দিরে আত্ম-বিসর্জ্জন আর কাহাকে বলে ?

আমরা সখী-সংবাদের একটি গান শুনাইব ; এ সকল গানের যোড়া মেলা কঠিন। এ গানটি কেহ কেহ হরু ঠাকুরের রচিত বলিয়া অনুমান করেন।—

জলে জলে কি গো সখি !
অপরূপ রূপ দেখি, দেখো সই নিরখি॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া করে' ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি ?
আচম্বিতে আলো কেন যমুনারই জল,
দেখো সখী কূলে থাকি কে করে কি ছল ;
তীরের ছায়া নীরে লেগে হলো বা এমন—
চকিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটি আঁখি॥
নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে,
ওগো ললিতে !
না দেখি এমনরূপ বারি-মাঝেতে।
আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়,
নীরের মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়,
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে—বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী॥
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই, ওগো প্রাণসই,
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই ;
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে,
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে ?
আবার ভাবি—সে যে শশী কুমুদ-বান্ধব—
হৃদয়-কমল কেন তা দেখে হবে সুখী ?

স্থির জলে প্রতিবিম্ব পড়ে, দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতেছে ; জল নাড়া পাইলেই ছায়া-ছবি মিলাইয়া যাইবে—আবার বিরহ ! এই ছায়া-মিলনটুকুর সাধে বাদ সাধিলে পাতক হয় বই কি !

বসুজ কবির কালাচাঁদের কালোর ব্যাখ্যা শুনাইয়া আমরা অন্তত্র যাই,—

ওহে, এ কালো উজ্জ্বলো বরণো তুমি কোথা পেলে ?
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে ॥
যে বলে সে বলে বলুক কালো,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো,
বামা হলে শ্যামা বলিতাম তোমায়, পূজিতাম জবা বিল্বদলে ॥
আরো ত আছে হে অনেক কালো,
এ কালো নহে তেমন, জগতের মনোরঞ্জন ;
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা
সাধে কি শরণ লয়েছে রাধা—
অনয়ের মত ও কালো চরণে বিকায়েছি যে বিধি যুগে ॥
ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো
আমার এই ত জ্ঞান ছিলো,
সে কালোর কালোত্ব গেলো হে কৃষ্ণ, তোমারে হেরে কালো ;
এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া সুন্দর নাহিকো আর,
কালো রূপ জগতের সার ;
ত্রিলোকে এমন আর নাহিক হেরি,
ও রূপে তুলনা কি দিব হরি,
কালো রূপে আলো করে হে সদা, মোহিত হয়েছে সকলে।
একো কালো জানি কোকিলো, আরো ভ্রমরার কালো বরণ,
আর কালো আছে জল কালিন্দীর, কালো ত তমাল-বন ;
আরো কালো দেখো নবীন নীরদ, ছিলো হে দৃষ্টান্তস্থল,
কালো ত নীল-কমল ;
সে কালোর কালোত্ব দেখেছে সবে,
প্রেমোদয়, অন্য হয় কারে বা ভেবে ?
তোমারো মতনো চিকণো কালো না দেখি ভুবন-মণ্ডলে ॥

জনশ্রুতি আছে,—রাম বসুর গান শুনিয়া এক জন সমজ্‌দার বলিয়াছিলেন,—"আমার যদি টাকা থাক্‌তো, বসুজাকে লাখ টাকা দিতাম।"

রাম বসুর গানে মধ্যে মধ্যে এক আধটি উপমা পাওয়া যায়—তুলনারহিত। একটি—

ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন, দেখতে পাই না চোখে।
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন, বাণ মারে কোথা থেকে ॥

আর একটি—

এ ত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুণ গুণ স্বরে কেন অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।

এই সকল দেখিলে বুঝা যায়, রাম বসু এত যশস্বী হইয়াছেন কেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅনাথনাথ দেব।

ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ।

৩

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যার পক্ষপাতী হইয়া ঋক, যজুঃ, সামকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং "ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ" করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, একদিন নূতনের সহিত পুরাতনের বিবাদ বাধিয়াছিল। মনীষী রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-চিত্রিত এই বিবাদ কেবল বিতণ্ডায় পর্য্যবসিত হয় নাই। ইহা লইয়া উভয়দলের বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল! রবি বাবু লিখিয়াছেন,—"বহুপল্লবিত যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তিধর্ম্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল, তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড় ঝড় আসিয়াছিল। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটা বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙ্গিতে দেন নাই।" পুনশ্চ,—"বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল, যখন বিচ্ছেদের বিদারণ রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্গিরিত হইতে আরম্ভ করিল।" আবার এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—"ক্ষত্রিয়দল ধর্ম্মে ও আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধীদলের সহিত দীর্ঘ কাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।" রবি বাবুর এই সকল উক্তি পড়িয়া মনে হয় যে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা যাগ-যজ্ঞের সার্থকতা স্বীকার করিতেন না; পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞ করিয়া

যশ ও ধন লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়দিগের নূতন মত তাঁহাদের বৃত্তির বৃতি ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল বলিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। পরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বহুদিন ধরিয়া লোকক্ষয়কর সংগ্রাম চলিয়াছিল। ইহাই রবি বাবুর বিরাট আবিষ্কার। ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জাতিগত বিবাদ, রবি বাবুর উক্তিতে ইহাঁই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু এই বক্তৃতার দুইটি স্থানে রবি বাবু স্বয়ংই উপর্য্যুক্ত উক্তির প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রিত বক্তৃতার ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভের অষ্টম ছত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"সমাজে যখন একটা বড় ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয়, তখন তাহা একান্ত ভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে নাই।" অর্থাৎ, যখন ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন উহা কেবল ক্ষত্রিয়দিগের জাতীয় গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না,—ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও উহা সংক্রমিত হইয়াছিল। আবার পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষে তিনিই লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পর বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দলেও অনেক ক্ষত্রিয় ছিল, ক্ষত্রিয়দিগের দলেও ব্রাহ্মণ ছিল। যদি তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, রবি বাবু উহাকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জাতিগত বিবাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন কেন? যে বিবাদে দুই পক্ষেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় জাতির চমূ যুদ্ধ করিয়াছিল, সে বিবাদটি তিনি ভাবগত বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? এই নিরঙ্কুশ কল্পনাকলিত বিবাদকে তিনি জাতিগত বিবাদ বলিয়া কেবল বর্ত্তমান সময়ের জাতিবিদ্বেষের প্রবর্দ্ধমান অনলে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। যদি এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণজাতির সহিত ক্ষত্রিয়াভিমানী কোনও জাতির প্রধূমিত বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বংশধরগণ এই অবিবেচক কবিকেই তাহার জন্য দায়ী করিবে। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—"এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন।" কোন পক্ষে কত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ ছিলেন, কবি তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। তবে তিনি লিখিয়াছেন যে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার এক দিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ—অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ।" রবি বাবুর এই অপূর্ব্ব মৌলিক মতকেই যদি তর্কের অনুরোধে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, রবি বাবুকে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বপক্ষে ছিলেন সপ্ত অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়, আর বিপক্ষে ছিলেন একাদশ

অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় ও তিন জন মাত্র ক্ষত্রিয়ের প্রতিপালিত ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ, রবি বাবুর নিজের উক্তিমত ক্ষত্রিয় পক্ষে ক্ষত্রিয়-সংখ্যা নিতান্ত অল্পই ছিল, আর ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিপক্ষ দলে ক্ষত্রিয়-সংখ্যা অধিক ছিল; আর ছিলেন তিন জন মাত্র ক্ষত্রিয়ের আশ্রিত ও প্রতিপালিত ব্রাহ্মণ। অথচ কবির মতে ইহাই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ!

রবি বাবু আবার লিখিয়াছেন,—"বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ পক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয় পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে আশ্রয় করিয়াছে।" রবি বাবু বিশ্বামিত্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং বিশ্বামিত্র আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত করিতেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে * উহার প্রমাণ আছে। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মণদিগকেই দান করা কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়াই বিশ্বামিত্র বলিয়াছিলেন;—

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্রাজধর্ম্মমবেক্ষতে। নির্ব্বেষ্টুকামো বিপ্রোঽহং দীয়তামিষ্টদক্ষিণা॥

"হে রাজন্! তুমি যদি রাজধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ,—আমাকে অভিলষিত দক্ষিণা দান কর"

সংস্কৃত সাহিত্যে "বিপ্র" শব্দ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও জাতির প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, তিনি আপনাকে স্পষ্টই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাং। তপসোঽত্র সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণ্যস্যামলস্য চ।
মন্যসে যদি তৎক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে বলং পরং॥ মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ॥
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ; ৮।৭৪-৭৫

"অরে ক্ষত্রিয়াধম! এই সামান্য অর্থকে যদি তুই আমার যোগ্য যজ্ঞ-দক্ষিণা মনে করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে তুই শীঘ্রই আমার উগ্র তপস্যার, অমল ব্রাহ্মণের তেজের, প্রবল প্রভাবের ও বিশুদ্ধ অধ্যয়নের বল দর্শন কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্রও বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আবার রাজা দশরথও বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন;—

যস্মাদ্বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম। ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া।
পূর্ব্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ॥ তদদ্ভুতমভূদ্বিপ্র পবিত্রং পরমং মম॥—রামায়ণ।

হে বিপ্রেন্দ্র! আজ আমি আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম, আজ আমার

* রবি বাবু এই উপাখ্যানটি অন্য স্থলে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুপ্রভাত ও জীবন সার্থক হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনি তপস্যার দ্বারা রাজর্ষি হইয়াছিলেন, এখন ব্রহ্মর্ষি হইয়া বহুগুণে আমার পূজ্য হইয়াছেন। আপনার দর্শনমাত্রেই আমার সমস্তই পবিত্র হইয়াছে।

সুতরাং বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিবাদে উভয় পক্ষই ব্রাহ্মণ ছিলেন,—কোনও পক্ষই ক্ষত্রিয় ছিল না। অথচ রবি কবি, ঐ বিবাদকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা কেহ কখনও বলে নাই, তাহা বলিলেই যে মৌলিকত্ব প্রকাশ পায়! সেই জন্য মৌলিকত্ব-বিকাশ-প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ এই প্রকারে জাতিবিদ্বেষজনক তথ্যের রচনার দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাসন্ধানে রত হইয়াছেন। পুরাণাদিতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদ ব্যক্তিগত বিবাদ বলিয়াই কীর্ত্তিত আছে। উহার সহিত সামাজিক বিপ্লবের কোনও সম্বন্ধই নাই।

সত্যসন্ধ রবি বাবু লিখিয়াছেন.—"এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।" সাহিত্যক্ষেত্রে রবি বাবুর নিকট আমরা এরূপ তঞ্চকতার আশা করি নাই। যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে চক্রবর্ত্তিত্বের স্পর্দ্ধা করেন, নিম্ন শ্রেণীর মোক্তারের ন্যায় তাঁহাকে তথ্য-গোপন করিতে দেখিলে কেবল যে বিস্মিত হইতে হয়, তাহা নহে; পরন্তু আমাদের জাতীয় উন্নতিস্বপ্নেও হতাশ হইতে হয়। আমরা রবি বাবুর এই সাহিত্যিক-শঠতা-প্রদর্শনের জন্য এই বিষয়টির একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

রবি বাবু হরিশ্চন্দ্রের যে উপাখ্যানটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র প্রাগসিদ্ধা বিদ্যা সকলকে উগ্র তপস্যা অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতেছিলেন, সেই জন্য তাহারা ভয়ে স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রোদন করিতেছিলেন। মূলে কি আছে, দেখুন ;—

বিশ্বামিত্রোঽয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্য্যবান্। সাধ্যমানাঃ ক্ষমামৌনচিত্তসংযমিনাঽমুনা।
প্রাগসিদ্ধাভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ব্রতী। তা বৈ ভয়ার্ত্তা ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং ময়া।

(বিঘ্নরাজ বলিতেছেন) বীর্য্যবান্ ও ব্রতী বিশ্বামিত্র অতুল তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাগসিদ্ধ ভবাদির বিদ্যাগুলিকে সাধনা করিতেছেন, ক্ষমা

মৌনচিত্ত সংযমাবলম্বনকারী এই বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সাধ্যমানা হইয়া সেই বিদ্যা-গুলি ভায়ার্ত্তা হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আমার এখন কি কর্ত্তব্য?” ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ঐ বিদ্যা সকল কেহ পূর্ব্বে সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, বিশ্বামিত্র ভবাদির সেই বিদ্যাগুলিকে অধিগত করিবার জন্য ক্ষমা মৌন চিত্তসংযম প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতেছেন। পাছে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অধিগতা হইতে হয়, এই ভয়ে ঐ বিদ্যা সকল স্ত্রীমূর্ত্তি ধরিয়া কাঁদিতেছিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রের ভয়ে বিঘ্নরাজ উঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় সেই ক্রন্দন শুনিয়া ক্রন্দন-শব্দানুসারী হরিশ্চন্দ্রকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া বিঘ্নরাজ হরিশ্চন্দ্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করেন। স্ত্রীজাতির উপর পীড়ন হইতেছে মনে করিয়া হরিশ্চন্দ্র অত্যাচারীকে লক্ষ্য করিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি জানিতেন না যে, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক সাধ্যমানা বিদ্যারা ঐরূপ ক্রন্দন করিতেছিল। হরিশ্চন্দ্রের গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধ জন্মে।

বিশ্বামিত্র স্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা তন্নৃপতে র্ব্বচঃ।
ক্রুদ্ধে চার্ষিবরে তস্মিন্নেশু বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ॥

অনন্তর সেই নৃপতির বাক্যশ্রবণে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইলে সেই বিদ্যাগুলি নাশপ্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ, বিশ্বামিত্র ক্ষমা, মৌন ও চিত্তসংযম দ্বারা যে বিদ্যা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, ক্রোধের ফলে তাঁহার ক্ষমা, মৌন, চিত্তসংযম ও তপস্যা নষ্ট হইল, সুতরাং তপস্যার ইষ্ট-ফলস্বরূপ সেই অধিগতপ্রায় বিদ্যাগুলিও নাশ পাইল। *

পাঠক দেখুন, মূল পুরাণে “ব্রাহ্মণের বিদ্যা” সম্পর্কে কোনও কথাই নাই, “ভবাদির বিদ্যা”র কথা আছে। ভব শব্দে কখনই ব্রাহ্মণ বুঝায় না।

---

* শমীক তাঁহার পুত্র শৃঙ্গীকে বলিয়াছিলেন ;—

ক্রোধো হি ধর্ম্মং হরতি যতীনাং দুঃখসঞ্চিতম্।
শম এব হি যতীনাং ক্ষমিণাং সিদ্ধিকারকঃ॥

—মহাভারত।

বশিষ্ঠ তাঁহার পৌত্র পরাশরকে বলিয়াছিলেন ;—

——পরমর্ষয়ঃ।
বর্জ্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত মা তদ্বশো ভব।

বিদ্যাগুলি বিশ্বামিত্র দ্বারা পীড়িত হয় নাই, সাধিত হইতেছিল। উৎকট তপস্যার দ্বারা সাধিত হইয়া পাছে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অধিগতা হইতে হয়, এই ভয়ে তাহারা মূর্ত্তিমতী হইয়া কাঁদিতেছিল। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের পরুষ বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; ক্রোধের ফলে বিদ্যাগুলি বিনষ্ট হয়। যে বিদ্যালাভের জন্য তিনি বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, হরিশ্চন্দ্রের জন্য সেই বিদ্যাগুলি প্রায় তাঁহার অধিগত হইয়াও হইল না,—সেই জন্য তিনি হরিশ্চন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং হরিশ্চন্দ্রকে কৌশলে রাজ্য সম্পদ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত ও সুসভ্য রবি বাবু এই উপাখ্যানটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতেও পারেন; কিন্তু উহার অপহার বা অপহ্নব করিয়া নূতন থিওরী রচিতে পারেন না। বিশেষতঃ যে তথ্যটুকু তাঁহার থিওরী-রচনার ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—সেইটুকুই তাঁহার অলীক-তথ্যোদ্ভাবিনী কল্পনার অপূর্ব্ব রচনা। ইতিহাসের ধারা-সন্ধানে এ পথ অনুসরণীয় নহে।

সুতরাং রবি বাবুর মুখ্য উদাহরণগুলির দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জাতিগত বিবাদ প্রতিপন্ন হইল না। কিন্তু রবি বাবু আরও দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন। প্রথম উদাহরণ জরাসন্ধ-বধ। বলা বাহুল্য, জরাসন্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। রবি বাবু লিখিয়াছেন যে, জরাসন্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষপাতী ছিলেন। "ব্রাহ্মণের পক্ষপাতী", এই কথার অর্থ কি? অন্যান্য ক্ষত্র রাজার ন্যায় জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে ব্রাহ্মণগণও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সৎকার করিয়াছিলেন। যথা—

তত্রৈনং নাগরাঃ সর্ব্বে সৎকারেণাভ্যযুস্তদা।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা রাজন্ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥

—মহাভারত, সভাপর্ব্ব;—২৪।৩১

"হে রাজন! তথায় ব্রাহ্মণপ্রমুখ নগরবাসীরা যথাবিহিত কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সৎকার করিয়াছিলেন।" যদি ব্রাহ্মণগণ জরাসন্ধের "পক্ষীয়" হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা জরাসন্ধের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের যথাযোগ্য সৎকার করিতেন না। সুতরাং সপ্রমাণ হইল যে, জরাসন্ধ কৃষ্ণের বিবাদ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ নহে।

রবি বাবু লিখিয়াছেন,—"এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল।" এই

উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেবল নৃপতিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভীষ্ম বাসু-দেবকে অর্ঘ্য দিবার প্রস্তাব করেন। ভীষ্ম বলিয়াছিলেন,—"ক্রিয়তামর্হণং রাজ্ঞাং যথার্হম্ ইতি ভারত।" "রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর।" রাজন্য-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করেন। শিশুপাল রাজন্যদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন,—

নায়মর্হতি বার্ষ্ণেয়স্তিষ্ঠৎস্বিহ মহত্মসু।
মহীপতিষু কৌরব্য রাজবৎ পার্থিবার্হণম্॥
* * * * *
কথং হ্যরাজা দাশার্হো মধ্যে সর্ব্বমহীক্ষিতাম্।
অর্হণামর্হতি তথা যথা যুষ্মাভিরর্চ্চিতঃ॥

মহাত্মা মহীপতিগণ এইখানে উপস্থিত থাকিতে বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ রাজার ন্যায় রাজপূজা পাইবার যোগ্য নহেন। * * * তোমরা সমস্ত মহীপতিদিগের মধ্যে রাজ-নামের অনধিকারী দাশার্হ ব্যক্তিকে যেরূপে অর্চ্চনা করিলে, সে কি প্রকারে ঐ প্রকার পূজার যোগ্য হইতে পারে?

সুতরাং বুঝা গেল যে, কেবল ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে প্রধান বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কোনও ব্রাহ্মণই শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানে আপত্তি করেন নাই। সুতরাং উহা ক্ষত্রিয়দিগের গৃহবিবাদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

শিল্প ও সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই লেখক শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীর 'তন্ত্ররহস্য'। তন্ত্র শিল্প, না সাহিত্য? স্বামীজী লিখিয়াছেন,—তন্ত্র ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে 'রৌরব' নামক নরক ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এ কালে 'নরকই গুলজার'; বাঙ্গালী কি নরকের ভয় করে? শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'বিবিধ শিল্পদ্রব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে 'চিত্র করিবা'র কাপড়ের পরিচয় দিয়াছেন। এখন শিল্পবিষয়ক এইরূপ প্রবন্ধসমূহের প্রয়োজন হইয়াছে। মূল্যবান বস্ত্রে দিতে তৈলের বা কালীর দাগ লাগিলে কিরূপে তাহা তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়, শ্রীললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীজীবানন্দ মল্লিকের 'সমালোচকের প্রতি' নামক দ্বাদশপদী কবিতাটি 'শিল্প ও সাহিত্যে' কেন প্রকাশিত হইল? মল্লিক কবি কি কখনও কোনও মাসিকে উমেদারী করিয়াছিলেন? কোনও স্পষ্টবাদী সমালোচকের বেত্রাঘাতে ব্যথিত হইবার ফলেই কি তাঁহার এই উচ্ছ্বাস? 'ত্যাজ্যপুত্র' শ্রীজীবানন্দ মল্লিকের রচিত একটি গল্প। মল্লিক জ্যৈষ্ঠের গরমে কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ গল্পের সমালোচনা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। বঙ্গসাহিত্যের আগাছা সাফ্ করিবার জন্য ধারালো কাস্তের দরকার। আগাছা যদি মাথা নাড়িয়া বলে, 'কাস্তে হে, তুমি কি নির্দ্দয়! কোনও দিকে না চাহিয়া কচাকচ্ আমাদের মুণ্ডপাত করিতেছ,' তাহা হইলে কাস্তে কি তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে? শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তীর 'বর্ণ-চিত্রণ' সুলিখিত—চিত্রশিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র সফরে' 'সফরে' নাই; কেবল শফরী ফরফরায়তে। এক রাশি কাজিলের বক্তৃতা! পাঁচ পৃষ্ঠা প্রবন্ধ পড়িয়া জানিতে পারিলাম, লেখক ১৯০২ অব্দের ৩রা জুলাই প্রাতঃকালে 'ক্লাইব' নামক জাহাজে কলিকাতার বন্দর ত্যাগ করিয়া বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিলেন, এবং 'কালাপানি'তে প্রবেশ করিলেন। লেখকের ভাষা ফেনাইবার শক্তির নিকট বাঙ্গালার জিভিংষ্টোন শ্রীযুত জলধর সেনও পরাজিত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য-সমাচার। আষাঢ়। সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্. বি. মহাশয় গত বৈশাখ মাস হইতে চিকিৎসাবিষয়ক এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত করিতেছেন। কার্ত্তিক বাবু এই পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক যে পত্রিকার সম্পাদক, তাহা যে অল্পদিনেই বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তাহা অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। এ দেশে এরূপ মাসিকের অভাব ছিল। কার্ত্তিক বাবুর এই দেশহিতব্রত ও লোকহিতকামনা সফল হউক। সমাচারের আকার প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। অথচ বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ এক টাকা মাত্র ধার্য্য করিয়া ডাক্তার বসু ইহার বহুল প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। আশা করি, এই নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশের প্রত্যেক শিক্ষিত-পরিবারে দিন-পত্রিকার ন্যায় স্বাস্থ্যসমাচার সমাদর লাভ করিবে। বঙ্গদেশে রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়লাভের জন্যও স্বাস্থ্যনীতিজ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। সমাচার দুই খণ্ডে

বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে নারী রোগের বিবরণ ও তাহার প্রতীকারের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য ও পথ্য সম্বন্ধে উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে 'খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ' বিচারিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি নৈপুণ্য ও সাবধানতার সহিত লিখিত। ইহা ডাক্তার বসুর বহুদর্শিতার ফল। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'যক্ষ্মা' সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যক্ষ্মা দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু যাঁহাদের বিশ্বাস, যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইলে আর নিস্তার নাই; এই প্রবন্ধ-পাঠে তাঁহারা আশ্বস্ত হইবেন। এ দেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িতেছে। কি ভাবে তাঁহাদের জীবনযাপন কর্ত্তব্য, লেখক তাহা নিপুণভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে যক্ষ্মারোগীরা উপকৃত হইবেন। ডাক্তার শ্রীযুত গিরীন্দ্রশেখর বসু বি.এস.সি.,এম্. বি. 'ম্যালেরিয়া-নিবারণের উপায়' লিখিয়া ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত বঙ্গপল্লীসমূহের অধিবাসিবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গিরীন্দ্রশেখর বসুর উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে ম্যালেরিয়াক্রান্ত পল্লীসমূহের ম্যালেরিয়াভীতি প্রশমিত হইতে পারে। 'খাদ্য ও পথ্য' শীর্ষক খণ্ডে এবার 'পাকা আমের গুণ' বর্ণিত হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, সুমিষ্ট পাকা আমের যে এত গুণ, তাহা পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না। দয়ালু ডাক্তার বসু মহাশয় সুমিষ্ট রসাল-রসে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। 'চর্ব্বণের উপকারিতা' উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার শ্রীযুত লালমোহন ঘোষাল এল্. এম্. এস্. 'সংক্রামক রোগে সাধারণের কর্ত্তব্য' নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে এবার বসন্ত, প্লেগ ও কলেরার আলোচনা করিয়াছেন। এই তিনটিই ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি, সুতরাং ইহাদের প্রতিশোধ ও প্রতীকারের উপায় সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রবন্ধগুলির ভাষা এরূপ সরল যে, যাহাদের বর্ণপরিচয় হইয়াছে, তাহারাই পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। সমাচারের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট; সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় ইহাকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।

অর্ঘ্য। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের সাহিত্যিকের গল্প উপভোগ্য। তবে বঙ্কিম বাবুর মাংসভোজনে ও চা-পানে কিরূপ অনুরাগ ছিল, তাহা না জানিলেও সাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। 'সাহিত্যের গল্পে' বঙ্কিম বাবু, মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে দুই একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক বৃহৎ ব্যাপার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মনুষ্য-চরিত্রের বিশেষত্ব সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—'একখানা চটুকে নক্সার থিয়েটার লোকে ভরে যায়, কিন্তু ম্যাকবেথে লোকের রুচি হয় নি; তাই সেক্সপিয়রের দিকে আর যাইনি।' কি মর্ম্মভেদী সত্য! গোয়েন্দার গল্পেই যে দেশের লোকের রুচি, সে দেশে উৎকৃষ্ট উপন্যাসের রচনা বিড়ম্বনামাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের মত অসামান্য প্রতিভার অধিকারী না হইলে এই দূষিত রুচিস্রোতের পরিবর্ত্তন-সাধন অন্যের অসাধ্য। সুতরাং অনেক প্রতিভাশালী উপন্যাসিককেও বিরহিণীর গুপ্ত কথা লিখিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইতেছে। দেশের দুর্ভাগ্য নহে কি? 'মহাকাব্য ও গীতিকাব্য' শ্রীকালিদাস রায়ের রচনা; কবি কালিদাস কবিতা ত্যাগ করিয়া গদ্যরচনায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আশার কথা বটে। লেখক উপসংহারে

লিখিয়াছেন,—'গীতিকাব্য প্রাণের কথা বলিয়া আমাদের নিকট সহানুভূতি গ্রহণ করে। *মহাকাব্য মহত্ত্বকে আদর্শ বলিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করে।*'—কেবল পূজা পাইবার জন্যই কি মহাকাব্যের সৃষ্টি? শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-অবলম্বনে 'হর-গৌরীর পরিণয়' নামক পৌরাণিক আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন: কিন্তু প্রবন্ধের ভাষা কাদম্বরীকে না হউক, কালীসিংহের মহাভারতকে লজ্জা দিয়াছে। যথা, 'তাঁহার করিকরসদৃশ ঊরুযুগ, মৃণালকোমল ভুজদ্বয়, ভুবনমোহন তনু দেহযষ্টি, অম্লান 'শারদেন্দু'র ন্যায় বদনমণ্ডল, কুরঙ্গ-লাঞ্ছিত নয়নযুগল দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতেন।' 'মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত বদনকমল কিশলয়বেষ্টিত সদ্যঃপ্রস্ফুট গোলাপের ন্যায়, উজ্জ্বলতারকাবলিমণ্ডিত সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইত।"—ভাষার এমন ঘটা সচরাচর দেখা যায় না। তবে 'তারকাবলিমণ্ডিত সুধাকর' দর্শন আমাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। বদনকমল কখনও গোলাপের মত, কখনও সুধাকরের মত শোভা পাইত, এরূপ বর্ণনায় 'ওরিজিন্যালিটী' আছে, অস্বীকার করিতে পারিব না। কবির উক্তি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরাও বলিতে পারি;—'কমলে 'গোলাপোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।' 'ওমরের পথে' শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-কুমার রায়ের দ্বিতীয় দফা অনুবাদ।—ব্যর্থ চেষ্টার নিদর্শন।

> The eternal saki from that bowl hath pour'd
> millions of bables like as, and will pour.

ইহার অনুবাদ হইয়াছে,—

> 'অনাদি-রূপিণী সাকি উলটি' পিয়ালা
> ঢালিছে, ঢালিবে হেন কত বিন্দু জল।'

মূলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আছে বটে, কিন্তু

> 'কৈশোরে শুনেছি তর্ক সুবিজ্ঞ কুটীরে—
> বিদ্রূপ চৈতন্যে মোর, পঙ্ক ক্রোধে ঘিরে,
> সংজ্ঞা উপাধিক। কি বৈদগ্ধ্য-জাল!
> তিমিরেই গিয়া আমি ফিরেছি তিমিরে।'

পাঠ করিয়া মনে হয়, 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।' কিছুই বুঝিবার যো নাই।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র 'হুগলি জেলার কবিওয়ালা' লিখিয়াছেন। হুগলী জেলায় অনেক কবি-ওয়ালার জন্ম হইয়াছিল। বঙ্গের অনেক জেলাতেই বহু 'কবি' জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও পদগুলি সংগৃহীত হইলে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস-রচনার উপাদান পাওয়া যায়। মিত্র লেখকের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। প্রবন্ধটি বড় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুবিখ্যাত কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেব বহুকাল গোঁদলপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য লেখক প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত করিবার আশা দিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এণ্টনি 'এদেশে এক ব্রাহ্মণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল' এই সংবাদটুকু দিয়াই লেখক প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে এণ্টনি সাহেবের অনেক পদ এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়; সেগুলি যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনই মধুর, একটি পদ এইরূপ—

'কহ সখি কিছু প্রেমের কথা,
শুনিব বলিয়া এসেছি হেথা।

* * *

কোন্ প্রেমে হরি ত্যজে' ব্রজনারী
এলো মধুপুরী ক'রে অনাথা ?
কোন প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবী লতা ?"

এইরূপ পদগুলি যদি সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে লেখকের শ্রম সফল হইবে। শ্রীসীতানাথ কাব্যরত্ন 'আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যে 'কুসৃষ্টি'র কারণ-নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া দৈববাণী করিয়াছেন,—'সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে বাঙ্গালা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করা কঠিন।' কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন না হইয়াও অনেক আধুনিক লেখক শুদ্ধ ও সুমিষ্ট বাঙ্গালা লিখিয়া থাকেন। এমন কি, অনেক কাব্যরত্ন, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যতীর্থও তেমন বাঙ্গালা লিখিতে পারেন না। সিংহের স্ত্রীলিঙ্গে অনেক মূর্খ 'সিংহিনী' লেখে, এবং তাহাদের কেতাব তেলের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হয় বটে, কিন্তু রসিকের স্ত্রীলিঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোনও হস্তিমূর্খকে 'রসিকিনী' লিখিতে দেখি নাই। ইহা কাব্যরত্নের স্বকপোলকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। 'এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী লেখকগণের লেখনী হইতেই ভাষার এই অবিসহ লাঞ্ছনা' প্রভৃতি দুঃসহ বিড়ম্বনার হস্ত হইতে বঙ্গভাষাকে মা সরস্বতী উদ্ধার করুন। কাব্যরত্ন লিখিয়াছেন,—'আদর্শ সাবিত্রী কিংবা দময়ন্তীর চিত্র উপন্যাস কিংবা নাটকে বিরূপ আকার ধারণ করিলে সত্য ও সৌন্দর্য্য উভয়েই যুগপৎ লুপ্ত হইয়া যায়।" এ কথা কি সত্য ? যাহা আদর্শ, চিরদিন তাহা আদর্শ-রূপেই পূজিত হইবে; তাহাতে কালি ঢালিয়া কেহ তাহাকে মসীলাঞ্ছিত করিতে পারিবে না। মাইকেল 'মেঘনাদবধে' রাবণকে রাম অপেক্ষা বড় করিয়া আঁকিয়াছেন। সে জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ খর্ব্ব হয় নাই; রামায়ণের গৌরবও নষ্ট হয় নাই। অতএব কাব্যরত্ন মহাশয় আপনি বৃথা রোদন সংবরণ করুন। বিদ্যাবিনোদের 'ধ্রুব' চলিতেছে।

সুপ্রভাত। আষাঢ়। শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্তের 'এসিয়াখণ্ডে পর্টুগীজ ও ডচ্ সওদাগর' সঙ্কলিত প্রবন্ধ হইলেও রচনা-গুণে উপন্যাসের ন্যায় মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এমস বার্টন' নামক ক্রমশঃপ্রকাশ্য আখ্যায়িকাটি চলিতেছে। 'গরীব ম্যাকসামের ডাকনামের রহস্য এই যে এক সময়ে তার ভাণ্ডার অনেক প্রবাদবাক্যে পূর্ণ ছিল।' আখ্যায়িকার আরম্ভেই এই উদ্ভট ভাষার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় না;—যদি বা অতি কষ্টে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু 'মিঃ কিচেট নিতান্ত দুঃখভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন' দেখিয়া পাঠের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত এইরূপ 'বিট্‌কেল' বাঙ্গালায় লিখিত। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের 'নামদেব ও তাঁহার উপদেশ' ভক্তিরসপূর্ণ; পরমার্থতত্ত্বপিপাসু-

গণ ইহা পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন গুপ্তের 'আনন্দাশ্রু' নামক চারি ছত্রের কবিতায় হর্ষ ও অশ্রু স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কথা কাটাকাটি করিতেছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের 'আকবর-কথা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়ের 'চন্দ্রের অবস্থা' তেমন আশাপ্রদ না হইলেও, চাঁদের ছবিখানি মন্দ নহে। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুসমাধি' মহামতি ষ্টেডের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। এই শ্রেণীর অনেক কবিতা অপেক্ষা এটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। 'হীরার পাহাড়' শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'গল্প'। হেমেন্দ্রকুমার এখন কেবল 'ভরাডুবি'র গল্প লিখিতেছেন। অন্য একখানি মাসিকে তিনি গল্পের নায়ককে পদ্মার জলে ডুবাইয়াছেন; আর এই গল্পের নায়িকাকে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ডুবাইয়া মারিয়াছেন। 'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।' শ্রীঅনুরূপা দেবীর 'বিপর্য্যয়' এখনও চলিতেছে, পরিসমাপ্তির নামগন্ধ নাই। লেখিকার গল্পের অনুরূপ ভাষা বঙ্গসাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। 'জলে স্থলের নির্জ্জনতায় উপর দিয়া যেন একটি কর্ম্মাবসানের বাঁশী কোন সেই অদৃশ্য কুঞ্জবিতানের মধ্য হইতে সেই পুরাতন সুরটি ধরিয়া বাজিয়া উঠিয়া গৃহমুখীন পল্লীবধূগণের সজল চরণচিহ্নরাগ দ্রুত কম্পনে মৃত্তিকাপটে লিখিত করিতেছিল।'—মুরলীধর শ্রীবৃন্দাবনে বাঁশী বাজাইয়া যমুনা উজানে বহাইয়াছিলেন, সেই বাঁশীর গানে ব্রজগোপীদের কুলমান ভাসিয়া গিয়াছিল; সে বাঁশী বাঁশের; তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—'যে দেশে বাঁশীর ঘর সে দেশে না যাব; ঝাড়ে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।'—একালেও অনেক সৌখীন যুবা বাঁশী বাজায়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত 'কর্ম্মাবসানের বাঁশী' কাহাকেও 'ফুঁকিতে' দেখি নাই। তবে সেই বাঁশী যখন 'গৃহমুখীন পল্লীবধূগণের সজল চরণচিহ্নরাগ দ্রুত কম্পনে মৃত্তিকাপটে লিখিত করে', তখন না দেখিলেও আমাদের অনুমান হইতেছে, সে বড় সাধারণ বাঁশী নয়। শ্রীপ্রতিভা নাগের 'দেবী রাবেয়া' সুলিখিত সন্দর্ভ। শ্রীসত্যবন্ধু দাস 'বঙ্গীয় ঔপন্যাসিক সাহিত্যে মহিলা-কবির অভাব' নিবন্ধে আক্ষেপ করিয়াছেন। আক্ষেপে পাণ্ডিত্য আছে। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন,—'অনেক রমণীর লেখায় দেখিতে পাই, তাহাদের যেন ভাষায় কৃত্রিমতার সৃষ্টির, স্থানে অস্থানে অলঙ্কারের অতিপ্রয়োগের, এবং যশস্বী লেখকদের ভাষার জলবৎ অনুকরণস্পৃহার আধিক্য আছে।...কি উপন্যাসে, কি কবিতায়, প্রসাদ গুণের অভাব, একটা ধোঁয়া ধোঁয়া 'কোয়াসাময়' ভাষার সৃষ্টি,—কৃত্রিম ভাববিকাশের চেষ্টা আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়।' যে সকল মাসিকের সম্পাদক বা সম্পাদিকাদিগের উৎসাহে এই শ্রেণীর অসার রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাঁহাদের নির্ব্বাচনশক্তিও যে তীব্র কশাঘাতের যোগ্য, লেখক মহাশয় সে কথাটিরও উল্লেখ করিতে পারিতেন। শ্রীশৈলবালা দেবীর 'পুত্রের প্রতি জননী'তে বীররস মূর্ত্তিমান; কিন্তু তাহা মেরুদণ্ডহীন।
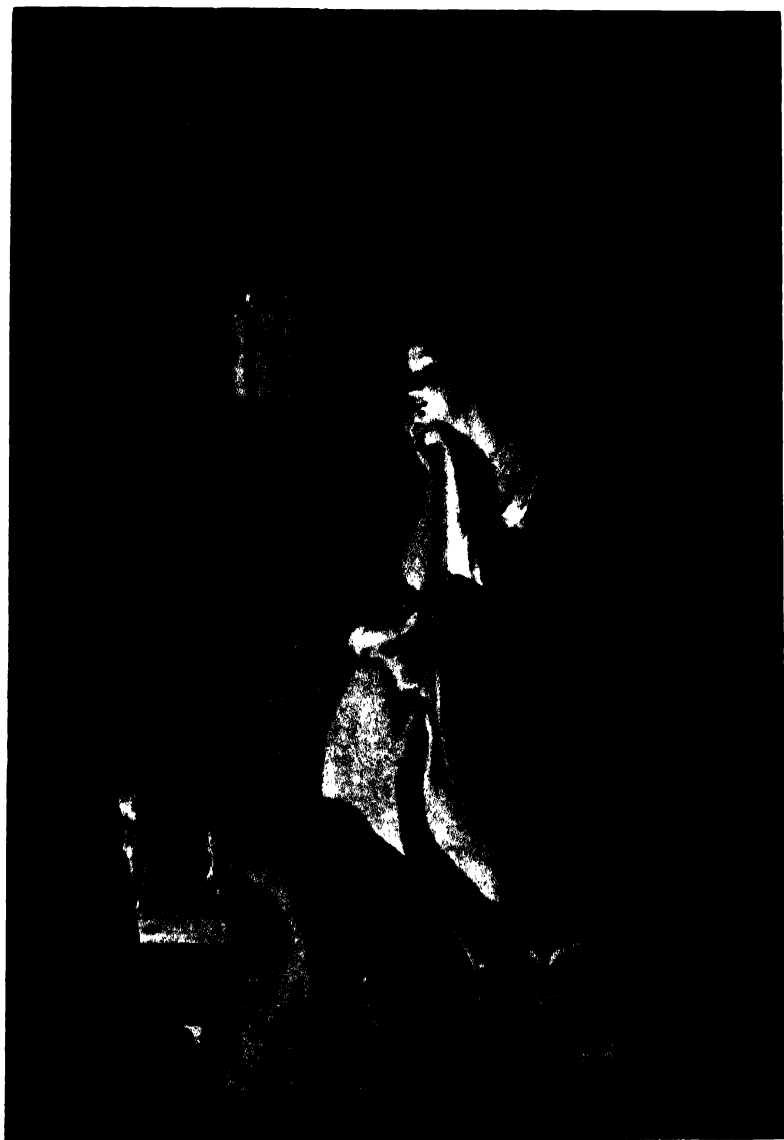
বিষাদিনী

চিত্রকর,...টমাস ডন্‌কান্‌।

K. V. Seyne & Bros.

প্রবাসে।

১

শান্ত এ কান্তারপ্রান্তে শ্রান্ত আমি, বন্ধুগণ !
ক্লান্ত এই বৃক্ষতলে বসি আমি কিছুক্ষণ ;
আমারে দিও না বাধা—তোমরা একটু এগিয়ে যাও—
এ সৌন্দর্য্যরাজ্যমাঝে আমায় একটু ছেড়ে দাও।

২

—পড়েছে ঐ সূর্য্যরশ্মি গিরিচূড়ায়—মনোহর !
পড়েছে ঐ সূর্য্যরশ্মি তরুশিরে—কি সুন্দর !
মাঠের উপর রাঙ্গা মাটী, সবুজ—গাছের চারিধার,
আকাশে এক রঙ্গের খেলা খেলে যাচ্ছে—চমৎকার।
গাভীগুলি দলে দলে বিজন পথে যাচ্ছে সব ;
পাখীগুলি ফিচ্ছে নীড়ে—কি মধুর ঐ কলরব !
বড় বিজন, বড় স্তব্ধ !—এ স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল !
প্রাণের মধ্যে গভীর শব্দে বেজে উঠছে বাল্যকাল।
এমনি চেয়ে দেখতাম গাঁ কি দেওঘরের গিরিবন !
তথাপি কি প্রভেদ দুয়ে !—কি আশ্চর্য্য বিবর্ত্তন !
তখন একটা আশার আলোক ঘেরে থাক্‌ত ললাট তা'র,
এখন ক্লান্তির অবসাদে ঘেরে আসে অন্ধকার ;
একটা হর্ষ, একটা দীপ্তি, একটা গীতি, আজি হায়,
একটা মহামহিমা—এ মুছে গেছে বসুধায় ;
এখন চোখে ঝাপসা দেখি, মনের মধ্যে করি বাস,
এখন শুধু চিন্তা আসে, ঘনিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

৩

সে দিন আমি পাই না ফিরে !—সেই দীর্ঘ অবকাশ,
সেই দীপ্তি, সে অতৃপ্তি, সেই শক্তি, সে উল্লাস।
—আবার বালক হ'ব আমি, শুধু আমি এই চাই—
শিশুর মত ভালবাসি, শিশুর মত হাসি গাই।

৪

জীর্ণ বস্ত্রসম জরায় ছুঁড়ে ফেলে, আবার চাই—
ঘাটের উপর জুটি সবাই ; মাঠের উপর ছুটে যাই ;
গাছে উঠে ফল্‌সা পাড়ি ; আঁক্‌শী দিয়ে পাড়ি ফুল ;
বিছিয়ে কাপড় শিউলি কুড়াই ; জলে হেঁটে পদ্মফুল ;
বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলা ; সকাল বেলা পড়ার ধূম
সন্ধ্যাটি না হ'তে হ'তেই বিছানাতে পড়ে' ঘুম ;
পুকুর-পাড়ে ঘোড়ার বাচ্ছা ধরে' চড়ে' বেগে ধাই ;
ঝম্প দিয়ে নদীর বক্ষে সাঁতার কেটে চলে' যাই ;
যৌবনের সেই প্রথম বিকাশ নিজভাবে ওতপ্রোত ;
বাহুর মধ্যে শিরায় শিরায় নূতন শক্তির অনল-স্রোত;
প্রথম শ্রমের পারিশ্রমিক ; নিজের পায়ে দিয়ে ভর
আবার গিয়ে সাজাই নিয়ে নিজের বাড়ী নিজের ঘর ;
আবার করি দশের সঙ্গে যশের যুদ্ধ—করি জয় ;
বাজ্‌ছে শুনি বিজয়-ভেরী উচ্চরবে সহরময় ;
শত্রুগণের পরাভূতি, মিত্রজনের ভক্তিস্তব ;—
করি আবার নূতন শক্তি শিরায় শিরায় অনুভব।

৫

মধুমাসে এলোমেলো মলয়-বায়ুর পাগল ঢং,
বকুল ফুলের মুকুল-গন্ধ, অশোক পাতার কচি রং,
শরৎকালের রঙ্গিন সন্ধ্যা, গ্রীষ্মকালের পলাশবন,
বর্ষাকালে প্রথম মেঘের প্রথম গুরু গরজন,
পাড়াগাঁয়ে বৎসরান্তে 'রাজার বাড়ী' দুর্গোৎসব,
ছেলের ভাতে অঙ্গিনাতে বন্ধু জনের কলরব,
সাগরবক্ষে প্রভাত বায়ে পাইল তুলে' বাওয়ার সুখ,
স্বদেশেতে বাল্যস্মৃতি, বিদেশেতে চেনা মুখ,
বিয়ের রাতে সাহানাতে প্রথম নিশার অবসান,
যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নে চুম্বনের সেই সুরাপান,
জীবন-কুঞ্জে হেনার গন্ধ আকুল অন্ধ বাসনায়,
—কে আছিস্ রে—আজি আমায় জীর্ণ প্রাণে দিয়ে আয়।

৬

তবে—উষার মত ভূষায় সেজে হাসিগুলি চলে' আয় !
রাঙ্গা পায়ে নেচে নেচে আয় রে আমার কোলে আয় !
অধরপুটে দুধের গন্ধ, মুঠোর মধ্যে জবাফুল,
মাথার উপর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল,
দিয়ে বেতাল করতালি, বেসুর সুরে গেয়ে গীত,
নিজেই বিভোর—নিজের গানে নিজেই যেন বিমোহিত ;
ওরে কান্ত, ওরে চপল, কাঁধে আমার দিয়ে ভর,
বুকের উপর লতিয়ে উঠে গলাটি মোর জড়িয়ে ধর।

৭

বাল্যে পড়া মহাভারত রামায়ণের উপাখ্যান—
বিষ্ণুর মহা যোগনিদ্রা, হিমালয়ে শিবের ধ্যান,
রামের হরধনুর্ভঙ্গ, ধনঞ্জয়ের লক্ষ্যভেদ,
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, রামের যজ্ঞ অশ্বমেধ,
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, পরীক্ষিতের সর্পভয়,
হনুমানের লঙ্কাদাহ, দশাননের পরাজয়,
জহ্নু মুনির নিঃশেষ করা গণ্ডূষেতে গঙ্গাজল,
ইন্দ্র-বৃত্রে তুমুল যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল,
আলাদীনের মায়া-প্রদীপ, আলিবাবার গুপ্তধন,
হার্কিউলিসের বাহুবল ও আকিলিসের মহারণ,
কন্দর্পের সে পুষ্পধনু, উর্ব্বশীর সে অভিসার,
হেলেনের সে কামাগ্নিতে ট্রয়রাজ্য ছারখার !
ক্লিওপ্যাট্রার কটাক্ষেতে রোমের শৌর্য্য নতশির,
দুইটি জাতির মহা নৃত্য রূপের তালে পদ্মিনীর ;
তোদের চক্ষে তোদের নৃত্যে, কল কণ্ঠে—সেই সব
আবার পড়ি, আবার করি প্রাণের মধ্যে অনুভব।

৮

আবার ছুটি চিন্তারাজ্যে, প্রাণের তৃষায় করি ধ্যান—
জগতের এক নূতন তথ্য, নূতন অর্থ, নূতন জ্ঞান।
পৃথিবী উড়িছে শূন্যে সূর্য্যে করি' প্রদক্ষিণ ;
চাকার মত ঘুরে যাচ্ছে ক্রমাগত রাত্রিদিন ;

চৌতালেতে নৃত্য করে—জ্বলে' উঠে নিভে যায়—
কোটী সূর্য্য কোটী গ্রহ কোটী চন্দ্র নীলিমায় ;
এ মহা ক্ষুলিঙ্গবৃষ্টি—মহাসৃষ্টি মহানাশ—
বক্ষে ধরে' দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে স্তব্ধ নীলাকাশ ;
ভাবে মনে—বিশ্বপতির এ কি খেলা বিস্ময়,
কেন বা এ মহাসৃষ্টি ? কেন বা এ মহালয় ?
এ কি একটা নিয়ম ? কিংবা বিশ্বপতির স্বেচ্ছাচার ?
এ কি একটা অধঃপতন ? এ কি একটা অগ্রসার ?
ইহার আদি দেখি নাই ত, জানি না তার কোথায় শেষ ;
জানো কি তা—সত্য বল—তুমিই নিজে পরমেশ ?
নিয়ে এসো সে সব প্রশ্ন, আমার পাত্র ভরে দাও ;
শিরায় শিরায় ঢেলে দাও আজ, আমায় পাগল করে' দাও।

৯

—না না—ঐ যে রশ্মিরাজ্য আকাশ থেকে নেমে যায় ;
ঐ যে দূরে যশের ডঙ্কা ধীরে ধীরে থেমে যায় ;
একটা তীব্র উন্মাদনা হয়ে আসে ম্রিয়মাণ,
সন্ধ্যা হয়ে আসে, দিবা হয়ে আসে অবসান।
চলে' যা সব চলে' যা রে—শূন্য হাসির অট্টরব ;
তাতে শান্তি ?—মনের ভ্রান্তি—নিতান্তই অসম্ভব।
বাল্য-ক্রীড়া, প্রেমের স্বপ্ন, যশের বাস্প, ডুবে যায়—
মহা শোকের অশ্রুজলে, মহা গভীর সমস্যায়।

১০

তবে আয় রে মলিনমুখী শীর্ণদেহ দীর্ণপ্রাণ !
সর্ব্ব অঙ্গে পদাঘাত ও লাঞ্ছনা ও অপমান ;
রুক্ষ মাথায় উড়্‌ছে ধূলি ; রিক্ত শুষ্ক করতল ;
অঙ্গ বেয়ে পণ্ডশ্রম ও গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল ;
নাইক পেটে অন্নকণা ; শীতে কাঁপে ছিন্নবাস ;
অশ্রুবারি, শুষ্ক নেত্র, আর্ত্তধ্বনি, দীর্ঘশ্বাস।
—অশ্রুর রাজ্য নিয়ে আয় রে, হাসির রাজ্য ঘুচে যাক্ ;
অনুকম্পায় কেঁদে আমার সকল দুঃখ ঘুচে যাক্।

১২

যেথায় ভগ্ন দেবমন্দির—রুক্ষশিরে দুল্‌ছে বটে ;
বিশাল ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত শূন্য মঠ ;
মড়ক শুয়ে থাচ্ছে খাবি—ক্রোশের মধ্যে নাইক কেউ ;
শুষ্ক নদী, ঊষর ক্ষেত্র, মরুভূমির বালুর ঢেউ ;
বাড়ীর ভিটেয় চর্‌ছে ঘুঘু, উঠনে তা'র জম্‌ছে ঘাস,
মৃত গৃহস্বামীর আত্মা ফেল্‌ছে এসে দীর্ঘশ্বাস ;
শীতের ঘন কুজ্ঝটিকা পাকিয়ে উঠ্‌ছে চারিধার ;
দিবার মৃত্যুর পরপারে ঘনিয়ে আস্‌ছে অন্ধকার ;
ভগ্ন রাজধানীর ধ্বংস ভাব্‌ছে দিয়ে মাথায় হাত,
একটা মৃত শিল্প কর্‌ছে সিন্ধুনীরে অশ্রুপাত ;
একটা লুপ্ত সভ্যতা সে অসভ্যতার ক্রীতদাস ;
একটা আশার শিওরে জেগে একটা মহাসর্ব্বনাশ ;
একটা শুষ্ক ভালবাসা পায়নি যে তার প্রতিদান ;
বাৎসল্য যা হৃদয় দিয়ে কিন্‌ছে শুধু অপমান ;
দাক্ষিণ্য যা ফতুর হয়ে দ্বারে দ্বারে পাত্‌ছে হাত ;
কৃতের প্রতি কৃতঘ্নতা, দয়ার শিরে পদাঘাত ;
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক্—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহে' যাক্।

১৩

নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার,
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বান্ত—নিয়ে আয় সেই অশ্রুলোক।
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়ুরোপ ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরঙ্গীবের মৃত্যুভয়,
পাণিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয় ;
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতে ধরে' আমায় সেথায় নিয়ে চল্।

১৩

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
হাস্য করে' অর্দ্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চলে' যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়!
গলা ধরে' কাঁদ্‌তে শিখি গভীর সহবেদনায়;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে বসবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ।

১৪

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদ্‌তে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবনদান!
সত্যের জন্য দৃঢ় ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ,
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আর্ত্ত-রক্ষা দৃঢ়পণ;
পিতার জন্য পুরুর কৃচ্ছ, পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থিদান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান
সীতার সে স্বর্গীয় ক্ষমায় আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস।
সেই রাজ্যে নিয়ে যা রে, কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে—
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে;
উঠুক বন্যা, যেন তাহা স্বর্গের রাজ্যে ছাড়িয়ে যায়,
শেষে প্রাণের উজান টানে মায়ের পায়ে পড়িয়ে যায়।

১৫

গাঢ় হয়ে আসে রাত্রি; অন্ধকারের আবরণ
পড়ে' গেছে। ছেয়ে গেছে উপত্যকা গিরি বন;
উপরে অনন্ত শূন্যে কোটী কোটী জ্যোতিষ্মান
ঋষিবৃন্দ সমস্বরে ধরেছেন ঐ সামগান—
এত গাঢ়! সে সঙ্গীতে ডুবে গেছে শব্দ তার,
জ্যোতিতে সে কেঁপে উঠে হয়ে গেছে একাকার।

স্তব্ধ ধরা ; শিওরেতে কাঁদে শুধু ঝিল্লীরব ;
ধরার বক্ষে দুরু দুরু করি মাত্র অনুভব।
শুধু মহা মৃত্যুসম কৃষ্ণ নভ ঘন স্থির ;
পক্ষ দিয়ে ঘিরে আছে এ রহস্য পৃথিবীর।

১৬

গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসে অন্ধকার ;
এই বিশ্বে আমি একা, কেহ যেন নাহি আর।
গভীর রাত্রি !—সহযাত্রী—কোথা তারা ?—কেহ নাই,
শ্রান্তপদে অন্ধকারে একা বাড়ী ফিরে যাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মন্দ্রার স্বয়ংবর।

১

রাজকুমারী মন্দ্রার তন্দ্রা আসিতেছিল। বোধ হয়, প্রায় তের শত বৎসর পূর্ব্বে। তখন এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম, অন্য দিকে নির্ব্বাণোন্মুখ বৈদিকধর্ম্মের সংঘর্ষণে রাজন্যবর্গ প্রাতঃকালে তন্দ্রাভিভূত হইতেন।

ইহার ঠিক কারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু কথা সত্য। কারণ, যে দেশের কথা বলিতেছি, তাহার নাম অঙ্গ। সেই অঙ্গদেশে দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত অন্ধ্র নামক বংশ অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিল। সেই বংশের এক জন মহাবীরপুরুষ রাজা সত্যসেন চম্পাই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরে ধান্যপূর্ণ মিথিলা ও মৎস্যদেশ ; দক্ষিণে গঙ্গানদীর সেকালের অপূর্ব্ব সুন্দর তট হইতে কলিঙ্গের নিবিড় বন পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

সেই বীর সত্যসেন 'কর্ণ' উপাধি ধারণ করিয়া রাত্রিকালে জাগিতেন, এবং দিনমানে নিদ্রা যাইতেন। যাহা সাধারণ সর্ব্বভূতের নিশা, তাহাতে সংযমী পুরুষ জাগিয়া থাকেন। অত্যন্ত রৌদ্রমূর্ত্তি, প্রবলপ্রতাপ সত্যসেন। রাত্রিকালে তান্ত্রিক ; প্রাতঃকালে বৈদিক পূজাপাঠ সাঙ্গ করিয়া, প্রহর বাজিবার পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করিতেন। কেহ কেহ বলিত, দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় আফিংএর নেশার ন্যায় কার্য্য করিতেছিল।

ঠিক জানা যায় না। কিন্তু কতকগুলি পুস্তক ও পুঁথি, পত্র ও নথি, ভগ্নপ্রস্তর ও কোদিত তাম্রলিপি ও কাংস্যফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অন্ততঃ ইহা বোধ হয় যে, সত্যসেনের হস্ত ও পদ, অসি ও চর্ম্ম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মুক্ত হইয়া দোষী ও নির্দ্দোষ, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে বেমালুম ও বিনা আপত্তিতে বর্ষিত হইত।

সকলে থরহরি কম্পমান!

সেই রাজার একমাত্র কন্যা মন্দ্রা। মন্দ্রা চিত্রাঙ্গদার মত ধনুর্ব্বাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে সময়ে ও অসময়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। জঙ্গলে ও পর্ব্বতে, বালুকা-সৈকতে ও শ্মশানে সর্ব্বত্রই মন্দ্রা। মন্দ্রার অব্যর্থ সন্ধান!—পশু ও পক্ষী, তস্কর ও চোর—সকলেই তটস্থ।

ক্ষীণা, দীর্ঘকেশা মন্দ্রা। নিবিড় কৃষ্ণপল্লবের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত স্থির দৃষ্টি। দীর্ঘায়তনা, ষোড়শী গৌরীর মত ভুবনমোহিনী। মৃণালবৎ হস্ত প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। সে হরিণীর ন্যায় চঞ্চলা ও ক্ষিপ্রগতি।

অনেকবার স্বয়ংবরের কথা হইয়াছিল। কিন্তু দুই শত যোজনের মধ্যে কোনও পুরুষশ্রেষ্ঠ মন্দ্রার ভয়ে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

শুধু যে কাহাকেও পছন্দ হইত না, তাহা নহে। মন্দ্রার মতে, সকলে ভয়ানক চোর, লম্পট ও দস্যু। রাজত্বে আসে যায়, আসুক যাউক। বাস করে, আপত্তি নাই। কিন্তু বিবাহ? কি ভয়ানক!

রাজা সত্যসেন কেবল কন্যা মন্দ্রাকে ভয় করিতেন। দেশের রাজা প্রজা মন্দ্রাকে ভয় করিত। অতএব মন্দ্রা কুমারী থাকিয়া গেল।

মন্দ্রার মাতা ছিল না। রাণীর মৃত্যুর পর পিতার ভার মন্দ্রা লইয়াছিল। রাজত্বের ভার, যৌবনের ভার, সুখ দুঃখের স্মৃতিভার, জ্ঞান ও ধর্ম্মের ভার লইয়া সেই অপূর্ব্ব মেয়েটি!

প্রকাণ্ড গৃহ। রাজসভা সজ্জিত। সপ্তাহ পরেই অমাবস্যা। শ্যামাপূজার তুমুল আয়োজন ও নিমন্ত্রণের পরামর্শ। বহু অমাত্য ও কতিপয় মিত্ররাজ্যের রাজকুমার উপস্থিত।

মন্দ্রা সিংহাসনের পশ্চাতে উপবিষ্টা। অদূরে উন্নতগ্রীব, বিশালবক্ষ, কর্ণসুবর্ণের রাজপুত্র, মন্দ্রার করপ্রার্থী, কুমার নায়ক সিংহ সুন্দর দেহ পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া সেই অদ্ভুতচরিত্রা অপূর্ব্ব বালিকার রূপ দেখিতেছিলেন।

সকলেরই মত যে, পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে অন্দদেশে শ্যামাপূজা হওয়া উচিত।

রাজা সত্যসেন বলিলেন, 'কুমারী মন্দ্রার মত লও।'

মন্দ্রা কি ভাবিতেছিল। সে নিষ্কম্প ও স্থির দৃষ্টি ধরণীর উপর রাখিয়া চিন্তামগ্না হইয়া পড়িল। ক্রমে সকলের তন্দ্রা আসিল। রাজার আসিল, অমাত্যগণের আসিল, প্রজাগণের আসিল।

নিদ্রাশূন্যা মন্দ্রার চক্ষুতেও আসিল। কি আশ্চর্য্য! মন্দ্রার বহু চেষ্টা সত্বেও চক্ষু অলস হইল।

সেই সময় বিরাট সুসজ্জিত গৃহদ্বারে এক জন ভিক্ষু উপস্থিত।

২

ভিক্ষুর মস্তক মুণ্ডিত নহে। হস্তে কমণ্ডলু নাই। শুভ্র উত্তরীয়। বালক কি যুবা, বুঝা যায় না। বলিষ্ঠ কি ক্ষীণ, বুঝা যায় না।

দৃষ্টি বৈরাগ্যপূর্ণ। আকার রহস্যময়। কেশভারের মধ্যে ঈষৎ জটার রেখা। মুক্তাদন্তের মধ্যে তুষারের মত ঈষৎ হাস্যরেখা। প্রশস্ত ললাটে ঈষৎ চিন্তার কুঞ্চন।

বর্ণ দীপ্ত। প্রশান্তপাদবিক্ষেপে ভিক্ষু গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, 'সকলের মঙ্গল হউক।'

বিরাট গৃহের সহস্র তন্দ্রাপূর্ণ চক্ষু তাহার দিকে পতিত হইল।

হঠাৎ নিদ্রায় বাধা পড়াতে রাজা সত্যসেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

'এ লোকটা চোর।'

ভিক্ষু দুই হস্ত তুলিয়া কহিল, 'আপনার মঙ্গল হউক।'

তখন মন্দ্রা পিতার কর্ণে কি কহিয়া ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল

'তুমি কোন রাজ্যের প্রজা'?

ভিক্ষু। বিশ্বরাজ্যের।

মন্দ্রা। তোমাকে ছদ্মবেশী দস্যু বলিয়া বোধ হয়।

ভিক্ষু। মঙ্গল হউক।

মন্দ্রা। কে মঙ্গল বিধান করিবে?

ভিক্ষু। জীব আপনার মঙ্গলের আপনিই বিধান করিয়া থাকে।

মন্দ্রা। তোমার পরামর্শরূপ ঋণ আমরা গ্রহণ করিতে চাহি না।

ভিক্ষু। আমি ঋণ দিব না, দান করিব। এই বিশাল রাজ্যে নৃশংস তান্ত্রিক শ্যামাপূজার আয়োজন হইতেছে। সৃষ্টির প্রাকালের শ্যামাপূজার ব্যভিচার হইতেছে। আপনারা জ্ঞানলাভ করিয়া নিবৃত্ত হউন।

মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, 'এ লোকটা বৌদ্ধ।' সেনাপতি রুদ্রনারায়ণ বলিলেন, 'ইহাকে বন্ধন করিয়া শূলে দেওয়া উচিত।'

মন্দ্রা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পুনরায় কঠিনভাবে কহিল, 'আমরা শ্যামাপূজা নিশ্চয় করিব। শত সহস্র বলি দিব। তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? তোমার ন্যায় ক্ষুদ্রপুরুষের তাহা রোধ করিবার কি শক্তি আছে?'

রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া হাসিলেন সকলে ভাবিয়াছিল, মন্দ্রা শ্যামা-পূজায় ঘোর আপত্তি করিবে। কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইয়া মন্দ্রার মত ফিরিয়া গেল। মন্দ্রার স্বভাবই এইরূপ।

ভিক্ষু দর্পসহকারে মস্তক উন্নত করিয়া মন্দ্রার প্রজ্বলিত নয়নের দিকে স্থিরভাবে চাহিল।

'রাজকুমারী মন্দ্রা! আপনাকে শ্যামাপদে বরণ করিলে, কত সহস্র বলিদানে আপনার তৃপ্তি হয়?'

মন্দ্রা। তুমি দেবদ্বেষী দুরাচার। প্রথমতঃ তোমাকেই বলি দিয়া আমি তৃপ্ত হইব।

ভিক্ষু। আমি স্বীকৃত আছি। এই ক্ষুদ্র জীবের বলিদানে আপনার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হউক। আপনার প্রজাগণের হউক। সত্য বটে, দুর্দ্দম্য প্রকৃতির সংহারশক্তির রোধ করিবার বল আমার নাই; কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতিই তাহা সংবরণ করিয়া সংসার আনন্দময় করিয়া থাকেন। আমি কেবল তাহার উদ্দীপনা করিব।

মন্দ্রা। কোন উপায়ে?

ভিক্ষু। নিমিত্তমাত্র হইয়া, সেবা করিয়া, জ্ঞানের প্রচার করিয়া, সংযম শিক্ষা করিয়া। কুমারী! এই বিশাল রাজ্য পতনোন্মুখ। রাজার হৃদয়ে করুণা না থাকিলে, রাজা আত্মত্যাগ না শিখাইলে, এক রাজা ভাঙ্গিয়া শত সহস্র রাজা হইবে, রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে। ধর্ম্মের জ্বলন্ত বহ্নি রাজসিংহাসনের আধারভ্রষ্ট হইয়া অন্য আধার অবলম্বন করিবে। এই মহাবিপ্লবের কালে করুণা না থাকিলে, স্নেহ পবিত্রতা, সাম্য শান্তি ও প্রীতি না থাকিলে, সকলেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই বৃহৎ রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। মদ্য মাংসের শ্রাদ্ধ ও সতীত্বের অপলাপ হইতেছে। নিঃসহায় জীবের বলিদানে প্রবৃত্তির পথে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। কুমারী মন্দ্রা! পুনরায় শ্যামাপূজার প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনারা অলক্ষ্যে ঘোর তামসিক প্রবৃত্তি

টানিয়া আনিতেছেন। আত্মবলি শিখাইয়া পূজার প্রতিষ্ঠা করুন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণও দেবীর মন্দিরে প্রসাদ খাইয়া যাইবে।

বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজা সর্ব্বপ্রথমে। মন্দ্রা কহিল, 'এ লোকটা ক্ষিপ্ত। ইহাকে দেবদত্ত পূজারীর বহির্ব্বাটীতে বন্দী করিয়া রাখ।'

৩

বৃদ্ধ দেবদত্ত পূজারী ঘোর শাক্ত। দেবদত্তের পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র বামনদাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিল্ববৃক্ষতলে বসিয়া বেদ পাঠ করিত। দেবদত্তের বৃদ্ধা গৃহিণী হরিনামের মালা জপ করেন। সংসারে আর এক জন ছিল। সে সত্যবতী।

সত্যবতী দেবদত্তের কন্যা। কি রকম কন্যা, তাহা সকলে জানিত না। কেহ কেহ বলিত, সত্যবতী ক্ষত্রিয়ানী। দেবদত্ত মিথিলা হইতে শৈশবকালে তাহাকে লইয়া আসে। সত্যবতীর বয়ঃক্রম এখন সপ্তদশ বৎসর। কেহ কেহ শুনিয়াছিল, মাঘীপূর্ণিমার মেলায় গঙ্গানদীতটে পরিত্যক্তা শিশুকে দেবদত্ত কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

সত্যবতী নিরুপমা সুন্দরী। সহাস্য-আননা, প্রেমময়ী বৈষ্ণবীর ন্যায়; সদাই গৃহকর্ম্মনিপুণা। সত্যবতীর সেবাই ব্রত। সেই ব্রতে তাহার জীবন ও যৌবন বর্দ্ধিত ও পালিত হইয়াছিল।

সেনাপতি রুদ্রনারায়ণ সিংহ মুক্ত-অসি-করে দেবদত্তের বাটীর প্রাঙ্গণে ভিক্ষুকে লইয়া উপস্থিত।

দেবদত্ত সসম্ভ্রমে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সেনাপতি। রাজকুমারী মন্দ্রার আজ্ঞায় এই বৌদ্ধভিক্ষু সাত দিন আপনার গৃহে বন্দী থাকিবে।

দেবদত্ত। প্রহরী থাকিবে ত?

সেনাপতি। না।

দেবদত্ত। সর্ব্বনাশ! যদি পলাইয়া যায়!

সেনাপতি। তাহার সহিত আপনার জটাপূর্ণ মস্তকও যাইতে পারে। অতএব তন্ত্র-মন্ত্র-বলে ইহাকে বাঁধিয়া রাখুন।

সেনাপতি চলিয়া গেলেন। দেবদত্ত ভিক্ষুর প্রতি চাহিল। সেই সুন্দর দেবতুল্য যুবার মূর্ত্তি দেখিয়া দেবদত্ত বুঝিল যে, ভিক্ষু পলাইবার লোক নহে। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেবদত্ত ডাকিল, 'সতী!'

সত্যবতী বাতায়ন দিয়া দেখিতেছিল। শীঘ্র বাহিরে আসিয়া নতমুখে কহিল, 'আজ্ঞা করুন।'

দেবদত্ত। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজকুমারী মন্দ্রার আজ্ঞায় সাত দিন বন্দী। ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর।

সত্যবতী হাসিয়া কহিল 'আচ্ছা। কিন্তু যদি পলাইয়া যায়?'

দেবদত্ত। বামনদাসের সহিত দৌড়িয়া পারিবে না। বামনদাসকে ডাক।

পিতৃআজ্ঞাক্রমে বামনদাস রাত্রিভাগে প্রহরী নিযুক্ত হইল। সত্যবতী দিবাভাগে দেখিবে।

ভ্রাতা ভগ্নীকে ভিক্ষুর ভার দিয়া দেবদত্ত মন্ত্রজপার্থ পুনরায় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ভ্রাতা বেদপাঠে নিযুক্ত হইল। সত্যবতী সাহসে ভর করিয়া ভিক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইল।

সত্যবতী। 'তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?'

ভিক্ষু কহিল, 'কুমারী! তোমার করতল দেখিতে চাহি।' সত্যবতী নির্ভয়ে ও সাদরে করপল্লব বিস্তারপূর্ব্বক ভিক্ষুর করে ন্যস্ত করিল। ভিক্ষু তাহা পরীক্ষা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। বোধ হয়, অনেক কালের কোনও কাহিনী, কিংবা কোনও ছিন্ন বন্ধন, অথবা কোনও লুপ্ত স্মৃতি ভিক্ষুর স্মরণপথে জাগিতে-ছিল। অতি বেদনাপূর্ণস্বরে ভিক্ষু ডাকিল, 'অমিতাভ!'

সত্যবতী। সে কি?

ভিক্ষু। তুমি আমাকে 'শরণ ভাই' বলিয়া ডাকিও।

সত্যবতী চমকিত হইয়া কহিল, 'তুমি আমার "শরণ" ভাইকে জান?'

ভিক্ষু। কি আশ্চর্য্য!

সত্যবতী। আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখি। গঙ্গানদীর উত্তরে, হিমালয়ের পদপ্রান্তে একটা অরণ্য আছে কি? সেখানে সীতার জন্ম হইয়াছিল। উজ্জ্বল বন। সোনার পাখী বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া বেড়ায়। ঋষির মত সরল মানুষ সেখানে আশ্রমে বাস করে! সেই বনে আমার 'শরণ' ভাই থাকে।

ভিক্ষু। না; আমি সে বনে থাকি না। সে বন এখন ব্যাঘ্র ভল্লুকে পরিপূর্ণ। আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু। দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াই।

সত্যবতী। কিন্তু আশ্চর্য্য নাম মিলিয়া গিয়াছে। আমার 'শরণ' ভাই ভিক্ষু নহে, রাজপুত্র।

ভিক্ষু। স্বপ্নের রাজপুত্র অপেক্ষা জাগ্রতাবস্থার ভিক্ষু ভাল। কেন না, এ ভাই সত্য, সে ভাই মিথ্যা। সতী! তুমি স্বপ্ন ছাড়িয়া সত্য অবলম্বন কর। সত্যবতী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, 'আচ্ছা।'

৪

রাজকোষাধ্যক্ষ লালা কিষণপ্রসাদ মনে মনে ভাবিল যে, রাজকুমারী মন্দ্রার অদ্ভুত আজ্ঞার একটা দুরূহ মতলব আছে। এক জন সুপুরুষ যুবাকে সত্যবতীর মত সুন্দরী যুবতীর গৃহে বন্দী করিবার কূটনীতি কিষণপ্রসাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লালা কিষণপ্রসাদ জাতিতে ক্ষত্রিয়। পুরাকালে যুদ্ধব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এবং লেখনীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের বংশ কালক্রমে কায়স্থ-বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। লালার বয়স ত্রিশ বৎসর। অবিবাহিত। শাক্তমতাবলম্বী। দিব্য কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি। দীর্ঘ পরিপাটী কেশ। লুকানো হাসি, চুরি করিয়া কটাক্ষপাত প্রভৃতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ। রাজ্যের মধ্যে কিষণপ্রসাদ এক জন বীর বলিয়া বিখ্যাত, এবং ধন রত্নাদি সমস্তই তাহার হস্তে থাকাতে, সকলে তাহাকে সেনাপতি ও মন্ত্রী অপেক্ষাও মান্য করিত। কুচক্রী কিষণপ্রসাদ রাজকুমারী মন্দ্রা ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিত না। কারণ, বল, বুদ্ধি, চক্র, সকলই মন্দ্রার নিকট ব্যর্থ।

কিষণপ্রসাদ দেবদত্তের প্রতিবাসী। সত্যবতীর অপূর্ব্ব রূপ ও বিমল চরিত্র দেখিয়া কিষণদাস ক্রমে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল যুবতীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব তাহার পদমর্য্যাদার পক্ষে অসম্ভব দেখিয়া, অবশেষে কিষণপ্রসাদ স্থির করিয়াছিল যে, কোনও প্রকারে সত্যবতীকে হরণ করিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিবে।

কিষণপ্রসাদ বহুকৌশলে সত্যবতীর হৃদয়ে এক খণ্ড শারদ মেঘের সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যবতী ভাবিত, কিষণপ্রসাদ তাহাকে ভালবাসে। তাহার অর্থ বুঝিতে গিয়া একটি চিন্তরেখার উৎপত্তি হইল। সেই রেখা হইতে ঈষৎ আন্দোলন আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিয়াছিল। এমন কি, কিছুদিন পূর্ব্বে নির্জ্জনে সত্যবতীকে পাইয়া, কিষণপ্রসাদ তাহার নিঃস্বার্থ হতাশ প্রেমের আভাষ জানাইয়া কাঁদিতে ছাড়ে নাই। এমন কি, সত্যবতীর সহিত বিবাহ না হইলে সে সংসার ছাড়িয়া কোনও অজ্ঞাততীর্থে গিয়া মরিয়া ভূত হইবে, এমন ভয়ও দেখাইয়াছিল। ভয়ে ও করুণায় অভিভূত হইয়া সত্যবতী বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, বাবাকে এ কথা বলিও।'

অভিলাষসিদ্ধির অনেকটা সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া কিষণপ্রসাদ সম্প্রতি দেহের পারিপাট্যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা বাধা পড়িয়া গেল। সেই বাধার সম্মুখে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পশ্চাতে রাজকুমারী মন্দ্রা।

চতুর কিষণপ্রসাদ বৌদ্ধভিক্ষুর অপূর্ব্ব যোগবলের মিথ্যা প্রবাদ রটাইয়া দেবদত্তের গৃহে দলে দলে লোক পাঠাইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া সন্ধ্যার সময় সুন্দরী কুমারীগণকে সন্ন্যাসিনীর বেশে, কখনও রূপসী বারাঙ্গনা-গণকে গৃহস্থকন্যার বেশে প্রেরণ করিত। সকলে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিত। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর অজেয় হৃদয়-দুর্গ এক কণাও বিচলিত হইল না। মিথ্যা প্রবাদ সত্যে দাঁড়াইল। সেই অসীমকরুণাময় মুখ দেখিয়া ও সেই মুখের স্নেহময়ী বাণী শুনিয়া সকলে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল।

ক্রমে কাণাকাণি হইয়া সকল কথা রাজকুমারী মন্দ্রার কর্ণে গেল। কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর সন্ধ্যাকালে রাজকুমারী দৃঢ়স্বরে সেনাপতি রুদ্রনারায়ণকে আদেশ দিলেন, 'কিষণপ্রসাদকে লইয়া আইস।'

৫

সেনাপতি গলবস্ত্র কিষণদাসকে লইয়া আসিল। সেনাপতিকে বিদায় দিয়া কুমারী মন্দ্রা বজ্রকঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিষণপ্রসাদ! তোমার অভিপ্রায় কি?' যোড়করে কিষণপ্রসাদ কহিল, 'রাজকুমারী! আপনি সকলের মাতৃস্বরূপা। আমি আপনার সন্তান স্বরূপ। আমার গোপনীয় কিছুই নাই। আমি সত্যবতীকে ভালবাসি। আপনি বোধ হয় না জানিয়া দরিদ্রের রত্নটিকে অন্যের হস্তে কোনও অজ্ঞেয় উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।'

মন্দ্রা। পাপিষ্ঠ! তুমি চরিত্রবিহীন তস্কর। তোমার মুখে ভালবাসার কথা শোভা পায় না।

কিষণপ্রসাদ। (বিনীতভাবে) আমি কালক্রমে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি। এখন সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া অন্য রাজ্যে গিয়া বাস করিব।

মন্দ্রা। কি নিঃস্বার্থ ভাব! অকৃতজ্ঞ পামর! এই রাজবংশের অন্নে পালিত হইয়া তুমি বিদ্রোহীর মত ব্যবহার করিতেছ না?

কিষণদাস। আমার অপরাধ কি?

মন্দ্রা। তুমি ভিক্ষুকে প্রলোভনে ভ্রষ্ট করিবার অভিলাষে পাপাচরণ করিতেছ। ফলে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইতেছে।

কিষণপ্রসাদ। সত্যবতী হইতে ভিক্ষুর মন অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করাই প্রলোভনের উদ্দেশ্য। ভিক্ষুকে নির্ব্বাসিত করিলেই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ হইবে। রাজকুমারী! এখনও সময় আছে, নচেৎ ভিক্ষু সত্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিবে।

মন্দ্রা। মিথ্যাবাদী!

কিষণপ্রসাদ। সকলই সত্য।

মান্দ্রার স্বর কম্পিত হইল। অঙ্গরাজ্যে মন্দ্রার ধীর নির্ম্মম স্বর পূর্ব্বে সেরূপ কম্পিত হইতে কেহ শুনে নাই।

'কিষণপ্রসাদ, কি সত্য?'

কিষণপ্রসাদ। সত্যবতী ভিক্ষুকে হৃদয় সঁপিতেছে।

মন্দ্রা। কিন্তু ভিক্ষু?

কিষণপ্রসাদ। সে দিয়াছে।

মন্দ্রা বাতাহত-বৃক্ষস্বননের ন্যায় বেদনাপূর্ণস্বরে কহিল, 'কি দিয়াছে?'

কিষণ। হৃদয় দিয়াছে।

মন্দ্রা। পাপিষ্ঠ! হৃদয় কি করিয়া দেয়, তাহা কখনও জান?

কিষণপ্রসাদ মনে মনে ভাবিল, অনেকটা জানিতে পারিয়াছি। এখন উপায়ের উদ্ভাবন বিজ্ঞের কার্য্য। প্রকাশ্যে কহিল.—'রাজকুমারী! অদ্য কিংবা কল্য পলায়নবার্ত্তা প্রচারিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন। এখন অধীনের প্রতি কি আজ্ঞা?'

মন্দ্রা। তুমি গতিরোধ করিবে। উভয়কে বাঁধিয়া আনিবে। সেনাপতির সাহায্য লইবে। অঙ্গরাজ্য হইতে বৌদ্ধভিক্ষুর কুমারী লইয়া—

কিষণপ্রসাদ। পলায়ন—

মন্দ্রা। অতি গুরুতর অপরাধ। তাহার দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।

কিষণপ্রসাদ চলিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভিক্ষু দেবদত্তের গৃহে ধ্যানমগ্ন। ধীরে ধীরে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সত্যবতী আর্ত্তস্বরে ডাকিল 'শরণ ভাই!'

নয়ন উন্মীলিত করিয়া ভিক্ষু কহিল, 'কেন সতী?' সত্যবতী কহিল, 'শরণ' ভাই! তোমাকে একটা কথা বলি নাই। আজ কিষণপ্রসাদ আমাকে তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে।'

ভিক্ষু বিস্মিতমুখে কহিল, 'সে কি সতী ? কিষণপ্রসাদ চরিত্রহীন, তাহা জানিয়াছি। তাহার কাড়িয়া লইবার কি অধিকার আছে ?

সত্যবতী। কিষণপ্রসাদ আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। আজ রাত্রিকালে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। নচেৎ দেশ ছাড়িতে হইবে। 'শরণ' ভাই, এ দেশে ধর্ম্ম নাই। আমি সন্ন্যাসিনী হইব। বুদ্ধের শরণ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব।

ভিক্ষু গৃহস্থিত মলিন দীপশিখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে কহিল 'তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সন্ন্যাসিনী! তবে তুমি প্রস্তুত হও। অরণ্য দুর্গম। হাঁটিতে পারিবে ?'

অলক্ষ্যে একটি নবীনশক্তি সত্যবতীর হৃদয় প্লাবিত করিতেছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সত্যবতী কহিল, "অরণ্য কোন ছার, অনায়াসে নদী পর্ব্বত পার হইয়া যাইব।"

জনহীন পথে, দ্বিপ্রহর নিশায়, দেবদত্তের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিল।

৬

সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে কুমারী মন্দ্রা চম্পাই গড়ের সিংহদ্বার পার হইয়া, ধনুর্ব্বাণ লইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে কুমার নায়ক সিংহকে ডাকিয়া কহিল, 'কুমার, তুমি অঙ্গরাজবংশের চিরসুহৃদ, অদ্য আমার একটি বিশেষ অনুরোধ রক্ষা কর।'

কুমার নায়কসিংহ স্মিতমুখে বলিলেন, 'মন্দ্রার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।'

মন্দ্রা। এই রাজধানীর দুইটিমাত্র পথ আছে। নিশাকালে বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারী সত্যবতীকে হরণ করিয়া একটি পথ বাহিয়া যাইতেছে। কোন পথে, তাহা জানি না। কিন্তু দুই দণ্ড পূর্ব্বে কিষণপ্রসাদের পত্র পাইয়াছি। রাজ-ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগের গতিরোধ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। কিষণপ্রসাদ ও সেনাপতি রুদ্রনারায়ণ চারি জন সুনিপুণ সৈনিকের সহিত এক পথে গিয়াছে। তোমার শৌর্য্য বিখ্যাত। একাকী অশ্বারোহণে অন্য পথে গিয়া ভিক্ষু ও সত্যবতীকে বন্দী কর। আমি প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিব।

কুমার নায়কসিংহ কশাঘাতপূর্ব্বক অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। মন্দ্রার ব্যস্তভাব দেখিয়া নায়কসিংহের মনে একটা মহাসমস্যা উদিত হইল। বৌদ্ধ ভিক্ষুর পথে মন্দ্রা কেন ?

অন্ধকারময়ী নিশা। নৈশ বায়ু দুরন্ত পর্ব্বতমালায় প্রতিহত হইয়া বনস্থলী

শিকার।

চিত্রকর— লে জন।

K. V. Seyne & Bros.

আক্রমণ করিতেছিল। পূর্ব্বদিকে খণ্ড খণ্ড মেঘ শুভ্রাকারে তারকাখচিত আকাশতলে উদিত হইতেছিল।

প্রায় এক ক্রোশ হাঁটিয়া সত্যবতী কহিল, 'শরণ ভাই, বোধ হয় অশ্বারোহী সৈনিকগণ আমাদিগের অনুসরণ করিতেছে।'

ভিক্ষু হাসিয়া কহিল, 'সত্যবতী, এ জীবনে অনেক সৈনিক দেখিয়াছি। কিন্তু তোমার রক্ষার্থ একটা উপায় করা চাই। ঐ উচ্চ শৈলখণ্ডের বাম দিক দিয়া অন্য একটি পথ গিয়াছে, তুমি সেই পথ দিয়া পলাও, আমি সকলকে নিরস্ত করিয়া তোমার নিকট যাইব।'

সত্যবতী ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। চারি জন অশ্বসাদী সেনাপতি রুদ্রনারায়ণের সহিত ভিক্ষুকে বেষ্টন করিল। কেবল কিষণপ্রসাদ অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিল।

পঞ্চবীর অসি নিষ্কাশিত করিয়া ভিক্ষুকে ধরিতে গেল।

এমন সময় কিষণপ্রসাদ চীৎকার করিয়া কহিল, 'সত্যবতী কৈ? সে নিশ্চয় অন্য পথে পলাইয়াছে।'

কিষণপ্রসাদকে সেই পথে গমনোদ্যত দেখিয়া বজ্র-নাদে ভিক্ষু কহিল, 'পাপিষ্ঠ, অমঙ্গল আহ্বান করিও না।'

মুহূর্ত্তের মধ্যে এক জন যোদ্ধার হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া ভিক্ষু বীরমূর্ত্তিতে রণস্থলে দাঁড়াইল। অসীম কৌশলে ও প্রতাপে চারি জন যোদ্ধাকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিল। ধূলিশায়ী যোদ্ধৃগণের মধ্যে সেনাপতি রুদ্রনারায়ণ সিংহ বহুক্ষণ যুঝিয়াছিল; অবশেষে কহিল, 'ভিক্ষু, তোমার বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল অপূর্ব্ব। বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তুমি একটা রাজসিংহাসন পাইতে।'

ভিক্ষু কহিল, 'বীর! অদ্য আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ ক্ষত্রিয়; কল্য পথের ভিখারী হইব। এখন দস্যুহস্ত হইতে ভিখারীর একমাত্র ধন—'

অন্ধকার ভেদ করিয়া নারীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হইল। ভিক্ষু দেখিল, অদূরে ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজকুমারী মন্দ্রা!

মন্দ্রা কঠোর স্বরে বলিল 'ভিক্ষু, রত্ন উদ্ধারের পূর্ব্বে এই শর হইতে প্রথমতঃ আপনাকে উদ্ধার কর।'

অব্যর্থ সন্ধানে তীক্ষ্ণশর ভিক্ষুর বাম চরণ বিদ্ধ করিল। তখন আকাশে ঘন মেঘ উঠিয়াছে। স্নিগ্ধ নৈশ বায়ু উগ্রভাব ধরিয়া বনস্থলী প্রকম্পিত

করিল। অন্ধকার ঘনীভূত হইল। মন্দ্রা আর ভিক্ষুকে দেখিতে পাইল না। কেবল একবার শুনিতে পাইয়াছিল, 'তুমি নির্দ্দোষ, তোমার মঙ্গল হউক।' সে স্বর ভিক্ষুর। বড়ই করুণ, বড়ই বিষণ্ণ স্বর।

বজ্র-নিনাদে অরণ্য পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল।

মন্দ্রা ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া গাঢ় অন্ধকারে পাগলিনীর ন্যায় ডাকিল, 'তুমি কোথায়, ভিক্ষু! তুমি কোথায়?' কিন্তু ভিক্ষু অদৃশ্য। কেবল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হইল, 'ভিক্ষু কোথায়?'

৭

কুমার নায়ক সিংহ আকাশের অবস্থা দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শিলাসন্নিকটে বিরক্তভাবে দণ্ডায়মান। এমন সময় বিদ্যুদালোকে সম্মুখে পলায়নপরায়ণা সত্যবতীকে দেখিতে পাইয়া তিনি কহিলেন, 'সুন্দরী, আমার বীরবংশে জন্ম; দুর্দ্দিন ও সুদিন, রণস্থল ও রঙ্গস্থল, সকলই দেখিয়াছি। এই অন্ধকারময়ী রজনীতে কণ্টক ও প্রস্তরময় পথ অবলাগণের পক্ষে গৃহপ্রাঙ্গণ নয়।'

কুমার নায়ক সিংহকে অঙ্গদেশে সকলেই জানিত। সত্যবতী বুঝিতে পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে কহিল, 'কুমার! আমি অনাথা আমাকে বন্দী কর, কিন্তু ভিক্ষু শরণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও।'

কুমার। তাঁহাকে ছাড়িবার অধিকার মন্দ্রার। আপাততঃ তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। অর্থাৎ, আপাততঃ। কারণ, তুমি পলাইতে জান না।

পশ্চাতে এক জন কহিল 'কখনও ছাড়িও না। ঐ রমণী আমার প্রণয়িনী।'

লালা কিষণপ্রসাদ যুদ্ধস্থলে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বারুণী পান করিয়াছিল। 'সত্যবতী! দাস সম্মুখে।'

সত্যবতী কাতরস্বরে কহিল, 'কুমার, রক্ষা কর।'

'কাহারও রক্ষা করিবার সাধ্য নাই' বলিয়া কিষণপ্রসাদ সত্যবতীর হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল।

কুমার নায়ক সিংহ ভাবিলেন, এ স্থলে গলা টিপিয়া পদাঘাত করাই প্রশস্ত, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করিলেন।

সত্যবতীকে মুক্ত করিয়া কিষণপ্রসাদকে বৃক্ষের সহিত উত্তরীয় দ্বারা

বাঁধিলেন। মন্দ্রা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সকলই দেখিয়াছিল। সেই সময় অদূরে ধ্বনিত হইল, 'সতী! সতী!'

সত্যবতী কুমারের হস্ত ধরিয়া কাতরস্বরে কহিল, 'ঐ আমার ভাই শরণ! কুমার উঁহাকে রক্ষা কর।'

গম্ভীরভাবে কুমার নায়ক সিংহ অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, 'কোথায় তুমি?'

ভিক্ষু কহিল, 'তুমি কে?'

কুমার। বৌদ্ধ ভিক্ষু! আমি নায়ক সিংহ। কোনও ভয় নাই; সত্যবতী নিরাপদ। লালা কিষণপ্রসাদও নির্ব্বিঘ্নে রক্ষে বন্দী।'

ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া নায়ক সিংহের হস্ত ধরিয়া কহিল, 'ভাই আমার পিতা অজিত সিংহ পাটলিপুত্রের যুদ্ধে তোমার পিতার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। আমি প্রায় চলচ্ছক্তিবিহীন। শর-বিদ্ধ। মন্দার পর্ব্বতের ঘোর বনে একটি কুটীর আছে, সেখানে গিয়া আশ্রয় লইব। কুমার নায়ক সিংহ! তুমি অদ্য যাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, আমার কনিষ্ঠা সেই সত্যবতী কুম্ভমেলায় দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়। মিথিলার রাজকুমারীকে তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। দেখিও।'

ভিক্ষু অদৃশ্য হইল। সত্যবতী দৌড়িয়া নিকটে আসিল। 'কুমার! আমার ভাই শরণ কৈ? শরণ কোথায় গেল?'

নায়ক সিংহ কহিলেন, 'কুমারী সত্যবতী, যে বুদ্ধ তোমার ভ্রাতাকে আশ্রয় দিয়াছেন, আমরা তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম। তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি এই শিলাকন্দরে আশ্রয় লও। আমি চতুর্দ্দিকের গতিক একটু বুঝিয়া দেখি।'

মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। বিজন পথ ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইল। সেই অন্ধকারময় অরণ্যপথে নায়ক সিংহ বিদ্যুদালোকে দেখিতে পাইলেন, পাগলিনীর ন্যায় রাজকুমারী মন্দ্রা!

তমিস্রা ভেদ করিয়া মন্দ্রার চক্ষু ভিক্ষুর অনুসরণ করিতেছিল। নায়ক সিংহকে দেখিয়া মন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, 'কুমার, ভিক্ষু কোথায় গেল?'

ধীরে ধীরে নায়ক সিংহ কহিলেন, 'কেন মন্দ্রা?'

মন্দ্রা। নায়ক সিংহ! তুমি কখনও ভালবাসিয়াছ?

ঈষৎ হাসিয়া নায়ক সিংহ কহিলেন, 'বোধ হয় ভালবাসার পরিচয় দিবার এ স্থল নহে, সময়ও নহে। সাত বৎসর ধরিয়া যে কথা হৃদয়ে

লুকাইয়া রাখিয়াছি, অভিনয়ের শেষ অঙ্কে সে কথা প্রচার করা কত দূর সঙ্গত, কিংবা অসঙ্গত—'

মন্দ্রা। কুমার, আমি তোমার প্রণয়ের যোগ্য নহি। ভাই! মার্জ্জনা করিও। আমার নির্ম্মম পাষাণ-হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে।

মন্দ্রা জ্ঞান হারাইয়া কুমারের বক্ষে স্বীয় মস্তক রক্ষা করিল। মন্দ্রার সিক্ত কেশ ও বসন দেখিয়া নায়ক সিংহ শিহরিয়া উঠিলেন, 'কুমারী মন্দ্রা! তুমি শীঘ্র প্রাসাদে ফিরিয়া যাও।'

মন্দ্রা কহিল, 'না। ভাই! আমারও জীবনের এই শেষ অঙ্ক। যে চরণ শরবিদ্ধ করিয়াছি, সেই চরণেরই অনুসরণ করিব। আমার সংসার ও স্বর্গ তাঁহারই পদতলে।' মন্দ্রা কাঁদিতেছিল।

কুমার নায়কসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, 'যাও, মন্দ্রা, যাও। মন্দার পর্ব্বতের দক্ষিণকুটীরে তাহাকে পাইবে।' মন্দ্রা গহন পথে আবার ছুটিল।

বৃষ্টি আসিয়াছে। শেষযামা চতুর্দ্দশী নিশি। নিঃশব্দে পা টিপিয়া সত্যবতী কুমারের পার্শ্বে আসিল। সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'কুমার, ও কে চলিয়া গেল?' সত্যবতী ভয়ে কাঁপিতেছিল। নায়কসিংহ কহিলেন 'অঙ্গরাজ্যের শক্তি মন্দ্রা।'

সত্যবতী। কোথায় যাইতেছে?

নায়ক। তোমার ভ্রাতা শরণের পদতলে। ঊর্দ্ধে বুদ্ধশক্তি, ধরাতলে রাজশক্তি, উভয়ই তোমার ভ্রাতার।

সত্যবতী। কুমার! তুমি মন্দ্রাকে ভালবাসিতে?

নায়ক। বোধ হয় বাসিতাম, কিন্তু—তুমি আমাদের কথা শুনিয়াছ?

সত্যবতী সলজ্জে কহিল, 'শুনিয়াছি। কুমার! এখন উপায় কি?'

সরলার সেই বালিকাসুলভ প্রশ্ন শুনিয়া নায়কসিংহের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। 'উপায় কিছুই নাই। সন্ন্যাস।'

সত্যবতী কহিল, 'না! তুমি সংসারে থাক, যদি কেহ ভালবাসে।'

গর্ব্বিতস্বরে নায়কসিংহ কহিলেন 'এ পরামর্শ মন্দ নয়।'

৮

ধীরে ধীরে নক্ষত্রমালা মেঘমুক্ত হইয়া আকাশে জ্বলিতেছিল। অতিশয় বিজন স্থানে, পর্ব্বতের পার্শ্বে, পুরাতন ভগ্ন কুটীর। সেই কুটীরে পর্ণশয্যায় ভিক্ষু একাকী শয়ান। শর-বিদ্ধ চরণ প্রস্তরের উপর রক্ষা করিয়া, বামবাহুর

উপর মস্তকভার বিন্যস্ত করিয়া আহত ভিক্ষু নিদ্রিত। চরণ হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত বিগলিত হইয়া পর্ণশয্যা রঞ্জিত করিতেছিল।

তখনও উষার সমাগম হয় নাই। বহু অন্বেষণের পর মন্দ্রা কুটীরদ্বারে আসিয়া দেখিল, ভিক্ষু নিদ্রায় অচেতন।

মন্দ্রা পদপ্রান্তে গিয়া বসিল। তীক্ষ্ণ শর মাংসপেশী ভেদ করিয়াছিল। মন্দ্রা অবলীলাক্রমে বহির্মুক্ত ফলক ভাঙ্গিয়া দিল; মন্দ্রা অঞ্চল হইতে বনলতা লইয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিল। তীক্ষ্ণ অসিধার দিয়া আলুলায়িত দীর্ঘ কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে কাটিয়া তাহার উপর জড়াইল। পট্টবস্ত্র ছিন্ন করিয়া পদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিল। চরণতল স্পর্শ করিয়া মন্দ্রা কৃতার্থ হইয়াছিল। চরণচুম্বন করিয়া মন্দ্রার নয়নযুগলে অশ্রুধার বহিল। নয়ন উন্মীলিত করিয়া ভিক্ষু কহিল, 'তুমি কে?' মন্দ্রা কহিল, 'দেব! আমি তোমার দাসী।' বিস্মিতলোচনে ভিক্ষু কহিল, 'স্বপ্ন!'

মন্দ্রা কহিল, 'সত্য। তুমি আমার জীবনের দেবতা। তোমার চরণ বিদ্ধ করিয়া আমি আত্মবলি দিয়াছি।'

মন্দ্রার সেই প্রথম ভালবাসা। মন্দ্রার নয়নে প্রত্যেক বিশ্বকণা প্রেমে ও করুণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভিক্ষু বল পাইয়া উঠিয়া বসিল।

'মন্দ্রা! আমি দেহী। দেবতা নহি। আমি মানব—সন্ন্যাসী। জগৎ আমার পক্ষে শূন্য। আমি অন্য পথে যাইতেছি। তোমরা সংসারের পথে থাকিয়া জগৎ উজ্জ্বল কর, আমরা দেখিয়া যাইব। মন্দ্রা! তোমার হৃদয়ে যে অসাম করুণা জাগিয়াছে, তাহা অঙ্গরাজ্যে প্রবাহিত হউক। সকলের মঙ্গল হউক।'

মন্দ্রা করযোড়ে কহিল 'জীবন-নাথ, তুমি সংসার ছাড়িয়া যাইবে না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলে।'

ভিক্ষু। কৈ, মনে পড়ে না।

মন্দ্রা। দেব! তুমি আত্মবলি দিয়া অঙ্গরাজ্যে করুণার উদ্দীপনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে। সেই সত্য-পাশে বদ্ধ থাক। ভিক্ষু! সংসার ছাড়িও না। সংসারে থাক। তোমাকে দেখিয়া আমরা শিখিব, তোমাকেই হৃদয়ের মন্দিরে পূজা করিব। আমাকে তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত কর। ভিক্ষু! বৌদ্ধধর্ম্ম বোধ হয় বড় সুন্দর ধর্ম্ম।

ভিক্ষু। মন্দ্রা! তুমি আমাকে সংসারের গৃহে বরণ করিতেছ?

মন্দ্রা। নিশ্চয়। ভিক্ষু! আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইও না। আমি বল-হারা হইয়াছি।

সেই ভুবনমোহন মুখের বিষাদময়ী বাণী শুনিয়া ভিক্ষু উঠিয়া দাঁড়াইল। চরণতলে নতমুখে উপবিষ্টা মন্দ্রাকে শক্তিপূর্ণ বাহুদ্বয়ে তুলিয়া কুটীরের বাহিরে লইয়া আসিল।

পূর্ব্বগগনে উষার কিরণ উভয়ের মুখে প্রতিভাত হইয়া অপূর্ব্ব চিত্রের সৃষ্টি করিতেছিল।

বৌদ্ধভিক্ষু মন্দ্রার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র মুখের উপর উভয় নেত্র নিবিষ্ট করিয়া কহিল, 'প্রেমময়ী! তুমি আত্মবিস্মৃতা হইতেছ। আমি কোন ছার? স্বয়ং দেবাদিদেব এই মায়ার মানরক্ষা করিতে গিয়া সংসারী হইয়া থাকেন। কুমারী মন্দ্রা! আমি বৌদ্ধ নহি, হিন্দু ক্ষত্রিয়। তন্ত্রের কলঙ্ক ও শক্তির অপব্যয় দূর করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি। মন্দ্রা! ছদ্মবেশে, ভিক্ষুবেশে, তোমার কর-প্রার্থী হইয়া, মিথিলার সিংহাসন ছাড়িয়া, বনে আসিয়া শরণসিংহ একবর্ষকাল রত্ন অন্বেষণ করিতেছিল। তাহা পাইয়াছে।

মন্দ্রার বক্ষ স্ফীত হইতেছিল। তাহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। মন্দ্রা প্রেমপূর্ণ নয়নযুগল শরণের দিকে ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, 'আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, তুমি ভণ্ড তপস্বী।'

শরণসিংহ। তবে শর বিদ্ধ করিয়া স্বয়ংবরের আয়োজন একটু অদ্ভুত।

কিন্তু মন্দ্রা পলাইয়া গেল।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্য।

বেদ-ব্যাখ্যা ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিধিনির্দ্দেশের জন্য প্রাচীনকাল হইতে অনেক সাহিত্য রচিত হইয়া আসিয়াছে। বেদগুলির বহু শাখা; এবং প্রত্যেক শাখায় নানা শ্রেণীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ-গুলির কোন্‌খানি কখন রচিত, তাহা সহজে ধরিতে পারা যায় না। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সুত্তপিটকের মধ্যে দীঘনিকায়খানি হয় ত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। যে সকল কথা ঐ গ্রন্থে দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভাবে আছে, তাহা মূলতঃ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত অন্য প্রাচীনতর অংশে পাওয়া যায়।

কাজেই দীঘনিকায়ে যে সকল আচার ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর কথা বলিয়া ধরিয়া লইলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখি না। এই দীঘনিকায়ে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে কোনও কোনও শাখা বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থের প্রচীনতা ও অর্ব্বাচীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

দীঘনিকায়খানি তিনটি বর্গে ও চৌত্রিশটি সুত্তে (১) বিভক্ত। সীলক্কন্ধ (শীলস্কন্ধ) নামক প্রথম বর্গের প্রথম সুত্তটির নাম ব্রহ্মজালসুত্ত। এই ব্রহ্মজালসুত্তে ও তৃতীয়সুত্তে, বা অম্বট্‌ঠ (২) সুত্তে ব্রাহ্মণ তাপস ও ব্রাহ্মণের অধিতব্য শাস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণটি এই ঃ—

ব্রাহ্মণ তাপসদিগের আটটি শ্রেণী (অট্ঠবিধা তাপসা), যথা ঃ—(১) সপুত্ত ভরিয়া, অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসারধর্ম্ম করিয়াও তপস্যারত থাকেন। (২) উন্‌ছাচারিয়া; অর্থাৎ, যাঁহারা কৃষকের ক্ষেত্রে যে সকল মুগ, মাষ প্রভৃতি শস্য পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া উদরপূর্ত্তি করেন। উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিলে যে সংসারত্যাগী হইতে হইত, তাহা নয়; তবে উন্‌ছাচারিয়া-গণ কোনও প্রকার উপার্জ্জনে মন দিতেন না। (৩) অনগ্‌গ পক্‌খিকা;—ইঁহারা ক্ষেত্রের পরিত্যক্ত শস্য কুড়াইয়া লওয়াও লোভের কার্য্য মনে করিতেন; এই জন্য কেবলমাত্র ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করিতেন। (৪) অসামপাকা;—ইঁহারাও ভিক্ষুক, কিন্তু কোনও প্রকার শস্যই ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রাঁধিয়া খাইতেন না। একেবারে রাঁধা-ভাত ভিক্ষা করিয়া লইয়া আহার করিতেন। (৫) অসম মুঠ্‌ঠিকা—ইঁহারা একমুষ্টিমাত্র ভিক্ষা লইতেন, এবং উহা কোনও কাঁচা তরকারীর সঙ্গে কুটিয়া লইয়া খাইতেন। (৬) দন্তবক্‌কালিকা;—দাঁত দিয়া বাকল কাটিয়া লইয়া, অর্থাৎ কেবল কাঁচা ফল ও উদ্ভিদ্ প্রভৃতি দাঁতে চিবাইয়া (না রাঁধিয়া, কিংবা হাতের সাহায্যে সংস্কারাদি না করিয়া) খাইতেন। (৭) পরত্তফলভোজিনো;—ইঁহারা উপস্থিত মত (প্রবৃত্তেঃ ইতি) যে ফল পাইতেন, কেবল তাহাই

(১) "সুত্ত" শব্দটির উৎপাদক শব্দ সূত্র।

(২) বুদ্ধঘোষের টীকাযুক্ত দীঘনিকায়ে অম্বট্‌ঠ জাতি সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে :—এক ক্ষত্রিয়-বংশ বনে বাস করিবার সময়, সেই বংশে একটি কৃষ্ণকায় কুৎসিত (কন্হ) জন্মিয়াছিল। ঐ পুত্র জারজ মনে করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। সেই জন্য সেই পুত্র "অম্বটঠো" "দাসীপুত্তো" সংজ্ঞা পাইয়াছিল।

খাইতেন ; ফল ভিন্ন অন্য কিছুই খাইতেন না। (৮) পণ্ডুফলাসিকা ;—ইঁহারা কেবল পাণ্ডু বা পাকা ফলই খাইতেন। ৭ম শ্রেণীর সহিত ইঁহাদের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে, ৭ম শ্রেণীর তাপসেরা ফল পাড়িয়া খাইতেন ; কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর তাপসেরা যে ফল গাছ হইতে আপনই পড়িয়া যাইত, কেবল তাহাই খাইতেন।

ব্রাহ্মণদিগের অধিতব্য শাস্ত্র সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে মনে হয় যে, যতগুলি বিদ্যা উল্লিখিত হইয়াছে, আদর্শ ধর্ম্মজীবনের জন্য তাহাই অধীত হইত। "ইত্যাদি" প্রভৃতি যদি না থাকে, এবং যদি দীর্ঘ বর্ণনা থাকে, তবে বর্ণনাটিকে নিঃশেষ বর্ণনা বলিয়াই মনে হয়। লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; যথা :—

(১) তিন্নং বেদানম্ ;—অর্থাৎ, ইরুব্বেদ (ঋগ্বেদ) যজুব্বেদ সামবেদানম্। বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্ব্বেই অথর্ব্ব বেদসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল ; পরবর্ত্তী নির্দ্দেশেও তাহা পাইব। কিন্তু অথর্ব্ব বেদটি প্রথম হইতে বিশিষ্ট বিদ্যারূপে গণিত হইয়া আসিয়াছে। মনে হয়, মন্ত্রবলে ভস্ম করা যাদুবিদ্যা করিয়া কার্য্য-সাধন করা প্রভৃতি যে অথর্ব্ববেদাধ্যায়ীরাই করিতেন, অনেক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। "অথর্ব্ব নিধি" না থাকিলে যে বন্ধ্যার পুত্র-উৎপত্তির যজ্ঞ, অনাবৃষ্টিনাশের যজ্ঞ প্রভৃতি হইত না, তাহা কালিদাসের কাব্যেও দেখিতে পাই। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মণের নাম তেবিজ্জ ; অর্থাৎ, ত্রিবিদ্যাধ্যায়ী।

(২) স-নিঘন্তুনা চ কেটুভেন চ। 'নিঘণ্টু' অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বৈদিক গ্রন্থ। কিন্তু "কেটুভ" কি? বুদ্ধঘোষ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন যে, ইহা "কিরিয়া কপ্প—বিকপ্প সংথ" ; এখন ক্রিয়াকল্প বিকল্প শাস্ত্র বলিয়া একখানি শাস্ত্র পাওয়া যায় না। উপনিষদে "কল্প" শাস্ত্র স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত নাই।

(৩) সাক্খর প্‌প ভেদানম্ ;—বৈদিক মন্ত্রগুলির অক্ষর প্রভেদ করিয়া এখন যে পদপাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে, উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল ; এবং শিক্ষা ও নিরুক্ত উহার সঙ্গেই ছিল। কারণ, টীকায় আছে যে, "অক্খরপ্‌পভেদেতি সিক্খা চ নিরুত্তি চ।" উপনিষদে শিক্ষা ও নিরুক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া উল্লিখিত।

(৪) ইতিহাস পঞ্চমানম্ ;—প্রাচীনকালে যজ্ঞ করিবার সময়ে কোন মন্ত্র উচ্চারিত হইবার পরে, ঐ মন্ত্রের কি ফল, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য

"ইতিহাস-পুরাণের" আবৃত্তি হইত। অর্থাৎ, অমুক অবস্থায় অমুক রাজা ঐ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ করিয়া অমুক ফল লাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। কাজেই ইতিহাস-পুরাণ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই শ্রুতির অন্তর্গত। এই বিদ্যাটির সম্বন্ধে টীকা করিতে গিয়া বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন,—"অথব্বেন বেদম্ চতুৎথং কত্তা ইতিহাস-পুরাণেন সংখ্যাতো পঞ্চমো এতেসান্।" অথর্ব্ব বেদকে চতুর্থ বেদ ধরিয়া লইলে "ইতিহাস-পুরাণ" বেদের পঞ্চম হয়। "ইতিহাস-পুরাণ" চিরকালই পঞ্চম বেদ; কাজেই পরবর্ত্তী "ইতিহাস-পুরাণ" ভারতী কথা ও অন্যান্য আখ্যায়িকার সহিত সংযুক্ত হইয়াও "পঞ্চম বেদ" বলিয়া আদৃত হইয়াছে। সুপ্রাচীন সকল গ্রন্থেই "ইতিহাস-পুরাণ" কথাটি এক সঙ্গে একবচনান্ত পাওয়া যায়। অতিপরবর্ত্তী শাস্ত্রেই "পুরাণ" বহুবচনে পাওয়া যায়।

(৫) পদকো—বেয়্যাকরণো। এই ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে ছান্দস ব্যাকরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৬) লোকায়তং।—টীকায় লিখিত হইয়াছে, "বিতণ্ডা-বাদ-সৎথম্"। এই লোকায়ত বা বিতণ্ডাবাদশাস্ত্র অতি প্রাচীনতম ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া মনে হয়। গোতমের ন্যায় লোকায়ত নহে। মহাভারতে নাস্তিকের ন্যায়শাস্ত্রকে লোকায়ত বলা হইয়াছে। এই লোকায়ত শাস্ত্র প্রথমতঃ নিশ্চয়ই নাস্তিকের শাস্ত্র ছিল না; কেন না, উহা "তেবিজ্জ"দিগের পাঠ্য ছিল।

(৭) মহাপুরিস-লক্খণন্।—যাহা দ্বারা ঋষি-মহাপুরুষ প্রভৃতিকে চিনিতে পারা যায়, সেই লক্ষণজ্ঞাপক "দ্বাদশ সহস্স" ভাগ (গন্থ) সংবলিত গ্রন্থ। এই বার হাজার "গন্থে" ষোল (সোল্লস সহস্স) হাজার গাথা ছিল বলিয়া টীকায় পাই। গন্থ শব্দটি গ্রন্থ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু এই বর্ণনা হইতে বার হাজার স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। মূল পাঠটি "গন্থ" কি না, এ বিষয়েও সন্দেহ আছে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে।

পরবর্ত্তী যুগের চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে এখানে সাতটি পাইতেছি। প্রাচীন উপনিষদগুলিতেও চতুর্দ্দশ বিদ্যা পাওয়া যায় না। উপনিষদে যতগুলি বিদ্যার কথা আছে, তাহার উল্লেখের পূর্ব্বে, অথর্ব্ব বেদ সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া লইব। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম শ্লোকে "অথর্ব্বাঙ্গিরস শাস্ত্র" বা অথর্ব্ব বেদকে ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গেই সংযুক্ত দেখিতে পাই। এই নির্দ্দেশ নিকায়ের নির্দ্দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে হয়। কিন্তু

আবার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই নারদ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রগুলির তালিকায় ইতিহাস-পুরাণকে অথর্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র পঞ্চম শাস্ত্র বলা হইয়াছে; এই নির্দ্দেশ নিকায়ের অনুরূপ। নারদের এই তালিকা, দীঘনিকায়ের তালিকা অপেক্ষা দীর্ঘ হইলেও, ভিন্ন নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে উনিশটি বিদ্যার নাম পাই। যথা,—

(১) ঋগ্বেদ; (২) যজুর্ব্বেদ; (৩) সামবেদ; (৪) "অথর্ব্বণং চতুর্থং"; (৫) "ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং"; (৬) বেদ (যাহা দ্বারা জানা যায় অর্থে) বা ব্যাকরণ; (৭) "পিত্র্যং" বা পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধের বিধি,; (৮) রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র; (৯) দৈবং বা উৎপাতনিবারক শাস্ত্র; (১০) নিধিং বা ভূতলের ধাতু প্রভৃতির জ্ঞান; (১১) বাকোবাক্যং (সম্ভবতঃ তর্কশাস্ত্র; এখানে উহার নাম লোকায়ত নহে।); (১২) একায়নং (শঙ্করের মতে ইহা একটি দেব-উপাসনার শাস্ত্র বা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র।); (১৩) দেববিদ্যা বা নিরুক্ত; (১৪) ব্রহ্মবিদ্যা (বা মন্ত্রজ্ঞানের শিক্ষাগ্রন্থ); (১৫) ভূতবিদ্যা; (১৬) ক্ষত্রবিদ্যা; (১৭) নক্ষত্রবিদ্যা বা জ্যোতিষ; (১৮) সর্পবিদ্যা; (১৯) দেবজনবিদ্যা বা নৃত্যাদি।

নিকায়ের সাতটি বিদ্যায় অতিরিক্ত যে সকল বিদ্যার নাম পাই, সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইলেও, উহার অনেকগুলি সপ্তবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তবে শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত প্রভৃতি এখানে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র, এবং "একায়ন" শাস্ত্র সম্পূর্ণ নূতন। ভূতবিদ্যা, সর্পবিদ্যা প্রভৃতির যে বৌদ্ধযুগে চর্চ্চা ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মন্ত্রবলে কুমারীর শরীরে ভূত নামাইয়া প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার কথাও (কুমারী-পন্হ) অম্বট্ঠ সুত্তে উল্লিখিত আছে। এখানে প্রাচীনতম ছান্দোগ্য উপনিষদের সহিতই নিকায়ের তুলনা করিলাম।

অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই "মহাপুরুষলক্ষণ" শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বুদ্ধঘোষের টীকা দেখিয়া মনে হয় যে, বার হাজারের উপর যে অতিরিক্ত চারি হাজার গাথার উল্লেখ আছে, উহাও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল।

উপনিষদের দেব-জন-বিদ্যা সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। দেবজনবিদ্যার অর্থ,—নৃত্য-গীত প্রভৃতির শাস্ত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদের পরবর্ত্তী সাহিত্য মহাভারত (৩) প্রভৃতিতে ঐ বিদ্যাকে গান্ধর্ব্ব বিদ্যা বলা হইয়াছে। দীঘ-

(৩) মহাভারত-সংহিতায় উপনিষৎ শাস্ত্রের যথেষ্ট উল্লেখ আছে (আদি ৬৪, ১৯। শান্তি ৪৭, ২৩ ইত্যাদি)। তদ্ব্যতীত ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের অনেক শ্লোক মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে প্রায় ৫০।৬০ স্থলে উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

নিকায়ের তৃতীয় সূত্তে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে টীকা পাই, তাহাতেও উহাকে দেবজন বিস্তা বলিয়াই পাই; কারণ, দেব শক্র (ইন্দ্র) স্বয়ং উহা কোশলরাজ্যে প্রথমতঃ উপস্থাপিত করেন। টীকার গল্পটি এইরূপ,—

কোশলের রাজকুমার শৈশব হইতেই কথা কহিতেন না, খেলা করিতেন না, কিংবা হাসিতেন না। যে কেহ রাজকুমারকে হাসাইতে পারিবে, তাহাকে অনেক পুরস্কার দিবেন বলিয়া কোশল-রাজ ঘোষণা করিয়া দিলেন। সকলের চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইল, তখন "সক্কো দেবরাজো নাটকং পেসেসি।" রাজকুমারও সেই দিব্য-নাটকের অভিনয় দেখিয়া হাসিয়াছিল। নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইটি প্রাচীনতম উল্লেখ। সংস্কৃত আলঙ্কারিক কাব্যযুগের নাটকগুলিতে বিদূষক প্রভৃতি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনও নাটকেই প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা নাই। প্রথম সময়ের প্রাকৃত নাটকে হাস্যরসের যথেষ্ট সমাবেশ ছিল, বুঝিতে পারা যায়। এখন আর সে সাহিত্যের কোনও নিদর্শনই নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাচী-ভ্রমণ।

২

৩রা রবিবার প্রাতঃকালে আমাদের জাহাজ মেটেবুরুজ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর প্রাচীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। দিবা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত গমন করিয়া, নদীতে অল্প জল বলিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না; নঙ্গর করিয়া জোয়ার ও আড়কাটীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এখন আর স্থল নয়নগোচর হইতেছে না। পার্থিব অভিমান স্থলে পরিত্যাগ করিয়া আমরা—জাহাজের অধিবাসিবৃন্দ—যেন এখন এক-পরিবারভুক্ত হইয়াছি। যাঁহাদিগের সহিত আমাকে আট দশ দিন থাকিতে হইবে, তাঁহাদের বিষয় কিছু না বলিলে পাঠক জাহাজের সুখ দুঃখ বুঝিতে পারিবেন না। তাই তাঁহাদের বিষয় কিছু লিখিত হইল।

প্রথম, জাহাজের কর্ম্মচারী।—জাতি অনুসারে ইঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত। ইংরেজ, চীনে, আর আমাদের দেশের মুসলমান। প্রথম, রাজার জাতি; সকলেরই অঙ্গে সেই আভিজাত্যের বেশ গন্ধ থাকিলেও, তাঁহারা যাত্রীদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, এবং তাঁহাদের ভদ্রতা দেখিয়া ডেক-

যাত্রীরাও তাঁহাদের প্রশংসা করিত। দ্বিতীয়, চীনে।—ইহাদের সংখ্যা চল্লিশ জন। চীনের বন্দরে মালের আদান-প্রদানে ইহারা বিশেষ উপযোগী; ইহাদের মধ্যে কতিপয় মসীজীবী মালপত্রের হিসাব রাখিয়া থাকে। তৃতীয়, আমাদের দেশের মুসলমান কর্ম্মচারী।—ইহারা জাহাজের হস্ত ও পদ। জাহাজের সমস্ত হস্ত ও পদের কার্য্য ইহারা সম্পন্ন করে। রন্ধনশালার কার্য্যভারও ইহাদের হস্তে ন্যস্ত। আমার কক্ষের পার্শ্বে রন্ধনশালা; তাহার উগ্রগন্ধ ও কথোপকথন যখন নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্রের গোচর হইত, তখন বোধ হইত, আমি যেন কোনও পল্লীবিশেষে অবস্থান করিতেছি।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে পঞ্জাবী শিখদিগের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব অঞ্চল পঞ্জাবী শিখে পরিপূর্ণ হইতেছে। ইহারা পিনাং, সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, শ্যাম, হংকং প্রভৃতি নানা স্থানে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য উৎসাহের সহিত গমন করিতেছে। নয় জন সিন্ধুদেশীয় বণিক হংকংএ যাইতেছে; ইহাদের সহিত চৌদ্দ বৎসরের কিশোর শিক্ষানবীশ হইয়া চলিয়াছে। পেশোয়ার অঞ্চলের মুসলমানদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। জাহাজে ইহাদের আহারের ক্লেশ কিছুমাত্র নাই। দুই পার্শ্বে দুইটি রন্ধনস্থান। একটি হিন্দুদিগের ও অপরটি মুসলমানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া উনুন। রুটী তরকারী প্রভৃতি অভীষ্ট খাদ্য পাক করিয়া স্ব স্ব স্থানে লইয়া গিয়া আহার করিতে লাগিল। আমার পার্শ্বের কক্ষে চারি জন আর্ম্মেনিয়ান। ইঁহারা পারস্য হইতে আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহার বয়স চল্লিশের অধিক নহে। ইনি বলিলেন, তিনি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিন দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ধনবান আর্ম্মেনিয়ানগণ স্বজাতীয় দরিদ্রের জন্য কিরূপ মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলাপে আমরা অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম। জাভার সুরবায়া নগরে ইঁহাদের এক জন আত্মীয় ব্যবসায় করেন। ইঁহারা তথায় গমন করিতেছেন। লাসা হইতে কতকগুলি চীনে-পুলিস স্বদেশে গমন করিতেছে। ইঁহাদের সহিত কথা কহিবার সময় এক জন হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ চীনে আমাদের দোভাষী হইয়া প্রশ্নোত্তর বুঝাইয়া দিতে লাগিল। ইহারা বলিল, এখন সকলেই বিনা বাধায় তিব্বতে গমন করিতে পারে। আজকাল তথায় দুই হাজার চীনে সৈন্য অবস্থান করিতেছে। এইরূপ নানা-দেশীয় আরোহীর সংসর্গে জাহাজের জীবন অতিবাহিত হয়।

৪ঠা সোমবার প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিনরাত্রি জাহাজ চলিতেছে। ৬ই বুধবার ১০টার সময় আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইল। দুইটার সময় আমাদের সম্মুখে অতি দূরে দেখিলাম, একটা পর্ব্বত সমুদ্র হইতে সগর্ব্বে যেন মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার সময় এই পর্ব্বতকে বামে রাখিয়া আমাদের জাহাজ চলিয়া গেল। শীতবস্ত্রের আর প্রয়োজন হইল না; বরং গ্রীষ্মবোধ হইতে লাগিল। এই কয়েক দিনের মধ্যে শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা চারি ঋতুই ভোগ করিলাম।

৯ই শনিবার প্রভাতে আমাদের জাহাজ পিনাং বন্দরে উপস্থিত হইল। জাহাজ হইতে নগরের দৃশ্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। সমুদ্র হইতে প্রায় আড়াই হাজার ফীট উচ্চ পর্ব্বত। তাহার কিয়দংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অপর অংশ শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র। কোনও স্থানে মালয়বাসীর কুটীর' কোনও স্থানে ইউরোপীয়দিগের আবাসভূমি। সমুদ্রের জল সূর্য্যকিরণের বর্ণের বিভিন্নতা-বশতঃ নানা রূপ ধারণ করিয়া নবাগতের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতেছে। জলে নানাপ্রকার ও নানাবর্ণ মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। এইরূপ মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পিনাং দ্বীপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমাদের জাহাজের নিকটে নানা দেশের নানা প্রকার পতাকায় শোভিত জাহাজ রহিয়াছে; কেহ বা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মালয়ের ও চীনের নানা-প্রকার নৌকার মাস্তুলে বন্দর যেন অরণ্যের মত বোধ হইতেছে। ডাক্তার আসিয়া সমস্ত আরোহীকে দেখিবার পর আমরা তীরে যাইবার অনুমতি পাইলাম। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় জাহাজ পিনাং পরিত্যাগ করিবে; এই অবকাশে এ স্থানের দ্রষ্টব্য দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখানে আমাদের বাঙ্গালীদের প্রাচীন দেবালয় আছে। নবাগত হিন্দু এই দেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে আণ্ডামানের ন্যায় পুলি-পিনাং ভারতের যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত কয়েদীদিগের থাকিবার স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। সে কালে অন্যান্য দেশের বন্দীদের মধ্যে বাঙ্গালী বন্দীর সংখ্যাও অল্প ছিল না। তাহা-দের মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীও ছিল। তাহারা এ দেশে বাস করিয়া, ইংরাজ-কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসভাজন হইয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। এই দেবালয় তাহাদের কীর্ত্তি। এই দেবালয়ের উৎসবাদি-নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট ভূমি সম্পত্তি ছিল। গবর্মেণ্ট তাহা দখল করিয়াছেন। বর্ত্তমান সেবায়ৎ তাহা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়াছেন।

পিনাং বেশ পরিচ্ছন্ন। প্রধান প্রধান রাজপথে ট্রাম আছে। এখানকার জলপ্রপাত ও চীনেদের দেবালয় দর্শনীয়। অবশ্য যিনি হিমালয়ের বা নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহা নূতন নহে। আমাদের সিন্ধুদেশীয় ব্যবসায়ীদের এ সহরে অনেক্গুলি বড় বড় দোকান আছে। হোয়াইটওয়ে লেডল্ প্রভৃতি ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহারা দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। দক্ষিণ-ভারতের তামিলদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পঞ্জাবীদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কতিপয় বাঙ্গালী চাকরী উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন। বাজার হইতে ম্যাঙ্গোষ্টিন, কলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া জাহাজে প্রত্যাগমন করিলাম। আসিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক পঞ্জাবী নামিয়া গিয়াছে; অনেক চীনে আরোহী আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতায় চীনে দেখিয়া পৃথক্ জাতি বলিয়া বোধ হইত। এখন আর তত পৃথক বোধ হইতেছে না। ইহাদের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের আকারে প্রকারে যেন আমাদের দেশের শিশুদের সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারিতেছি।

আমাদের দেশ হইতে পিনাং দ্বীপে ময়দা, চাউল, দাল, ভুষি প্রভৃতি ও পশুর খাদ্য দানা ইত্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বরণ কোম্পানীর মাটীর নলও আসিয়াছিল। এই সকল দ্রব্য নামাইয়া আমাদের জাহাজ অপরাহ্নে পিনাং পরিত্যাগ করিল। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ হইলেন; আকাশ সুনীল মেঘে মেদুর হইল। নিসর্গের বিচিত্র শোভা অপূর্ব্ব মনে হইল। বিশেষতঃ, আলোকস্তম্ভের নিকটবর্ত্তী পাদপসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালায় অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিপাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন পর্ব্বতের উপর দাবানল জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতে লাগিল; বায়ুপ্রবাহে মেঘ উড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে ঘোর অন্ধকার যেন চরাচর গ্রাস করিল।

আমাদের জাহাজে এতদিন স্থায়ী ডাক্তার ছিলেন না। পিনাং বন্দরে এক জন ডাক্তার জাহাজে আসিলেন। ইনি বাঙ্গালী। সুতরাং উভয়েই উভয়কে দেখিয়া প্রীত হইলাম। ইঁহার নাম এস্. পি. ভট্টাচার্য্য। ডাক্তার-বাবু বড় ভদ্র। সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার বড় অনুরাগ। মাইকেলের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। মলয় উপদ্বীপের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রের বক্ষে তিনি মেঘনাদবধ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। অবকাশ পাইলেই তিনি সামুদ্রিক জীবনের সুখ দুঃখের কথা কহিয়া সময়যাপন করিতেন।

১০ই রবিবার আমাদের জাহাজ সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী মালাকাপ্রণালী অতিক্রম করিল। প্রায় সমস্ত দিন পর্ব্বতমালা ও তীরভূমি দেখিতে পাওয়া গেল। মেঘশূন্য দিনে কোনও কোনও স্থান হইতে সুমাত্রার তটভূমি নয়নগোচর হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত রাত্রি মালাকার আলোকিত তট-ভূমি দেখিতে পাওয়া গেল। ১১ই সোমবার আমাদের জাহাজ প্রাতঃ-কালে সিঙ্গাপুরের নিকটবর্ত্তী সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া সৌধ-মালা-বিরাজিত বেলাভূমির সম্মুখভাগে অসংখ্য-অর্ণবযান-পরিশোভিত সাগরে নঙ্গর করিল। যথারীতি ডাক্তার আসিলেন। তিনি সকলকে পরীক্ষা করিলে পর আমরা তীরে যাইবার অনুমতি পাইলাম। আমার শুভাদৃষ্টক্রমে তিন জন বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে লঞ্চে করিয়া আমাদের জাহাজে আসিয়াছিলেন। আমি সেই লঞ্চে আহূত হইলাম। আমার স্বদেশবাসীর সহৃদয়তায় আমাকে আর কোনও বিষয় দেখিতে হইল না। একেবারে আমার থাকিবার স্থানে উপস্থিত হইলাম।

আমি যে দেশে আগমন করিয়াছি, ইহার সহিত আমাদের ভারতবর্ষের একদিন শাস্য-শাসক, জেতৃ-জিত সম্বন্ধ ছিল। অনেকে বলেন,—সেই অতীব সুপ্রাচীন কালে অধ্যবসায়ের অবতার অদ্ভুতবিক্রম ভারতবাসীরা প্রথমে সুমাত্রা দ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা বণিকের বেশে কি যোদ্ধবেশে আসিয়াছিলেন, তাহা এখন নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনেকের মতে, সমুদ্র নামক স্থানের নামানুসারে সুমাত্রার নামকরণ হইয়াছে। সুমাত্রা হইতে হিন্দুগণ মলয় উপদ্বীপ, যাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে, এমন কি, ফিলিপাইন, কেরোলিন, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপ-পুঞ্জেও গমন করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, দক্ষিণ-ভারতের মলয় দেশ হইতে যে সকল ভারতবাসী এই সকল দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের দেশের নামানুসারে এই নূতন স্থানের নামকরণ করেন। বর্ত্তমান সুমাত্রা, যাভা, মলয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক পর্ব্বত নগর প্রভৃতির সংস্কৃত নাম প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মলয়উপদ্বীপে মুয়াঙ্গ তাকুয়াপা হইতে তিন চারি ঘণ্টার রাস্তা ফোপ্রানারাই নামক স্থানে ত্রিরূপের মন্দির আছে। এই দেবায়তনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অতি প্রাচীন মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। ইহাতে একটি শিলালেখ আছে। এখনও ইহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীর 'লেখ' বলিয়া

অনুমিত হইয়া থাকে। ইহার ও অন্যান্য শিলালেখের পাঠোদ্ধার হইলে, মলয় উপদ্বীপে হিন্দুপ্রভাবের ইতিহাস স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। মলয়বাসীর আকৃতিতে ভারতবাসীর সাদৃশ্য আছে। যদি ইহাদিগকে ভারতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে মলয়বাসী বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে মলয়বাসীরা মুসলমান হইলেও, গোঁড়া মুসলমান নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ভারতীয় প্রথা ও সংস্কার বর্ত্তমান। তাহারা ইহার উৎপত্তির বিষয় অবগত না থাকিলেও, ইহা ভারতীয় প্রভাবের ফল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মলয়বাসী কখনও অস্ত্রহীন হইয়া অবস্থান করিত না। শয়ন, ভোজন, এমন কি, স্নানকালেও ইহারা পার্শ্বে অস্ত্র রক্ষা করিত। বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের ক্ষত্রিয়ের আচার। হিন্দু নরপালেরা মুসলমান হইলেও প্রাচীনকালের 'রাজা' উপাধি এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মলয় ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে।

সিঙ্গাপুরের প্রাচীন নাম সিংহপুর। Sanga Nila Utama (সিংহ নল উত্তম) নামক এক জন ভারতীয়, প্রায় আট শত বৎসর অতীত হইল, এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। নগরের ও স্থাপয়িতার নাম দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি উপনিবেশী ভারতবাসী। সেকালে সিংহপুর বাণিজ্যে সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। নানা দেশ হইতে বণিক সম্প্রদায় সিংহপুরে আগমন করিত। যাভার রাজার সহিত সিংহপুর-পতির বিরোধ হয়। প্রথম যুদ্ধে সিংহপুরের রাজা পরাজিত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধে সিংহপুর-পতি স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মলয় উপদ্বীপের তটে আর একটি নগর স্থাপিত করেন। এই নগরের বর্ত্তমান নাম মলাকা। ১৫১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মলকায় তাঁহার বংশধর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি পর্টুগীজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হন।

সিঙ্গাপুর নদীর তটে সিংহপুরপতির আবাসভবনের ভিত্তির প্রস্তর সকল পতিত ছিল। ইহার মধ্যে একখানিতে অজ্ঞাত অক্ষরে কিছু লিখিত ছিল— এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী এই সকল ধ্বংসাবশেষ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাভূমি পূর্ণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট একখণ্ড সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতার মিউজিয়মে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

সিঙ্গাপুরে ইংরেজদিগের কিরূপে অভ্যুদয় হইল, তাহা বিবৃত করিবার

পূর্ব্বে, এ অঞ্চলে ইঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। সেকালে এ প্রদেশে ডচদিগের বিশেষ আধিপত্য ছিল। এই আধিপত্যের জন্য উভয় জাতির মধ্যে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। সুমাত্রার পূর্ব্বতটে বেনকুলন নামক স্থানে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের একটি কুঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। পিঁপুল সংগ্রহ করাই তখন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। বিলাতের কর্ত্তাদের ধারণা ছিল যে, দ্রাক্ষালতা হইতে পিঁপুল উৎপন্ন হয়! কাঁচাগুলা কৃষ্ণবর্ণ, আর সুপক্ক দ্রাক্ষা শ্বেতবর্ণ পিঁপুল। তাই তাঁহারা প্রচুরপরিমাণে শ্বেত পিঁপুল সংগৃহীত করিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিয়া পাঠান। এক সময় এ স্থানের কুঠীতে যথেষ্টপরিমাণে রূপা কমিয়া যায়। এত কমার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কুঠীয়াল ইংরেজগণ অনেক গবেষণা করিয়া স্থির করেন যে, উঁইপোকা রৌপ্য খাইয়া ফেলিয়াছে, তাই কমিয়া গিয়াছে। বিলাতে এইরূপ লিখিলে, বিলাতী কর্ত্তারা অনেক চিন্তা করিয়া উঁইএর দাঁত ঘষিয়া দিবার জন্য উকা-ইস্পাত পাঠাইয়া দেন!

মলয় উপকূলে একটা সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিবার জন্য ইংরেজ অনেক দিন হইতে চেষ্টিত ছিলেন। পানীয় ও আহার্য্যের সংগ্রহ, জাহাজ মেরামত করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তখন পিনাং খেদার রাজার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত শ্যামরাজ ও বর্ম্মা রাজার ভয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত ছিলেন। এই সময় মিষ্টার লাইট পিনাং রাজের নিকট উপস্থিত হন। রাজা মনে করেন ভাগ্যক্রমে বিদেশী মিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজা পিনাং ও ইহার নিকটবর্ত্তী ভূভাগ এই সর্ত্তে ইংরেজকে প্রদান করিলেন যে তাঁহার শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে তিনি ইংরেজদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। ইংরেজদিগের বড় কর্ত্তারা শ্যাম বা বর্ম্মার সহিত যুদ্ধকালে সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, রাজাকে বুঝাইয়া ইংরাজ পিনাং অধিকার করিয়া লন। ইংরাজ জানিতেন, তাঁহাদিগকে পিনাং হইতে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া রাজার সাধ্যের অতীত। এইরূপে পিনাং ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। বর্ত্তমানকালে এ প্রদেশ ইংরাজের শাসনগুণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদে পরিণত হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের ইতিহাসও প্রায় পিনাংএর মতন। এ অঞ্চলে ডচদিগের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য ইংরাজ একটা অনুকূল স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন। Sir Stamford Raffles ঘটনাক্রমে একবার সিঙ্গাপুরে আগমন করেন।

সিঙ্গাপুরের প্রাকৃতিক অবস্থান দেখিয়া তিনি অন্ত স্থানের অপেক্ষা এ স্থানের প্রাধান্য অধিক, তাহা উপলব্ধি করেন। যোহরের সুলতানের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী এই দ্বীপের অধিকারী ছিলেন। অনুকূল সুযোগে ইংরাজ অবলীলাক্রমে এ দ্বীপ অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী এক পক্ষে র‍্যাফলস্, ও অপর পক্ষে সুলতান হোসেন ও তিমিনগঙ্গ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। সে সময় সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা দেড় শতের অধিক ছিল না; অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসীরা সম্ভবতঃ জলপথে চুরী ডাকাতি করিয়া জীবনধারণ করিত! ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুর, মালাক্কা পিনাং, এই তিনটি স্থান ভারতের একটা প্রেসিডেন্সি-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক একবার এ প্রদেশ পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহা বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অধীন হয়। ১৮৬৭ খৃঃ ইহা ক্রাউনকলোনীতে পরিণত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার জনসংখ্যা ও বাণিজ্যের পরিমাণ অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ইহার জনসংখ্যা আড়াই লক্ষের উপর, এবং বাণিজ্যে সিঙ্গাপুর পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

প্রাচ্যবিদ্যা।

জুর্ণালাসিয়াতিকের (Journal asiatique) ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় অধ্যাপক সীলভ্যাঁ লেভি তুএন্ চ-আং-এর সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মধ্য আসিয়া হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি খণ্ডিত সংস্কৃত পুঁথি পেলিও অভিযানে সংগৃহীত হয়। এই পত্র কয়েকখানি মঃ পেলিও অধ্যাপক লেভির নিকট পাঠোদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পত্রগুলি পিশেল বর্ণিত (Sitz.-Ber. d. wiss. Berlin, 1900. 969) তুর্ফানীয় ধর্ম্মপদের পত্রসমূহের ন্যায়। অধ্যাপক লেভি বলেন যে, এগুলির তারিখনির্দ্ধারণ বড় সহজ নহে। মধ্য আসিয়ার লিপিতত্ত্ব সবে মাত্র আলোচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। তাঁহার মতে, একটা পুরাতন লিপিপ্রণালী বহ-

শতাব্দী ধরিয়া আশ্রয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকা, এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার প্রবর্ত্তন নিতান্ত অসম্ভব নহে। যাহা হউক, বর্ত্তমান পত্র কয়টির লিপি যে অতি পুরাতন প্রণালীতে সম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। বেবর ও ম্যাকার্টনির সংগৃহীত পুঁথির লিপি অবিকল ইহার অনুরূপ। ডাক্তার হের্ণ্‌লে প্রথমে এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তাঁহার মতে, ম্যাকার্ট্‌নির পুঁথি ৪র্থ শতাব্দীর মধ্য যুগের অপেক্ষা অধুনিক নহে। অধ্যাপক লেভি বলেন যে ভবিষ্যৎ গবেষণা যদিও এই মতের পরিবর্ত্তনসাধন করিতে পারে, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে, চিয়েন্‌-ফো তোং-এর কক্ষটি গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিবার অনেক পূর্ব্বে এই আলোচ্য পত্র কয়খানি লিখিত হইয়াছিল।

আলোচ্য গ্রন্থাংশসমূহের মধ্যে তিনখানি পত্র নিদানসূত্রের। নিদান-সূত্র বৌদ্ধধর্ম্ম-নীতিসূত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে বুদ্ধ দুঃখের দ্বাদশটি কারণ অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। এই দুঃখসমূহনিবৃত্তির একমাত্র উপায়,—ইহাদের কারণসমূহের উচ্ছেদসাধন। এই মহতী অবিক্রিয়া গৌতমের সাধনপথ আলোকিত করিয়াছিল; তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ইহাই প্রথম সোপান। তুএন্‌ হুয়াং-এর সংস্কৃত পাঠের বিশেষত্ব এই যে, একটি পুরাতন বৌদ্ধনীতিকথার (parable) ছলে সূত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে। এক জন পথভ্রান্ত পথিক বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনেক ক্ষণের পর বহু আয়াসে সে একটি পুরাতন মার্গ খুঁজিয়া পাইল;—সে মার্গ চিরপুরাতন সাধনপথ;—সেই পথ ধরিয়া সে তাহার চির-কাঙ্ক্ষিত, চিরপরিচিত, চিরপুরাতন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বাসনা ও তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিল; পুরাতন সাধনার পথ ধরিয়া অমর-নির্ব্বাণ-পুরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। পালি সংযুত্ত নিকায়ের নিদান সংযুত্তে এই পাঠেরই প্রবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। (১) সংস্কৃত আগমে ইহা দুইবার দুইপ্রকারে স্থান পাইয়াছে।

নিদানসূত্র।

প্রথমতঃ ইহা সংযুক্তাগমের নিদান-সংযুক্তের শাখারূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অংশ গুণভদ্র কর্ত্তৃক ৳৩৫—৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অনূদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা একোত্তরাগমে নূতন ভাবে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং

(১) ১২।৬৫।

৩৮৪ হইতে ৩৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধর্ম্মানন্দি কর্ত্তৃক চৈনিক ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। এই অধ্যায়টির প্রারম্ভে বলসমূহের উপর একটি সূত্র আছে। কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, এবং ইহার অঙ্গুত্তর নিকায়ের অটুক নিপাতের অন্তর্গত (২) দশবল সূত্রের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই।

আমাদিগের আলোচ্য নিদানসূত্র এত বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল যে, ইহা অনেকবার চীনভাষায় অনূদিত হয়। উয়াং চোয়াং ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার শেষ অনুবাদক ফাতিআং ৯৮২ এবং ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত হইতে দেশে ফিরিয়া গিয়া "পুরাতন নগরের নীতিকথা" (কিউ-ছেং যু কিং) নামে ইহার প্রচার করিয়াছিলেন। এই সূত্রের এত বহুল প্রচারের জন্য অশ্বঘোষ কিঞ্চিৎ দায়ী বলিয়া আমাদের মনে হয়। তৎপ্রণীত সূত্রালঙ্কারে বর্ণিত আছে যে, ব্রাহ্মণ কৌশিকের বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা এই সূত্র-গ্রথিত উপদেশমালার দ্বারাই সংসাধিত হয়।

সংযুক্ত নিকায়ের পালিপাঠ এবং আগমের অন্তর্গত সংস্কৃত পাঠ অপেক্ষা আলোচ্য পাঠ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। পুঁথিখানির লিপিকর বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। যে দু' একটি প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা অনব-ধানতাপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হইবার কারণ আছে। এ গ্রন্থের প্রথম ভুলটি বেদনা নিরোধ [ঃ] কথাটার বিসর্গের লোপ; দ্বিতীয় বর্ত্মন্ শব্দের (যাহা পথ অর্থে স্বভাবতঃ ক্লীবলিঙ্গ) পুংলিঙ্গে ব্যবহার; তৃতীয় ত[ম] মুগচ্ছেৎ বাক্যের ম-টা পড়িয়া গিয়াছে; এবং চতুর্থ দন্ত্যানুনাসিকের স্থানে অনুস্বারের ব্যবহার।

পরের তিনখানি পত্রের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহারা সংস্কৃত ধর্ম্মপদ গ্রন্থের অংশ। জর্ম্মন্ অভিযানের সদস্যগণ কর্ত্তৃক তুর্ফান্ হইতে সংগৃহীত এই গ্রন্থের অনেক খণ্ডিত হস্তলিপি ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষিত হইয়াছে। অধ্যাপক পিষেল্ উক্ত অভিযানে সংগৃহীত পুঁথিসমূহের একটা বর্ণনা-সংযুক্ত তালিকা ও তাহাদের নমুনা-স্বরূপ যুগ-বর্গের অংশবিশেষ বের্লিনের বৈজ্ঞানিক-সমিতির ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কার্য্য-বিবরণীতে (১) প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্য পত্রখণ্ডগুলিতে

ধর্ম্মপদ।

(২) ২৭।

(১) Sit. Ber. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 1908 pp. 960—985.

শ্রুতবর্গের শেষাংশ আত্মবর্গের প্রায় সমগ্র, ইহার পরবর্ত্তী বর্গের প্রারম্ভ ও শেষের পাতাখানায় ভিক্খুবর্গের ৮-১৪টা শ্লোক আছে। পিষেল তাঁহার তালিকায় শ্রুত ও আত্মবর্গের উল্লেখ করেন নাই।

ধর্ম্মপদ গ্রন্থ চীন ও তিব্বতে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। ইহার চারিটি সানুবাদ সংস্কৃতপাঠ চীন ও তিব্বতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেরিয়ায় রক্ষিত সংস্করণে সঙ্কলয়িতা ভদন্তের উল্লেখ আছে। মঃ লেভি আর কোনও নাম প্রাপ্ত হন নাই।

আলোচ্য পত্র কয়খানির লিখনপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। ইহাদের লিপিকর জিহ্বামূলীয় ও উপাধ্মানীয় বর্ণের সংযোগে বিসর্গের লোপ করিয়া গিয়াছেন:—নাথ (ঃ) কো সু নাথ (ঃ) পরো ভবেৎ। ভিক্ষু শব্দের ইকার অনেক সময়ে প্রথমে ভ্রমক্রমে না লিখিয়া পরে সংশোধন করিয়া পুনরায় বর্ণের নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন, এবং অনুস্বারের কিঞ্চিৎ বহুল ব্যবহার হইয়াছে; যথা:—শৈলবং ন।

পূর্ব্ববর্ণিত নিদানসূত্রের প্রথম পত্রের পূর্ব্বাংশে সন্নিবদ্ধ আর একটি খণ্ডিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; গ্রন্থখানি যে কি, তাহা বলা বিশেষ কঠিন নয়। পত্রশেষে সমাপ্তি দেখিয়া মঃ লেভি ইহাকে দশবল-সূত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই সূত্র পালি নিকায় গ্রন্থের সংযুক্ত নিকায়ের অংশবিশেষ। কিন্তু আলোচ্য পত্রখণ্ডের পাঠ উক্ত গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্তর্গত দসক নিপাতের সহিত আমাদিগের খণ্ডিত পাঠের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। চৈনিক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে দশবলসূত্রের আর একটি অনুবাদ খৃঃ ৮ম শতাব্দী হইতে স্থান পাইয়াছে, এবং এই অনুবাদ মধ্য আসিয়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল, প্রাচ্যবিৎগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। শ্রমণ যুং চাও গ্রন্থ-ভূমিকায় তৎপরিচয় সম্বন্ধে সকল সন্দেহের অপনোদন করিয়াছেন। প্রাপ্ত পত্রের পাঠ এত অল্প যে, তাহার লিখনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না। আমাদের আলোচ্য কয় ছত্র হইতে দেখা যায় যে, লিপিকর দন্ত্যানুনাসিক স্থানে অনুস্বার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। অনুস্বারের এরূপ অযথা ব্যবহারে, অধ্যাপক লেভি কিছু না বলিলেও, লিপিকরকে চীনদেশীয় বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে ব্যাকরণ-দোষ দৃষ্ট হয়।

দশবলসূত্র।

শেষ পত্রখানিতে মাতৃচেট স্তোত্রের কয়েক ছত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আচার্য্য মাতৃচেটের প্রণীত স্তোত্র ১৫০টি শ্লোকে গ্রথিত। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং (Yi-tsing) (৬৭১—৬৯৫ খৃঃ) এই স্তোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, (১) এবং পরে তাঁহারই কর্ত্তৃক ইহা চীনভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হয়। তারানাথ মাতৃচেটের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে বড় গোল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইঁহাকে বিন্দুসার, শ্রীচন্দ্র ও সর্ব্বশেষে কণিকের (কনিষ্ক) সমসাময়িক বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে ইঁহাকে কনিষ্কের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। তারানাথ প্রমুখ মহাযানেতিহাস প্রণেতৃগণ অশ্বঘোষ ও মাতৃচেট একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। স্তোত্রের তিব্বতীয় অনুবাদের সমাপ্তিতে অশ্বঘোষকেই ইহার প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মাতৃচেট স্তোত্র।

উক্ত প্রবন্ধের পর মঃ মেইএ (Meillet) আর্মেনীয় ঐতিহাসিক আগাথাঙ্গের কয়েকটি হস্তলিপির সাহায্যে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ-সংশোধনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মঃ দেকুড়্মান্‌শ্ (Decourdemanche) আরবীয় ভৈষজ্যে ব্যবহৃত ওজন সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক বিলের "হীকোস্‌ও প্রাচীন মিশরে জাতীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা" নামক গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ "জুর্ণালাসিয়াতিকে"র উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে নিপুণভাবে গ্রন্থকার মানেথোনের উল্লিখিত ও আলেকজান্দ্রীয় সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনা-সমূহের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন।

ইহার পরের প্রবন্ধে মঃ গেরিনো (Guerinot) বারাণসী হইতে প্রকাশিত যশোবিজয় জৈন গ্রন্থমালার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবন্ধকার মুখবন্ধে যশোবিজয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সঙ্কলিত করিয়াছেন।

১৯১১ সালের উক্ত পত্রের মে-জুন্ সংখ্যায় মঃ বয়ের মিরাণের লেখমালা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সকল লেখমালা ডাক্তার ষ্টাইন তাঁহার দ্বিতীয় মধ্য-আসিয়াতিযানে দুইটি একই প্রকারের স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কার করেন। ইহাদিগের লেখনপ্রণালী খরোষ্ঠী।

(১) A Record of the Buddhist Religion. Transl. by Takakusu. Page 156 & seq.

স্তূপের অলিন্দে বেস্‌সন্তর জাতক ক্ষোদিত আছে। অঙ্কিত জাতকান্তর্গত হস্তীর পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ আছে:—

১। তিতস এষা ঘলি

২। হস্ত ক্রিচ [ভং ম] ক

৩। ৩ ১০০০।

এই প্রবন্ধ মধ্যে উদ্ধৃত লেখমালায় চতুষ্কোণ বেষ্টনী পরিবৃত অক্ষরগুলি অসম্পূর্ণভাবে উৎকীর্ণ বা লিখিত আছে।

ইহার অনুবাদ এইরূপ হইবে:—এই অলিন্দ চিত্র তিতের, (১) (এবং তজ্জন্য সে) ৩০০০ (৩ × ১০০০) [ভং ম] ক গ্রহণ করিয়াছে (হস্তগত করিয়াছে, অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে) (২)।

দ্বিতীয় লিপিটি প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ আছে। ডাক্তার ষ্টাইন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ছায়াচিত্র অবলম্বনে মঃ বয়ের ইহার পাঠ নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারণ করেন:—

"এষে ইষিদতে বুঝমিপুত্রে"।

অনুবাদ:—এ বুঝমিপুত্র ইষিদত। (৩)

একার-সংযুক্ত প্রথমার একবচনান্ত পদ প্রাদেশিক-ভাষা-সুলভ বলিয়া প্রবন্ধকার মনে করেন; এবং পালি ও প্রাকৃত ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিয়া এরূপই মনে হয়। "ইষিদত" "ঋষিদত্তের" প্রাদেশিক অপভ্রংশ, এবং তাৎকালিক প্রাকৃত বা পালিতে এইরূপ পদের অভাব নাই। কিন্তু অধ্যাপক বয়ের "বুঝমি"র কোনও সন্তোষজনক প্রতিশব্দ প্রাপ্ত হন নাই। (৪)

তৃতীয় লিপিটি মসী দ্বারা মসৃণ চীনাংশুকখণ্ডে লিখিত। লিপিটি এইরূপ:—

১। [ঘ] দছিন এ ভবদু

২। অসগোষস সপরিবরস অরুঘদছিন এ ভবদু

৩। ফ্রিয়ন এ অরুঘদছিনএ ভবদু

---

(১) অর্থাৎ তিত কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

(২) মঃ বয়েরের ফরাসী অনুবাদের মূল পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা এইখানে প্রদান করিলাম:—Cette fresque (est l'œvvre) de Tita, qui a reçu 3000 [bhanıma] kas.

(৩) "Calvi-ci est Isidata, le fils de Bujhami"—Traduction de l'inscription, par M. Boyer.

(৪) Quant a bujhmi, je ne vois aucune conjecture qui lui retrouve, d'une maniere satisfaisante, un representant sanskrit,—M. Boyer sur les inscriptions de Miran.

৪। ফিরিনএ অরুঘদছিনএ ভবদু

৫। চরোকস অরুঘদছিনএ ভবদু

৬। যমনয়স সপরিবরস অরুঘদছিনএ ভবদু

৭। মিত্রকস স[পরি] ... ...

৮। ... ... [ভব]দু

৯। কিভিলস সপরিবরস [অরু] ... ...

প্রবন্ধলেখক উদ্ধৃত লিপির সমস্তটা অনাবশ্যক বোধে অনুবাদ করেন নাই। শুধু ২য় পংক্তির অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরের পংক্তিগুলি পূর্ব্বের ন্যায় অনূদিত হইবে। উক্ত পংক্তির তিনি নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন।—

২। "ইহা অসঘোষের সপরিবারের আরোগ্যপ্রদানের জন্য হউক। (১) ইত্যাদি।

উক্ত পত্রিকায় আলোচ্য সংখ্যার পরবর্ত্তী প্রবন্ধে অধ্যাপক সিল্‌ভঁ্যা লেভি-পেলিও-অভিযানে সংগৃহীত তোখারি-সংস্কৃত পুঁথির একটা বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল পুঁথিতে সংস্কৃত ও তাহার তোখারি অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

"এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা"র দশম ভাগের পঞ্চম সংখ্যায় হীরানন্দ মচ্ছলি সহরে প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্রদেবের তাম্রফলক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুত হুল্‌ৎস্ (Hultzsch) গড়্‌বালে প্রাপ্ত ১ম বিক্রমাদিত্যের ফলক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন; তৎপরে শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শক শাসনকালের একটি নূতন ব্রাহ্মী উৎকীর্ণ লিপি সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুত সিউয়েল (R. Sewell) চোল ও পাণ্ড্য রাজাগণের তারিখ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধে বিদ্যাবত্তার ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

উক্ত পত্রিকার দশম ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যায় ডাক্তার লুডার্স (Luders) অশোক-লেখমালা বাদ দিয়া খৃষ্টীয় ৪০০ বৎসর অবধি পুরাতন ব্রাহ্মী উৎকীর্ণ লিপিমালার একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

(১) "Que cela soit pour lendon de la sact a Asaghosa avec son entourage."—M. Boyer sur les inscriptions de Miran.

"ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকোয়েরী" ১৯১২ খৃষ্টাব্দের যে সংখ্যায় সেনারের (Senart) ভারতের জাতীয় ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইতেছে। উক্ত সংখ্যায় শ্রীযুত শ্যাম শাস্ত্রী ভারতের বৈদিক পঞ্জিকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুত কানে অলঙ্কার সাহিত্যের ইতিহাস নামক একটি প্রবন্ধে ভূয়সী গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত পত্রিকার ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন-সংখ্যায় সেনারের জাতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয়ানুবৃত্তি বাহির হইয়াছে। পণ্ডিত ভট্টনাথ স্বামিন্ কবি মায়ুরাজ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উতকমন্দের শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্য আয়ার করিকল ও তৎসাময়িক ইতিহাস নামক প্রবন্ধে চোলরাজ্যের অতীত ঐতিহাসিক রহস্যোদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছেন।

রয়েল আসিয়াটিক সমিতির ১৯১২ সালের জুলাই সংখ্যায় শ্রীযুত আমেদ্রোজ (H. F. Amedroz) সুফি জীবন সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গিব্ মেমোরিয়াল ফণ্ডের ব্যয়ে প্রকাশিত কাশ্ফ্ অল্-মাহজুবের সমালোচনা করিতে গিয়া প্রবন্ধকার অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, এবং জনকয়েক সুফির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও দিয়াছেন। ডাক্তার ষ্টাইন্ কর্তৃক কাশ্মীর হইতে সংগৃহীত ও ভারত-মন্দিরের পুস্তকাগারে * সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির শ্রীযুত জি. এল্. এম্. ক্লাউসন্ একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ তাহাতে একটা ভূমিকা সংযুক্ত করিয়া দিয়া উক্ত পত্রিকায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ-রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক বালে পুসাঁ ও গোটিয়ে শ্রীযুত ষ্টাইন সংগৃহীত তুএন্‌হুআংএর পুঁথির খণ্ডিতাংশের আলোচনা করিয়াছেন। পুঁথিখানি সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত,এবং নিম্নে সোগ্‌ডিয়ান্-অনুলিপি-সংযুক্ত। ইহার নাম নীলকণ্ঠধারণী। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—সিদ্ধযোগীশ্বর ধুরু ধুরু বিয়ংস্তি মহাবিয়ংস্তি ধর ধর (ইত্যাদি) এবং শেষ :—ত্রে নিত্য মুণ্ডটটে॥ প্রবিশা প্রবিশা৷ বিপালোকিতেশ্বর কুর্ম হূঁ॥ হৃদয়মন্ত্র উঁড্রুং সমস্ত স্বাহা।" সমাপ্তির কিয়দংশ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অপরের দ্বারা লিখিত আছে,—ওঁ নমো ভগবত্যৈ আর্যপ্রজ্ঞাপার [মিতায়ৈ]। চতুর্থ প্রবন্ধে শ্রীযুত ব্রাউন প্রাচ্যভাষায় প্রতীচ্য অনুলিপির উপযোগিতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চম প্রবন্ধে শ্রীযুত কেনেডি কনিষ্ক-রহস্যের উদ্ভেদ করিয়া-

* Indian Institute Library.

ছন। কনিষ্কের ইতিহাস সম্বন্ধে ও সাধারণতঃ শকাধিকার-কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এখনও অনেক বিষয় আমাদের জানিবার আছে। প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় শেষ হয় নাই। শ্রীযুত ব্লাগ্‌ডেন কয়েকটি তালেং উৎকীর্ণ লিপি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছেন। অধ্যাপক ভেনিস্ সারনাথ হইতে উদ্ধৃত অশ্বঘোষের উৎকীর্ণ লিপি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ফোগেল (Dr. Vogel) ও অধ্যাপক ভেনিস্ উভয়ে মিলিয়া এই লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই :—

পারিগেয়হে রজ্ঞ অশ্বঘোষস্ত চতরিশে সবচ্ছরে হেমত পখে প্রথমে দিবসে দসমে + (সুতিথয়ে ৪২০০, ৯) বেষ্টনী পরিবৃত অংশের পাঠ ডাক্তার ভেনিস্ উদ্ধার করিয়াছেন। এই সমগ্র লিপিটির ভেনিস্ নিম্নলিখিত অনুবাদ প্রদান করেন :—

"রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎবর্ষে হেমন্তকালের প্রথম পক্ষে দশমদিবসে, চতুর্থস্থিতিথিতে ২০৯ বর্ষে।" ভেনিস বলেন যে, উৎকীর্ণ স্পষ্ট তারিখ ২০৯ মালব বিক্রমাব্দ (অর্থাৎ খৃঃ ১৫২)। শ্রীযুত ফ্লীট্ ভেনিসের পাঠের উপর কিঞ্চিৎ টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন যে, বেষ্টনী-পরিবৃত অংশটা সুথথয়ে (অর্থাৎ সুথার্থায়) বা সুবিথয়ে (অর্থাৎ সুবীথয়ে) পাঠ করা যাইতে পারে। ফ্লীট্ অশ্বঘোষের তারিখ খৃঃ ১১১—৫১ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

শ্রীযুত উইল্‌ফ্রেড্ শফ "পেরিপ্লস্ অব দি এরিথ্রীয়ান সী" নামক একখানি পুরাতন গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রতীচ্যবাসীদিগের প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যাদির অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব্বে একবার অনূদিত হইয়াছিল। বর্তমান অনুবাদটি কি সঠিক ও মানচিত্র-সংবলিত। তবে বোরোবোদোরের ভাস্কর্য্য হইতে যে অর্ণবপোতের ছায়াচিত্র এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অনুবাদক ও তাঁহার স্বদেশীয়েরা পুরাতন গুজরাতী পোতের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন ; কিন্তু আমরা ইহাকে পূর্ব্বভারতীয় অর্ণবযানের চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক মনে করি না।

শ্রীপুরাপ্রিয়।

Periplus of the Erythraean Sea. Transl. by Wilfred Schoff. Published by Longmans, Green and Co. 1912, Price 7 s. 6. d

রেবা।

জল-বেণী-রম্যা রেবা হিল্লোলিয়া বরকান্তি
উন্মাদিনী প্রায়
উপল-বিষম পথে তরঙ্গিছে অনারত
তুরন্ত ধারায়;
কুন্দবর্ণ বারি-ধূমে আবরিয়া স্মেরানন
ধায় আত্মহারা—
কবে তুমি হে নর্ম্মদা! বিদারিলে মন্ত্রবলে
মর্ম্মরের কারা?
ফাল্গুন-রজনীমুখে গুঞ্জরে তোমার বুকে
অমরী-মঞ্জীর,
মানস-রঞ্জন হাস্য ভাসে গো কমল-আস্যে
নিসর্গ-লক্ষ্মীর;
ইন্দ্রনীল-রথ-চূড়ে চন্দ্রিকা-কেতন উড়ে
অন্তরীক্ষ-পথে—
হেন স্বপ্ন-লীলা-ভূমি অবহেলি' ধাও তুমি
দুর্নিবার স্রোতে।

কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে,
হে বর-বর্ণিনী,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা, পারাবার-স্বয়ংবরা
বিন্ধ্যের নন্দিনী?
কোথা মাহিষ্মতী পুরী? মর্ম্মর-সোপানোপরি
রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে
চকিত-ঝঙ্কার,
পৌর্ণমাসী অর্দ্ধরাতে জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে
অলিন্দের 'পরে,
দ্রাক্ষা-রসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব
চুম্বিত অধরে।

আবর্ত্ত-শোভন-নাভি, অলঙ্কৃত কটী-তট
হংস-মেখলায়
কোথায় রূপসী রেবা, ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায়?

উর্ম্মিস্পর্শ সুখ-বাতে, বিশদ শারদ প্রাতে,
বানীর-বিপিনে,
শ্বেত-ভুজা সারদার দেউল-দুয়ারে একা
উনমদ-বীণে,
আসমুদ্র-হিমাচল প্রকৃতির রম্য পট,
রাজবতী মহী,
কি সৌন্দর্য্যে উদ্বোধিলা, অতুলনা ইতিকথা
মহৈশ্বর্য্যময়ী!
কোথায় সে অবন্তিকা, কোথা নব-রত্নপ্রভা,
প্রাচ্যের গৌরব?
অস্ত জ্ঞান-বিভাবসু, ভারত-হৃদয়-কেন্দ্র
সমাধি-নীরব।

উদয়-বিলয়-ভরা আবর্ত্তিছে বসুন্ধরা,
নাহি ক্ষোভকণা,
কোরকে প্রসূনে ফলে মঞ্জু কিসলয়-দলে
অনন্ত-যৌবনা।—
প্রণষ্ট বিভব তরে তবু খেদ-অশ্রু ঝরে
বিধৌত শ্মশানে,
শোনে না বধির-মতি মৃত্যুর মঙ্গলারতি
আনন্দ-বিধানে।

পাষাণ-পুলিনে তব কত যতি তাপসের
পূত নিকেতন,
হরিতকী-বনভূমে সুরভিত হোমধূমে
সম্ভৃত ইন্ধন;

ত্রিকালজ্ঞ, মহাযোগী ভৃগুর সাধনাক্ষেত্র,
তীর্থ সনাতন,
যাঁর পূজ্য পদরজঃ মাধবের বক্ষে রাজে
ভুবন-পাবন।
প্রাণায়াম-পরায়ণ, সিদ্ধবাক্ ঋষিগণ
ভাঙ্গি' মঠাকাশ
নিভৃতে তোমারি পাশে, মিশেছেন মহাকাশে
চিন্ময়-সকাশ।

আজি যেন মূর্ত্তি লভি' কত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ কবি
সম্মুখে আমার,
মুরলীর মূর্চ্ছনায় নিবেদিছে আরাধ্যায়
স্তোত্র-উপহার—
যুগান্তের সিংহাসনে আজি তাঁ'রা পুণ্যশ্লোক,
অমৃতায়মান,
লোকালোক-প্রান্ত থেকে রটিতেছে দিকে দিকে
প্রতিষ্ঠার গান।
বঙ্গের প্রবাসী কবি, 'দেবেন্দ্র'-প্রতিভারবি
সপ্তাশ্ব-বিমানে
স্বর্ণাভ্রে ভাস্বর করি' মৌক্তিক-কিরীট পরি'
তব সন্নিধানে
আত্মভোলা মুগ্ধ প্রাণে আজিও বাজান বীণা
সুধা-নিঃস্যন্দিনী,
কভু কাঁপে ঊর্দ্ধগ্রামে, কভু মন্দ্রে নেমে আসে
স্বর্লোক-রাগিণী।
চিরন্তন মধুমাস চিত্তে যাঁ'র করে বাস
সিক্ত পুষ্পরসে,
মানস-নন্দন-বীথি লীলায়িত কলকণ্ঠ-
সঙ্গীত-রভসে।
কবিত্বের মন্দাকিনী- পুণ্য-তোয়ে নিত্য যিনি
করেন তর্পণ,

ভাবের অতলস্পর্শে তন্ময় অতুল হর্ষে
ধ্যান-নিমগন।

এ জীবনে কভু রেবা, ভুলিব না অভিরাম
ভঙ্গিমা তোমার,
সম্মোহন ধ্বনি তব বিহরিবে অন্তরের
অন্তরে আমার—
করপুট ভরি' আজি স্ফটিক-বর্ত্তুল-রাজি
করিনু সঞ্চয়,
সূর্য্যকান্তমণি সম রাজিবে যা' বক্ষে মম
উজ্জ্বল অক্ষয়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

রাষ্ট্রনীতি ও ইতিহাস।

লর্ড মর্লী বিলাতের ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে বর্ত্তমান যুগের লোকমতের প্রাধান্যের বিষয় উত্থাপিত করিয়া, একটি অতি উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিভাষণ ইউরোপের বিদ্বজ্জনসমাজের চিন্তার ও আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই অভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্তব্যও কিছু বলিয়া রাখিব।

লর্ড মর্লী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, লোকমত কি এবং কেমন? জোগাড়ে যে মতকে স্বীয় মতের অনুকূল করা যায়; আবার যাহা কোটীমুদ্রা ব্যয় করিলেও কাহারও অনুকূল হয় না; ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় কখনও কখনও যাহা প্রবলবেগে রাজা, রাজ্যতন্ত্র, চিরাচীর্ণ আচার ব্যবহার, রীতিনীতিকে সমূলে উৎখাত করিয়া, নূতন ভাবের ও নবীন সমাজপদ্ধতির সৃষ্টি করে;—ইহার মধ্যে কোনটা লোকমত? লর্ড মর্লী জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এখন ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট আছে, নির্ব্বাচন আছে, লোকমতের প্রভাবে শাসনকার্য্যও চলিতেছে;

লোকমত কি?

পরন্তু এ সকলের উপরে রাজনীতিক অধিকার-প্রার্থিনী সফ্রেজিষ্ট নারী-দিগের চেষ্টাও উত্তালতরঙ্গভঙ্গে উত্থিত হইয়াছে! আধুনিক নিত্যপরিচিত লোকমত ত এই নারীদিগের আন্দোলনকে সাম্‌লাইতে পারিতেছে না। কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে, প্রজাতন্ত্র-শাসনাধীন দেশে লোক-মতটা কি ও কেমন? ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও ইউ-রোপীয় মনীষী এই লোকমতের প্রকৃত বিবরণ দিতে পারেন নাই। পুরাতন আচার-ব্যবহার, নিয়মপদ্ধতির প্রতি লোকের পূর্ব্বে যেমন শ্রদ্ধার ভাব প্রগাঢ় ছিল, এখন তেমন নাই; দিনে দিনে সে ভাবটা দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। জাতির বিধিনিষেধের প্রতি লোকের আর সে পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রমের ভাব নাই, আইন-কানুনের প্রতি একটা ভক্তির টান নাই। কেবল যে ইংলণ্ডেই এই অশ্রদ্ধার ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে; ইউরোপের সকল সভ্য দেশেই এই ভাব জাগরূক হইয়াছে। পুরাতনকে বর্ত্তমানের সহিত বাঁধিয়া ভবিষ্যতের নবীনতায় মিশাইবার চেষ্টা যে ইউরোপব্যাপী ছিল, যাহার প্রভাবে ইউরোপের উন্নতি ও জগদ্ব্যাপিনী বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, সে চেষ্টা এখন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন পুরাতনের প্রতি উপেক্ষার ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই হেতু যে জাতির বিশিষ্টতা (Individualism) নষ্ট হইতেছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। এই যে ভাবান্তর, ইহা কাহাদের মধ্যে ঘটিতেছে? এই লোকমতটা কি ও কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া লর্ড মর্লী ইউরোপের রাষ্ট্রীয় কথার পর্য্যালোচনা করিয়া-ছেন, ইউরোপীয় খ্রীষ্টানী-সভ্যতা-বিমুগ্ধ বর্ত্তমান যুগের সভ্যসমাজের ভাবের বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির সহিত লোকমতের সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন।

ভাব-প্রবাহ।

নেপোলিয়ন বলিয়া গিয়াছেন যে, "Imagination rules the world". অর্থাৎ, ভাব-প্রবাহে জগতের লোকসমাজ শাসিত হইয়া থাকে। যুগে যুগে এক একটা ভাবের ঢেউ উঠিয়া থাকে, সেই ঢেউতে সমাজে ওলট্ পালট্ হয়, সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। যেমন বিরাট জলপ্লাবনে গ্রাম পল্লী বিধৌত হইয়া যায়, জীর্ণবিষাক্ত ভূমির উপর নূতন পলিমাটী পড়িয়া ভূমিতে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়া দেয়, তেমনই নূতন ভাবের বন্যায় এক একবার সমাজ যেন ভাসিয়া যায়, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে। এই ভাবের কাহিনী

জাতির ইতিহাস; এই ভাবের দ্যোতনা যাহার দ্বারা হয়, তাহাই লোকমত। প্রথমে ভাবটা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর স্তরের ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে; এই অব্যক্ত ভাব লোকবিশেষের মনীষার ও প্রতিভার প্রভাবে বাহ্ আকার ধারণ করে, শেষে সেই পরিস্ফুট ভাব সমাজ গ্রহণ করে, এবং তদনুসারে কার্য্য করে। সমাজের গুপ্তকথা যুগে যুগে এক একটা মানুষে বা দলে প্রথমে প্রকাশ করে। তাহাদের মুখের কথা সমাজ গ্রাহ্ করিয়া লয়। যেমন, লাইব্‌নীজ, গ্রোশিয়স্, রুসো, কবডেন, কাভুর, বিসমার্ক, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি যুগাবতারগণ রাষ্ট্রনীতির নূতন বাণী ইউরোপকে শিখাইয়া গিয়াছেন। ইউরোপ সেই ভাব লইয়া যুগে যুগে প্রমত্ত হইয়াছে, নিজের সমাজ সময়োপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। যখন জাতি জাগিতে চাহে, তখন এক জন জাগাইবার মানুষও আসিয়া জুটে। এই জাগরণ ও উদ্বোধনের ইতিহাসই জাতির ইতিহাস। এই জাগরণ ও উদ্বোধনের ফলে যে মতের সৃষ্টি হয়, তাহাই লোকমত। যে যুগের যাহা উপযোগী, লোকমতও সেই তন্ত্রের উপযোগী হয়। কখনও বা সামন্ততন্ত্রের প্রভাব হয়, কখনও বা ঐশ্বর্য্যতন্ত্রের প্রাবল্য ঘটে, কখনও বা প্রজাতন্ত্রের প্রাবল্য বিস্তৃত হয়। প্রত্যেক তন্ত্রের মূলে এক একটা ভাব (Idea) নিহিত থাকে; প্রত্যেক তন্ত্রের এক এক জন ভাবুক প্রতিভাশালী প্রবর্ত্তকও থাকেন। এই হিসাবে মানবজাতির ইতিহাসে সাম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিশাল, সুদূরব্যাপী হিমালয় পর্ব্বত অগণ্য শৃঙ্গের মালাস্বরূপ, তেমনই মানবসমাজের নানা জাতির নানাবিধ ইতিহাস এক পর্ব্বতের নানা শৃঙ্গমাত্র। যে দেখিতে জানে, সে দেখিতে পারে যেমন এক পর্ব্বতপৃষ্ঠে অগণ্য শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তেমনই মানবতার এক ভাবের উপর নানা জাতির নানা ইতিহাস অজ্ঞেয় অনন্তকে চুম্বন করিবার জন্য ভাবআকাশের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ভাব এক; দেশ ও জাতিভেদে উহার অভিব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

সাম্য ও বৈষম্য।

মানবজাতি সকলের মধ্যে মানবতায় সাম্য ও দেশকাল পাত্র অনুসারে উহাদের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। যে হেতু পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি,—শ্বেত, পীত, কপিল, ধূসর, কৃষ্ণ,—সকল বর্ণের সকল জাতি মনুষ্যসাধারণগুণোপেত, সেই হেতু মনুষ্যত্ব জন্য তাহাদের মধ্যে একটা সমতা আছে। এই সমতাজন্য জাতিবিশেষের উত্থান পতনের ভঙ্গী সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে একই-

রকমের হয়। এই সমতাজন্য পাপপুণ্যের ফলাফল সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে একই প্রণালীবদ্ধ হইয়া পরিস্ফুট হয়। পরন্তু দেশপ্রভাবে, জলবায়ু-অবস্থানপ্রভাবে, জাতির অতীত ইতিহাসের—আচার-ব্যবহার-বিধিনিষেধ-রীতিপদ্ধতির প্রভাবে প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশিষ্টতা উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই ইংরেজিতে National Individualism বা জাতীয় বিশিষ্টতা বলা হইয়াছে। এই বৈষম্যজন্যই জাতিভেদ এবং বর্ণবিচার; এই বৈষম্যজন্যই কোনও জাতি শ্বেত, কোনও জাতি পীত, কোনও জাতি ঘোরতর কৃষ্ণকায়, কোনও জাতি আবার নানাবর্ণের সমবায়মাত্র। কিন্তু ভাবের পরিস্ফুরণ যুগে যুগে প্রায় সকল জাতির মধ্যে সমভাবে হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব ভারতে যে ভাবের প্রচার করিয়াছিলেন, যিশুখৃষ্ট সেই ভাবেরই প্রচার ইউরোপে করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সহস্র বৎসরকাল এসিয়া মহাদেশে যে ভাবে সমাজবিন্যাস, সভ্যতার উন্মেষ, মানবতার উদ্ভব, এবং সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় ঘটিয়াছিল; খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে গত সহস্র বৎসরকাল ইউ-রোপখণ্ডে সেইরূপ ফলোৎপত্তি হইয়াছে। মানবতার সমতার জন্য পরিণতির সমতা ঘটিয়াছে; পরন্তু দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ফলের পরিস্ফুরণ এসিয়া ও ইউরোপে দুই ভাবে হইয়াছে। এসিয়ার বিশিষ্টতা এসিয়াকে এক রকমে এক দিকে পরিচালিত করিয়াছে; ইউরোপের বিশিষ্টতা ইউরোপকে স্বতন্ত্র পরিণতির পথে পরিচালিত করিবে।' পরন্তু কথা এক; যে কথায় ইউরোপ মাতিয়াছে, সেই কথায় পুরাকালে এসিয়া মাতিয়াছিল। যে পাপে এসিয়ার অধঃপতন হইয়াছে, সেই পাপ ইউরোপে পরিস্ফুট হইলে, ইউরোপও অধঃ-পাতে যাইবে। ইহাই ইতিহাসের সমতা ও বৈষম্য। লর্ড মর্লী ইঙ্গিতে এই কথাটা বুঝাইয়াছেন।

স্থিতি ও উন্নতি।

এইবার স্থিতি ও উন্নতি, এই দুইটা কথা বুঝিতে হইবে। ইউরোপ উন্নতির পক্ষপাতী; এসিয়া, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ স্থিতির উপাসক। ইউরোপ এখনও ভুলিতে পারে নাই যে, এককালে সে অতি বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল। পদার্থতত্ত্বের অনুশীলনের প্রভাবে, বিদ্যার অতিপ্রচারে, প্রাকৃত শক্তির উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ইউরোপ উন্নতি ও সভ্যতার আরোহণীর উচ্চধাপে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের এখনও এই ধারণা যে, মানব-পুরুষকারের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইউরোপ স্বাধীন

ও স্বাবলম্বনে সিদ্ধ, তাই ইউরোপ উন্নতির প্রয়াসী। ইউরোপের স্মৃতি নাই, আশা আছে। পক্ষান্তরে, এসিয়ার স্মৃতি আছে, আশা নাই বলিলেও হয়। এসিয়ার মনে নাই, কবে সে বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল। এসিয়ার কিন্তু মনে আছে যে, সে যুগে যুগে জগৎকে নূতন তত্ত্ব শিখাইয়াছে, নিত্যনবীন সভ্যতা দিয়াছে। জোরোয়াষ্টার, কণফু, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, সবাই এসিয়ার সন্তান। ইঁহারা সকলেই এসিয়াকে উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, শ্লাঘা, অহঙ্কার, সবই দিয়াছিলেন। এসিয়া বুঝিয়াছে যে, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইলে মানব-পুরুষকারের প্রভাব অসীম নহে। যে পুরুষকারের প্রভাবে মানুষ জগজ্জয়ী হয়, সেই পুরুষকারের সম্মোহনে মানুষ বিলাসী ভোগী হইয়া অধঃ-পতিত হয়। উত্থান পতন, কালধর্ম্ম এবং জাতিধর্ম্ম, উহা মনুষ্যের সাধনার আয়ত্ত নহে। বরং জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে মানুষ কাহারও অপেক্ষা করে না। এই বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হইলে স্থিতির প্রয়াসী হইতেই হইবে। এসিয়ার শ্লাঘা অতীতের গৌরবগরিষ্ঠ স্মৃতি লইয়া, তাই এসিয়া অতীতের সহিত জড়াইয়া থাকিতে চাহে। রোগী মুমূর্ষু হইলে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে চিকিৎসকের বাহাদুরী আছে। এসিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তাই এসিয়া স্থিতিটা বুঝে ভাল। ইউরোপের অতীত নাই, ভবিষ্যৎ আছে; তাই ইউরোপ স্থিতি বুঝে না, উন্নতিই বুঝে। ইউরোপকে কখনই ত মরণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইউরোপ স্থিতির মহিমা বুঝিবে কি?

ডাকের কথা।

রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে এক এক যুগে এক একটা শব্দে, এক একটা কথায় সমাজে ভীষণ ওলট পালট ঘটিয়া থাকে। কথার মধ্যে কিছু নাই, কথার তাৎপর্য্য কেহ বুঝে না, তথাপি কথায় লোকে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। যেমন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। সংসারে জীবিকার্জ্জনের ব্যাপারে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, এই তিনটার কোনটাই খাটে না; সমাজবিন্যাসে বৈচিত্র্যেরই বিকাশ হয়, সাম্য পরিস্ফুট হয় না; সকল মানুষ সমান নহে, সকল মানুষ এক হইতে পারে না। তথাপি এই সাম্যের জন্য ফরাসী-বিপ্লবে নরশোণিতের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। এখনও যাহারা এই সকল কথার ব্যবহার করে, তাহারা উহার প্রকৃত অর্থ ও দ্যোতনা বুঝে না। তাহারা জানে না যে, মানুষ চিরদিনই ঐশ্বর্য্যের দাস, জ্ঞান মনীষা প্রতিভার অনুগত।

সমাজে যে প্রতিভাশালী হইবে, যে চরিত্রের ও ব্যবহারের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে পারিবে, ত্যাগের ও সন্ন্যাসের জগন্মোহন দৃষ্টান্তে সমাজকে চকিত করিয়া তুলিবে, মনীষার বিদ্যুদ্বিকাশে সকলকে চমকাইয়া তুলিবে, সেই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে। কাজেই মনুষ্যসমাজে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, এই তিনের কোনটাই কার্য্যকারী হইতে পারে না। তথাপি এই ডাকের কথায় এক সময়ে ফরাসীদেশ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কেন না, এই ডাকের কথার অন্তরালে একটা জাতিগত ব্যথার ভাব লুকান ছিল। এই ডাকের কথা জাতির সময়বিশেষের ব্যথার দ্যোতকমাত্র। ইতিহাস এই ব্যথার বিশ্লেষণ করিয়া দেখায়, এই হেতু ইতিহাস রাষ্ট্রনীতির পরিপোষক। এই সকল ডাকের কথা ধরিয়া কত বড় বড় লেখক কত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এক স্বাধীনতা শব্দের দুই শতটা বিবৃতি আছে; সাম্যের বিষয় লইয়া বড় বড় পুস্তক রচিত হইয়াছে। কিন্তু ডাকের কথা যে কথামাত্র, উহা কেবল অতীত ঘটনা-পারম্পর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, এইটুকু অনেকে বুঝিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রনীতি এই সব ডাকের কথার সমবায়মাত্র। যিনি এই সমবায়ের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই রাষ্ট্রনীতির একটা বিজ্ঞান বা Science গড়িয়া তুলিতে পারেন। পরন্তু এমন সায়ান্স পাইয়া সমাজের কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। সমাজে যখন যে ভাবের ঢেউ উঠে, যে ব্যথার জ্বালা তীব্রভাবে অনুভূত হয়, তখনই একটা বিপ্লব ঘটে। যুক্তি-তর্কে বা সুবিবেচনার কথায় বিপ্লব কখনই প্রশমিত হয় না। যখন যাহা ঘটিবার, তখন তাহাই ঘটে। লোকমতকে সংযত করিবার সামর্থ্য আজ পর্য্যন্ত কোনও মানুষের ভাগ্যে হয় নাই, লোকমতকে দলিত মথিত করিবার সাহস আজ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই। বিপ্লবের মুখে মনুষ্য-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যতদিন না বিপ্লবের উন্মাদনা প্রশমিত হয়, ততদিন উহা উত্তালতরঙ্গে অগ্রসর হইতেই থাকে।

সাহিত্য ও সমাজ।

অনেকের বিশ্বাস যে, এক এক যুগে এক এক রকমের সাহিত্য এক একটা সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। কথাটা ঠিকও বটে, বে-ঠিকও বটে। সাহিত্যের পরিণতি সমাজবিপ্লব, না সমাজবিপ্লবের উদ্বোধনে নবীন সাহিত্যের সৃষ্টি? এই সন্দেহের নিরসন করিতে পারিলে, বিপ্লবতত্ত্ব কতকটা বুঝা যাইতে পারে। পরন্ত এ সংশয়ের নিরসন হইবার নহে। রুসোর বহির

প্রচার জন্য ফরাসী-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, কিংবা যে ভাবের উদ্বোধনে ফরাসী-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই ভাবের প্রেরণায় রুসোর বহি লিখিত হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। যেমন কার্য্য ও কারণের পারম্পর্য্যই দেখা যায়, কোনটা কার্য্য, কোনটা কারণ নির্দ্দেশ করা মনুষ্য-শক্তির অতীত, তেমনই সাহিত্য ও সমাজ-বিপ্লবের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, কোনটা ফল, কোনটা বীজ, ঠিক করিয়া বলা যায় না। ভাবজন্য সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব ঘটে; ভাব ব্যথা বা দুঃখ দূর করিবার চেষ্টামাত্র; সুতরাং সমাজে সর্ব্বাগ্রে দুঃখানুভূতি ও দুঃখোপশান্তিচেষ্টা পরিস্ফুট হওয়া চাহি। এই দুঃখোপশান্তির চেষ্টায় ভাবের উদ্বোধন হয়, ভাব ভাষায় পরিণত হয়। এই ভাবগত ভাষাই এক এক যুগের এক একটা সাহিত্য। ফলে, ভাবের উদ্বোধন ও সাহিত্যের সৃষ্টি কতকটা সমসাময়িক। ভাবের প্রেরণায় সাহিত্যের সৃষ্টি, সাহিত্যের প্রভাবে ভাবের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে। প্রথমে অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন হওয়া চাহি; সেই অত্যাচার উৎপীড়নের সাহায্যে ভাবের উদ্গম হয়, দুঃখানুভূতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও লোকের মনে জাগিয়া উঠে। এই জাগরণজন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি। অতএব বলা চলে যে, সাহিত্য সমাজবিপ্লবের ফলস্বরূপ, আবার সমাজবিপ্লব পরিস্ফুট করিবার হেতুস্বরূপও বটে। এই হিসাবে এক এক যুগের সাহিত্য এক এক যুগের উপযোগী। পরবর্ত্তী যুগে পুরাতন সাহিত্য তেমন কার্য্যকর হয় না; অথবা পরবর্ত্তী যুগে পুরাতন সাহিত্য কদাচিৎ নূতন ভাব ও আকার ধারণ করে। অর্থাৎ, পুরাতন শব্দ সকলকে নূতন ভাবের দ্যোতক করিয়া তোলা হয়। সমাজ সাহিত্যের আধার; সমাজ-ক্ষেত্রেই সাহিত্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রত্যেক যুগের ভাব এই সাহিত্যের বীজ; সামাজিক দুঃখের উপশান্তির আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষেত্রের জলসেচন। কবি ও মনীষী ক্ষেত্রের ফসল ঘরে তুলিয়া, ঝাড়িয়া মাজিয়া মনোমত করিয়া সমাজে উহার ফেরি করেন। সমাজের সামগ্রী সমাজকে বিলাইয়া দিয়া তাঁহারা কবি ও গ্রন্থকার হন। কবি ও ভাবুক অসামাজিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারেন না। অনুচিকীর্ষার বশে অসামাজিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে, সে সাহিত্য টবের ফুলের মতন অধিক দিন টিকে না।

শেষ কথা।

লর্ড মর্লী এই প্রকারে রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ করিয়া শেষে

বলিয়াছেন যে, এই সকল তত্ত্ব শিখাইবার জন্য, ইতিহাসের ঘটনা-পারম্পর্য্য ও তাহার গতি ও পরিণতি বুঝাইবার জন্য বিশিষ্ট অধ্যাপক নিয়োগ করা ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনিভারসিটীর কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহার ইঙ্গিতের কথা দুই এক স্থানে ফুটাইয়া বলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের কথার পরিহার করিয়াছি। তাঁহার বিশ্লেষণের ভঙ্গীটাই দেখাইয়া দিয়াছি। লর্ড মর্লীর বিশ্বাস, উন্নতিই বিশ্বের গতি বা পরিণতি নহে। উন্নতি, স্থিতি ও অবনতি প্রতিবেশ-প্রভাবের উপর নির্ভর করে! ইউরোপ এত দিন উন্নতির মোহে মুগ্ধ ছিল, এখন ইউরোপের মনস্বি-প্রধানগণ স্থিতির জন্য আকুল হইয়াছেন। এতকাল ইউরোপের অভাব পূর্ণ হয় নাই, সাধ মিটে নাই, তাই ইউরোপ উন্নতিকামী হইয়াছিল। এখন ইউরোপের মনস্বিগণ বুঝিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির একটা সীমা আছে, সে সীমা অতিক্রান্ত হইলে জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী হয়। তাই এই সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে ইউরোপ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া, যাহা পাইয়াছে, তাহা যদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে হয় ত ইউরোপ আরও কিছুকাল টিকিতে পারে। লর্ড মর্লী ঠিক এই মতের পোষক না হইলেও, তিনি যে ইহার যাথার্থ্য অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার বক্তৃতা পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। এই বক্তৃতার কিছুদিন পূর্ব্বে মনীষী মিঃ ব্যালফোর স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আর উন্নতি উন্নতি করিয়া চীৎকার করিও না, যাহা পাঁইয়াছ, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখ। সমাজ যদি এখন স্থিতিশীল না হয়, তাহা হইলে, এই উন্নতির উন্মাদে সমাজকে অবনতির গহ্বরে পড়িতেই হইবে মিঃ ব্যালফোরের এই কথার যেন প্রতিধ্বনি করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড মর্লী এই অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়াছেন। ইউ-রোপের খৃষ্টান-সমাজে স্থিতিতত্ত্ব সর্ব্বজনমান্য হইলে, খৃষ্টান ইউরোপ বৌদ্ধ বা হিন্দু ভারতের সমাজতত্ত্বের অনুসরণ করিতে পারে। ইউরোপ একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ইউরোপের মনস্বিগণ ইহা বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহাদের মুখে নূতন কথা ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ।

৪

রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে ব্রাহ্মণদিগের বিপক্ষদলভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ অপূর্ব্ব 'থিওরী' কি প্রকারে তাঁহার মস্তিষ্ককন্দরে প্রবেশলাভ করিল, তাহা আমরা বুঝিতে একেবারেই অসমর্থ। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই যজ্ঞে (যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে) তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্ত্তী কালের এই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়।" *

* কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণের দৃষ্টিতে হীন করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি রচিত হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। মহাভারতে পদপ্রক্ষালনের কথা এইরূপ আছে,—

চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ংহ্যভূৎ।
সর্ব্বলোকসমাবৃত্তঃ পিপ্রীষুঃ ফলমুত্তমম।

"সমস্ত উপায়নপ্রদ লোক কর্ত্তৃক সমাবৃত্ত (বেষ্টিত) হইয়াও উত্তম ফলকে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ব্রাহ্মণদিগের পদক্ষালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।" এ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। ভগবান ঐ কার্য্যে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ কার্য্যের পুণ্যই প্রীত হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবহানি করা হয় নাই; গৌরববৃদ্ধি করাই হইয়াছে।

ঐরূপ কার্য্যে যে গৌরববৃদ্ধি হইত, তাহা ত্রিদেব-পরীক্ষায় স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে। একদা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিন দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা ভৃগুকে ঐ তিন দেবতার নিকট প্রেরণ করিলেন:—ভৃগু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন নাই। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৈলাসে যাইয়া শিবকে কটূক্তি করায় শিব ভৃগুকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শেষে বৈকুণ্ঠে যাইয়া একেবারেই বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। বিষ্ণু ভৃগুর উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার পাদ-প্রহারচিহ্ন আমার বক্ষে বিভূতিরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।" ভৃগু সেই কথা ঋষিগণকে বলিলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুই সকলের শ্রেষ্ঠ।" এইরূপ শ্রেষ্ঠানুমানের প্রমাণ পুরাণে প্রচুর আছে।

উপর্য্যুক্ত উপাখ্যান দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, তখন মহত্ত্বের পরিমাপ করিবার যে standard ছিল, তাহা এখনকার standard হইতে স্বতন্ত্র। তখনকার standard দিয়াই তখনকার বিষয় বিচার করিতে হইবে, এখনকার standard দিয়া তখনকার বিষয়ের বিচার করিতে গেলে তাহা ভ্রান্ত হইবে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু স্থানাভাব।

এই অপূর্ব্ব যুক্তি-শ্রবণে আমরা চমকিত। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে আছে। ইহা যে পরবর্ত্তী কালের, তাহা কবিবর কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? আর যদি ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, উহা পরবর্ত্তী কালের অত্যুক্তিমাত্র, তাহা হইলে, তাহা হইতে কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে ঘোর বিরোধ ছিল, এবং সেই বিরোধে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপক্ষদলের নেতা ছিলেন? প্রবাদ আছে, সাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সাধনায় কালিকাদেবী ভক্ত রামপ্রসাদের বাগানের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। রবি বাবুর নিকট ইহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী কালের অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং বঙ্গের শেলী মহাশয় কি তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ঐ কিংবদন্তীর দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, শৈব-বৈষ্ণব বিবাদে কালিকাদেবী বৈষ্ণব পক্ষের নেত্রী ছিলেন? আমরা রবি বাবুর ইতিহাসের ধারা-পাঠে বিস্মিত, কিন্তু লজিকের ধারা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।

পুরাণাদি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন। জতুগৃহদাহের পর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে অবস্থান করেন নাই। লক্ষ্যভেদের পর সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলী পাণ্ডবদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন পাশায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ যখন বনগমন করেন, তখন বহুসংখ্যক সাগ্নিক ও নিরগ্নি ব্রাহ্মণ আত্মীয়বান্ধব সহ তাঁহাদিগের অনুগমন করিতেছিলেন। ইহাতে কি সপ্রমাণ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের প্রতিপক্ষ ছিলেন? যে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মণানাং পরিক্লেশো দৈবতান্যপি সাদয়েৎ।" "যে ব্যক্তির আশ্রয়ে ব্রাহ্মণের ক্লেশ হয়, সে ব্যক্তি দেবতা হইলেও কষ্ট পায়"।—সেই যুধিষ্ঠির রবি বাবুর ন্যায় ব্যক্তির মতে ব্রাহ্মণের বিদ্বেষী! এইরূপ সৃষ্টিছাড়া থিওরী শুনিয়া আমরা বিস্মিত।

রবিবাবু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিবাদের যে উদাহরণগুলি প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জাতিগত বিবাদ কিছুমাত্র সপ্রমাণ হয় নাই। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদ ব্যক্তিগত। উহাতে অন্য কোনও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যোগ দিয়াছিলেন, তাহার নিতান্তই প্রমাণাভাব। হরিশ্চন্দ্রের পরুষ বাক্যই হরিশ্চন্দ্র-বিশ্বামিত্রের বিবাদের কারণ। জরাসন্ধের

সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাদও ব্যক্তিগত। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের জামাতা কংসকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শত্রুতা জন্মে।* শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সাহায্যে বৈরনির্য্যাতন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতেই স্বীকৃত হন নাই। শিশুপাল জরাসন্ধের বন্ধু ও সেনাপতি; কৃষ্ণ ছলে জরাসন্ধের বধসাধন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসমুদ্ভূত ছিলেন।—পুরাণপাঠে জানা যায় যে, বৃষ্ণিবংশ অত্যন্ত নিন্দিত বংশ ছিল, সেই জন্য অনেক আভিজাত্যাভিমানী ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সম্মান সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। সেই জন্যই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য-প্রদান উপলক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কলহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সম্পত্তি-বিভাগ লইয়াই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। পাণ্ডবগণ পাঁচখানি গ্রাম লইয়াই ক্ষান্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন,—"বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিব না।" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যদি অন্য কোনও কারণ থাকিত, তাহা হইলে, যে সময় কেশব বিবাদ-মীমাংসার জন্য কুরু-সভায় গিয়াছিলেন, সে সময় ঘুণাক্ষরেও সে কথা প্রকাশ পাইত।

পুরাণাদির আলোচনা করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কোনও কালে ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া বিবাদ ঘটিয়াছিল, স্পষ্টাক্ষরে বা ঘুণাক্ষরে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। রবিবাবু ক্ষত্রিয়দিগের কতকগুলি গৃহ-বিবাদকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।

আদর্শ লইয়া বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কোনও প্রাচীন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ নাই। বরং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আদর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই চেষ্টায় কতকটা সাফল্যলাভে সমর্থও হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষিগণই ব্রহ্মর্ষি নামে আখ্যাত হইতেন। বিশ্বামিত্র কেবল ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু বশিষ্ঠ যাহাতে তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। দেবতারা

---

* নিহতো বাসুদেবেন তদা কংসে মহীপতৌ।
জাতো বৈ বৈরনির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণেন সহ তস্য বৈ॥—মহাভারত, সভা; ১৯।২২।

যখন তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখনও তিনি বলিয়াছিলেন ;—

ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ ॥ ব্রহ্মপুত্রবশিষ্ঠো মামেবম্ বদতু দেবতা।
ওঙ্কারোঽথ বষট্‌কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্। যদ্যেবং পরমং কামং কৃতো যান্ত সুরর্ষভাঃ ॥
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি ॥ আদিকাণ্ড ; ৬৫।২২—২৫

"হে দেবগণ! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করিলাম, তবে চতুর্ব্বেদে, ওঙ্কারে ও বষট্‌কারে ব্রাহ্মণের ন্যায় আমার অধিকার হউক। আর যে বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয়বেদবিদ্‌গণের ও ব্রহ্মবেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করুন, ইহা হইলে আমার প্রধান বাসনা পূর্ণ হয় ; আর আপনারাও স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারেন।" বশিষ্ঠ যে ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন, ইহার প্রমাণ যোগবাশিষ্ঠে, মহাভারতের জনক-বশিষ্ঠ-সংবাদে ও অন্যান্য গ্রন্থে যথেষ্ট বর্ত্তমান।

পক্ষান্তরে, বিশ্বামিত্রও যজ্ঞিষ্ঠ ছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বশিষ্ঠের সহিত তিনি হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ ;—

বিশ্বামিত্রোঽভবত্তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্য্যুরাত্মবান্। জমদগ্নিরভূদ্‌ব্রহ্মা বসিষ্ঠোঽয়াস্যঃ সামগঃ ॥
ভাগবত, ৯।৮।২২

সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মজ্ঞানী জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মুনিরা উদ্গাতা হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মপুরাণেও ঐ প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

বিশ্বামিত্রেণ ঋষিণা বশিষ্ঠেন পুরোধসা ॥ প্রাপ্য গঙ্গাং গৌতমীং তাং নরমেধায় দীক্ষিতঃ ॥
বামদেবেন ঋষিণা তথান্যৈর্মুনিভিঃ সহ। ব্রহ্মপুরাণ, ১০৪।৬৯—৭০

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য ঋষিকে সঙ্গে লইয়া হরিশ্চন্দ্র গঙ্গাতীরে গৌতমীতীর্থে উপস্থিত হইয়া নরমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। সেই জন্য তিনি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে গণনীয় ছিলেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ, উভয়েই যজ্ঞ করিতেন। বিশ্বামিত্র যেখানে হোতা, বশিষ্ঠ সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা। হোতা অপেক্ষা ব্রহ্মার পদ উচ্চতর। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠেরই আদর্শের অনুকরণ করিয়াছিলেন। আদর্শ লইয়া উভয়ের বিবাদ ছিল না ; একই আদর্শের অনুসরণহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ উভয়ের বিবাদ ঘটিয়াছিল।

সুতরাং রবিবাবু যে কয়টি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে 'আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ' কল্পনা করিতেছেন, তাহা মিথ্যা বলিয়াই সপ্রমাণ হইল। তবে যদি রবিবাবু বলেন ঃ—

I am Sir Oracle

And, when I ope my lips, let no dog bark!

তাহা হইলে আমরা নিতান্তই নাচার। পৌরাণিক বিষয়ের বিচার করিতে হইলে পুরাণের কথা ভিন্ন অন্য গতি নাই। তাহার সম্বন্ধে থিওরী রচিতে হইলে পৌরাণিক তথ্যের উপরই তাহার ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষ ভাবে ক্ষত্রিয়-বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য রবিবাবু দুইটি হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম হেতুবাদ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যার একটি নাম 'রাজবিদ্যা'। রবিবাবুর মতে, রাজবিদ্যা অর্থে রাজার অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা। রবিবাবুর এই হেতুবাদ যে একান্তই ভ্রান্ত, তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শব্দের অর্থ ধরিয়া যদি ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণেরই বিদ্যা। কারণ, ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ,—যে ব্রহ্মকে জানে। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ, ইহা মনুর উক্তি। পক্ষান্তরে, রাজবিদ্যার অর্থ ক্ষত্রিয়েরই বিদ্যা, ইহার কোনও প্রমাণই নাই। গীতায় রাজবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'বিদ্যানাং রাজা' রাজবিদ্যা। সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ যে বিদ্যা, তাহাই রাজবিদ্যা। শঙ্করের মতে, রাজবিদ্যা ও পরাবিদ্যা একই অর্থের দ্যোতক। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে; যথা—রাজখর্জ্জুরী, রাজজম্বু, রাজযক্ষ্মা, রাজদন্ত, রাজধুস্তুরক, রাজপুষ্প, রাজফল, রাজবদর, রাজভদ্রক, রাজমণ্ডূক, রাজমাষ, রাজসর্ষপ, রাজকদম্ব, রাজকুষ্মাণ্ড, রাজভুঙ্গত ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ শঙ্করের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং উহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা আছে কি না, দেখা যাউক।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে রাজবিদ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে; সেখানে ঐ শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠ বলিতেছেন ঃ—

কালচক্রে বহত্যস্মিং স্ততো বিগলিতে ক্রমে।
প্রত্যহং ভোজনপরে জনে শাল্যর্জ্জনোন্মুখে॥
যুদ্ধানি সংপ্রবৃত্তানি বিষয়ার্থং মহীভুজাম্।
দণ্ড্যতাং সম্প্রয়াতানি ভূতানি ভুবি ভূরিশঃ॥
ততো যুদ্ধং বিনা ভূপা মহীং পালয়িতুং ক্ষমাঃ।
ন সমর্থাস্তদা যাতাঃ প্রজাভিঃ সহ দৈন্যতাম্॥

তেষাং দৈন্যাপনোদার্থং সম্যগ্ বুদ্ধিক্রমায় চ।
ততোঽস্মদাদিভিঃ প্রোক্তা মহত্যো জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ॥
অধ্যাত্মবিদ্যা তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা।
তদনু প্রসৃতা লোকে রাজবিদ্যেত্যুদাহৃতা॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বা রাঘব রাজানঃ পরাং নির্দ্দুঃখতাং গতাঃ॥

" * * * এইরূপে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ঐ সমস্ত ক্রিয়াদি বিলুপ্ত হইতে লাগিল। লোকসমূহ অর্থাদি অর্জ্জনের ও ভোজনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিষয়ের জন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিতে লাগিল। পৃথিবীতে দলে দলে লোক দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠিল; অর্থাৎ, বহুসংখ্যক লোক পাপাচারী হইয়া উঠিল। রাজারা বিনা যুদ্ধে পৃথিবীপালন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন; তখন রাজা ও প্রজা উভয়েই এক সঙ্গে দীন ভাব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর জনসমূহের দৈন্যমোচন করিবার উদ্দেশ্যে ও আত্ম-জ্ঞান-প্রচারার্থ মহতী জ্ঞানদৃষ্টি প্রকটিত করিতে হইল। এই কারণে আধ্যাত্মজ্ঞান রাজাদিগের নিকট প্রথমে বর্ণিত হয়, পরে জনসাধারণের নিকট বিবৃত হয়; সেই জন্যও অধ্যাত্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ও অতি গুহ্য উত্তম অধ্যাত্মবিদ্যা অবগত হইয়া রাজগণ দুঃখমুক্ত হইয়াছিলেন।"

এই উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণই প্রথমে অধ্যাত্ম বিদ্যার চর্চ্চা করেন। পরে যখন জনসমাজে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত ও নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাবহেতু কলহ ও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে ভারতে ঘোর অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করে, তখন লোকের হিতার্থ মহর্ষিরা ঐ একতাসাধক তত্ত্বজ্ঞান জনসমাজে প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যেই উহা রাজগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। লোকসমাজে প্রচারার্থ উহা প্রথমে রাজাদিগকে উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া লোকে উহাকে রাজবিদ্যাও বলিত। ইহাতে সপ্রমাণ হইল, রাজারা জনসমাজে উহার প্রচারকমাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণ ঋষিরাই এই অধ্যাত্মবিদ্যার উদ্ভাবক ও প্রথম প্রচারক। উপনিষদে, অধ্যাত্মবিদ্যার আদিগ্রন্থসমূহে, ইহা বহু স্থানেই উক্ত হইয়াছে। যথা:—

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রম্ প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্॥ শ্বেতাশ্বতর; ৬।২১।

ইহার অর্থ,—বিদ্বান শ্বেতাশ্বতর তপস্তাপ্রভাবে ও দেবতার প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম পবিত্র ঋষিসঙ্ঘজুষ্ট (ব্রহ্মজ্ঞান) অত্যাশ্রমীদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। জুষ্ট অর্থে সেবিত এবং উচ্ছিষ্ট। ঋষিসঙ্ঘজুষ্ট অর্থে, ঋষিসমাজ কর্ত্তৃক প্রথমে সেবিত। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণ ঋষি-সমাজেই প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভেই এই কথা আরও স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং রবিবাবু রাজবিদ্যা অর্থে ক্ষত্রিয়বিদ্যা বুঝিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এখানে রাজন্ শব্দ ক্ষত্রিয়বাচক নহে। সমাজের বিপ্লব-নিবারণের জন্য সমাজ ও ধর্ম্মের গোপ্তা (Defender of Faith and Country) মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগকেই সমাজের হিতার্থ ঋষিগণ এই বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় সমাজে এই বিদ্যা কখনও অনুকূল আশ্রয় লাভ করে নাই।

ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়বিদ্যা, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য রবি বাবু কেবল শব্দমার্গ অবলম্বন করেন নাই, পরন্তু যুক্তিমার্গও অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ—"মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয়, তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না। * * * তাঁহারা মানবের বন্ধুর দুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক অনুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশবিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্য্যদের মধ্যকার ঐক্য সূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্য পদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল।" পাঠক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, রবি কবি তাঁহার কল্পনাকল্পিত কারণ-নির্দ্দেশে কেবল 'ছেঁদো' কথার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রিয়-বিদ্যা, ক্ষত্রিয়সমাজই ইহার আবিষ্কর্ত্তা ও পোষ্টা, ইহা সপ্রমাণ করাই তাঁহার সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। কিন্তু যেমন কোনও কূটতার্কিক মোক্তার নিজের পক্ষের যুক্তি-দৌর্ব্বল্য জানিয়া কথার ছাঁদে সেই দৌর্ব্বল্য ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা পায়, রবি বাবুও বালখিল্যদলের করতালি-লাভপ্রয়াসে সেইরূপ কৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি যেন তাঁহার বক্তব্য পূরা মাত্রায় বলিতে সাহসী হন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষ-

ভাবে ক্ষত্রিয়বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল" ; ব্রহ্মবিদ্যা "ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অনুকূল আশ্রয়লাভ করিয়াছিল" ইত্যাদি। অর্থাৎ, বিশেষরূপে চাপিয়া ধরিলে পাঁকাল মাছের মত পিছলাইয়া যাইবার পথটি তিনি যথাসাধ্য পরিষ্কৃত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ব্যাপার সম্পর্কে পৌর্ব্বাপর্য্য-সংঘটনের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ দেখিয়াই কারণকার্য্য অনুমিত হইয়া থাকে। * অর্থাৎ, যদি একটি পরিবর্ত্তনের সহিত আর একটি পরিবর্ত্তনের পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাবে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে প্রথমটিকে কারণ ও শেষটিকে কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল দেশেরই সামরিক জাতি মৃত্যুর সম্মুখে একত্র হয়, এবং আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে। সুতরাং রবি বাবুর হিসাবে সকল দেশে মধ্যকার ঐক্য সূত্রটি সামরিক সম্প্রদায়ের হাতে থাকে। উহাই যদি ব্রহ্মবিদ্যার পক্ষে অনুকূল আশ্রয়-লাভের কারণ হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন মিশরের সামরিক জাতি, প্রাচীন স্পার্টান জাতি, হানিবলের আমোলের কার্থেজিনীয় জাতি, আলেকজান্দারের সমসাময়িক মেসিডোনীয়ান জাতি, জাপানের সামুরাই জাতি, প্রাচীন রোমক জাতি প্রভৃতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করে না। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস্, কার্থেজ, রোম, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের সামরিক জাতি তত্রত্য অন্যান্য জাতির ন্যায় বহু দেবতার উপাসক ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সক্রেটিসের সময়ে এথেন্সে একেশ্বরবাদ পরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহা তথাকার দার্শনিকসমাজেই অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সময়ের য়ুরোপীয়দিগের সৈন্যদলের বিবরণ-পাঠে জানা যায়, সৈনিকগণ জনসাধারণ অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে কিছুমাত্র অধিক অগ্রসর নহে,—বরং তাহারা অধিকতর কুসংস্কারাপন্ন। সমরক্ষেত্রে সম্মিলন, রাজ্যজয় ও উপনিবেশসংস্থাপন প্রভৃতি সামরিক কার্য্য যদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের কারণ হইত, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সামরিক জাতিরাও ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হইত। সুতরাং যে হেতুবাদে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ক্ষত্রিয়সমাজে ব্রহ্মবিদ্যার অনুকূল আশ্রয়প্রাপ্তি সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন,

* Uniformity of succession presented in nature are subject to one great uniformity—the law of Causation—Bain.

সে হেতুবাদ নিরপেক্ষ বিচারে গ্রাহ্য হইতে পারে না। ফলে ভারতীয় ক্ষত্রিয়-সমাজে ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল,—রবীন্দ্রনাথ এ কথা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদের কারণ কল্পনা করিয়া রবিবাবু লিখিয়াছেন,— "এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরা বিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিবাদ বাধিয়াছিল।" রবিবাবুর এই উক্তিটি পড়িলে মনে হয় যে, যাঁহারা ব্রহ্মিষ্ঠ ছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইহা রবিবাবুর বিষম ভ্রম। জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের বিবাদ নাই—বৈষম্য আছে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ গ্রন্থগুলি কর্ম্মনির্দ্দেশক বৈদিক সাহিত্যের চরম ভাগ। উহাতে চরম উপদেশ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহারা সাংসারিক মায়ায় বদ্ধ, কর্ম্মকাণ্ড তাহাদেরই জন্য। মায়াবদ্ধ জীবের ব্রহ্মবিদ্যায় বা প্রজ্ঞানে অধিকার নাই। তবে কর্ম্ম জ্ঞানেরই সোপান। জ্ঞানের উচ্চতম শৈলশিখরে আরোহণ করিতে হইলে কর্ম্মেরই আশ্রয় লইতে হয়। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, অবিদ্যা কাটিয়া যায়। বিদ্যাই অবিদ্যার বিরোধী; বিদ্যা দ্বিবিধ, পরা ও অপরা। ইহাদের পরস্পর বিরোধ নাই—আধিকারিভেদ আছে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থের মধ্যে উপনিষদই প্রাচীনতম গ্রন্থাবলী। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও সিদ্ধান্ত। তাঁহাদের ছন্দানুবর্ত্তী রবিবাবু সে সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন। সেই উপনিষদ বলিতেছেন যে, বিদ্যা অবিদ্যারই প্রতিকূল। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিয়াছেন,—

> নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া
> উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি—

বিদ্যা অবিদ্যার বিরোধী; যাহা বিদ্যার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদের সহিত (গুরুউপদেশ বা যোগের সহিত) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর হয়।

পাঠক দেখুন, এইখানে উপনিষদ পরা ও অপরা উভয় বিদ্যাকেই একত্র ধরিয়া লইয়াছেন। অপরা বিদ্যাও অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিতেছেন,—"ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা" অবিদ্যা

ক্ষর (নশ্বর) বিদ্যা অমৃত (মুক্তিপ্রদ)। এখানেও উভয়বিধ বিদ্যারই মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

কেন উপনিষদ বলিতেছেন,—

আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।

মায়াবদ্ধ আত্মার জ্ঞান দ্বারা শক্তিলাভ হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যা দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত সকল স্থানেই বিদ্যা শব্দ দ্বারা পরা বিদ্যা লক্ষিত হইলেও, অপরা বিদ্যাকে উহা হইতে পৃথক করিয়া বলা হয় নাই। এখানে ব্রহ্মজ্ঞানই লক্ষিত হইলেও, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম্মগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং পরা-বিদ্যা-সম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থে স্থূলতঃ উভয়বিধ বিদ্যার বিরোধ সপ্রমাণ হইল না। বিদ্যার সহিত অবিদ্যারই বিরোধ সূচিত হইল।

অপরা বিদ্যা যে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য নহে, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। মুণ্ডকোপনিষদ বলিতেছেন,—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরা চ॥

"ব্রহ্মবিদ্ সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, পরা ও অপরা দুইটি বিদ্যাই জানা আবশ্যক।" যদি পরা বিদ্যার সহিত অপরা বিদ্যার বিরোধই থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দুইটি বিদ্যারই প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিতেন না।

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ বলিয়াছেন,—

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥

মেধাবী ব্যক্তি বেদাদি গ্রন্থ অভ্যাস দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া, পরে ধান্যার্থী যেমন ধান্য লইয়া পল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইলে বেদাদি গ্রন্থ ত্যাগ করিবে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদ বলিয়াছেন,—

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্মবিদায়া উল্কাবয়াস্তথোৎসৃজেৎ॥

"গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বে অন্ধকারে পথ চলিতে হইলে যেমন পথিমধ্যে মশাল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ যতদিন ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত না হয়, ততদিন বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইবে, উহা ত্যাগ করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে উহা ত্যাগ করিবে।"

যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রবিবাবু নব্য ক্ষত্রিয়দলের নেতা বলিয়াছেন তিনিই গীতায় কি বলিয়াছেন, দেখুন,—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

"সমস্ত দেশ জলময় হইলে যেমন কূপ-তড়াগের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ যাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার বেদশাস্ত্রে প্রয়োজন কি?" ইহার অর্থ এই যে, দেশ জলে প্লাবিত না হইলে যেমন কূপ তড়াগাদির প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইরূপ বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়োজন।

ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মিষ্ঠগণ যাগযজ্ঞ প্রভৃতিকে নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করেন নাই,—উহা রবিবাবুর কল্পনামাত্র। তবে উপনিষদাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থে স্থানে স্থানে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা আছে সত্য,—তাহা ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে। কোন ব্যক্তি মশালসাহায্যে অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক শোভিত গৃহে উপস্থিত হইয়া পরেও তথায় মশাল লইয়া ঘুরিলে, তাহাকে লোকে বলে,—'মশাল অনাবশ্যক, উহা পরিত্যাগ কর।' তাহাতে যেমন মশালের নিন্দা হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্ত লোকের নিকট কর্ম্মকাণ্ডের অপ্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন করিলে কর্ম্মকে নিষ্ফল বলা হয় না। কোনও ব্যক্তি যদি গোলায় ধান্য রাখিবার সময় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচালীও রাখে, তাহা হইলে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে বলিয়া থাকে, "বিচালী নিষ্প্রয়োজন, উহা ফেলিয়া দাও"। কিন্তু সেই উপদেশ পাইয়া যদি সেই ব্যক্তি ক্ষেত্রে ধান্য উদ্গত হইবার সময় খড় নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া উহা কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে,তাহার অজ্ঞতা রবিবাবুর অজ্ঞতার সহিতই তুলনীয় হইতে পারে।

ব্রহ্মবিদ্ ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ কুত্রাপি নাই। সমস্ত উপনিষদের মধ্যে বৈদেহ জনক, প্রবহণ জৈবলি, মৈত্র, অজাতশত্রু ও অশ্বপতি কৈকয়, এই কয় জন মাত্র ব্রহ্মিষ্ঠ রাজর্ষির উল্লেখ দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে জনক, মৈত্র, অশ্বপতি কৈকয় বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা উপনিষদে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, ইহা সত্য নহে।

উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যাকে "ঋষিসঙ্ঘজুষ্টম্" অর্থাৎ "বামদেবসনকাদীনাং সর্ব্বৈঃ সমূহৈঃ জুষ্টং সেবিতং" ঋষিসমূহকর্ত্তৃক প্রথমে সেবিত বলিয়াছেন। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, অরণ্যবাসী তপস্যাশ্রয়ী ঋষিগণই প্রথমে

পূর্ব্বরাগ ।

ব্রহ্মবিদ্যার সেবা করিতেন। পরে ঋষিগণ লোকহিতার্থ উহা দুই এক জন রাজর্ষিকে প্রদান করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আবার দুই চারি জন জনপদবাসী গৃহস্থ ব্রাহ্মণও ঐ সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণরা রাজর্ষিদের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লইতে আসিলে রাজর্ষিগণ সযত্নে তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ উপনিষদেই বর্ত্তমান। কিন্তু কোনও সাধারণ ক্ষত্রিয় কোনও রাজর্ষির নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়াছেন, ইহার একান্তই প্রমাণাভাব। সুতরাং ক্ষত্রিয়সমাজে ব্রহ্মবিদ্যা যে অনুকূল আশ্রয়লাভ করে নাই, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

রবিবাবুর বক্তৃতাসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নিবেদিতা।

"নিবেদিতা" * নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি উদ্বোধন-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; রচয়িত্রী,—শ্রীমতী সরলাবালা দাসী। বঙ্গসাহিত্যের পাঠক পুস্তকখানি সাগ্রহে পাঠ করিবেন, সন্দেহ নাই; কারণ, নিবেদিতার এরূপ চরিত্র-চিত্র বঙ্গভাষায় অন্যত্র কোথাও অঙ্কিত হয় নাই।

ভগ্নী নিবেদিতার হিতচিকীর্ষা দেশের লোক অনুভব করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। সেই জন্য তাঁহার উদ্দেশে স্মৃতিসভা হইয়াছে, সাময়িক সাহিত্যে তাঁহার কথা আলোচিত হইতেছে। আমরা সকলেই স্বীকার করি, তিনি আমাদিগকে ঋণপাশে চির-আবদ্ধ করিয়াছেন,—চির-কাল তিনি ভারতীয় সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র থাকিবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমরা তাঁহাকে যথাযোগ্যরূপে চিনিবার চেষ্টা করিতেছি কি?

চিনিবার আবশ্যকতা যথেষ্ট রহিয়াছে, উপায়ও যথেষ্ট রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ প্রতিভামুগ্ধ হইয়া যাঁহাকে সাদরে গৌরবের উচ্চাসন প্রদান

---

* পুস্তকের সমস্ত আয় নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রদত্ত। মূল্য আট আনা। [illegible] নং গোপাল নিয়োগীর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

করিতে পারিত, আমাদের সমাজ কোন শক্তিবলে তাঁহাকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইয়াছিল, তাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে। আমাদের এমন কি আছে, যাহার আকর্ষণে এত বড় একটি স্বার্থলেশশূন্য হৃদয় আমাদের গৃহদ্বারে আপনাকে নিঃশেষে বিকাইয়া দিতে পারে, তাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে। কারণ, আমরা আপনাকে চিনি না—আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই সকল ক্ষেত্রেই বিফল হইতেছি।

নিবেদিতা আপনার কথা আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য বলিয়াছি, তাঁহাকে চিনিবার উপায়ও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার "যদ্দৃষ্ট শ্রীগুরুচরিত" (The Master as I saw Him), "ভারতীয় জীবন-বিতান" (Web of Indian Life) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাঁহার জীবন-রহস্যের মর্ম্মোদ্ধার করা যায়। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এখনও কেহ সেরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই; কেবল "নিবেদিতা"-লেখিকা প্রসঙ্গের যথার্থ গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

গুরুশিষ্য-সম্বন্ধকে নিবেদিতা কি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা অনেকের জানা নাই। দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ "প্রবুদ্ধ-ভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহার মতে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিদ্যার্জ্জন সমাপ্ত হইলে, স্বীয় জীবনাদর্শের সাধনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় শ্রীগুরুকে জীবনের নেতা ও নিয়ন্তা রূপে লাভ করিতে হইবে। বেশ বুঝা যায়, শিক্ষার এই পরম অঙ্গ বিচার করিবার সময় নিবেদিতা নিজেরই প্রাণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "we must understand that the whole significance of our own lives depends, first and last, on their relation to his (Gurus) life". অর্থাৎ, "আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গুরুর জীবনলীলার সহিত শিষ্য যে সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহার নিজজীবনের প্রকৃত মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য সেই সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত থাকে।" আমাদের নিকট চির-বিদায় লইবার কিছু পূর্ব্বেই নিবেদিতা স্বীয় চরিত্র-রূপ রত্নপেটিকার চাবি এই উক্তিগুলির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। এই চাবিটি অবহেলা করিয়া নিবেদিতার জীবনচরিতের আলোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

বাস্তবিক, নিবেদিতাকে বুঝিতে হইলে, নিবেদিতার গুরুর কথা অনিবার্য্য

রূপে আসিয়া পড়ে। তাঁহার হৃদয়ে গুরুর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের যে তন্ময়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই তাঁহার সকল শক্তির উৎস—তাঁহার চরিত্রসৌধের ভিত্তি। গুরুভক্তির সহিত তাঁহার চরিত্র এমন নিখুঁত-ভাবে তদাকারকারিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত যাঁহারা গুরুর সম্পর্কে সম্পর্কিত নহেন, উহার অস্তিত্বই হয় ত তাঁহাদের চোখে পড়িত না। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে কি গুরুর কথা বাদ দিয়া নিবেদিতার কথা আলোচনা করিতে হইবে? অসম্ভব। যিনি ঐরূপ বাদ দিবার পক্ষপাতী, তিনি বুঝেন না যে, ঐরূপ করিলে তাঁহার গুরুর প্রতি অন্যায় করা না হইলেও, নিবেদিতার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়। যাঁহারা মনে করেন, নিবেদি-তার সহিত তাঁহার গুরুর সম্পর্ক সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধে দূষিত, অতএব ঐ সম্পর্ক অন্তরালে থাকিলেই ভাল, তাঁহারা নিবেদিতার বিশ্বজনীন ভাব বুঝিতে পারেন নাই, এবং সেই ভাবের মূল-আকর ও শিক্ষাগুরুর বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেরাই সম্প্রদায়িকতার একটা উৎকট প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছেন।

এই কারণে আমাদের মনে হয় যে, "নিবেদিতা"-লেখিকা শিষ্যার জীবনের আলোচনা করিতে যাইয়া, প্রথমেই যে গুরুর প্রভাব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে নিবেদিতাকে বুঝিবার চেষ্টা বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত গতি লাভ করি-য়াছে। শ্রীমতী লেখিকা "The Master as I saw Him." নামক পুস্তক হইতে দেখাইয়াছেন যে, নিবেদিতা যখন হিন্দুসন্ন্যাসীকে গুরু-রূপে বরণ করিলেন, তখন কেবল একটা উচ্চতর মতবাদের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করেন নাই। প্রকৃত কথা, তিনি অসাধারণ ত্যাগ ও সত্যানুরাগের নিকটই আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, "তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) আজ যাহা মনের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বলোকসমক্ষে প্রচার করিতেছেন, কাল যদি সেই মতে ভ্রম দেখিতে পান, তাহা হইলে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন; কেন না, তিনি সত্যানুরাগী, তিনি বীর;—তিনি ত্যাগমন্ত্র গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন যে, মানযশ প্রভৃতি কিছুরই আর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না।" (নিবেদিতা, ৪ পৃষ্ঠা)। নিবেদিতা কেবল সামান্য মতবাদের ডোরে যে আপনাকে গুরুচরণে আবদ্ধ করেন নাই, তিনি যে গুরুচরিত্র-রূপ অঞ্জনে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, শ্রীগুরুর মধ্যেই সত্যের প্রকাশ দেখিয়াছিলেন, এ কথা তিনি নিজে লেখনী ধারণ করিয়া লিপিবদ্ধ

করিতে পারিত, আমাদের সমাজ কোন শক্তিবলে তাঁহাকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইয়াছিল, তাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে। আমাদের এমন কি আছে, যাহার আকর্ষণে এত বড় একটি স্বার্থলেশশূন্য হৃদয় আমাদের গৃহদ্বারে আপনাকে নিঃশেষে বিকাইয়া দিতে পারে, তাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে। কারণ, আমরা আপনাকে চিনি না—আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই সকল ক্ষেত্রেই বিফল হইতেছি।

নিবেদিতা আপনার কথা আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য বলিয়াছি, তাঁহাকে চিনিবার উপায়ও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার "মদ্দৃষ্ট শ্রীগুরুচরিত" (The Master as I saw Him), "ভারতীয় জীবন-বিতান" (Web of Indian Life) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাঁহার জীবন-রহস্যের মর্ম্মোদ্ধার করা যায়। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এখনও কেহ সেরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই; কেবল "নিবেদিতা"-লেখিকা প্রসঙ্গের যথার্থ গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

গুরুশিষ্য-সম্বন্ধকে নিবেদিতা কি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা অনেকের জানা নাই। দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ "প্রবুদ্ধ-ভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহার মতে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিদ্যার্জ্জন সমাপ্ত হইলে স্বীয় জীবনাদর্শের সাধনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় শ্রীগুরুকে জীবনের নেতা ও নিয়ন্তা রূপে লাভ করিতে হইবে। বেশ বুঝা যায়, শিক্ষার এই পরম অঙ্গ বিচার করিবার সময় নিবেদিতা নিজেরই প্রাণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "we must understand that the whole significance of our own lives depends, first and last, on their relation to his (Gurus) life". অর্থাৎ, "আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গুরুর জীবনলীলার সহিত শিষ্য যে সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহার নিজজীবনের প্রকৃত মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য সেই সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত থাকে।" আমাদের নিকট চির-বিদায় লইবার কিছু পূর্ব্বেই নিবেদিতা স্বীয় চরিত-রূপ রত্নপেটিকার চাবি এই উক্তিগুলির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। এই চাবিটি অবহেলা করিয়া নিবেদিতার জীবনচরিতের আলোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

বাস্তবিক, নিবেদিতাকে বুঝিতে হইলে, নিবেদিতার গুরুর কথা অনিবার্য্য-

রূপে আসিয়া পড়ে। তাঁহার হৃদয়ে গুরুর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের যে তন্ময়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই তাঁহার সকল শক্তির উৎস—তাঁহার চরিত্রসৌধের ভিত্তি। গুরুভক্তির সহিত তাঁহার চরিত্র এমন নিখুঁত-ভাবে তদাকারকারিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত যাঁহারা গুরুর সম্পর্কে সম্পর্কিত নহেন, উঁহার অস্তিত্বই হয় ত তাঁহাদের চোখে পড়িত না। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগকে কি গুরুর কথা বাদ দিয়া নিবেদিতার কথা আলোচনা করিতে হইবে? অসম্ভব। যিনি ঐরূপ বাদ দিবার পক্ষপাতী, তিনি বুঝেন না যে, ঐরূপ করিলে তাঁহার গুরুর প্রতি অন্যায় করা না হইলেও, নিবেদিতার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়। যাঁহারা মনে করেন, নিবেদিতার সহিত তাঁহার গুরুর সম্পর্ক সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধে দূষিত, অতএব ঐ সম্পর্ক অন্তরালে থাকিলেই ভাল, তাঁহারা নিবেদিতার বিশ্বজনীন ভাব বুঝিতে পারেন নাই, এবং সেই ভাবের মূল-আকর ও শিক্ষাগুরুর বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেরাই সম্প্রদায়িকতার একটা উৎকট প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছেন।

এই কারণে আমাদের মনে হয় যে, "নিবেদিতা"-লেখিকা শিষ্যার জীবনের আলোচনা করিতে যাইয়া, প্রথমেই যে গুরুর প্রভাব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে নিবেদিতাকে বুঝিবার চেষ্টা বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত গতি লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী লেখিকা "The Master as I saw Him." নামক পুস্তক হইতে দেখাইয়াছেন যে, নিবেদিতা যখন হিন্দুসন্ন্যাসীকে গুরু-রূপে বরণ করিলেন, তখন কেবল একটা উচ্চতর মতবাদের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করেন নাই। প্রকৃত কথা, তিনি অসাধারণ ত্যাগ ও সত্যানুরাগের নিকটই আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, "তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) আজ যাহা মনের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বলোকসমক্ষে প্রচার করিতেছেন, কাল যদি সেই মতে ভ্রম দেখিতে পান, তাহা হইলে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন; কেন না, তিনি সত্যানুরাগী, তিনি বীর;—তিনি ত্যাগমন্ত্র গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন যে, মানযশ প্রভৃতি কিছুরই আর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না।" (নিবেদিতা, ৪ পৃষ্ঠা)। নিবেদিতা কেবল সামান্য মতবাদের জোরে যে আপনাকে গুরুচরণে আবদ্ধ করেন নাই, তিনি যে গুরুচরিত্র-রূপ অঞ্জনে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, শ্রীগুরুর মধ্যেই সত্যের প্রকাশ দেখিয়াছিলেন, এ কথা তিনি নিজে লেখনী ধারণ করিয়া লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রের মহত্ব তাঁহাকে চিরদিনের মত কিনিয়া রাখিয়াছিল; মতবাদের পারিপাট্য নহে।

নিবেদিতার চরিতপ্রসঙ্গে এই সত্যটি অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতীয় জীবনাদর্শকে যদি তিনি প্রত্যক্ষজীবনে প্রতিভাত হইতে না দেখিতেন, তবে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া এমন ভাবে ভারতবর্ষের দাস্য তিনি গ্রহণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। শুধু শ্রেষ্ঠ মতবাদের দ্বারা ভারতবর্ষ বিদেশীর পূজা পাইতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট অকপট অবিচলিত দাস্য পাইতে হইলে, প্রত্যক্ষ চরিত্রমাহাত্ম্য বিকশিত করিতে হইবে। নিবেদিতা তাঁহার গুরুর চরিত্রে ভারতের অতীত ও ভাবী মাহাত্ম্যের পরম আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, * তাই ভারতের ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট একটা অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য কল্পনার আকারে প্রতীয়মান ছিল না। সে সত্যবস্তুকে তিনি ছুঁইয়া দেখিয়াছেন; এই জন্য তাঁহার ভারতপ্রীতিতে ও উহার কল্যাণসাধনে লেশমাত্রও কৃত্রিমতা ছিল না, বিন্দুমাত্রও সংশয়বিক্ষোভ ছিল না।

নিবেদিতার ভারতপ্রীতির কথা শ্রীমতী সরলাবালা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "প্রবাসী"তে সুকবি রবীন্দ্রনাথও সে চিত্র এমন সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই; তাঁহার চিত্র জাঁকাল হইলেও, উহাতে এমন উজ্জ্বলভাবে রঙ ফলে নাই। নিবেদিতার ভারতপ্রীতির সহিত ভারতীয় জাতীয়তা (Nationalism) সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে সংযুক্ত। "Web of Indian Life" হইতে নিবেদিতার এই ধারণা "নিবেদিতা" পুস্তিকার গোড়াতেই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দুইএকটি কথা বঙ্গীয় পাঠককে বলিবার আছে।

ভারতীয় জাতীয়তা বলিতে কি বুঝায়, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইহাই আমাদের মূলসমস্যা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নিবেদিতা এই সমস্যার মীমাংসাকল্পে বিশেষভাবে যত্নবতী হন। তাঁহার এই

* "He, our master, incarnates for us in his own person, that great mutual love which is the Indian national ideal" (the Master as I saw Him.)— (আমাদের গুরু জনপ্রীতিমূলক ভারতীয় জাতীয়ত্বের আদর্শকে স্বকদেহে যেন আপনাতে মূর্ত্তি ধারণ করাইয়া দেখাইয়াছিলেন)। "* it was the religious Consciousness of India that spoke through him, the message of his whole people, as determined by their whole past." (Introduction to the Memorial Edition) "অতীতে নানা অবস্থার দ্বারা পোষিত ও সুপরিচিত জাতীয় ভাবকে ভারতের সমষ্টি-মন যেন তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে ব্যক্ত করিয়াছে।"

চেষ্টা ও গবেষণার ফল "Civic and National Ideals" নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় যে প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে জাতীয়তাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া নিবেদিতা ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে নিজের ধারণা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য—'নেশন'দিগের দৃষ্টান্ত হইতে যে এই ধারণা গঠিত হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধে স্পষ্টই প্রতীয়মান। প্রবন্ধ হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এই ধারণার পরিচয় দিতেছি; যথা,—ভৌগোলিক হিসাবে যে দেশের স্বাতন্ত্র্য আছে, বিশিষ্ট জাতীয়তার উদ্ভব ও পোষণ, সেই দেশের পক্ষে সম্ভবপর। বাসভূমির উপরই জাতীয়তাত্মক অখণ্ডতা নির্ভর করে। "নেশন-গঠনে বহুল বিচিত্র উপাদানসমূহ যদি বাসভূমির সমতাজনিত জাতীয়ত্বের প্রভাবাধীন হয়, তবে নেশনের পক্ষে ঐ বৈচিত্র্য দুর্ব্বলতার কারণ না হইয়া, বিশেষ বলাধানেরই হেতুভূত হয়।" *

প্রবন্ধটিতে নিবেদিতা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান বা উহার ভৌম একত্বই উহার জাতীয় জীবনের অখণ্ডতা বিধান করিবে। একটা অখণ্ডতার ভাবই জাতীয়তার আশ্রয়। ভারতীয় জাতীয়তার আশ্রয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদিতা আমাদিগকে ভারতের ভূমিমূলক একত্বের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতায় একাধিকবার এই প্রশ্নের অন্য প্রকার সদুত্তর দিয়াছেন। "ভারতের ভবিষ্যৎ" নামক মান্দ্রাজে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন,—"জগতের অন্যান্য নেশন জাতিবৈচিত্র্যের হিসাবে যতগুলি বিভিন্ন অঙ্গের সংহতিতে গঠিত, তাহা আমাদের দেশের তুলনায় খুবই অল্পসংখ্যক। এ দেশে আর্য্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুরস্ক, মোগল, পাশ্চাত্য প্রভৃতি জগতের যাবতীয় জাতির শোণিত ভারতবাসীর ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভাষা হিসাবে এ দেশে অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্র্যের সমাবেশ। আচার ও রীতিনীতির হিসাবে ভারতীয় দুইটা জাতির মধ্যে এমনও ব্যবধান আছে, যাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদের মধ্যেও নাই! কেবল যুগপরম্পরায় অভিব্যক্ত

---

* Any country which is geographically distinct has the power to become the cradle of a nationality. National unity is dependent upon place." "Complexity of elements when duty subordinated to the Nationalising influence of place, is a source of strength, and not weakness to a nation." Page 43.

ধর্ম্মভাব—আমাদের সনাতন ধর্ম্মই—একমাত্র সাধারণ মিলনভূমি হইতে পারে, এবং এই ভূমির উপরই আমাদিগকে গড়িতে হইবে। ইউরোপে রাজনৈতিক ভাবই জাতীয় ঐক্যের আশ্রয়; এসিয়ায় ধর্ম্মভাবই জাতীয় ঐক্যের আশ্রয়স্থল। অতএব অপরিহার্য্যরূপে ধর্ম্মসমন্বয়ই ভারতের ভাবী কল্যাণের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন।" অতঃপর স্বামীজি সনাতন ধর্ম্মের অপরিণামী স্বরূপের উল্লেখ করিতেছেন। যাহা সনাতন ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, তাহার সহিত খৃষ্টীয়, ইসলামীয়, বা বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য থাকিবেই; কিন্তু সনাতনধর্ম্মের তত্ত্বাংশের উপর দাঁড়াইলে সকল ধর্ম্মের একটা সমন্বয় পাওয়া যাইবে। এই সমন্বয় ইতিহাসেও ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ইহারই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে একটা সুদৃঢ় মিলনভূমি গড়িয়া উঠিবে। "প্রথম পদক্ষেপেই এই কাজটি আমাদের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। আমরা দেখিতেছি, এসিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতিবৈষম্য, ভাষাবৈষম্য, আচারবৈষম্য, সমাজ-বৈষম্য, ধর্ম্মের সমন্বয়-শক্তির কাছে কেমন বিলীন হইয়া থাকে। * * * অতএব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ই আমাদের উন্নতির সেই প্রথম সোপান, যাহাকে অনন্তকালরূপ মহাদ্রির প্রস্তরগাত্রে সমবেত চেষ্টা দ্বারা আমাদিগকে ক্ষোদিত করিতে হইবে। ইহাই ভাবী ভারতগৌরবের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান।"

এইরূপ উক্তি স্বামীজির বক্তৃতায় আরও পাওয়া যায়। ঐগুলি বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি সনাতনধর্ম্মের সমন্বয়ভাবের উপরই ভারতীয় জাতীয়তাগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে, এই ধর্ম্মমূলক সমন্বয়ভাবই ভারতীয় জাতীয়-জীবনের অখণ্ডতা বিধান করিবে। তাঁহার কোনও স্পষ্টোক্তিতে এই জাতীয় অখণ্ডতাকে ধর্ম্মমূলক না বলিয়া ভূমিমূলক বলা হয় নাই।

ভারতে জাতীয়-জীবন-গঠনে যাঁহারা উদ্যোগী, তাঁহাদের পক্ষে, ভারতীয় জাতীয়তাতত্ত্বের বিচার করিয়া একটা অভ্রান্ত মতবাদ স্থির করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতীয়তার অনুকরণ করা আমাদের এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতীয় জাতীয়ভাব কি,এবং কিরূপে উহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা বারংবার ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন দেশের লোক সে কথা কানেই তোলে নাই; তখন পাশ্চাত্য জাতীয়তার নেশা সবে ধরিয়াছে।

এখনও যে সে নেশা কাটিয়াছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। সেই জন্য, প্রাসঙ্গিক না হইলেও, ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে নিবেদিতা ও তাঁহার গুরুর মতামতের একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

আমাদের অনুমান, নিবেদিতা ভারতের জাতীয় জীবন যে পরমার্থনিষ্ঠ, তাহা বুঝিয়াও, উহা যে পরমার্থমূলক, তাহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই; সেই জন্য ভারতীয় জাতীয়তার একটা পাশ্চাত্য ভিত্তি তাঁহাকে কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছে। কি সূত্রে আমাদের জাতীয় জীবনের ঐক্য-বন্ধন হইবে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া নিবেদিতা যেন প্রকৃতিবশে পাশ্চাত্য ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য নেশনদের দৃষ্টান্তে বাসভূমির সাধারণত্বকেই আমাদের জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতাবৎকাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে একরূপ অন্ধভাবেই জাতীয়জীবনের ঐক্যসূত্র ঠিক ঐরূপ ভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

কিন্তু কোন্ সূত্রে জাতীয় ঐক্যবন্ধন হওয়া আমাদের সনাতন আদর্শ-সম্মত, অথবা আমাদের ইতিহাস এ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দেয়, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ, অল্প কথায় হইলেও, সুস্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, নিবেদিতার একটা ধারণা ছিল যে, স্বামীজি ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে কোনও কথা স্পষ্টভাবে প্রচার করেন নাই, সেই জন্য তিনি "the Master as I saw Him" পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"He never proclaimed nationlity, but he was hjmself the living embodiment of that idea which the word conveys". অর্থাৎ, স্বামীজি কখনও ভারতীয় জাতীয়তা ঘোষণা করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজেই জাতীয়তা অর্থে যে ভাব বুঝায়, তাহারই মূর্ত্তিমান প্রকাশ ছিলেন।

এরূপ ভ্রমের কারণ এই যে, স্বামীজি জাতীয় জীবন গড়িবার যে পরমার্থ-মূলক আদর্শ ভারতে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সে আদর্শের ভিতর নিবেদিতা যথাযথভাবে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এ ত্রুটী, এ অক্ষমতার জন্য নিবেদিতাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ, স্বামীজির নিজ দেশের লোক এ পর্য্যন্ত সে আদর্শ বুঝিয়াছেন কি?

বরং নিবেদিতার বাহাদুরী এই যে, পরমার্থনিষ্ঠতা ভারতীয় সর্ব্ববিধ সাধনার যে প্রধান লক্ষণ, তাহা তিনি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

সেই জন্ম ভারতীয় চিত্রশিল্পাদির মর্ম্মগ্রহণে তাঁহার মত নিপুণতা নিতান্ত দুর্লভ। ভারতীয় সাধনা সম্বন্ধে ছোট বড় সকল বিষয়ে তাঁহার মত ভাবগ্রাহিতাও অত্যন্ত বিরল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি যে এমন দক্ষতার সহিত ভারতের ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে পারিতেন, বই-পড়া বিদ্যা তাহার কারণ নহে। যে সাধনার দ্বারা ভারতকে চিনিবার ভাবদৃষ্টি তাঁহার হৃদয়-কন্দরে খুলিয়া গিয়াছিল, তাহা গুরুদত্ত ধর্ম্মবীজের সাধনা; সে সাধনার সংবাদ সাধারণে প্রকাশ নাই। নিবেদিতার "Kali the Mother" পাঠ করিলে, পাঠক বুঝিবেন, কোন শক্তির বিকাশে তাঁহার উক্ত ভাবদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। নিবেদিতার আকৈশোর ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস সংকলিত হইলে, জগতের পক্ষে উহা একটি উপাদেয় ও অমূল্য নিদর্শন হইবে, সন্দেহ নাই।

নিবেদিতার কর্ম্মময় জীবনের অন্তরালে ধর্ম্মসাধনার যে অন্তঃসলিলা ফল্গু বহিত, শ্রীমতী সরলাবালা সুন্দর লিপিকৌশলে তাহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। নিবেদিতার গুরুর পাশ্চাত্যে প্রদত্ত একটি প্রধান উপদেশ এই যে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষোপলব্ধির বস্তু, মস্তিষ্কচালনা বা কবিত্ব করিবার বিষয় নহে। নিবেদিতা গুরুর এই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, এবং বৈদিক ও পৌরাণিক ভেদে যাহার সনাতন অখণ্ডভাব ম্লান বা ক্ষুণ্ণ হয় না। সেই গুরূপদিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের সাধনায় যথাশক্তি মগ্নচিত্তা থাকিতেন। তাঁহার চিন্তা ও সাধনার মধ্যে এই চিত্তনিবেশ যিনি লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহার পক্ষে নিবেদিতার "হিন্দুয়ানী"র বিচার করিতে যাওয়া এক প্রকার হঠকারিতা। ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যার "প্রবাসী"তে কোনও ব্রাহ্ম লেখকপ্রবর নিবেদিতার "হিন্দুয়ানী"র ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুভ্রাতাদের উপর একটু ভ্রূকুঞ্চনলীলা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নিবেদিতা হিন্দু হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা যদি গৌরব অনুভব করি, তবে আমরা তিরস্কারের পাত্র; কারণ, ঐরূপ ব্যবহারে, আমরা হিন্দু-ধর্ম্মের দোহাইয়ে নিজেদের যতটা বাড়াইতেছি, নিবেদিতার ত্যাগকে ঠিক ততটা খর্ব্ব করিতেছি। অর্থাৎ যুক্তি এই যে, অপরে তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যদি ঐ ব্যাপারে তুমি তোমার ধর্ম্মের মহত্ব দেখ, তাহা হইলেই, সে বেচারীর মাহাত্ম্য দেখা হইল না—অন্ততঃ উহা আড়ালে পড়িয়া রহিল; এবং নিজধর্ম্মের মহত্ব অনুভব করিলেই, নিজের গর্ব্ব করা হইল।

অপরাধ এই যে, "আমরা বলিতেছি, তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড় কম লোক নই।" "অন্তরে" কেন, আমরা বলি যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে হিন্দু ছিলেন। এরূপ বলা বা ভাবা যদি অপরাধ হয়, তবে অপরাধের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। আমরা যে হিন্দু,—আমাদের হিন্দুত্ব আমাদের কাছে চিরগৌরবের বস্তু। যে অধঃপতিত অবস্থায়, আমাদের ধর্ম্মের গৌরব ও মর্য্যাদা,—রক্ষা করা দূরে থাকুক,—অনুভবই আমরা করিতে পারিতেছি না, সে অবস্থায় কোনও মনস্বী বিদেশী আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যদি উহার গৌরব ও মর্য্যাদার সাক্ষ্য দেয়, তবে নৈরাশ্যের আত্মগ্লানি কথঞ্চিৎ অপনীত হওয়ায় ইহা ভাবা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক যে, "আমরা হিন্দুরা বড় কম নই!" নিরাশামগ্ন, দৈন্যমথিত হিন্দুর এতটুকু আত্মমর্য্যাদার ভাব দেখিয়া যিনি তর্জ্জনী তুলিয়া তিরস্কার করিতে আসেন, তাঁর "মায়া" দেখিতেছি "মার চেয়ে বেশী"!

নিবেদিতা হিন্দু হইয়াছিলেন বলিয়া নহে, হিন্দুত্বের গৌরব করিবার আরও মহত্তর প্রমাণ আছে। কিন্তু ধরিয়া লইলাম যে, নিবেদিতার দোহাই আমরা দিয়াছি; তাহাতে তাঁহার ত্যাগকে খর্ব্ব করার অপরাধ যে শ্যেনদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইল, তাহাকে নমস্কার! তুমি সমধর্ম্মী বলিয়া আমি গৌরব করিলেই, তোমার ত্যাগ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করায় আমার মহা বাধা উপস্থিত হইল,—গৌরবে চোখ না টাটাইলে, এমন যুক্তিবাণ ত কেহ হানে না, কিন্তু যিনি সামান্য দলাদলির অশান্তি হইতে বহু উচ্চে শান্তিশিখরে বিরাজমান, তাঁহার লেখনীতে নিশ্চয়ই এরূপ যুক্তি শোভা পায় না।

তার পর, নিবেদিতা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে "ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন", অতএব লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে, "বস্তুত তিনি কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানীর যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন এ কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না।" কেন না, আমরা হিন্দুয়ানীর যে ক্ষেত্রে আছি, উহাকে একটা "শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া" ঘিরিয়া আছে; নিবেদিতা কিন্তু সেই বেড়া ভেদ করিয়া "সংস্কারমুক্ত চিত্তে হিন্দুধর্ম্মকে নানা পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন"।

অতএব, হে হিন্দু, নিবেদিতা হিন্দু বলিয়া গৌরব করিলে তোমার

অপরাধ ত হইবেই, উপরন্তু গৌরব করিতে যাওয়াই প্রহসনে পরিণত হইল। আগে গোড়া সামলাও, নিবেদিতা প্রকৃতই হিন্দু ছিলেন কি না, বুঝিয়া লও।

নিবেদিতা The Master as I saw him নামক পুস্তকের ২৯১ পৃষ্ঠায় "The glory of Hinduism"—হিন্দুধর্ম্মের মহিমা নির্দ্দেশ করিতেছেন। "Truth being thus the one goal of the Hindu creeds, and this being conceived of, not as revealed truth to be accepted, but as accessible truth to be experienced, it followed that there could never be any antagonism, real or imagined between scientific and religious conviction, in Hinduism. In this fact the Swami saw the immense capacity of the Indian people for that organised conception of science peculiar to the modern era."—"অতএব দেখিলাম, হিন্দুধর্ম্মমতসমূহে সত্যই একমাত্র চরম লক্ষ্য। এ কথায় হিন্দুধর্ম্ম এরূপ বুঝেন না যে, সত্যকে বেদব্যক্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেই হইল ;—তৎকৃত সত্যের ধারণা এই যে, উহা সর্ব্বজনলভ্য, অতএব সাধনা দ্বারা উপলব্ধব্য। ফলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, হিন্দুধর্ম্মে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে প্রকৃত বা কল্পিত কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানবিকশিত সুসমন্বিত তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করিবার পক্ষে ভারতবাসীদের যে অশেষ সামর্থ্য রহিয়াছে, তাহা স্বামীজি এই সিদ্ধান্বিত সত্যের মধ্যে নিহিত দেখিয়াছিলেন।"

নিবেদিতাকে তাঁহার গুরু হিন্দুয়ানীর কিরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নিবেদিতার আরও অনেক উক্তি হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে। যে উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিলাম, এ ক্ষেত্রে উহাই যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন এই যে, "হিন্দু"প্রশ্নমান লেখক মহাশয় "আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি" বলিতে কিরূপ ক্ষেত্র বুঝিয়াছেন? "সর্ব্বসাধারণে" স্বামী বিবেকানন্দকে, তাঁহার জীবদ্দশায়, "হিন্দুয়ানী"র পরিচয় দিবার পক্ষে কি যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে নাই? তাঁহার যোগ্যতার জন্য একদিন সর্ব্বসাধারণের দ্বারা তিনি কি প্রকাশ্যে অভিনন্দিত হন নাই? আমরা হিন্দুয়ানীর কিরূপ ক্ষেত্রে আছি, তাহা আমাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির কাছে শুনিয়া, তার পর স্বকপোলকল্পনায় প্রবৃত্ত হইলেই ভাল হয় না কি? স্বকপোলকল্পনার দৌড় ত আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট! বেদকে অপৌরুষেয় বলিলে, কোনও হিন্দুই উহাকে যুক্তিসম্মত বিচারের সীমাবহির্ভূত করিয়া দেয় না। মীমাংসা-শাস্ত্র

অপৌরুষেয় অর্থে নিত্য বুঝিয়াছেন,—বিচারের হস্ত হইতে বেদমতকে নিষ্কৃতি দেন নাই। অতএব, স্বকপোলকল্পিত হিন্দুয়ানীর নির্দ্দেশ নিজ বৈঠকখানার তাকে তুলিয়া রাখিলেই ভাল হইত। নিবেদিতার শোক-স্মৃতির পালা গাহিবার আসরে কেহ আক্রোশদৃষ্টির এ আকস্মিক শরনিক্ষেপ প্রত্যাশা করে না যে,—"হিন্দু হইলেই আজকাল অন্ধ বিশ্বাসের দাস হইতে হয়, নিবেদিতা সে দাসত্ব করেন নাই, অতএব তাঁহাকে হিন্দু বলা যায় না।"

নিবেদিতা হিন্দু ছিলেন। তিনি "মহৎ" বলিয়াও আমাদের "প্রণম্য", হিন্দু বলিয়াও আমাদের প্রণম্য। হিন্দু বলিয়া যদি তিনি কাহারও প্রণম্য না হন, তবে কিছু আসিয়া যায় না। একটা প্রণাম তাঁহাকে বেশী দেওয়া হইতেছে বলিয়া "প্রবাসী"র লেখক আপত্তির কথা না তুলিলেই ভাল করিতেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম আপনার মহত্ত্বের দ্বারা নিবেদিতার স্বার্থলেশশূন্য হৃদয়কে কিনিয়াছিল। "নিবেদিতা"র লেখিকা বঙ্গসাহিত্যে সে কথার আলোচনা করিয়া ভালই করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে নিবেদিতার মতামত, জীবনব্রত ও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইবে।

উপসংহারে শ্রীমতী সরলাবালা লিখিতেছেন,—"ভারতে কি বিংশতি জনও এমন লোক নাই, যাঁহারা ভগ্নী নিবেদিতার মানসী কন্যারূপী উক্ত বিদ্যালয়টির রক্ষণে ভারতেরই কল্যাণ বুঝিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ঐ কার্য্যের সহায়কস্বরূপে দাঁড়াইতে পারেন? ইহাও যদি সম্ভবপর না হয়, তবে আবার বলি, ভারতবাসীর এতটুকুও কি প্রাণ নাই যে, নিবেদিতা অনশন অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়া যাহাকে আজীবন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র অর্থ-ভিক্ষা দিয়া সেই বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করেন? হায়, তপস্বিনী নিবেদিতা অনাহার অনিদ্রায় শিক্ষাসমিধে যে হোমানল প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল শিখা কি সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিবে না? হব্য অভাবে তাহা কি যজ্ঞারম্ভেই নির্ব্বাপিত হইবে?"

নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কথা এখন সকলেই শুনিয়াছেন। টাউনহলের সভা স্থির করিয়াছেন যে, নিবেদিতার স্মৃতিচিহ্নরূপে এই বিদ্যা-লয়টিকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের জাতীয়-জীবন-গঠনে ভারত-

মহিলাকে যদি উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে হয়, তাহা হইলে, যে শিক্ষা লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক, সেই শিক্ষা দান করাই নিবেদিতার জীবনব্রত ছিল। অতএব বলা বাহুল্য যে, তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির উৎকর্ষসাধন ভারতবাসিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। নিবেদিতার কর্ম্মজীবনের প্রধান অবলম্বন, মৃত্যুশয্যায় আশা আশীর্ব্বাদের প্রধান পাত্র, এই বিদ্যালয়টি বর্ত্তমানে আমাদের সহিত নিবেদিতার প্রত্যক্ষ-সংযোগসূত্র-রূপে অবস্থিত। শুনিয়াছি, নিবেদিতা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এই বিদ্যালয়ের জন্য উইল করিয়া দিয়াছেন। আশা করি, নিবেদিতা দায়স্বরূপ যাহা আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তত্ত্বাবধানে আমরা উদাসীন থাকিব না।

শ্রীহিন্দু।

চিত্র-পরিচয়।

শিকার।

চিত্রকর পে স্কুল বাইবেল ও সেক্সপীয়র হইতে ছবি আঁকিতেন। কিন্তু শিশু-চিত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বর্ত্তমান চিত্রের প্রতিপাদ্য,— বালক মাছ ধরিতে গিয়াছিল। গোধার মত এক প্রকার ক্ষুদ্র জলচর সরীসৃপ ধরিয়া বোতলে পুরিয়াছে, এবং সঙ্গীদিগকে সহাস্যে আপনার 'শিকার' দেখাইতেছে।

অ্যাফ্রোডাইট।

Mohila Press.

K. V. Seyne & Bros

হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তি-কথা।

[গত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় এই সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন; বেথুন সোসাইটীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা উহা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সন্দর্ভ লিখেন, তখন তিনি যুবক ছিলেন। এই বিষয় লইয়া প্রৌঢ়ে তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, এই হেতু তিনি পরে এই সন্দর্ভের কোনও উল্লেখ করেন নাই।]

হিন্দুদিগের পূজা ও উৎসবাদি লইয়া পূর্ব্বে একটু আলোচনা হইয়াছিল বোধ হইতেছে। এই সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের বিবরণী-পুস্তকে পাওয়া যায় যে, একবার হিন্দুদিগের উৎসব সকলের পদ্ধতি ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি নিবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। আমি উহাদের উৎপত্তি বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব।

আমার মনে হয়, হিন্দুদিগের উৎসব সকল এখন যে আকারে প্রচলিত, উহাদের উৎপত্তি বা প্রথম প্রচলনকালে সে আকারের ছিল না। আমরা যদি উৎসব সকলের প্রচলন-সূচনা আবিষ্কার করিতে পারি, সমাজের কোন অবস্থায় উহাদের কেমন আকার ছিল, তাহার ইতিহাস-কথা জানিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদের সমাজ কেমন বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সে তত্ত্বও আমরা অবগত হইতে পারিব। তবে ইহাও ঠিক যে, সকল পূজা-উৎসবাদির এক উৎপত্তি-বিধি নির্দ্দেশ করা এখন সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যেক পূজা বা উৎসবের প্রচলনের হেতু স্বতন্ত্র; অন্য সকল পূজা বা উৎসবের প্রচলন-হেতুর সহিত উহার কোনও সামঞ্জস্য নাই। প্রত্যেক উৎসব এক একটা বিশিষ্ট কারণের জন্য প্রচলিত হইয়াছে। সকল উৎসবের উৎপত্তি-কারণ এক নহে; সে সকল কারণের মধ্যে আদৌ কোনও সামঞ্জস্যের ভাব নাই। ফলে এ বিষয়ে আমরা কোনও সাধারণ নিয়মের নির্দ্দেশ করিতে পারি না। বিশেষতঃ, এমনও অনুমান করিতে পারা যায় না যে, অধুনা-প্রচলিত সকল উৎসবই হিন্দু সমাজের

আদিম অবস্থায় প্রচলিত হইয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, অনেকগুলি উৎসব অতি পুরাতন, অবশিষ্ট অনেকগুলি অতিশয় আধুনিক।

ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমন অনেক উৎসব আছে, যাহা দেবতা-বিশেষের পূজার আকার ধারণ করিয়া ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইলেও, মূলে ঋতু-বিশেষের বা প্রাকৃত ঘটনা-বিশেষের সূচকরূপে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। আদৌ ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ দোলযাত্রার উৎসবের কথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে দোলযাত্রা এখন তিথি-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পূজামাত্র। পশ্চিম দেশে উহাকে হুলি বলে। এই শব্দটা ইংরেজীতে শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না, লিখিতও হয় না। গোড়ায় এই হুলি বসন্ত ঋতুর সমাগমের উৎসব ছিল; উহাকে সংস্কৃতে বসন্তোৎসব বলিত। পরে এই বসন্তোৎসব মদনোৎসবে পরিণত হয়। তখনই উহাতে ধর্ম্মের ভাব অনুস্যূত হয়। মদনোৎসবের অর্থ,—প্রেমের উৎসব। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, যে ঋতুতে প্রকৃতি নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, পবিত্র নিরাবিলরূপে ফুটিয়া উঠেন, বরং যে ঋতুতে মানবের মন উন্নত ও শান্তিপ্রদ চিন্তায় মগ্ন থাকিবে,--সেই ঋতুকে ভারতের কবি সকল ও অধিবাসিবৃন্দ কামের ও প্রেমের ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কেন! এই-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে বসন্ত ঋতু প্রেম ও কামের সহিত যেন অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। কেবলই কি তাই? যে প্রেম অতি উচ্চ, যাহা আত্ম-ত্যাগের বা আত্মবিসর্জ্জনের তুল্য পবিত্র, যাহা মানুষ ও তাহার সঙ্গিনীতে বা অন্য কোনও বিষয়-বিশেষে নিবদ্ধ থাকিলেও অতি মধুর, সে প্রেম বসন্ত ঋতুর বিষয়ীভূত নহে; পরন্তু যে প্রেমে বা কামে মানুষকে পশুতে পরিণত করে, সেই কামই বসন্ত ঋতুর আয়ত্তীকৃত ব্যাপার। এই ধারণাটা ভারতবাসীর হৃদয়ে এতই দৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে, যখন কোনও হিন্দু কবি বসন্ত ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই উহাকে কামজ-প্রেমের ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্য কোনও ভাবের উহাতে আরোপ করিতে পারেন নাই।

পৌরাণিক যুগে ভারতে যে সকল মনস্বী ও মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের কেহই বসন্ত ঋতু বিষয়ে এই ধারণা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এমন কি, ভারতের, কেবল ভারতেরই বা কেন বলি, প্রাচ্য জগতের কাব্য সাহিত্যের অতি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ, কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনায় কবি যেন সহসা একেবারেই ভূমি স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছেন—ঐ কামের কথাই

বলিয়াছেন। অথচ ঐ কুমারসম্ভবের এক এক অংশে কবির কাব্য এত উচ্চে উঠিয়াছে, গাম্ভীর্য্যে ও ভাব-ঐশ্বর্য্যে এতটাই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে যে, বুঝি বা ততটা উচ্চতায় জগতের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না, এমন সংশয়ও মনে উদিত হয়। সত্য বটে, বসন্ত-বর্ণনাতে কবি কোমলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, মাধুরী ছড়াইয়াছেন, তাঁহার ভাবকম্পিত অনুভাবিকাশক্তি প্রকৃতির নবোন্মেষের সর্ব্বাবয়বে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে—নবসঞ্জীবিতা প্রকৃতির সহিত কবি যেন অনুকম্পার ভাবে বিভোর হইয়া আছেন, তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনায় কাম ও প্রেমই প্রধান আসন অধিকার করিয়া আছে। এই হেতু বসন্তের উৎসব মদনোৎসবেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রেমের দেবতা মদন; তাই মদন-উৎসবে সর্ব্বপ্রথমে মদনের পূজাই হইত। হুলিখেলায় আবীর কুঙ্কুম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পিচকারীর সাহায্যে আবীরের লাল জল সকলের অঙ্গে দেওয়া হয়। পুরাকালের মদনোৎসবেও এই সকল ব্যবহৃত হইত; রত্নাবলী নাটিকায় মদনোৎসবের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, হুলি মদনোৎসবের আধুনিক পরিণতিমাত্র। তবে শ্রীকৃষ্ণ কবে মদনের স্থান অধিকার করিলেন, এবং হুলী বা মদনোৎসব কখন বঙ্গদেশে দোলযাত্রায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। পরন্তু যে দেবতা পরে বাঙ্গালার বহুলোকের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, যাঁহার পূজা দেশের আপামর সাধারণের প্রেয় হইয়া উঠিল, এবং যাঁহার ব্রজবিলাসকাহিনী শুনিয়া লোকে বুঝিল যে, মদন অপেক্ষা তিনিই শিথিল প্রেমের ও উদ্দাম কামের যোগ্যতর দেবতা, তিনিই যে তখন মদন-উৎসব ব্যাপারে মদনকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহারই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

এইবার লক্ষ্মীপূজা ও উৎসবের বিচার করিয়া দেখা যাউক। লক্ষ্মী বা শ্রী ঐশ্বর্য্যের বা ধনধান্য বিভব বিষয়ের দেবী। পুরাকালে যখন কৃষিকার্য্যই ধনসম্পত্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিল, অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা সকল লোকে অবগত হয় নাই, তখন লক্ষ্মী বলিলেই লোকে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র মনে করিত। এখন দেখ, বৎসরে চারিটা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বৎসরের চারি ঋতুতে চারিটা ফসল হয়,এবং চারিবার লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। প্রথমে শরৎকালে দুর্গোৎসবের পরেই একটি লক্ষ্মীপূজা হয়; ইহার পরই হৈমন্তিক ধান্য সুপক্ক হইতে থাকে। দ্বিতীয় লক্ষ্মীপূজা পৌষমাসে হইয়া থাকে;

এই সময়ে হৈমন্তিক ধান কাটিয়া ঘরে তুলিতে হয়। তৃতীয় লক্ষ্মীপূজা হয় চৈত্রমাসে; এই সময়ে আশু ধান্তের উপযোগী প্রথম বারিপাত হইয়া থাকে। চতুর্থ বা শেষ লক্ষ্মীপূজা ভাদ্রমাসে হয়; এই সময়ে আশু ধান্ত কাটিয়া ঘরে তোলা হয়। ইহা হইতে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মীপূজা কৃষকের উৎসবমাত্র, গোড়ায় উহার সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

অন্ত বহু উৎসব, সূর্য্যের নিয়মবৃত্তে আয়নিক গতি ও আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি পরিণতির সহিত সংবদ্ধ—উহার অনেকগুলি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এক একটা ঘটনার স্মারকমাত্র। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে একটা সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। আমি এইবার তাঁহারই গোটাকয়েক সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করিব। এ কারণ আমি তাঁহারই নিকট ঋণী। আমাদের সকল উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যাইতে পারে। ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ষের দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ সংক্রমণ অনুসারে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ, সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে সংক্রমিত হন, সেই রাশি অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে মেষরাশি, মেষরাশিস্থ ভাস্কর বলিলেই বৈশাখ মাস বুঝায়। তেমনই জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশি। তেমনই আবার আশ্বিন মাসে যখন দুর্গোৎসব হয়, তখন ভাদ্রের সিংহ রাশির পর আশ্বিনে কন্যা রাশি। দুর্গা সিংহবাহিনী, কন্যা রাশি সিংহের পৃষ্ঠেই আসেন। তবে দুর্গা কন্যা নহেন; পুরাণে তাঁহাকে বিবাহিতা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; তিনি শিবানী ও গণেশজননী। কিন্তু কথা এই যে, বর্ত্তমান দুর্গোৎসবের দুর্গা-প্রতিমা কন্যার প্রতিমা না হইলেও, মূল উৎসবে যে কন্যার বা কুমারীর পূজা হইত, যুক্তির হিসাবে এটুকু বলা যাইতে পারে। এমন কি, গোড়ায় বোধ হয় কন্যা রাশিরই পূজা হইত। এ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ যে দুর্গার পূজা হইয়া থাকে, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে যোড়শী বলে। কন্যা, কুমারী, যোড়শী এক ভাবের পরিচায়ক নহে কি? অথবা যেমন পুরাতম অপ্রচলিত মদন দেবতার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মদনোৎসবকে দোলযাত্রায় পরিণত করিয়াছেন, তেমনই ইহা সম্ভবপর যে, কন্যারাশির পূজার পরিবর্ত্তে লোকপূজ্যা দুর্গারই উৎসব এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ এইরূপে রথযাত্রা উৎসবের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই

উৎসব কর্কট-সংক্রান্তির সময় হইয়া থাকে। ঠিক সংক্রান্তির দিন না হইলেও উহার কাছাকাছি একদিন হইয়া থাকে। সৌর গণনা অনুসারে ত হিন্দুর উৎসবাদির নির্দ্দেশ হয় না, উহা চান্দ্রমাসের তিথি নক্ষত্রের ব্যবস্থা অনুসারে হইয়া থাকে। এই হেতু বোধ হয় রথের তিথির একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তবে মনে হয়, গোড়ায় রথোৎসব সৌর গতি গণনা অনুসারেই সংক্রান্তির দিন হইত; পরে সাধারণ নিয়ম চান্দ্র গণনা অনুসারেই উহার তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। মকর রাশি ও কর্কট রাশির মধ্যে বিষুব রেখাকে দুইবার অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যে স্বীয় অয়নের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার একটু বিশিষ্টতা আছে। সূর্য্য কর্কট রাশিতে যাইয়া যেন কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তাহার পর আবার বিষুব রেখার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মকর-সংক্রান্তির সময়েও ঠিক একই রকম গতি সূর্য্যের হয়। হিন্দুর পুরাণে গল্প আছে যে, সূর্য্য রথে চড়িয়া আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। এই পৌরাণিক গল্পের অনুসারে একটা রথ নির্ম্মিত হয়; সে রথকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; সেই স্থানে রথ অষ্টাহকাল অপেক্ষা করে; পরে যেখানকার রথ সেইখানেই ফিরিয়া আসে। ইহা কি সূর্য্যের গতির অভিনয় নহে? বলিতে পার, রথে ত সূর্য্য থাকেন না, জগন্নাথ বিরাজ করেন। তাহা হইলে উত্তরে বলিব, যেমন মদন ও কন্যাকে অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গা অন্য দুই উৎসবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তেমনই জগন্নাথ সূর্য্যকে সরাইয়া নিজেই রথে বিরাজ করিতেছেন।

এমন সংশয় করা যাইতে পারে যে, রথযাত্রার উৎপত্তির যে আনুমানিক কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে, শীতকালে মকর-সংক্রান্তির সময়ে আর একটা রথযাত্রার উৎসব হইত। দ্বিতীয় রথযাত্রা না হউক, মকর-সংক্রান্তির সময় যে একটা উৎসব হয়, সে পক্ষে ত কোনও সন্দেহ নাই। এই উৎসব ঠিক সংক্রান্তির দিনই হইয়া থাকে, উহার নির্দ্দেশ সৌর গণনা অনুসারে হয়, চান্দ্র পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। মাসের শেষ দিনে মকর-সংক্রান্তির নির্দ্দেশ আছে বলিয়াই, বোধ হয়, উৎসবটা ঐ দিনেই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে দিন সূর্য্য মকর-সংক্রান্তিতে আসিয়া স্পর্শ করেন, সেদিন ত পঞ্জিকার হিসাবে মকর-সংক্রান্তি হয় না। হইবার কথাও নহে; কারণ, ক্রান্তিপাতে সূর্য্যের বিলোম বা পশ্চাৎ গতি আছে, সে জন্য পার্থক্য ঘটিবার কথা। পুরাকালে যখন এই উৎসব প্রচলিত হইয়াছিল, তখন

হয় ত প্রকৃত সংক্রান্তি মাসের শেষ দিনেই হইত। এখন একুশ দিনের পার্থক্য হইয়াছে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীর ৫০° ২" বিলোম গতি হওয়াতে পনর শত শতাব্দীতে একুশ দিনের পার্থক্য হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মকর-সংক্রান্তির উৎসবটা খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। কর্কট-সংক্রান্তির সময়ে যেমন রথ প্রস্তুত হয়, মকর-সংক্রান্তির সময়ে তেমন রথ প্রস্তুত হয় না বটে, পরন্তু পরের দিনকে উত্তরায়ণের দিন বলাতে, ইহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই উৎসব সৌর অয়নগতি লক্ষ্য করিয়াই প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের বহুপ্রদেশে উত্তরায়ণের দিনে কেবল সূর্য্যেরই উপাসনা হইয়া থাকে। মিঃ লঙ্ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে এক সন্দর্ভ পাঠ করেন; উহাতে ভারতীয় নানা বিষয়ে পাঁচ শত প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্ন সকলের মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, উত্তরায়ণের দিনে কেবল সূর্য্যেরই পূজা হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি আরও বিশদভাবে দিতে হইবে? মকর-সংক্রান্তির উৎসব যে সৌর অয়নগতি লক্ষ্য করিয়া প্রচলিত, তাই উত্তরায়ণের দিনে সূর্য্যের পূজাই প্রশস্ত। আমার মনে হয়, এই উত্তর অন্য কোনও অনুমানের অপেক্ষা করে না।

আমি জানি যে, জেনারল কনিংহাম, তাঁহার ভিল্‌সা স্তূপের বিবরণ-পুস্তকে আধুনিক রথযাত্রার একটি সঙ্গত ও ইতিহাস-সম্মত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার উৎসব ছিল। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিনের প্রতিমা রথে বসাইয়া রথ টানা হইত। বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার উৎসব ঐ কর্কট-সংক্রান্তির সম-সময়ে হইত। বোধ হয়, পরে বৌদ্ধদিগের অনুকরণে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের পরিবর্ত্তে, রথে বসাইয়া রথযাত্রার উৎসব আরম্ভ করা হয়। এমন কি, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের আকারান্তরমাত্র, বৌদ্ধ আদর্শেই নির্ম্মিত। এই অনুমানের পোষক প্রমাণ, কনিংহাম সাহেবের পুস্তকে লিখিত আছে। তবে উহা যে অবিসংবাদিত প্রমাণ, তাহা আমি বলিতে পারি না। এমনও ত হইতে পারে যে, বৌদ্ধগণ অতি পুরাতন আদিম সৌর উৎসবকে, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ঘটনা-পরিজ্ঞাপক উৎসবকে,—নিজেদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন!

এই হিসাবে রাস-যাত্রার উৎসবটা জ্যোতিষ-নির্ণায়ক উৎসব বলিয়া মনে হয়। হয় ত রাস শব্দটা 'রাশি' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে, উহার

অর্থ যে কি হইতে পারে, তাহা আমি বলিতে পারিলাম না। তবে এই অনুমান কতকটা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় যে, বসন্তোৎসবের—দোলযাত্রার অনুকরণে ইহা শারদোৎসব মাত্র। বসন্ত-উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হয়, শরতের রাসযাত্রা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হয়। আবার বৈশাখের পূর্ণিমায় ফুল দোল, শ্রাবণের পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা হয়। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, এই চারিটা উৎসব প্রথমে ঋতুর উৎসবই ছিল, ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এখন কিন্তু এই চারিটিই ধর্ম্মোৎসব, এবং শ্রীকৃষ্ণই এই চারি উৎসবের অধিনেতা, দেবতা। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হিন্দুদিগের বৎসরের ছয় ঋতুর চারিটা ঋতুর চারি পূর্ণিমায় এই চারিটা উৎসব হইয়া থাকে। কেবল হেমন্ত ও শীতের দুইটা পূর্ণিমায় কোনও উৎসব নাই। ইহার হেতু বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতের পূর্ণিমায় স্ফুটচন্দ্রিকাদীপ্ত নিশা বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম, উৎসবের ও উল্লাসের উপযোগী। এমন কি, বর্ষায় গতঘনা যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু শীতকালে, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের পূর্ণিমা যেন তমিস্রাসমাচ্ছন্না, যেন শীতজাড্যস্থবিরা, যেন হৈমস্পর্শে সদা বেপমানা ; চন্দ্রের সে উল্লাস বিকাশ নাই, সে বিগলিত-রজত-ধারাস্রাবের ন্যায় চন্দ্রিকাদীপ্তির হাস্যময়ী খেলা নাই। এমন পূর্ণিমার নিশায় উৎসব জমে না। হিন্দুগণ এই দুই পূর্ণিমা পরিহার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-পূজাটাও, আমার মনে হয়, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ঘটনা হইতে সঞ্জাত। দেবতার নাম ও যে মাসে উহার পূজা হয়, তাহার নাম, কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরাণে গল্প আছে যে, কার্ত্তিকেয় উমা বা দুর্গার পুত্র বা দত্তক পুত্র। উমা বা দক্ষদুহিতা সাতাইশটা নক্ষত্রের ভগিনী। ইহা হইতে এমন অনুমান করা যায় না কি যে, অতিপূর্ব্বে—পৌরাণিক যুগেরও পূর্ব্বে—কার্ত্তিকেয় ঐ কৃত্তিকা নক্ষত্রের পুত্র ছিলেন ; শেষে পৌরাণিক যুগে গল্পটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং কার্ত্তিকেয় পুরাণপ্রিয় দুর্গারই পুত্র বলিয়া উক্ত হইলেন ? এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রথমে কার্ত্তিকোৎসব বলিলেই কৃত্তিকা নক্ষত্রের উৎসব বুঝাইত। পরে এই উৎসবে ধর্ম্মের ভাব আরোপিত হইল, উৎসবের অধিষ্ঠাতা এক দেবতা আসিলেন ; কৃত্তিকা-সম্বন্ধীয় দেবতা বলিয়া তাঁহার

নাম হইল কার্ত্তিকের। ক্রমে ক্রমে কার্ত্তিকেয়কে লোকে কৃত্তিকার পুত্র বলিয়া চিনিল। শেষে পুরাণের কল্যাণে কার্ত্তিকেয় উমার পুত্র হইলেন। উমা দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা, সাতাইশ নক্ষত্রের ভগিনী হইলেন। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার সিদ্ধান্ত অনেকটা সুদূরপরাহত, এবং এই হেতু উহা বিশেষ বিচারযোগ্য গুরুতর সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

উপরের উল্লিখিত অনুমান সকলে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে, হিন্দুদিগের উৎসব সকলকে নিয়োক্ত কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) সূর্য্যের আয়নিক উৎসব ; যথা, রথযাত্রা ও মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি।

(২) নাক্ষত্রিক বা জ্যোতিষ-ঘটনা-সঞ্জাত উৎসব ; যথা, দুর্গাপূজা, কার্ত্তিকেয়-পূজা প্রভৃতি।

(৩) ঋতুজাত উৎসব ; যথা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, ফুলদোল প্রভৃতি।

(৪) কৃষিকার্য্যগত উৎসব ; যথা, চারিটি লক্ষ্মীপূজা। গ্রীকদিগের কীরিজ (Ceres) লক্ষ্মীর স্থানাভিষিক্ত দেবী।

(৫) পৌরাণিক উৎসব ; যথা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি। এগুলি অতি আধুনিক।

(৬) বিভীষিকা-অপসারক উৎসব। লোকে যে সকল প্রাকৃত ঘটনায় ভীত হয়, বা আপদে সঙ্কুচিত হয়, সেই সকল আপদ বা বিভীষিকার দূরীকরণমানসে দেবতাবিশেষের পূজা করে। যথা, মনসা-পূজা ; ইহা সর্পভয়-নিবারণের উৎসব। শীতলা পূজা প্রভৃতিও এই শ্রেণীর পূজা।

হিন্দুদিগের সকল উৎসবের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষের স্মারক কোনও উৎসবই উহাদের নাই। যে জাতির মধ্যে ইতিহাসের চর্চ্চাই ছিল না, সে জাতির মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনামূলক উৎসবের অন্বেষণ ব্যর্থপ্রয়াসমাত্র।

যাহা হউক, হিন্দুদিগের মধ্যে এমন উৎসবের প্রচলন আছে, যাহা আমার নির্দ্দিষ্ট কোনও শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যেমন দেওয়ালী উৎসব। দেওয়ালী যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে উহা যে একটা বিস্ময়জনক উৎসব, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। উহার বিশিষ্টতা এই যে, যে নিশায় দেওয়ালী

ঔরংজেবের শোভাযাত্রা

উৎসব হয়, সেই নিশাকালে হিন্দুমাত্রই নিজ নিজ গৃহ প্রদীপ্ত দীপাবলীতে সাজাইয়া থাকেন। ক্রমে নগর আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া উঠে। কেবল ইহাই নহে; এই দীপাবলীর সঙ্গে আরও একটু ব্যাপার আছে; তজ্জন্যই উহার বিশিষ্টতা, এবং তাই মনে হয় যে, কোনও এক বিশিষ্ট ঘটনা, বা উদ্দেশ্য, বা ভাব নির্দ্দেশ করিয়া এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব কার্ত্তিক মাসে হয়। এই মাসটা যেন আলোকমালা-বিভূষণেই উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সারা মাসটা প্রত্যেক হিন্দু-গৃহে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়; একটা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর আলো জ্বালাইয়া ঊর্দ্ধে ঝুলাইয়া রাখা হয়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশীতে এই মাসেই প্রত্যেক ঘাটে তীর্থে তীর্থে দীপাবলী জ্বালিয়া দেওয়া হয়। কুমারী সকল ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়; যেন মনে হয়, সংসার-প্রবাহে তাহাদের জীবন-প্রদীপ যে ভাবে ভাসিয়া যাইবে, তাহারা উহারই অভিনয় করে। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এবংবিধ আচার ব্যবহারের মূল কোথায়, তাহার আলোচনায় আমার সমধিক আগ্রহ বোধ হয়; মনে হয়, ইহাদের মূলের অনুসন্ধিৎসা, উৎসব সকলের প্রচলনের, অনুসন্ধিৎসা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক। তবে এই সকল ব্যাপারের দুই চারিটা পদ্ধতির অর্থ অনেকটা বুঝা যায়। লক্ষ্মীপূজায় কেন ধান দিতে হয়; সরস্বতীপূজায় পুস্তক, দোয়াত, কলম, বাদ্যযন্ত্রাদি কেন রাখা হয়, তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। হলীর সময়ে আবীর ব্যবহৃত হয়; বোধ হয়, বসন্তের নবসঞ্জীবিত প্রকৃতির নবানুরাগপ্রফুল্ল লোহিতাভ নব কিশলয় আদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবীরের ব্যবহার হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের পর বিজয়াদশমীর দিন ভাঙ খাইতে হয়। ভাঙের অপর নাম সিদ্ধি। বিজয়াদশমীর দিনে সিদ্ধি পান করিলে সারা বছরটা সকল কার্য্যে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্য সকল ব্যবহার-পদ্ধতি এমনই বিস্ময়জনক যে, উহাদের ব্যাখ্যা এত সহজে হয় না। কার্ত্তিক মাসে এত দীপাবলী কেন? গঙ্গা দশহরা পূজার দিনে কেন আদা কলা উচ্ছে (বীড়) না চিবাইয়া গলাধঃকৃত করিতে হয়? চুল্লীমুখে উনানের উপর মনসা-পূজা হয় কেন? পুরাণ এ সকল ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, লোকবুদ্ধিও ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে না। তাই মনে হয়, যে ভাব বা ঘটনা সম্পর্কে, বা যাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত

হইয়াছিল, সে ভাব, ঘটনা বা স্মরণীয় ব্যাপার এখন পূর্ণভাবে বিস্মৃতি-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, হিন্দুদিগের অধিকাংশ উৎসব এবং তৎসংসৃষ্ট ব্যবহারপদ্ধতি, অন্ততঃ পুরাতন উৎসব সকল ও ব্যবহার-পদ্ধতির মূলে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধই ছিল না। এখন যে ঐ সকল ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইয়াছে, সে কেবল পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের প্রভাবেই হইয়াছে, অথবা পুরাণগত অন্ধবিশ্বাসের হেতুই উহাদের আদিম আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিলাম। লোকসাধারণ আমার হেতুবাদ অনুসারে উৎসব সকলকে লক্ষ্য করিলে, আমার সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য হয় ত অনুধাবন করিতে পারিবেন, এবং হয় ত তাঁহারাও আমার মতানুকূল হইতে পারেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দর্ভ পঠিত হইবার পর রেভারেণ্ড জে. লং উঠিয়া বলিলেন যে, সন্দর্ভ-লেখক অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় প্রদেশে (Tera incognita) বিচরণ করিয়াছেন। এখনও এ ব্যাপারের অনেক বিষয় আবিষ্কার করিবার আছে। তিনি যাহার ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা নূতন বিষয়, এবং সম্যক আলোচনার যোগ্য। তবে ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার বটে যে, এখন যাঁহাকে আমরা জগন্নাথ বলিয়া জানি, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উনিই বুদ্ধ ছিলেন, এবং জগন্নাথের মন্দির বৌদ্ধ-মন্দির ছিল।

মিঃ উড্রো বলেন, (Mr. woodrow) আমার এই ধারণা যে, হিন্দু-দিগের উৎসব সকলের ইতিহাস যদি আদিম কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, গ্রীক বা যবনদিগের উৎসব সকলের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় ত জানা যাইতে পারিবে।

মিঃ বিভার্লী (Mr. Beverley) লেখকের ভাবুকতার পর্য্যাপ্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন, লেখক দার্শনিকের সামঞ্জস্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, হিন্দুদিগের উৎসব পূজা কেন, জাতিবিচারটাও যে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, এমন বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক কারণবশতঃই এই সকল ব্যাপার উদ্ভূত : সমাজিক অভাব প্রভাবে উহাদের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে ; বিশেষতঃ, জাতিবিশেষের প্রকৃতি বা মনীষার বিশিষ্টতা হেতু সামাজিক আচার ব্যবহার উৎসবাদির বিশিষ্টতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পরিশেষে স্বয়ং সভাপতি উঠিয়া লেখকের প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনায় যে সকল নূতন উপাদান দিয়াছেন, তজ্জন্য সভা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। সকল দেশের উৎসব ও আচার ব্যবহার তৎতৎ দেশের বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক; পরন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের পক্ষে তাহাদের উৎসব আনন্দ রীতি পদ্ধতি তাহাদের বিশিষ্টতার একমাত্র পরিজ্ঞাপক। কাজেই এই সকলের সম্যক আলোচনা হইলে সকল পক্ষেরই বিশেষ উপকার হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সকল বিষয়ের যথারীতি আলোচনা করিতে থাকিলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন।

রেলপথে।

* * * * * সাহিত্যিক সমাজপতি মহাশয়, এবং 'নায়কের' লেখক ও লেখকের নায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমরা পশ্চিমাঞ্চলবাসী বাঙ্গালী, 'দেড়া' মাশুলের প্রিয়। রাত্রি প্রায় আটটা। চট্ করিয়া একখানি টিকিট ক্রয়-পূর্ব্বক ইণ্টার-ক্লাসে আরোহণ করিলাম। ছয়খানি বেঞ্চ। মাথার উপর দুইখানি 'বংক'। কামরার মধ্যে পঁয়ত্রিশ জন আরোহী।

যাহারা বহুদূরের যাত্রী (আমাদিগের মত) তাহাদিগের মধ্যে তিন চারি জন অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় হতাশদৃষ্টিতে চাহিতেছিল। 'মহাশয় কোথায় যাইবেন?' উত্তর, 'রামপুরহাট', 'ভাগলপুর', 'মুঙ্গের' ইত্যাদি। সাধারণতঃ লুপ-রেলে এত ভিড় হয় না। আমরা প্রমাদ গণিলাম। সারারাত্রি জাগিতে হইবে। শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতির আরোহী যোটে তিন চারি জন। রামপুরহাট পর্য্যন্ত এগার জন। রাজমহল পর্য্যন্ত দশ জন। হিসাব করিয়া দেখা গেল, রাত্রি তিনটার পূর্ব্বে বেঞ্চের উপর চরণযুগল-বিস্তারের সম্ভাবনা অতি অল্প।

কামরার দিকে চাহিলাম। দুইটি মেড়ুয়াবাদী; তন্মধ্যে একটি মাড়োয়ারী, এবং এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। চারি জন বীরভূমনিবাসী, তন্মধ্যে দুই জনকে বেশ ধার্ম্মিক লোক বলিয়া বোধ হইল। এক জন গ্রাজুয়েট ও একটি সবডেপুটী। পরিচয় হওয়াতে এ সব কথা জানা গেল। এক জন

বিকটাকার লম্বাদাড়ীযুক্ত পুরুষ পরিচয় দিলেন না। পরিচয়ের পরিবর্ত্তে তিনি 'তামুক' সাজিয়া ঘন ঘন অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ছয় সাতটি নব্য যুবক তাহা দেখিয়া সিগারেট (এবং এক জন বিড়ি) জ্বালিয়া বসিলেন।

গাড়ী ছাড়িবামাত্র এক জন ভদ্রলোক আম্রের খোসা ছাড়াইতে লাগিলেন, অতি সাদা সিধা মানুষ। তাঁহার পার্শ্বে গ্রাজুয়েট ভদ্রলোকটি (পরে জানা গেল, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের এক জন অধ্যাপক) জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি আম খাইবার সময় ?

আম্রভোজী। আমার 'অর্শের ব্যারাম' আছে।

প্রোফেসার। ক্রমে বিষাদের ব্যারাম দাঁড়াইলে দুর্য্যোধনের মত মারা যাইতে পারো।

আম্রভোজী। কেন মশায় ?

প্রোফেসার। আমি এক জন বিলেতের অধ্যাপক। পরীক্ষাপূর্ব্বক জানিয়াছি, রসযুক্ত ফল গ্রহণ করিলে অর্শের প্রকোপ বাড়ে। আপনার অর্শের ব্যারাম ; আম ছাড়িয়া ওল খাওয়া উচিত।

আম্রভোজী। ওল অনেক খাইয়াছি।

প্রোফেসার। বোধ হয় সাঁতরাগাছির ওল ?

উত্তরে ভদ্রলোকটি বলিল, "হুঁ।" অধ্যাপক হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "সে ওলে কোনও ফল হয় না। খাইতে হইলে মাদারী ওল খওয়া উচিত। ভাগলপুরের দক্ষিণে পাওয়া যায়।" আম্রভোজী নিরস্ত হইয়া মাদারী ওলের তল্লাস করিবেন, এমত প্রতিজ্ঞা করিলেন।

বিপরীত দিকের বেঞ্চের মাড়োয়ারী আরোহী কহিল, 'হমার নিকট ওলের আচার আছে।' কিন্তু ভদ্রলোকটি বলিলেন 'আচারে লঙ্কা দেওয়া থাকে, আমার সহিবে না।' ইহাতে অন্য হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি হাসিয়া কহিল, 'এই জন্য দুইটা মুলুক আলাদা হইয়া গিয়াছিল।'

অধ্যাপক বলিলেন, 'মর্ম্মটা বুঝা গেল না।'

হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক কহিলেন, 'আমি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। আমরা বৈদ্যের ব্যবসা করিয়া থাকি। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ শাকদ্বীপে বাস করিতেন, এবং অতিশয় লঙ্কাভোজী ছিলেন। ক্রমে, খৃষ্টাব্দের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, বিশাল কাস্পিয়ান উপসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া দক্ষিণ রুসিয়া প্রদেশ জলপ্লাবিত করিয়াছিল। উপসাগরের লবণাক্ত জলের সহিত শাকদ্বীপের

রক্তমৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া ক্ষারে পরিণত হইল। লঙ্কামরিচের উৎপত্তি বন্ধ হইয়া গেল।'

অধ্যাপক অতিশয় ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার কোনও প্রমাণ আছে ?'

ব্রাহ্মণ। আমাদিগের পুরাতন পুঁথি আছে। ইউরাল ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থ আমাদিগের সেই আদিম বাসস্থান হইতে বিদায় লইয়া আমরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমরা বিন্ধ্যগিরি ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে লঙ্কার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সেইখানে থাকিয়া গেলাম। পরে পূর্ব্ববঙ্গে সেন-বংশের আধিপত্যকালে আমরা জানিতে পারিলাম যে, সেই দেশে অত্যন্ত ঝাল এক প্রকার লঙ্কার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম 'ধানি' লঙ্কা। তাহা আস্বাদন করিয়া আমরা পরম পুলকিত হইলাম। ফলতঃ, দেখা গেল যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও বিহার, এ দুই প্রদেশের বাসিন্দাগণই লঙ্কাপ্রিয়! যাহাকে আপনারা 'রাঢ়দেশ' কহেন, সে দেশের লোক লঙ্কা সহিতে পারে না। অতএব, রাঢ়দেশের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ মিশিতে পারে না, এবং বিহারও মিশিতে পারে না। এই তথ্য না জানিয়া সরকার বাহাদুর একবার রাঢ়কে এ দিকে ও একবার ও দিকে যুক্ত করিতেছেন; কোনও বন্দোবস্তই সন্তোষজনক হইতেছে না। ক্রমে লঙ্কার ঝালযুক্ত আচার প্রভৃতি অভ্যাস হইয়া গেলে পরে কোনও গোলমাল থাকিবে না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী এই উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছেন।

ব্রাহ্মণের এই সহৃদয়তা দেখিয়া ও উদার পরামর্শ শুনিয়া সেই কামরার অন্যান্য বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি অত্যন্ত প্রশংসাসহকারে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। প্রোফেসার নোটবহি লইয়া টুকিতেছিলেন। কতকগুলি আরোহী ইত্যবসরে শয়ন করিবার ব্যর্থ বন্দোবস্ত করিতেছিল।

তাহাদিগের কায়ক্লেশ ও মনঃকষ্ট দেখিয়া পূর্ব্বদিকের বেঞ্চের সাত জন নব্যযুবক সমস্যা-পূরণ করিবার চেষ্টা করিল।

এক জন হঠাৎ উঠিয়া কহিল, 'আমার নাম বংশী। এই ভদ্রলোকগুলির কষ্ট দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।'

(সকলের কৃতজ্ঞতাসূচক দৃষ্টিপাত।)

সম্মুখে বড় বড় পেটারা। কলার কাঁদি। আনারস ও আম্রের ডালি। দুই তিনটি বড় বড় কুমড়া (বিলাতী)। বংকের উপর কলিকাতার রসগোল্লা-

পরিপূর্ণ হাঁড়ি। বেঞ্চের তলায় একটা প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য পচিতেছিল। কাপড়ের গাঁটরী। জুতার বস্তা। বীরভূমবাসীদিগের মধ্যে এক জনের হার্ম্মোনিয়ম, বাঁয়া ও তবলা। অন্য এক জনের গ্রামোফন।

বংশী সমস্ত তৈজসপত্রাদি টানিয়া বাঁধিয়া, বেঞ্চগুলির নীচে গুছাইয়া রাখিল। কেহ বাধা দিল না। এক জন বলিল, 'মহৎকর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত নয়।'

মাড়োয়ারী কিছু ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন, 'হাপনি কি করিবেন?'

বংশী। কিছু হুন্নত (উন্নত) হইয়া বসিব।

অতঃপর সাত জন যুবকের মধ্যে ছয় জন একই বেঞ্চের উপর জানুদ্বয় আরগুলার শুণ্ডের ন্যায় বাহির করিয়া দিয়া তদুপরি মস্তক স্থাপন করিল। একটি যুবকের স্থানাভাব হইল।

বংশী কহিল, 'তুই দাঁড়াইয়া থাক্।'

যুবক অমায়িকভাবে, নতমুখে, সবডেপুটী বাবুর পদতলপার্শ্বে দাঁড়াইল।

সবডেপুটী কহিলেন 'বেশ সুবন্দোবস্ত হয়েছে।'

প্রায় সাত আট জন আরোহী এই সুযোগে কলেবর যত দূর সম্ভব কুঞ্চিত করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল।

অমায়িক যুবক। কাশীনাথ মিত্র আমার পিশেমশায়।

সবডেপুটী। ও! আমি জানি। বড় উঁচুদরের লোক।

প্রোফেসার। কি! আপনি কালী মিত্তিরের—

আম্রভোজী। কি আশ্চর্য্য! আপনি কালী মিত্রের শ্যালক-পুত্র! কালী মিত্র যে আমাদের—

সবডেপুটী। কোন্ কালী মিত্রের কথা বল্‌ছেন?

আম্রভোজী। রিসড়ের।

প্রোফেসার। আমি বর্দ্ধমানের কালী মিত্রের কথা বলছি।

সবডেপুটী। আমি চুঁচুড়ার কালী মিত্তির ঠাউরেছিলাম।

অমায়িক যুবক কহিল, 'আমি ও সব কালী মিত্রকে জানি না। আমার পিশেমশায় যাত্রার দলে ছিলেন। সেই পুরাতন রায় বাঁড়ুয্যের দল।'

এক জন বীরভূমবাসী কহিল, 'সাবাস্। তিনি ত দিগ্‌গজ গাহক। তুমি গাহিতে জান?

অমায়িক। কিঞ্চিৎ।

সকলে হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া তবলার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সবডেপুটী কহিলেন, 'এখন থাক্। বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন ছাড়ুক।'

ট্রেণ বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত। ভাগ্যক্রমে যতগুলি আরোহী নামিয়া গেল, তাহার অপেক্ষা কম উঠিল।

প্রোফেসার কহিল, 'স্বর্গেরও এই নিয়ম।'

একটি স্ত্রীলোক শশব্যস্তে প্লাটফরমে স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গাড়ীতে জায়গা আছে?'

২

মলিনা; এককালে মুখশ্রী ছিল। স্ত্রীলোকটি ভয়ানক লম্বা। দীর্ঘকেশা, দীর্ঘবাহু, দীর্ঘনখা। পুত্রটি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি। সাত, আট বৎসর বয়ঃক্রম।

প্রোফেসার কহিল, 'মেয়েদের গাড়ীতে যাও।'

স্ত্রীলোক। একটুন্ জায়গা নাই। মহাশয়! আমি দীনা অনাথিনী। একটু দাঁড়াইবার স্থান দিবেন। আমরা সাঁইথিয়া যাইব।

হিন্দুস্থানী। তোমার দেড়ামাশুলের টিকিট আছে?

স্ত্রীলোক। (হঠাৎ চটিয়া) 'কেবল তোমরাই দেড়ামাশুল দিতে পার, আমরা পারিব না! এ পুরুষগুলা কেমন গা? একটু মায়া দয়া নেই। (পুত্রের প্রতি)। 'বাছা, ওঠ।'

সদর্পে পুত্র উঠিল। মাতা পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

বংশী বেঞ্চের উপর হইতে কহিল, 'মা জননী, এস, অতএব এস। বঙ্গ আমার, জননী আমার! এস।'

রমণী। তোমরা কে গা?

বংশী। আমরা ৭টি, যাত্রার দলের ছেলে। কিন্তু লেখা পড়া জানি। বল্‌তে কি, এক জন বি. এ. ফেল্। আমরাও সাঁইথে যাত্রা কর্ত্তে যাচ্ছি। সব্বর লোক থার্ড ক্লাসে।

রমণী। '——গাঙ্গুলীর বাড়ীর যাত্রা?'

বংশী। হাঁ, কি সৌভাগ্য! তুমিও সেখানে যাচ্ছ? বাঃ! একটু অ্যাকটিংএর নমুনা রাস্তাতেই দেখাইয়া দিব। (বীরভূমবাসীর প্রতি) সুর ধর, গ্রামোফন ছাড়। তবলা বাঁধ। হৃদয় উদ্বেলিত কর। পাষাণ হৃদয়! হা হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি, প্যারাসাইটের মত অপরের স্কন্ধে চাপিয়া অন্নধ্বংস করিতেছ,—

(বিকটাকার-দাড়ীযুক্ত ভদ্রলোকটির প্রতি)—'মশায় দফরাজ! গা তুলুন, তামাক সাজুন!'

সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। হিন্দুস্থানীদ্বয় শব্দের আধিক্য দেখিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ করিল।

সুরের গোড়াপত্তন দেখিয়া দুইটি ধার্ম্মিক পুরুষ প্রোফেসারের নিকট ঘেঁষিয়া বসিল।

প্রথম পুরুষ। মহাশয় বোধ হয় গীতা পড়িয়াছেন?

প্রোফেসার। (আশ্চর্য্য হইয়া) বাঃ! বাঙ্গালীর মধ্যে কে গীতা পড়ে নাই?'

প্রথম পুরুষ। হায়! (আপনাকে দেখাইয়া) এই হতভাগ্য 'আমি' এতদিন পড়ি নাই। তার পর বক্ষাকাশের মত একটা ব্যায়রাম হইবার পর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বলিতে কি, গীতা পড়িয়া আরোগ্য হইয়াছি।

দ্বিতীয় পুরুষ। বক্ষাকাশ কেন, (নস্য লইয়া) মূলাকাশ, ঘটাকাশ, মহাকাশ প্রভৃতি ইহাতে আরোগ্য হয়। আমি তর্করত্ন মহাশয়ের শিষ্য; আমার প্রধান পাঠ্য বেদান্ত।

প্রোফেসার। আচ্ছা, জীব অবসন্ন হইয়া পড়ে কেন? বৈরাগ্য হয় কেন? এটা কেমন অস্বাভাবিক নয়? বলিতে পারেন, দেহের সংস্পর্শে হয়; কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াও সাধুগণ বিকল হইয়া পড়েন, তার অর্থ কি? মন সংযত করিলেও বায়ু, পিত্ত, কফাদির বিকার হইয়া রোগের উৎপত্তি কেন হয়?

তর্করত্ন। প্রথমতঃ 'জীব' সম্বন্ধেই আমার সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ, জীবের আধিপত্য সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। ভগবান্ বলিতেছেন, জীব তাঁহার অংশ। এ স্থলে 'অংশ'টাকে 'ভাব' বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন একটা গান। মনে করুন, গানটা গ্রামোফনের মধ্যে নিনাদিত হইতেছে। অন্তরীক্ষের একটা গানের দ্বারা গ্রামোফনের রেখার সৃষ্টি, এবং গ্রামোফন ঘুরিলে সেই গানটি হয়। কিন্তু গ্রামোফনের উপর গানের আধিপত্য নাই। গ্রামোফন না ঘুরিলে গান হয় না। কল বিগড়াইলে গান বন্ধ থাকে। গানের 'ভাব', কিংবা 'জীব' তখন ক্ষুব্ধ হয়, বিষণ্ণ হয়, বৈরাগ্যযুক্ত হয়। কলটি বিশ্ব-কল, এবং সমগ্র বিশ্বকে কিংবা বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া আছে। এটা বিরাট মায়া। আংশিক জীবের তাহার উপর কোনও আধিপত্য নাই।

ধ্যানী বুদ্ধ।

ভূমিস্পর্শ মুদ্রা।]

পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ।
[চিত্রে এক মুখ প্রদর্শিত।]

K. V. Seyne & Bro

প্রোফেসার। তবে মুক্ত পুরুষও মায়ার অধীন?

তর্করত্ন। অধীন কথাটা ঠিক নয়। দেহের মধ্যে থাকিতে হইলে দেহের বিকার লইয়া থাকিতে হইবে। শুদ্ধ মুক্তাত্মা পুরুষ তাহা দ্বারা সুখ দুঃখে জড়িত হন না। আপনি যাঁহাদের কথা বলিতেছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। এই যে মুখুর্য্যে মহাশয়ের যক্ষ্মাকাশ হইয়া বৈরাগ্য হইয়াছিল, এবং গীতা পড়িয়া সারিয়া গিয়াছেন, ইহাতে এমন কোনও কথা নাই যে, তিনি দীর্ঘায়ু হইবেন। তবে অন্তবার পীড়িত হইলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবানের নাম করিবেন; কারণ, তাঁহার বৈরাগ্য যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। ইহার বচন 'পাকা হরীতকীর ন্যায়'।

প্রোফেসার। তবে বহুপরিবারবিশিষ্ট গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

প্রথম পুরুষ। আমার অগ্রজের চারিটি স্ত্রী এবং তেরটি পুত্রকন্যা ছিল, এবং কন্যাগণের বাইশটি পুত্রকন্যা ছিল, অথচ তিনি বিরাট গৃহ-কোলাহলের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। যত কলহ বাড়িত, ততই তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন।

প্রোফেসার। আমারও সেই রকম হচ্ছে। গাড়ীতে চড়িয়া শরীরটা অবসন্ন হয়েছিল, পরে বৈরাগ্যের ভাব। এখন এই যাত্রার বালকগণের সঙ্গীত-অভিনয়াদি ও আবালবৃদ্ধবনিতার কৌতুহল দেখিয়া অনেকটা আত্মার অস্তিত্বের অনুভব কচ্ছি।

বাস্তবিকই আমরা সকলে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। অমায়িক যুবক 'শুম্ভনিশুম্ভে'র পালার একটি গান ছাড়িয়া দিল। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সুর টিপিতে লাগিল।

প্রোফেসার। সুর জিনিসটা বেশ, ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

আম্রভোজী। তত্ত্বজ্ঞানের কথা যদি বলিলেন, তবে একটা অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করুন।

আমাদের বাসার নিকট রামধন ধোপার একটি গর্দ্দভ ছিল। পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ তাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল।

তর্করত্ন। তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত পুরুষের গর্দ্দভের দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করার দৃষ্টান্ত বিরল।

আম্রভোজী। বোধ হয়, বোঝা বহিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকাতে, এবং সুরের চৈতন্য পূর্ব্বজন্মে ঘটিয়া না উঠাতে তিনি গর্দ্দভরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। অন্যান্য গর্দ্দভের সহিত তাঁহার বিশেষ পার্থক্য ছিল। তিনি ঘাস খাইতেন না। কোনও শব্দ করিতেন না। বোঝা বহিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিনা আপত্তিতে চলিয়া যাইতেন।

সবজেপুটী। আমাদের মত।

আম্রভোজী। হঠাৎ তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে ধ্যানস্থ হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। ধোপা কহিল, 'এটাকে বাবুদের ভাগাড়ে ফেলিয়া দে।' প্রাতঃকালে ভাগাড়ে গর্দ্দভকে দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়া গেলাম। সোনার বর্ণ চক্ষু, দিব্য লাঙ্গুল, কান্তিপূর্ণ দেহ! স্ত্রীকে কহিলাম, 'ইহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, এই সাধু গর্দ্দভকে বসিয়া খাইতে দেহ।' তিনি বলিলেন, 'কয়টা গর্দ্দভকে বসিয়া খাইতে দিব?' আমি বলিলাম, 'তথাপি, ইনি সাধু পুরুষ, আমি বদ্ধ গৃহস্থ। আমা হইতে ইঁহার স্থান উচ্চ।' তাহাই হইল। সজলনয়নে কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক গর্দ্দভ রহিয়া গেলেন। একদিন আমাদের বাটীর নিকট এক জন সুগায়কী কীর্ত্তন-ওয়ালীর গান হওয়াতে দেখিলাম, গর্দ্দভরাজ তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন।

'বঁধু! জনমে জনমে, জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি।'

সেই গভীর ভাবের সহিত সুমিষ্ট স্বর যেমন কানে লাগা, অমনই গর্দ্দভেরও অন্তর্নিহিত জাতিস্মরতা জাগিয়া উঠা। মুহূর্ত্তের মধ্যে উদাত্ত বেদধ্বনির ন্যায় গর্দ্দভের সামগানে বাটীর প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। গর্দ্দভ লাঙ্গুল উত্তোলন-পূর্ব্বক আসরে পঁহুছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মোটেই বেসুরা নহে।

প্রোফেসার। আপনি সুর বুঝেন?

আম্রভোজী। আমি ঠিক না বুঝি, কীর্ত্তনীর বেহালাওয়ালা শপথ করিয়া কহিল যে, গর্দ্দভের গান সুরে তালে অতিশয় মিলিয়াছিল। কীর্ত্তনীর কোমল প্রাণে তাহা বাজিয়াছিল। সে হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক কহিল, 'কর্ত্তারা হরিবোল দিন্, হরিবোল দিন্।'

তর্করত্ন। (ব্যগ্রতাসহকারে) তার পর?

আম্রভোজী। সেই হরিবোলই শেষ। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গর্দ্দভ লুটাইয়া পড়িল। তাহার দিব্য দেহ ক্রমে আমাদিগের বৈঠকখানার ছাতের শালিকের বাসার মধ্য দিয়া, পরে আলিসার উপর উঠিয়া, আম্র-

কানন ভেদ করিয়া পরমানন্দাবস্থায় আকাশে উঠিতেছিল। কেবল মৃত্যুমূর্ত্ত-প্রমাণ অনন্ত আত্মা, কেবল দুটি চক্ষু! কেবল দুটি চক্ষু! ভারতবর্ষীয় নূতন চিত্রকলাপদ্ধতির মত সুন্দর চক্ষু!

৩

প্রায় মেমারী ষ্টেশন পার হইতে চলিল। অভিনয় জমিয়া গিয়াছে। নারদ ঋষি ঝুঁটা গোঁফ উত্তোলনপূর্ব্বক বিকটাকার পুরুষের হুঁকায় তামাক টানিতেছেন। নারদ ঋষি বহু পুরাতন এবং সনাতন পুরুষ, বাঙ্গালীর আদর্শ ঋষি; হরিনাম করিয়া ঝগড়া বাধানো স্বভাব, ঈশ্বরত্বের মধ্যে কিরূপে সুন্দর-ভাবে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, তাহা কেবল কলিকাতার কবিগুরু মহাশয় ও বাদরায়ণ ব্যাস দেখাইয়াছেন।

এক জন সখী বিড়ি টানিয়া জামাতাকে বরণ করিতেছিল। মহেশ্বরের বিবাহ। বিকটাকার পুরুষ দক্ষের 'পার্ট' লইয়াছে। ভুঁড়িযুক্ত-কলেবর দেখিয়া মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকে শিব সাজানো হইয়াছে। সে বড় খুসী। 'তবে হামি পিঁড়ির উপর চড়িতে পারিব না, বাঙ্গালীর স্কন্ধে হিন্দুস্থানীর হারোহণ হেকটা নূতন ব্যাপার।' বংশী বলিতেছিল, 'প্রেমের বাজারে হোটা হইয়া থাকে, তুমি কেবল স্বদেশী কাপড় ব্যাচ।'

বিকটাকার পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, হঠাৎ ঘন মেঘ হইয়া ঝড় উঠিল। সন্ সন্ শব্দে বাত্যা বহিল। রেলগাড়ীর গতি মৃদু হইয়া আসিল। তর্করত্ন কহিলেন, 'ভোলানাথের বিবাহের সময় ঝড়বৃষ্টি শাস্ত্রসঙ্গত।'

বংশী। গিরিরাণী কই?

সখীগণ। গিরিরাণী সাজিবার লোক নাই। দক্ষরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

দক্ষরাজবেশী বিকটাকার পুরুষ বলিল, 'সে রমণীটি কোথায়?'

রমণী অনেকক্ষণ ধরিয়া বিকটাকার পুরুষের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বংকের উপর হইতে সবডেপুটী কহিলেন, 'ধর! স্ত্রীলোকটি শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।' বাস্তবিক, ভয়ানক দুর্য্যোগ রাত্রি, এবং বাস্তবিক, রমণীর নিশ্বাস ঘন হইয়া আসিল।

বংশী। বোধ হয়, মা'র মৃগী রোগ ছিল। এখন একটা উপায় কর

নচেৎ গাড়ীতে জন্ম মৃত্যু উভয়ই বিপজ্জনক। বেমারীতে নামাইয়া দিলে অনাহারে মরিবে। আর অনাহারে মৃত্যু হইলে ইহকালে পরকালে সদ্গতি নাই।

প্রোফেসার। উহার নাকে মুখে প্রথমতঃ জল দাও।

বংশী সুরাই হইতে জল লইয়া সেচন করিতে গেল।

বিকটাকার পুরুষ গর্জ্জন করিয়া কহিল, 'উহাঁকে স্পর্শ করিও না। ধর্ম্ম সাক্ষী, উনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।' তখন দক্ষবেণী পুরুষ ক্রন্দন করিতে করিতে ডাকিল, 'গিরিবালা! হায় গিরিবালা! তোমার এই দশা! হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! হায় গিরি! অবশেষে তোমার রেলগাড়ীতে মৃত্যু, আর আমি নরাধম পাষণ্ড দাঁড়াইয়া তামাক টানিতেছি!' (ঘোররবে ক্রন্দন)

সবডেপুটী। ব্যাপারটা কি?

অনেকে বলিল, 'ভাব লাগিয়াছে।' কিন্তু বিকটাকার পুরুষ আর্ত্তস্বরে বিনীতভাবে বুঝাইল, 'মহাশয়গণ, আমি পাগল নহি, সত্য কথা কহিতেছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, নিবাস পোড়াদহ। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখা করিতাম। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে শেষ দেখিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম যে, গ্রামে মহামারী হইয়া উহাদের বংশে কেহ অবশিষ্ট ছিল না।'

প্রোফেসার। বোধ হয় 'বঙ্গবাসী'তে পড়িয়াছিলেন?

বিকটাকার পুরুষ। 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী', সব কাগজেই বাহির হয়।

প্রোফেসার। তখনই জানা উচিত ছিল যে, সকলই মিথ্যা! ও সব মিথ্যা খবর কেবল বঙ্গসন্তানের হৃদয়ে দয়াধর্ম্মাদির উদ্রেকের জন্য বাগবাজারে ও গ্রে ষ্ট্রীটে তৈয়ারি হয়।

বিকটাকার পুরুষ। কিন্তু হায়! আমার হৃদয়ে দয়াধর্ম্ম কোথায়? আমার চারিটি স্ত্রীর মধ্যে ঐ অবশিষ্ট ছিল। সেও গেল। আমার স্বভাব বিগড়াইল। চেহারা গেল, চরিত্র গেল, স্বাস্থ্য গেল, শক্তি গেল, বন্ধু গেল, কর্ম্ম গেল, সকলই গেল। মান সম্ভ্রম বর্জ্জন করিয়া বিকটবেশে পাঁচ বৎসর কেবল রেলে তামাক সাজিয়া খাই।

তর্করত্ন। আপনি কিছুকাল 'aerated water' বিক্রয় করিতেন না?

বিকট পুরুষ। হাঁ, কিন্তু তাহাতে লোকসান হইল। হায়! আমি কি পাপী! গিরি! গিরি! চাহিয়া দেখ, নবদ্বীপের বলরাম তোমার সম্মুখে।

সেই পুরাতন মুখ! সেই দীর্ঘ কেশ, সেই দুঃখক্লিষ্টা বঙ্গবধূর কাতর, হতাশ, নির্ম্মল চাহনি! গিরি, একবার ওঠ!

বংশী। ওহো! সে ছেলেটি কই?

রমণীর পুত্রসন্তানের কথা কাহারও মনে ছিল না। অভিনয়ের সময় বালক বেঞ্চের তলে গিয়া তিনছড়া কদলী খাইয়া ও মাড়োয়ারীর ওলের আচার চাটিয়া সাবাড় করিয়াছিল। হঠাৎ মাতার মূর্চ্ছা দেখিয়া বাহিরে আসিল।

মাড়োয়ারী ঘোর-গর্জ্জনে কহিল, 'তুই আমার হাচার মারিয়া দিয়াছিস্।' এই বলিয়া বালকের কর্ণ ধরিল। বালক কাঁদিয়া ডাকিল, 'মা!' মা কহিল, 'বাবা! বাপধন, তোমার বাবাকে প্রণাম কর।'

বালক ভ্রমক্রমে মাড়োয়ারীকে প্রণাম করিতে গেল; তাহা দেখিয়া বিকটাকার পুরুষ বিলক্ষণ গুঁতা মারিয়া মাড়ওয়ারীকে নিরস্ত করিয়া কহিল, 'বাছা, আমার কোলে আয়, তুই আমার হারাধন।'

বাস্তবিক, পিতার মত পুত্রের মুখ হুবহু। সেই ভ্রূ, সেই সুগোল কর্ণ, এবং বড় বড় দন্ত। আমরা সকলে গিয়া পরীক্ষা করিলাম। সবডেপুটী করিলেন; তর্করত্ন, বংশী প্রভৃতি সকলে পরীক্ষা করিল। কি সুন্দর প্রমাণ! কথা সত্য, সম্বন্ধ সত্য, পিতার হৃদয়ের অনুতাপ সত্য, মাতার মিলনের হর্ষ সত্য, পুত্রের নির্ব্বিকার ভাব সত্য! এ জগৎ মিথ্যা বলে কে?

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকে শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ ঘটনাটা বুঝাইয়া দেওয়াতে সে নিতান্ত লজ্জিতভাবে কহিল, 'হামার অপরাধ হইয়াছে, পুত্রকে আরও কিছু খাইতে দেও।'

'হায় রে কাঙ্গালীর ধন, তুই এতদিন নিরাহারে ছিলি, আর খাস্‌নে।'

মাতার এই সকরুণ সাবধান-বাণী শ্রবণ করিয়া প্রোফেসার কহিলেন, 'এই বিরাট বিশ্বমাঝে মাতৃস্নেহটাই ঈশ্বরের প্রবল প্রমাণ। প্রকৃতি আছে সত্য, কিন্তু স্নেহের বন্ধন, পাশববুদ্ধি, এ সকলের মূল কি?'

তখন রমণী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া স্বামীর নিকট বসিয়াছে। পিতা পুত্রকে ক্রমশঃ প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসিতেছে। রমণী তাহাই দেখিয়া জীবনের বহু দুঃখ ভুলিতেছিল। বংশী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'মা জননী! তুমি সাঁইথে যাইতেছিলে কেন?'

রমণী। সেখানে আমার মামার বাড়ী। মামা হারাধনকে বোল্‌পুরের ঋষির আশ্রমে এইবার ভর্ত্তি করিয়া দিবেন।

প্রোফেসার। অতি উপযুক্ত প্রস্তাব। ছেলেটির যে রকম নির্ব্বিকার ভাব, আশ্রমে থাকিলে যেটুকু মলিনত্ব আছে, ঘুচিয়া যাইবে।

তর্করত্ন। ছেলেপুলেরা চুরী করিয়া খায়, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু অনেক বৃদ্ধকে চুরী করিয়া খাইতে দেখিয়াছি।

তর্করত্ন একটা গল্প ফাঁদিবেন, এমত চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেল। অর্থাৎ, সেই অমায়িক যুবাপুরুষ, রমণীর অকস্মাৎ মূর্চ্ছাকালে 'ওয়ার্নিং বেল্' ধরিয়া আকর্ষণ করাতে গার্ড সাহেব বাষ্পীয়-শকটের গতি রুদ্ধ করিয়া একেবারে আমাদের কামরায় আসিয়া উপস্থিত!

'কোন্ বেল খীচা?'

অমায়িক। হাম্। ঐ স্ত্রীলোকটী মূর্চ্ছা গিয়াছিল।

সকলে বলিল, 'সত্য।' কিন্তু মূর্চ্ছার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া গার্ড সাহেব রাগিয়া বলিলেন, 'সব ঝুটা বাত, তোমাকে আমি 'প্রসিকুট' করিবে।'

একটা ফৌজদারীর সূত্রপাত দেখিয়া সবডিপুটী মহাশয় উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, 'You know I am Sub-Deputy Magistrate of——— I try Railway cases; this lady had hysteric fits.'

গার্ড। But where is the proof?

মহা তর্কবিতর্ক বাধিয়া যাওয়াতে বংশী সেই রমণীর নিকট গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'মা! অনুগ্রহপূর্ব্বক আর একবার মূর্চ্ছা যান্।' রমণীর স্বভাবতঃ দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু বংশীর কথায় উপক্রম বন্ধ হইয়া গেল।

ফলতঃ অমায়িক যুবাপুরুষ গার্ড কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া 'ব্রেকভানে' চালিত হইলেন। আমরা সকলে কহিলাম, 'ভয় নাই, সাক্ষী দিব।'

সবডিপুটী। কোনও ভয় নাই।

যুবা। মনে থাকে যেন, কালী মিত্তির আমার পিশে মহাশয়।

সেই কথা বারংবার মনে করাইয়া যুবা চলিতেছিল। অন্ধকার রাত্রি, পুনরায় বৃষ্টি আসিল। রেল পুনরায় চলিল। ক্রমে আমরা নিদ্রাভিভূত হইলাম।

আমার মনে ছিল, কালী মিত্র।

সবডেপুটী মনে করিয়া রাখিলেন। কিন্তু কোথাকার কালী মিত্র, তাহা তখনও স্থির হয় নাই। তর্করত্ন কহিলেন, 'মা কালীকে মনে রাখিলেই হইবে।'

কবিতা-বিদায়।

১

যাবে কি একান্ত তবে—যাবে তুমি প্রিয়া ?
সকলি কি ফুরা'ল চকিতে ?
জীবনের সব সাধ, সব প্রেম দিয়া,
তবু আমি নারিনু রাখিতে ?
চাহি নি জগৎপানে, তোমারে চাহিয়া
আজীবন দেখেছি স্বপন ;
আজ—জগতের দ্বারে, কার কাছে গিয়া
কি মাগিব ? সবই যে নূতন !

২

তোমার নয়ন হ'তে ফিরালে নয়ন,
এ জীবন শূন্য মনে হয় !
কোথা উষা, কোথা আলো ! কেবল দহন ;
কোথা শোভা বিকাশ-বিস্ময় !
কোথা শশি-তারা-ভরা নিথর আকাশ,
চিরস্থির পূর্ণিমার রাত !
জীবনে মরণে সেই গভীর বিশ্বাস,
অলক্ষ্যে অপ্সরা-যাতায়াত !

৩

বিচ্ছিন্ন সাধনা আজ—অদৃষ্টে আশ্রয়,
গেছে স্বর্গ সরি' বহু দূরে !
নাহি দেহে বসন্তের আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়—
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে সুরে ।
সে মত্ত হৃদয় নাই—সৌন্দর্য্যে উচ্ছল,
সর্ব্ব বিশ্বে আছাড়িয়া পড়ি !
সজীব নির্জীব নাই—কল্পনা-বিহ্বল,
সর্ব্বভূতে আপনা বিতরি !

৪

সে পূত মাহেন্দ্র-ক্ষণে যে দাঁড়া'ত আসি—
হোক্ চিত্রে মূর্ত্তিতে সঙ্গীতে,
দিয়া নিজ আশা ভাষা, প্রেম রাশি রাশি,
মজিতাম তাহারি ভঙ্গিতে!

দিতাম নয়নে তার আমার চেতনা,
হৃদ্-রক্তে রঞ্জিয়া কপোল—
লতিকার নব পর্ণে পুষ্প-সম্ভাবনা,
সৌন্দর্য্যের বিচিত্র হিল্লোল!

৫

তুমি শব্দে ভাবে ছন্দে কেন এসেছিলে,
নত-মুখী নবীনা ললনা?
দেখি নি—ভাবি নি কিছু আমি যে অখিলে,
বুঝি নাই নারীর ছলনা!

ত্রস্তে ব্যস্তে প্রেম-মালা পরাইনু গলে,
আশার কিরীট দিনু শিরে;
ইহ-পরকাল মম দিয়া পদতলে—
আজ আমি কোথা যাব ফিরে'?

৬

সে নবযৌবন-মোহে নিজ প্রাণ দিয়া
জড়ে কেন দেই নি চেতনা?
দৃষ্টিহীন নেত্রে—চির রহিত চাহিয়া
আমার সে প্রথম কামনা!

কেন অঙ্গে অঙ্গে তার দেই নি ছড়ায়ে
আমার সে হৃদয়-স্পন্দন?
আপনার বাহুপাকে আপনা জড়ায়ে
দেখি নাই প্রেমের স্বপন?

সরস্বতী।

উমা-মহেশ্বর

৭

আজন্ম তপস্যা-ফলে লভি' উপহাস—
তবু কেন বিরহ-বেদন ?
মাদকতা-অবসাদে মাদক-পিয়াস,
ভ্রম-ভঙ্গে ভ্রম-অন্বেষণ !
কোথা তুমি, মহাশ্বেতা, অচ্ছোদের তীরে
ল'য়ে তব অক্ষয় যৌবন !
কেন আর, কাদম্বরী, মৃত চন্দ্রাপীড়ে
স্মর-ভ্রমে করিছ চুম্বন !

৮

যাও তবে, প্রাণাধিকা, মুছিনু নয়ন,
রুদ্ধ অশ্রু চিররুদ্ধ থাক্ ।
বৃথা বিদায়ের ছল, নিঃশ্বাস সঘন—
বাক্যাতীত এ যন্ত্রণা বাক্ ।
কেন আর প্রবোধন—হ'য়ো না নিষ্ঠুর,
আমি অতি কৃপাপাত্র—দীন !
তোমার বিজয়-গর্ব্বে আজি শত-চূর
আমার সে হৃদয় নবীন ।

৯

যাও তবে ! মৃত্যু পরে যদি দেখা হয়,
ভুবর্লোকে—কাশ্যপ আশ্রমে !
ক্ষৌমবাস-অন্তরালে কম্পিত হৃদয়—
অভিমানে, লজ্জায়, সম্ভ্রমে !
কৌতুক মানস-পুত্র সম্বন্ধ জিজ্ঞাসে—
নিজ ভাগ্যে করি' নিন্দাবাদ,
নারীর সরল-প্রেমে সহজ-বিশ্বাসে
ক্ষমিবে কি সর্ব্ব অপরাধ ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ।

বঙ্গের ভাস্কর্য্য।

বহুদিন—বহুদিন পরে, প্রায় সহস্র বৎসর পরে আবার দেখিলাম, নয়নময় হইয়া, বাঙ্গালার অতীত কীর্ত্তির চিতাচুল্লী হইতে সমাহৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের পরিদর্শনের ন্যায়, আবার দেখিলাম!

পুরাণে পাঠ করিয়াছি যে, ব্রজবরবরবল্লবীগণ সহস্র বৎসর বিরহব্যথা ভোগ করিয়া, প্রভাসতীর্থে আবার কৃষ্ণসন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সে মিলন অপূর্ব্ব; মনুষ্যের রচিত কাব্যগাথায় বুঝি বা তেমন মিলনবার্ত্তা আর কেহ লেখে নাই। তাহাতে শোক আছে, ক্ষোভ আছে, আর আছে যুগে যুগে সঞ্চিত, বিরহনির্ম্মলীকৃত মিলন-আকাঙ্ক্ষার তটিনীতরঙ্গকল্লোল।

ইতিহাস-পাঠে বুঝিয়াছিলাম যে, ছিল এক দিন, যে দিন বাঙ্গালী মানুষের মতন মানুষ ছিল; ছিল একদিন, যে দিন বাঙ্গালার প্রতিভা ও মনীষা জগজ্জ্যোতিঃ রূপে আর্য্যাবর্ত্তকে সমালোকিত করিয়া রাখিয়াছিল; বাঙ্গালার প্রদীপ ভারতের সন্ধ্যাপ্রদীপতুল্য কালতটিনী কালিন্দীর কূলে টিপি টিপি জ্বলিতেছিল। হায়! সে প্রদীপদ্যুতিও নির্ব্বাপিত হইয়া বিস্মৃতির পুঞ্জীকৃত তমিস্রায় জাতি-প্রাঙ্গণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যে মানুষের বংশধর, তাহাও ভুলিয়াছিলাম; আমরা যে জাতির বনীয়াদ, তাহাও জানিতাম না; আমরা যে বিদ্যার ও চতুঃষষ্টি কলার মন্ত্রধারী, তাহাও ভুলিয়াছিলাম। সব ভুলিয়া, কীট পতঙ্গের দলে মিশিয়া, মোহমদিরায় মুগ্ধ হইয়া দেহভার বহন করিতেছিলাম।

রামপুর বোয়ালিয়ার প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। সহস্রবর্ষব্যাপী গুরুবিরহের সুবিরতা দূর হইয়াছে। দেখিয়াছি, বরেন্দ্রের ব্রজমণ্ডলে বঙ্গীয় মানবতা স্থলকমলগঞ্জন অপূর্ব্ব বিভায় কেমন বিকশিত হইয়াছিল; বুঝিয়াছি, যাহাদের চিতাচুল্লী হইতে এমন অর্দ্ধদগ্ধ চন্দনকাষ্ঠ সমাহরণ করা যায়, তাহাদের বীর্য্য ঐশ্বর্য্য কেমন অরুণ-কিরণে শত ময়ূখ-মালায় প্রাচীগগনোপান্তকে সমুদ্ভাসিত করিতে পারে; জানিয়াছি, মাতা ধরিত্রী সহস্রবৎসরকাল যে চিতাভস্মরাশি কুক্ষিগত করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, তাহা ভস্ম নহে, বাঙ্গালার বিভূতি; সেই বিভূতিভূষণকে অঙ্গরাগ করিতে পারিলে আবার বাঙ্গালী শবসাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি-বিন্যস্ত প্রদর্শনী বাঙ্গালার প্রভাসক্ষেত্র; অতীত ও

বর্ত্তমানের সঙ্গম, অনাগতের দ্যোতক। গতঘনা যমিনীর চন্দ্রিকাদীপ্তি যেমন নিরাবিল, অপসারিতবিস্মৃতিকুজ্ঝটিকায় আত্মানুভূতির দ্যুতিও তেমনই নিরাবিল। নিশাবসান হয় নাই বটে, পরন্তু মুদিতার হ্লাদিনী লোহিতাভা চক্রবালকে রক্তিমরঞ্জিত করিয়াছে; একনিষ্ঠার শুক্রতারা স্বমস্তকের ন্যায় আকাশের নীলবক্ষে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঐ শুন, আশা-পিক পঞ্চম তানে জাগরণের গান ধরিয়াছে।

দেখিয়াছি, শুনিয়াছি,—বুঝি বা কচিৎ কদাচিৎ অতীতের অশরীরিণী বাণীর মর্ম্মানুভব করিয়াছি—প্রভাসে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভয়বার্ত্তা, মিলন-সমাচার কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছি। সে কথা শুনাইবার জন্য, সহস্রবর্ষব্যাপী গুরুবিরহের পর অপূর্ব্ব মিলনের আলেখ্য দেখাইবার জন্য, প্রাণে কাতরতা জন্মিয়াছে। একবার শুন, একবার দেখ,—বাঙ্গালী যেমন ভাবে শুনিলে সব শুনিতে পায়, বাঙ্গালী যে নয়নে দেখিলে সব দেখিতে পায়, তেমনই শ্রবণময় ও নয়নময় হইয়া আমার ভাববিহ্বল অস্ফুট ভাষা ও আমার আশাসুখকম্পিত-লেখনী-লিখিত আলেখ্য শুন ও দেখ; আমার বাঙ্গালী-জন্ম সার্থক হউক।

প্রদর্শনী।

সম্মুখেই বাঙ্গালার পালরাজগণের মকর তোরণ, বা বিজয় তোরণ। নবদ্বীপের কারিকর গঙ্গার মাটী দিয়া পুরাতন বিজয় তোরণের অনুরূপ একটি অপূর্ব্ব তোরণ গড়িয়াছে। ইহা কেবল তোরণই নহে; পুরাকালের সকল বিগ্রহের ও শ্রীমূর্ত্তির শোভামণ্ডল বা ছটারূপে ইহা ব্যবহৃত হইত। এই তোরণই সেকালের প্রতিমার "চালচিত্র" ছিল। দুই দিকে দুই স্তম্ভ; স্তম্ভগাত্রে দুই ভীমকায় প্রহরী দণ্ডায়মান; এই স্তম্ভযুগলের উপর অর্দ্ধবর্ত্তুলাকারে কতকটা বা ধনুরাকারে প্রভামণ্ডল বিন্যস্ত। মণ্ডলের চূড়ায় কীর্ত্তিমুখ। কীর্ত্তিমুখ যে কি, তাহা আধুনিক বাঙ্গালীকে কেমন করিয়া বুঝাইব? সে রেখাবন্ধুর ভালতল, সে ভ্রূকুটীকুটিলসম্বদ্ধ দার্ঢ্যের ভীমবিকাশ, সে দন্তেদন্তনিবদ্ধ ভৈরব হুঙ্কারের অভিব্যঞ্জনা, সে অমানুষ-অপাশব বদনায়তনের বিভীষণ বিস্তার যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিতেই পারে না। যেমন এখনও উদয়পুরের সূর্য্যবংশীয় শিশোদীয় রাণাগণের পশ্চাতে সূর্য্যমুখ বিস্তার করিয়া সাম্রাজ্যাধিকারের দ্যোতনা বিকাশ করা হয়, এই কীর্ত্তিমুখও তেমনই বোধ হয়, গৌড়-প্রাধান্যযুগে গৌড়ীয় সম্রাটদিগের পশ্চাতে প্রকট করিয়া

গৌড়প্রাধান্তের ইঙ্গিত করা হইত। কীর্ত্তিমুখের দুই পার্শ্বে তোরণস্তম্ভের দুই কলায় দুইটি কিন্নরী যন্ত্রহস্তে বন্দনাগীতি করিতেছে। কিন্নরীদিগের নিম্নে প্রস্তারগুলের শেষ কলায় দুই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি। স্তনভারানমিতাঙ্গী, প্রসন্নবদনা ষোড়শী হেলায় যেন সিংহারূঢ়া হইয়া আছেন; অথচ সিংহ মত্তমাতঙ্গমথনকারী;—গ্রীবা হেলাইয়া সম্মুখের পদযুগলে দেহশক্তি কেন্দ্রীকৃত রাখিয়া সিংহ মাতঙ্গ দমন করিতেছে। এই দুই সিংহবাহিনীর নীচেই দৌবারিকযুগল। এই ত তোরণ-বিন্যাস। উহার চারিধারে লতাপাতা ফলফুলের লেখা। সে লেখা অতিসুন্দর, অতি কোমল। কঠোর উপলগাত্র যেন ভাস্কর্য্যের মোহময়ী মাধুরীর প্রভাবে সমুন্নত—প্রফুল্ল।

অঙ্গন।

এই তোরণ দেখিয়া, অতীতের শ্লাঘাময়ী স্মৃতির ভারে কতকটা অবনত হইয়া, "পব্‌লিক লাইব্রেরী"র অঙ্গনে প্রবেশ করিতে হয়। নানা পুষ্পিত গুল্ম লতায় ছায়াময়মান সে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ যেন বাঙ্গালার—গৌড়ের অতীত গৌরবের শ্মশানক্ষেত্র। চারি দিকেই ভগ্ন, খণ্ড, হস্তপদাদিশূন্য, কবন্ধ প্রস্তরপ্রতিমা সকল সাজান—বসান আছে। সম্মুখে স্তম্ভ ও রাজভবনের অংশ সকল একত্র সজ্জিত। দেখিলে হৃদয়ের শোণিত উথলিয়া উঠিয়া বাষ্পাকারে নয়ন ভরিয়া দেয়। ঐ উত্তর দিকের প্রাচীরসংলগ্ন বিশাল বিষ্ণু-মূর্ত্তি, কষ্টি পাথরকে যেন ছানিয়া ছাঁদিয়া সজীব নরাকারে পরিণত করা হইয়াছে। ঐ দূরে কামিনী বৃক্ষের তলে আর একটি ভগ্ন খণ্ড প্রতিমা যেন কঠোর কালের জ্বালায় অধীর হইয়া ঘনবিন্যস্ত কামিনী-ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে—যেন দর্শককে ইঙ্গিতে বলিতেছে, একদিন এই কামিনী-কুসুমের মত আমারও পুণ্যপূত সৌরভরাশি দিগ্দেশকে আমোদিত করিয়া রাখিত, একদিন অগণিত পূজকগণ আমারই শীতল আশ্রয় বাঞ্ছা করিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে জুড়াইবার জন্য আমারই মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত। এমনই ভাবে কত প্রতিমা কত দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার হিসাব করিতেও ইচ্ছা করে না, তাহার প্রত্যেকের বিবরণ লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়; কেন না, সে বিবরণ-কাহিনীতে সহস্রবর্ষব্যাপী জাতীয় জাড্য ও বাঙ্গালীর বিমূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি একটু হিসাব দিব। প্রদর্শনীর অঙ্কানুসারে সামান্য পরিচয় দিব।

১০৩।—একটা বিরাট বিষ্ণুমূর্ত্তির বেদী। এই বেদীতে গরুড়ের মূর্ত্তি

অঙ্কিত আছে। প্রস্তরের ক্ষোদিত গরুড় কালপ্রবাহে অপচিতকায় হইয়াছে। না জানি ইহা কত কালের! ইহা রাজসাহী জিলার গোদাগাড়ীর নিকট জাহানাবাদ গ্রামে মাটীর নীচে পাওয়া গিয়াছে।

৬৪।—একটা বিশালস্তম্ভের অধিষ্ঠান-প্রস্তর বা আসন। ইহা দিনাজপুর জিলার বাণনগর হইতে পাওয়া গিয়াছে। বাণনগর পুরাণ-কথিত গ্রাম; ইহার অন্য নাম শোণিতপুর, কোটিবর্ষ, উমাবাণ ও দেবীকোট। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, মহাপুরুষ মণ্ডীশ্বর, যিনি শিবের পঞ্চবিংশ অবতার বলিয়া পূজ্য, তিনি এই নগরে বাস করিতেন। দিনাজপুর-রাজের উদ্যানে এই বাণনগর হইতে প্রাপ্ত স্তম্ভ বেদী আদি রক্ষিত আছে। উহার একটি স্তম্ভে লিখিত আছে যে, কাম্বোজবংশীয় গৌড়রাজ গত ৯৬৬ খৃঃ অব্দে বাণনগরে এক বিশাল শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

৮৮।—বিজয়নগরের রাজা বিজয়ের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত একটি স্তম্ভের আসন। বিজয়নগর রাজসাহী হইতে প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেনবংশীয় রাজগণের প্রথম বিজয় সেন এই নগরে বাস করিতেন। তিনি খৃঃ অব্দ ১১২০ হইতে ১১৫০ এর মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। পবনদূতম্ কাব্যে বিজয়নগর 'বিজয়পুরী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৪।—প্রস্তর নির্ম্মিত কার্ণিষের এক অংশ। রাজসাহী হইতে সাত মাইল দুরবর্ত্তী দেবপাড়া হইতে প্রাপ্ত। বোধ হয়, ইহা প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের অংশ। একটি সরোবরের তীরে ধ্বংসাবশেষের স্তূপ এখনও বিদ্যমান। এই সরোবরকে স্থানীয় লোকে এখনও পদ্মসর বলে।

৪২।—বগুড়া জিলার মহীপুর গ্রাম হইতে আনীত একটি স্তম্ভাসন। প্রবাদ এই যে, এই মহীপুরই মহীপাল রাজার রাজধানী ছিল। তিনি প্রায় খৃঃ অব্দ ৯৮০ হইতে ১০২৮ এর মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন।

৪৫।—একটি স্তম্ভের ভগ্নাংশ। বগুড়ার বালিগ্রাম হইতে প্রাপ্ত। ইহাতে লেখা আছে যে, প্রহসিত শর্ম্মা নির্ম্মাণ-কার্য্যের অধিনায়ক ছিলেন। শর্ম্মা যখন, তখন জাতিতে ব্রাহ্মণ; সেই ব্রাহ্মণ রাজার ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। কে তিনি?

৮৫।—সূর্য্যমূর্ত্তি; রাজসাহী জিলার থানা বাগমারার অধীন একটি গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

৪৬।—স্তম্ভের নিম্নাংশ। দিনাজপুর জিলার জগদ্দল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। এই জগদ্দলই বৌদ্ধযুগের জাগদ্দল মহাবিহারের স্থান। এই প্রস্তরখণ্ড সেই মহাবিহারের অংশ নিশ্চয়ই।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। একটি দরজার গোব্‌রাট বা কন্‌কাট আছে। যাহার দ্বারের প্রস্তর এত বড়, না জানি সে মন্দির কত বড় ছিল!

গাড়ী-বারান্দা।

পবলিক লাইব্রেরীর গাড়ী-বারান্দার স্তম্ভ ও প্রাচীরের গাত্রে অপূর্ব্ব সামগ্রী সকল লটকাইয়া রাখা আছে। সে কালের তান্ত্রিকী উপাসনা ও পূজা-বলিদানের তৈজসপত্র, খাণ্ডা প্রভৃতি রহিয়াছে। খাঁড়া দুইটি বিশাল। যাহারা এই খাঁড়া তুলিয়া মহিষ বলিদান করিত, না জানি তাহাদের দেহে কত বল ছিল! খাঁড়া দুইটিরই হাতীর দাঁতের মুঠ ও গড়ন দেখিয়া মনে হইল, দুইটিই তন্ত্রের হিসাবে ভৈরব খাণ্ডা, উহাতে নরবলিও চলিত। শুনিলাম, এই খাঁড়া দুইটি নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণের ছিল। একখানা পিতলের থালা ওজনে এক মণ দেড় মণ হইবে! একটা মানুষ ঐ থালার মধ্যে বেশ শুইয়া থাকিতে পারে; বুঝুন, থালাখানা আকারে কত বড়। তামার পুষ্পপাত্রটিও একটি বিরাট কাণ্ড। তার পর কোষা কুষী; সে কোষা তুলিয়া যাহারা পূর্ণার্ঘ্য দিত, তাহাদের কব্জীর জোর কতটা ছিল! নিরেট তামার প্রায় ছয় সাত সের ওজনের কোষা দেখিয়া মনে হইল, ইন্দ্রজিৎ বোধ হয় এমনই একটা বিরাট কোষা দিয়া লক্ষ্মণকে আঘাত করিয়া থাকিবেন। ইহার পর টেবিলের উপর আরতির পঞ্চ-ঘণ্টা, বিজয়-ঘণ্টা, পঞ্চ-প্রদীপ ও বিজয়-প্রদীপমালা সাজান আছে। বাম হস্তে সেই পাঁচ সেরা ঘণ্টা তুলিয়া দশ সের ওজনের বিজয়-প্রদীপমালা লইয়া কেমন ব্রাহ্মণে দয়াময়ীর আরতি করিত? সে সকল পূজারী ব্রাহ্মণদের কেমন দেহ ছিল? আমরাও ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ করা অভ্যাস ছিল, দেহে কিঞ্চিৎ বলও ছিল। তুলিয়া দেখি, ঘণ্টা নাড়িতে কব্জি ফাটিয়া যায়! অতিবলবান মল্ল ব্রাহ্মণ না হইলে এমন অতিকায়, অতিভার তৈজসপাত্র লইয়া পূজা করিতে পারিত না। অথচ পূজা করিতেন কোটীশ্বর নাটোরাধিপ। সে কালের ধনীরাও পুরুষসিংহ ছিলেন। সে এক কোষা কারণ পান করাও ত সহজ কলেজার কাজ নহে!

সিঁড়ির উপরেই বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটি শ্রীমূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি দুইটি মাটীর তৈয়ারী, কিন্তু মসীলেপে কষ্টি পাথরের আকার ধরিয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি দুইটি অতি সুন্দর গড়া হইয়াছে। উপরের ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি প্রভৃতি সকলগুলিই মোগলাই আমোলের। এইখানে দুইটি মানচিত্র আছে। একটি ভারতের, অপরটি বাঙ্গালার। ভারতের জাতি-বিচার অনুসারে মানচিত্রের রং ফলান হইয়াছে, এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ বাঙ্গালার, বিশেষতঃ বরেন্দ্রভূমের যে সকল পুরাতন স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাহারই নির্দ্দেশ-সমন্বিত বাঙ্গালার মানচিত্র। এইখানে কার্পেট, পাপোষ প্রভৃতি যাহা কিছু সাজান আছে, সে সকলই মোগল্যই আমলের, একটিও আধুনিক নহে।

হল বা প্রধান কক্ষ।

এইবার পবলিক লাইব্রেরির হলে প্রবেশ করিতে হইবে। সে হল এখন অপূর্ব্ব যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গালার যাদু ঐ ঘরে সাজান আছে। ধরাসুন্দরী এতকাল সে যাদু মৃত্তিকার আবরণে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; যখন তিনি দেখিলেন যে, বাঙ্গালী পূর্ব্বপরিচয় জানিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে, অতীতের যাদু অপসারিত করিয়া পিতৃ-পরিচয় প্রকাশ করিবার যোগ্য হইয়াছে, তখন সে মৃত্তিকার যাদু-আবরণ দূরে ফেলিয়া দেশমাতৃকা স্বীয় জঠরগত অপূর্ব্ব সামগ্রী উপঢৌকন দিয়াছেন। একবার দেখ বাঙ্গালী, তোমার গৌরবগরিমামণ্ডিত অতীত বিস্মৃত বিদ্যার দ্যুতিচ্ছটা একবার দেখ! এইখানে বাঙ্গালার কোমল কমনীয়তা সঞ্চিত রহিয়াছে; এইখানে বাঙ্গালীর ভাবমাধুরী সাজান রহিয়াছে। একবার দেখ! ইহা আর কাহারও নহে, ষোল আনা তোমারই। খাঁটী নির্ভাজ বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে! এইখানেই ধীমানের ধীশক্তির বিভা, বীতপালের নির্ম্মাণচাতুর্য্য পরিস্ফুট। তাহারা সব কেমন বাঙ্গালী ছিল!—যাহারা পাথর কুঁদিয়া দেবতা বাহির করিয়াছে! যাহারা শীতল, স্থবির, বন্ধুর অশ্ম-দেহ হইতে সজীব, ভাবোষ্ণ, আসক্তি-মুখর দেবদেহ গড়িতে পারিয়াছে? সহস্র বৎসর কালের সর্ব্বসংহারিণী-শক্তিনিচয় এই সকল বিগ্রহমূর্ত্তির উপর খেলা করিয়াছে, জলবায়ু-তাপের ক্রিয়া সমভাবে চলিয়াছে; তথাপি সে সব যেন জীয়ন্ত প্রতিমা, এই যেন ভাস্করের তৈলাক্ত হস্ত হইতে ছিনাইয়া আনা হইয়াছে! তোমরা

কি তাহারা? না তাহাদের? বল না—এই কি সেই বাঙ্গালা? সেই বাঙ্গালী?

হলের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড টেবিল। ইহার উপরে অতি পুরাতন ও জীর্ণ পুঁথি সকল সাজান রহিয়াছে। সংখ্যায় পাঁচ শতের অধিক হইবে। ইহার মধ্যে সারদাতিলক তন্ত্র ও উহার তিনখানি টীকা দেখিলাম। ইহা ছাড়া তন্ত্রের অনেক লুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি দেখিলাম। দেখিয়া মনে হইল, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ তন্ত্র-তথ্য জানিলে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল অঙ্ক লিখিয়া যাইতে পারিবেন। তন্ত্রের সাধনার ও উপাসনার অঙ্গ এখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝে না, বুঝিতে জানে না; তন্ত্রের উদার-উন্নত সমাজ-ধর্ম্মের মহিমা বাঙ্গালার নবীন শিক্ষিত-সমাজ বিস্মৃত হইয়াছেন,তাই পুরাতন বাঙ্গালী সমাজকে তাঁহারা এখন আর চিনিতে পারেন না। তন্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বাঙ্গালার আধুনিক বিদ্বজ্জন-সমাজে ব্যাখ্যাত হইলে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর পুরাতন কাহিনী সুধীমাত্রই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। তখন আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গানের মহিমা বুঝিতে পারিব, ভগবানের মাতৃত্বের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিব। ইহার সঙ্গে যখন দেখিলাম, বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য্য জিনেন্দ্রবুদ্ধি বিরচিত কাশিকাবৃত্তি বা ন্যাস পুস্তকখানি বিরাজ করিতেছে, তখন বুঝিলাম, মাতা ভারতী দেবী সত্যই বাঙ্গালীর মহিমার কপাট উদ্ঘাটন করিবার বহু উপাদানই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা বা ন্যাস পুঁথিতে পুরাতন সাহিত্যের ও আচার ব্যবহারের অনেক সমাচার পাওয়া যাইবে। এক সময়ে বাঙ্গালায় যে পাণিনির আলোচনা পর্য্যাপ্তরূপে হইত, তাহা সমিতির সঞ্চিত পুস্তক সকল হইতে বেশ জানা যায়। সমিতি সুপণ্ডিতের সহায়তা পাইয়াছেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তন্ত্র সাহিত্যের সমাচার রাখেন; তাই আশা হইতেছে যে, কালে সাহিত্যের পক্ষ হইতে পুরাতন বাঙ্গালী সমাজের কুঞ্চিকা আধুনিক বিদ্বজ্জন-সমাজ লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের কল্যাণে আমরা লুপ্ত গ্রন্থ সকলের পরিচয় পাইতে পারিব, পুরাকালের ধ্যান-ধারণার মর্ম্মও বুঝিতে পারিব। মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গ ও রাঢ় দেশ আলোড়ন করিলে এখনও আমরা বহু পুরাতন ও লুপ্ত গ্রন্থের পরিচয় পাইতে পারি। সমিতির সম্মুখে সাগরসমান কর্ম্মের ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব দিকের পার্শ্বে

মারীচী

একটি কক্ষে 'শো-কেস্'। উহাতে নানাবিধ তাম্রশাসন ও পুরাতন অলঙ্কার সকল সাজান আছে।

শ্রীমূর্ত্তির পরিচয়।

৭৮।—হলে প্রবেশ করিয়া বাম দিকের কোণে নৃত্যশীল গণেশের মূর্ত্তি দেখিলাম। ইহা অপূর্ব্ব প্রতিমা। লম্বোদর দাঁকাইয়া, গজশুণ্ড ঘুরাইয়া তিনি সোল্লাসে নাচিতেছেন; নৃত্যের সে ভঙ্গীই অপরূপ। সবাই জানে যে, নটনাথ মহাদেবই নৃত্যকলার প্রবর্ত্তক; কিন্তু হেরম্ব যে কলানিধি এবং কলাবধূ-পতি, ইহা পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী জানিতেন, এবং সেই ভাবে হেরম্বের পূজা করিতেন; একালের বাঙ্গালী কেবল দোয়াত কলম দিয়া গণেশকে সাজাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই নৃত্যশীল গণেশের অষ্ট ভুজ; সর্প, মালা, দাড়িম্ব, বসন প্রভৃতি চারি হস্তে আছে, দুই হাত নৃত্যদ্যোতক, অপর দুইটি বরাভয়-প্রদায়ক। সেকালের কিন্নর- কাণ)-জাতীয় বাঙ্গালীগণ অষ্টভুজ গণেশের পূজা করিতেন। এখন কাণজাতি লুপ্ত, অষ্টভুজ গণেশের পূজাও লুপ্ত। এই মূর্ত্তি বগুড়া জিলার ছাতিম গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

৪৭।—ইহার কিছু পরেই সূর্য্যের এক প্রতিমা,—অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত অলোক-সাধারণ ভাস্কর্য্য-চাতুরী-প্রকাশক অতি সুন্দর সূর্য্যের প্রতিমা। এমন মনোহর দেবপ্রতিমা আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। উহা ব্রাহ্মণজাতীয় কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত; যে কষ্টিতে আঘাত করিলে ধাতুর অনুরূপ ধ্বনি হয়, তাহাকেই ব্রহ্মশিলা কহে। ইহাও তাহাই। চারি দিকে বাঙ্গালার প্রভা-মণ্ডল বা বিজয় তোরণ শোভাচ্ছটা-রূপে বিরাজ করিতেছে, মধ্যে ললিত-লাবণ্যের আধার নবকিশোরবয়স্ক সূর্য্য দেব! মুখে, চোখে, অধরে, ওষ্ঠে নয়নে, নাসিকায়, সর্ব্বাঙ্গের প্রত্যেক ভঙ্গীতে কিশোরের কোমলতা যেন ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। যে শিল্পী এত রূপ, এমন লাবণ্য প্রস্তরে সঞ্চারিত করিতে পারে, না জানি সে কেমন কারিকর! মনে হইল, এ মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে ধীমানের হাত আছে। মূর্ত্তির মস্তকে মঙ্গল-উষ্ণীষ, দুই হস্তে দুইটি নলিনী। কটিবর্ম্মের ধারণী হইতে সকোষ তরবারি ঝুলিতেছে, দুই চরণে জানুচুম্বী উপানৎযুগল; একটি শতদল কমলের উপর দেবতা দাঁড়াইয়া আছেন। দুই চরণের মধ্যে ধরাসুন্দরী উষালোকপ্রসাদরূপে বিরাজ করিতেছেন। সূর্য্যের দুই নারী সন্ধ্যা ও ছায়া দুই দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। চিত্রগুপ্ত ও পিঙ্গলা একটু স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছেন। ধরাসুন্দরীর নিম্নে অরুণ; তাহার নীচে সপ্তাশ্ব

ও একচক্র রথ। বলা বাহুল্য, এমন রূপ, এমন বিগ্রহ আমরা আর কখনও দেখি নাই। যে ভাস্কর এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি যে কবি. তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ, সে পক্ষে কোনও সন্দেহই নাই। ধ্যান-গম্য না হইলে এমন মূর্ত্তি প্রস্তরের সাহায্যে গড়িয়া তোলা যায় না। বিগ্রহের লাবণ্যভাতি দেখিয়াই নিশ্চয় করিয়াছি যে, উহা বাঙ্গালীর নির্ম্মিত; নেত্রবক্ত্রের দ্যোতনাও বাঙ্গালীত্ব-জ্ঞাপক। ইহা দিনাজপুর জিলার শিবপুর গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। তিন দিন অনবরত এই সূর্য্যপ্রতিমা আমরা অবাক হইয়া দেখিয়াছি। শ্লাঘায় দেহ কণ্টকিত হইয়াছে, লোমহর্ষণ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভের প্রশ্বাসে পঞ্জর খসিয়া গিয়াছে। এমনও হয়—এমনও ছিল!

১১।—বিষ্ণু গরুড়ের উপর বসিয়াছেন, বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্মেরাননে আসন করিয়া যেন চাপিয়া বসিয়াছেন। বিষ্ণুর মুখখানি দেখিলেই, আসন করিয়া বসিবার ঘটা দেখিলেই মনে হয়, তিনি যেন বলিতেছেন, দেখা যাউক, গরুড় আমাকে কেমন করিয়া আকাশে তোলে। গরুড়েরও মুখে হাসি, অনুগৃহীত দাসের, সিদ্ধ সাধকের আত্মনির্ভরতার হাসি বিরাজ করিতেছে। গরুড় যেন বলিতেছে যে, তুমি আমার দেবতার দেবতা, আমার ইষ্ট, আমার সর্ব্বস্ব, তুমি বিশ্বম্ভর হইতে পার, কিন্তু তোমার বাহন বলিয়াই ত আমি গরুড়, তুমি কৃপা কর বলিয়াই ত আমি তোমার দাসানুদাস; আমি ছাড়া তোমাকে আর কে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে! হাসি-মুখে, সেবকের শ্লাঘার সহিত এইটুকু যেন মনে ভাবিয়া সেই সুবদ্ধ ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ, সেই সুসম্বদ্ধ মাংসপেশীসংবলিত বিশালবক্ষ ক্ষীণকটি গরুড়, পক্ষবিস্তার করিয়া, দেহের সকল বল যেন প্রকট করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিতেছে। বিষ্ণুর আসন-সংবদ্ধ জানু ঘাড়ের উপর আসিয়া চাপিয়াছে বলিয়া বাম হস্তে সেই জানু ধরিয়া, দক্ষিণ পদে ভর দিয়া ভূমি ত্যাগ করিয়া গরুড় উড়িতেছে। এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমরা কখনই দেখি নাই; যেন সজীব, যেন এখনই উড়িবে! ইহা বগুড়া জিলার সারোইল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

১৫।—অর্দ্ধনারীশ্বরে ভাস্কর্য্যের পরাকাষ্ঠা, ভাবাভিব্যঞ্জনার পূর্ণতা; এমন ভাবের ঠাকুর আমরা পূর্ব্বে কখনই দেখি নাই। বোম্বায়ের এলিফাণ্টা গিরিগুহায় একটা আছে বটে, কিন্তু এমন সুন্দর নহে, এমন পূর্ণাবয়ব পূর্ণভাবদ্যোতক নহে। অর্দ্ধনারীশ্বরটি বেশ সাজান হইয়াছে। বেদীর

সর্ব্বোচ্চ স্তরে অর্দ্ধনারীশ্বর; নীচে শিবের বিবাহ হইতে হরগৌরী একাসনস্থ পর্য্যন্ত ভাবের সকল পর্য্যায় দেখান আছে। প্রথমে উমার বিবাহ,তখন পুরুষ-প্রকৃতি পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার পর পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলনের চেষ্টা, একটি ফুল লইয়া দুই জনের খেলা। তৃতীয় স্তর গৌরী শিবের বাম জানুর উপর বসিয়া আছেন, পুরুষ প্রকৃতির চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। চতুর্থে অর্দ্ধনারীশ্বর—হরগৌরী মিলিতাঙ্গ; পুরুষপ্রকৃতি একীকৃত। পুরুষপ্রকৃতির মুখের ভাব এক হইয়া গিয়াছে, গতি ও স্থিতি—মাতা ও পিতা—সম্মিলিত হইয়া প্রসন্নতার প্রকাশ করিতেছে; পরন্তু দেহ পূর্ণ এক নহে, অর্দ্ধেক নারী, অর্দ্ধেক পুরুষ। বাম দিকে স্ত্রীত্বের অভিব্যঞ্জনা, দক্ষিণে পুংস্বের বিকাশ। শিল্পীর চাতুরী শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া দেখান হইয়াছে। শিল্পীও শাস্ত্রজ্ঞ, প্রত্যেক বিগ্রহের ভাব তাই শাস্ত্রানুকূল হইয়াছে। যিনি নানা স্থান হইতে সমাহৃত এই বিগ্রহগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে পারিয়াছেন, তিনি যে তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ব—স্ত্রীত্ব-পুংত্ব-মহিমা অবগত আছেন,সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা এমন অপূর্ব্ব বিগ্রহসম্ভারও পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই, এমন সাজান মানান আর কোথাও পাই নাই। অর্দ্ধনারীশ্বর বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের আদর্শ প্রতিমা। পুরাণ ও নিবন্ধ হইতে সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া পরে স্বতন্ত্র সন্দর্ভে এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির তত্ব ব্যাখ্যা করিবার বাসনা রহিল। সেই ব্যাখ্যার সময়ে এই মূর্ত্তির পূর্ণ পরিচয় দিব। এখন কেবল ইঙ্গিতে দুই একটা কথা বলিয়া রাখিলাম। ইহা বিক্রমপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৬০।—মহিষমর্দ্দিনী—অষ্টভুজা। অসুর মহিষদেহ হইতে বিনির্গত, তাহার কেশরাশি দুর্গা ধরিয়া আছেন, মহিষের দেহের উপর দুর্গার বামপদ বিন্যস্ত। মহিষকে দুই দিক হইতে দুইটা সিংহ আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। দেবী সিংহারূঢ়া নহেন। দক্ষিণে গণেশ, বামে ময়ূরবাহন কার্ত্তিকেয়। লক্ষ্মীসরস্বতী নাই, পরন্তু জয়া বিজয়া আছেন। এমন মহিষমর্দ্দিনীর পূজা বাঙ্গালায় আর হয় না। ইহাও বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত। ইহা ছাড়া দশভুজা দুর্গা আছেন, চতুর্ভুজাও আছেন; সে সব প্রতিমা আধুনিক প্রতিমার অনুরূপ নহে। প্রতিমা-নির্ম্মাণে এ পরিবর্ত্তন কবে ঘটিল, এবং কেন ঘটিল, ইহা জানিতে পারিলে, বাঙ্গালীর ধর্ম্মমতের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা পরিস্ফুট হইবে।

৪১।—মাতৃমূর্ত্তি। ষোড়শী-প্রভৃতি শয়ন করিয়া আছেন, শিশু পার্শ্বে আছে। উপরে শিবলিঙ্গ আছে। দেখিলে মনে হয়, উহা আত্মাশক্তি শিব-প্রভৃতির বিগ্রহ-মূর্ত্তি। এরূপে মায়ের পূজা বাঙ্গালার কোন যুগে হইত, তাহা ত জানি না। তবে শুনিলাম, এমন মাতৃমূর্ত্তি বরেন্দ্রভূমে অনেক পাওয়া যাইতেছে। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, আদ্যাশক্তি শিবপ্রভৃতির পূজা এককালে বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত ছিল। লোপ পাইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা উন্মুক্ত হইবে। কবে হইবে? কে করিবে? কে জানে!

বাহুল্যভয়ে অন্য সকল মূর্ত্তির উল্লেখ করিলাম না। এমন অপূর্ব্ব অনেক বিগ্রহের সংগ্রহ হইয়াছে। তন্ত্রোপাসনা বুঝিবার একটা পর্য্যায় ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভবানী আছেন, চামুণ্ডা, ধূমাবতী, সরস্বতী আছেন; সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিও আছেন। যে বিষ্ণুর সম্মুখে শ্বেতবর্ণের মেষ বলিদান হইত, তেমন চতুর্ভুজ বিষ্ণুও দেখিলাম। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি-প্রকাশিত তালিকাপুস্তকে এ সকলের উল্লেখ আছে বটে, পরন্তু এখনও তন্ত্রের হিসাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যিনি দেখিবেন, তিনি প্রদর্শনী দেখিয়া চমকিত হইবেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নীরব ইঙ্গিতে সত্যই বিস্মিত হইবেন। তাই আশা হয়, ভবিষ্যতে এ সকলের ব্যাখ্যাও বাহির হইবে।

বৌদ্ধবিগ্রহ।—পার্শ্বের কক্ষ।

পার্শ্বের এক দীর্ঘ-কক্ষে বৌদ্ধবিগ্রহ সকল রক্ষিত রহিয়াছে। এখানে তেমন পর্য্যায়-নির্দ্দেশ নাই; কেন না, সংগ্রহ তেমন পর্য্যাপ্ত নহে, শৃঙ্খলের সকল আংটাগুলি পাওয়া যায় নাই। ফলে, এ কক্ষে আসিলে বৌদ্ধতন্ত্রের কোনও হদিস্ পাওয়া যায় না, তবে কালচক্রযানের একটু আধটু খবর পাওয়া যায়।

২১।—তারা। শতদলকমলাসনা, দ্বিভুজা; সব্যপাণি বরাভয়দায়িনী, সব্যেতরে একটি সনাল পদ্ম ধরিয়া আছেন। দুই দিকে দুই নারী-মূর্ত্তি, একটি বজ্রপাণি, অপরটি একটি ছুরী ও পানপাত্র ধরিয়া আছেন, এবং অতি ভীষণা। আমাদের মনে হইল, এ দুইটি বজ্রজা ও বজ্রন্মী। উপরে পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ। এই মূর্ত্তি প্রথমে ভগিনী নিবেদিতা প্রাপ্ত হন। প্রাপ্তির পর তাঁহার অমঙ্গল ঘটে। পরে কুমারী ক্রিশ্চিয়ানের হস্তগত হয়; তিনিও রাখিতে

বিজয়-তোরণ।

গরুড়বাহন বিষ্ণু

পারেন নাই। এখন সমিতির হস্তগত। ইহা রাজসাহীর গান্দুর গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

৯৩।—বোধিসত্ব লোকনাথ পদ্মাসন, শান্ত-সংযত মূর্ত্তি। দক্ষিণহস্ত আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীযুক্ত, বাম হস্তে সনাল কমল। পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ উপরে আছে। ইহা বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত। ইহা ছাড়া আরও তিনটি বোধিসত্ব লোকনাথ আছে। একটির ভৈরবরূপ—দ্বাদশহস্তযুক্ত, বর্ম্মাচ্ছাদিতদেহ ; সঙ্গে হয়গ্রীব, সুধনকুমার ও তারা আছেন। ইহা দিনাজপুরের আগ্রা-দিগন হইতে প্রাপ্ত।

১৫ —শান্তিনাথ জৈনদিগের ষোড়শ তীর্থঙ্কর। মূর্ত্তিটি সুন্দর, সম্মুখে কৃষ্ণকায় মৃগ আছে, চব্বিশ তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি সাজান আছে। রাজসাহীর মণ্ডিয়াল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

৭৭।—বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ মুদ্রা করিয়া বসিয়া আছেন। পদ্মাসন, সেই আসনের নিম্নে যুগল কেশরী। উপরে পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ। অপরূপ মূর্ত্তি! পশ্চিমে যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়, সে সকল হইতে ইহার মুখভঙ্গী ও নির্ম্মাণচাতুরী স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর কলাকৌশল বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহাও বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত।

৮৯।—সিংহনাদ লোকেশ্বর দ্বিভুজমূর্ত্তি, সিংহের উপর বসিয়া আছেন। সিংহ যেন পঞ্জর ফাটাইয়া রব করিতেছে। মূর্ত্তিটিতে শান্ত ও ভয়ানক দুই রসই বিদ্যমান আছে। ইহা রাজসাহীর তলাই গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

এই প্রকারের অনেক মূর্ত্তি আছে, গৃহের ভগ্নাংশ সকল আছে। এতদ্ব্যতীত, তাম্রশাসন, শিলায় উৎকীর্ণ লেখা, পুরাতন লিপি সকল সঞ্চিত রহিয়াছে। প্রতিলেখ, অবলেখ ও পুরাতন পুঁথিরও অভাব নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই দুই বৎসরের মধ্যে একটি ছোট খাট রকমের মিউজিয়ম বা যাদুঘর গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। গৌড় হইতে প্রাপ্ত মিনে করা ইষ্টকও সংগৃহীত আছে। আর আছে পুরাকালের অলঙ্কার-সকল,—গুজরীপঞ্চম, ঢেঁড়ী, ঝুমকো, বাউটীগুট, তাড়বাক, চরণচাঁদ, পাঁয়জর, কিঙ্কিণী, নীবী প্রভৃতি। এইখানে একটা কথার উল্লেখ করিয়া রাখিব। এত পুরাতন মূর্ত্তি দেখিলাম, কিন্তু কোনও মূর্ত্তিরই নাসিকায় অলঙ্কার দেখিলাম না। খুব পুরাকালে, বাঙ্গালায় কেন, উত্তর-ভারতের কোনও প্রদেশেই নাসিকায় অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত না। অনেকের অনুমান যে, উহা অনার্য্য-ভূষণ। বল্লাল সেনের আমল হইতে বাঙ্গালায় উহার প্রচলন হই-

য়াছে। পরে মুসলমানী আমলে উহার আদর বাড়ে। যাহা হউক, ইহা একটু লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়ের আলোচনা করিলে ভাল হয়, একটা কথা পরিষ্কার হইয়া যায়।

প্রদর্শনীর উপযোগিতা।

প্রদর্শিত বিষয়গুলির মোটামুটি একটা পরিচয় দিলাম। এইবার উহার উপযোগিতার কথা বলিব। পাঠানদিগের দ্বারা ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে পালরাজগণের সময় হইতে সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত, এই চারি শত বর্ষ-কাল বাঙ্গালার সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা কেমন ছিল, আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুগোষ্ঠীদিগের মধ্যে বাঙ্গালার হিন্দুর আসন কত উচ্চে ছিল, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা এই প্রদর্শনীর দ্বারায় হইতে পারিবে। "গৌড়রাজমালা"য় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ঐতিহাসিকের সামঞ্জস্যের বুদ্ধির প্রভাবে, গৌড়-দেশের একটি ইতিহাস-কথা গ্রথিত করিয়াছেন। এই প্রদর্শনী সেই ইতিহাসের পরিপোষক প্রমাণমাত্র। উহাতে প্রদর্শিত এক একটি পদার্থ চন্দ-লিখিত ইতিহাসমালার এক একটি পদ্মবীজ—এক একটি মুক্তাফল। কেবল এইটুকুই নহে; "গৌড়রাজমালা"য়, নানাদেশে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের লেখার সমালোচনা করিয়া, উপলপাত্রে উৎকীর্ণ নানা বিবরণের বিশ্লেষণ করিয়া, গৌড়ের রাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাখ্যান উহাতে নাই। কিন্তু প্রদর্শনীতে সমাজ ও ধর্ম্মের কথার বিস্তর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। মাৎস্যন্যায়ের অবসানের পর বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব, বিস্তার ও উন্নতি কেমন ভাবে ঘটিয়াছিল, সে অভ্যুত্থানের পরাকাষ্ঠা কিসে হইয়াছিল, এবং কোন দোষের জন্য অধঃপতন সম্ভবপর হইয়াছিল, এ সকল কথা এখনও বলা হয় নাই। প্রদর্শনীর প্রস্তরনির্ম্মিত বিগ্রহগুলি, সংগৃহীত পুঁথি সকল, সে সমাচার এখনও প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সে প্রচ্ছন্ন বার্ত্তার প্রচার করিতে পারিলে প্রদর্শনী সার্থক হইবে। যে দেখিতে জানে, সে এই প্রদর্শনী হইতে সেই পুরাতন গুপ্তকথার ইঙ্গিত পায়; বিস্মৃতির ভস্মস্তূপে আশার ফুৎকার দিলে, কচিৎ কদাচিৎ স্মৃতির এক আধটি স্ফুলিঙ্গ দীপ্তিমান হইয়া উঠে।—সে আলোকে অতীত কাহিনী সুস্পষ্ট হয়, মনীষার মুকুরে জাতির স্মরণাতীত আদর্শ-আলেখ্য পরিস্ফুট হয়। ইহাই এই প্রদর্শনীর উপযোগিতা।

সহস্র বৎসরকাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রবল হইয়া ছিল। সহস্র বৎসরকাল ভারতভূমি এসিয়ার কেন্দ্রভূমি ছিল, জ্ঞানালোকের প্রদীপ্ত ভাস্কর-স্বরূপ ছিল। তাহার পর অধঃপতন। এই অধঃপতনের সূত্রপাত হইতে নব হিন্দুত্বের উদ্ভবকাল পর্য্যন্ত ভারত-সমাজ কেমন পরিবর্ত্তনের ঢেউ খাইয়াছিল, কোন ভাব-স্রোতে বাহিত হইয়া ভারত-সমাজ কোন কূলে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহার পরম্পরা-সমন্বিত ইতিহাস-কথা ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশের নাই। জানি বটে, এই সময়ে হূণ-শবরাদির আক্রমণে উত্তর-ভারত বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়াছিল; জানি বটে, কুষাণ বংশধরগণ সম্রাটের আসন অধিকার করিয়াছিলেন; পরন্তু ইহা ত জানি না, বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান ও মহাযানের প্রণালী বাহিয়া, কোন নূতন ভাবের সহিত সম্মিলিত হইয়া নবীন হিন্দুত্বে অন্তর্হিত হইল! কোন মহাদোষের উত্তপ্ত প্রভাবে সহস্রবর্ষজীবী জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মটা একেবারে ভারতক্ষেত্র হইতে শুকাইয়া গেল! কোন গুণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষকে এসিয়ার সভ্য-জগতের কেন্দ্ররূপে পরিণত করিয়াছিল? কোন দোষে উহা নবীন হিন্দুয়ানীর অঙ্গে ধীরে ধীরে অঙ্গ মিলাইয়া শেষে একেবারেই কর্পূরের ন্যায় উপিয়া গেল? এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই, এ কথার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। ইতিহাস লিখিত না হইলে জাতির উত্থান-পতনের হেতুবাদ প্রদর্শন করা কঠিন হইয়া পড়ে। যে কষ্টি-পাথরে কষিয়া জাতির উত্থান-পতনের যাচাই ঐতিহাসিকগণ করিয়া থাকেন, সেই কষ্টিপাথরে হিন্দু জাতির উত্থান-পতনের বিবৃতি কষিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত কি একই রকমের হইবে? ইউরোপের মনীষিগণ বলেন যে, কোনও ধর্ম্ম বা সভ্যতা ঠিক আকাশ হইতে কোনও জাতির মধ্যে পড়ে না; ইহসংসারে সহসা কোনও কাজ হয় না। সকল ঘটনা, সকল ধর্ম্ম, সকল সভ্যতা উন্মেষমাত্র, শক্তি-সমবায়ে ভাবের ধীর-বিকাশমাত্র। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম সহসাজাত ব্যাপার নহে। উহার মধ্যে জিন-প্রভাব, চার্ব্বাক-মত, তন্ত্র-মত, বা অন্য কোনও অজ্ঞাত ভাব কতটা আছে, তাহা ত আমরা জানি না। বৌদ্ধধর্ম্মের বনিয়াদ কোন ব্যাপার সকলের উপর ন্যস্ত, তাহা ত আমরা জানি না। বৈদিক ধর্ম্মের কেমন সকল অপচার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব, তাহা ত কোনও ঐতিহাসিকই নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের মূল কারণও আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। যাহা কিছু এতকাল বলিয়া আসিয়াছি, সে সকলই অনুমানমাত্র। ঐতি-

হাসিকের বিশ্লেষণ-প্রভাবে, ঘটনা-পারম্পর্য্যের ব্যবচ্ছেদের ফলে কোনও অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তই আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এবম্প্রকারের প্রদর্শনী এই আবিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

বাঙ্গালায় মাৎস্যন্যায় কেন ঘটিয়াছিল? সমাজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় বাঙ্গালী মাণ্ডলিকগণ রাজার নির্ব্বাচনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন? তখন যদি বাঙ্গালায় নব্য হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কি এক জন প্রবল বৌদ্ধকে বাঙ্গালী রাজাসনে বসাইত? হিন্দু-ধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের আপেক্ষিক সম্বন্ধ কেমন ছিল? ইউরোপে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে,—নবীন ধর্ম্মমাত্রই পুরাতন নানা ধর্ম্মমতের আপোষ মাত্র। কথাটা সত্য। এই প্রবচন অনুসারে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে, নব্য হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের কোন মত সকলের আপোষ? আপোষ হইলেও, প্রথম উদ্ভবে বিরোধ ঘটেই। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটাইয়াছিল, নব্য হিন্দু ধর্ম্মও ত তেমনই পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটাইয়াছিল। সে বিরোধ সত্ত্বেও পালরাজগণ বৌদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় রাজ্য করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া? তাঁহারা উত্তর-ভারতের সাম্রাজ্যাধিকার কিসের বলে পাইয়াছিলেন? পরে তাঁহাদের আবার অবসান হইল কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর না পাইলে বাঙ্গালার ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইবে না। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে তাৎকালিক বাঙ্গালীর জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ বুঝিতে হইবে। এটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিলেই সর্ব্বাগ্রে তন্ত্রের কথা মনে পড়িবে, আম্নায়ের ইতিহাস খুঁজিতে হইবে, বৌদ্ধ, তন্ত্র ও হিন্দু তন্ত্রের বিভাগ বিচার করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জৈন ধর্ম্মের, সহজিয়া মতের, গোরক্ষনাথের নব শৈব-সম্প্রদায়ের, আদ্যাশক্তি-পূজার, কালচক্রযানের সমাচার রাখিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, বশিষ্ঠের মহাচীনে গমন, তারামন্ত্রে সিদ্ধি, চীন ও হিন্দু জাতির সমন্বয়সাধনচেষ্টা ও নূতন-তন্ত্র-প্রচারের ঐতিহাসিকতা বুঝিতে হইবে। তিব্বত ও চীন বাঙ্গালার সহিত ভাবের আদান প্রদান কতটা করিত, তাহাও বুঝিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মে ও ভাবে চীনের প্রভাব এখনও কতটা আছে, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে। এ পক্ষে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির এই প্রদর্শনী বিশেষ সাহায্য করিবে।

একটা কথা শেষে বলিয়া রাখিব। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী জাতিকে চিনিতে হইলে, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বাঙ্গালার এই

সুন্দরী।

চিত্রকর—শ্রীনরেন্দ্র নাথ সরকার।

From Seyne's Calender.

সাধার যুগের পরিচয় রাখিতেই হইবে। খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীর গোড়া হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত এই প্রায় পাঁচ শত বর্ষ কালের বাঙ্গালার সামাজিক ও ধর্ম্মমতের ইতিহাস না জানিলে পরবর্ত্তী বাঙ্গালার প্রকৃত পরিচয় আমরা পাইতেই পারিব না। কারণ, এই পাঁচ শত বৎসরে বাঙ্গালার সমাজে যে ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও অনেকটা বজায় আছে। এই ছাপের উপর কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, ত্রিপুরানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক মহামহোপাধ্যায় সিদ্ধ সাধুগণ নূতন রং ফলাইয়া গিয়াছেন; এই ছাপের উপর অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আর এক রং ফলাইয়াছেন। এই দুই রঙ্গের সামঞ্জস্য ঘটাইবার উদ্দেশ্যে হলায়ুধ, জীমূতবাহন, শূলপাণি হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ আরও কারচুপী করিয়াছেন। এই তিনের সমবায়ে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ। এই তিনের মহিমা বুঝিতে পারিলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রভাব ও বিন্যাস বুঝা যাইবে! পরন্তু এই তিনের মহিমা বুঝিতে হইলে গোড়ার ছাপের পরিচয় জানা চাই। সেই পরিচয়-প্রাপ্তির পক্ষে "গৌড়রাজমালা" আংশিক সহায়তা করিয়াছে বলিয়াই আমি এতটা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি, প্রশংসার শেফালী-বর্ষায় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষকে সৌরভযুত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। শাস্ত্র বলেন, যাহা আছে, জন্মজন্ম যাহা পাইয়াছ, তাহার পরিহার করিবার পূর্ব্বে তাহার পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিবে, এবং যাহা নবীন, তাহাকে অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে নবীনের পূর্ণ-পরিচয়-গ্রহণও কর্ত্তব্য। আমরা ইংরেজীনবীশ, নবীন বা প্রবীণ কোনও বাঙ্গালার সহিত আমাদেরও পূর্ণ পরিচয় নাই। অথচ বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, বাঙ্গালার যাহা কিছু আছে, বা ছিল, তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি। উত্তরাধিকার-সত্ত্বের সহিত একটা দায় আছে। সে দায় এ ক্ষেত্রে পরিচয়ের জ্ঞান। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি সে জ্ঞান আমাদিগকে মুক্তহস্তে দিতেছেন। আনন্দে বিভোর হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নাচিব না? বিমূঢ় আমি, আমার পিতৃ-পরিচয়, আমার জাতির পরিচয়, আমার ধর্ম্মের পরিচয় যাহারা দিবে, তাহাদের প্রশংসা করিব না! এখন পরিহার বা অবলম্বনের কাল আসিয়াছে, বা আসিতেছে; ইহাই ত পরিচয়ের মহা মুহূর্ত্ত। এই সন্ধিক্ষণের শুভ অবসরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি যে গৌড়রাজমালা, লেখমালা ও প্রদর্শনী বাঙ্গালীকে পড়াইতেছেন এবং দেখাইতেছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে গুরু-

দক্ষিণা দিব না? তোমরা ইংরেজীনবীশ বাবু, হাটে মামা হারাইয়া, পরের কথায় সায় দিয়া, পরের চালে গুঁজি দিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছ, তোমরা আমার এ বেদনায় ও উল্লাসের মর্ম্ম কি বুঝিবে? ভাইয়ের মুখে মায়ের পরিচয় পাইতেছি, পিতৃপরিচয় জানিতেছি, স্বীয় উত্তরাধিকারের মূল্য বুঝিতেছি। ইহা কি কম শ্লাঘার কথা, অল্প স্পর্দ্ধার কথা? এই সোজা কথাটা যাহারা বুঝে না, ধার-করা মানের ডালী মাথায় করিয়া যাহারা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেও লজ্জা-বোধ হয়।

শিল্পচাতুরীর মহিমা।

এই প্রদর্শনী আর একটা বড় কাজ করিয়াছে,—বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য-শিল্পের স্বাতন্ত্র্য ও মহিমার নির্দ্দেশ করিয়াছে। এতকাল যাহা ঢাকা ছিল, এখন তাহা প্রকট হইল। বাঙ্গালার শিল্পের কথা কিংবদন্তীর ন্যায় বিবজ্জন-মণ্ডলেই কদাচিৎ উল্লিখিত হইত। এই প্রদর্শনী তাহা ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা নূতন আবিষ্কার বলিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কেবল জানিতেন যে, তিব্বতের তারানাথ, তাঁহার পুস্তকের চব্বিশ অধ্যায়ে শ্রীমূর্ত্তি-নির্ম্মাণপ্রণালীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও অসাধারণ পুস্তক "History of Fine art in India and Ceylon" (ভারতের ও সিংহলের কলা বিদ্যার ইতিহাস) নামক গ্রন্থে ভারত-প্রচলিত সকল শিল্পি-সম্প্রদায়ের শিল্পচাতুরীর নিদর্শন দিতে না পারিয়া, তারানাথের সিদ্ধান্ত সকল তালিকার আকারে গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পুস্তকে এমন আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরে হয় ত অনুসন্ধিৎসুদিগের সাধনা-প্রভাবে পর্য্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যাইবে, এবং তারানাথের উক্তির যাথার্থ্য সিদ্ধ ও গ্রাহ্য হইবে। ঐতিহাসিক স্মিথ যদি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত বিগ্রহ সকল দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, মনে হয়, তাঁহার এ ক্ষোভ অনেকটা মিটিত। নাগার্জ্জুনের পর ধীমান ও বীতপাল ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। পিতাপুত্রে দুইটা নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে পদ্ধতি নাগার্জ্জুনের অমরাবতীর ভাস্কর্য্য-চাতুরী অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। উভয়ের art technique বা শিল্পবিশিষ্টতায় অনেকটা প্রভেদ ও বৈষম্য আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রদর্শনী দেখিলে, এবং অমরাবতীর ছবি দেখিলে

তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। কেবল এইটুকুই নহে। জাভা বা যবদ্বীপে আবিষ্কৃত বোরোবুদরের ভাস্কর্য্য-শিল্পের সহিত ধীমান ও বীতপালের পদ্ধতির সাদৃশ্য বা সাম্য আছে। মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"whence did the artists of Borobudder come? By whom were they trained? which Indian School is closely related to them?" অর্থাৎ, যবদ্বীপের শিল্পিগণ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন? তাঁহারা কাহার কাছে শিক্ষা পাইয়াছিলেন? ভারতের কোন শিল্পিসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা? মনে হয়, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রদর্শনী দেখিলে, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর হয়। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "বঙ্গদর্শনে" "শ্রীমূর্ত্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে এবং "সাহিত্যে" "সাগরিকা"-শীর্ষক নিবন্ধে এই সকল বিষয়ের পর্য্যাপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। তিনিই দেখাইয়াছেন যে, উড়িষ্যার ও মগধের শিল্পপদ্ধতি ধীমান ও বীতপালের পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র নহে; উহা বাঙ্গালার আদর্শে চালিত। মৈত্রেয় মহাশয় একরূপ সপ্রমাণই করিয়াছেন যে, যবদ্বীপের শিল্পী হয় খাঁটী বাঙ্গালী, নহে ত বাঙ্গালার ধীমান ও বীতপালের শিষ্য; অথবা উভয়ে এক গুরুর বা এক সম্প্রদায়ের অনুচিকীর্ষু। মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ বোরোবুদরে চীনের প্রভাব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদর্শনী দেখিলে সে অনুমানের প্রয়োজন হয় না। বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক হ্যাভেল যব-দ্বীপ হইতে আনীত ও ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন নগরের যাদুঘরে রক্ষিত, মাটীর ছাঁচে গড়া একটি মুখ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাষার ছটায় তাহার অনন্যসাধারণ প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের পুরাতন শিল্পকথার পরিচয়ে পূর্ণ তাঁহার নূতন পুস্তকে হ্যাভেল এই প্রশংসাবাণীর উচ্চারণ করিয়াছেন। হ্যাভেলের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম এই যে, যাবাদ্বীপের বুদ্ধ-মুখে ভারত-শিল্পসুলভ কঠোরতা নাই, তাহাতে যে প্রগাঢ় প্রশান্তির ভাব বিদ্যমান, তাহা ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ, ভারতবাসীরা বিবিধ-বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ ভারতের বাহিরে যবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হইয়া যে শান্তি ও নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে বুদ্ধ-মুখে এই ভাব ফুটাইতে পারিয়াছে। ইহা উপনিবেশী ভারতবাসীর কীর্ত্তি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ বাঙ্গালা দেশেই এমন মুখের ছাঁচ অনেকগুলি পাইয়া-

ছেন। আমরা হ্যাভেল-প্রদত্ত ছবির সহিত সংগৃহীত মুখের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিয়াছি। কোপেনহেগেনে যাহা আছে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রদর্শনীতে তাহাই আছে। কাজেই বলিতে হয় যে, উহা বাঙ্গালার সামগ্রী, বাঙ্গালী কারিকরের তৈয়ারী; যবদ্বীপের বিশেষত্ব নহে। অতএব হ্যাভেলের প্রশংসার পুষ্পবর্ষা হেঁটমুণ্ডে বাঙ্গালীকেই লইতে হয় না কি? মূর্ত্তির ভাবাভিব্যঞ্জনায় ধীমান নাগার্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বিগ্রহে দেহগত লাবণ্য ও কমনীয়তার বিকাশে বাঙ্গালার শিল্পীই অগ্রণী। যবদ্বীপের উৎখাত বিগ্রহ সকলে এই বিশিষ্টতাই বিদ্যমান। বিশেষতঃ, নির্ম্মাণপদ্ধতিও এক রকমের; তাই বলিতে ইচ্ছা করে, বাঙ্গালীই বোরোবুদরের মন্দির-সৌধের নির্ম্মাণকর্ত্তা। প্রদর্শনীতে সংগৃহীত যে অর্দ্ধনারীশ্বর, গরুড়, সূর্য্য, মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহা ভারতের কুত্রাপি নাই। তেমন নমুনার ছবি ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের বা হ্যাভেলের বহিতে নাই। বাঙ্গালীর গড়া ধ্যানী বুদ্ধের মুখের ভাবে যে কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মথুরার বা লাহোরের সংগ্রহে নাই। অর্দ্ধনারীশ্বরে শিল্পী যে ভাব ফুটাইয়াছেন, পাথরের উপর তেমন ভাব যে ফুটান যায়, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। বিষ্ণুকে স্কন্ধে করিয়া গরুড় উড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, —এ মূর্ত্তি যে শিল্পী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি যে বরেণ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পী, ভাবাভিব্যঞ্জনায় অপরাজেয়, আসক্তি-প্রকটনে অদ্বিতীয়, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রদর্শনী দেখিলে বুঝিতে পারি, এ সকলই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর। সহস্র বৎসরকাল এ বোধ হয় নাই, এমন আত্ম-বোধের উদ্বোধন কোনও সিদ্ধ পুরোহিত করিতে পারেন নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি শবসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহাদের মন্ত্রপ্রভাবে গলিত স্খলিত শবদেহ বুঝি বা আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে—চণ্ডালদেহ মাতৃনাদে আবার মুখর হইবে। বিজয়-দুন্দুভি বাজাইবার ইহাই ত শুভ, কল্যাণপ্রদ অবসর!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই প্রবন্ধে তাঁহাদের সংগৃহীত মূর্ত্তি প্রভৃতির পরিচয় দিবার ও চিত্রগুলি প্রকাশিত করিবার অনুমতি দিয়া, এবং পূজনীয় শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধের উপাদান-সংগ্রহের জন্য রাজসাহী-যাতায়াতের ক্লেশস্বীকার করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

এষা।

এষা—বনিতা-বিয়োগ-বিধুর বড়াল কবির শান্তি-অন্বেষণ। 'অন্বেষণ'কে প্রাচীন গাথায় 'এষা' বলে,—তাই এই গীতি-কাব্যের নাম 'এষা'।

এই ব্যাধি-মন্দির দেহে, এই জরা-মন্দির জীবনে,—শোক-মন্দির সংসারে—শোকের কুঁদের মুখে সকলকেই পড়িতে হয়। সেই কুঁদের মুখে আর বাঁক থাকে না, শোকে সকলকেই সরল করে। আঁক, বাঁক ঘুচাইয়া, ময়লা মাটী ধুইয়া সরল করে, নির্ম্মল করে। তবে কেহ কাঁদিতে পারে, কেহ পারে না।

কেহ বলে—

যে করে বুকের ভিতরে—
ও সে বুক চিরে দেখাবার নয়।—

আবার কেহ বলে—

দর্দে দিল্‌কো খোদা জানতে হ্যায়,
রাহা নেই দিল পচানে কো।

কবির প্রাণে কাব্যস্ফূর্ত্তি হয়। রবি বাবুর হইয়াছিল; এই বড়াল কবির হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার অনেক দিন হইতেই কবি—কিন্তু এবার তাঁহার কবিত্ব বুক চিরিয়া বাহির হইয়াছে, খোদার কাছে তাঁহার আরজ পেঁৗছিয়াছে।

শোকে অনেকের বুকের ভিতর তাল পাকাইয়া থাকে। খেই হারান রেশম সুতার পুটলির মত, বিয়োগবিধুর ব্যক্তি খেই খুঁজিয়া না পাইয়া কাঁদিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে না। গুম্‌রিয়া থাকে—'সে যে তুষের আগুন পুড়াইয়ে-করে খুন।'

বড়াল কবি, কিন্তু একবারও খেই হারান নাই। স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থা হইতে কবিতা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড, মৃত্যু।

কন্যা বলিতেছেন—

বাবা,
মা—কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর-প্রণাম?

কবি উত্তর দিতেছেন:—

'কাছে যা বাছা রে, শুনা গে তাহারে
জনমের মত হরি-নাম।

হরিস্মরণে কি সুন্দর আরম্ভ !

তার পর,

* * *

শান্ত—সুপ্ত, ধীরে পার্শ্বে ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন !

কবির তখন সন্দেহ হইল,—সকলেরই হয়—

এই কি মরণ ?
এত দ্রুত—সহসা এমন !

তাহার পর কবির ক্রন্দন। একটু পরে আবার একটা কথা মনে হইল,—অনেকেরই হয়—"মরণে কি মরে প্রেম ?" তাহার পর শ্মশানে একবার মরিতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু

মরিয়া জুড়াতে চাই,
মরিতে সাহস নাই।
শিথিল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

তার পর একরূপ দৃশ্য, অতীতের সহিত ভবিষ্যৎ জুটিতেছে—

গৃহতলে আছে বসি' পুত্রকন্যাগণ
করিয়া মণ্ডল ;
নববস্ত্রপরিহিত বাক্যহীন, সঙ্কুচিত
ম্লান মুখ, রুক্ষ কেশ, নেত্র ছল ছল।

'নববস্ত্রপরিহিত'—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।" শাস্ত্রকারগণ এই কথা ঐ রূপে শিক্ষা দেন। তাহার পর অশৌচে কবি ভাবিতেছেন,—

হে পূত তুলসী, বিষ্ণুর প্রেয়সী, সন্ধ্যায় আসিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া
বিবর্ণ তোমার দল : কে বা তলে দীপ জ্বালে ;
প্রভাতে আসিয়া প্রণাম করিয়া নীরস মঞ্জরী পড়ে ঝরি ঝরি
কে বা মূলে ঢালে জল। লূতা-তন্তু ডালে ডালে।

ভক্তি-ভরা এই সকল শোকের কথা বড় সুন্দর।

তাহার পর আদ্যশ্রাদ্ধ—

সদ্যঃস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,
বসি কুশাসনে ;
গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘশ্বাস,
পড়ে মন্ত্র গাঢ় স্বরে, খলিত-বচনে

তার পর শান্তিজল— ওঁ মধু মধু মধু, জগৎ মধুময়! কবিত্বের গুণে আমাদের মনে হয়, যেন আমরা হিন্দুর শ্রাদ্ধাদির অধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকি। যেন হিন্দুয়ানীর বার আনা বুঝিতে পারি।

তাহার পর শোক। শোক-কথা আর তুলিব না, বলিব না।

তাহার পর সান্ত্বনা।

সতী,

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি :
তুমি যাহে দেছ পদ
সে যে ফুল্ল কোকনদ !
সে নহে শ্মশান-চুল্লী—ভীষণ মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কন্যায় মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ?
তুমি চোখে মুখে হেসে,
উড়ায়ে আঁচলে কেশে,
চলে গেলে নিজ দেশে অতি হৃষ্ট-মতি !

মানিলে না কোন মানা
আমি কেন ভাবি নানা ?
চায় না দেখিতে বাপে কোন্ স্নেহবতী ?

*   *   *   *

হে মরণ, ধন্য তুমি : না বুঝে তোমায়
বৃথা নিন্দা করে লোকে ;
জগতে—তুমি ত শোকে
অমর করিছ প্রেমে দেব-মহিমায় !
আজি মোর প্রিয়তমা
স্তব করে বিশ্বরমা—
ভাসিছে ইন্দিরা সমা সৃষ্টি-নীলিমায় !

সে কি রূপ, তাই বলিতেছেন :—

কি স্বপন সুমধুর !
দূর—দূর—অতি দূর—
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে স্বর্গ-অলিন্দায়
দিয়া ভর একাকিনী
দাঁড়াইয়া বিষাদিনী :
হেরিছে কাতরনেত্রে ধরিত্রী কোথায় !
নীলবাসে দেহ ঢাকা,
মেঘে ঢাকা শশী রাকা,
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছলায়।

সমুস্ত মন্দার ছুটি
বাম করে আছে ছুটি,
সোনার আঁচল লুটি পড়ে রাঙ্গা পায়।

*   *   *   *

আঁচলে মুছিয়া আঁখি
করেতে কপোল রাখি,
আবার আগ্রহে কত চায়—চায়—চায় !
ওই না কম্বুক প্রায়
সে ধরণী দেখা যায়।
ওই না পূর্ণিমা-চাঁদ রৌপ্য রেণু প্রায়।

দেখিতে দেখিতে গোলোকের মহিমা কবির নয়নে উদ্ভাসিত হইল :—

সূর্য্য নয় চন্দ্র নয়—
গোলোকে আলোকময়
বিষ্ণুর প্রশান্ত স্নিগ্ধ নেত্র-নীলিমায়।
নহে মধু ফুলবাস—
কমলার ধীর শ্বাস
বহিছে কি প্রেমানন্দে প্রেম-পরিমায়।

নীল মেঘ নিরুপম
হেলে আছে স্বপ্ন সম,
চপলা চেতনা-সম কভু শিহরায়।
স্বর্ণগৃহে—চূড়ে চূড়ে
নব ইন্দ্রধনু স্ফুরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে মণি-প্রস্তরায়ণ

কল্পতরু সারি সারি,
আলবালে কাপে বারি,
হরিণী অলস-আঁখি শীতল ছায়ায়;
পারিজাতে সুধাগন্ধ,
আনন্দে ভ্রমরী অন্ধ,
শাখায় শাখায় পিক মৃদু কুহরায়।
শূন্যে বাজে বীণা বেণু,
শস্পভূমে কামধেনু,
ধূ ধূ উড়ে স্বর্ণরেণু বিরজা-বেলায়।
দীর্ঘ নেত্র দীর্ঘ ভুরু,
ক্ষীণ কটি, শ্রোণী গুরু,
দুলিছে তরুণী কত লতার দোলায়।
কত সুকুমার শিশু,
ফুল্ল পারিজাত ইন্দু,
হেসে দুলে হেসে খেলে নাচিয়া বেড়ায়।
কত যুবা, কত বৃদ্ধ,
কত ঋষি, কত সিদ্ধ,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া রজঃ আনন্দে গড়ায়।
কি মহান্—কি গম্ভীর,
প্রলয়-জলধি স্থির—
বিরাজে সর্ব্বতোভদ্র স্বর্ণ মহিমায়!

কি মধুর—কি সরল,
কি কঠোর—কি কোমল,
পৌরুষে বিস্ময় জাগে, মোহে সুষমায়!
উত্তুঙ্গ শিখর-চূড়ে,
গরুড়-কেতন উড়ে;
নবগ্রহ নবদ্বারে গোপুর-মাথায়।
গায়ে ফুল লতা পাতা,
কত না কাহিনী গাথা;
প্রাচীরে উদ্ভিন্ন মূর্ত্তি—নানা দেবতায়।
মণ্ডপ সহস্র-থামী,
রত্নকণ্ঠ শুক সারি,
ঝলকে বিতান-ছাদ নীল মণিকায়।
তলভূমি ঢাকা ফুলে,
ফুলের ঝালর ঝুলে,
ফুলের লহরী দুলে চারু বেদিকায়।
যুগে যুগে নারী নর,—
নতজানু, যুক্তকর,
প্রেমে গদগদস্বরে রাসলীলা গায়।
বাজে শঙ্খ ঘন ঘন,
ফুটে পদ্ম অগণন,
ঘুরে চক্র সুদর্শন তড়িৎ প্রভায়!

কবি প্রার্থনা করিতেছেন :—

গর্ভগৃহে পদ্মাসন,
বসি' লক্ষ্মী নারায়ণ,
বাক্য-মন-অগোচর—নমামি তোমায়!
সৃজন-পালন-লয়
শ্রীপদে জড়িত রয়—
দেখি দেখি পদাশ্রয় শোকার্ত্ত জনায়!

পত্নী-প্রেম হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের রূপ-দর্শন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অনুরূপে লিখিয়াছেন :—

চৈতালিতে।—

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি,
যে ভাবে লতায় ফুল নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী

স্তম্ভোপরিস্থ গরুড়

অৰ্দ্ধনারীশ্বর

যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করে লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচনা,
হে রমণি ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি' দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

এই দ্বৈত-বাদের রহস্য রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে বলিতেছেন :—

আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ!
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।

বড়াল কবির প্রার্থনা অনুরূপ :—

দাও প্রেম—আরও প্রেম, চিরপ্রেমময়!
আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,
আরো আত্মজয়-শক্তি—
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়!
জীবন—মরণ পানে'
বহে যাক্ সুরে গানে,
হোক প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয়!

কর' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ।
সে ছিল তোমারই ছায়া—
তোমারি প্রেমের মায়া!
তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আস্বাদ।
এখনও সে যুক্তকরে
মাগিছে আমার তরে—
তোমার করুণা স্নেহ শুভ আশীর্ব্বাদ।

সতী যে পতির শুভাকাঙ্ক্ষিণী, সে ত জীবনে মরণে সমানই আছে; আমার তরে এখন তোমার আশীর্ব্বাদ মাগিতেছে—সেই পুণ্যে আমি আজি তোমার আস্বাদ পাইতেছি।

বলিহারি কবির কল্পনা—আর ধন্য কবির বিশ্বাস! এই বিশ্বাস পাষণ্ডীকেও বিশ্বাসী করিয়া তুলে।

কদমতলা, চুঁচুড়া।
২৮শে ভাদ্র; ১৩১৯ সাল।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

মাতৃ-পূজা।

ভারতের ঋষিমুনি-প্রবর্ত্তিত সাধনা ও জ্ঞানকাণ্ডে এক আমি বা আত্মা নিত্য বিদ্যমান। অন্য কিছু নাই। আমি আছি, তাই আমার জগৎ আছে। কবীর বলিয়াছেন,—"হম ডুবা ত জগ্ ডুবা।" অর্থাৎ, আমি ডুবিলেই, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎও ডুবিল। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, এই যে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমের নানা বিভাবনা, ইহা আমা হইতেই

উৎপন্ন। তাই জগতের উৎপত্তিকে বৈদিক ভাষায় বিসৃষ্টি কহে। অর্থাৎ, প্রবৃত্তির মুখে, কামনার বশে, আমি যেন আমা হইতে এই জগৎকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। বেদ বলিতেছেন,—

"কামস্তদগ্রে সম বর্ত্ততাধি ;
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

অর্থাৎ, আমার মনে কামনার বিকাশ হইল, আর জগতের বিসৃষ্টি হইল। এই বিশ্বসৃষ্টি আমার বা আত্মার কামনাসঞ্জাত। "একোহং বহু স্যামঃ।" ইচ্ছার বিকাশই সৃষ্টি। সেই আমি—কেমন আমি? আম্ভৃণকন্যা বাক্ বলিতেছেন:—

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা। * *
অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা। * *
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিরপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনাসু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।"

আমিই রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আমিই মিত্র ও বরুণকে ভরণ করি, আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি। আমি বিশ্বভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রবহমান হই। আমারই মহিমা ভূর্লোক ও দ্যুলোককে অতিক্রম করিয়াছে। ইহাই আমি—আত্মা—ব্রহ্মন্। সৃষ্টির মধ্যে ইহাই সৎস্বরূপ, আর সকলই মিথ্যা-মায়া-প্রপঞ্চ-লীলা।

এই আমি গুটীপোকার মতন গুটী রচিয়া থাকি, ঊর্ণনাভের মতন জাল বুনিয়া থাকি। কেন বুনি? উহাই আমার ইচ্ছা। কেন যে এমন ইচ্ছা হয়, তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহা অন্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। এই গুটীপোকার গুটী সীমাবদ্ধ আমি—জীব; আর গুটীর বাহিরের আমি—শিব। জীব শিবকে দেখিতে চাহে; জীব গুটী কাটিয়া, প্রজাপতি সাজিয়া অনন্ত আকাশে উড়িতে চাহে। এই জীব-শিবের মিলন-চেষ্টা হইতেই সাধনার উদ্ভব। জ্ঞানকাণ্ড বলেন,—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

যে দেখে, সর্ব্বভূত আমাতে বর্ত্তমান, আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, সে এই জগৎ হইতে ভয় পায় না, জগৎকে ঘৃণা করে না। আবার সাধন-কাণ্ড বলেন,—

"রুচীণাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"
"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নম্ সায়াহ্নং প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্।"

হে মহাদেব! তুমিই মনুষ্যের—সাধকের একমাত্র গম্য। যেমন নদ-নদী সকল সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তেমনই রুচির বৈচিত্র্য থাকিলেও, ঋজু-কুটিল পথ অবলম্বন করিলেও, পরিণামে তোমাতে যাইয়াই জীবের জীবত্বের পর্য্যবসান হয়।

হে জগন্ময়ী! প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করি না কেন, তাহা যেন তোমারই পূজা হয়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, চেষ্টায় অচেষ্টায় আমা দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হইবে, তাহা যেন তোমারই কার্য্য হয়—তোমারই পূজা হয়।

অর্থাৎ, জ্ঞানী বলেন, দেখিয়া লও, এই বিশ্বসৃষ্টিতে তুমি ছাড়া আর কিছু নাই। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—অণু হইতে অণু তুমি, মহান্ হইতে মহত্তর পদার্থ তুমিই। সাধনশীল সাধক বলেন, বটে, আমি ছাড়া এ জগতে আর কিছু নাই, আমিই জীব, আমিই শিব। কিন্তু জীবে ও শিবের মধ্যে মায়োপহিত যে ব্যবধান আছে, তাহাকে ছিন্ন করিবার সুখটুকু হইতে আমি বঞ্চিত হইব কেন? জীব শিবকে পূজা করিয়া—আত্মদান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতে চাহে। সেই তৃপ্তিলাভই সাধনা। সেই তৃপ্তিই ভক্তি ও মুক্তি। এই তৃপ্তিটুকু পাইব বলিয়াই "রসো বৈঃ সঃ" আমি আমাকে রসময়, ভাবময়, প্রেমময়, বিলাসময় করিয়া গড়িয়াছি। অথবা, জীব স্বীয় আসক্তিনিচয়ের ভাবভূষণে শিবকে ভূষিত করিয়া, আসক্তির তৃপ্তি-যূপে আত্মবলি দিয়া, জীবে-শিবে একত্ব সাধন করে। কি জানি কেন? আমি যাহা চাই, তাহা ত পাই না; কেন না, তাহা পাইলে আমার আর চাহিবার কিছু থাকে না। আমি চাহি আমাকে। আমার আমিত্ব মৃগমদের মত আমারই মধ্যে লুকান আছে, আমি তাহার সৌরভে প্রমত্ত হইয়া দশ দিকে ঘুরিয়া বেড়াই। আতি পাতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া তাহাকে পাই না। আমি আমাকে খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই কত নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকি। প্রবৃত্তি ও আসক্তি যখন যেমন নির্দ্দেশ করে, তখন তাহাকে সেই নাম ধরিয়াই ডাকি। ইহাই নাম। আসক্তির আগ্রহ-

জন্ত নামের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাপারের অভিব্যঞ্জনা হয়, তাহাই রূপ। মা বলিয়া ডাকিলে নয়ন তাঁহাকে যে রূপে দেখিতে চাহে, তাহাই তাঁহার তাৎকালিক রূপ। পুত্র বলিয়া কন্যা বলিয়া ডাকিলে, তাঁহাকে যে সাজে সাজাইতে ইচ্ছা করে, সেই সাজই তাঁহার রূপ। আমি আমাকে চিনি না, জানি না বলিয়াই, আমি আমাকে কত নামে ডাকি, কত সাজে সাজাই। এই বিহ্বলতা জন্য এক আমি দুই হইয়া যাই—আমি আর তুমি—এই দ্বৈতের বিন্যাস করি। একবার তোমার তুমিত্বের ঠিকমত নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই, তোমাকে লইয়া আমার সাধ মিটাই, আমার নিত্যপিপাসিত আসক্তিনিচয় তোমার রূপসাগরে—ভাবসাগরে—রসসাগরে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইয়া তাহাদের আজন্মের পিপাসা মিটাইবার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা ফলবতী হইলে আমি তুমি এক হইয়া যাই, আমি তোমাকে চিনিতে পারি, তুমি আমাকে চিনিতে পার। তুমি আমি হও, আমি তুমি হই। যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ তুমি আমি স্বতন্ত্র থাকিয়া, আমি তোমার পূজা করি, সেবা করি, উপাসনা করি ;—তোমাতে আমাকে ডুবাইবার চেষ্টা করি। ইহাই সাধনা। তথাপি মনে থাকে যেন, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে আমি ছাড়া অন্য সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর নাই; আমিই আমার দেবতা, আমিই আমার পূজক। রামপ্রসাদ তাই বলিয়া গিয়াছেন, "তুমি খাও কি, আমি খাই মা, দু'টোর একটা করে যাবো,—এবার শ্যামা, তোমায় খাবো।" এই তোমার আমার ভাবটা প্রকট করিয়া তোমাতে আমাকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে ভগবান প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন,—

"যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি॥"

তোমার ভক্তিসমন্বিত চিত্ত আমাতে যেরূপ নিশ্চলভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে তুমি আমার অনুগ্রহে নির্ব্বাণ অবধি প্রাপ্ত হইবে।

ইহাই হইল সাধনার মোটা কথা। অদ্বৈত-তত্ত্বের উপর দ্বৈতভাবসম্মত সাধনার বিশ্লেষণ। বেদ হইতে শাণ্ডিল্যসূত্র পর্য্যন্ত, সকল দর্শন ও ভাবশাস্ত্রেই এই কথাটাই নানা ভাবে ব্যক্ত করা আছে। তন্ত্র আবার এই কথাটাকে আরও একটু মজা করিয়া বলিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, প্রতিষ্ঠিত দেবতা আত্মজতুল্যা। কেন না, উহা আত্মজাতা। তাই যাহার বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়, দুর্গা-প্রতিমা তাহারই গোত্র-প্রবর-বর্ণ-জাতি গ্রহণ করিয়া

থাকেন। তাই শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত বা পূজিত দেববিগ্রহকে ব্রাহ্মণের নমস্কার করিতে নাই। তাই মা, পূজকের কন্যাও বটেন, জননীও বটেন। দুর্গা কন্যারূপেই বাঙ্গালীর গৃহে আসিয়া অবতীর্ণা হন। লোকমুখে শুন নাই কি, উমা শারদীয় উৎসবকালে কন্যারূপে পিতৃগৃহে আসিয়া থাকেন! তাই বাঙ্গালী কবি গান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, এলো বুঝি পাষাণী, তোর ঈশানী।" কন্যারূপেই দুর্গার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, কন্যারূপেই তাঁহার বিসর্জ্জন ও বিজয়া। আমি ছাড়া আর কিছু নাই বলিয়া, আমা হইতে সমুদ্ভূতা বলিয়া, তন্ত্র ইষ্টদেবীকে কন্যারূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধনাকাণ্ডে এত মাধুরী বুঝি বা আর কোনও শাস্ত্র ছড়াইতে পারে নাই। এ পক্ষে তন্ত্রসাধনা জগতে আদর্শ-স্থানীয়। শ্রীমৎবল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল—নন্দদুলাল সাজাইবার সময়ে, তন্ত্রের কাছে ভাবের ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের উল্লেখ গোড়ায় করিয়াছি। উহাই মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর সূক্ষ্ম ভাব, উপাসনার মূল পত্তন, মাতৃপূজার মূল মন্ত্র। সে মা কেমন?

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি-রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥
* * * *
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

দেবীসূক্তের পদগুলি আর চণ্ডীর এই স্তবটি একবার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখ দেখি! দেখিবে, দেবীসূক্তে যেখানে "আমি" আছে, চণ্ডীতে সেইখানে কেবল "তুমি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অন্যথা ভাবে ও ভাষায় দুই-ই এক। আম্ভৃণকন্যা বাক্ স্পষ্ট ভাষায় "আমার" কথা বলিতেছেন। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে ব্রহ্মার মুখে মায়ের কথাই বলিতেছেন। মাতৃপূজার এই-টুকুই গুপ্ত কথা। আমার মাকে যখন আমি দেশমাতৃকা মহালক্ষ্মীরূপে সাজাই, তখন যেমন আমিই মায়ের কোলে থাকি—আমিই মা রূপে বিরাজ করি; তেমনই, যখন তিনি দশভুজারূপে আমার চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া বসেন, আর পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকেন,—

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

তখন সেই আমারই পূজা হয়। আমারই বিস্তার বা সন্তান আমার দেশ-মাতৃকা, আমারই বিস্তার বা সন্তান আমার দশভুজা। আমি আমাকে খুঁজিয়া বেড়াই, তাই আমার দুর্গোৎসব। ঐ দশভুজা মূর্ত্তিতে কত যুগযুগান্তরের কল্পকল্পান্তরের আমি জড়ান মাখান লুকান রহিয়াছে। আমার ইতিহাস, আমার গৌরবগাথা, আমার ঐশ্বর্য্যবিলাস, ঋদ্ধিসিদ্ধি ঐ প্রতিমাকে খুঁজিলেই পাইবে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব যুগ-যুগান্তরের বাঙ্গালীত্বের পূজা ও উপাসনামাত্র। উহা ইতিহাস-পূজা, পুরাতত্ত্বের উপাসনামাত্র।

কিন্তু আমার মাতৃত্ব কি পদার্থ? বাঙ্গালীর মাতৃপূজা কেন? বেদ উপ-নিষদ বলিতেছেন যে, জীবে ও শিবে মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি নিত্য বিদ্যমান আছে। যখন মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি একই আধারে সম্মূঢ়—একীকৃত, তখন একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই এক, দুই আর নাই। তখন একা শিব তানপুরা হাতে করিয়া গান করিতেছেন; নিজের গান নিজেই শুনিতেছেন, নিজের স্বরে নিজেই মজিয়া আছেন। যখন মাতৃশক্তি পরিস্ফুট, তখন শিব, 'এক আমি বহু হইব' বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাহার পর সৃষ্টি। এই বিসৃষ্টিতে মা তখন সৃষ্টিরূপা। ইহার আবার বিলোম গতি আছে। পিতা মাতা পৃথক হইলেন, শিবের সহিত উমার বিবাহ হইল, উমা শিবানী হইলেন। ক্রমে উমা শিবের সহিত মিশিতে চাহিলেন। স্বতন্ত্রা, স্বচ্ছন্দসা উমা, ধীরে ধীরে শিবের নিকটস্থ হইলেন, জানুবিহারিণী হইলেন, শেষে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি প্রকট হইল।

"নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্ত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপলকপালকশূলহস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষম্
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্॥"—নিবন্ধ।

যিনি জগতের পরাপর পরমেশ্বর, তিনি অর্দ্ধাঙ্গে স্ত্রী ও অর্দ্ধাঙ্গে পুং দেহ-ধারী হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বর নামে জগতের পিতৃমাতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন। যে অর্দ্ধাঙ্গ মায়ের আকার, তাহা নীলবর্ণ; যে অর্দ্ধাঙ্গ পিতার আকার, তাহা শ্বেতবর্ণ। ইঁহার বাম দিকে মায়ের অংশে যে দুইখানি হস্ত আছে, তাহাতে পাশ আর রক্তোৎপল বিধৃত; আর দক্ষিণাংশে পিতার দুই হস্তে কপাল ও ত্রিশূল শোভা পাইতেছে। ইনি ত্রিনেত্র ও চন্দ্রশেখর। ইহাই হইল শিবে মাতৃশক্তির ও পিতৃশক্তির বিকাশ। জীবেও এই দুই শক্তি প্রকট হইয়া

থাকেন। যখন জীবে যে শক্তির প্রভাব অধিক, তখন সেই শক্তির সহায়তায় জীব ও শিব এক হইতে হয়। প্রকৃতির লীলাতেও এই মাতৃশক্তি ও পিতৃ-শক্তির পরিস্ফুরণ হইয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত জীবের অন্তঃপ্রকৃতির নিত্য সাম্য বিধান করা আছে। তাই বাহ্যপ্রকৃতির দ্যোতনা দেখিয়া অন্তঃ-প্রকৃতির পরিচয় লইতে হয়। পূর্ব্বেই ত বলিয়া রাখিয়াছি যে, আমি আমাকে চিনি না বলিয়াই, আমারই সাধনা। আমাকে চিনিতে হইলে, বাহ্য প্রকৃতি বা বিসৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। শরৎকাল মাতৃশক্তি-উন্মেষের কাল। বঙ্গভূমি মাতৃশক্তির আধাররূপিণী। এইটুকু বুঝিলেই মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের বিলোম-পদ্ধতি বুঝা যাইবে; তন্ত্রের সাধনাপদ্ধতির মূল মন্ত্রের সমাচার জানা যাইবে। এইবার সেই কথাটাই সংক্ষেপে বলিব।

ষড় ঋতুর মধ্যে শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত, এই তিন ঋতুই মাতৃশক্তি-উন্মেষের ঋতু বলিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই তিন ঋতুতে প্রাকৃত সকল ঘটনায় মাতৃত্বের স্ফুরণ হইয়া থাকে; সকল রকমের শস্য উৎপন্ন হয়; পুষ্প সকল ফলে পরিণত হয়। জড়শক্তি এই তিন ঋতুতেই জননীরূপা হন। ফলে, এই তিন ঋতুতে জীবদেহে মাতৃত্বের বিকাশ হইয়া থাকে। তাই এই তিন ঋতুই মাতৃপূজার প্রশস্ত ঋতু। শরতে ও হেমন্তে লক্ষ্মী, দুর্গা, কোজাগর, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে; বসন্তে সরস্বতী ও বাসন্তী দুর্গোৎসব, এবং মধুমাধবে তারা ও শ্মশানকালীর পূজা হয়। এই তিন ঋতুই শব-সাধনার প্রধান ঋতু। দ্বাদশ রাশির মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী রাশি, কতকগুলি পুরুষ রাশি আছে। কন্যা রাশি স্ত্রী রাশি, ভাস্কর কন্যারাশিস্থ হইলেই দুর্গোৎসব করিতে হয়। আর এক কথা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নকে বৎসরের দিবা ও নিশা বলা হইয়া থাকে। এক বৎসর দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। নিশার দ্বিযামা ও ত্রিযামা স্ত্রীত্বের উন্মেষের কাল; দিবাভাগের প্রথম দেড় প্রহরকেও নারীকাল বলে। দক্ষিণায়নে শরৎ ও হেমন্ত দ্বিযামা ও ত্রিযামা; তাই এই সময়ে, দেবী-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। বসন্ত ঋতু উত্তরায়ণের প্রথম প্রভাত, প্রায় দেড় প্রহর বলিলেও চলে; তাই বসন্তেও নারী দেবতার পূজা হইয়া থাকে। চণ্ডীতে স্তুতি আছে,—

প্রকৃতি স্তুঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥"

ইহাকেই বলে,—বাহ্য প্রকৃতির পরিলক্ষণা। এইটুকু দেখিয়াই বুঝা যায়, কখন, কোন কালে সাধকের দেহে মাতৃশক্তির উন্মেষণ হইয়া থাকে। এইটুকু বুঝিবার জন্য ভাগবতী জ্যোতিষ শাস্ত্রের উদ্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে তাই চক্ষুষ্মান খঞ্জ বলা হয়; কারণ, জ্যোতিষের সাহায্যে সাধক দেখিতে পায়, আর সাধনা শাস্ত্র অন্ধ অথচ বলবান পথিক। দেবতার পথে বিচরণ করিতে হইলে জ্যোতিষকে স্কন্ধে করিয়া সাধক তাহারই নির্দ্দেশমত অগ্রসর হইয়া থাকেন। এই হেতুই আমাকে বর্ষের স্ত্রীত্ব ও পুংত্বের বিষয় ইঙ্গিত করিয়া বলিতে হইল।

দেবীর পূজা, নিশার পূজা, তাই উহাকে নবরাত্রের পূজা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শরতের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমীর দিনোদয় পর্য্যন্ত এই নবরাত্রি দেবীর পূজা হইয়া থাকে; সেই হেতু ইহাকে উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র নবরাত্রের পূজা বলে। তবে নিবন্ধকারদের আদেশমতে পিতৃপক্ষের নবমী হইতে মাতৃশক্তির উন্মেষ হয় বলিয়া, বঙ্গের তান্ত্রিকগণ নবম্যাদিকল্পারম্ভ করিয়া এক মাস কাল মাতৃপূজা করিয়া থাকেন। তাই বাঙ্গালার বহু স্থানে এক মাস কাল মায়ের পূজা হয়। ইহাই হইল দ্বিযামার পূজা। শ্যামাপূজা ত্রিযামার পূজা—ঘোরা রজনীতেও মায়ের আরাধনা। দক্ষিণায়ন দেবনিদ্রার কাল হইলেও, দেবলোকের নিশাকাল হইলেও, দ্বিযামায় ও ত্রিযামায় স্ত্রীত্বের বিকাশ হয় বলিয়াই, বৈদিক ব্যবস্থানুসারে ইহা যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অকাল হইলেও, তন্ত্রের হিসাবে মাতৃপূজার প্রশস্ত কাল। তাই দেবীর অকালবোধন হয়।

জননী জাগৃহি! জাগো মা, কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধারে জাগিয়া উঠ মা! এই ঘোর নিশায় দেবনিদ্রার কালেই ত তোমার জাগরণ হইবে। ঐ দেখ, প্রকৃতি সতী শস্যপূর্ণা হইয়া জাগিয়াছেন। ঐ দেখ, নিত্য অপচীয়মান নদীপথলে কুমুদকহ্লার ফুটিয়া, কাননে প্রান্তরে কাশকুসুম বিকশিত হইয়া, তোমার জাগরণের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। তুমি জাগিলে ভিতরের ও বাহিরের, জীবের ও বিশ্বষ্টির মহাশক্তি সম্মিলিতা হইয়া মহামায়ার মোহ-যবনিকা ছিন্ন করিতে পারিবে। তুমি জাগিলে আমি আমাকে চিনিতে ও জানিতে পারিব।

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্য স্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥

চামুণ্ডা।

চণ্ডী।

উঠ মা—তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বেশ্বরী ; উঠ, উঠ, তুমি উঠিলে সব উঠিবে, তুমি জাগিলে সবাই জাগিবে। কেন না, তোমার জাগরণে আমার জাগরণ। আমি জাগিলে আমার জগৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমার সহিত আমার বিসৃষ্টির পরিচয় হইবে ; তখন আমি সদসৎ বিচার করিতে পারিব। সৎকে অবলম্বন করিয়া অসতের পরিহার করিব। উঠ মা, জগজ্জননী, লোকপালনী, সনাতনী। তুমি মা—

"অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥"

তুমি সর্ব্বদেবশক্তির সমবায়রূপিণী মহাশক্তি। তাই তুমি অসুরদর্প-খর্ব্বকারিণী, মহাভয়বিনাশিনী। তুমিই মা—

"দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্ত্রয়হিতৈষিণী।"

তাই তোমায় কন্যারূপে আহ্বান করিতেছি। এস মা উমা, তুমি তোমার পিতৃগৃহে আসিয়া উদিত হও। চপলা-বিকাশের মতন এক একবার দেখা দিয়া আবার ঘোর নিশার অন্ধকারে লুকাইও না। আসক্তির একাদশ-গিরিসমন্বিত-হিমালয়-সদৃশ আমার জীবত্বের গিরিবালিকা তুমি, সোহাগের মেয়েটির মতন তুমি আমার মনোজ শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলাইয়া বেড়াইও না। তুমি এস, আমার হৃদয়ের চিরহিমানীশীতলীকৃত কন্দরে আসিয়া দশ দিক্ আলো করিয়া বস। জনকজননী তুমি মা ঈশানী, তুমি আমার গৃহে এস। আমার প্রাণের ঘটে, স্নেহের মন্দাকিনীসলিলে "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রৈব সন্নিধিং কুরু।" তুমি মা—

"জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।"

শারদজ্যোৎস্নামৌলিমালিনী, শারদেন্দুবিকাশিনী, শ্বেতাঙ্গী, শুভ্রবসনা, চন্দ্রিকাধৌতকপালিনী—তুমি শেফালী কুসুমের মতন নিঃশব্দে আমার হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হও। আমার চিত্তের সকল অন্ধকার দূর হউক, দুঃখদারিদ্র্যের সকল স্থবিরতা অপসৃত হউক। জাগো, জাগো মা জননী! তুমি জাগিলে আমার মোহনিদ্রা—মহানিদ্রা সকলই দূর হইবে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"

তুমি মা চেতনা-দেবী, চৈতন্যরূপিণী। তোমার শক্তি উদ্বোধিতা হইলে বিষ্ণুমায়া থাকিবে না।

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিলে আমার আমিত্বের অরুণোদয় হইবে। তাই

তোমাকে মা বলিয়া কন্যা বলিয়া ডাকিতেছি। অভাবে পড়িয়াছি বলিয়াই ডাকিতেছি; অতি দরিদ্র অতি ক্ষুদ্র হইয়াছি বলিয়াই ডাকিতেছি। বাঞ্ছা-কল্পলতিকে! আমার আমিত্বের ক্ষুদ্রতা দূর কর, আমার সর্ব্বস্ব আমাতেই লীন করিয়া দাও। তাই আমার মাতৃপূজা সকাম পূজা। আমার কিছু নাই, আমি সব চাই। যাহা পাইলে আর কিছু চাহিবার থাকে না, আমি সেই সব চাই। দাও মা! রামপ্রসাদ তাই বড় ক্ষোভেই বলিয়াছেন,—

"আমি ঐ খেদে খেদ করি,
ঐ যে, তুমি মা থাকিতে আমার—
জাগা ঘরে হয় গো চুরি।"

ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। আমি জানি, আমি আছি; আমি জানি, বিশ্বপ্রপঞ্চ আমারই। তুমি আমাতে আছ, বাহিরেও আছ। সব জানি, সব বুঝি—তবু কে জানে কেন আমার জাগা ঘরে হয় গো চুরি! এই চুরি নিবারণ করিবার জন্য রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

"যে দেশে রজনী নাই মা,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
* * *
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

ঘুমেরে ঘুম পাড়াইতে না পারিলে মায়ে পোয়ে ত ভাব হবে না। তাই তোমায় জাগাইতে চাই। ইহাই আমার মাতৃপূজা, ইহাই বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব। একবার বুঝিয়া দেখিবে কি? রামপ্রসাদই ত বলিয়াছেন,—

"ডুব দে মন কালী ব'লে,
হৃদ্-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

একবার ডুব দিয়া দেখ না! তোমার আমিত্বের মধ্যে ডুব দাও, জাতির আমিত্বের সাগরে ডুব দাও। দেখিবে, সে অগাধ জলে দশভুজা দশপ্রহরণ-ধারিণী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, সিংহবাহিনী মা দশদিক্ আলো করিয়া রহিয়াছেন। একবার দেখ—গুপ্ত আনন্দধামের লীলা একবার দেখ—তোমার মুকুরে তোমাকে দেখ, আপনাকে চিন। তোমার বাঙ্গালী-জন্ম সার্থক হইবে। শক্তিময়ীর সন্তান তুমি, শক্তিধর-রূপে প্রকট হইবে। এই শুভদিনে শুভক্ষণে একবার দেখ!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগমনী।

মামা প্রাণগোপাল সুভাষিণীকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসিতেন। সুভাষিণীর বয়স দশ বৎসর, সে বড় অভাগিনী। সাত বৎসর বয়সে সে মাতৃহীনা হয়, তাহার পর এই তিন বৎসর তাহার মামার বাড়ী বলরামপুরে আশ্রয় লইয়াছিল। মাতামহী মাতৃহীনা দৌহিত্রীকে এক বৎসর পরম স্নেহে যত্নে প্রতিপালিত করিয়া কৃতান্তের আহ্বানে পরলোকে প্রস্থান করিলে, সুভাষিণীর মুখের দিকে চাহে, এমন স্ত্রীলোক সংসারে আর কেহই রহিল না। কেবলমাত্র মামা প্রাণগোপালই তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন হইয়া রহিলেন।

সুভাষিণীর পিতা হরিশ চাটুয্যে মহা কুলীন; তাঁহার পিতামহ গোকুল চাটুয্যে এক শত আটটি এবং পিতা গোবর্দ্ধন চাটুয্যে পঁয়ষট্টিটিমাত্র কুলীন-মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। হরিশ পিতার কুপুত্র, একটিমাত্র বিবাহ করিয়া তিনি কুলীনের নাম কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এ জন্য অনেক কুলীন বৃদ্ধের নিকট তাঁহাকে বিস্তর গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। এই চাটুয্যে-বংশ চিরকাল মাতুলগৃহে মাতুলান্নে প্রতিপালিত। তাঁহাদের আদি নিবাস কোন্ জেলায়, কোন্ গ্রামে, হরিশ তাহাও জানিতেন কি না সন্দেহ। উপবৃক্ষের মত তাঁহারা বংশানুক্রমে মাতুলের স্কন্ধে আশ্রয় করিয়া আসিতেছেন। হরিশ এখন মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কয়েক বিঘা জোত জমী, তুঁতের ক্ষেত, আম কাঁটালের বাগান ও কয়েক ঘর শিষ্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক পত্নী বর্ত্তমানে হরিশকে কেহ বহুবিবাহে সম্মত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সাধ্বী পত্নী হরিপ্রিয়া দেবী সাত বৎসরের শিশু কন্যা সুভাষিণীকে রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলে, সাতাশ বৎসর বয়সে হরিশের পত্নীশোক অসহনীয় হইয়া উঠিল। বৎসর পুরিতে না পুরিতে তিনি একটি কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়া পত্নীশোক সংবরণ করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহাকে নূতন করিয়া কালা-পেড়ে ধুতি পরিতে ও মাথায় টেড়ী কাটিতে দেখা গেল। খবরের কাগজ হাতে পড়িলেই তিনি চোখে চশমা আঁটিয়া চুলের কলপের বিজ্ঞাপন খুঁজিতেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল পল্লীবাসী গ্রাম সম্পর্কে তাঁহাকে

'দাদা' বলিয়া ডাকিত, এই দ্বিতীয় সংসারের আবির্ভাবের পর হইতে তাহারা তাঁহাকে দাদা বলিলেই তিনি চটিয়া লাল হইতেন, এবং তাঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোনও লোক তাঁহাকে 'ভায়া' বলিয়া ডাকিলে তিনি তাহাকে তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া চারি আনা সেরের 'অম্বুরী' তামাকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার তামাক-খরচ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দিন দিন বাড়িয়া উঠিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, হরিশ মনুষ্যচর্ম্মাবৃত একটি গর্দ্দভ ছিলেন। কুলীনের মেয়ে পিতার স্কন্ধের ভারস্বরূপ। আজকাল হিন্দু গৃহস্থমাত্রেরই কন্যা পিতার জীবনের অভিশাপস্বরূপ। মেয়ে হইয়াছে শুনিলে গৃহে বিষাদের ছায়া পড়ে, পিতার মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়, প্রসূতি আপনাকে মহা দুর্ভাগিনী মনে করেন। কিন্তু যে সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বদেবতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় কন্যার জন্ম, তাঁহার সৃষ্ট মায়ার বন্ধনেই বালিকার জীবনরক্ষা হয়। হরিশ সুভাষিণীকে গলগ্রহ মনে করিতেন, এবং সন্ধ্যার পর যখন তিনি ঘরের বারান্দায় একখানি অর্দ্ধছিন্ন 'মাদুরে'র উপর ময়লা বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া ডাবা হুঁকার অম্বুরী তামাক টানিতেন, আর আফিংয়ের মৌতাতে তাঁহার চক্ষু দুটি নিমীলিত হইয়া আসিত, তখন তিনি কিরূপে ভীষণ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিতেন। কোনও কোনও দিন তাঁহার মনে হইত, বিধাতা পুরুষ বড় গোল করিয়া ফেলিয়াছেন, স্ত্রীটিকে না লইয়া যদি তিনি কন্যাটিকে সরাইতেন, তাহা হইলে বিচারটা ঠিক হইত।

কিছুদিনের মধ্যেই হরিশ বিধাতা পুরুষের ভ্রম প্রকারান্তরে সংশোধিত করিলেন। সুভাষিণীকে তিনি তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। সুভাষিণীর মাতামহী জীবিত ছিলেন, তিনি দৌহিত্রীকে ফেলিতে পারিলেন না। প্রাণগোপাল ইহাতে আপত্তি করেন নাই বলিয়া প্রাণগোপালের স্ত্রী নয়নতারা একবেলা অনশনে ও তিন দিন ধরাসনে কালযাপন করিয়াছিলেন; সপ্তাহ কাল স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। প্রাণগোপাল ইহা শাপে বর মনে করিলেন। দিবারাত্র প্রেমময়ী ভার্য্যার বচনসুধা-পানে তাঁহার এমন উদর পূর্ণ হইয়াছিল যে, কয়েক দিনের রোমন্থন ভিন্ন তাহা জীর্ণ হইবার আশা ছিল না।

কিন্তু তথাপি তাঁহাকে সুভাষিণীর ভার লইতে হইল। তাঁহার মা ভাবিতেন, "পুত্র স্ত্রৈণ, দায়ে পড়িয়া ভাগিনীটিকে লইয়া আসিয়াছে বটে,

কিন্তু মুখে একটা মিষ্ট কথা নাই!" স্ত্রী ভাবিতেন, "আমার স্বামী মায়ের গোলাম, আমার উপর এক বিন্দু মায়া মমতা নাই। নিজের ছেলে মেয়ের চেয়ে ভাগিনীর উপর বেশী দরদ।" দেখিয়া শুনিয়া প্রাণগোপাল হাল ছাড়িয়া দিলেন; মাতা ও স্ত্রী উভয়কে যত দূর পারিতেন, পরিহার করিয়া চলিতেন।

সুভাষিণী কিছুদিনের মধ্যেই মামার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল। প্রাণগোপালের কন্যা আহ্লাদীর মত দুষ্টু মেয়ে ভূমণ্ডলে বোধ হয় অল্পই আছে। দুষ্টুমী তাহার সহজাত-সংস্কারের মত। তাহাকে যাহা বলা হইত, সে তাহার উল্টা করিত! আহ্লাদীর অত্যাচারে পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অনুগ্রহে কাহারও টালে শশা কি শিম থাকিত না। মধু বেণে তাহার পিতার বয়সী, মশলার দোকান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। আহ্লাদী একদিন তাহার দোকানে গিয়া হাজির; বলিল, "মধুদাদা, আমাকে একমুঠো ছোট এলাচ দাও।" মধু বলিল, "যা, পয়সা আন্‌গে. বিনি পয়সায় একমুঠো এলাচ খায় না।" আহ্লাদী মধুকে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নাচিতে নাচিতে বলিল:—

"মোদো খায় খোদোর বিচি,
নীলমণি খায় ফ্যান,
মোদোর বাপের দাড়ী ধরে
নাচ্‌চে কোলা ব্যাঙ্‌!"

মধু রাগিয়া আগুন!—মধুর স্ত্রীর সহিত আহ্লাদীর মার সে দিন যেরূপ কলহ আরম্ভ হইল, কংগ্রেসের কলহ তাহার নিকট লজ্জা পায়।

একদিন দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী জমীদার-বাড়ী হইতে ফিরিয়া প্রাণগোপাল বলিলেন, "আহ্লাদী, এক গেলাস জল আন্‌তো!"

আহ্লাদী একটা শশা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "কে এখন গেলাস খুঁজে বেড়ায়?"

নিকটে সুভাষিণী দাঁড়াইয়া ছিল!—সে বলিল, "ছি, আহ্লাদী, মামার তেষ্টা পেয়েছে, এমন কথা কি বলে? আমি তোমাকে জল এনে দিচ্ছি মামা!"

সুভাষিণী গামছা পরিয়া তাড়াতাড়ি তাহার আই-মার কলসী হইতে এক গেলাস জল আনিয়া মামাকে দিল।—তাহার পর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মামা, তুমি বড্ড ঘেমেছ—একটু বাতাস করবো?"

কথাটা মামীর কাণে গেল। তিনি বলিলেন, "ও বাবা, এইটুকু মেয়ের এত শয়তানী? কালিতে আরও কত না হবে। এখনই মামাকে ভুলোনার চেষ্টা।—হারামজাদী দেখচি আমার আহ্লাদীকে পর করে দেবে!"

প্রাণগোপাল সুভাষিণীর কথায় ও ব্যবহারে ক্রমে তাহার প্রতি যত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, তাহার প্রতি গৃহিণীর আক্রোশ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মেয়ের দুষ্টামীর জন্য প্রাণগোপাল আহ্লাদীকে গালি দিতেন; আহ্লাদীর মা মনে করিতেন, "মেয়েটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, একচোখো মিন্‌সে!"

কিন্তু প্রাণগোপালের উভয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সমান ছিল। তিনি আহ্লাদীকে ও সুভাষিণীকে কাপড় চোপড়, পুতুল, জামা সমান ভাবে দিতেন। তিনি বলিতেন, "আহা! মেয়েটা বড় হতভাগা; মা নেই, বাপ থাকৃতেও নেই। আমি যদি ওর মুখের দিকে না চাইব, তবে ওর গতি কি হবে?"

গৃহিণী বলিতেন, "ও আর আহ্লাদী সমান? ইচ্ছা করে, তোমার সংসার ছেড়ে দিনকত মায়ের কাছে গিয়ে থাকি।"

প্রাণগোপাল একটা তীব্র বিদ্রূপের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তার পরদিন তোমার মা আমার কাছে ছুটে আস্‌বেন। তাঁর সঙ্গে আবার চাল ডাল পাঠাতে হবে।"—নয়নতারার পিতৃগৃহের অবস্থা এইরূপ স্বচ্ছল ছিল!

"কি! আমার মায়ের ঘরে ভাত নেই, তুমি তাঁকে চরদিন ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌চো! ও মা! ঘেন্নায় মলাম যে! আমি গালে মুখে চড়িয়ে মরবো। আমার মা বাপের খোঁটা!" প্রাণগোপালের প্রাণাধিকা নয়নতারা কোঁৎ কোঁৎ শব্দে নাক ঝাড়িতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় অবগুণ্ঠন (কারণ শাশুড়ী নিকটে ছিলেন) ভিজিয়া গেল। তিনি শাঁখা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে, প্রাণগোপালের মাতা অনেক মিষ্ট কথায় বধূকে নিরস্ত করিলেন।

মধ্যাহ্নকালে প্রাণগোপাল বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে আহ্লাদী একখানি কঞ্চি লইয়া বাতাবি নেবুর গাছ ঠেঙ্গাইতে লাগিল; সুভাষিণী তাহার মামার মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল তুলিতে তুলিতে বলিল, "মামা, তুমি যে 'নিলেম্বরী' খান দিয়েছ, ও আমি পরবো না।—আমাকে একখান মোটা কাপড় এনে দিও। মামীমা বলেন, আমি বাপে-খেদানো মেয়ে, ও রকম ভাল কাপড় আমার মানায় না।"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "তোর মামীমার যেমন কথা!"

যতদিন প্রাণগোপালের মা বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন সুভাষিণী মায়ের অভাব জানিতে পারে নাই। আইমার মৃত্যুর পর তাহার বুক যেন খালি হইয়া গেল।—সে ভাবিল, "সকলেরই মা আছে, আমার মা নেই কেন? —সবারই বাপ মেয়েকে আদর করে, ভালবাসে, আমার বাবা কখনও আমাকে দেখ্‌তেও আসেন না।" সংসারে সকলের অবস্থা সমান নয় কেন, বালিকা এ সমস্যা বুঝিতে পারিত না।

প্রাণগোপাল মায়ের মৃত্যুর পর সুভাষিণীর সুখস্বচ্ছন্দতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নয়নতারার উৎপীড়ন হইতে ভাগিনেয়ীকে রক্ষা করেন—তাঁহার এরূপ শক্তি ছিল না। যেখানে রমণীর অধিকার অক্ষুণ্ণ—সেখানে পুরুষের শক্তি পরাহত।

সুভাষিণী অল্পবয়সেই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বুঝিতে শিখিয়াছিল। সে যদি আহ্লাদীর মত দুরন্ত হইত, তাহা হইলে সংসারে তাহার স্থান হইত না। সমস্ত দিন মামীমার 'ফরমাস্‌' খাটিয়া রাত্রে সে মেঝের এক পার্শ্বে একখানি জীর্ণ মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িত। প্রাণগোপালের ছেলে মেয়ে তখন চৌকীর উপর শুইয়া হুড়োহুড়ি করিত। তাহাদের শয্যাপ্রান্তে সুভাষিণীর স্থান ছিল না।—প্রাণগোপাল একদিন স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "সুভা ছেলে মানুষ, নীচে একা শুতে পারে না, চৌকীতে ওকে একটু যায়গা দিলে দোষ কি?"

নয়নতারা নথ ঘুরাইয়া বলিলেন, "দোষ ত কিছুতে নেই—ঐ একখান ছোট চৌকীতে ছেলে মেয়ে দুটি নিয়ে আমারই যায়গা হয় না। 'আপ্‌নি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' ভাগনীর 'দুঃখু' দেখে এত কষ্ট হয়ে থাকে তো একখানি নূতন চৌকী গড়িয়ে দাও না।"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "অপরাধ হয়েছে, এমন কথা আর বল্‌বো না।"

নয়নতারা ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "না, যত অপরাধ—সব আমার!—ইচ্ছে করে, এমন সংসারের মুখে নুড়ো জেলে যে দিকে দুই চোখ যায়, চলে যাই।"

প্রাণগোপাল অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন, "না, তুমি চলে যাবে কেন, তোমার অত্যাচারে আমাকেই বিবাগী হ'য়ে চলে যেতে হবে।—মেয়েটা যেন তোমার চক্ষুঃশূল।"

প্রাণগোপাল আর ক্ষণমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া হুঁকা লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে চলিলেন। বালক ভৃত্য গৌরে বাগ্দী বিচিলির বালিশে মাথা রাখিয়া বারান্দায় পড়িয়া নাক ডাকাইতেছিল। কর্ত্তার খড়মের শব্দে সে 'ধড়মড়' করিয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর উভয় চক্ষু ডলিতে ডলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণগোপাল বলিলেন, "শিগ্‌গির এক ছিলিম তামাক সাজ।—আলোটা নিব্‌লো কেমন করে রে?"

বেগুনগাছে ও শাকের ক্ষেতে জল দিয়া গৌরের শ্রান্তিবোধ হইয়াছিল, তাই সে বিচালীর বালিশ মাথায় দিয়া মুদিতনেত্রে নাসাগর্জ্জনসহকারে শ্রান্তি দূর করিতেছিল। প্রদীপটা জ্বালিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাতে যে একটু তেল আনিয়া দিবে, সেটুকু বিলম্বও সহে নাই। কিন্তু সে কৈফিয়তে চুকিল না, বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, একটা জোনাকী পোকা 'পিদিমে' পড়বার যো 'হয়েল' তাই 'পিদিম'টা নিবিয়ে দিয়েছি। আপুনি যে কর্ত্তা বুলেছিলেন, জোনাকী পোকা 'পিদিমে' পড়া দোষ!"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "বেশ করেছিস্, এখন আলো জ্বাল।"

গৌরে বলিল, "তা হ'লে কর্ত্তা, মেচ-বাক্সোটা মা ঠাগ্‌রুণের কাছ থেকে চেয়ে আনি।"

প্রাণগোপাল তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তার আর দরকার নেই, তোর চক্‌মকি বের কর।"

গৌরে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, শোলাখানা পুড়ানো নেই, আর আল্‌লোদী পাথরখানা বিড়াল তাড়াতে কোথায় ফেলে দিয়েছে, খুঁজে পাইনে।"

প্রাণগোপাল বলিলেন "তবে থাক্ তামাক।—আমার খোলখান পাড়, দেখিস্, যেন ফেলে ভাঙ্গিস্‌নে, যদি ভাঙ্গিস্, তবে তোকেও গুঁড়ো করবো।"

গুঁড়া হইবার ভয়ে গৌরে অতি সাবধানে খোলখান দেয়ালের 'দাণ্ডি' হইতে পাড়িয়া প্রাণগোপালের হাতে দিল। প্রাণগোপাল সতরঞ্চিতে বসিয়া খোলে মৃদু আঘাত করিয়া সংকীর্ত্তন ধরিলেন,—

"আজু বৃন্দাবনে এ কি শোভা নেহারি।"

মৃদঙ্গধ্বনি শুনিয়া পাড়ার পাঁচ জন হরিসংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্ত প্রাণগোপালের বৈঠকখানায় সমাগত হইল। তখন জোরে জোরে খোল বাজিতে লাগিল, খোল করতালের শব্দে নৈশ পল্লীপ্রকৃতি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নূতন করিয়া গান আরম্ভ হইল,—

ভবানী।

প্রাণগোপাল আর ক্ষণমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া হুঁকা লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে চলিলেন। বালক ভৃত্য গৌরে বাগ্দী বিচিলির বালিশে মাথা রাখিয়া বারান্দায় পড়িয়া নাক ডাকাইতেছিল। কর্ত্তার খড়মের শব্দে সে 'ধড়মড়' করিয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর উভয় চক্ষু ডলিতে ডলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণগোপাল বলিলেন, "শিগ্‌গির এক ছিলিম তামাক সাজ।—আলোটা নিব্‌লো কেমন করে রে?"

বেগুনগাছে ও শাকের ক্ষেতে জল দিয়া গৌরের শ্রান্তিবোধ হইয়াছিল, তাই সে বিচালীর বালিশ মাথায় দিয়া মুদিতনেত্রে নাসাগর্জ্জনসহকারে শ্রান্তি দূর করিতেছিল। প্রদীপটা জ্বালিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাতে যে একটু তেল আনিয়া দিবে, সেটুকু বিলম্বও সহে নাই। কিন্তু সে কৈফিয়তে চুকিল না, বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, একটা জোনাকী পোকা 'পিদিমে' পড়বার যো 'হয়েল' তাই 'পিদিম'টা নিবিয়ে দিয়েছি। আপুনি যে কর্ত্তা বুলেছিলেন, জোনাকী পোকা 'পিদিমে' পড়া দোষ!"

প্রাণগোপাল বলিলেন, "বেশ করেছিস্, এখন আলো জ্বাল।"

গৌরে বলিল, "তা হ'লে কর্ত্তা, যেচ-বাক্সোটা মা ঠাগ্‌রুণের কাছ থেকে চেয়ে আনি।"

প্রাণগোপাল তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তার আর দরকার নেই, তোর চক্‌মকি বের কর।"

গৌরে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, শোলাখানা পুড়ানো নেই, আর আগ্‌লাদী পাথরখানা বিড়াল তাড়াতে কোথায় ফেলে দিয়েছে, খুঁজে পাইনে।"

প্রাণগোপাল বলিলেন "তবে থাক্ তামাক।—আমার খোলখান পাড়, দেখিস্, যেন ফেলে ভাঙ্গিস্‌নে, যদি ভাঙ্গিস্, তবে তোকেও গুঁড়ো করবো।"

গুঁড়া হইবার ভয়ে গৌরে অতি সাবধানে খোলখান দেয়ালের 'দাণ্ডি' হইতে পাড়িয়া প্রাণগোপালের হাতে দিল। প্রাণগোপাল সতরঞ্চিতে বসিয়া খোলে মৃদু আঘাত করিয়া সংকীর্ত্তন ধরিলেন,—

"আজু বৃন্দাবনে এ কি শোভা নেহারি।"

মৃদঙ্গধ্বনি শুনিয়া পাড়ার পাঁচ জন হরিসংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য প্রাণগোপালের বৈঠকখানায় সমাগত হইল। তখন জোরে জোরে খোল বাজিতে লাগিল, খোল করতালের শব্দে নৈশ পল্লীপ্রকৃতি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নূতন করিয়া গান আরম্ভ হইল,—

ভবানী।
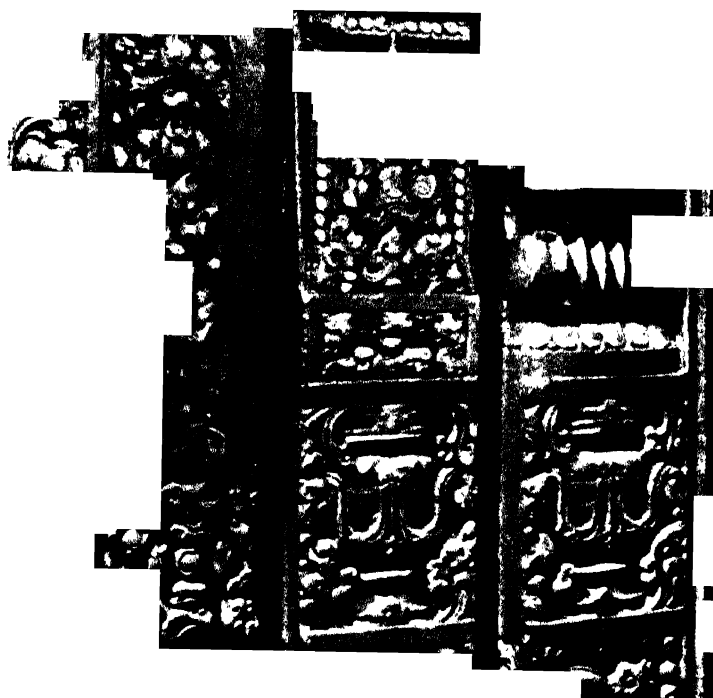
চৌকাঠের পার্শ্বফলক।

বাণনগর হইতে সংগৃহীত কষ্টিপাথরের চৌকাঠের পার্শ্বফলকের নীচের অংশ। দীনাজপুর রাজবাড়ীতে একটা Gate এ গাঁথা আছে।

"সঙ্কীর্ত্তন মাঝে আমার গৌর নাচে।"

ভৃত্য গৌর তখন গোয়ালঘরে সাঁজালের কাছে গিয়া সাঁজালের আগুনে কল্‌কে বোঝাই করিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল।

বাহিরে এত ধূম, কিন্তু অন্তঃপুরে সুভাষিণীর চক্ষুতে নিদ্রা নাই, সে মামা মামীর প্রেমালাপ শুনিয়াছিল, চক্ষুর জলে তাহার বালিশ ভিজিয়া গেল।

মামী ডাকিলেন, "সুভা ওঠ্, কুয়ো থেকে এক ঘটী জল তুলে আন্।"

সুভাষিণী ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিল;—বলিল, "মামীমা, বাইরে বড় আঁধার, একা যেতে ভয় করে।"

নয়নতারা কণ্ঠ আরও সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন, "ভয় করে! কচি খুকী!—উনি জল তুল্‌তে যাবেন, এক জন বাঁদীকে ওর সঙ্গে পাহারা দিতে পাঠাতে হবে! এত সুখে আর কাজ নেই, যা, শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়।—আহ্লাদী ভাত খেয়েছে, এঁটোটা এখনও পরিষ্কার করা হয় নি।—প্রদীপ জ্বাল্‌তে না জ্বাল্‌তে ঘুম!"

সুভাষিণী ঘটী লইয়া কুয়ায় জল তুলিতে গেল। কুয়া সেখান হইতে অনেক দূরে, পাশে শশার টাল, দুটো ইঁদুর টালের উপর 'কিচির মিচির' করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল।—সে কোনও রকমে এক ঘটী জল তুলিয়া ঘরের দিকে আসিয়াছে, এমন সময় বাড়ীর পাশের প্রকাণ্ড বকুল গাছের ডালে বসিয়া একটা হুতুম প্যাঁচা গম্ভীরস্বরে ডাকিল, "তু-থুনি!"

সুভাষিণী ভয়ে দৌড়াইতে গিয়া একখানি ইঁটে বাধিয়া পড়িয়া গেল। ঘটীর সমস্ত জল তাহার কাপড়ে পড়িয়া গেল, খোলায় তাহার কপাল কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল, সে কষ্টে বলিল, "মা গো!"

যে মাতৃহীন, সেও অসময়ে মাকে ডাকে।

শব্দ শুনিয়া নয়নতারা উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিতে দীপ-হস্তে বাহিরে আসিলেন; তিনি বালিকাকে না তুলিয়া—সে জল ফেলিয়া দিয়াছে বলিয়া তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, এবং পরদিন তাহার ভাত বন্ধ করিবেন বলিয়া রায় প্রকাশ করিলেন।

গোলমাল শুনিয়া হুঁকা ফেলিয়া গৌরে সেখানে আসিল। গৌরে এই মাতৃহীনা বালিকাকে স্নেহ করিত। ঘরে যাহার আহা বলিবার কেহ নাই,

পরে তাহার বেদনায় হাত বুলাইয়া দেয়। গৌরে সুভাষিণীর হাত ধরিয়া তুলিল, ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহার কপালে জলপটী বাঁধিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে শয়নকক্ষের দ্বারে রাখিয়া আসিল; সে বাগ্দী, শয়নকক্ষে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল না।

নয়নতারা হাঁকিলেন, "বাগ্দীকে ছুঁয়েছিস্, ও কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুক্‌তে পাবিনে।"—

সুভাষিণী চালের 'বাতা' হইতে একখানি জীর্ণ মলিন বস্ত্র টানিয়া লইয়া তাহাই পরিয়া ঘরে শুইতে গেল চক্ষুর জলে সে পথ দেখিতে পাইল না; কেবল অভ্যাস ছিল বলিয়া টলিতে টলিতে কোনও রকমে সে তাহার মাদুরখানার উপর গিয়া পড়িল। কপালের বেদনায় সমস্ত রাত্রি বালিকা ঘুমাইতে পারিল না। গভীর রাত্রে পিপাসায় কাতর হইয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে মামীমার নিকট একটু জল চাহিল!—কিন্তু তাঁহার কোনও সাড়াশব্দ পাইল না।

তখন সে অতি কষ্টে উঠিয়া কলসী হইতে এক 'পাউলি' জল লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

নয়নতারা বলিল, "এই রাত দুপুরে পেটে সাপর ঢুকেচে! ধন্যি মেয়ে বাবা, জালিয়ে পুড়িয়ে মারলে। কত পাপ করেছিলাম, তাই এমন আবাগের বেটীকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষ্‌তে হচ্ছে!"

ক্রমে পূজা আসিল। সপ্তমীপূজার দিন প্রাণগোপাল গ্রাম্য বাজার হইতে দুইখানি পেঁয়াজ রঙ্গের শাড়ী আনিয়া একখানি আহ্লাদীকে ও অন্যখানি সুভাষিণীকে প্রদান করিলেন।

আহ্লাদী বায়না ধরিল, "ও দুখান কাপড়ই আমি নেব।"

নয়নতারা বলিল, "সুভা, তোর কাপড়খান আহ্লাদীকে দে; তোর অনেক কাপড় আছে, তাই পরে' পূজো দেখিস্। নূতন শাড়ী না হলেও পূজো দেখা যায়।"

সুভাষিণী বিনা প্রতিবাদে শাড়ীখানি মামীমার হাতে দিল। তাহার পর সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাসন মাজিতে গেল। সংসারের যত বাসন, সমস্তই তাহাকে প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হইত।

সন্ধ্যার সময় প্রতিবেশী গাঙ্গুলীবাড়ীতে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল; মা দুর্গার আরতি আরম্ভ হইল। ধূপের সৌরভে চারি দিক পূর্ণ হইল। গ্রামের

স্ত্রী পুরুষেরা দল বাঁধিয়া গ্রাম্যপথে পূজাবাড়ীতে আরতি দেখিতে ছুটিল। নয়নতারা আহ্লাদীকে লইয়া আরতি দেখিতে চলিলেন; সুভাষিণীকে ডাকিলেন না, সেও তাঁহার সহিত যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

মামীমার এতদিনের ব্যবহারে—উপেক্ষায় ও বিরাগে বালিকার শিশুহৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাকে ফেলিয়া আহ্লাদীকে লইয়া পূজা দেখিতে যাওয়ায় তাহার যত কষ্ট হইল, তাহার অন্য দিনের নানাপ্রকার কঠোরতর ব্যবহারেও তাহার তত কষ্ট হয় নাই। সুভাষিণী ঘরের বারান্দার একপাশে বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শারদ-সপ্তমীর খণ্ড চন্দ্র মধ্যাকাশে বসিয়া রজতকিরণধারায় ধরাতল প্লাবিত করিতেছিলেন। শরতের নির্গলিতাম্বু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি চন্দ্রকরোজ্জ্বল অম্বরপথে অতি ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। বকুলবৃক্ষের নিবিড় পল্লবরাশির অন্তরালে বসিয়া একটা পাখী মধ্যে মধ্যে 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' শব্দে নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী ডোবার ধারে অযত্নসম্ভূত রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে সদ্যো বিকশিত রজনীগন্ধা-স্তবকের মৃদুগন্ধ সুশীতল নৈশসমীরণপ্রবাহে ভাসিয়া চতুর্দ্দিক সৌরভাকুল করিতেছিল। পূজাবাড়ীতে আরতির ঢাক তুমুলশব্দে বাজিয়া বাজিয়া তখন থামিয়া গিয়াছিল; কেবল ভূ-বিবরমধ্যবর্ত্তী ঝিল্লীর আশ্রান্ত তানপুরা তখনও নীরব হয় নাই। দূরবন হইতে কদাচিৎ দুই একটা নিশাচর পক্ষীর বিকট কণ্ঠস্বর রজনীর গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল। গ্রাম্য নরনারীগণ আরতি দেখিয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

বালক ভৃত্য গৌরে গরুর জাবনা মাখিয়া দিয়া হাত ধুইয়া তাহার নূতন 'ফোতা'-(চাদর)-খানি মাথায় বাঁধিল; তাহার পর তৈলপক্ক বাঁশের লাঠীখানি লইয়া পূজা দেখিতে বাহির হইবে, এমন সময় ক্রন্দমানা সুভাষিণীর প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া সহানুভূতিভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে? সুভা দিদি নাকি? তুমি পূজো দেখতে যাও নি?"

সুভাষিণী কোনও কথা না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গৌরেরও মা ছিল না, সে সুভাষিণীর মনের কষ্ট বুঝিতে পারিল। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মা ঠাকরুণ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি? কেঁদ না দিদি! চল, আমি তোমাকে ঠাকুর দেখিয়ে আনি। আরতির সময় ভিড়ে 'পিত্তিমে-

দর্শন' হয় না, তাই আমি এতক্ষণ যাইনি, গাই কটাকে জাবনা দিচ্ছিলাম! এখন আর বেশী ভিড় নেই, চল, তোমাকে দেখিয়ে আনি।"

সুভাষিণী মলিন-বস্ত্রেই গৌরের সঙ্গে প্রতিমা-দর্শনে চলিল।

গাঙ্গুলী-বাড়ীতে প্রতিমার সোনালি সাজ। দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোকরাশি ডাকের সাজে ও প্রতিমার মুখে প্রতিফলিত হইতেছে। দশপ্রহরণ-ধারিণী মা দুর্গার নথশোভিত মুখের কি প্রশান্ত ভাব! সুভাষিণীর হৃদয় ভক্তিতে, প্রীতিতে পূর্ণ হইল; সে 'ঠাকুর-দালানে' উঠিয়া দেবীচরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিল; মনে মনে বলিল, "মা, তুমি এত গহনা পোরে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী এসেছ,—তুমি সকলের মা, আমার দুঃখ তবে দূর কর না কেন? আমারও ত বাবা আছেন, তিনি একবারও আমার খোঁজ নেন না। এই পূজার সময় বাপে মেয়েদের কত ভাল ভাল কাপড় জামা গহনা দিয়াছেন, আর আমার বাবা আমাকে ভুলে আছেন। মা, আমাকে তুমি আমার বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও, মামীমার কাছে আর আমি থাকতে পারচিনে।"—অভিমানিনী বালিকার অশ্রুপ্রবাহে তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

মামীমার বকুনীর ভয়ে সুভাষিণী সেখানে অধিক বিলম্ব করিতে পারিল না। দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাকে তাহার কাতর প্রার্থনা জানাইয়া গৌরের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

প্রাণগোপাল তখনও পূজা দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই, চণ্ডী-মণ্ডপে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, অদূরে একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া এক জন লোক বোধ হয় গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সুভাষিণীকে অন্তঃপুরে প্রবেশোদ্যতা দেখিয়া আগন্তুক ডাকিলেন, "কে যায়? সুভা না কি?"

সুভাষিণী চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিরিয়া বলিল, "কে? বাবা?"

হরিশ চাটুয্যে দুই বৎসরের পরে আজ সপ্তমীর রাত্রে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। দুই বৎসরের পরে পিতা পুত্রীতে সাক্ষাৎ! সুভাষিণী পিতার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হরিশ নীরবে কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; তিনি কি বলিয়া অভিমানিনী কন্যাকে সান্ত্বনা দান করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে সুভাষিণী মুখ তুলিয়া কোমলদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, তবে তুমি আমাকে ভুলে যাও নি? আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে, বাবা?"

হরিশ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, মা আমি তোমাকেই নিতে এসেছি। এবার ভিক্ষে শিক্ষে করে' মা জগদম্বাকে ঘরে এনেছি; কিন্তু কাল রাত্রে মা আমাকে স্বপন দিয়েছেন, 'তুই তোর মেয়েকে অনাহারে পরের বাড়ী ফেলে রেখে আমাকে ঘরে এনেছিস্, তোর মত নিষ্ঠুর বাপের পূজা আমি গ্রহণ করবো না। যদি আমার পূজা করতে চাস্ ত তোর মেয়েকে ফিরিয়ে আন্।'—তাই মা! এই পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে, তোকে তাড়াতাড়ি নিতে এসেছি। চল্, বাড়ী যাই, গাড়ী ঠিক হয়েছে; আর আমি আমার মাকে কাছ-ছাড়া করবো না।"

প্রাণগোপাল গৃহে ফিরিয়া ভগিনীপতির মুখে সকল কথা শুনিলেন। তিনি বিষণ্নমনে ভাগিনেয়ীটীকে বিদায় দিলেন। আপদ গেল, ভাবিয়া নয়নতারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

সুভাষিণী বাড়ী আসিয়াই চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া ভক্তিভরে মাদুর্গাকে প্রণাম করিল; বলিল, "মা, তুমি বছরে বছরে আমাদের বাড়ী এসো, তা হ'লে আমি বাবার কাছে থাকতে পাব।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিদেশী গল্প।

বাজে খরচ।

ইতালী ও ফরাসী রাজ্যের সীমান্তে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে "মোনাকো" নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। বহু প্রাদেশিক নগরের অধিবাসীর সংখ্যা মোনাকোর লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। সমগ্র রাজ্যে সাত সহস্রের অধিক অধিবাসী ছিল না। প্রজাগণের মধ্যে রাজ্যটি বণ্টন করিয়া দিলে বোধ হয়, প্রত্যেকের অংশে এক বিঘা জমীও পড়ে না। রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও ইহার এক জন প্রকৃত রাজা ছিলেন। তাঁহার বসবাসের জন্য রাজপ্রাসাদ ছিল; সভাসদ, মন্ত্রী, ধর্ম্মোপদেষ্টা, সেনাপতি ও সেনাদল, সকলই ছিল।

সেনাদলটি বৃহৎ নহে। সৈনিকের সংখ্যা ষাট জন মাত্র। কিন্তু তথাপি

সেনাদল ত বলিতে হইবে। ভিন্ন রাজ্যের ন্যায় এখানেও নানারূপে কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। তাম্রকূট, সুরা ও অন্যপ্রকার মাদক দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে কর ধার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রজাকে "জিজিয়া" কর দিতে হইত। অন্যদেশবাসীর ন্যায় এ রাজ্যের অনেকেই ধূমপান ও সুরাসেবন করিত বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। রাজা যদি কোনও বিশেষ নূতন প্রণালীতে রাজস্ববৃদ্ধির উপায় না করিতেন, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন ও সভাসদবর্গের পানভোজনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া নিজের পদোচিত সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা রক্ষা করা রাজার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ঘট হইত! এই বিশেষ রাজস্ব জুয়ার আড্ডা হইতে সংগৃহীত হইত। লোকে জুয়ার আড্ডায় আসিয়া জুয়া খেলিত। খেলায় হার হউক বা জিত হউক, আড্ডার মালিক প্রত্যেক ক্ষেপেই নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা লইত। ইহাতে তাহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন ছিল। সেই টাকার অধিকাংশই রাজার কোষাগারে করস্বরূপ প্রেরিত হইত। জুয়ার আড্ডার অধ্যক্ষ রাজাকে যে এত অধিক অর্থ করস্বরূপ দিতে পারিত, তাহার প্রধান কারণ, সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এরূপ ভাবের জুয়ার আড্ডা আদৌ ছিল না। পূর্ব্বে সমগ্র জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের কোনও কোনও প্রাদেশিক নরপতি স্ব স্ব রাজ্যে এইরূপ জুয়ার আড্ডা রাখিতেন; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে সমগ্র দেশ হইতে সে প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ জুয়ার আড্ডায় প্রায়ই নানারূপ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইত। লোকে ভাগ্যপরিবর্ত্তনের আশায় দ্যূতক্রীড়া করিতে আসিত, হার জিতের নেশায় শেষে এমন মত্ত হইয়া উঠিত যে, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জুয়া খেলিত। অনেক সময় কেহ কেহ অপরের গচ্ছিত অর্থ লইয়াও ভাগ্য পরীক্ষা করিতে বিরত হইত না। শেষে নৈরাশ্যদগ্ধহৃদয়ে হয় জলে ডুবিয়া, নয় ত পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিত। জর্ম্মণ প্রজারা এই সকল কারণে জর্ম্মণ নৃপতিদিগকে এরূপ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু মোনাকোর নৃপতিকে নিষেধ করিবার সে রাজ্যে কেহ ছিল না। সুতরাং নিরুপদ্রবে জুয়ার ব্যবসায়ে তিনি একাধিপত্য করিতেছিলেন।

দ্যূতক্রীড়াসক্ত মানবগণ তাহাদের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য মোনাকো রাজ্যে গমন করিত। তাহাদের লাভ বা ক্ষতি যাহাই হউক না কেন, রাজার ষোল আনা লাভ ছিল। একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে,

"সাধু উপায়ে রাজ্যলাভ হয় না।" মোনাকোর নরাধিপ জানিতেন, কাজটা অতি হেয়, কিন্তু উপায় কি? জীবিকানির্ব্বাহ করা ত চাই! সুরা, তাম্রকূট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য হইতে শুল্ক আদায়ও ত সাধুব্যবসায় নহে! যাহা হউক, এইরূপ উপায়ে তিনি আড়ম্বরসহকারে প্রকৃত রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেছিলেন।

অন্যান্য স্বাধীন দেশের নরপতিগণের ন্যায় তাঁহারও বার্ষিক অভিষেক-উৎসব হইত; দরবার বসিত; পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। যথানিয়মে অপরাধীর বিচার, দণ্ড ও ক্ষমা, স্বাধীনরাজ্যোচিত সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানই ছিল। কোথাও কোনও ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যাইত না। প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাদলের কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধপ্রণালীর অভিনয় হইত। মন্ত্রণাসভার বৈঠক বসিত। নূতন বিধান-প্রণয়ন, পুরাতনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের বিধিমত ব্যবস্থা ছিল। এ সকল বিষয়ে অন্যান্য দেশের সহিত মোনাকো রাজ্যের কোনও প্রভেদ লক্ষিত হইত না; তবে সমস্তই কিছু সংক্ষিপ্ত—তেমন বৃহৎ আয়োজন ছিল না।

কিছুকাল পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রজাবৃন্দ শান্তিপ্রিয়, এরূপ ব্যাপার এ রাজ্যে কখনও ঘটে নাই। বিচারক-গণ প্রথামত বিচারালয়ে আসিলেন, বিচক্ষণতা ও সাবধানতা সহকারে মোকদ্দমার বিচার করিলেন। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটী ঘটিল না। সরকারী উকীল, ব্যারিষ্টার, জুরী, বিচারক, সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের প্রশ্ন ও উত্তর শুনিয়া বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্ত হইল, আসামী প্রকৃতই অপরাধী, সুতরাং দেশের বিধানানুসারে বিচারক তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। এত দূর পর্য্যন্ত কোনও গোলযোগ ঘটিল না। বিচারকগণ মোকদ্দমার নথিপত্র ও রায় রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহাল রাখিয়া স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিলেন। লোকটা যখন মরিবেই, তখন মরুক।

কিন্তু একটা বিষম প্রতিবন্ধক ঘটিল। রাজ্যমধ্যে মস্তকচ্ছেদনের উপযোগী গিলোটিন যন্ত্র অথবা জল্লাদ ছিল না। মন্ত্রীরা সমবেত হইয়া কর্ত্তব্য-অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্ত হইল, ফরাসী গবর্মেণ্টের নিকট এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আবেদনপত্রে লিখিত হইল, একটি গিলোটিন যন্ত্র ও এক জন জল্লাদকে

তাঁহারা মোনাকো রাজ্যে পাঠাইতে পারেন কি না? যদি পারেন, তাহা হইলে ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ হইবে? রাজার স্বাক্ষরিত পত্র যথাসময়ে প্রেরিত হইল। সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল, একটি যন্ত্র ও জল্লাদ তাঁহারা পাঠাইতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য ষোল হাজার মুদ্রা ব্যয় পড়িবে। মন্ত্রীরা রাজার নিকট কাগজপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ষোল হাজার টাকা! হতভাগার জীবনের মূল্য ত এত নয়! রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও স্বল্পব্যয়ে কি এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না?" সমগ্র প্রজার উপর মাথা পিছু দুই টাকা করিয়া কর ধার্য্য করিলেও এত টাকা সংগৃহীত হইবে না। বিশেষতঃ এরূপ নূতন কর দিতে তাহারা কখনই সম্মত হইবে না। হয় ত এই উপলক্ষে প্রজাবিদ্রোহও ঘটিতে পারে।

কর্ত্তব্য-অবধারণের জন্য পুনরায় মন্ত্রিগণ সম্মিলিত হইলেন। সভায় স্থিরীকৃত হইল, ইতালী গবর্মেণ্টের নিকট এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাউক। ফরাসী গবর্মেণ্ট সাধারণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত; মুকুটধারী রাজার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু ইতালীর নৃপতি স্বয়ং মুকুটধারী রাজা; সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ স্বল্পব্যয়ে যন্ত্রাদি সরবরাহ করিতে পারেন। পরামর্শমত আবেদন-পত্র লিখিত হইল। ফেরত ডাকে পত্রের উত্তর আসিল।

ইতালী গবর্মেণ্ট লিখিয়াছেন যে, অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহারা মোনাকোর অধিপতির প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা পাইলে তাঁহারা একটি যন্ত্র ও পারদর্শী জল্লাদকে পাঠাইতে পারেন। যাতায়াতের জন্য আর অন্য ব্যয় পড়িবে না। ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প বটে, কিন্তু তথাপি অনেক টাকা! হতভাগা আসামীর জীবনের মূল্য এত অধিক নহে! প্রজাবর্গের উপর দুই টাকা করিয়া কর ধার্য্য না করিলে এ টাকা সংগৃহীত হইবে কোথা হইতে?

পুনরায় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসিল। স্বল্পব্যয়ে কার্য্যটি কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সদস্যগণ সেই চিন্তায় বিব্রত হইলেন। কোনও রাজসৈন্য কি অপরাধীর মাথাটা অস্ত্রাঘাতে স্কন্ধচ্যুত করিতে পারে না? সেনাপতি আহূত হইলেন। "অস্ত্রাঘাতে আসামীর গলাটা কাটিয়া ফেলিতে পারে, এমন এক জন সৈনিক দিতে পারেন, সেনাপতি মহাশয়? যুদ্ধকালে তাহারা ত মানুষ মারিতে দ্বিধাবোধ করে না। অস্ত্রাঘাতে শত্রুনিপাত করাই ত তাহাদের ব্যবসায়।" সেনাপতি মহাশয় সৈনিকবৃন্দের সহিত পরামর্শ

করিলেন। সকলকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সকলেরই এক কথা, "না মহাশয়, লোকের গলা কাটিবার প্রণালী আমরা জানি না। এরূপ শিক্ষা আমরা কখনও পাই নাই।"

তবে কি হইবে? মন্ত্রিগণ পুনরায় সমবেত হইলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া সকলেই কৃশ হইয়া উঠিলেন। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত তদন্ত-কমিশন বসিল; কমিটী সবকমিটী গঠিত হইল। বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে লোকটাকে চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হউক, তাহা হ'লে সব গোল মিটিয়া যাইবে। ব্যয়বাহুল্যও ঘটিবে না, আসামীর প্রতি রাজার করুণাও প্রকাশ করা হইবে।

রাজা এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। বিচারক দণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আবার এক বিষম সমস্যা! যাবজ্জীবন রুদ্ধ করিয়া রাখিবার মত সুদৃঢ় কারাগার ত রাজ্যে নাই! একটা সামান্য হাজত-ঘর আছে বটে, সেখানে অল্প সময়ের জন্য অপরাধীকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে। কিন্তু স্থায়ী, দৃঢ় কারাগার রাজ্যমধ্যে ছিল না। যাহা হউক, বহু অনুসন্ধানের পর দণ্ডিত ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার মত একটা স্থান মিলিল। যুবক যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য এক জন প্রহরী নিযুক্ত হইল। সে বন্দীর জন্য প্রত্যহ রাজবাটীর রন্ধনাগার হইতে আহার্য্য লইয়া আসিত, এবং পাহারা দিত।

এইরূপে বন্দী বৎসরাধিককাল তথায় অতিবাহিত করিল। বর্ষশেষে রাজা আয় ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষার সময় দেখিলেন, কাগজ-পত্রে একটা নূতন খরচের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। প্রহরীর বেতন ও বন্দীর আহার্য্য প্রভৃতি বাবদে খরচ সালিয়ানা প্রায় ছয় শত মুদ্রা! বন্দীর ত এই প্রথম যৌবন, সে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল, সে এখনও যে আরও চল্লিশ বৎসর বাঁচিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ব্যাপারটি সহজ নহে। এত টাকা বাজে খরচ কখনই সঙ্গত নহে। রাজা মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিলেন।

"হতভাগা লোকটার সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা না করিলে নয়। তাহার জন্য এত টাকা ব্যয় করিতে পারিব না। অন্য কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা

হউক।" মন্ত্রিগণ পুনরায় সভা আহ্বান করিলেন। পুনরায় আন্দোলন, আলোচনা চলিতে লাগিল। বহু বিতর্কের পর এক জন অমাত্য বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আমার মতে প্রহরীকে বিদায় দেওয়া যাউক।" অপর অমাত্য বলিলেন, "কিন্তু যদি বন্দী পলায়ন করে?" প্রথম বক্তা বলিলেন, "যায়, যাউক না।" তখন সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজার নিকট তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলেন। নরপতি অবিলম্বে সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। প্রহরী বিদায় পাইল। অতঃপর কি ঘটে, মন্ত্রীরা তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভোজনকাল সমাগত হইলে বন্দী বাহিরে আসিল। কিন্তু প্রহরীকে দেখিতে না পাইয়া সে রাজবাটীতে গিয়া রন্ধনশালা হইতে স্বীয় আহার্য্য চাহিয়া আনিল। তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া কক্ষমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। পর দিবসও ঠিক ঐরূপ ঘটিল। পলায়ন করিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! তখন কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য অমাত্যবৃন্দ পুনরায় সম্মিলিত হইলেন। সকলেই বলিলেন, "লোকটাকে স্পষ্ট বলা যাউক, আমরা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি না।" সেই প্রস্তাব অনুসারে প্রধান মন্ত্রী বন্দীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সে আসিলে মন্ত্রী বলিলেন, "তুমি পলায়ন করিতেছ না কেন? প্রহরী কেহ নাই, তুমি পলাইয়া গেলে কেহ তোমাকে ধরিবে না। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার। রাজারও তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।"

বন্দী বলিল, "রাজার কোনও আপত্তি নাই, তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার ত যাইবার কোনও স্থান নাই। আমি কি করিতে পারি, বলুন? আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া আপনারা আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমার চরিত্র হারাইয়াছি। লোকে আমাকে দেখিলেই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবে। তা ছাড়া এতদিন অলসভাবে থাকিয়া কিরূপে পরিশ্রম করিতে হয়, আমি তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। আপনারা আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। কাজটা সঙ্গত হয় নাই। প্রথমতঃ ধরুন, যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, তখনই আমাকে মারিয়া ফেলা আপনাদের উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা তাহা করিলেন না; এই গেল এক কথা। আমি সে জন্য আপনাদের নিকট কোনও অভিযোগ করি নাই। তাহার পর চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন। প্রহরী দ্বারা আমার আহার্য্য আনাইবার

ব্যবস্থাও করিলেন। কিছুকাল পরে তাহাও বন্ধ করিলেন! তখন আমি স্বয়ং গিয়া আমার খাদ্য দ্রব্য আনিতে লাগিলাম। তথাপি আমি একটি কথা কহি নাই। কিন্তু এখন আপনারা আমাকে সত্যই চলিয়া যাইতে বলিতেছেন! এ প্রস্তাবে আমি কখনই সম্মত হইতে পারি না। আপনাদের যাহা খুসী করুন, আমি কোথাও যাইব না।"

তবে উপায়? আবার অমাত্যগণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। কি উপায় অবলম্বন করা যায়? লোকটা কোনও মতেই পালাইবে না! বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত হইল, লোকটাকে বার্ষিক কিছু বৃত্তি দিলে সে রাজ্য ছাড়িয়া হয় ত চলিয়া যাইতে পারে। মন্ত্রীরা রাজাকে সকল সংবাদ অবগত করাইলেন। "মহারাজ! আর কোন উপায় নাই। এখন লোকটার হাত এড়াইতে পারিলে বাঁচা যায়।" তখন মন্ত্রিসভা বার্ষিক ছয়শত মুদ্রা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া বন্দীকে বলিয়া পাঠাইলেন।

"সে বলিল, "আপনারা যদি নিয়মিতভাবে আমায় বৃত্তি দিবেন বলিয়া লেখাপড়া করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই। এ সর্ত্তে সম্মত আছেন কি? তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইতে সম্মত আছি।"

তাহাই হউক। বার্ষিক বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ তখনই বন্দীকে দেওয়া হইল। সেও মোনাকো রাজ্য ছাড়িয়া গেল। ব্যবধান, রেলযোগে পনের মিনিটের পথমাত্র! রাজ্যের সীমা পার হইয়াই নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে সে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। ক্ষেত্রে নানারূপ শাক সবজী ও তরকারী উৎপন্ন করিয়া তাহারই উপস্বত্ব সে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে এখনও বৃত্তি আদায় করিবার জন্য মোনাকো রাজ্যে গমন করে। টাকা পাইবামাত্র জুয়ার আড্ডায় গিয়া দুই চারি টাকা জুয়া খেলিয়া কখনও হারিয়া যায়, কখনও বা দু' পয়সা লাভ করে। তার পর আবার সে স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আইসে। এখন সে নিরুপদ্রবে শান্ত শিষ্টভাবে জীবনযাপন করিতেছে।

তাহার ভাগ্য ভাল যে, সে যে রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হন না, যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করেন না, এমন কোনও রাজ্যের সীমার মধ্যে অপরাধ করে নাই!*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* কাউণ্ট টলষ্টয় কর্ত্তৃক রচিত গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

কালিকা।*

হিন্দু বিশ্বের বীজস্বরূপিণী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়া পরমা-প্রকৃতির প্রতীক পূজা করিয়া থাকেন। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু, দারু প্রভৃতিতে যে মূর্ত্তি রচিত হইয়া থাকে, সেই মূর্ত্তিরূপ যন্ত্রের সাহায্যে পূজাসাধনের নামই প্রতীক-পূজা। ইহা ভিন্ন ঘটে ও পটে প্রতীক-পূজা হইয়া থাকে। এখন সমাজের এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, হিন্দুর সন্তান প্রতীক-পূজার ও পুত্তলী-পূজার প্রভেদ বুঝিতে অসমর্থ। মায়ার বৃত্তিতে আবদ্ধ, সংস্কারের সঙ্কীর্ণতায় সসীম, মানবের মানস-মুকুরে যে ভূমার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে না,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব অনেক সময় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সান্ত অনন্তের প্রতিবিম্বধারণে অসমর্থ। তাই মানব সকল বিষয়েই প্রতীকোপাসক। মানবের মনে, ভাবে, ভাষায়, কল্পনায়, ধ্যানে, ধারণায় সান্তের প্রতিমা বা প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র মুকুরে বৃহতের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়ে না,—পড়িতে পারে না,—বৃহৎ বিপ্রকৃষ্ট থাকিলে ক্ষুদ্র হইয়াই ক্ষুদ্র মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে;—সন্নিকৃষ্ট হইলে উহার ক্ষুদ্র অংশই ক্ষুদ্র মুকুরে দেখা যায়। কিন্তু অনন্তের অংশও অনন্ত, সুতরাং সান্ত জীবাত্মার মানসমুকুরে তাহা প্রতিবিম্বিত হয় না—হইতেই পারে না। সেই জন্য সাধকের হিতার্থ অনন্ত ব্রহ্মের সান্ত মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। মূর্ত্তি বা প্রতিমায় অনন্তের বিভূতি কল্পিত ও ব্যক্ত করিতে হয়। মূর্ত্তি-কল্পনার ইহাই প্রকৃত রহস্য। প্রকৃতির প্রতীক-পূজা এই নিয়মেই সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। প্রতীক-পূজার এই রহস্য ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার Kali the Mother নামক পুস্তিকায় তাহা অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়, অনেক হিন্দুর সন্তান এখন যে তথ্য বুঝিতে পারেন না,—সম্পূর্ণ ভিন্নদেশে জন্মিয়া, প্রতিকূল প্রতিবেশ-অবস্থার মধ্যে লালিতা হইয়া, মনস্বিনী নিবেদিতা জন্মান্তরের সুকৃতিবলে তাহা বুঝিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় পাশ্চাত্য চিন্তার, পাশ্চাত্য ভাবের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রাচ্য প্রতীক-পূজার রহস্যে অনেকটা প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

* Kali the Mother, by Sister Nivedita.

মূর্ত্তি-পূজা।

ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার গ্রন্থের প্রথমেই প্রতীকের আলোচনা করিয়াছেন। মানব-জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার হইতেই ভগবানের মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। দুইটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি একই ধারণা বা একই ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। ভাষা ভাবের প্রতিমা বা প্রতীকমাত্র। ধরাবাসী সমগ্র মানবের দৈনন্দিন জীবনের অবশ্য-আবশ্যক বস্তু একই। সেই জন্য বিদেশের ভাষা-শিক্ষাকালে আমরা বৈদেশিক শব্দ-সন্ধানে ব্যস্ত হই। "তৃষ্ণা" বলিলে আমার যে বেদনা বা অনুভূতি বুঝায়, thirst বলিলে ইংরেজের সেই বেদনা বা অনুভূতিই বুঝাইয়া থাকে। তৃষ্ণা শব্দ বাঙ্গালীর রচিত যে বেদনা বা অনুভূতিরই শাব্দিকা মূর্ত্তি ; thirst শব্দ ইংরেজের রচিত সেই অনুভূতিরই শাব্দিকা মূর্ত্তি। মূর্ত্তিকে চিনিলেই আমরা ভাবকে চিনিতে ও চিনাইতে পারি। ভাবের অর্চ্চিঃ ভাবেরই প্রতিমা শব্দে বর্ত্তে, তাই শব্দ দেখিয়া ভাবের পরিচয় মিলে। সেই জন্য যেখানে ভাবসাম্য, সেখানে কেবল প্রতিমার পরিচয় পাইলেই ভাবের পরিচয়লাভ সম্ভবে। কিন্তু অনুভূত বস্তু ও অনুভাবকের বিপর্য্যয়-বশে অনুভূতিরও বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যফলে অনুভূতির মূর্ত্তি শব্দেরও অর্থ-স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভাষার শব্দ স্থূলতঃ একই ভাবের প্রতিমা বা মূর্ত্তি হইলেও, উহাদের মধ্যে অর্চ্চিঃ-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজীতে twilight বলিলে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালায় 'সন্ধ্যা' বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। মেরুসন্নিহিত দেশসমূহে দিনের আলোক নিশার অন্ধকারে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে আলোকে ও আঁধারে একটা বহু-ক্ষণব্যাপী মেশামিশি হইয়া থাকে। পলে পলে আলোকের পরিবর্ত্তন যে গম্ভীরতা আনিয়া দেয়, না দেখিলে তাহার অনুভূতি অসম্ভব। আর সেই সময়ের সহিত দৈনন্দিন ব্যাপারের কত স্মৃতি, কত ভাব, কত অভিজ্ঞতা জড়াইয়া একটি ভাবের সৃষ্টি করে। সে ভাব twilight শব্দেই ব্যক্ত হয়। Twilight শব্দ সেই ভাবেরই পূর্ণ প্রতিমা! আমাদের 'সন্ধ্যা' শব্দ সে ভাবের পূর্ণপ্রতিমা নহে। এ দেশে সন্ধ্যা বলিলে twilightএর প্রতিমা পূর্ণমাত্রায় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে না। এ দেশে দিনের আলোক নিশার আঁধারে ত্বরিতে মিশিয়া যায়। সুতরাং ইংরেজী twilight শব্দ ও বাঙ্গালা 'সন্ধ্যা' শব্দ ঠিক একই ভাবের দ্যোতনা করে না। উভয় দেশের শাব্দিক প্রতিমা

স্বতন্ত্র। প্রদোষ শব্দও ঠিক ঐ ভাব প্রকাশ করে না। রজনী প্রভাত হইলেও উত্তর অঞ্চলে twilight হয়। আলোক ও অন্ধকারে ঐরূপ দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। এ দেশের উষায় ঠিক সেরূপ হয় না। এ দেশে দেখিতে দেখিতে উষার আলোক বালভানুকিরণে পরিণত হয়। এ দেশে twiligh নাই; সুতরাং বাঙ্গালী সে ভাবের প্রতিমা গড়ে নাই। সেই জন্য বাঙ্গালা twilight শব্দের প্রতিশব্দও নাই।

ইংরেজী gloaming শব্দ বাঙ্গালীর গোধূলি শব্দেরই অনুরূপ। প্রদোষের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, উৎসুকা নাগরী দিবাশ্রম শ্রান্ত নাগরের গৃহাগমনপ্রতীক্ষায় গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথ পানে চাহিতেছে,—"ঐ এলো, ঐ এলো" ভাব শব্দটির সহিত যেন জড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে;—প্রত্যাশিতের আগমনে পরিবারের মধ্যে যেন কেমন একটা কোমলভাবের প্রবাহ ছুটিতেছে,—নিদ্রিত শিশুর অধরে কোমল হাস্য ফুটিতেছে। এই সমস্ত ভাব gloaming শব্দ-প্রতিমায় অনুস্যূত রহিয়াছে। বাঙ্গালা 'গোধূলি' শব্দ ঠিক ঐ সময়কেই বুঝায় সত্য, কিন্তু ঐ শব্দের সহিত বঙ্গীয় পল্লীজীবনের চিত্র ফুটিয়া উঠে। তপন প্রতীচ্য দিক্‌চক্রবালপ্রান্ত আশ্রয় করিয়াছেন। নিশাসমাগমশঙ্কিত রাখাল গো-পাল লইয়া পল্লীর অভিমুখে ফিরিতেছে; প্রত্যাবর্ত্তনশীল গো-পালের ক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে; দূরে গ্রামপ্রান্তস্থ শ্যামলশস্যসমাচ্ছন্ন প্রান্তর প্রান্তে রাখাল ও গো-পালের এই চিত্র গোধূলি শব্দের সহিত বিজড়িত। আর দেখিতে দেখিতে গাভীগণের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিকে আশ্রয় করিয়া নৈশ অন্ধকার যেন সমস্ত দৃশ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর পল্লীজীবন এই ধারণার সৃষ্টি করে,—গোধূলি শব্দ এই ধারণারই শব্দময় চিত্র। গোধূলি বলিলে এই সমস্ত দৃশ্যপট যেন মানস চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। ইংরেজী gloaming ও বাঙ্গালা গোধূলি একই কালের দ্যোতনা করে সত্য,—কিন্তু উভয়ের প্রতিমা বা মূর্ত্তি স্বতন্ত্র। এক কথায় দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, জাতির প্রকৃতি ও ব্যক্তির বিশেষত্ব অনুসারে শব্দের ব্যঞ্জনা ও তাহার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসম্পর্কিত ভাব ও তাহার প্রতীক ঠিক এইরূপ ভাবেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। অনন্ত জ্যোতিঃ আমাদের ধারণার মধ্যে আইসে না, উহা আমাদের চিন্তাশক্তির ভিতর দিয়াই মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে

ব্যক্তিভেদে ও জাতিভেদে চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র হয়; সুতারং ধর্ম্ম-সম্পর্কিত ধারণা ও তাহার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। দুই জাতির বা দুই ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ও ধারণা সম্পূর্ণ একরূপ হয় না;—ফলে, তাহাদের মানস-প্রতিমা স্বতন্ত্রই হইয়া থাকে। আরব জাতির সমাজে পিতাই শ্রেষ্ঠ। আরবের মরুপ্রান্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ান পুরুষই সমাজের গোপ্তা ও পরিচালক। তাঁহারই ইঙ্গিতে শত শত যুবক সমরক্ষেত্রে প্রাণদানে প্রস্তুত। সকলে তাঁহারই আজ্ঞাধীন। সমাজে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপ ও অপ্রতিহত প্রভাব। পিতৃশাসিত সেমিটিক জাতির মনে সেই জন্য শক্তিমানের কল্পনায় পিতৃ-প্রতিমাই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহারা সর্ব্বশক্তিমানকে পিতা বলিয়াই ডাকিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, আর্য্যজাতির সমাজে রমণীই প্রধানা। প্রতীচ্য-খণ্ডে ভার্য্যাই সর্ব্বেসর্ব্বা, ভার্য্যাই স্বামীর সম্রাজ্ঞী। প্রাচ্যখণ্ডে জননীই সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবীমূর্ত্তি,—সংসারের পবিত্রতাবিধায়িনী ও শান্তিপ্রদা-য়িনী। মা মা বলিয়া ডাকিলে এই অঞ্চলের লোক যত তৃপ্তি, যত শান্তি পায়, বুঝি আর কিছুতেই তেমন তৃপ্তি পায় না। মা মা বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে ভক্তির মন্দাকিনীপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। তাই বোধ হয়, ক্যাথলিক খৃষ্টান শিশুখৃষ্টকোলে কুমারী মেরীর পূজা করিয়া থাকেন। মা শব্দের মত সর্ব্ব-সন্তাপহারক শব্দ জগতে আর নাই। সাধকের আত্মা ইষ্টদেবের নিকট ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় হইয়া পড়ে। ভারতীয় বর্ণাশ্রমিগণ মাতৃত্বের পূর্ণভাবের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই ভারতে মাতৃমূর্ত্তির পূর্ণপ্রতিমা গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই জন্যই কালীমূর্ত্তি স্ত্রীমূর্ত্তি—মাতৃমূর্ত্তি। ভক্ত হিন্দু কালীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মাতৃ-প্রতিমা অতি অদ্ভুত। প্রতীচ্যখণ্ডে রমণী প্রতিমার সহিত কাব্যকলার সমস্ত কোমল ও কান্তভাব বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতেও যে ঐরূপ মাতৃমূর্ত্তি নাই, তাহা নহে। নিবেদিতা সে মূর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই,—সম্ভবতঃ তিনি উহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কালিকা মূর্ত্তিই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। এই মূর্ত্তি দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা শিহরিয়া উঠেন। এই মূর্ত্তি বিবসনা, লোলরসনা, বিকটদশনা,—এলোকেশী ও চতুর্ভুজা; মূর্ত্তির এক হস্তে কৃপাণ, অন্য হস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরশির। আবার অন্য দুই হস্তে বর ও অভয়। মূর্ত্তির গলে দোদুল্যমান নরশিরের

মালা, মূর্ত্তি বিভূতিভূষিতাঙ্গ, পদতলে লুণ্ঠিত শিবের উপর নৃত্যশীল মূর্ত্তি বিভীষণা ও অসাধারণী। যাহারা মায়ের কেবল মূর্ত্তির ঐটুকুম লক্ষ্য করে,—তাহারা মূর্ত্তির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। মা‌ে স্নেহমাখা স্বর তাহাদের কর্ণে পশে না। হিন্দু এই মূর্ত্তিরই পূজা করি প্রীতি অনুভব করে!

শিব।

প্রকৃতি অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, কুসুমকুসুমি দ্রুমদলশোভিনী, সুহাসিনী প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে শান্ত, শুভ্র, নির্ব্বিক ও নির্ম্মল সত্তা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেন প্রকৃতির অন্তরা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, মূক ও অনন্ত শূন্যতার মধ্যে কে অবস্থিতি ক তেছে বলিয়া বোধ হয়। পার্থিব সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন কেমন এক দ্বৈ ভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। হিন্দু যে দিকেই দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকে এই দ্বৈতভাব দেখিতে পায়। আলোকের সহিত অন্ধকার, আকর্ষণে সহিত বিপ্রযোগ, সৃষ্টির সহিত লয়, কারণের সহিত কার্য্য ওতপ্রোতভা বিজড়িত রহিয়াছে। মানব-জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও স্ত্রী ও পুরু দেহ ও আত্মা এই দ্বৈতভাব পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টিরহস্য-উদ্ভেদের ইঙ্গি এইখানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়াই যেমন মানবত প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়াই তেমনই বিশ্ব। প্রকৃতির সহিত পুরুষের বিরোধ বিবাদ নাই। স্ত্রী ও পুরুষের সমবায়ে যেমন মানবতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সেইরূপ বিশ্বও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃ তির সহিত পরমাত্মার বিরোধ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই হি বলিয়া আসিতেছে,—পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও শক্তি অভিন্ন। মানবে কল্পিত মূর্ত্তি মানবত্ব-জড়িতই হইবে। লোককোলাহলশূন্য নির্জ্জন দে বিশাল পর্ব্বতের বিপুল ছায়া মানবের মনে ভূমার গুণবিশেষ উদ্রিক্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বেশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে না। বাহ্য আকৃ তিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা সম্ভব নহে।

নিবেদিতা বলিয়াছেন,—Hinduism has avoided this danger o fixedness in a curious way. Of all the peoples of the earth, i might be claimed that Hindus are apparently the most and at heart, the least idolatrous."—ইহার মর্ম্মার্থ এই,—"হিন্দুধ

গরুড়।

অতি চমৎকার উপায়ে বহুভাব পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছে। জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুরাই আপাতদৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পৌত্তলিক,—কিন্তু অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, অন্য কোনও জাতি তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সমর্থ হয় নাই।" মনস্বিনী ভগ্নী নিবেদিতা বাস্তবিকই হিন্দুর মর্ম্মকথা বুঝিতে সমর্থা হইয়াছেন,—হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারিয়াছেন। বাহ্য আকৃতি লইয়াই হিন্দু ব্যস্ত নহে,—ভাবের পথ ধরিয়া হিন্দু বিশ্বপ্রহেলিকার সমাধানে ব্যগ্র। বাহ্য আকৃতি বা প্রতিমা সেই ভাবেরই প্রকাশকমাত্র। বাহ্যবস্তু অবলম্বন করিয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, হিন্দু তাহা বুঝে; সেই জন্যই হিন্দু প্রতীকোপাসক। বিশাল হিমালয়ের বক্ষে নিত্য শুভ্র হিমানীর উপর কৌমুদীরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—চন্দ্রিকাসমুদ্ভাসিত হিমানী দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্তকাল নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছে,—আর তাহারই উপর শশিকলাকে ভালে লইয়া নিবিড় নীলিমময় অনন্ত আকাশ প্রকৃতির নগ্নমূর্ত্তিরূপে নৃত্য করিতেছে,—এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হিন্দুর মনে যদি প্রকৃতিপুরুষের লীলা-কথা উদিত হয়,—যদি সে মনে করে, এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির মূলে নিত্য, শুদ্ধ, নিরঞ্জন ও নির্ব্বিকার আত্মা অবস্থিতি করিতেছে; হিমাদ্রিশিখরশায়ী হিমরাশির ন্যায় উহা দুরধিগম্য, কিন্তু উহারই বক্ষের উপর নৃত্যশীলা নগ্না প্রকৃতির প্রত্যেক লীলারই প্রতিবিম্ব পতিত হইতেছে,—তাহা হইলে সে ভাব হৃদয়ে পুনর্ব্বার জাগাইবার জন্য সেই ভাবমূলক প্রতীক রচনা করিবার প্রবৃত্তি হিন্দুর মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠে। সে প্রতীক-পূজা পুত্তলিকার পূজা নহে, ভাবেরই পূজা। হিন্দু যেখানে সেই ভাব প্রতিফলিত দেখে, সেইখানেই প্রকৃতিপুরুষের মূর্ত্তি দেখিতে পায়। হ্রদের জল নিথর নিঃস্পন্দ লহরীশূন্য। কৌমুদীরাশি তাহারই উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে শুভ্র করিয়া তুলিয়াছে। আর সেই শুভ্র সলিলরাশির উপর তীরস্থ তরুলতা, পত্রপুষ্প প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আর সেই সকল প্রতিবিম্বমধ্যে চন্দ্রকলার প্রতিবিম্ব পূর্ণ ভাস্বরতায় সকলকেই পরাজিত করিয়াছে।—এ দৃশ্য হিন্দুর মনে প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধ-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়,—তাই হিন্দু ইহারও প্রতীকপূজক। তাই বুঝি বিসর্জনের সময় দর্পণে জলাধারের জলে মায়ের পাদপদ্মের প্রতিবিম্ব দেখিতে হয়। হিন্দুর এই প্রতীক-উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলা বিষম ভ্রম।

প্রকৃতি ও পুরুষের, শিবের ও শক্তির সম্বন্ধ কি? য়ুরোপীয়দিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য য়ুরোপীয় ভাবে মনস্বিনী নিবেদিতা তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা সত্য, কিন্তু তাহাকে ক্রিয়া করাইবার জন্য পুরুষের প্রয়োজন। আত্মার সহিত অভিজ্ঞতার যে সম্বন্ধ, ডাইনামোর (Dynamo) সহিত বৈদ্যুতিক শক্তির যে সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সেই সম্বন্ধ। একের সহিত অন্যের সংযোগের ফলে শক্তি ও কার্য্যকারিতা উদ্ভূত হয়, বিশ্বব্যাপারে ইহা নিত্য পরিদৃশ্যমান। শিষ্য শ্মশানে নিশীথে শবের উপর আসীন। অকস্মাৎ গুরুর "মাভৈঃ মাভৈঃ" শব্দ শিষ্যের কর্ণে পশিল। শিষ্য নির্ভয়ে শবসাধনায় ব্রতী হইল। সাধনবলে শবে জীবনী-শক্তির সঞ্চার হইল। সেইরূপ পুরুষের অশরীরিণী শক্তির সঞ্চারে প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। শিব ও শক্তি পৃথক্ নহে। নিবেদিতা এই তথ্যই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জীবমাত্রই শিব। মানবাত্মা শিবরূপে প্রকৃতির লীলা দেখিতেছে।

ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিতে হইলে পার্থিব সকল সম্পদই পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন কি, সুখ দুঃখ উভয় ভাবেরই পরিহার আবশ্যক হইয়া উঠে। সেই জন্য শঙ্কর ভিখারী,—আপনার যজ্ঞকুণ্ডের ভস্মে আপনি আবৃত। মহাযোগে নিমগ্ন। তাঁহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত। পার্থিব কোনও ব্যাপারই তিনি লক্ষ্য করেন না। জগৎ তাঁহার দৃষ্টিতে মায়াকল্পিত স্বপ্নরাজ্য। তাঁহার প্রজ্ঞাই কেবল ক্রিয়াশীল। সেই জন্য আদর্শমানবরূপী শিবের ললাটে প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত। তাই শিব বিরূপাক্ষ। তিনি সর্ব্বজীবের আশ্রয়। বিষধর ভুজঙ্গও তাঁহার গলদেশে উপবীতরূপে আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। তিনি বিশ্বপ্রেমে বিভোর। ভূত, প্রেত, পিশাচও তাঁহার প্রেমের পাত্র। সংসারের সকল দুঃখজ্বালা তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বিষপানে নীলকণ্ঠ। তাঁহার কিছুই নাই। বৃদ্ধ বৃষই তাঁহার বাহন, যোগের ব্যাঘ্রচর্ম্মই তাঁহার আসন। তিনি আশুতোষ; বিল্বদল ও গঙ্গাজলেই তিনি তুষ্ট। তিনি সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম, ভীষণের মধ্যে ভীষণতম, বীরেশ্বর ও বিরূপাক্ষ। ভগ্নী নিবেদিতা এই ভাবেই জীবরূপী শিবের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবাত্মা বা পুরুষ মায়া বা প্রকৃতির অর্দ্ধাঙ্গ। মায়া নশ্বর ইন্দ্রিয়জ বৈচিত্র্যজ্ঞান। জীবাত্মা শবরূপে পতিত। নিষ্ক্রিয় ও বাহ্য ব্যাপারে

সম্পূর্ণ উদাসীন। কালী বা প্রকৃতি ভীষণামূর্ত্তিতে সংহার-কার্য্যে নিযুক্তা। চারিদিকেই সংহারের ভীষণ দৃশ্য! তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা, হস্তে সভচ্ছিন্ন নরশির ও উদ্যত কৃপাণ। অকস্মাৎ তাঁহার পদ তাঁহার ভর্ত্তার বক্ষ স্পর্শ করিল। শিব ঊর্দ্ধে চাহিলেন; জীবাত্মার প্রাজ্ঞা চক্ষু মায়ার চক্ষুর সহিত সম্মিলিত হইল। মায়া লজ্জায় দশনে রসনা কাটিলেন। শিব সেই মহামেঘপ্রভা সাক্ষাৎ সংহারিণীমূর্ত্তিধারিণী মায়াকে পরমা সুন্দরী দেখিলেন। তখন সেই নগ্না, ভীষণা, সংহারিণী প্রকৃতি সংহার জন্য বেদনায় ব্যথিতা নহেন, বরং প্রফুল্লা। পিশাচগণ তাঁহারই প্রদত্ত পিশিতে পরিপুষ্ট। এ হেন প্রকৃতির উপর যোগী জীবাত্মার প্রজ্ঞাদৃষ্টি পতিত হইল। তখন প্রকৃতি তাহাকে বরাভয় কর উদ্যত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রাজ্ঞা-চক্ষুশালী জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ মহাশক্তিকে চিনিলেন। তিনি শক্তিকেই মাতৃসম্বোধন করিলেন। প্রকৃতির রহস্য উদ্ভিন্ন হইল। মায়াবদ্ধ শিব 'জীবাত্মার' সহিত পরমাত্মা পরমাপ্রকৃতির মিলন হইল। যোগীর যোগ সাফল্য-লাভ করিল।

কিরূপে সাধকের এই আত্ম-সাক্ষাৎকর ঘটিয়া থাকে? কি রূপে সাধক 'মা' কে চিনিতে ও জানিতে পারে? প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী ও বৈচিত্র্যময়ী। কিন্তু তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যময়ী যবনিকার অন্তরালে বিভীষিকাময় শ্মশানের দৃশ্য লুকাইয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বতোবিসারিণী দৃষ্টি অতিক্রান্ত করিতে পারে না। প্রকৃতির অঙ্কে জীব জীবের প্রাণসংহার করিতেছে, স্রোতস্বতী ভূধরকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছে, ধূমকেতু পৃথিবীকে চূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই যেন মধ্যগগনে খর করপালতুল্য পুচ্ছ উদ্যত করিয়া উদিত হইতেছে। জীবের হাহাকার, ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, পিপাসিতের মর্ম্মোচ্ছ্বাস, ভয়চকিতের আতঙ্ক-ধ্বনি প্রভৃতিতেই প্রকৃতির ক্রোড় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যথিতের বেদনার প্রতি তাঁহার একেবারেই দৃকপাত নাই,—উপেক্ষার অট্টহাস্যে তিনি সেই বেদনা-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছেন। হিন্দু প্রকৃতির এই দৃশ্যে অন্ধ নহে। হিন্দু হৃদয়ের মর্ম্মতলভেদ করিয়া বলিতে পারে।—"মাগো তুমি বিশ্ব-সংহারিণী সত্য, কিন্তু তথাপি আমি তোমারই শরণাগত।" "শ্মশানের মধ্যেই মায়ের করুণার কমল প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিবেদিতা দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে মায়ের মূর্ত্তিকে চিনিয়াছেন। সাংখ্যমতে পুরুষ অনেক; প্রকৃতিই

এক। নিবেদিতা বলেন পুরুষ সাধক, প্রকৃতি বিশ্বাত্মার মূর্ত্ত-প্রতিমা—মায়া। পরমাত্মা মায়া কর্ত্তৃক উপহত প্রকৃতির পদতলে মথিত হইয়া জীবাত্মরূপে শবের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। সাধনায় জীবাত্মার প্রাজ্ঞাচক্ষু উন্মিলিত হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। তান্ত্রিকগণ সকলে কালীমূর্ত্তির এই ব্যাখ্যা করেন না। তাঁহারা বলেন শিবই পরমাত্মা, কালী পরমাপ্রকৃতি। ঐশী শক্তি মায়া রূপে সৃষ্টিস্থিতি সংহার করিতেছেন, ঈশ শুভ্র, শান্ত, নির্ব্বিকল্প ও নিরঞ্জন অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। নিবেদিতা এ ব্যাখ্যাও গ্রহণ করিয়াছেন। মূলে সকল ব্যাখ্যাই এক। নিবেদিতা য়ুরোপীয়দিগকে বুঝাইবার জন্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সাধক রামপ্রসাদ ও পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এই দুই জন মায়ের ভক্ত সাধকের সাধন পদ্ধতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজীনবীশদিগের এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। ভাদ্র।—"পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদ" সুখপাঠ্য, অন্য পত্র হইতে উদ্ধৃত। প্রবন্ধের শেষে ক্ষুদ্র অক্ষরে 'কৃষি-সম্পদ' লিখিত হইয়াছে! অতএব ধর্ম্ম বাঁচিয়াছে! শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্রের "মুসলমান ঐতিহাসিক—আবুলফজল" ভিন্ন আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই। শ্রীজগদীশ্বর রায় গুপ্ত 'মিশ্র কানেড়া—জলদ একতালা'য় প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি পাই না কেন হে ডাকিয়া?"

বোধ হয়, এই সকল কবিতার ভয়ে ভগবান লুকাইয়া থাকেন, সাহস করিয়া দেখা দেন না! কবিবর ভাব, ভাষা ও ছন্দকেও অনায়াসে প্রশ্ন করিতে পারেন,—"পাই না কেন হে ডাকিয়া?" সাধনায় সিদ্ধ হইয়া না ডাকিলে সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। তাই সাধক বলিয়াছেন,—"একবার ডাক দেখি মন, ডাকবার মতন, কেমন কালী থাকৃতে পারে?" "মাসিক সাহিত্য-পরিচয়ে" 'ভদ্র'-সম্পাদক 'সাহিত্য'-সম্পাদককে গালি দিয়াছেন।—"বড় ধুরন্ধর সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া" পড়িয়াছেন, এবং ভদ্র, ভট্টশালী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা জানাইয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। আর, আমাদের "ভিতরে প্রবেশ করিবার" মত বিদ্যা নাই, তাহাও স্বীকার করিতেছি। ভদ্র-সম্পাদকের মত সে বিদ্যায় বিশারদ হইলে, তৈলভাণ্ড-হস্তে গোয়েন্দাবিভাগে প্রবেশ করিতাম; "সাহিত্যক্ষেত্রের ধুরন্ধর"দিগের পৃষ্ঠে পাঁচনবাড়ী ভাঙ্গিতে হইত না। কিন্তু প্রাক্তনের ফলে ইহজীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অতএব, বিবিধবিদ্যাপারদর্শী 'ভদ্র'দিগের হিংসা করিয়া কোনও লাভ নাই।—"গৌড়-রাজমালা"র সমালোচনায় সমালোচক যে বিদ্যা ও বিবেক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' দেখাইয়া দিয়াছিলাম।—সে সকল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গ না তুলিয়া, উত্তর না দিয়া, সম্পাদক 'ভদ্রো'চিত আধ-আধ-ভাষায় আমাদিগকে গালি দিয়া বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিয়াছেন। আমরা সে সুখে বাদ সাধিব না।—কিন্তু কাহারও 'নির্জ্জলা মিথ্যা-বাদিতা' ত ক্ষমা করিতে পারি না। তিনি লিখিয়াছেন, "ঢাকাই বাঙ্গালের সুষুপ্তিভঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ-অধিকৃত পুরাতত্ত্বচর্চ্চায় অনধিকার হস্তক্ষেপ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সাহিত্যের সমালোচক ইহাতে সজাগ, সচকিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।" যাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অভিসন্ধির আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং বিরুদ্ধবাদীকে প্রদেশবিশেষের বিরাগভাজন করিবার জন্য অলীক, অমূলক, মিথ্যার প্রচারেও কুণ্ঠিত নহে, তাহারা 'বিদ্বান' হইতে পারে, 'ধুরন্ধর' হইতে পারে, 'ভদ্র'-সমাজের যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-সমাজে তাহাদের স্থান নাই। দ্বিজিহ্ব সরীসৃপমণ্ডলেই এমন খলতা শোভা পায়। যে ভাবে 'ঢাকাই বাঙ্গাল' শব্দটি প্রযুক্ত ও বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে সংস্কার জন্মিতে পারে, "সাহিত্যে"র সম্পাদক বা সমালোচক 'ঢাকাই বাঙ্গালে'র বিদ্বেষী, এবং সেই জন্য, ইতিহাসের চর্চ্চা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ

রাখিবার প্রয়াসী। বলা বাহুল্য, মিথ্যা এত উজ্জ্বল হইয়া আর কখনও কোনও 'তন্ত্রে'র স্বরূপ এমন উদ্ভাসিত করিয়া দেয় নাই। পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—কোনও বঙ্গের কোনও অ-জন্মও প্রদেশবিশেষের অধিবাসীদিগকে এমন অভিধানে অভিহিত করিতে পারে না। আমরা একতার উপাসক, ভেদের পরিপন্থী। সমগ্র বঙ্গভূমি আমাদের দেবতা,—'ভেদ নাই, ভেদ নাই!' আমরা ইতিহাস-চর্চ্চার পক্ষপাতী; ঐতিহাসিক সত্যই আমাদের বরেণ্য। সে সত্য কোথায় প্রকটিত হইল, তাহার সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এত সঙ্কীর্ণতা, এত নীচতা, এত ক্ষুদ্রতা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান,—সকল জ্ঞানই সার্ব্বভৌমিক। জ্ঞানই আমাদের উপাস্য। এই মিলনের দিনে, বিশেষতঃ বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে, যাহারা পূর্ব্ব-বঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে, বা উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা করে, ভেদবুদ্ধি-বিষলতার বীজ বপন করে, তাহারা দেশের শত্রু, নরাধম।

অর্চ্চনা, ভাদ্র।—শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যের "রত্নাবলী ও বিষবৃক্ষ" সুখপাঠ্য। নিবন্ধ লেখক নূতন পথের পথিক। এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "সাতার সালের কথা" ঐতিহাসিক খংকিকিং; মুখরোচক বটে। "প্রতিশোধ" গল্পের আখ্যানবস্তু মন্দ নহে। সম্পাদক মহাশয়ের "বিষ্ণু-সংহিতায় দণ্ডবিধি" পড়িয়া আমরা আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি। "অর্চ্চনা"র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

প্রবাসী, ভাদ্র।—মোলারামের "কালীয়-দমন" নামক চিত্র দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহাও কি 'চিত্র'? ইহা কোন দেশের চিত্রকলাপদ্ধতির অনুগত? ময়ূর অঙ্কনের প্রথায় কৃষ্ণের মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত হইয়াছে। কৃষ্ণ কালীয় দমন করিতেছেন, কি সুপারি গাছে উঠিতেছেন, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কৃষ্ণের মাথার উপর বেবেথোর মত পাহাড়। জলের যে 'আবর্ত্ত-অঙ্কন' দেখিয়া প্রবাসীর লেখকের মস্তিষ্ক আবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঘূর্ণপাক আছে বটে, কিন্তু জলের আবর্ত্ত নাই। চিত্রে যাহা নাই, ব্যাখ্যায় তাহা বিদ্যমান। ইহাই ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব। "জম্বু" সুখপাঠ্য। "লীলা" রবীন্দ্রনাথের প্রহেলিকা। "এই যে তোমার আড়ালখানি দিলে তুমি ঢাকা!"—এই "আড়াল-ঢাকা"র ঢাকা ও সাত দিন চেষ্টা করিয়াও খুলিতে পারিলাম না। "চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব" বিবিধ লোমহর্ষণ তথ্যে পূর্ণ। "ভারতীয় বিমান-নাবিক", "তারহীন টেলিফোন", "মধ্যযুগে ভারতীয় সভ্যতা" অনূদিত প্রবন্ধ,—পাঠযোগ্য। সমস্ত 'চ-বৈ-তু-হি'র পরিচয় দিতে পারিলাম না। "গৌড়রাজমালা"র সমালোচনায় "প্রবাসী"র সমালোচক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে "নায়কে" যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৈফিয়ৎ।—

"বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উদ্যোগে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী জাতির পুরাতত্ত্বের রীতিমত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। 'রীতিমত' শব্দটা ব্যবহার করিবার একটু উদ্দেশ্য আছে।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ বিশেষ যে কিছু অলৌকিক সমাচার দিতে পারিয়াছেন, তাহা বলি না, তবে তাঁহারা মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে পারিয়াছেন। সে ইতিহাসকথা বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গাথার ইতিহাস—গৌরবের ইতিবৃত্ত। গৌড়রাজমালার লেখক মনস্বী ও ধীমান্ শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার পুস্তিকায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পালরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন, সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, বাঙ্গালীর বিজয়ভেরী দূর পঞ্চনদের সীমান্তেও প্রতিধ্বনিত হইত। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার ভাস্কর ধীমান ও বীতপাল একটা নূতন পদ্ধতি (school) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুকরণে চীন হইতে জাভা, তিব্বত হইতে মগধ ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সকল দেশের কারিকরগণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। বাঙ্গালার আদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। এই সকল কথা যে লেখক গুছাইয়া বলিতে পারেন, তিনি বাঙ্গালী জাতির আত্মাভিমানের পুষ্টি করেন। কেবল এইটুকুই নহে, শ্রীমান রমাপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার প্রজাশক্তির প্রকৃত উন্মেষ ঘটিয়াছিল। মাৎস্য-ন্যায়ের সর্ব্বপ্রমাথী গোলযোগের পর বাঙ্গালী প্রজাবর্গের নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালার রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সকল কথা যে ঐতিহাসিক মালাকর দেশাত্মবোধের গন্ধরাজের স্তবকে সাতলহরের মালা গাঁথিয়া দেশমাতৃকার গলায় ঝুলাইয়া দিতে পারেন, তেমন লেখক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র; তাঁহাকে পুষ্প-চন্দন দিয়া পূজা করিতে হয়। আমরা এই ভাববিভোর হইয়া গত শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিকপত্রে গৌড়রাজমালা-লেখকের এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণের একটি স্তুতিগীতি প্রকাশ করিয়াছি। উহাতে গৌড়রাজমালার সমালোচনা ছিল না, লেখক মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধির বিশ্লেষণ ছিল না; লেসিঙের 'লেওকুণ' পাঠ করিয়া জর্ম্মণ ভাবুক যেরূপে ভাবায়াদের বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন, উহাও কতকটা তাহাই। বাঙ্গালা ভাষায় ফরাসী রীতির অনুকূল appreciation বা স্তুতিমাত্র।

"কিন্তু এই লেখাতেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। মিত্র স্বজন ক্ষেপিয়াছেন, ঐতিহাসিক বন্ধুগণ চটিয়াছেন, দলপতিগণ রাগে রোষে আত্মহারা হইয়াছেন। অনেকে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, আমাদের মতন ধুরন্ধর লেখকগণের শীর্ষে ভাষার অমন পুষ্পবৃষ্টি না হইয়া কোথাকার মফস্বলের তিনটা বাজে লোকের মাথায় পারিজাত-পরাগ-বর্ষণ করা হইল কেন?

"আর এক দল বলিতেছেন যে, সাহিত্য-সম্রাট সব ধূলায় গড়াগড়ি যায়, আর তুমি অস্থানে কুস্থানে এমন পূর্ণার্ঘ্য প্রক্ষেপ করিলে? শ্রীমান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভঙ্গী এই যে—কি! আমি প্রত্নতত্ত্বের রাজা, আমি লেখ-পাঠে অপরাজেয়, প্রস্তর-চয়নে অদ্বিতীয়, পুরাতত্ত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি পাথরের মুখে কথা ফুটাই—আমি থাকিতে আর একটা বাজে কাগজে লেখক, দৈনিক সাপ্তাহিক সমাচারপত্রের ভাড়াটিয়া সম্পাদক, প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বে পূর্ণ অজ্ঞ পুরুষ এমন সমালোচনা করিবে? লোকে গৌড়রাজমালার যোগ্য সমালোচনার জন্য কেবল আমারই পদানত হইবে; এ যে আমার একচেটিয়া! অতএব এই 'প্রবাসী' পত্রে লেখ একটা জগাখিচুড়ী সমালোচনা; তাহাতে দেও সাহিত্য-সমালোচককে গালাগালি! দোহাই ধর্ম্মের! প্রশংসার ঈর্ষ্যায় লেখাপড়া জানা লোকে যে এতটা আত্মহারা হয়, তাহা কখনই জানিতাম না।

"ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা"য় দেখিতেছি,—"ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোন দেশে নাই।"—আহ্লাদের কথা নয়? তবে দেশের লোকে এতদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই; কারণ, 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার'। আর, ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ভক্তবৃন্দের বদনেই বিরাজ করেন, দর্শন দুর্ঘট। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র,—প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। কোন্ কোন্ সুধী এই জগদ্ব্যাপী কবি-মনীষীর সার্ব্বভৌম ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা আমাদের ধন্য করিলেন, তাঁহারাও ধন্য!

ভারতী, ভাদ্র।—"বসুধা"র পটখানি মোগলাইদের কাজীর-দমনের উপর টেক্কা দিয়াছে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "আমার বাল্য-কথা"য় এবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচয় দিয়াছেন। সে কাহিনী যেমন মধুর, লেখকের শিশুসুলভ সরলতাও তেমনই উপভোগ্য। ঘরাও কথাগুলি সত্যেন্দ্রবাবু এমন গুছাইয়া বিশ্বের পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, দেখিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এ বিষয়ে ঠাকুর মহাশয়দিগের art অতুলনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রবন্ধসূত্রে অশিক্ষিতপটু পটুয়া শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথকে চিত্রচ্ছলে একবার 'ভ্যাংচাইয়া' লইয়াছেন। প্রবাদ আছে, 'কাজ না থাকিলে লোকে খ্যাঁঠার গঙ্গাযাত্রা করে'। গগনেন্দ্র রাজপুত্র, হাতেও বোধ করি, কাজ নাই। সুতরাং তাঁহার এ অধিকার আছে। সে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি যে খ্যাঁঠার আলেখ্য-বিগ্রহের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তারা।

সীতাবধোন্মুখ রাবণ ও মন্দোদরী

চিত্রকর—শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

মুক্ত।

১

আর কেন বাঁধি তোরে—শিকল দিলাম খুলি';
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি'।
ঝাপটি' পড়িল ভুঁয়ে, ভয়ে কাঁপে পাখা দুটি;
পুত্রকন্যা দেয় তাড়া—করে ঘরে ছুটাছুটি।

২

ল'য়ে গেনু গৃহ-চূড়ে অতি সন্তর্পণে ধরি',
সর্ব্বাঙ্গে বুলানু কর কত-না আদর করি';
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন গুঞ্জনে কূজনে গানে।

৩

স্ফুরিল কাকলী মুখে, উড়িল সহসা টিয়া—
উড়িছে—হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণরৌদ্র আলোড়িয়া।
কি আলোক—পরিপূর্ণ! কি বায়ু—পাগল-করা!
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

৪

ধায় ছাড়ি' গ্রাম নদী, দূর মাঠে যায় দেখা—
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ—শ্যামল-বঙ্কিম-রেখা।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধরা অবিরত—
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত।

৫

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাই আর!
চকিতে ভাতিল মেঘে অমরার সিংহদ্বার!
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারা-মণি!

৬

এই মুক্তি—এই মৃত্যু? হে দেব, হে বিশ্বস্বামী!
আমিও তো বদ্ধজীব, আমিও তো মুক্তি-কামী!
আমিও কি ফেলি' দেহ—বিস্ময়ে আতঙ্ক-হীন—
অসীম সৌন্দর্য্যে তব হইব আনন্দে লীন?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বংশানুক্রম।

৫

পূর্ব্বে মেণ্ডেলের বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা মিশ্র ও অমিশ্র উভয় প্রকার বংশানুক্রমের দৃষ্টান্তস্থল। এই বিধান ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জোহন গ্রেগর মেণ্ডেল নামক জনৈক বোহিমীয় পাদ্‌রী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। বিধানটির স্থূল মর্ম্ম এই:—বিভিন্ন-লক্ষণ-যুক্ত দুই জীবের পুংকোষ ও স্ত্রী-কোষ মিলিত হইয়া অপত্য উৎপন্ন হইলে, প্রথমতঃ মিশ্র বংশানুক্রম, পরে মিশ্র অমিশ্র উভয়বিধ বংশানুক্রম লক্ষিত হয়, এবং মিশ্র ও অমিশ্র অপত্যগণের সংখ্যামধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত লক্ষিত হয়। এই নিয়ম প্রথমে উদ্ভিদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং উদ্ভিদগণের মধ্যে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা এক্ষণে জন্তুগণের মধ্যেও পরীক্ষিত হইতেছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য বলিয়া এখনও স্বীকৃত হয় নাই। তবে, ক্রমেই এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলিয়া অধিকতর প্রতিভাত হইতেছে। আমি ফিরিঙ্গীগণের মধ্যে যত দূর পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাতে বিশ্বাস করি যে, এ বিধান জন্তুগণের মধ্যেও প্রযোজ্য। যাহা হউক, মেণ্ডেলের বিধান নিম্নে রেখাচিত্র দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

মেণ্ডেলের বিধান।

বিবেচনা করুন, "ক" ও "খ" দুইটি পৃথক লক্ষণ, এবং উহারা দুইটি পৃথক জীবে বিদ্যমান। ঐ পৃথক জীব এক-জাতীয়ও হইতে পারে, অথবা যেরূপ পৃথক-জাতীয় জীবের সংসর্গবশতঃ অপত্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ পৃথক পৃথক জাতীয়ও হইতে পারে। (১) ঐ দুই পৃথক লক্ষণযুক্ত দুইটি জীব, (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী) সংগত হইলে বংশশ্রেণী কিরূপ হইবে, মেণ্ডেলের বিধান তাহাই বুঝাইয়া দেয়। "ক" ও "খ" বিভিন্ন লক্ষণ, এবং ধরিয়া লওয়া যাউক যে, "ক" প্রবল (২) লক্ষণ, "খ" দুর্ব্বল লক্ষণ; (৩) অর্থাৎ, "ক" ও "খ" লক্ষণ যুক্ত দুই জীবের সঙ্গমের ফলে অপত্য জাত হইলে, তাহাতে "ক" লক্ষণই প্রকাশ পায়; "খ" লক্ষণ লুপ্ত ভাবে থাকে,

(১) যেমন কুকুর ও শৃগাল।

(২) Dominant.

(৩) Recessive.

অথবা পরিত্যক্ত হয়। এরূপ স্থলে "ক"-লক্ষণ যুক্ত ও "খ"-লক্ষণ-যুক্ত জীবের সংযোগে যে অপত্যশ্রেণী জাত হইবে, তাহাতে প্রথম পুরুষে মিশ্র বংশানুক্রম, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি অধস্তন পুরুষে মিশ্র অমিশ্র উভয়বিধ বংশানুক্রমই লক্ষিত হয়, এবং ঐ উভয়বিধ অপত্যের সংখ্যা সিকি, সিকি ও আট আনা, এইরূপ অনুপাতে হইয়া থাকে। "ক"-লক্ষণ-যুক্ত পুরুষ ও "খ"-লক্ষণ-যুক্ত স্ত্রীর সংসর্গে "কখ" জাত হইল। "কখ" মিশ্র লক্ষণ। ঐ লক্ষণ-যুক্ত অপত্যের সহিত তত্তুল্য অন্য একটি জীবের সংযোগ হইলে, দ্বিতীয়

পুরুষে যে কয়েকটি অপত্য উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের সিকি "ক"-লক্ষণ-যুক্ত, আট আনা "কখ"-লক্ষণ-যুক্ত ও অবশিষ্ট সিকি "খ"-লক্ষণ-যুক্ত হইয়া থাকে। এখন হইতে "ক"-ও-"খ"-লক্ষণ-যুক্তগণ যদ্যপি তুল্য-লক্ষণ-যুক্ত জীবের সহিত সংগত হয়, তবে বংশপরম্পরায় "ক" ও "খ" লক্ষণই ঠিক থাকিয়া যায়। কিন্তু "কখ"-লক্ষণ-যুক্তগণ হইতে ঐরূপ অবস্থায় পুনরায় সিকি-"ক"-লক্ষণযুক্ত, আট-আনা "কখ"-লক্ষণযুক্ত ও সিকি "খ"-লক্ষণযুক্ত অপত্য জাত হয়। "ক" ও "খ" লক্ষণ চিরতরে পৃথক হইয়া গেল, কিন্তু "কখ" মিশ্র রহিয়া গেল। তথাপি "ক" লক্ষণ প্রবল হওয়ায় "কখ"-যুক্ত জীবকে বাহ্যতঃ "ক"-এর ন্যায়ই বোধ হয়।

এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া সঙ্গত। বলিয়াছি, মটর সিমড়ীর গাছ দ্বিবিধ; দীর্ঘ ও খর্ব্ব। এতদুভয় মটর হইতে যে গাছ হইবে, তাহা সঙ্কর-জাতীয় হইলেও দীর্ঘ দেখা যাইবে। কারণ, খর্ব্ব-ত্ব অপেক্ষা দীর্ঘ-ত্ব প্রবল। স্ত্রীকোষ ও পুংকোষের মধ্যে বহু লক্ষণ থাকে; একের কোনও একটি লক্ষণ অপরের ঐ শ্রেণীর লক্ষণ অপেক্ষা প্রবল হইলে বুঝা যায় যে, প্রবলের মধ্যে এমন কোনও উপকরণ আছে, যাহা দুর্ব্বলে নাই। আবার দুর্ব্বলের উপকরণও প্রবলের নাই। সুতরাং দীর্ঘের ও খর্ব্বের মিশ্রণে প্রথম

বংশ সঙ্কর হইলেও দীর্ঘ-ত্ব প্রাপ্ত হইবে। দীর্ঘ ও খর্ব্ব মটরের সংকর
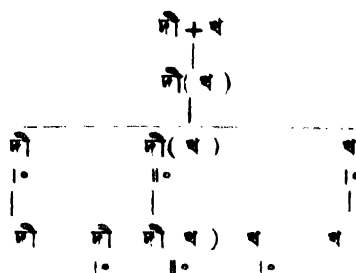
বংশানুক্রম পূর্ব্বের ন্যায় রেখাচিত্র দ্বারা উপরে দেখাইলাম। প্রথম পুরুষের "দীর্ঘ" গাছ প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ ও খর্ব্ব; কিন্তু দীর্ঘত্ব প্রধান লক্ষণ, সুতরাং উহা দীর্ঘ হইল। পরবর্ত্তী বংশে উভয় লক্ষণ পৃথক হইয়া এক-চতুর্থাংশ দীর্ঘ, এক-চতুর্থাংশ খর্ব্ব, এবং অর্দ্ধাংশ মিশ্রলক্ষণযুক্ত সঙ্কর কিন্তু দেখিতে দীর্ঘ হইল। "খ"-লক্ষণ-লুপ্ত থাকায় বন্ধনীমধ্যে দেওয়া গেল। এখন হইতে দীর্ঘ গাছগুলি খর্ব্বের সহিত মিশ্রিত না হইলে বংশ-পরম্পরায় দীর্ঘ গাছ জন্মাইবে। খর্ব্বের সম্বন্ধেও তাহাই। সুতরাং "দী" এবং "খ" এর মিশ্রণে প্রথম বংশে যে সঙ্করজাতীয় "দী (খ)" উৎপন্ন হইয়াছিল, পর পর বংশে কতিপয় গাছে ঐ লক্ষণদ্বয় পৃথক হইয়া "দী" হইতে "খ", এবং "খ" হইতে "দী" চিরতরে বিযুক্ত হইয়া গেল, এবং অবশিষ্ট গাছে মিশ্রিত হইয়া রহিল। এক শ্রেণীর গমে (wheat) পোকা লাগিত; উহার বীজে ঐ এক লক্ষণ ছিল। তাহার সহিত ভাল গমের বীজ দ্বারা সঙ্করজাতীয় গম উৎপন্ন করিয়া, পরে তত্তুল্য গমের বীজের দ্বারা পর পর বংশ হইতে এমন এক শ্রেণীর গম উৎপন্ন করা হইয়াছে, যাহাতে কখনই পোকা লাগিবার সম্ভাবনা নাই। উহার উপকরণ চিরতরে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের নিয়ম অবগত থাকিলে, উদ্ভিদ অথবা জন্তুর কত দূর উন্নতিসাধন করা যায়, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। আমেরিকা দেশে ইংরাজ প্রভৃতি শ্বেতকায়গণের ও কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীদিগের সংযোগে যে মুলেটো জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণে (মেণ্ডেলের বিধানানুসারে) কতক অংশ কৃষ্ণবর্ণ, কতক শ্বেতবর্ণ ও অবশিষ্ট সঙ্করবর্ণ দেখা যায়; ঐ সঙ্করগণও প্রায় কৃষ্ণকায়, কারণ, কৃষ্ণবর্ণ শ্বেত অপেক্ষা প্রবল লক্ষণ; কিন্তু উহাদিগের অপত্য উভয় বর্ণেরই হইয়া থাকে।

স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ।

স্ত্রীকোষ ও পুংকোষের মধ্যে বহু দানা অথবা বিন্দু থাকে, এবং ঐ বিন্দু হইতেই জীবদেহের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উপরে যে অনুপাতের উল্লেখ করিলাম, (অর্থাৎ, সিকি, সিকি ও আট আনা), তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষেও, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ পরীক্ষা করিলে দানাদারই বোধ হয়। এই সকল আর কিছুই নহে, একটি ঘন আবরণের মধ্যে একটু তরল পিচ্ছিল পদার্থমাত্র। ঐ পদার্থকে জীব-বস্তু বলে উহার মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বড় কেন্দ্র-বিন্দু আছে ; অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু আছে। বংশানুক্রম ঐ কেন্দ্র-বিন্দুরই কর্ম্ম। অন্যান্য ভাগের কোনই কার্য্যকারিতা নাই, এমন নহে ; ঐ সকল ভাগ ঐ কেন্দ্রবিন্দুর পরিপোষকমাত্র। (৪) স্বভাবতঃ স্ত্রীকোষ পুং-কোষ অপেক্ষা বড় ; কিন্তু পুংকোষ স্ত্রীকোষ অপেক্ষা চঞ্চল। উহাদিগের মধ্যে এক একটি কেন্দ্রবিন্দু থাকে ; তন্মধ্যস্থ আঁইসবৎ সূত্রগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রমের প্রধান প্রবর্ত্তক। পুং-কোষের ও স্ত্রীকোষের কেন্দ্রবিন্দু মিলিত হইলে যুক্তকোষ উৎপন্ন হয় ; তাহাই শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইয়া ভ্রূণদেহ গঠিত করে। উপরের লিখিত আঁইস্‌গুলিও জীববস্তুর বহুবিন্দু দ্বারা গঠিত।

এক্ষণে, মেণ্ডেলের বিধান বুঝিতে হইলে ঐ যুক্তকোষের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যস্থ বিন্দুগুলির বিচার করিতে হয়। মটরের কথা স্মরণ করুন। দীর্ঘ ও খর্ব্ব মটরগাছের বীজ হইতে সঙ্করজাতীয় মটর গাছ হইলে, তাহাতে সঙ্করশ্রেণীর মটর ফলিবে ; উহা বুনিলে দীর্ঘ-ত্ব ও খর্ব্ব-ত্ব পৃথক্ হইয়া যায় ; এবং কতকগুলি গাছ দীর্ঘ ও কতকগুলি খর্ব্ব হইতে দেখা যায়। কিন্তু দীর্ঘ-গুলির মধ্যে কতক অংশ মিশ্রভাবাপন্ন। কারণ, উহাদিগের ফল বুনিলে উভয় প্রকার গাছই হইয়া থাকে। তাহার অনুপাত সিকি, সিকি ও আট আনা কেন হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। সঙ্করভাবাপন্ন বীজের মধ্যে দীর্ঘত্ব ও খর্ব্বত্বের উৎপাদক উপকরণ (বহু দানা) বর্ত্তমান আছে। ঐ দানা সকল পরস্পর মিশ্রিত হইবার কালে পৃথক পৃথক ভাবে সংযুক্ত হয়, এবং দুই দুইটি একত্র মিলিত হয়। যদি দীর্ঘত্বের উৎপাদক উপকরণকে "দী" ও খর্ব্বত্বের উপ-

(৪) হাঁসের ডিমের হলুদবর্ণ অংশ কেন্দ্রবিন্দু হইতে জাত ; শ্বেতাংশ ইহার পোষক।

করণকে "খ" বলি, তবে যুক্তকোষস্থ "দী" ও "খ" এই ভাবে মিলিত হইবে।

(দী খ)+(দী খ)

একটি "দী"র সহিত অপর "দী" মিলিত হইল, এবং "খ" মিলিত হইল; তাহাতে "দী দী" এবং "দী খ" জাত হইল। ঐরূপ একটি "খ" র সহিত একটি "দী" ও এক "খ" মিলিত হইয়া "দী খ" এবং "খ খ" জাত হইল। সুতরাং শেষ ফলে ১ দী দী, ২ দী খ ও ১ খ খ উৎপন্ন হইল। অর্থাৎ, সিকি দীর্ঘ, সিকি খর্ব্ব, এবং উহার দ্বিগুণ (আট আনা) সঙ্করজাতীয় "দী খ" উৎপন্ন হইল।

এই ফল হইতে দেখা যায় যে জীবকোষের মধ্যে বহু দানা আছে; উহারা বহু লক্ষণের প্রবর্ত্তক। এই দানাগুলি বিভিন্নধর্ম্মী। কোনও দানা দীর্ঘত্বের, কোনও দানা মিষ্টত্বের, অথবা বর্ণের উপকরণ। এইরূপ পৃথক পৃথক লক্ষণের পৃথক পৃথক দানা আছে। এক লক্ষণের দানা অপর লক্ষণের দানার সহিত মিশ্রিত না হইয়া অমিশ্র বংশানুক্রম উৎপন্ন করে।

এই সকল দানা যে, বিভিন্ন ভাবে বিবর্ত্তিত ও সজ্জিত হইয়া বংশানুক্রমে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত করে, তাহার গুরুতর প্রমাণ এই যে, নিম্নশ্রেণীর ও উচ্চশ্রেণীর জীবগণের স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ অণুবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে তুল্যপ্রকারই বোধ হয়; উহাদিগের দানার মধ্যে কোনও প্রভেদই বুঝা যায় না। কিন্তু উহা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন আকারের জীব জাত হইয়া থাকে। বিড়াল, কুকুর ও মানবের স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ দেখিতে ঠিক একরূপ; কিন্তু উহা হইতে কেমন বিভিন্ন জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল কোষস্থ দানাগুলির স্ব স্ব ধর্ম্ম ও সংস্থান অবশ্যই সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা বিবেচনা করিতে হয়। পিতৃদেহের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানগত লক্ষণ অপত্যে ঐ স্থানে উৎপন্ন হইলে, বিবেচনা করিতে হয় যে, ঐ লক্ষণ-উৎপাদক দানা অন্য লক্ষণ-উৎপাদক দানার সহিত মিশ্রিত হয় নাই, এবং উহার সংস্থানও পিতৃকোষের ন্যায়ই রহিয়াছে, পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কোষস্থ দানা অথবা বিন্দু বিভিন্নধর্ম্মী থাকে, ইহা স্বীকার করিলে, পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিবিধ বংশানুক্রমই বুঝা দুরূহ হয় না।

শ্রীশশধর রায়।

লুব্ধ।

কেন আঁখি ছল-ছল, কেন দীর্ঘশ্বাস,
কেন।হেন আত্মপ্রবঞ্চনা ?
অতৃপ্তির অগ্নি দিয়া হা মুগ্ধ হতাশ !
মরুভূমি করিছ রচনা ?
যে গান হয়েছে শেষ সে কি ফিরে আর
এ সিন্ধুর পর-পার হ'তে ?
যে জ্যোৎস্না নিবে গেছে সে কি পুনর্ব্বার
দেখা দেয় পুষ্পবন-পথে ?
কলিকাবন্ধনমুক্ত মধুর সৌরভ
কভু কি ফিরিয়া আসে ফুলে ?
যে নির্ঝর বয়ে গেছে তুলি' কলরব,
সে কি ফিরে গিরি-হৃদি-মূলে ?
গত প্রেম-মিলনের অমৃত পরশ
অঙ্গে অঙ্গে ফিরে কি আবার ?
সম্ভোগে ফুরায়ে গেছে যে আনন্দ-রস,
সুখ-স্বাদ ফিরে কি তাহার ?
আনন্দের নিত্যোৎসবে, সৌন্দর্য্য মেলায়
কেহ নহে – কিছু নহে স্থির ;
উঠে, ফুটে,—পলে পলে আপনা বিলায়,
জ্বলে শিখা লুব্ধ অতৃপ্তির !
স্মৃতির আনন্দটুকু—এ দিব্য উৎসবে
রস-সিন্ধু সুন্দরের দান।
তাহে পুণ্যস্নান করি', নবীন গৌরবে
গাহ রে গাহ রে জয়-গান !
অসীম ভাণ্ডার মুক্ত,—এই রসধারা,
এ মাধুরী ফুরাবার নয় ;
রস-রাস-মঞ্চ বিশ্ব, ওরে আত্মহারা !
এ আনন্দ অনন্ত অক্ষয় !

অনাগত-গর্ভ হ'তে উঠি ঊর্ম্মি-মেলা,
আছাড়ি' পড়িছে বর্ত্তমানে ;
পলে পলে ডুবে যায়, ভেসে যায় বেলা,
রূপ রস ছন্দ গন্ধ গানে !
কোটী মুখে কোটী বুকে ঝরিতেছে সুধা,
কোটী তৃষ্ণা লভিছে নির্ব্বাণ,—
শঙ্কা নাহি রে শম্বুক, ক্ষুদ্র তোর ক্ষুধা
তৃপ্ত হবে, স্নিগ্ধ হবে প্রাণ !
আনন্দ সঞ্চয় করি' পরিপূর্ণতায়
যে দিন টুটিবে আবরণ,
আপনারে হারাইয়া এ রস-লীলায়
লভিবি রে অমৃত-মরণ !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মুক্তির সোজা পথ।

অনেকে বলিয়া থাকেন—"মুক্তির চেষ্টা স্বার্থপরতা" ; অর্থাৎ, নিজে মুক্তিলাভ করিয়া অপরকে সংসারের গহন কান্তারে পরিত্যাগ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। এইরূপ সংস্কারে মুক্তির একটা বদনাম রটিয়া গিয়াছে—এমন কি, অনেকের ধারণা যে, মুক্তিলাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে হাতী, ঘোড়া ও টাকাকড়ি পাওয়া যায়। সে দিন এক জন মুক্তপুরুষের সহিত দেখা হইয়াছিল। লোকটা জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক—অনেকটা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতের ন্যায়। পূর্ব্বকালে তোফা চেহারা ছিল, এখন বিশ্রী ও বিবর্ণ। চেষ্টা করিলে হাসিতে পারে, কিন্তু দাঁত নাই ; আনন্দিত কিংবা পিপাসাতুর, তাহা চট্‌ করিয়া বুঝা যায় না। কথোপকথন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীযুক্তের কোনও বিশেষ সুবিধা ঘটে নাই, বরঞ্চ যদি কোনও বদ্ধ পুরুষ তাঁহার সহিত স্থান বিনিময় করিতে চাহেন, তবে তিনি অচিরাৎ প্রস্তুত।

লোকটি পূর্ব্বে ডেপুটী ছিলেন। তাঁহার মতে চাকুরীই মুক্তির সোজা পথ। চাকরীর চরম সীমা অতিক্রম করিলেই মুক্তি। মুক্তিলাভ ে

অর্থশূন্যতা একই—উভয়ই স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে। সুতরাং মুক্ত পুরুষের স্বার্থপরতা বন্ধ্যা নারীর পুত্রের ন্যায় অলৌকিক ও অসম্ভব। (সাংখ্যদর্শন)।

প্রথমে কথাটা কিঞ্চিৎ অভিনব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহার মধ্যে সার সত্য নিহিত। ভারতবর্ষ মুক্তিক্ষেত্র। মুক্তির আদব কায়দা অন্যান্য পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের ন্যায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গযোগ মুক্তির প্রধান কায়দা বলিয়া গণ্য হইত। অধুনা চাকরীতেই অষ্টাঙ্গ, এমন কি, দশ বারটা যোগ বর্ত্তমান। অতএব চাকুরীর কদব কেরামৎ যোগশাস্ত্রের ন্যায় নিগূঢ় ও গুরুমুখী বিদ্যা হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদিগের প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অষ্টাঙ্গাদি যোগের ন্যায় চাকুরীর ক্রিয়াকলাপ কি রকম, এবং তাহার তন্ত্র মন্ত্রাদি ফলদায়ক কি না। অবশেষে আমাদিগের দ্রষ্টব্য যে, চাকুরীতে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী কি না, এবং কীদৃশ উপায়ে তাহা সাধিত হয়।

পুরাকালে চাকুরী কিংবা পেশা বংশপরম্পরাগত ছিল, এখন অনেকটা গুরুশিষ্যপরম্পরাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ, এখন যে কোনও জাতি হউক না কেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক চাকুরীতে দীক্ষিত হইতে পারে। যোগ-কৌশল শিক্ষা করিয়া ক্রমে যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। নিতান্ত অক্ষমের হয় ত যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু অন্যবিধ কোনও জঞ্জাল নাই। ব্রহ্মচর্য্য, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদি প্রক্রিয়া নাই, এবং শাস্ত্রপ্রমুখ গোঁড়া অনড্বানদিগের বিধানাদি নাই ("অচল আয়তন।")। পিতা পুত্রের পেশা অবলম্বন করিবে, এমন কোনও কথা নাই। ব্রাহ্মণ যে ম্লেচ্ছের শিষ্যত্ব লইবে না, এমন কোনও বারণ নাই। একবার প্রবেশ করিতে পারিলেই হইল, তাহার পর গুরুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ, এবং কর্ম্ম-যোগের আরম্ভ।

যোগপথে বিভূতিলাভের আশা করিয়া লোকে দীক্ষিত হয়, কিন্তু শেষে অনেকে বিরক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। চাকুরীতেও বিভূতির আশা করিয়া যায়, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনে বহু বিপদ। অন্য উপায় নাই। আশা থাকিলেও নাই। না থাকিলেও নাই। সুতরাং এটা কঠিনতর যোগ, কিংবা দুর্য্যোগ। অথচ হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি যোগ অপেক্ষাও ইহা ফলদায়ক, তাহা ক্রমে দর্শিত হইবে। নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে

চাকুরী পাওয়া দুষ্কর। অনেকে বি.এ. এম্.এ. পাশ করিয়াও অভিলষিত চাকুরীতে ঢুকিতে পারেন না. অথচ হয় ত এক জন বাহ্যদৃষ্টিতে অকর্ম্মণ্য এম্.এ.-ফেল চট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, আয়তনের স্থিতিস্থাপকত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান না থাকিলে কোনও পদে স্থিরভাবে আরূঢ় হওয়া সুকঠিন। যাঁহারা পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে কোনও দেবতা কিংবা অসুরের স্কন্ধে আরোহণ করেন নাই, অর্থাৎ, যাঁহারা বিষ্ণুপুরাণের মতে ককুৎস্থবংশীয় নহেন, তাঁহারা কখনও চাকুরী পাইতে পারেন না। কারণ, চাকুরী নামক কর্ম্মযোগের প্রধান লক্ষণ ইহাই যে, যদিও দাসত্ব সেবাদি করিতে হয়, কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তি কিংবা বর্গবিশেষের স্কন্ধে আরোহণ না করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই।

২

যমনিয়মাদি।

চাকুরী নামক যোগশাস্ত্রান্তর্গত মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে হইলে কোনও মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না। একেবারেই ক্রিয়ার আরম্ভ। হয় ত দর্শনী প্রভৃতি দিয়া আপনি আপাততঃ কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু ফল অবশেষে একই।

প্রথমতঃ, যমনিয়মাদির বিষয় দেখা যাউক। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের নাম যম। সাধারণ যোগমার্গে এগুলি পরিশ্রমপূর্ব্বক অভ্যাস করিতে হয়। চাকুরী নামক ক্ষেত্রে ইহা দুর্বিপাকবশতঃ স্বতঃই চট করিয়া জমিয়া যায়। যেমন মিষ্টান্নবিক্রেতা স্বয়ং মিষ্টান্ন উপভোগ করে না, বস্ত্রবিক্রেতা বহুমূল্য বস্ত্রাদির প্রতি লোভ করে না, তদ্বৎ, কর্ম্মচারিগণেরও অহিংসাদি ধর্ম্মের সঞ্চয় করিতে অধিক সময় লাগে না।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন। বিবাহিত ও পুত্রকলত্রসম্পন্ন হইলেও পুনর্ব্বার নূতন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে দিনরাত্রির মধ্যে দশ বার ঘণ্টা একাদিক্রমে পরিশ্রম অসম্ভব; এমন কি, অল্পদিনেই সমূল জিহ্বা বাহির হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সহিত বংশবিস্তার সমানুপাতে ঘটে, তাঁহাদিগের অকালমরণ নিশ্চিত। পেন্সন, অর্থাৎ সমাধিপাদ পর্য্যন্ত পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগারূঢ় হইয়া এটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বিপত্তি হইতে নিস্তারলাভ হইতে পারে, নচেৎ বিষম বিপদ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা দূর হইয়া যায়। জীবহিংসা চাকরীস্থলে ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মুক্ত পুরুষ বলিলেন, "আমি প্রথমতঃ ডেপুটী হইয়াই বাল্যবন্ধু মধুসূদনের সহিত শ্রীরামপুরে সাক্ষাৎ করি। মধুসূদন তখন অস্থায়ী মুন্সেফ। আমি হাসিয়া খুন। মধুসূদনের সামান্য চায়না কোট ও চাদনীর টুপী এবং শীর্ণ কলেবর নয়নপথে পতিত হইবামাত্র আমার সহজদয়ার্দ্র চিত্ত অধিকতর ব্যাকুলিত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, দর্শনানন্দ দ্বারা চিত্ত পরিপ্লুত হওয়াতে দুঃখের ভাব মনেই রাখিলাম, আনন্দের ভাব সম্যকরূপে দন্তোষ্ঠাদিতে বিকাশ করিলাম। মধুসূদন বলিল, 'দাদা মনে রেখ। কতদিন পরে যে এই গোজন্ম পার হ'ব, তা বলতে পারিনে।' আমি তাহাকে রীতিমত সান্ত্বনা প্রদান করিলাম। বাস্তবিক, পেন্সন পাইবার পূর্ব্বেই মুন্সেফগণ অতিবৃদ্ধ ও অতিরুগ্ন হইয়া পড়ে, এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

"মধুসূদনের নিকট বিদায় লইবার পর আমি চট্টগ্রামে যাই। তথা হইতে কুমিল্লা, ক্রমে ঢাকা ময়মনসিংহ পরিভ্রমণ করিয়া হুগলীর আরামবাগে। পূর্ব্ববঙ্গে মৎস্য সরীসৃপাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পক্ষী পতঙ্গাদি সর্ব্ববিধ স্বেদজ ও অণ্ডজ জীবজন্তু উদরসাৎ করিয়াছিলাম। এখন চতুষ্পদ জন্তুগণের পশ্চাতে প্রবৃত্ত হইলাম। মধুসূদন আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত, 'দাদা, কেমন আছ, আমরা সকলে সুস্থ ও নিরাপদে আছি।' মধুসূদন তখন রাঁচীতে। আমি সপরিবারে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মর্ত্ত্যের মধুসূদন ও বৈকুণ্ঠের মধুসূদন উভয়কেই স্মরণ করিতে লাগিলাম। একদিন সস্ত্রীক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ দেখি, মধুসূদন মুন্সেফ হৃষ্টপুষ্ট আকারে মহকুমার মুনসফী আদালতের গেট্ পার হইয়া সহাস্যবদনে বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইয়াছে। দেখিবামাত্র আমি সস্ত্রীক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। উভয়ে বিস্ফারিতনয়নে তাকাইয়া রহিলাম। হয় ত একটু গাত্রদাহ হইয়াছিল। সহধর্ম্মিণী কহিলেন, 'তাই ত গা, খবর পর্য্যন্ত দেয় নাই!'

"কিন্তু আমাদিগের ভ্রম ক্রমেই দূর হইয়া গেল বন্ধু মধুসূদন স্বয়ং আসিয়া পুরাতন বন্ধুত্ব নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইল।

"মধুসূদনের বেতন তখন ৪০০৲, কিন্তু দুই মাসের মধ্যেই সদরালার পদে বাহাল হইয়া মুঙ্গেরে বদলী হইল। এই সুসংবাদ শুনাইবার জন্য মধুসূদন আমার বাসায় আসিয়াছিল—সস্ত্রীক! মনে কর কি নিদারুণ

ব্যাপার! আমি বিশ বৎসর ধরিয়া চারি শত টাকায় পড়িয়া আছি, এবং সে ব্যক্তি চট্ করিয়া ছয় শত টাকায় উঠিয়া গেল? গবর্মেণ্টের কি চক্ষু নাই?

"মধুসূদন আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই হউক, বা অন্য কারণেই হউক বলিল, 'দাদা, আজ রাত্রিকালে আমার ওখানে দুটো আহার করিও। হয় ত অনেক দিন দেখা হবে না।'

"ধীরে ধীরে আহার করিতে গেলাম। তখন রাত্রি নয়টা। মধুসূদন বলিল, 'দাদা, এত দেরি কেন?' আমি বলিলাম, স্ত্রীর অসুখ।' তবে একটু 'টু ইওর হেল্থ্' হইতে দোষ কি?

"কিন্তু মধুসূদন অবাক্! 'তুমি এখনও মদ ছাড় নাই?'

"আমি না।

"মধু তবেই ত মুস্কিল। আমার স্ত্রী গোঁসাইদের মেয়ে, জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না। আমি বীরেনের বাড়ী থেকে এক গ্লাস হুইস্কী আনিয়ে দিচ্ছি, বাইরে খাওগে।

"অগত্যা তাই। কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ নাই। মধুসূদন মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে।

"আমি। তাই ত মধু! ক'রেছ কি? এমন ক'রে শরীর রাখবে কি ক'রে?

"কিন্তু মধুসূদন হাসিয়া বলিল, 'দাদা! শরীর বেশ আছে। একটা কথা বলি—জীবহিংসাটা করিও না।'

"কথাটা শুনিয়া আমি চটিয়া খাক্ হইয়া গেলাম। আমার আসিবার সময় হয় ত সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছিল। সেই অবধি মধুসূদনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই, এবং মুন্সেফ্ দেখিলে পরশুরামের মত একটা দুর্জ্জয় ভাব আসে।"

মুক্তপুরুষ এবম্প্রকার পূর্ব্বকথা বলিয়া পুনরায় শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন।

এখন বোধ হয় প্রতিপক্ষ-ভাবনা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঈর্ষানল প্রভৃতি প্রজ্বলিত না হইলে শীঘ্র নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না। ফলভোগ দ্বারা জ্ঞানের উদ্রেক হয়, এবং জ্ঞানের উদ্রেক হইলেই শান্তি। চাকুরীতে এই ফলভোগ শীঘ্র ঘটে, কাজেই অল্প সময়ে জ্ঞান তীক্ষ্ণ হইয়া পড়ে।

চৌর্য্যবৃত্তি, মিথ্যা বচন ও আচরণ, উৎকোচ প্রভৃতি গ্রহণ, এই ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত। যাহারা স্বভাবতঃ নিষ্ঠাবান, তাহাদিগের অল্পদিনেই বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। যাহারা লোভ সংবরণ করিতে পারে না, তাহাদিগের প্রবৃত্তির পথে গতি ও শীঘ্র জ্ঞানের উদয় হয়।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানাদির নাম নিয়ম। বলা বাহুল্য, চাকুরীতে এগুলি যত শীঘ্র সাধিত হয়, অন্য কিছুতেই তাহা হয় না। শুচির সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, স্নান ও আহারাদির পর সারাদিন আফিসে হংসপুচ্ছ নামক যন্ত্র চালনা করিলে কোনও প্রকার অশৌচের সম্ভাবনাই থাকে না, এবং ক্লান্তিবশতঃ সারানিশি সুষুপ্ত হওয়াই জীবনধারণের একমাত্র উপায়। এই ত গেল বাহ্যশুচি। আভ্যন্তরিক শুচির কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। হিংসা দ্বেষাদির পরিণাম যে কেবল হাতে হাতে, তাহাই নহে, অনেক সময় স্বীয় কর্ম্ম ছাড়া অন্য কোনও কুচিন্তা মনোমধ্যে স্থান পাওয়াই দুর্ঘট। সুতরাং চাকুরী নামক বৃত্তিই স্বাধ্যায় ও তপস্যা; আমি কি? এরূপ দুর্দ্দশা আমার কেন? আমার ন্যায় দুঃখী কে আছে? ইত্যাকার ভাবনা হইতে ক্রমেই 'হে ভগবান্, এ দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে কবে পরিত্রাণ পাইব' আসিয়া পড়ে। ঈশ্বর-প্রণিধানের বিলম্ব থাকে না।

৩

আসন ও প্রাণায়ামাদি।

ভগবান্ পতঞ্জলির মতে 'স্থিরসুখাসনম্'ই সর্ব্বাপেক্ষা মুক্তির উপযোগী আসন। হঠযোগে মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারাও আসন ঠিক করিতে হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। যাহার সোজা আসন মনঃপূত নহে, তাহার পক্ষে মুদ্রাই বিধেয়। এই উভয়যোগ অর্থাৎ রাজযোগ ও হঠযোগ একত্র করিয়া যে আসন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম 'চেয়ার'। গীতায় উক্ত আছে যে, আসন নিতান্ত নিম্নে কিংবা উচ্চে হওয়া যোগবিঘ্নকর; 'চেয়ার' (কেদারা) ঠিক মধ্যমে থাকে। প্রত্যহ ৭।৮ ঘণ্টা একাসনে বসিয়া থাকিলে অভ্যাসযোগে যে মহাদক্ষতা জন্মিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

আসনে মধ্যে মধ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়; অর্থাৎ, ছারপোকা ইত্যাদি নরশত্রু কীটাদি আসনগহ্বরে বাস করিলে জ্বালাতন হইতে হয়। সেই স্থানে মুদ্রাদির আবশ্যক। 'করচরণাদ্যঙ্গবিন্যাসবিশেষেণ উপবেশনম্ ইত্যর্থঃ'।

অর্থাৎ,মধ্যে মধ্যে এরূপ ভাবেপদতল, জংঘা প্রভৃতির বিন্যাস করিবে যে,সহজে ছারপোকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে কুক্কুটের মত, কচিৎ কচ্ছপের মত, কদাচিৎ নৌকাদণ্ড-সঞ্চালনকারী দাঁড়ীর মত, কখনও উঠিয়া, কখনও বসিয়া, কখনও সংবাদপত্র দ্বারা গহ্বরের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া আত্মরক্ষা করিবে ; কারণ, সকল যোগমার্গই বিঘ্নসঙ্কুল।

তবে এটা যেন মনে থাকে যে, আসন 'জয়' করা চাহি। কেবল হংসপুচ্ছ চলিবে। পদতল ইত্যাদি ও সমগ্র কলেবর স্থির ও ঋজুভাবে থাকিবে। অনেকে কুঅভ্যাসবশতঃ বৃশ্চিকরাশিজাত পুরুষের ন্যায় পা দোলাইয়া থাকেন। 'তেন অলম্'।

আসন স্থির হইলে গুরু (বড় বাবু, কিংবা বড় সাহেব) সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনেকে প্রথম শিক্ষাস্থানে ভারবাহক দুরন্ত গর্দ্দভের ন্যায় পশ্চাতের পদদ্বয় ঘন ঘন ছুড়িতে থাকে। ইহা অতীব বিরক্তিকর, এবং ইহাতে দেবলোক ও পিতৃলোক উভয়েই বিমর্ষ হন। কারণ, শাস্ত্রে বলে যে, নিতান্ত শ্রান্ত হইলে, এমন কি, নিদ্রাভিভূত হইলেও আসন বজায় রাখিয়া নিদ্রা যাইবে।

[আসনের অন্যান্যবিধ উপকারিতা] এহেন আসনে পদদ্বয় শীর্ণ হইয়া যায়। তিক্ত বিরক্ত হইয়া গৃহসংসার হইতে বুদ্ধদেবের ন্যায় পলাইবার উপায় থাকে না। উদর নিশ্চল হইয়া ক্ষুধা কমিয়া যায়। বাম হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; ফলে দক্ষিণ হস্ত মস্তিষ্কের ন্যায় তেজঃশালী হয়, এবং চক্ষু ডাগর হইয়া উঠে ; মাড়ি প্রশস্ত হয়।

আসন-জয়ের সহিত দ্বিবিধ মুদ্রা ফলদায়ক—যথা, মহামুদ্রা ও খেচরী মুদ্রা। পাছে পদতল অসাড় হইয়া যায়, তজ্জন্য পদযুগল মধ্যে মধ্যে কটিদেশের সরল কোণে (right angle) লম্বমান করিবে ; ইহার নাম মহামুদ্রা। স্ত্রীলোকেরা শিশুসন্তানকে দুধ খাওয়াইবার সময় এই ভাবে বসিয়া থাকে। অনন্তর, জিহ্বা সাবধানে তালুর প্রান্তভাগে সন্নিবেশিত করিবে, নচেৎ দারুণ পরিশ্রমে বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

প্রাণায়ামের মারপ্যাঁচ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-দমন। অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অভ্যন্তরেই হওয়া চাহি। বাহিরে আসিলে সকলই ব্যর্থ। যে সকল পশু ধীরে ধীরে যায়, তাহাদিগের নিঃশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী। যেমন, গর্দ্দভ, হস্তী, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রজ্ঞাসম্পন্ন জানোয়ার। নিঃশ্বাস দমন করিলে মনের ব্যগ্রতা কমে ;

মনের ব্যগ্রতা কমিলে নিশ্বাস লম্বা হইয়া যায়। চাকুরীস্থলে ব্যগ্র কিংবা রিপুপরবশ হইলে অচিরাৎ তাড়নাগ্রস্ত হইতে হয়। এ স্থলে প্রাণায়াম নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

আফিসে বসিয়া প্রাণায়াম যত সোজা, তত সোজা যোগাভ্যাসে ও সঙ্গীতচর্চ্চাদিতেও হয় না। প্রত্যেক কৈফিয়ৎ এক একটা প্রাণায়ামের উপযোগী। আতঙ্কই নিশ্বাস বন্ধ করে। একটা আতঙ্ক হইতে পরিত্রাণ পাইলে অন্য আতঙ্ক। এক একটা সাক্ষীর জোবানবন্দী, এক একটা জেরা, হাকিমদিগের পক্ষে এক একটা প্রাণায়াম. কর্ত্তৃপক্ষ হইতে তাড়না সকলের পক্ষেই প্রাণায়াম কোনও ভ্রম হইলে, কোনও অবৈধ আচরণ করিলে শীঘ্র দমবন্ধ হইয়া পড়ে, নিশ্বাস লম্বা হয়। এক একটা ফাইল-(file)-এর ফিতা খুলিতে, নোট করিতে, এবং পুনঃ ফিতা লাগাইতে যতটুকু সময় যায়, তাহাতে রেচক, পূরক ও কুম্ভক, তিনটিরই কার্য্য সম্যকভাবে সম্পন্ন হয়। সাধারণ যোগী এক মিনিটে হয় ত একটা প্রাণায়াম করেন; এক জন কেরাণী পাঁচ মিনিটে একটা শেষ করে। অতএব সে পাঁচগুণ সিদ্ধ পুরুষ। এইরূপ প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা ধরিয়া করিলে শীঘ্রই যে প্রত্যাহার ও ধ্যানের কার্য্য হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

৪

প্রত্যাহার ও ধ্যান।

বারটি প্রাণায়াম দস্তুরমাফিক করিলে একটি প্রত্যাহার হয়। অপর দিকে মন ধাবিত হইলে তাহা পুনর্ব্বার আত্মকর্ম্মে স্থাপনার নাম প্রত্যাহার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রতিদিন চড়টা চাপড়টা আহারের নাম প্রত্যাহার। যদিও ইহা ব্যাকরণসঙ্গত অর্থ নহে, তথাপি ফলে একই। কারণ, যাহা দ্বারা মন স্বীয় কেন্দ্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাহার।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, চাকুরীস্থলে যথারূপে নিয়মবদ্ধ. আসনবদ্ধ ও প্রাণায়ামবদ্ধ থাকিলেও মন ইতঃস্ততঃ ধাবিত হয়। তাহা তিন প্রকার:—

১। স্বার্থসিদ্ধেঃ।

২। অকর্ম্মত্বাৎ।

৩। প্রকৃত্যা।

স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত পুরুষ তৃতীয় সূত্রের অন্তর্গত। স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গের বিষয় চিন্তা করিলে কর্ম্মের ক্ষতি হয়। রাজকর্ম্মচারী মুক্তপদলাভ করিবার

বাসনা করিলে, অন্যান্য সংসারবাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে তাঁহার বিরত হওয়া উচিত। রিপুপরবশ হইয়া কিংবা পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কোনও অকর্ম্ম করিয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যাহারের বন্দোবস্ত করা উচিত, নচেৎ ঘোরতর দুর্ব্বিপাকের সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় সূত্র প্রায় অকর্ম্মা অর্থাৎ অলস লোকের পক্ষে। যাঁহারা কর্ম্মস্থলে সুনিদ্রা কিংবা বাজে গল্পাদির বশবর্ত্তী হইয়া সময় নষ্ট করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অর্থদণ্ড ও কর্ম্ম হইতে বিতাড়নই প্রত্যাহারের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রেমিক লোকের পক্ষে চাকুরী কোনও ক্রমেই বিধেয় নহে। কারণ, দণ্ডে দণ্ডে প্রণয়পাত্রী ইত্যাদির কথা স্মরণমাত্র হংসপুচ্ছাদি কম্পিত হইয়া লেখা নষ্ট হয়, বানান্ ভুল হয়, কৈফিয়ৎ দিতে দেরী হয়। চাকুরী জ্ঞান-মার্গের পথ ; সে পথে প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি হৃদয়দ্রবকারী ভাবের স্থান নাই। এই জন্যে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

'অপাণিগৃহীতেন রাজকার্য্যমপি ন কুর্য্যাৎ'—[বিজ্ঞারত্ন ; Entrance course] অর্থাৎ বিবাহ না করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্ত করিবে না। উন্মনা হইলে যোগবিঘ্ন ঘটে। ইহার টীকায় ভোজরাজ বলিয়াছেন যে, পুত্রকলত্রাদি হইলে পর চাকুরী আরম্ভ করা প্রশস্ত। কারণ, তখন যৌবনের প্রথম উদ্যম, প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের চঞ্চলতা অনেকটা নিবৃত্ত হইয়া যায়। 'সংসারে অর্দ্ধবৈরাগ্য ভাব আসিলে যযাতির ন্যায় চাকুরীতে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ বৈরাগ্যভাব করিয়া লইবে।'—(ইতি পৌরাণিকী বার্ত্তা)।

প্রথম সূত্র—অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মন সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ; কারণ, এটা অতি বৃদ্ধ বয়স, এমন কি, পেন্সনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে পদোন্নতিলাভের চেষ্টা অর্থাৎ বেতনবর্দ্ধনাদির জন্য কৌশলাদির প্রয়োগ সর্ব্বপ্রধান। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য প্রভৃতির তন্ত্রমন্ত্রাদি এ স্থলে বিশেষরূপে প্রযোজ্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই কয়টি উপায় প্রশস্তঃ—

১। সময়োপযোগী জোযাযোগ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিন্দাবাদ।

২। মুহুর্মুহুঃ স্বীয় কর্ম্মনিপুণতা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রদর্শন ও স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

৩। সময়োপযোগী অভিবাদনাদি। অর্থাৎ 'ছেলাম', 'নমস্কার', প্রভৃতি মুদ্রায় অভ্যাস।

জননী

চিত্রকর,—পি, ট্যারাণ্ট্।

কলসটি ভাঙ্গিয়াছে!

চিত্রকর—বুগারিও।

৪। সুপারিশ-পত্রাদি লইয়া অবসরমত ত্রিদিবস্থ হওয়া (দার্জ্জিলিং,সিমলা ইত্যাদি দৌড়ান ও বৈধ অবৈধ উপায়ে স্বার্থসাধনের চেষ্টা।)

৬। মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি মন্ত্রের শিক্ষা।

চাকুরীস্থলে স্বার্থসিদ্ধি ও পদোন্নতির অনেক বাধা ব্যতিক্রম আছে। সচরাচর ত্রিংশৎ বৎসর কর্ম্ম করিলে কিংবা পঞ্চান্ন বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মচারিগণের অবসর গ্রহণ করা নিয়ম। যদি ইহার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তবে ভাল। কিন্তু যোগাভ্যাসবশতঃ ইহারা দীর্ঘজীবী হইয়া পড়ে; শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না, এবং যোগকৌশলাদি দর্শাইয়া Extension অর্থাৎ দীর্ঘ-মেয়াদী পাট্টা লইয়া থাকে। ইহাতে নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের পথ রুদ্ধ হয়। কাজেই মারণ, উচাটনাদি না করিলে উপায় নাই। ঘন ঘন Civil list দর্শন, শত্রুনিপাতের পথে নিদিধ্যাসন, এবং যেন তেন প্রকারেণ নিজের পথ পরিষ্কৃত করিবার চিন্তনাদি, মনের আয়তনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তীক্ষ্ণ শরজালের ন্যায় অপর পক্ষের প্রতিকূল ও অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে।

এতদ্দ্বারা প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝা যায়। বিকল্পে অন্যের অনিষ্টসাধন যোগমার্গে ঘোর বিঘ্ন-উৎপাদক, অতএব মন স্থির রাখিবার নিমিত্ত ধ্যানের দরকার। নচেৎ বহুমূত্র নামক রোগে আক্রান্ত হইবার খুব সম্ভাবনা। কাহারও যক্ষ্মা প্রভৃতি, কাহারও পুত্রশোকাদি হইয়া পড়ে। সুতরাং মারণ উচাটন বশীকরণাদি এক দিকে সুফলদায়ক হইলেও অন্য দিকে ভারণ্ড পক্ষীর দ্বিতীয় গ্রীবার ন্যায় বিষময় ফল প্রসব করে। আমরা অনেক নবীন মার্জ্জার ও বৃদ্ধ জরদ্গবকে এইরূপে অকালমৃত্যুর গ্রাসে পড়িতে দেখিয়াছি। এবংবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও বিশেষ আনন্দ ভোগ করিতে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রত্যাহার সম্বন্ধে দড় হইয়া পড়িলেই ধ্যানের অবস্থা আসে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, প্রস্তাবিত 'চাকুরী' নামক মুক্তিপথে ধ্যান কীদৃশ? ধারণা কীদৃশী? আমাদিগের বক্তব্য যে, এই স্থলে ধ্যানের কোনও জঞ্জাল নাই। কোনও কল্পিত ইষ্টদেবতার রূপগুণাদিতে মন নিবিষ্ট করিবার দরকার নাই। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, কল্পিত মূর্ত্তিতে একাগ্র হইয়া পড়িলেও মূর্ত্তিটা বাস্তবিক কিছু নয়, একাগ্রতাই আসল। যখন ভগবান দেখা দেন, তখন তাঁহার নিজের মনোমত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের পছন্দ গ্রাহ্য না করিতে পারেন। ভগবানের দয়া ব্যাধিরূপে

অবতীর্ণা হইতে পারে; এমন কি, অর্দ্ধচন্দ্রভাবে আসিবার আশ্চর্য্য নাই। যাহাতে চট্ করিয়া সংসারের অলীকতার বাস্তবিক ধারণা হয়, তাহাই ভগবানের দয়া। অনেকের জুতালাথি খাইয়াও হয় না। কাহারও সামান্য কটুবাক্যে হয়। কর্ম্মচারিগণের জীবনে সৌরজগতের উল্কাপাতের ন্যায় অহরহঃ ভগবানের দয়াসমূহ আবির্ভূত হইতেছে। কাহার উপর সেটা বর্ত্তে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু একাগ্রচিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে একটা না একটা ধারণা করা যায়। ইহা বিভূতিলাভের ন্যায়। সুতরাং কর্ম্মের একাগ্রতাই ধ্যানের অবস্থা। যাহা করিতেছ, করিয়া যাও। ভগবানকে কল্পনা করিয়া আসরে আনিও না।

৫

ধারণা ও সমাধি।

মুক্ত পুরুষের বক্তৃতার সারভাগ গ্রহণ করিয়া অনেকটা ধারণা লাভ করা গেল। ধারণা প্রত্যাহারেরই কসরৎ, পরিপক্কভাবে অভ্যাসে পরিণত ধারণাই জ্ঞানের মূল। কর্ম্মের চরম। যখন বুঝা গেল, এটা এই, তখনই ধারণা। বাস্তবিক লোকটা বুঝিয়াছে কি না, তাহা তাহার কথায় বুঝা যায় না। কারণ, অনেকে না বুঝিয়াও অনর্গল বুঝাইতে পারে, যেমন টীকাকারগণ। যাহার ধারণা হইয়াছে, তাহার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যেমন :—

১। বাক্‌শক্তিবিহীনতা—অর্থাৎ কথা কহিবার শক্তি নাই। যাহা কহে, তাহা শুনিলে সকলেই চটিয়া যায়। পুত্র, কলত্র, পরিবার, আত্মীয়-স্বজনাদি, বন্ধু বান্ধব, সকলেই চটে। কারণ, সত্য কথা কেহই ভালবাসে না।

২। উত্তমস্ফূর্ত্তিবিহীনতা। কোনও জিনিসে মন নাই, উৎসাহ নাই, হাসি নাই, দুঃখ শোক নাই, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার ভাব নাই, সত্ত্ব, রজ ও তম নাই। আয়তন অচল, আহার নিদ্রা নাই।

৩। বিবর্ণ মুখশ্রী, পক্ব (কিংবা মুণ্ডিত) কেশাদি, নস্য, তামাকু কিংবা সংবাদপত্র-প্রিয়তা—বেকুফের ন্যায় স্থির দৃষ্টি।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে। জ্ঞানমন্দিরের দ্বারস্থ হইলে সংসারের সকল কথাই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না।

এই সময় সমাধির। পূর্ব্বকালে পেন্সনের সময় হইলেই রাজকর্ম্মচারিগণের নিমিত্ত ccffin সংগৃহীত হইত। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, এখন

নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বে একটা আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার নাম 'retirement', অর্থাৎ পেন্সনযুক্ত বানপ্রস্থ। পূর্ব্বে বানপ্রস্থে পেন্সন ছিল না; এখন একটা করিয়া Life certificate দিলেই মাসে মাসে পূর্ব্ব বেতনের অর্দ্ধেক মরণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাশী, হরিদ্বার, কাঞ্চী, দেওঘর, মধুপুর, গিরিডি প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান বানপ্রস্থোপযোগী। এ হেন বানপ্রস্থ সপরিবারে অবলম্বন-যোগ্য। ইহার বিশেষ লক্ষণ এই যে, মধ্যে মধ্যে সমাধিগ্রস্ত হইলে ঔষধাদি সংগ্রহ করা যায়। স্ত্রীলোকবর্গ চীৎকার করিতে পারে। বন্ধুবর্গ আসিয়া মরণের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে। যথা :—

১। 'লোকটা কিসে মলো হা?'

২। 'পৃষ্ঠব্রণ।'

৩। (স্ত্রীলোকগণের চীৎকার।)

৪। বিষয় আশয় কি?

৫। প্রায় ৩০০০৲ টাকা ঋণ।

৬। (স্ত্রীলোকগণের চীৎকার। সকলের সহানুভূতি—ধূমপান—ও প্রস্থান—পথে হাস্য ও নিন্দাবাদ।)

অবশ্য, এরূপ দুর্দ্দশা-নিবারণের পথ আছে, এবং তাহা কেবল জ্ঞানচর্চ্চা। জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞান বিতরণ না করা একটা মহাপাপ। অতএব আমাদিগের কথিত মুক্ত-পুরুষের মতে সকল রাজকর্ম্মচারিগণেরই বানপ্রস্থে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত; অন্ততঃ বহি লেখা উচিত। ভাল বহি লিখিতে পারিলে দু' পয়সা লাভ হয়। অভাবে এণ্ট্রেন্স-পরীক্ষার Key লিখিলেও হানি নাই।

অন্য উপায়,—গীতার সটীক নূতন সংস্করণ, কিংবা উপনিষদের তরজমা, বেদ হইলে আরও ভাল (দাম ৷৹ আনা মাত্র)। অনর্থক বৃদ্ধবয়সে পরনিন্দা ও সর্ব্বনাশজপাদি না করিয়া দুই একখানা পুঁথি লিখিলে অনেকে ব্যাস ও বাল্মীকির দশা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অবশেষে মুক্ত-পুরুষ কহিলেন যে, চাকুরীই মুক্তির সোজা পথ; কারণ, ইহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়মার্গীয়। কথাটা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হইল।

প্রাচ্য বিদ্যা।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের ১৯০৮—৯ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বিলম্বে প্রকাশিত হইলেও, ইহাতে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় একত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথমাংশে কোণারকের কৃষ্ণ মন্দিরের (Black Pagoda) রক্ষণ সম্বন্ধে ডাক্তার ফোগেল (Dr. Vogal) ১৯০৮—৯ সালের "পূর্ব্ব কেন্দ্রের পুরাতত্ত্ববিবরণী" হইতে মৃত ডাক্তার ব্লকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডাক্তার ব্লক্ লিখিয়া গিয়াছেন :—

The main problem, which we have to face at present...is the preservation of the spire. This part of the temple has now been completely cleared of debris,...and it now becomes evident that the spire of the temple never was completed, probably on account of the death of the king who built the Black Pagoda, Narasimha I, 1240-1280 A. D."

কয়েকটি খণ্ডিত মূর্ত্তির রক্ষণ সম্বন্ধে ডাক্তার ফোগেল বলেন যে, এই সকল মূর্ত্তি জগন্নাথের হইলেও, ইহাদিগকে শিবলিঙ্গ ও দুর্গা মূর্ত্তির সমন্বয় বলা যাইতে পারে। এই উভয় মূর্ত্তির সহিত প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং তাঁহার স্বমতসমর্থনার্থ ডাক্তার ব্লকের গবেষণাপূর্ণ "পূর্ব্ব কেন্দ্রের সাংবৎসরিক পুরাতত্ত্ববিবরণী" হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি স্বপ্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত করিয়াছেন : –

The cult of Jagannatha at Puri was not, as it is at present associated with the religion of the Vaishnavas, but with that of the Saivas ..We gather from this interesting fact, that one of the most popu'ar religions in India has been subject to a very important change, even as late as the 14th or 15th century A. D.

ইষ্টকনির্ম্মিত স্থপতি-কার্য্যের দুইটি শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন, এবং ইহা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক ; দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যসমূহ খৃঃ ৮ম ও ১২শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালে সম্পাদিত। লিপিতত্ত্বের দিক হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যের কালনির্ণয়ের একটা সুবিধা ঘটিয়াছে ; সাতোম গ্রামের একটি ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে একটি উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট দ্বারফলক (door lintel) আবিষ্কৃত

হইয়াছে। ফলকটি দ্বিধা ভগ্ন, এবং তদুপরি একটি অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীর লেখ বর্ত্তমান :—

ওঁ জয়াদিত্যপুত্র দুর্গাদিত্যস্য কীর্ত্তিঃ।

এই লিপিটির শেষে একটি চক্র-চিহ্ন ক্ষোদিত আছে।

শ্রীযুত স্পুনার তাঁহার কনিষ্ক-স্তূপের উৎখনন ও আবিষ্ক্রিয়ার একটি সচিত্র বিবরণ প্রদান করিয়া সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আচার্য্য ফুশের "সুদূর প্রাচ্যের ফরাসী বিদ্যামন্দিরের পত্রিকা"য় ঐতিহাসিক কনিষ্কচৈত্যের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক সেই স্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্ক্রিয়া সাময়িক পত্রিকায়, বিশেষতঃ ষ্টেটস্‌ম্যানে, বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। কনিষ্কচৈত্যোৎখাত ধাতুপাত্র-নিহিত শরীরনিধানটি স্ফটিকনির্ম্মিত। ধাতুপাত্রের অংশবিশেষে বিশ্লেষণের ফলে এই ধাতুপাত্রের উপাদান পিত্তল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত ধাতুপাত্রের আচ্ছাদনীর উপর কেন্দ্রস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তির দক্ষিণে দণ্ডায়মান বোধি-সত্ত্বের পশ্চাতে নিম্নলিখিত খরোষ্টী লিপিটি উৎকীর্ণ আছে :—

"অচঁধন [ঃ] সর্ব্বস্তিবদিন [ঃ] প্রতিগ্রহে":

দ্বিতীয় পংক্তিটি যদিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কনিষ্কের নাম সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিদ্বয় ধাতুপাত্রের গাত্রে উদ্ভিন্ন মূর্ত্তিগুলির উপরে ও নিম্নে উৎকীর্ণ আছে। উপরের পংক্তিটি এইরূপ :—

'দেয়ধর্ম্মো সর্ব্বসত্বন [ঃ] হিদসহর্ঠ [ঃ] ভবতু।'

উক্ত পংক্তির র্ম্মো এবং ত্ব (বা ত্ত) বুলার-প্রদত্ত সারণীর উক্ত অক্ষরদ্বয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নিম্নের পংক্তিটি এইরূপ :—

"দস অগিশল নবকর্মি কনষ্কস বিহারে মহাসেনস সংঘরমে।"

নবকর্মিক শব্দ তক্ষশীলার পতিক পত্রে নবকর্মিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা মনিক্যাল লেখমালায় নবকর্মিয় রূপ ধারণ করিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্ক্রিয়া গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বেসনগরের গরুড়ধ্বজ-গাত্রস্থিত লেখমালা। কনিংহাম্ (১) প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থানীয় জনসাধারণের উপাস্য এই স্তম্ভগাত্রের সিন্দূরালেপন হইতে উক্ত লিপির উদ্ধারসাধনে সক্ষম হন নাই। ডাক্তার ফোগেল বহু আয়াসে এই লেখমালার

(১) A. S. R. Vol. X, p. 41, pl. 14.

অনুলিপি গ্রহণ করিয়া ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও প্রাচ্যবিদ্‌গণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমরা এখানে এই স্তম্ভানুশাসন সম্বন্ধে শ্রীযুত মার্শালের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

A glance at the few letters exposed was all that was needed to show that the column was many centuries earlier than the Gupta era. This was indeed a surprise to me, but a far greater one was in store when the opening lines of the inscription came to be read. The memorial they state, was a Garudadhvaja set up in honour to Vasudeva by Heliodoros, the son of Dion, a Bhagavata, who came from Taxila in the reign of the great King Antialkidas."

আন্তিয়ালকিদাস্ এক জন ইন্দোবক্ত্রিয় নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাবুল উপত্যকা হইতে পঞ্জাব অবধি বিস্তৃত ছিল। বক্ত্রিয় রাজ্যের শেষপাদে যে সকল নরপালগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইনিই গ্রীক প্রথানুযায়ী মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক গার্ডনার ইঁহাকে হেলিওক্লিসের সমসাময়িক অথবা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আলোচ্য অনুশাসনে কাশীপুত ভাগভদ্র নামে কোনও ভারতীয় নরপালের উল্লেখ আছে, এবং আধুনিক বেসনগর তাঁহারই অধিকারভুক্ত ছিল। শ্রীযুত স্মিথ উক্তনামধারী শুঙ্গবংশীয় নরপতির তারিখ খৃঃ পূঃ প্রায় ১০৮ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলেই ইহা আন্তিআল্‌কিদাসের প্রায় সমসাময়িক হইয়া পড়ে। "কাশীপুত" সম্বন্ধে ফোগেল্ বলেন যে, এই নরপতি কাশীরাজকন্যার পুত্র। ডাক্তার ফ্লীট কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া এই অনুশাসনটি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

(ক)

১। দেবদেবস বা [সুদে] বস গরুড়ধ্বজে অয়ং
২। কারিতে...হেলিওদোরেণ ভাগ-
৩। বতেন দিয়সপুত্রেণ তখসিলাকেন
৪। যোনদূতেন আগতেন মহারাজস
৫। অংতলিকিতস উপ [ং] তা সকাস [ং] রঞো
৬। কাশীপুতস ভাগভদ্রস ত্রাতারস
৭। বসেন চতুদসেন রাজেন বধমানস

(খ)

১। ত্রিনি অমুতপদানি...[স্থ] অনুঠিতানি

২। নয়ংতি স্বগং দমো চাগো অপ্রমাদ

ক অনুশাসনের—অনুবাদ :—

এই গরুড়ধ্বজ তক্ষশিলাবাসী দিওনপুত্র ভাগবত হেলিওদোরসের আজ্ঞানুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল ; [উক্ত হেলিওদোরস] মহারাজ আন্তিআলকিদাস কর্ত্তৃক কাশীপুত্র ত্রাতা ভাগভদ্রের নিকট তাঁহার প্রবর্দ্ধমান রাজত্বকালের চতুর্দ্দশ বর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

খ অনুশাসনের অনুবাদ :—

তিনটি অমৃতপদের অনুষ্ঠান স্বর্গে নীত করে [তাহা এই] দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ।

সাহেঠ মাহেঠে প্রাপ্ত একটি উপবিষ্ট বোধিসত্বমূর্ত্তির পাদপীঠে একটি উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ; ইহার ভাষা প্রাকৃত ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণ। আলোচ্য লেখের তারিখ উৎকীর্ণ নাই। কিন্তু ইহার সাধারণ লিখন-প্রণালীদৃষ্টে ইহাকে সারনাথে প্রাপ্ত বোধিসত্বার সহিত একই যুগে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু অক্ষরগুলি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আলোচ্য লেখটি প্রাচীনতর। ত্রিভাগে বিভক্ত "য়" কনিষ্কলেখমালার "য়" অপেক্ষা পুরাতন। বর্ত্তমান লিপির "য়"র উভয় দিক গোলাকার, কনিষ্কলেখমালার "য়" কোণযুক্ত। এই লিপির "শ" পরীক্ষা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার মধ্যের রেখাটি এখনও বক্রতা ত্যাগ করে নাই, এবং সোড়াস লেখমালার "শ"র অনুরূপ। ইহার স্বর-সংযোগ কুষানপূর্ব্ব লেখমালার ন্যায় সংসাধিত হইয়াছে। মথুরার নয়টি জৈন লেখমালার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। এই সকল যুক্তি দ্বারা বিচার পূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত দয়ারাম সাহনি আলোচ্য উৎকীর্ণ লিপিকে কনিষ্কপূর্ব্ব লিপির মধ্যে পরিগণনা করেন। লিপিটি এই :—

১। ... স্য শিবধরস্য চ ভ্রাতৃণা [ং] ক্ষত্রিয়না [ং] বেলিষ্টানং ধমনাংদ-পুত্রানং দানং শ্রাবাস্ত-জেতাবনে বোহিসত্বা মথুরা—[বা]

২। ...তা সর্ব্ব-বুদ্ধানং পুজথং মাতাপৃতী পুরস্কৃচ সবসত্বহিতথং চ [ে] দংতী সথর্বাচক্ষণা অসরাকা চ ভোগানাং

৩। জীবীতস চ সেরামিয়কুশলা ভুয়কুশলমচীনি ম [া] থুরেন শেল-রূপকারেন শিবমিত্রেন বোহীসত্বকৃতা।

অনুবাদ।

[একটি] বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রাবস্তী জেতবনে [প্রতিষ্ঠিত করা হইল ; ইহা] বিলিষ্টা [?] হইতে [আগত] শিবধর [ও তাহার] ক্ষত্রিয় ভ্রাতৃবর্গ ও মথুরা [নিবাসী] ধর্মানন্দের পুত্রগণের দান। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে ব্যুৎপন্ন [হইয়া] ভোগ ও জীবনের চঞ্চলতা [বুঝিতে পারিয়া], [তাহারা] সর্ব্বসত্ত্বার হিতার্থ, এবং মাতা পিতার [মঙ্গলকামনায়] ও ইহ-পর জগতের জন্য পুণ্যার্জ্জন হেতু, সর্ব বুদ্ধের পূজার্থ, [এই বোধিসত্ত্ব] দান করিল। এই বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি মথুরানিবাসী ভাস্কর শিবমিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

মৃত ডাক্তার ব্লকের গবেষণাপূর্ণ বোধিদ্রুমের ইতিহাস এই রত্নহারের একটি উজ্জ্বলতম মণি। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের ইতিহাস ভারতের প্রাচীন বৃক্ষপূজার যে একটা বিবর্ত্তিত অবস্থা, এ কথাটা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক ও মানবতাত্ত্বিক উভয় শ্রেণীর পাঠকের সমান শিক্ষাপ্রদ। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম যে অনেক প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। "দেবানাং পিয় পিয়দসি" অশোকের সময়ে এই মহাদ্রুমের বিনাশসাধনের প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল। যদিও জনশ্রুতি ও চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, ডাক্তার ব্লক অশোকের নবমানুশাসন হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, "অপফল"প্রদ অর্চনার তিনি বিরোধী থাকায়, বোধিদ্রুমের বিনাশ তাঁহার আজ্ঞানুক্রমে সংসাধিত হইয়াছিল। বোধিবৃক্ষের বিনাশসাধনের দ্বিতীয় প্রয়াস উআং চোআং-এর ভারতাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ধার্ম্মিক পরিব্রাজক তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে লিখিয়াছেন (Watters, II. 115) :—

"আধুনিক কালে বৌদ্ধশত্রু ও অত্যাচারী শশাঙ্ক বোধিদ্রুম কর্ত্তন করিয়াছে, উহার মূল বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, এবং অবশিষ্টাংশ অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে। কয়েক মাস পরে মগধপতি পূর্ণবর্মন্ ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। উআং চোআং বুদ্ধগয়ায় সম্ভবতঃ ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন। গুপ্ত সংবৎ ৩০০ অর্থাৎ খৃঃ ৬১৯—৬২০ কর্ণসুবর্ণরাজ মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক-রাজের তারিখ। পূর্ণবর্ম্মণের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নাই ; এবং এই পরিব্রাজককাহিনীর অবস্থাগত সাক্ষ্য ব্যতীত তাঁহার বৌদ্ধত্বের আর কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাক্তার ব্লক বলেন, বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ব হইতে ন্যগ্রোধ-পূজা চলিয়া আসিতেছে, এবং

বৌদ্ধগণ জনসাধারণের উপাস্য অশ্বত্থবৃক্ষকেই তাঁহাদিগের ধর্ম্মের নিদর্শন-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সহিত এই বৃক্ষ যে কোনও ঐতিহাসিক ভাবে সম্বদ্ধ, তাহা বিশ্বাস করিতে ডাক্তার ব্লক একান্ত অনিচ্ছুক। উরুবেলার সেনাপতি-বনিতা সুজাতা সম্বন্ধে নিদানকথায় যে আখ্যায়িকা নিবদ্ধ আছে, তাহাতে এই ন্যগ্রোধাধিষ্ঠিত বৃক্ষদেবতায় বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। হথিপাল জাতকে "নিগ্রোধে অধিবত্থ দেবতা"র কথা আছে।

পরে বুদ্ধগয়ায় শৈব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত উৎকীর্ণ লিপিই তহার যথেষ্ট প্রমাণ :—

১। ওঁ [॥ *] ধর্ম্মেশ্বায়তনে রম্যে উজ্জ্বলস্য শিলাভিদঃ ॥ (।)

২। কেশবাখ্যেন পুত্রেণ মহাদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ (১) শ্রেষ্ঠ

৩। যে * * * * মহা [বো] ধিনিবাসিনং ॥ (।)
স্নাতকা

৪। [নাং] প্রজায়াস্ত শ্রেয়সে প্রতিষ্ঠাপিতঃ ॥ (২) পুষ্করি

৫। ণ্যত্যগাঢ়া চ পূতা বিষ্ণুপদীসমা ॥ (।) ত্রিতয়ে

৬। ন সহস্রেন দ্রম্মাণাং খানিতা সতাং ॥ (৩)

৭। ষড় বিংশতিতমে বর্ষে ধর্ম্মপালে মহীভুজি ॥ (।

৮। ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং সূনোর্ভাস্করস্যাহনি ॥ ওঁ [॥ *]

বুদ্ধগয়ার একটি পুরাতন বেষ্টনীর অবক্ষেপ প্রস্তরখণ্ডে (on the coping Stone of an ancient railing) নিম্নে প্রদত্ত লেখটি বর্ত্তমান আছে। কনিংহাম ইহা আংশিক ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। লিখনপ্রণালী দৃষ্টে ডাক্তার ব্লক ইহার তারিখ ষষ্ঠ বা সপ্তম খৃষ্টাব্দ অনুমান করেন। ইহার প্রান্তের অনেকটা লেখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১। * * * * কারিতো যত্রা বজ্রাসনবৃহদ্‌গন্ধকুটি। প্রসাদমর্দ্ধত্রিকৈর্দ্দি-নারশতৈস্ সুধালেপ্য পুনর্ন্নবীকরণেন সংস্করিতং। অত্রৈব চ প্রত্যহমাচন্দ্রা-তারকং ভগবতে বুদ্ধায় গোশতদানেন ঘৃতপ্রদীপঃ আকারিতঃ। প্রাসাদে খণ্ডস্ফটিতপ্রতিসমারাধনে তৎপ্রতিমায়াং চ প্রত্যহং ঘৃতপ্রদীপো গোশতেনা-ক্ষয়েণ কারিতঃ। বিহারে পি ভগবতো চৈত্যবুদ্ধপ্রতিমা [য়ং গো শতেনা-ক্ষয়েণ ঘৃতপ্রদীপঃ * * * *]

২। [ঘৃত] প্রদীপাক্ষয়নীবিনি [ব] ন্[ধ]ঃ বিহারোপয়ো [গায়]

কারিতস্তত্রাপি * * * * ভিক্ষুসংঘস্য আর্যস্য [উ] পয়োগায় মহাম্ভমাধারং খানিতং, তদনুপূর্বং চাপ্রহতকক্ষেত্রমুৎপাদিতম্। তদেতৎসর্ব্বং যন্ময়া-পুণ্যোপচিতসম্ভারং তন্মাতাপিত্রোঃ প [, র্ব্বং গমং কৃত্বা] * * * *

অনুবাদ।

১। * * * * বজ্রাসনের বৃহদ্‌গন্ধকুটী যথায় আছে [তথায়] সম্পাদিত হইল। সুধালেপন ও পুনর্ন্নবীকরণ [ইত্যাদিরূপ] মন্দিরের সংস্কারকার্য্যে ২৫০ দিনার ব্যয়িত হইল। এবং শত গোদানে ভগবান্ বুদ্ধের জন্য অত্র (অর্থাৎ মন্দিরাভ্যন্তরে) যতদিন [আকাশে] চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাগণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ঘৃতপ্রদীপ-প্রজ্বালনের [নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত] হইল। এবং মন্দিরের সামান্য সংস্কারাদির ব্যয় ব্যতীত প্রত্যহ প্রতিমা-সম্মুখে [অপর] ঘৃতপ্রদীপ-প্রজ্বালনের জন্য আরও এক শত গো দান করা হইল। [অপর এক শত গোদানে] বিহারাভ্যন্তরস্থ ভগবান্ বুদ্ধের পিত্তল-মূর্ত্তির সম্মুখে ঘৃতপ্রদীপ-প্রজ্বালনের নিয়ম সংস্থাপিত হইল।

২। * * * * বিহারের মঙ্গলকল্পে [ঘৃত] প্রদীপ চিরকাল প্রজ্বলনের নিয়ম সংস্থাপিত হইল। তথায় আরও * * * আর্য্যভিক্ষু সংঘের ব্যবহার হেতু একটি সুবৃহৎ জলাশয় উৎখাত হইল, এবং তদনুপূর্ব্বে একটি অভিনব ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইল। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা কিছু পুণ্য মৎকর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইল, তাহা আমার পিতা মাতার মঙ্গলের জন্য হউক [প্রথমে * * * *]

"গন্ধকুট" বুদ্ধের বাসগৃহ, এখানে বুদ্ধমূর্ত্তিপরিশোভিত মন্দির অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৫০ দিনার, বোধ হয় সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তমুদ্রা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্য উৎকীর্ণ লিপিটি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শতাব্দীতে সম্পাদিত হইয়াছিল। এবং উদ্ধৃত লেখোক্ত বিহার বোধিদ্রুম-মণ্ডপের উত্তর দ্বারের বহির্ভাগস্থ "মহাবোধি সংঘারাম।"

খৃঃ ২য় শতাব্দীতে তাম্রপর্নি [লঙ্কা দ্বীপ] হইতে আগত পরিব্রাজক বোধি রক্ষিতের নিম্নোদ্ধৃত লিপিটি বুদ্ধগয়া মন্দিরের পরিবেষ্টনীর প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয় :—

বোধিরখিতস ত [ং] বপ [ং] নকস দনং, অর্থাৎ তাম্রপর্ণী-নিবাসী বোধি রক্ষিতের দান।

ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের লিপি পুরাতন পরিবেষ্টনীর একখণ্ড প্র

অবক্ষেপ প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত আছে। ইহা সিংহল-রাজবংশোদ্ভব পরিব্রাজক ভিক্ষু প্রখ্যাতকীর্ত্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

তৃতীয় লিপিটি খৃঃ নবম অথবা দশম শতাব্দীতে ক্ষোদিত হইয়াছিল। ইহাও এক জন সিংহল পরিব্রাজকের কীর্ত্তি :—

১। কারিতো ভগবানেষ সিংহলেনোদয়শ্রিয়া। দুঃখাম্বোনিধিনির্মগ্ন জগদুদ্ধর-

২। ণেচ্ছয়া।

বঙ্গদেশ হইতে আগত এক জন ১০ম শতাব্দীর পরিব্রাজক কর্ত্তৃক একটি মানবাকারের বুদ্ধমূর্ত্তির দক্ষিণ স্কন্ধের নিকট নিম্নপ্রদত্ত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল :—

১। ওঁ অনেন শুভমার্গেন প্রবিষ্টো লোকনায়কঃ [।]

২। অতশ্চ বোধিমার্গোয়ং

৩। মোক্ষ-মার্গপ্রকাশকঃ॥

পাদপীঠে ক্ষোদিত আছে :—

১। শ্রীসামতটিকঃ প্রবরম

২। হাযানযায়িনঃ শ্রীমৎসোমপুর মহা-

৩। বিহারীয়বিনয়বিৎস্থবির-বীর্য্যেন্দ্রস্য [।]

৪। যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপা—

৫। [ধ্যায়]-মাতাপিতৃ-পূর্ব্বঙ্গমঃ কৃত্বা সকল-

৬ [সত্ত্বরাশে] রনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয় ইতি।

তৎপরে ডাক্তার ফোগেলের "প্রাচীন-মথুরায় নাগপূজা" নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধকার নাগ-পূজার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, এবং সপ্রমাণ করিয়াছেন যে হুবিষ্ক-বিহারের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই দধিকর্ণ নাগের পূজা প্রচলিত ছিল। ছড়গাঁও-এ প্রাপ্ত একটি কুষাণ-যুগের নাগমূর্ত্তির পশ্চাতে ক্ষোদিত লেখ হইতে হুবিষ্কের সময় নাগ-পূজার প্রচলন সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীযুত ফোগেল উহার নিম্নোদ্ধৃত পাঠ প্রদান করেন :—

১। মহরজস্য রজাতিরাজস্য হুবিস্কস্য সবৎসর চত [্] রিশ ৪০

২। হেমন্তমসে ২ দিবসে ২৩ এত্ত পুর্বায়্যা

৩। সেন হস্তি [চ [পিণ্ডপয্য পুত্রো ভোণুকে চ

৪। বিরবুদ্ধিপুত্রো এন্তি বয্যস্সো উভযো

৫। নাগ [ং] প্রতিস্তাপ [এ] ত্তি পুষ্করণীয্যা

৬। স্বকয্যা প্রিযাতি ভগবা নাগো।

অনুবাদ।

"রাজাধিরাজ হুবিষ্কের চত্বারিংশ বর্ষে দ্বিতীয় হেমন্ত মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে পিণ্ডপয্য পুত্র সেনহস্তী ও বীরবুদ্ধি-পুত্র ভোণুক—এই দুই জন বয়স্য কর্তৃক তাহাদের এই পুষ্করিণীতীরে এই নাগমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইল। ভগবান্ নাগ প্রসন্ন হউন।"

শ্রীপুরাপ্রিয়।

প্রাচী-ভ্রমণ

জাহাজ হইতে তীরে পঁহুছিয়া দিবার মজুরী ১০।২৫ সেণ্টই যথেষ্ট ; বিদেশীর কাছে সাম্পানের মাঝি ১০ ডলার চাহিয়া থাকে। আমাকে নৌকার বা গাড়ীর জন্য কোনও প্রকার উদ্বেগ পাইতে হয় নাই। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আমি 'জনসন পায়ারে' উপস্থিত হই। এ স্থান হইতে আমার থাকিবার স্থান বেশী দূর নহে ; ৫।৭ মিনিটের রাস্তা মাত্র। আমার মাড়োয়ারী বন্ধুরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তঞ্জাম পগার বন্দরে যিনি প্রাতঃকাল হইতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল। আমিও স্নানাদি মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। আমার বাসার নিকটেই জাহাজের আফিস। আফিসে শুনিলাম, কাল একখানা জাহাজ যাভার দিকে যাইবে। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেও বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কতিপয় দিবস সিঙ্গাপুরে থাকিতে বাধ্য হইলাম। এই অবসরে সিঙ্গাপুরের দ্রষ্টব্য সকল দেখিয়া লইলাম।

সিঙ্গাপুর বিষুব রেখার সন্নিহিত হওয়াতে এ স্থানে রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক ; সর্ব্বদা প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

এখানকার পাদ-পথ (foot path) উত্তাপ ও বৃষ্টি হইতে পথিককে রক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তার ধারে প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখের বারাণ্ডাই এখানকার

পাদ-পথ ; এ জন্য পথিকেরা বৃষ্টি ও উত্তাপে ক্লিষ্ট হয় না। কেবল এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় যাইবার সময় জল বা রৌদ্র গায়ে লাগে।

এখানকার অধিবাসীর অর্দ্ধেকের উপর চীনদেশীয়। চীনে না হইলে এক দণ্ড এখানকার কাজ চলে না। বাগানের কুলী মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া আফিস আদালতের কেরাণী পর্য্যন্ত সব চীনে। সর্ব্বত্রই চীনের সংখ্যা বেশী। পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেকপরিমাণ টিন বা বঙ্গ এই দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। প্রচুরপরিমাণ রবারও এ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এই সকল কার্য্যে চীনে শ্রমজীবীদের সংখ্যাই বেশী।

উত্তরভারতের সকল অধিবাসী, সে বাঙ্গলার বাঙ্গালী হউক, অথবা পেশোয়ারের পাঠানই হউক, সকলেই এ দেশে বাঙ্গালী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উত্তর-ভারতের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর দুরাচারের জন্য অনেক সময় বাঙ্গলার নামের উপর কলঙ্ককালিমা পতিত হইয়া থাকে। একেই বলে অদৃষ্ট। এক সময় এক জন মালয় ভদ্রলোক আমাদের দেশের লোকের চরিত্রহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে আমি বলি, যাহাদিগকে আপনারা বাঙ্গালী বলেন, তাহাদিগের মধ্যে যথার্থ বাঙ্গালী মোটেই নাই—তাহারা বাঙ্গালার বন্দর হইতে আগমন করে, এইমাত্র। বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে আপনাদের যে ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহা তাহারা অদৃষ্টক্রমে ভোগ করিয়া থাকে।

পঞ্জাবীরা পুলিস, ট্রাম ও বণিকদের দোকানে দ্বারবানের কার্য্য করিয়া থাকে। বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী পুলিসও দুগ্ধের ব্যবসায় করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিয়া থাকে। সিন্ধুদেশীয় বণিকগণ হাই ষ্ট্রীটে বড় বড় মনোহারী দোকান খুলিয়া ইংরাজ দোকানদারদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব করিবার এখানে কিছুই নাই। এখানকার আদালতে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। সিঙ্গাপুর এ অঞ্চলের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান। শ্যাম, কোচিন, সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও, সিলিবিস প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। চীনবাসী প্রভৃতি তাহার ফলে প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইতেছে। উদ্যম করিলে বঙ্গীয় যুবকগণও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন। একবার চটকা ভাঙ্গিলে, একবার ভারতের বাহিরে গেলে, তখন আর অন্ধকার তাহাদিগকে বিভীষিকাগ্রস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।

সিঙ্গাপুরে বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান বড় কিছু নাই। চীনে পল্লী, চীনে দেবায়তন

প্রভৃতি দেখিয়া অবকাশের সময় অতিবাহিত করিতাম। আমাদের কলিকাতার মিউজিয়মের সহিত এ স্থানের ক্ষুদ্র মিউজিয়মের, তুলনা হয় না। যাদুঘরে সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুস্তকালয় থাকাতে সাধারণের ইহা বেশ উপযোগী হইয়াছে। অবকাশ পাইলেই আমি সেখানে গমন করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতাম।

যাভা অঞ্চলে জাহাজ যাইবার বিলম্ব থাকায় প্রথমে শ্যামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। শ্যামে যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একখানি ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে হইল। এখানকার আফিসে অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, দুই প্রকার ছাড়পত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। একখানিতে দুইখানি ফটোর প্রয়োজন হইয়া থাকে। একখানি আফিসে থাকে; অপরখানি গৃহীতার ছাড়-পত্রে মারা থাকে। এ জন্য ইহাতে কিছু অর্থ ও সময় ব্যয় করিতে হয়। অপরখানিতে গৃহীতার নাম ধাম প্রভৃতি লিখিত থাকে। ইহা সংগ্রহ করিতে বেশী বিলম্ব হয় না, এবং ইহাতে অর্থব্যয়ও কিছুমাত্র নাই। আমি শেষোক্ত প্রকারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েক জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর কাছে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের ভদ্রতা এবং বিদেশীকে সাহায্য করিবার ঐকান্তিকী ইচ্ছা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সিংহলী হিন্দুকর্ম্মচারী মহাশয়ও আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; এ জন্য তাঁহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র, ইহা বলাই বাহুল্য।

যে জাহাজে শ্যামে গমন করিয়াছিলাম, তাহা জর্ম্মাণ কোম্পানীর জাহাজ। নাম "চাংমাই"। চাংমাই শ্যামের একটা জনপদের নাম। সোমবার বেলা ৩টার সময় আমি জাহাজে উপস্থিত হইলাম। ৪॥০ টার সময় জাহাজ তঞ্জাম পগার ডক পরিত্যাগ করিল। যাঁহারা আমাকে জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাশ্মীরী পণ্ডিত, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী ও মাড়ওয়ারী ভদ্রলোক ছিলেন। শেষোক্ত ব্যতীত আর সকলের সহিত সিঙ্গাপুরে পরিচয় হইয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা আমাকে নিজের দলের এক জন করিয়া লইয়াছিলেন। বিদায়কালে তাঁহাদের সহৃদয়তা তাঁহাদের সজল নেত্রে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের ব্যবহারে আমার হৃদয়ও ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়াছিল।

সিঙ্গাপুর হইতে বাস্তবিক পক্ষে আমার বিদেশ-ভ্রমণের প্রারম্ভ হইল। সিঙ্গাপুরে থাকা আর বাড়ীতে থাকা উভয়ই আমার কাছে তুল্য-

মূল্য হইয়াছিল। জাহাজে সোমবার রাত্রি বেশ সুখেই কাটাইলাম। মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতে আমার সামুদ্রিক পীড়া আরম্ভ হইল। মঙ্গল, বুধ, শয়ন করিয়াই অতিবাহিত করিলাম। এর মধ্যে একদিন একটু লেবুর রস খাইয়াছিলাম। বিন্দুমাত্রও পেটে না থাকিয়া সমস্ত বাহির হইয়া গেল। আমার সহৃদয় মাড়ওয়ারী বন্ধু শেঠমলজী নানাপ্রকার ফল-মূল, লাড্ডু, নিমকী প্রভৃতি আমার জন্য দিয়াছিলেন; সে সকল দ্রব্য আমার চতুষ্পার্শ্বে সাজান থাকিলেও তাহার কিছুই উপভোগ করিতে সমর্থ হইলাম না। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মনে করিলাম, সকলেই খাইতেছে, বেড়াইতেছে; আমি কেন না খাইয়া পড়িয়া থাকিব? সঙ্গে মুগের ডাল ছিল; তাহা ভিজাইতে দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে গোলমরীচ, আদা ও নুনের সহিত কিছু খাইলাম। বেশ লাগিল। শুক্রবার হইতে শরীরের গ্লানি কাটিয়া গেল; বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম।

আজ শ্যামের রাজধানী ব্যাংককে জাহাজ পঁহুছিবার কথা ছিল, তাহা হইল না। সুতরাং আর এক রাত্রি জাহাজে অবস্থান করিতে হইবে। আজ অপরাহ্নে এক পসলা অল্প অল্প বৃষ্টি হইল, ইহার ফলে এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব হইল। ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা, আকৃতির সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতা অতুলনীয়। দুই দিক সমুদ্রের নীল জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকাতে, বহুবার এই অভিনব ধনু দেখিলেও হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। আমাদের জাহাজ রজনীমুখে শ্যামের পবিত্র নদী মেনমের মুখে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। অদূরে আলোকস্তম্ভের ও কয়েকখানি অর্ণব-যানের আলোকমালায় এ প্রদেশ উজ্জ্বলীকৃত হইল। মৃদু-মন্দ-প্রবাহিত সামুদ্রিক সমীরণ আমাদের শারীরিক সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এক অভিনব শক্তি প্রদান করিয়া আমাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। এই মেনম নদীর মুখে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যেন স্বীয় স্নিগ্ধক্রোড়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শেষরাত্রে একটা দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইল; বোধ হইল, যেন নিকটবর্ত্তী জলাভূমি হইতে গাছপালা-পচা গন্ধ আসিতেছে। গন্ধ তীব্র হওয়াতে নাকে ঢাকা দিতে হইল।

প্রাতঃকালে আমাদের জাহাজ ব্যাংকক-গমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক দল গাংচিল জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। জাহাজের গমনজনিত হিল্লোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ভাসিয়া উঠায় তাহাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অল্পদূর যাইতে না যাইতে নদীর প্রশস্ত মুখ খুব সংকীর্ণ হইয়া আসিল। এত শীঘ্র যে পরিসর কমিয়া যাইবে, তাহা ভাবি নাই। আমাদের গঙ্গার সহিত ইহার কোনরূপ তুলনা হয় না। নদীর দুই ধারে সমৃদ্ধিজ্ঞাপক ব্যবসায়গৃহ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে নদীর মধ্যে একটি দ্বীপে একটি বৃহৎ বুদ্ধমন্দির দেখিতে পাওয়া গেল। নবীন রাজার অভিষেক উৎসব উপলক্ষে এ স্থান সুশোভিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গেল। এই স্থানটির নাম পাকনাম। শ্যামরাজ্যকে অনেকে "মন্দিরের রাজ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। ইহার সর্ব্বত্র মন্দিরের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে শ্যামবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য। এখানকার দৃশ্য আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের অনুরূপ। আমাদের দেশের কোনও স্থানে গমন করিতেছি, এইরূপ যেন বোধ হইতে লাগিল। কোথাও বা নদীর তটে বৃক্ষ সকল জলের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা নারিকেল তাল প্রভৃতি পরিচিত বৃক্ষ সকল আমাদের স্বদেশের দৃশ্য অনুকরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। নদীর ধারে, জলের উপরে, স্থানে স্থানে হাট বাজার ও দোকান সকল সজ্জিত রহিয়াছে। শ্যামবাসীরা পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ নৌকা লইয়া নদী পারাপার করিতেছে। এইরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় ১৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ৯টার সময় আমরা শ্যামের রাজধানী ব্যাংককে উপস্থিত হইলাম। কষ্টমের কর্ত্তা উপস্থিত না হওয়াতে আমাদিগকে এক ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আসার বিলম্ব দেখিয়া ছোট কর্ম্মচারী আমার মালপত্র দেখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমার কাছে মাশুল দিবার কিছুই ছিল না, সুতরাং উদ্বেগের কারণও কিছুই ছিল না।

এক জন চীনে ভদ্রলোকের সহিত জাহাজে পরিচয় হয়। আমি তাঁহার সহিত তীরে যাইব, স্থির করিলাম। এক জন সিংহলী ভদ্রলোক তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিকে লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি না আসাতে, সিংহলী ভদ্রলোকটি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। এই ভদ্রলোকটির আগমন

যেন ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া আমার বোধ হইল। আমাদের নৌকা একটা খালের ভিতর দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রিটিশ লিগেসনের ধার দিয়া একটা বড় রাস্তার ধারে গিয়া লাগাইল।

এখন আমি কোথায় যাই? একটা বড় সহরে আসিয়াছি। না জানি এ দেশের আচার ব্যবহার, না জানি এ দেশের ভাষা, না আছে কেহ পরিচিত লোক। এখন যাই কোথায়? এরূপ ভাবনা আসা স্বতঃসিদ্ধ। আমিও এ ভাবনা হইতে বঞ্চিত হই নাই! কিন্তু আমি তাহাতে অণুমাত্র বিক্ষুব্ধ হই নাই। চীনে ভদ্রলোকটি তাঁহার বাসায় চলিয়া গেলেন। আমার অংশের নৌকাভাড়া তাঁহাকে দিতে গেলাম; তিনি লইলেন না, স্বয়ং সমস্ত প্রদান করিলেন। সিংহলী ভদ্রলোকটিকে আমার জন্য একখানি গাড়ীভাড়া করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আহ্লাদের সহিত আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গাড়ী আসিল, আমার জিনিসপত্র উঠান হইল। এখন চালক কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা জানিবার জন্য আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে এক জন শ্যামপ্রবাসীর সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে রাজকুমার সুমতের বাড়ীতে যাইবার পরামর্শ দেন। আমি সেই পরামর্শ স্মরণ করিয়া প্রিন্স সুমতের বাড়ী যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে আদেশ করিলাম। বলা বাহুল্য, সিংহলী ভদ্রলোকটি আমার কথা শ্যাম ভাষায় অনুবাদ করিয়া গাড়োয়ানকে বুঝাইয়া দিলেন। যথাসময়ে আমাদের গাড়ী বহুজনমুখরিত ব্যাংককের বহু রাস্তা অতিক্রম করিয়া প্রিন্স সুমতের ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। রাস্তায় আসিবার সময়, বড়লোকের বাড়ীতে কিরূপ ভাবে অভ্যর্থিত হইব, যদি সে স্থানে থাকিবার উপযুক্ত স্থান না পাই, তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করিব, সময় সময় এইরূপ চিন্তা আসিয়া আমাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এ সময় নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সমস্ত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম,—

প্রভু! তোমার চরণ শরণ লইয়া সিংহের হৃদয়ে সদাই ফিরি।
রাজা কি প্রজা ভাবি না কখন, মানুষ দেখিয়া কভু না ডরি॥

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রিন্সের বাড়ীর ভিতর অগ্রসর হইলাম। আমাকে বাড়ীর ভিতর আসিতে দেখিয়া এক দল (১০।১২ টার কম নহে) সারমেয়, সকলে তারস্বরে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে দ্রুতবেগে অগ্রসর

হইল। ভৈরব বাহনের অভ্যর্থনায় আসপাশের লোকেদের খাঁটী বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ও গোঁপদাড়ি-(শ্যামীদের ভিতর গোঁপদাড়িযুক্ত পুরুষ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।)-যুক্ত একটা অদ্ভুত লোকের উপর সকলের দৃষ্টি আপতিত হইল। যাহা চাহিতেছিলাম, তাহাই হইল। সিংহলী ভদ্রলোকটি এক বালক ভৃত্যকে আমার সমস্ত কথা কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ভ্রমণের পূর্ব্বে আমার জনৈক বন্ধু কতকগুলি দর্শনপত্র ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। আমি একখানি কার্ড বালকের মারফৎ গৃহস্বামীর নিকট প্রেরণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামী মহাশয় উপস্থিত হইলেন। আলাপ পরিচয় হইল। সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে তথাকার সংবাদপত্রসমূহে আমার উদ্দেশ্য ও শ্যাম দেশে যাইবার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রিন্স মহোদয় শ্যামের সংবাদপত্রে এ কথা অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমার অভীষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইল না। আমার জিনিস পত্র বাহিরে ছিল; তাহা ভিতরে আনিবার জন্য এক জন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলাম। সে সমস্ত দ্রব্য ভিতরে আনিল। এই সকল জিনিসের ভিতর একটা বোতলে গঙ্গাজল ছিল। এটা কি, জিজ্ঞাসিত হইলে আমি বলিলাম, গঙ্গাজল। গঙ্গাজলের নাম শুনিয়া প্রিন্স ভক্তিভাবে একটু চাহিলেন; আমি তাঁহাকে একটু গঙ্গাজল দিলাম। এই সময় একটি স্ত্রীলোক মোটর-যানে একটি বালককে ক্রোড়ে করিয়া আগমন করিলেন। তাঁহাকেও একটু গঙ্গাজল দিলাম। প্রিন্সের বয়স প্রায় [illegible] বৎসর। ইনি মৃত শ্যামাধিপতি চূড়ালঙ্করণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইউরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইংরেজী ও পালি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। দেখিলাম, হর্ষবর্দ্ধন শিল্প সাহিত্যের বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে। নানারূপ আলাপের পর রাজকুমার স্বয়ং (ইংরেজীতে ইঁহার নাম এইরূপ ভাবে লিখিত হয়, H. R. H. Prince Kroma Pitha Sommott.) আমার ভোজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমার সহিত চাউল, ডাল, ঘি প্রভৃতি সবই আছে, আমি স্বহস্তে পাক করিয়া খাইব। বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি ব্রাহ্মণদের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা দেখিলেন, এবং শুনিলেন। এ দেশে ঘৃতের প্রচলন নাই, ঘি দ্রব্যটা কি, তাহা তিনি দেখিয়া লইলেন। এইরূপ কথোপকথনের পর তিনি আমার থাকিবার জন্য তাঁহার ঠাকুরবাটীর মধ্যে একটি ঘর

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া আমার থাকিবার স্থানে গমন করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমার কক্ষটি পরিচ্ছন্ন করিয়া মাদুর পাতা হইল। পানীয় জলের জন্য প্রচুরপরিমাণ বৃষ্টির জল আনীত হইল। এক জন লোক আমার কাছে সর্ব্বদা থাকিবার জন্য নিযুক্ত হইল। ব্যাংককের সর্ব্বত্র খাল কাটান থাকায় নৌকাপথে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা আছে। আমার থাকিবার স্থানের পাশেই একটা খাল ছিল। আমি সেই খালে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, বহুসংখ্যক লোক আমাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছে। কেহ গঙ্গাজলপ্রার্থী, কেহ বা রোগ দূর করিবার জন্য আমার আশীর্ব্বাদপ্রার্থী। ইহাদিগের মধ্যে এক জন কুষ্ঠীও ছিল। আকার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে আমি বুঝাইয়া দিলাম, আমি এক জন সামান্য ব্যক্তি; তোমরা যে অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসিয়াছ, সে সব বিষয় আমার কাছে কিছুই নাই। প্রিন্স বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ভারতের পরম পূজনীয় জাতি। আমি সেই ব্রাহ্মণদিগের এক জন— দাস দাসীরা এ কথা সকলকে বলায় আমার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে; তাই লোকের এত ভিড়। এইরূপ জনতা দেখিয়া স্থানটা আমার বড় মনোমত হইতেছিল না। মনে করিতেছিলাম, গ্রামের যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিব। সম্ভবতঃ আমার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া প্রিন্সের কাছে আমার মনোভাব কেহ কহিয়া থাকিবে। কিয়ৎকাল পরে এক জন লোক আসিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ও ইঙ্গিতে আমাকে বুঝাইল, আমি প্রিন্স সুমতের পুত্র প্রিন্স চাউ মঙ্গল প্রভাতির অতিথি হইয়াছি, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

চক্ষুর ইঙ্গিতে আমার সমস্ত দ্রব্য প্রিন্সের ঘরে নীত হইল। আমিও এক জন লোকের সহিত সস্ত্রীক প্রিন্সের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম—তিনি আত্মীয়ের ন্যায় সাদরসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে আপনি আমার অতিথি হইলেন।" আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

মন্ত্র-শক্তি।

আমরা মহাভারতে মহামুনি দুর্বাসার নিকট কুন্তীদেবীর মন্ত্র-লাভ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ তখন তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে প্রভুপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একদা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই কথায় নিম্নে ঘটনাটি যথাশক্তি বিবৃত করিলাম।

গোস্বামী মহাশয় বলিতেছেন :—

"আমরা তখন বৃন্দাবনে। এক দিন সন্ধ্যার সময় একাকী যমুনা-তীরে বেড়াইতেছিলাম। সময় ও স্থান উভয়ই মনোরম; সায়ংকালীন সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে যমুনা-জল কোথায়ও লোহিত, কোথায়ও ধূসর বর্ণে মণ্ডিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল; ব্রজরাখালবালকেরা ধেনুবৎস সঙ্গে লইয়া মাঠ ছাড়িয়া আপন আপন গৃহপানে চলিতেছিল; পক্ষিগণ সুমধুর কূজনে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া দ্রুত-পক্ষবিক্ষেপে নীড়াভিমুখে যাইতেছিল। পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পবিত্র যমুনা-পুলিনে দাঁড়াইয়া আমি অনেকক্ষণ প্রকৃতির সেই সুমধুর লীলা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রাণে এক অভূত-পূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইল। আমি সেই যমুনা-তীরে তৃণাচ্ছাদিত এক ভূমি-খণ্ডের উপর উপবেশন করিলাম। চারি দিক ক্রমশঃ অন্ধকারময় হইয়া আসিতে লাগিল; আমি দশোভাবে ইষ্টদেব-ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম।

অকস্মাৎ কোথা হইতে এক জন সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী দেখিতে তেজোময় ও বয়সে প্রাচীন। সন্ন্যাসী ব্যস্তভাবে আমার নিকট আসিয়াই বলিলেন 'গোঁসাই! অনেক দিন হইতে তোমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আজ একাকী পাইয়াছি। আমার একটি মন্ত্র আছে, তা তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।'

আমি আগন্তুক সন্ন্যাসীর এইরূপ আকস্মিক আগমন ও সম্ভাষণের কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মন্ত্র? আপনি আমাকে মন্ত্র-দানের জন্য এত উদ্বিগ্নই বা হইতেছেন কেন?' প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন 'এ মহামন্ত্র আমার গুরুদেব কৃপাবশতঃ আমাকে দান করিয়াছিলেন; এ মন্ত্র জপ করিয়া যখন যাঁহাকে আহ্বান করিবে,

তিনি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, মানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যাহাই হউক না কেন, মন্ত্র-বলে তখনই সশরীরে তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন, এবং তোমার অভীষ্ট কার্য্যে সহায়তা করিবেন।'

অতি বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'এ মন্ত্র দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে?' সন্ন্যাসী তখন আরও দৃঢ়তর স্বরে বলিলেন, 'তুমি এ মন্ত্র দ্বারা অসীম উপকার লাভ করিতে পার। যদি কখনও তোমার ইষ্টদেবকে দেখিতে বাসনা হয়, এই মন্ত্র জপমাত্র তখনই তিনি সশরীরে তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যদি কখনও কোনও কার্য্যে কোনও দেবতাকে আহ্বান কর, তখনই তিনি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য্যসৌকর্য্যার্থ তোমার সহায় হইবেন।'

আমি। আর যদি কোনও কুৎসিত কার্য্যে আমার মতি হয়—

সন্ন্যাসী। তবে তখনই তাহা সম্পাদন করিতে পারিবে।

আমি। আমি এ মন্ত্র গ্রহণ করিব না।

সন্ন্যাসী। তোমাকে এ মন্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে। আমার গুরুদেবের আদেশ যে, এ মন্ত্র কোনও সৎপাত্রে সমর্পণ করিতে হইবে। আমি বহুদিন হইতে সৎপাত্র অন্বেষণ করিতেছি, বহুদেশ ঘুরিয়াছি, কিন্তু কোথাও পাইতেছি না। অদ্য ভাগ্যবশে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আমি এ মন্ত্র তোমাকে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি পাইব। দেখ, আমার বয়স হইয়াছে, আমি আর ঘুরিতে পারিতেছি না।

আমি। আমারও গুরুদেবের নিষেধ আছে, কোনওরূপ বুজরুকী শিক্ষা করিব না। আপনি অন্যত্র সৎপাত্র অন্বেষণ করুন; আমি এ মন্ত্রের অধিকারী নহি।

সন্ন্যাসী। অধিকারী জানিয়াই তোমাকে ধরিয়াছি; বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তোমাকে পাইয়াছি, আমাকে নিরাশ করিও না।

আমি যেন দেখিতেছিলাম, সম্মুখে বিষম পরীক্ষা ও ভয়ঙ্কর বিপদ। আমি কিছুতেই মন্ত্রগ্রহণে সম্মত হইলাম না। কিন্তু সন্ন্যাসীও ছাড়িবার পাত্র নহেন। ক্রমশঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহাতেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে আমি মনে মনে স্থির করিলাম, আর বৃথা বাগ্‌-দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নাই, আমি প্রত্যুত্তর করিব না। আমি নীরবে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে সন্ন্যাসী আমার কাণের পাশে মুখ রাখিয়া মন্ত্রটি বলিয়া চলিয়া গেলেন। সামান্য দুটি অক্ষরমাত্র—যেমন শুনিলাম, তখনই মনে রহিয়া গেল। প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল,—যেন কি এক ভয়ানক পরীক্ষা-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি; সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া স্বেদ-বিন্দু বাহির হইতে লাগিল; আতঙ্কে সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল।

শেষে স্থির করিলাম, যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে; আমি কখনও এ মন্ত্র পরীক্ষা করিব না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অতি বিষণ্ণচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

সেইদিন মধ্যরাত্রিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, যদি মন্ত্রটি পাইলাম, একবারমাত্র মন্ত্রের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে দোষ কি। কিন্তু কাহাকে আহ্বান করি? অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, গোবিন্দজী বিগ্রহের গলায় যে ফুলের মালা আছে, তাহাই আনিতে হইবে মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম; সাবধানে চাহিয়া দেখি, গোবিন্দজীর মালা আমার গলদেশে দুলিতেছে

এবার মনে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সঞ্চার হইল; এ কি করিলাম! গোবিন্দজীর মালা গলায় আনিয়া বিগ্রহের অবমাননা করিলাম; আর যে মন্ত্র পাইয়াছি, হয় ত পরিণামে এই মন্ত্র-মোহে আমাকে আমার বহু-যত্ন-লব্ধ ধর্ম্ম-পথ হইতে একেবারে চিরকালের মত বিচ্যুত হইতে হইবে! গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'ধর্ম্মপথে থাকিয়া কখনও কোনও কুহুকীর আশ্রয় গ্রহণ করিও না।' আমি তাঁহারও পবিত্র আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলাম।

এইরূপ নানা অনুতাপ-যন্ত্রণায় সারারাত্রি আর নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে —ভোর না হইতেই গাত্রোত্থান করিয়া মালাটি হাতে লইয়া আমার পরম বন্ধু ও হিতৈষী গৌরদাস শিরোমণি মহাশয়ের নিকট যাত্রা করিলাম। শিরোমণি মহাশয় পরম ভক্ত ও ভগবতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি বৃন্দাবনেই বাস করিতেন। আমি তাঁহার গৃহ-সম্মুখস্থ হইয়া দেখিলাম, তিনি আমার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই শয়ন-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বেড়াইতেছেন। আমার পানে একবারমাত্র দৃষ্টি করিয়াই তিনি সস্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, 'এ কি গোঁসাই! মুখ যেন সাগর শুকাইয়া গিয়াছে; ব্যাপার কি?' আমি অতি বিনীতভাবে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিতেই তিনি সমবেদনা প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, 'কাজটা অতি গর্হিত

হইয়াছে। তা, উপায় কি? যাও, গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইয়া মালা ফিরাইয়া দাও, আর প্রার্থনা করিও, যেন অচিরে মন্ত্রটি ভুলিয়া যাও।'

শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরাভিমুখে যাইতেছি। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম যে, মন্দিরের দুই জন পাণ্ডা আমারই দিকে আসিতেছেন। তাঁহারা আমার অপরিচিত, কিন্তু বেশ-ভূষা দেখিয়া তাঁহাদিগকে গোবিন্দজীর পাণ্ডা বলিয়া চিনিতে পারিলাম। তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি ঠাকুর! কোথায় যাইতেছ?'

'গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইতেছি' বলিয়া আমি সংক্ষেপে তাঁহাদিগকে ঘটনার কথা বলিলাম। তাঁহারা উভয়ে হাসিয়াই আকুল! বলিলেন, 'আর তোমাকে যাইতে হইবে না। গোবিন্দজীর আদেশে আমরাই তোমার নিকট হইতে মালা আনিতে যাইতেছিলাম; মালা দাও।'

আমি মালা প্রত্যর্পণ না করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম, 'আমার ঠাকুরের নিকট আরও প্রার্থনা আছে—যেন অচিরে এ মন্ত্র বিস্মৃত হই।'

তখন পাণ্ডাগণ বলিলেন, 'এখন আর যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা তাহাও জানিয়া আসিয়াছি; গোবিন্দজী বলিয়াছেন, যে মন্ত্র শিখিয়াছ, তাহা আর বিস্মৃত হইবে না, তবে এ মন্ত্রের ক্রিয়া-সম্পাদনে আর কখনও তোমার ইচ্ছার উদয় হইবে না।'

পাণ্ডা-মুখ-নিঃসৃত শ্রীগোবিন্দজীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, মালাগাছিটি তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাদিগকে যথারীতি অভিবাদনপূর্ব্বক আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

তদবধি এই মন্ত্রের ক্রিয়া-সম্পাদনে আমার আর ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু মন্ত্রটি আজিও আমার মনে আছে।"

কান্দী; মুর্শিদাবাদ। শ্রীগোবিন্দবন্ধু মজুমদার।

বিদেশী গল্প।

দেবদৃষ্টি।

ভ্লাদিমির নগরে আইভান দিমিত্রিচ্ আফ্সানফ্ নামক জনৈক বণিক যুবকের বাস। তাহার একটি অট্টালিকা ও দুইখানি দোকান ছিল।

আফ্সানফ্ সুপুরুষ। তাহার মস্তকের কেশরাজি সুন্দর, কুঞ্চিত। সে অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ও রহস্যপ্রিয়। প্রথম যৌবনে সে প্রায়ই সুরা পান করিত। মাত্রা অধিক হইয়া গেলে বড় মাতলামী করিত। কিন্তু বিবাহের পর সে সুরাপানের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল। কদাচিৎ সামান্য-পরিমাণে সেবন করিত।

একদা নিদাঘে আফ্সানফ্ নিজ্নীর হাটে যাইবার পূর্ব্বে পত্নীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিল। স্ত্রী বলিল, "আইভান্, আজ তুমি যাইও না; তোমার সম্বন্ধে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।"

আফ্সানফ্ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "হাটে গিয়া পাছে আমি মাতলামী করি, এই ভয় বুঝি তোমার?"

পত্নী বলিল, "আমার মনে কেন আশঙ্কা হইতেছে, বলিতে পারি না। শুধু এই জানি, বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি যেন নগর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ। তুমি টুপী খুলিয়া ফেলিলে; দেখিলাম, তোমার মাথার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গিয়াছে।"

আফ্সানফ্ সহাস্যে বলিল, "ইহা ত শুভ লক্ষণ। দেখিও, এ যাত্রা সমস্ত জিনিস বেচিয়া ফেলিব। আর তোমার জন্য হাট হইতে ভাল ভাল জিনিস লইয়া আসিব।"

এই বলিয়া সে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল।

অর্দ্ধ-পথ অতিক্রম করিলে জনৈক পরিচিত সওদাগরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে রাত্রিবাসের জন্য একই পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একত্র চা-পানের পর উভয়ে পাশাপাশি কক্ষে আশ্রয় লইল।

অধিক বেলা পর্য্যন্ত আফ্সানফ্ কখনও শয্যায় পড়িয়া থাকিত না। রৌদ্র উঠিতে না উঠিতে যাত্রা করিবার বাসনায় সে অতি প্রত্যূষে শকট চালককে ডাকিয়া তুলিল। সে গাড়ী তৈয়ার করিল।

আফ্‌সানফ্‌ পান্থনিবাসের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য টাকাকড়ি মিটাইয়া দিল। তার পর গন্তব্য পথে যাত্রা করিল।

যুবক পঁচিশ মাইল পথ অতিবাহন করিয়া অশ্বযুগলকে 'দানাপানি' দিবার জন্য গাড়ী থামাইতে বলিল। পথিপার্শ্বস্থ পান্থনিবাসে সে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিল। একপাত্র জল গরম করিবার আদেশ দিয়া বণিক বাহিরে আসিয়া একটি বাদ্যযন্ত্র লইয়া সঙ্গীতালাপ করিতে বসিল।

অকস্মাৎ একখানি ত্রি-অশ্বযোজিত শকট পান্থনিবাসের সম্মুখে আসিল। জনৈক রাজকর্ম্মচারী দুই জন সৈনিকের সহিত শকট হইতে অবতরণ করিলেন। কর্ম্মচারী আফসানফের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নাম কি, এবং কোথা হইতে আসিতেছে। আফ্‌সানফ্‌ তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া বলিল, "আসুন, চা-পান করা যাক্‌।" কিন্তু কর্ম্মচারী মহাশয় তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "গত কল্য রাত্রিকালে তুমি কোথায় ছিলে? একা ছিলে, অথবা কোনও সঙ্গীর সহিত রাত্রিবাস করিয়াছিলে? যে সওদাগরটির সহিত পান্থনিবাসে অবস্থান করিয়াছিলে, আজ প্রভাতে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল কি? ঊষাগমের পূর্ব্বেই বা কেন তুমি পান্থশালা ছাড়িয়া আসিলে?" ইত্যাদি।

আফসানফ্‌ এই সব প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আমি চোর, না, ডাকাত? নিজের কার্য্যোপলক্ষে আমি অন্যত্র যাইতেছি। এ সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।"

রাজকর্ম্মচারী তাঁহার সহচরবর্গকে আহ্বান করিয়া আফ্‌সানফ্‌কে বলিলেন, "আমি এই প্রদেশের পুলিসকর্ম্মচারী। যে সওদাগরটির সহিত তুমি রাত্রিবাস করিয়াছিলে, সে হত হইয়াছে; সেই জন্য তোমাকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার দ্রব্যাদি আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

তাঁহারা পান্থনিবাসের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আফ্‌সানফের দ্রব্যাদি খুলিয়া ফেলিয়া সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহসা একটা বস্তা হইতে পুলিস-কর্ম্মচারী একখানি ছোরা টানিয়া বাহির করিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এ ছোরা কাহার?"

আফসানফ্‌ তাহার দ্রব্যাদির মধ্য হইতে একখানি শোণিতরঞ্জিত অস্ত্র নির্গত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল।

"এ ছোরাতে রক্ত লাগিল কিরূপে?"

আফ্সানফ্ উত্তর দিতে গেল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। জড়িতস্বরে সে বলিল, "আমি—আমি জানি না—আমার নয়।"

পুলিস-কর্ম্মচারী বলিলেন, "আজ সকালে সওদাগরকে শয্যার উপর মৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। কে তাহার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তুমি ছাড়া আর কে তাহাকে হত্যা করিবে? ভিতর হইতে বাড়ীর দরজা রুদ্ধ ছিল, সে বাড়ীতে আর কেহই ছিল না। তোমার ব্যাগের মধ্যে রক্তাক্ত ছোরা পাওয়া গেল। তা ছাড়া তোমার পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও ব্যবহার সন্দেহজনক। এখন বল, কিরূপে তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ, কত টাকাই বা চুরি করিয়াছ?"

আফ্সানফ্ শপথ করিয়া বলিল যে, সে এ কার্য্য করে নাই। চা-পানের পর সওদাগরের সহিত তাহার দেখাই হয় নাই। তাহার নিজস্ব আট হাজার মুদ্রা ব্যতীত সঙ্গে এক মুদ্রাও অধিক নাই। ছোরাখানিও তাহার নহে। কিন্তু কথা কহিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গেল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, এবং অপরাধীর ন্যায় তাহার সর্ব্বদেহ কম্পিত হইতে লাগিল।

পুলিস-কর্ম্মচারীর আদেশে সৈনিকদ্বয় আফ্সানফ্কে বাঁধিয়া গাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। আবদ্ধ অবস্থায় হতভাগ্য ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার দ্রব্যাদি ও অর্থ পুলিসকর্ম্মচারী কাড়িয়া লইলেন, এবং সন্নিহিত নগরের কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সে কি চরিত্রের লোক, তাহার সন্ধান লইবার জন্য ভ্লাদিমীর নগরে লোক প্রেরিত হইল। নগরের অন্যান্য বণিক ও অধিবাসীরা বলিল যে, পূর্ব্বে সে সুরাপানে অনেক সময় বৃথা যাপন করিত বটে, কিন্তু সে লোক ভাল। তার পর বিচারের দিন সমাগত হইল। রায়াজান নগরের কোনও বণিককে হত্যা ও তাহার বিংশ সহস্র মুদ্রা অপহরণের অপরাধে সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইল।

এই সংবাদে তাহার পত্নী অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার সন্তানগণ নাবালক, তন্মধ্যে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। পুত্রকন্যাগণকে সঙ্গে লইয়া সে স্বামীর সহিত দেখা করিবার জন্য নগরের কারাগারে গমন করিল। প্রথমতঃ সে স্বামীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি পাইল না। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনার পর উপস্থিত রাজকর্ম্মচারী সাক্ষাতের আদেশ দিলেন। সে স্বামীর নিকট নীত হইল। কারাগারের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অন্যান্য তস্কর ও

অপরাধীদিগের সহিত স্বামীকে দেখিয়া সাধ্বী পত্নী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমি-তলে নিপতিত হইল। বহুক্ষণ তাহার সংজ্ঞা ছিল না। তার পর পুত্রকন্যা-গণকে লইয়া সে স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। পত্নীর প্রশ্নে স্বামী সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি উপায়?"

"রুষ সম্রাটের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আমি নির্দোষ, তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে?"

পত্নী বলিল যে, সে ইতিমধ্যে সম্রাটের নিকট সেই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিল; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

আফ্‌সানফ্‌ কোনও উত্তর করিল না। নতমুখে সে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

পত্নী বলিল, "আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তোমার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝি ফলিল। সে দিন যদি তুমি বাড়ী হইতে না বাহির হইতে!" স্বামীর কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া রমণী বলিল, "স্বামী, প্রিয়তম, সত্য করিয়া বল, তুমি কি এ কাজ করিয়াছ?"

আফ্‌সানফ্‌ বলিল, "তুমিও আমায় সন্দেহ করিতেছ?" করপুটে মুখ আবৃত করিয়া যুবক ক্রন্দন করিতে লাগিল। দ্বাররক্ষী আসিয়া বলিল, সময় হইয়াছে, আর তাহারা কারাগারে থাকিতে পাইবে না। আফ্‌সানফ্‌ স্ত্রীপুত্রের কাছে শেষবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, আফ্‌সানফ্‌ পূর্ব্বাপর চিন্তা করিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রীও তাহার উপর সন্দেহ করিয়াছে। তখন সে ভাবিল, শুধু ভগবান ব্যতীত আর কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? তিনি সমস্তই জানেন, তাঁহার নিকট সে আবেদন করিবে। তিনি ভিন্ন আর কে তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে?

আফ্‌সানফ্‌ আর আবেদনপত্র কাহারও নিকট প্রেরণ করিল না। মুক্তির কোনও আশা নাই দেখিয়া সে শুধু ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

তাহার বেত্রদণ্ডের আদেশ হইল। তার পর খনির মধ্যে তাহাকে আজীবন কাজ করিতে হইবে যথাসময়ে বেত্রাঘাতে তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল। দেহের ক্ষত আরোগ্য হইলে অন্যান্য অপরাধীদের সহিত সে সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইল।

ছাব্বিশ বৎসর সে সাইবীরিয়ায় অপরাধীর ন্যায় কালযাপন করিল। দীর্ঘ কালে, তাহার মস্তকের কেশরাজি তুষারবৎ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, তাহার গুম্ফ ও শ্মশ্রু ক্রমে দীর্ঘ ও ধূসর হইতেছিল। তাহার যৌবনের সে চাপল্য, পরিহাস-রসিকতা ছিল না। তাহার উন্নতদেহ ক্রমে বক্রাকার ধারণ করিতেছিল। সে অতি ধীরে পদবিক্ষেপ করিত, কথা অল্পই কহিত, তাহাকে কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই সে ভগবানের আরাধনা করিত।

কারাগারে অবস্থানকালে আক্‌সানফ্‌ জুতা তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিল; তদ্দ্বারা সে যৎসামান্য যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহাতে সে প্রাচীন ঋষিদিগের একখানি জীবনচরিত ক্রয় করিয়াছিল। কারাগারে যতক্ষণ সূর্য্যের আলোক থাকিত, ততক্ষণ সে সেই পুস্তক পাঠ করিত। রবিবারে কারাগারের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরে সে স্তোত্র পাঠ করিত; ভগবানের নামগানের সময় সঙ্গীতে যোগদান করিত। তাহার কণ্ঠস্বর তখনও সুমিষ্ট ছিল।

কারাগারের কর্তৃপক্ষ তাহার বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অপরাপর বন্দীরাও তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহারা তাহাকে "ঠাকুরদাদা" ও "ঋষি" নামে অভিহিত করিত। কারাগারের কর্তৃপক্ষের নিকট কোনও বিষয়ে আবেদন করিতে হইলে তাহারা আক্‌সানফ্‌কে পাঠাইয়া দিত। বন্দীদিগের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া কলহ হইলে, তাহারা তাহাকে সালিস মানিত। সে সকলের বিবাদ মিটাইয়া দিত।

দেশ হইতে সে পত্নী ও পুত্রকন্যার কোনও সংবাদ পায় নাই। তাহারা বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাও সে জানিত না।

একদিন একদল নূতন অপরাধী কারাগারে উপনীত হইল। অপরাহ্নে পুরাতন অপরাধীরা নূতন অপরাধীদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল! কোন্ নগর অথবা গ্রাম হইতে তাহারা কি অপরাধে এখানে আসিতেছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। আক্‌সানফ্‌ নীরবে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল।

নূতন অপরাধীদিগের মধ্যে ষষ্টিবর্ষীয় দৃঢ়কায় দীর্ঘাকার এক অপরাধী নিজের কাহিনী বলিতেছিল।

সে বলিল, "বন্ধুগণ," একখানা স্লেজ-গাড়ী হইতে একটা ঘোড়া খুলিয়া লইয়াছিলাম, এ জন্য আমি চোর বলিয়া ধৃত হইয়াছি। তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইব বলিয়া আমি ঘোড়া লইয়াছিলাম। তার পর ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া-

ছিলাম। শকটচালকও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিলাম যে, আমি অন্যায় কাজ করি নাই। কিন্তু বিচারকগণ বলিলেন, না, তুমি চুরী করিয়াছ। কিন্তু কেমন করিয়া অথবা কোথা হইতে চুরী করিয়াছিলাম, কেহ তাহা প্রমাণ করিতে পারিল না। একবার সত্যই আমি অপরাধ করিয়াছিলাম; সে অপরাধে বাস্তবিক বহু পূর্ব্বে আমার এখানে আসা উচিত ছিল; কিন্তু সে যাত্রা আমি ধরা পড়ি নাই। কিন্তু এবার আমার কোনও অপরাধ নাই, তবু আসিতে হইল শোন, শোন, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছিলাম, একবার আমি সাইবীরিয়ায় আসিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু বেশী দিন থাকি নাই।"

এক জন বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

"ভ্লাদমীর নগরে। আমার পরিবারবর্গ সেইখানে আছে আমার নাম মেকার। কিন্তু লোকে আমাকে সেমিওনিচ্ বলিয়া ডাকে।"

আফ্সানফ্ মাথা তুলিয়া বলিল, "সেমিওনিচ্, তুমি বলিতে পার, ভ্লাদমীর নগরের আফ্সানফ্ সওদাগরের পরিবারের কি হইয়াছে? তাহারা সব বাঁচিয়া আছে ত?"

"তাদের আমি বিলক্ষণ জানি। আফসানফেরা এখন বেশ ধনবান্। তাহাদের পিতা এখন সাইবীরিয়ায় আছে। লোকটি বোধ হয় আমাদেরই মত পাপী! আচ্ছা ঠাকুরদাদা, তুমি এখানে এলে কোন্ অপরাধে?"

আফ্সানফ্ নিজের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিত না দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "আমার পাপের জন্য আজ ছাব্বিশ বৎসর আমি এখানে আছি।"

সেমিওনিচ বলিল, "কি পাপে?"

আফ্সানফ্ বলিল, "যে পাপের জন্যই হউক, আমার উপযুক্ত শাস্তি আমি পাইয়াছি!" সে আর কিছু বলিল না; কিন্তু তাহার সহচরেরা বলিল, এক জন এক সওদাগরকে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত ছোরা আফ্সানফের দ্রব্যাদির মধ্যে রাখিয়া যায়। বৃদ্ধ বিনা দোষে শাস্তি ভোগ করিতেছে।

মেকার সেমিওনিচ্ ইহা শুনিয়া আফ্সানফের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তার পর বলিল, "বাঃ, এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! খুব চমৎকার! কিন্তু ঠাকুরদা, তুমি বড় বুড়া হইয়া গিয়াছ!"

অন্যান্য বন্দীরা তাহার এইরূপ বিস্ময়ের হেতু জিজ্ঞাসা করিল। সে কি

পূর্ব্বে আফ্সানফ্কে দেখিয়াছে? কিন্তু যেকার সেমিওনিচ্ সে প্রশ্নের উত্তর করিল না। সে বলিল, "ভাই সব, এখানে আমাদের দুই জনের সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি চমৎকৃত হইয়াছি।"

আফ্সানফ্ ভাবিল যে, হয় ত এই লোকটা প্রকৃত হত্যাকারীর বিষয় অবগত আছে। সে বলিল, "সেমিওনিচ্, তুমি বোধ হয় এই ঘটনার কথা শুনিয়া থাকিবে; আমাকে কি তুমি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছ?"

"শোনা আর বিচিত্র কি? পৃথিবীতে কত কথাই রটে। সে অনেক দিনের কথা, আমি কি শুনিয়াছিলাম, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি।"

আফ্সানফ্ বলিল, "সওদাগরকে কে হত্যা করিয়াছিল, বোধ হয় তুমি শুনিয়া থাকিবে?"

সেমিওনিচ্ সহাস্যে উত্তর করিল, "যাহার ব্যাগের মধ্যে ছোরাখানি পাওয়া গিয়াছিল, সে ছাড়া আর কে হত্যা করিতে যাইবে! যদি আর কেহ ছোরাখানি লুকাইয়া রাখিয়া থাকে, ধরা না পড়িলে ত আর তাহাকে অপরাধী করিবার উপায় নাই। তোমার মাথার নীচে ব্যাগ ছিল, অন্য কেহ তাহার মধ্যে ছোরা রাখিয়াই বা যাইবে কিরূপে? তাহা হইলে তখনই তোমার নিশ্চয়ই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।"

এই সকল কথা শুনিয়া আফ্সানফের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি সওদাগরকে হত্যা করিয়াছিল। সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। সমস্ত রজনী আফ্সানফ্ বিনিদ্র অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না। তাহার মানসপটে কতপ্রকার মূর্ত্তি উদিত হইল। হাটে যাইবার পূর্ব্বে তাহার পত্নীর যেরূপ আকৃতি সে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই মূর্ত্তি কল্পনানেত্রে উদ্ভাসিত হইল। সে যেন তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে! সেই মুখ, সেই চক্ষু! সে যেন তাহার কণ্ঠস্বর, হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল। তার পর ছোট ছোট সন্তানগণের মূর্ত্তি একে একে তাহার মানস-নেত্রে প্রতিফলিত হইল। একটি শিশু যেন জামাগায়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! একটি মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছে! তার পর নিজের কথা মনে পড়িল—তখন তাহার যৌবনের কত চাপল্য, কত স্ফূর্ত্তি! পান্থনিবাসের বহির্ভাগে বসিয়া সে যন্ত্র-সংযোগে গান করিতেছিল, এমন সময় পুলিস আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। তখন দুঃখ-যন্ত্রণার লেশমাত্র সে জানিত না। তার পর যেখানে দাঁড়াইয়া সে বেত্রাঘাত-যন্ত্রণা সহ

করিয়াছিল, সেখানকার চিত্র অকস্মাৎ তাহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইল,—সম্মুখে জল্লাদ, চারি পার্শ্বে বিপুল জনতা। তার পর অপরাধী-দিগের সাহচর্য্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা, ছাব্বিশ বৎসরের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা, অকাল-বার্দ্ধক্য—একে একে সমুদয় ঘটনার চিত্র তাহার মানসপটে সমুজ্জ্বল ভাবে দেখা দিল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মন নৈরাশ্যে এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, আত্মহত্যা দ্বারা সকল যন্ত্রণার অবসান করিবার বাসনা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

আফ্সানফ্ ভাবিল, এই দুষ্ট নরাধমের জন্য আজ তাহাকে এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। মেকার সেমিওনিচের প্রতি তাহার এরূপ আক্রোশ জন্মিল যে, প্রতিশোধ-স্পৃহা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল! এ জন্য যদি মরিতেও হয়, তাহাতেও সে পশ্চাৎপদ নহে। সমস্ত রাত্রি সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, কিন্তু মনে শান্তি পাইল না। দিবাভাগে সে সেমিওনিচের নিকট হইতে দূরে রহিল; একবারও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল না।

এইরূপে এক পক্ষ কাল অতীত হইল। রাত্রিকালে আফ্সানফের নিদ্রা হইত না। দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় তাহার মানসিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, সে কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

একদা রাত্রিকালে কারাগৃহের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় সে দেখিতে পাইল, একটি বন্দীর শয়নকক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে খানিকটা মাটী ঝরিয়া পড়িল। সে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে লাগিল। অকস্মাৎ মেকার সেমিওনিচ্ শয়নকক্ষ হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইল। আফ্সানফ্‌কে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আফ্সানফ তাহার দিকে না চাহিয়াই চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু মেকার তাহার হাত ধরিয়া বলিল যে, সে প্রাচীরের নিম্নভাগে গর্ত্ত কাটিতেছে। সে প্রত্যহ তাহার বুট জুতার মধ্যে মাটী ভরিয়া যখন বন্দীরা বাহিরে কাজ করিতে যায়, সেই সময় ফেলিয়া দিয়া আসে।

"বৃদ্ধ, তুমি কাহাকেও এ কথা বলিও না। তোমাকেও সঙ্গে করিয়া পলাইব। যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমাকে উহারা বেত মারিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে; কিন্তু তার আগে আমি তোমায় খুন করিব।"

আফ্‌সানক্ শত্রুর দিকে চাহিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তাহার হস্ত হইতে নিজ বাহু মুক্ত করিয়া লইয়া সে বলিল, "আমার পলায়নেরও ইচ্ছা নাই, এবং আমাকে হত্যা করিবারও তোমার প্রয়োজন হইবে না। বহু পূর্ব্বে তুমি আমায় মারিয়া রাখিয়াছ। তোমার কথা কাহাকেও বলা না বলা, সে ভগবান যেমন করাইবেন, সেইরূপ হইবে।"

পরদিবস বন্দীরা যখন কাজ করিবার জন্য বাহিরে প্রেরিত হইল, জনৈক রক্ষী সৈনিক দূর হইতে লক্ষ্য করিল, এক জন বন্দী জুতার মধ্য হইতে রাস্তার উপর মাটী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তখনই কারাগার পরীক্ষিত হইল, ভূমধ্যস্থ গর্ত্ত আবিষ্কৃত হইল। কে এই কাজ করিয়াছে, কেহই স্বীকার করিল না। যাহারা জানিত, তাহারাও কেহ মেকার সোমিওনিচের নাম করিল না; কারণ, তাহা হইলে হতভাগ্য প্রাণে মরিবে। অবশেষে জেলের কর্ত্তা আফ্‌সানফের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তিনি জানিতেন, লোকটি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ।

"তুমি সত্যবাদী, ভগবানের দোহাই, যথার্থ বল, কে এ কাজ করিয়াছে?"

মেকার সোমিওনিচ তখন নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে জেলের কর্ত্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে আফ্‌সানফে যেন ভাল করিয়া লক্ষ্যই করিতেছিল না। আফ্‌সানফের ওষ্ঠ ও বাহুযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল। কিছু কাল তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে ভাবিল, আমার জীবন যে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাকে রক্ষা করিব কেন? আমি এতকাল যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহার বিনিময়ে সে যন্ত্রণা ভোগ করুক। কিন্তু আমি যদি প্রকাশ করি, তাহা হইলে নিদারুণ প্রহারে উহার প্রাণান্ত হইতে পারে। আমি উহার প্রতি সন্দেহ করিতেছি, হয় ত সে অপরাধী না হইতেও পারে। যদি তাই হয়, বলিয়া দিয়া আমার কি উপকার হইবে?"

জেলের কর্ত্তা পুনরায় বলিলেন, "বৃদ্ধ, সত্য কথা বল। কে প্রাচীরের নীচে গর্ত্ত করিয়াছে?"

আফ্‌সানফ্ মুহূর্ত্তমাত্র সোমিওনিচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "হুজুর, আমি বলিতে পারিব না। ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, আমি কোনও কথা বলি! আপনারা আমাকে যে শাস্তি দিতে চাহেন, দিন। আমি আপনাদের অধীন।"

কিশোর

চিত্রকর—জান ব্যাপ্‌টিষ্টা ক্রুজ।

জেলের কর্ত্তা বহু চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু আফ্‌সানফ্‌ কিছুই বলিল না। কাজেই সে ব্যাপারের যবনিকা সেইখানেই পতিত হইল।

রজনীতে আফ্‌সানফ্‌ শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি নিঃশব্দে তাহার শয্যার উপর আসিয়া বসিল। আফ্‌সানফ্‌ অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, লোকটি মেকার।

আফ্‌সানফ্‌ বলিল, "আবার তুমি? কি চাও? এখানে এলে কেন?"

মেকার সেমিওনিচ নীরবে বসিয়া রহিল। আফ্‌সানফ্‌ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তোমার কি প্রয়োজন? চলিয়া যাও, নহিলে আমি রক্ষীকে ডাকিব!"

মেকার সেমিওনিচ্‌ আফ্‌সানফের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আইভান্‌ দিমিত্রিচ্‌, আমায় ক্ষমা কর!"

আফ্‌সানফ্‌ বলিল, "কেন, কি জন্য?"

"আমি সওদাগরকে হত্যা করিয়া তোমার ব্যাগের মধ্যে ছোরা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তোমাকেও মারিয়া ফেলিব, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু বাহিরে কিসের শব্দ শুনিয়া, তোমার ব্যাগের মধ্যে ছোরা রাখিয়া, বাতায়নপথ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।"

আফ্‌সানফ্‌ নীরবে বসিয়া রহিল ; সে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। মেকার সেমিওনিচ ভূমিতলে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল! "আইভান্‌, ভগবানের দোহাই, আমায় ক্ষমা কর! আমার অপরাধের কথা কাল সকালে আমি স্বীকার করিব। তাহা হইলে তুমি মুক্তি লাভ করিয়া গৃহে যাইতে পারিবে।"

আফ্‌সানফ বলিল, "তুমি ত সহজ কথা বলিলে! কিন্তু তোমার জন্য আজ ছাব্বিশ বৎসর কত যন্ত্রণাই সহ্য করিয়াছি। এখন আমি কোথায় যাইব? আমার স্ত্রী মৃত, আমার পুত্র কন্যা কেহই আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমার যাইবার কোনও স্থান নাই।"

সেমিওনিচ উঠিল না। সে ভূমিতলে মাথা ঠুকিয়া বলিল, "আইভান, আমায় ক্ষমা কর। তাহারা যখন তোমায় বেত্রাঘাত করিয়াছিল, সে যন্ত্রণা অসহ্য ; কিন্তু এখন তোমার যে অবস্থা দেখিতেছি, ইহার তুলনায় সে যন্ত্রণা আমি সহস্রবার সহ্য করিতে পারিতাম। তবু আমার প্রতি তোমার কি করুণা ; তুমি একবারও আমার নাম প্রকাশ করিলে না। আমি অতি

পাপী, তথাপি ভগবানের দোহাই, আমায় ক্ষমা কর!" সেমিওনিচ রুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া আফ্‌সানফও কাঁদিতে লাগিল।

"ভগবান তোমাকে ক্ষমা করিবেন। হয় ত আমি তোমার অপেক্ষাও শত গুণ পাপী।" এই কথা বলিবার পর আফ্‌সানফের হৃদয়ের ভার যেন লঘু হইল। তখন তাহার গৃহে যাইবার আকাঙ্ক্ষা আর রহিল না। কারাগার ত্যাগ করিবার বিন্দুমাত্র বাসনা আর তাহাকে ব্যাকুল করিল না। কবে তাহার দিন শেষ হইবে, সে শুধু তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আফ্‌সানফের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মেকার সেমিওনিচ্ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্তু যখন আফসানফের মুক্তির আদেশ আসিল, তখন সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

গঙ্গা।

গান।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মাঈ,
কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি',
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি'
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটিজটিলজটা 'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

---

* কাউণ্ট টলষ্টয় রচিত গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

সহযোগী সাহিত্য।

ইউরোপের অধঃপতন।

"The International Journal of Ethics" নামক একখানি ত্রৈমাসিক সন্দর্ভ-পত্র বিলাতের লণ্ডন নগর হইতে জর্জ্জ এলেন এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার বহু মনীষী পণ্ডিত এই পত্রে সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহা পাঠ করিলে ইউরোপ ও আমেরিকার ভাব-রাজ্যের অনেক সমাচার পাওয়া যায়। পূর্ব্বে একবার আমরা লিখিয়াছিলাম যে, জর্ম্মনীর জন কয়েক ভাবুকের ধারণা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগের ইউরোপের সভ্যতা আদর্শের অভাবে হীন হইয়া যাইতেছে। ইউরোপের কোনও দেশের সাহিত্যে আর নূতন সৃষ্টি নাই; ভাবাভিব্যঞ্জনায় সে আবেগ, সে আগ্রহই নাই; মাধুরীর মোহে মুগ্ধ হইয়া কবি ও ভাবুক আর ভাষার লহরে আত্মহারা হইয়া যাইতেন না। ইউরোপের সাহিত্য যেন প্রাণহীন মর্ম্মরপ্রতিমার মতন হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যের অধঃপতন হইলে জাতির অধঃপতন ঘটিয়া থাকে; কেন না, ভাবের অভাবে জাতি বিলাস-বিমূঢ় ও স্থবির হইয়া পড়ে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া মার্কিণ লেখক বেঞ্জামিন এনড্রুজ "The decline of Culture" শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন তিনি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সমাজের দিক হইতে কথা কহিয়াছেন, এবং জর্ম্মন মনীষীদিগের সিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

Changing America নামক একখানি পুস্তকে মিঃ এডওয়ার্ড এল্‌স্‌-ওয়ার্থ রস স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"The rampancy of the commercial point of view which rates well-being by the dollar income and measures success by the sheer cash standard"—এই দোষেই সব মাটী হইল। সমাজের সকলে যখন জীবনের সুখ দুঃখের পরিমাণ টাকার ওজনে করিতে আরম্ভ করেন, যখন কর্ম্ম-সাফল্য আয়ের হিসাবে নির্দ্ধারিত হয়, তখন সমাজ যে স্থবিরতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, অধঃপতনের পথে গড়াইয়া যাইতেছে, সে পক্ষে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। যে সমাজে নূতন ভাব ছড়াইবার জন্য আসিয়াছে, তাহার কর্ম্ম-সাফল্য ভাবের বিস্তার দেখিয়া পরিমাণ করিতে হইবে; তাহার অর্থভাগ্যের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না। কবির কাব্যের আদর তখন সম্যক্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যখন তাহার কাব্যগত ভাষা ও ভাব সমাজের অধিক লোকে গ্রহণ করিয়াছে। পরন্তু তাহার কাব্যগ্রন্থের কাটতি দেখিয়া, অর্থাগমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হিসাব করিলে চলিবে না। যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ব্রতের উদ্‌যাপন তখন হইবে, যখন তাহার সাধ মিটাইয়া ধনসম্পত্তি তাহার গৃহে সঞ্চিত হইবে। কিন্তু টাকার মাপ-কাঠিতে সমাজের সকল ব্যাপারের মাপ আরম্ভ হইলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজে সদ্ভাবের অভাব হইয়াছে, ত্যাগের আদর্শ ম্লান হইয়াছে, সংযমের আদর্শ ক্ষীণ হইয়াছে।

এই সঙ্গে একটা বড় কথার আলোচনা করিতে হইবে। ইংরেজীতে উহাকে Race suicide বা জাতির আত্মহত্যা বলা হয়। এই যে ইউরোপের ও আমেরিকার সকল সভ্যদেশেই নরনারীমাত্রেরই বিবাহে অরুচি হইয়াছে, বিবাহ করিলেও পুত্রোৎপাদনে প্রায় সকলেই বীতস্পৃহ হইতেছে, ইহা হইতেই ইউরোপীয় সমাজের ও সভ্যতার অধঃপতন সূচিত হইতেছে। নরদেহ ঈশ্বরের প্রতিমার আদর্শে নির্ম্মিত—বাইবেলের এই কথাটায় যে কত ভাব, কত মাধুরী লুকান আছে, তাহা আধুনিক সভ্য খৃষ্টানে বুঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না। দেহকে ভোগের আধার-রূপে গড়িয়া তুলিলেই সর্ব্বনাশ। তখন দেহের তুষ্টি পুষ্টির জন্য মানুষ ইহকালের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া থাকে। সর্ব্বস্ব পণ করিলেও সে তুষ্টিপুষ্টি ষোল আনা লাভ করা যায় না; ফলে অতৃপ্ত শূকরের মতন বিলাসের পঙ্কে কেবল হাবুডুবু খাইয়া জীবন যাত্রার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। সকল দেশের সকল সমাজের উন্নতি ঘটিয়াছে নব নব ভাবের প্রভাবে। ভাবের জন্য মানুষ দেহসুখে জলাঞ্জলি দেয়, জীবন অর্পণ করে; ভাবের ধারা বজায় রাখিবার জন্য কত নরনারী সাগ্রহে দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দিনযাপন করিয়াছে। ভাবের বশে এই উন্মাদনার জন্য জাতির উন্নতি ঘটিয়া থাকে। ভোগে কখনই জাতির উন্নতি ঘটে নাই, ঘটিবেও না। ভোগে বংশের ধারা, জাতির ধারা ও ভাবের বিশিষ্টতা বজায় থাকে না। ভোগে মানুষ স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রচেতা হয়; ভোগে ভাবের অনুভূতি থাকে না। ইউরোপ ভাব ছাড়িয়া ভোগের পঙ্কে ডুবিয়াছে; তাই ইউরোপের সাহিত্য প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় পরিম্লানদ্যুতি হইয়াছে। যে দোষে রোম-সাম্রাজ্য নষ্ট হয়, সারাসেনদের উচ্ছেদ হয়,

স্পেনের অধঃপতন ঘটে, সেই দোষ ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখন হুন, গথ, তাতার জাতি সকল নাই, তাই রক্ষা; নহিলে ইউরোপে আবার অন্ধযুগের (Dark Age) সূচনা হইত। জীর্ণ সমাজ-পদ্ধতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিধাতা আবার নূতন করিয়া নব সমাজের ও নবীন সভ্যতার পত্তন করিতেন। সংহার-শক্তি প্রকট নাই বলিয়াই ইউরোপ ও মার্কিণ এখন আশ্বস্ত।

তথাপি মনীষী এনড্রুজ বলিতেছেন—"It is not simply abstention from wrong that human beings need in order to live well. It is enthusiasm for rightiousness, it is mighty self-denial and heroic, sacrifice ; not innocence but nobility, not continuance upon present moral levels, but inspiration and power to soar to the height ; and it is clear that latter-day motives are less and less adequate for those attainments."

কথাটা এই। মানুষ ইহ সংসারে একা আসে নাই, একা থাকিতে পারে না। যে সমাজে তাহার জন্ম, তাহার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহপদ্ধতি দ্বারা সেই সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তোমার কর্ম্মের ফলের ভাগী একা তুমি নও, তোমার সমাজ অনেকটা বটে। তুমি এক জীবনে ভোগ করিয়া যাও, সমাজ সাত জীবনে, বংশের পর বংশপরম্পরায় তাহা ভোগ করিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই শ্রীযুত এনড্রুজ বলিতেছেন যে, মানুষ যদি কেবল পাপ হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজে সুখী ও সম্পন্ন হইয়া হইয়া থাকিতে পারে না। চাই সাধুতার জন্য একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা; চাই অতি প্রবল আত্মত্যাগ, অনন্য-সাধারণ সন্ন্যাস। কেবল নিষ্পাপজীবন হইলে চলিবে না, চাই মহত্ত্বের প্রতি একনিষ্ঠা। সমাজ প্রচলিত স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ থাকিলেই চলিবে না; চাই আত্মার উন্মেষ, ভাবের উচ্চতম শিখরে আরোহণের প্রয়াস। যে সমাজে এমন আদর্শ নাই, এমন চেষ্টা সাধনা তপস্যা নাই, সে সমাজে সুখ নাই, উচ্চ জীবনের আদর্শ নাই, উচ্চ আদর্শের আকাঙ্ক্ষা নাই। আধুনিক বিলাস-বিদগ্ধ ইউরোপীয় সমাজে এমন ভাববিস্তারের অবসর নাই; তাই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা কেবল ভোগের সভ্যতা হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভোগের সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী; ভোগজ সাহিত্য শূকরের—মর্কটের সাহিত্য।

কেন এমন হইল? মিঃ এনড্রুজ বলেন যে,—চারিটা কারণে এমন হই-

য়াছে ; ১) Astounding growth in wealth, ধনের বিস্ময়জনক অতিবৃদ্ধি, (২) the spread of communistic socialism, অর্থাৎ সমাজে গোষ্ঠীর কল্যাণ-কামনা না করিয়া ব্যষ্টির তুষ্টি তৃপ্তির পদ্ধতির প্রচলন, সোসিয়ালিজমের অতি-প্রচার, (৩) bad theory and practice in education, শিক্ষা কার্য্যে দুষ্ট নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন ; (4) depressing views of the world, life and man, সংসার, মনুষ্য-জীবন ও মনুষ্য বিষয়ে নিরাশার ধারণা। ইউরোপ বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত ; এই এক জীবনেই সকল সাধ মিটাইতে চাহে ইউরোপের ভবিষ্যৎ নাই, পরলোক নাই, আশা নাই, স্বর্গ নাই, বুঝি বা নরকও নাই। ইউরোপ জানে, বর্ত্তমানের আলোক, আর ভবিষ্যতের অন্ধকার। তাই আলোক থাকিতে থাকিতে ইউরোপ সাধ মিটাইতে বড়ই ব্যস্ত। ভোগের ব্যস্ততায় সদ্ভাবের উদয় হয় না—ভাবের প্রগাঢ়তা নষ্ট হয় ফলে সাহিত্যের আদর্শ নষ্ট হয়, আত্মার বাণী মূক হইয়া যায়। অন্যের জাতা হইবার জন্য মানুষ যে অসাধ্যসাধন করে। তাহা আর পারে না ভোগের ভারে মানুষ পৃথিবীর ধূলায় গড়াগড়ি দেয়।

যখন ইউরোপে ধর্ম ছিল, তখন সমাজে এই প্রবচন প্রচলিত ছিল,— "Life is more than meat", অর্থাৎ জীবন কেবল ভোজ্যেই পর্য্যবসিত নহে ; খাদ্য বা ভক্ষ্য ছাড়া জীবনে আরও কিছু আছে। এখন কিন্তু সে ধারণা নাই। এখন জীবন বলিলেই লোকে জীবনে ভোগের পরিমাণ করিয়া লয় এখন জীবন বলিলেই লোক ধন দৌলত, পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, ভক্ষ্য ভোজ্য বুঝিয়া থাকে। পূর্ব্বে ধন দৌলত উপার্জ্জনের একটা পরিমাণ ছিল, মানুষের তৃপ্তির একটা সীমা ছিল। এখন যে যত উপার্জ্জন করে, সে তত চায়। যে পথের কাঙ্গাল, সে কোটীশ্বর হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না। যে ভিক্ষা করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, সে শত কোটী পাইলেও তুষ্ট নহে। অর্থ-উপার্জ্জনের বিরাম নাই, উপভোগেরও সীমা নাই। এমন সমাজে কি ভাবের উদ্গার হয় ?

বৈচিত্র্যই সমাজের আধার। সোসিয়ালিজমে সেই বৈচিত্র্য নষ্ট করিতে চাহিতেছে। তাই এন্ডরুজ বলিতেছেন "Social homogeneity is coarse, not fine, low not high. Levelling would be mainly downward. সামাজিক সমীকরণ অতি মোটা ব্যাপার, আদৌ সূক্ষ্ম নহে। উহা হীন, কখনই উন্নত নহে। বস্তুর ভূমিখণ্ডকে চৌরস করিতে হইলে

সর্ব্বাগ্রে উচ্চের মাথাই চূর্ণ করিতে হয়। তাই সোসিয়ালিজমের প্রভাবে ইউরোপে ভাবের কৃপণতা ঘটিতেছে; তাই সাহিত্যে নবীনতা পাওয়া যাইতেছে না।

ইউরোপের লেখাপড়া প্রায় ষোল আনা ব্যবসাদারী লেখাপড়া হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যা যেন অর্থ-উপার্জ্জনের যন্ত্রস্বরূপ। তাই বিদ্যার্থীর যোগ্যতা বুঝিয়া লেখাপড়ায় specialisation বা বিশিষ্টতার পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে; স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটী যেন এক একটা বিশাল কারখানা; ঐ কারখানায় ফেলিয়া প্রত্যেক বিদ্যার্থীর যোগ্যতাকে অর্থোপার্জ্জনের অনুকূল করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। এমন শিক্ষার ফলে ভাব ফুটে না, কবির সৃষ্টি হয় না, উচ্চ আদর্শের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে জাগরূক হয় না। এই বৈজ্ঞানিক, ব্যবসাদারী শিক্ষার ফলে ইউরোপের ভাবের ফোয়ারা শুকাইয়া গিয়াছে।

ডারবিনের বিবর্ত্তনবাদ প্রচলিত হওয়াতে ইউরোপের খ্রীষ্টানসমাজে নাস্তিকতার প্রচার বর্দ্ধিত হইয়াছে। Naturalism বা 'স্বাভাবিকতা' এই বাদের ফলস্বরূপ। স্বভাবে জীবজন্তু, স্থাবর জঙ্গমে যাহা ঘটিতেছে, যাহার প্রভাব প্রচলিত আছে, মনুষ্যসমাজেও তাহাই থাকিবে, তাহাই যোগ্য ও মান্য—এই মতের প্রচারেই ইউরোপের ভাবুকতা নষ্ট হইয়াছে। জর্ম্মণ পণ্ডিত Freidrich Nietzoche এই জীবনীতিতত্ব, এই জীবধর্ম্মপালন-পদ্ধতি ডারবিনের বিবর্ত্তনবাদ হইতে বাহির করিয়াছেন। The maintenance of the species—অর্থাৎ নিজের জাতির রক্ষা, পশু যেমন পশু-বলে পশু জাতির রক্ষা করে, তেমনই মানব-পশুও পশুসামান্য ধর্ম্মের দ্বারা স্বজাতির পুষ্টি করিবে। এই সিদ্ধান্ত যে দেশে ও যে সমাজে প্রচলিত, সে দেশে ও সে সমাজে পরকালের ভয় নাই, পরলোকের ভাবনা নাই, ঈশ্বরের চিন্তা নাই, অজ্ঞেয়ের প্রতি আশা নাই, অতীন্দ্রিয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। সুতরাং মানবতার মাধুর্য্য ও মহত্বে বর্জ্জিত হইয়া সে সমাজ পশুজীবন অতিবাহন করে। ইউরোপ ও আমেরিকার এই দশা ঘটিয়াছে। এ দশায় ভাবের উন্মেষ হয় না, সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর নহে।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া চিন্তাশীল এনড্রুজ বলিতেছেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার রক্ষার জন্য Perhaps another Messiah will have to be awaited—বুঝিবা আর এক জন ত্রাণকর্ত্তার প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপর্ণা।

কাশী। আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাস্তাঘাট কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। ৺বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম। ছাতা সঙ্গে ছিল না। বৃষ্টি আসাতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছি। পুরায় ঢুকিতেই জোরে বৃষ্টি আসিল। পথের ধারে একজনদের বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। এমন সময় ভিতর হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন;—তিনি যেন নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্তভাবাপন্ন। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই একটু চমকিত হইয়া 'কেও?' বলিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং রাস্তার আলোকের সাহায্যে যেন সাগ্রহে আমাকে চিনিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। আমি বলিলাম, "আমি মহাশয়—বৃষ্টি আসাতে আপনাদের এখানে একটু আশ্রয় লইয়াছি!" ব্রাহ্মণ যেন আরও আগ্রহ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ত! বেশ ত! মহাশয় ভিতরে বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করুন না—এখন ত শীঘ্র এ বৃষ্টি ধরিবে না। এ আমারই বাড়ী। আসুন, আসুন!" ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। আমি কিছু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং বিনা দ্বিরুক্তিতে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

একটি ছোটগোছের বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর সতরঞ্চি পাতা—সেখানে আমরা বসিলাম। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আমার আশ্রয়দাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নিবাস?"

"কলিকাতা।"

"মহাশয়েরা?"

"ব্রাহ্মণ"

"নামটি শুনিতে পাই কি?"

"—বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আপনারা কোন মেল?"

"কুলিয়া।"

"কার সন্তান?"

"রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর।"

"স্বভাব, না ভঙ্গ?"

"স্বভাব।"

"কি করা হয়?"

"ওকালতী।"

এইরূপ প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়া ভাবিলাম, "মন্দ নয়, দেখছি। এক জন পেশাদার ঘটকের পাল্লায় পড়া গিয়াছে!" ঘরে যে এক ব্রাহ্মণকন্যা এই দ্বিপদবিশিষ্ট সম্পত্তিটির উপর নির্ব্যূঢ়সত্ত্বে সত্ত্ববতী হইয়া গত অষ্টবর্ষ যাবৎ অবাধে ও নির্ব্বিবাদে তাহাকে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার উল্লেখ করিয়াই ঘটক মহাশয়ের কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে অন্ততঃ নগদ এক শত টাকা ও একজোড়া শাল লাভের কালনেমিসুলভ স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া দি,—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় "একটু বসুন, আসছি," এই বলিয়া ব্রাহ্মণ হঠাৎ অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে বৃষ্টি ধরিবার নামটি নাই। ব্রাহ্মণ এবার বাহিরে আসিলেই একটি ছাতা চাহিয়া লইব, স্থির করিলাম। কিছু পরে তিনি ফিরিলেন, এবং আমার সম্মুখে আসিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "বাবা - আমার বড় বিপদ—তুমি আমার স্বজাতি ও বড় ঘরের ছেলে—তুমি এ বিপদে একটু সাহায্য না করলে—" ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা সরিল না; তাঁহার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া আমি কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কিন্তু তাঁহার সে ব্যাকুলভাব-দর্শনে, বিশেষতঃ আমার আশ্রয়দাতা জ্ঞানে, তাঁহার কষ্টমোচন করিবার ইচ্ছা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইল। আমি উঠিয়া বলিলাম, "কি মহাশয়? বলুন, আমার দ্বারা যদি কিছু হয় ত আমি এখনই প্রস্তুত আছি—কি হইয়াছে, মহাশয়?" তিনি বলিলেন, "আর বাবা—আমার কন্যাটি মরণাপন্না - রাত কাটে কি না—আমার এখন লোকবল নাই, অর্থবল নাই—এই দুর্য্যোগের সময় একটু দেখে শুনে, এমন আমার কেহ নাই। তুমি যদি—তুমি আমার ছেলের বয়সী বলে' এরূপভাবে সম্বোধন করছি—কিছু মনে ক'র না বাবা- তুমি যদি দয়া করে'—" আমি বলিলাম, "সে কি মশাই—আমি যদি রাত্রে এখানে থাক্‌লে আপনার কিছু উপকার হয় ত আমি এখনই প্রস্তুত আছি।" ব্রাহ্মণ আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আঃ—নারায়ণ তোমার মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি করুন বাবা! এখন একবার আমার সঙ্গে ভিতরে এসে অবস্থাটা দেখে যাও বাবা।" বাল্যকাল হইতে ভয় জিনিসটার অধীনতা স্বীকার করিবার অভ্যাস যেমন কখনও ছিল না, তেমনই কৌতূহল জিনিসটা একবার উদ্দীপিত হলে' আবার সেটাকে দমন করিবার অভ্যাসও কখনও ছিল না। সুতরাং কতকটা এই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও বটে, এবং কতকটা আমার আশ্রয়-

দাতার উপকার করিবার ইচ্ছাবশতঃও বটে, তাঁহার সহিত অন্দরে প্রবেশ করিলাম।

একটি ছোট কুঠরীর মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল ; যেন তাহারই নিকটস্থ নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপের অনুকরণ করিতেছিল। একটি শয্যাতে মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকন্যা, পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ—চক্ষু মুদ্রিত—ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি সেই জীর্ণাবাস ত্যাগ করিতেছিল। নিকটে এক বর্ষীয়সী ও দুইটি প্রবীণ পুরুষ। বর্ষীয়সী চোখের জল মুছিতেছেন, এবং বড়সীর আগুনে হাত তাতাইয়া রোগিনীর হস্ত-পদ-তল ঘষিতেছিলেন। বোধ হয়, হিমাঙ্গ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

ব্রাহ্মণ আমার হাত ধরিয়া শয্যার পাদদেশে লইয়া গিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মা অপর্ণা, একবার চোখ খুলে দেখ ত মা—কে এসেছেন ?" প্রশ্নটা আমার অদ্ভুত বোধ হইল ! যাহা হউক, অপর্ণা চোখ চাহিলেন—ধীরে ধীরে সেই আসন্নমরণা ব্রাহ্মণকন্যা যেন কালের করালছায়াকে চক্ষুর শেষ কয়টি রশ্মির দ্বারা আরও গাঢ়তর করিয়া, আমার দিকে চাহিলেন। দিব্য শান্ত, সকরুণ, বেদনাপূর্ণ অথচ বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে আমাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। ক্রমে তাঁহার বিস্ময়ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। বহুকাল ধরিয়া যাহার অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলাম, তাহাকে পাইলে মনে একটা নিশ্চিন্ত ও আনন্দোৎফুল্ল ভাব আসে, যেন সেই ভাব আসিল। সেই পাণ্ডুর কপোলে যেন ঈষৎ কালিমা দেখা দিল, সেই মরণচ্ছায়ানিবিড় বদনপ্রান্তে যেন শেষ হাস্যদীপ্তি ফুটিল। পরে ধীরে ধীরে বর্ষীয়সীর দিকে চাহিলেন। তিনি অতি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা ! ইনিই কি ?" ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অপর্ণা উত্তর করিলেন ; "হাঁ।" বর্ষীয়সী, ব্রাহ্মণ ও উপস্থিত ভদ্রলোক দুইটি সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ! বাবা বিশ্বেশ্বর রক্ষা করেছেন !" ভদ্রলোক দুটি আরও বলিলেন, "আর হবে নাই বা কেন ? আপনারা এ কয় দিন ধরে' যে করে' বাবা বিশ্বেশ্বরকে ডেকেছেন ; আর আপনার কন্যাও বাবা বিশ্বেশ্বরের প্রতি যেরূপ ভক্তিমতী।" আমি যেন ক্রমশঃই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। মুমূর্ষুর জন্য কেমন একটা বেদনাপূর্ণ সহানুভূতি, এঁদের রহস্যময় কথোপকথন শ্রবণে বিস্ময়, এই সকল ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত যেন আমাকে ক্রমশঃ বাস্তবরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আমার চিন্তাকুল ভাব লক্ষ্য করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "বাবা !

বিশ্বেশ্বর যদি করুণা করে' সময় থাকতে থাকতে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তবে দয়া করে' আমার কন্যাটিকে উদ্ধার কর।" আমি অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলাম, "মহাশয়, আপনারা কেন আমাকে এরূপ সাধ্যসাধনা করছেন? এরূপ স্থলে আমার ন্যায় সামান্য ও অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আপনাদের যে কি কাজ হ'তে পারে, আমি তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই—আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝিয়ে দেন ত ভাল হয়।"

তাহার পর তাঁহাদের সকলের প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

এই ব্রাহ্মণটির আদি নিবাস —জেলাস্থ গ্রাম। বহুকালাবধি এই স্থানেই বাস করিতেছেন। এই বর্ষীয়সী ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। অপর্ণা ইঁহার একমাত্র সন্তান ও শৈশবে মাতৃহীনা হইবার পর হইতে এই পিতৃস্বসার দ্বারাই কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালিতা। ইঁহারা ভাল কুলীন ও আমাদের পালটী ঘর। অপর্ণার বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বর্ষ হইলেও পালটীঘরের পাত্রাভাবে এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। গত ছয় মাস যাবৎ অপর্ণা জ্বর ও কাশীতে ভুগিতেছেন—সাধ্যমত চিকিৎসাদি করাইয়াও কোনও ফল হয় নাই। জ্বর মজ্জাগত ও কাশী ক্ষয়কাশীতে পরিণত হইয়াছে। প্রায় এক সপ্তাহ হইল, ডাক্তার কবিরাজেরা জবাব দিয়া গিয়াছেন। কখন শেষ মুহূর্ত্ত আসে। মধ্যে মধ্যে নাড়ী ও সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় ও দেহ শীতল হইতেছে। কেবল মৃগনাভি ও মকরধ্বজ খাওয়াইয়া রাখা হইয়াছে। অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন হওয়া অবধি রোগিণী মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন, এবং "বাবা বিশ্বেশ্বর দয়া করে' আমাকে নাও" এই বলিয়া কেবল কাঁদিতেছেন। ইনি শিশুকাল হইতেই দেবদ্বিজে ও বিশেষতঃ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার অসাধারণ ভক্তিমতী। ইঁহার পূজার্চ্চনা ও স্নিগ্ধ মধুর ভাব দেখিয়া সকলেই বলিতেন, "অপর্ণা শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা।" গত রাত্রে অপর্ণা এইরূপ যন্ত্রণায় কাঁদিতে কাঁদিতে বিশ্বেশ্বরকে সকাতরে ডাকিতে ডাকিতে শেষরাত্রে নিদ্রা যান, এবং ভোরে স্বপ্ন পান যে, ভগবান্ বিশ্বেশ্বর দেব স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া বলিতেছেন, "বড় যন্ত্রণা পাইতেছ? আইস, আমার নিকট আইস; কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে তোমার বিবাহসংস্কার দ্বারা শুদ্ধি হওয়া চাই; নচেৎ আসা হইবে না। এই দেখ, এই ব্রাহ্মণ আজ তোমাদের বাড়ীতে আসিবেন। তোমার পিতাকে বলিবে যে, সন্ধ্যার পর

তোমাদের পালটী ঘরের কোনও ব্রাহ্মণসন্তানকে বাড়ীর সম্মুখে দেখিলেই তাঁহাকে যেন তোমাকে সম্প্রদান করেন। তিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিবামাত্র তোমার ভববন্ধন মুক্ত হইবে; তুমি আমার নিকট আসিতে পারিবে।" তৎপরে অপর্ণার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতৃষসাকে সমস্ত কথা বলেন। এই কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার পিতা স্বীয় ভবনের দ্বারদেশে সারাদিন ধরিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে সেই স্বপ্নাদিষ্ট ব্রাহ্মণপুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরে এইমাত্র অপর্ণার নিজ উক্তি হইতেই আমিই যে সে স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণ, তাহা প্রমাণিত হইল

প্রাচীন ভদ্রলোক দুইটি ব্রাহ্মণের পুরাতন বন্ধু ও সহৃদয় প্রতিবেশী; সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, এবং খোঁজখবর লয়েন। তাঁহাদের নিকট হইতে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। আমার সেই ভাব-দর্শনে অপর্ণার পিতা আমার হস্তদ্বয় নিজ হস্তে লইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আমার প্রতি—এই অভাগিনীর প্রতি কৃপা করিবে না?"

আমি যন্ত্রবৎ অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "মহাশয়! আমি বিবাহিত—আমার বিবাহ—"

ব্রাহ্মণ আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হা অদৃষ্ট! এ কি বিবাহ? এ যে অন্তর্জলি বাবা!" এই বলিয়া শিশুর ন্যায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার পর বর্ষীয়সী ও প্রাচীন ভদ্রলোক দুইটিও অতি সকরুণ ভাবে এরূপ সাধ্যসাধনা ও অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলেন যে, আমি কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। একবার চকিতের ন্যায় মনে হইল, ইহাদের কোনও মতলব নাই ত? যে পেশায় ঢুকিয়াছি, তাহাতে মানুষের কোনও কাজ বা ব্যবহারই সন্দেহের বহির্ভূত নয়, এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। আবার মনে হইল, "আচ্ছা, ইহারাই যেন প্রতারক; কিন্তু এই আসন্নমরণা, সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি—এও কেন অন্তিম কালে প্রবঞ্চনা করিবে? ইহাও কি সম্ভব?" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি অন্যমনস্কভাবে একবার অপর্ণার মুখ পানে চাহিলাম। ঠিক সেই সময়েই অপর্ণা চক্ষু চাহিল, এবং সকরুণ অথচ মৃদুভর্ৎসনাপূর্ণ স্থির দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল। যেন চক্ষু দুটি বলিতেছে, "ছি! আমাকেও প্রতারণা

সন্দেহ? এ সময়েও দ্বিধা ও অবিশ্বাস?" আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; সেই দৃষ্টি যেন আমার মনে তাড়িতের সঞ্চার করিয়া দিয়া আমাকে আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। আমি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলাম, "কি করিতে হইবে, বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।" কুলীনের একাধিক বিবাহের প্রতি আজীবন ঘৃণা ও বিদ্বেষ, মদ্গতপ্রাণ সহধর্ম্মিণীর প্রেমপূর্ণ মুখ, দ্বিধা সন্দেহ, সমস্তই ভাসিয়া গেল।

তার পর? কি করিয়া চেলী ও টোপর পরিলাম, এবং সেই তুষারশীতল হস্ত স্বহস্তমধ্যে রাখিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিলাম, কিছুই মনে নাই। কেবল এই-মাত্র মনে আছে যে, সম্প্রদানান্তে অপর্ণা অতি সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। সম্প্রদানকালে কোনও রকমে তাহাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। —যেন শেষ সঞ্চিত প্রাণবায়ুটুকু নিঃশ্বাসের সহিত আমাকে দিয়া গেল। যেন বলিল, "আমার জীবনদেবতা! তোমাকে ভক্তি প্রীতি প্রেম, সেবাযত্ন, এ সকল কিছুই ত দিবার অবকাশ পাইলাম না। আমি যে চলিলাম! তবে তোমারই নিমিত্ত অতিকষ্টে অতি বেদনায় রক্ষিত জীবনের শেষাংশটুকু তাহার পরিবর্ত্তে উপহার দিয়া চলিলাম; গ্রহণ করিও।"

দূরে ঘণ্টায় বারটা বাজিল। শ্রমে ও অবসাদে ও হৃদয়ের একটা অস্ফুট, অব্যক্ত বেদনায় আমি অবসন্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। পার্শ্বস্থ একটি ঘরে মাদুর পাতা ছিল। আমি কোনও মতে তাহার উপর গিয়া পড়িলাম, এবং শীঘ্রই তন্দ্রাভিভূত হইলাম।

* * * * *

নিস্তব্ধ রজনীর বক্ষ ভেদ করিয়া উত্থিত, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" রবে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম, শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, অপর্ণাকে শয্যাসমেত প্রাঙ্গণস্থ তুলসী-তলায় বাহির করা হইয়াছে; ব্রাহ্মণ তারকব্রহ্মনাম করিতেছেন। আর একবার সেই মুখ দেখিলাম। চক্ষু দুটি ধ্যানস্তিমিতবৎ। নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না, বুঝা যায় না। পরিধানে সেই বিবাহের চেলী। বালার্কসমপ্রভ সিন্দূরবিন্দু তখনও মস্তক ও ললাট উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। ঘনকৃষ্ণ কেশ-রাশি আলুলিত অবস্থায় যেন চিরবিচ্ছেদশোকে সেই শয্যায় পড়িয়া লুটাই-তেছে। দুইটি সূক্ষ্ম অশ্রুধারা কপোলে পড়িয়া শুখাইয়া আসিতেছে। কত ভাব উঠিয়া হৃদয়কে ক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত করিতে লাগিল। কে জানিত যে,

এই জীবন-মরণের—ইহকাল-পরকালের সন্ধিস্থলে এই অপরূপ ভাবে আমাদের সন্ধি হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই বিচ্ছেদ ঘটিবে! যে নির্ম্মম সূত্রকার কোনও এক অজ্ঞাত, রহস্যময় মুহূর্ত্তে আমাদের নিমিত্ত সন্ধি-বিচ্ছেদের এই কঠোর সূত্র রচিয়াছিলেন, সেই ভাগ্যবিধাতাকে মনে মনে একবার প্রণাম করিলাম।

মলাট সমালোচনা।

"সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

"বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি" জিনিসটা এ দেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাত বইয়ের তেরো পাত সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক কিংবা এক হাত বেশীই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন। সেকালে যখন সূত্র আকারে মূল গ্রন্থ রচনা করবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখন ভাষ্যে টীকায় কারিকায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে যখন, যে কথা দু' কথায় বলা যায়, তাই দু'শো কথায় লেখা হয়, তখন সমালোচকদের ভাষ্যকার না হয়ে সূত্রকার হওয়াই সঙ্গত। তাঁরা যদি কোন নব্য গ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন, তা হলেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ঐরূপ করতে গেলে তাঁদের ব্যবসা মারা যায়। সুতরাং তাঁরা যে সমালোচনার রীতিপরিবর্তন করবেন, এরূপ আশা করা নিষ্ফল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুক্তির প্রতিবাদ করে' একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার ঠিক মনে নেই যে, তিনি সাহিত্যেও অত্যুক্তি যে নিন্দনীয়, এ কথাটি বলেছেন কি না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রবাবুর সেই তীব্র প্রতিবাদে বিশেষ কোন সুফল হয়েছে ব'লে মনে হয় না। বরং দেখতে পাই যে, অত্যুক্তির মাত্রা ক্রমে সপ্তমে চড়ে' গেছে। সমালোচকদের অত্যুক্তিটা প্রায় প্রশংসা করবার সময়েই দেখা যায়। বোধ হয়, তাঁদের বিশ্বাস যে, নিন্দা জিনিসটা সোজা কথাতেই করা চলে, কিন্তু প্রশংসাকে ডালপালা দিয়ে পত্রে পুষ্পে সাজিয়ে বার করা উচিত। কেন না, নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটুকারের মর্যাদা অনেক বেশী। কিন্তু আসলে অতিনিন্দা এবং অতি-প্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য। কারণ, অত্যুক্তির "অতি" শুধু সুরুচি এবং

ভদ্রতা নয়, সত্যেরও সীমা অতিক্রম করে' যায়। এক কথায়, অত্যুক্তি মিথ্যোক্তি। মিছা কথা মানুষে বিনা কারণে বলে না। হয় ভয়ে, না হয় কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে। সম্ভবতঃ অভ্যাস-বশতঃ মিথ্যাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকমাত্রায় কেউ কেউ চর্চ্চা করে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলা চর্চ্চা করলে ক্রমে তা' উদ্দেশ্যবিহীন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যেরূপ নির্লজ্জ অতি-প্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তা'তে মনে হয় যে, তার মূলে উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই জিনিসই আছে। এক একটি ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তকের যে সকল বিশেষণে স্তুতিবাদ করা হয়ে থাকে, সেগুলি বোধ হয় সেক্সপীয়র কিংবা কালিদাসের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশী হয়ে পড়ে। শকুন্তলা কিংবা হ্যাম্‌লেট যে বিশেষণের ভার বইতে পারে না, আমাদের একালের সাহিত্যের নলিনী এবং নলিনীরঞ্জনরা হাসিমুখে তাই বহন করেন। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে বইয়ের ভাল রকম কাট্‌তি হয়, সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হয়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রী করা হয়, সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রী করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে একই কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে' পয়লা নম্বরের বলে' দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে' পয়লা নম্বরের বলে' দেব,—এই রকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে, এরূপ সহজেই মনে উদয় হয়। এই কারণেই, পেটেণ্ট ঔষধের মতই, একালের ছোট গল্প কিংবা ছোট কবিতার বই, মেধা, হ্রী, ধী, শ্রী প্রভৃতির বর্দ্ধক, এবং নৈতিক-বলকারক বলে' উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে' পাঠক নিত্যই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হয়। যা' চ্যবনপ্রাশ বলে কিনে আনা যায়, তা দেখা যায়,—প্রায়ই অকালকুষ্মাণ্ডখণ্ডমাত্র।

অতি-বিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম। কারণ, মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল, এবং মানব-মনের সবল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত। যখন আমাদের এক-মাথা চুল থাকে, তখন আমরা কেশ-বর্দ্ধক তৈলের বড় একটা সন্ধান রাখিনে। কিন্তু মাথায় যখন টাক চক্ চক্ করে' উঠে, তখনই আমরা কুন্তল-বৃষ্যের শরণ

গ্রহণ করে' নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পাই, এবং দিই। কারণ, তাতে টাকের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে টাকাও নষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষণ করা। বিজ্ঞাপন প্রতি ছত্রের শেষে প্রশ্ন করে,—"মনোযোগ করেছেন ত?" আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলেও বিজ্ঞাপন চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে' থাকে। ও জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবার যো নেই। কারণ, বিজ্ঞাপন এ যুগে সংবাদপত্রে প্রবন্ধের গা ঘেঁসে থাকে, মাসিক পত্রিকায় শিরোভূষণ হয়ে দেখা দেয়, এক কথায় সাহিত্য-জগতে যেখানেই একটু ফাঁক দেখে, সেইখানেই এসে জুড়ে বসে। ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবচন আছে যে, প্রাচীরের কান নেই। সে বধির হলেও বিজ্ঞাপনের দৌলতে মূক নয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর মিথ্যা কথা তারস্বরে চীৎকার করে' বলে। তাই আজকাল পৃথিবীতে চোখকাণ না বুজে চল্লে বিজ্ঞাপন কারো ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে না। যদি চোখ কাণ বুজে চল, তা হ'লেও বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, পদব্রজেই চল, আর গাড়ীতেই যাও, রাস্তার লোকে তোমাকে বিজ্ঞাপন ছুঁড়ে মারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কথা নেই। ছুঁড়ে মারাই বিজ্ঞাপনের ধর্ম্ম। তার রূপ ছুঁড়ে মারে, তার ভাষা ছুঁড়ে মারে, তার ভাব ছুঁড়ে মারে। সুতরাং বিজ্ঞাপিত জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাকলেও, তার মোড়কের সঙ্গে এবং মলাটের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমি বহু ঔষধের এবং বহু গ্রন্থের কেবলমাত্র মুখ চিনি ও নাম জানি। যা জানি, তারই সমালোচনা করা সম্ভব। সুতরাং আমি মলাটের সমালোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। অন্ততঃ মুখপাতটুকু দোরস্ত করে' দিতে পারলে আপাততঃ বঙ্গ-সাহিত্যের মুখ রক্ষা হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের কেবলমাত্র নাম-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রধানতঃ সেই নাম জিনিসটার সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপ জিনিসটে একেবারে ছেঁটে দেওয়া চলে না বলে' সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলতে চাই। ডাক্তারখানার আলো যেমন লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানারূপ কাচের আবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তেমনই পুস্তকের দোকানে এ কালের পুস্তক পুস্তিকারা নানারূপ বর্ণ-ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। সুতরাং নব্য সাহিত্যের বর্ণপরিচয় যে

কিশোরী

চিত্রকর—জ্যান ব্যাপ্‌টিষ্টা গ্রুজ।

আমার হয়নি, এ কথা বল্‌তে পারিনে। কবিতা আজকাল গোধূলিতে গা-ঢাকা দিয়ে লজ্জানম্র নববধূ সম আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না। কিন্তু গালে আল্‌তা মেখে রাজপথের সুমুখে বাতায়নে এসে দেখা দেয়। বর্ণেরও একটা আভিজাত্য আছে। তার সুসংযত ভাবের উপরেই তার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। বাড়াবাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচয়। আমার মতে, পূজার বাজারের নানারূপ রংচং পোষাক পরে প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যের সমাজে বাহির হওয়া উচিত নয়। তবে পূজার উপহার স্বরূপে যদি তার চলন হয়, তা হ'লে অবশ্য কিছু বলা চলে না। সাহিত্য যখন কুন্তলীন, তাম্বূলীন এবং তরল আল্‌তার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন পুরুষের পক্ষে পরুষ বাক্য ছাড়া তার সম্বন্ধে অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা চলে না। তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, এতে যে আত্মমর্য্যাদার লাঘব হয়, এ সহজ কথাটা কি গ্রন্থকারেরা বুঝতে পারেন না? কবি কি চান যে, তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আল্‌তার সামিল হয়? চিন্তাশীল লেখক কি এই কথা মনে করে' সুখী হন যে, তাঁর মস্তিষ্ক লোকে সুবাসিত নারিকেল তৈল হিসাবে দেখবে? এবং বাণী কি রসনানিঃসৃত পানের পিকের সঙ্গে জড়িত হয়ে লজ্জা বোধ করেন না? আশা করি যে, বইয়ের মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হয়ে উঠবে। অ্যান্টিক কাগজে ছাপানো, এবং চকচকে, ঝকঝকে, তকতকে করে' বাধানো পুস্তকে আমার কোন আপত্তি নেই। দপ্তরীকে আসল গ্রন্থকার বলে' ভুল না করলেই আমি খুসী হই। আমরা যেন ভুলে না যাই, লেখকের রূপই মলাটে শুধু ঢাকাই পড়ে। জীর্ণ কাগজে, শীর্ণ অক্ষরে, ক্ষীণ কালীতে ছাপানো একখানি "পদকল্পতরু" যে শত তকতকে ঝকঝকে চকচকে গ্রন্থের চাইতে শত গুণ আদরের সামগ্রী!

এখন সমালোচনা সুরু করে দেবার পূর্ব্বেই কথাটার একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঐ শব্দটি আমরা ঠিক অর্থে ব্যবহার করি কি না, সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। প্রথমেই, 'সম্' উপসর্গটির যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। শব্দ অতিকায় হ'লে যে তার গৌরব-বৃদ্ধি হয়, এ কথা আমি মানি; কিন্তু, দেহভারের সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যের অর্থভার বেড়ে যায়, তার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুগের লেখকরা মাতৃভাষায় লিখেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে মায়ের দেহপুষ্টি করাও তাঁদের কর্ত্তব্য বলে' মনে করেন। কিন্তু সে পুষ্টিসাধনের

জন্য বহুসংখ্যক অর্থপূর্ণ ছোট ছোট কথা চাই, যা সহজেই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হ'তে পারে। স্বল্পসংখ্যক এবং কতকাংশে নিরর্থক বড় বড় কথার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সে ভাষার বাক্যাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ করবামাত্রই সে আমাদের হস্তগত হয় না। বরং আমাদের অশিক্ষিত হাতে পড়ে প্রায়ই তার অর্থবিকৃতি হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে গোঁজামিলন দেওয়া জিনিসটা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। কবি হোন্, দার্শনিক হোন্, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেক কথাটি ওজন করে' ব্যবহার করতেন। বাক্যের কোনরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ সেকালে অমার্জ্জনীয় দোষ বলে' গণ্য হ'ত। কিন্তু একালে আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড় একটা ধারিনে। নিজের ভাষাই যখন আমরা শব্দ অর্থ বিচার করে' ব্যবহার করিনে, তখন স্বল্পপরিচিত এবং অনায়ত্ত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করে' ব্যবহার করতে গেলে সে ব্যবহার যে বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তা আমি জানি। তবুও একেবারে বেপরোয়াভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে, এই 'সমালোচনা' কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, তার আসল অর্থ ঠিক তা নয়। আমরা কথায় বলি "লেখাপড়া" শিখি; কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়তেই শিখি, লিখতে শিখিনে। পাঠকমাত্রেরই পাঠ্য কিংবা অপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে মতামত গড়ে' তোলবার ক্ষমতা থাক আর না থাক্, মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; বিশেষতঃ সে কার্য্যের উদ্দেশ্য যখন আর পাঁচ জনকে বই পড়ানো, লেখানো নয়। সুতরাং সমালোচিতব্য বিষয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে অভাব থাকলেও সমালোচনার কোন অভাব নেই। এই সমালোচনা-বন্যার ভিতর থেকে একখানিমাত্র বই উপরে ভেসে উঠেছে। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আলোচনা"। তিনি যদি উক্ত নামের পরিবর্তে তার "সমালোচনা" নাম দিতেন, তা হ'লে আমার বিশ্বাস, রূপ, বাগাড়ম্বরে আলোচনার ক্ষুদ্র দেহ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এত গুরুভার হয়ে উঠত যে, উক্ত শ্রেণীর আর পাঁচখানা বইয়ের মত এখানিও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যেত। এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটি

রাখতেই হয়, তা হ'লে 'সম্‌' বাদ দিয়ে 'আলোচনা' রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। যদিচ ও কথাটিকে আমি ইংরাজী criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বলে' মনে করিনে। আলোচনা মানে 'আ' অর্থাৎ বিশেষরূপে, 'লোচন', অর্থাৎ ঈক্ষণ। যে বিষয়ে সন্দেহ হয়, তার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে' দেখার নামই আলোচনা। তর্ক বিতর্ক, বাক বিতণ্ডা, আন্দোলন আলোড়ন প্রভৃতি অর্থেও ঐ কথাটি আজকালকার বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ও কথায় তার কোন অর্থই বোঝায় না। ইংরাজী scrutinize শব্দের 'আলোচনা' যথার্থ প্রতিবাক্য। Criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকলেও 'বিচার' শব্দটি অনেকপরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'সমালোচনা'র পরিবর্তে 'বিচার' যে বাঙ্গালী সমালোচকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখিনে। কারণ, এঁদের উদ্দেশ্য বিচার করা নয়, প্রচার করা। তা' ছাড়া যে কথাটা একবার সাহিত্যে চলে' গেছে, তাকে অচল করার প্রস্তাব অনেকে হয় ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলে' মনে করবেন। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যখন আমরা নির্ব্বিচারে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দকে বঙ্গসাহিত্যের কারাগারে প্রবেশ করিয়েছি, এখন আবার সুবিচার করে' তার গুটিকতককে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় কার্য্য হবে না। আর এক কথা। যদি 'Criticism' অর্থেই আমরা আলোচনা শব্দ ব্যবহার করি, তা হ'লে 'Scrutinize' অর্থে আমরা কি শব্দ ব্যবহার করিব? সুতরাং, যে উপায়ে আমরা মাতৃভাষার দেহপুষ্টি করতে চাই, তা'তে ফলে তার শুধু অঙ্গহানি হয়। বাক্য সম্বন্ধে যদি আমরা একটু শুচিবাতিকগ্রস্ত হতে পারি, তা হলে আমার বিশ্বাস, বঙ্গভাষার নির্ম্মলতা অনেকপরিমাণে রক্ষিত হতে পারে। অনাবশ্যকে যদি আমরা সংস্কৃত ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে সঙ্কুচিত হই, তাতে সংস্কৃত ভাষার উপর অবজ্ঞা দেখানো হবে না, বরং তার প্রতি যথার্থ ভক্তিই দেখানো হবে। শব্দগৌরবে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে' সেই ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব, তা'ও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। আমি বহুদিন থেকে এই মত প্রচার করে' আসছি, কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না। সাহিত্য-জগতে এক শ্রেণীর জীব বিচরণ করে, যাদের প্রাণের চাইতে কান বড়। সঙ্গীতচর্চ্চার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ

করতে পারে না, এবং সে ব্যাপার থেকে তাদের নিরস্ত করবার ক্ষমতাও কারো নেই। প্রতিবাদ করায় বিশেষ কোন ফল নেই জেনেও আমি প্রতিবাদ করি ; কারণ, আজকালকার মতে, আপত্তি নিশ্চিত অগ্রাহ্য হবে জেনেও আপত্তি করে' আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে' নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলে বিবেচিত হয়।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, কোন বিশেষ লেখকের বা লেখার প্রতি কটাক্ষ করে' আমি এ সব কথা বলছিনে। বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা প্রচলিত ধরণ, ফ্যাসান্, এবং ঢংএর সম্বন্ধেই আমার আপত্তি, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। সমাজের কোন চল্‌তি স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে যে আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারি, এমন অন্ধ ভরসা আমি রাখিনে। সকল উন্নতির মূলে থামা জিনিসটে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে এমন কোন সিঁড়ি নেই, যার ধাপে ধাপে পা ফেলে আমরা অবলীলাক্রমে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হতে পারি। মনোজগতে প্রচলিত পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হয়ে শেষে চোরা গলিতে পরিণত হয়, এবং মানুষের গতি আটকে দেয়। বিজ্ঞানে যাকে Evolution বলে, এক কথায় তার পদ্ধতি এই যে, জীব একটি প্রচলিত পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে, ডাইনে কি বাঁয়ে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করে, সাহস করে' সেই পথে চল্‌তে আরম্ভ করে। এই নূতন পথ বার করা, এবং সেই পথ ধরে' চলার উপরেই জীবের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। মুক্তির জন্যে হয় দক্ষিণ নয় বাম মার্গ যে অবলম্বন করতেই হবে, এ কথা এ দেশে ঋষিমুনিরা বহুকাল পূর্ব্বে বলে গেছেন। একেলে বিজ্ঞান এবং সেকেলে দর্শন উভয়ই এই শিক্ষা দেয় যে, সিধে পথটাই মৃত্যুর পথ। সুতরাং বাঙ্গলা লেখার প্রচলিত পথটা ছাড়তে পরামর্শ দিয়ে আমি কাউকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিনে। আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশী পথে চল্‌তে শিখি, তা'তে বাঙ্গলা সাহিত্যের লাভ বই লোকসান নেই। ঐ পথটাই ত স্বাধীনতার পথ, এবং সেই কারণেই উন্নতির পথ, এই ধারণাটি মনে এসে যাওয়াতেও আমাদের অনেক উপকার আছে। আমি জানি যে, সাহিত্যে কিংবা ধর্ম্মে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র দু চার জন মহাজনদেরই থাকে, বাদ বাকী আমরা পাঁচ জনে সেই মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে চল্‌তে পার্‌লেই আমাদের জীবন সার্থক

হয়। গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়ের অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্যও বটে; কেন না, পৃথিবীর সকল ভেড়াই যদি মেড়া হয়ে ওঠে ত ঢুঁমারামারি করেই মেষ-বংশ নির্ব্বংশ হবে। উক্ত কারণেই আমি লেখবার একটা প্রচলিত ধরণের বিরোধী হলেও, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের বিরোধী নই। আমরা কেউ ভাষা জিনিসটে তৈরি করিনে, সকলেই তৈরী ভাষা ব্যবহার করি। ভাষা জিনিসটে কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে একটি জাতির হাতে গড়া। কেবলমাত্র মনোমত কথা বেছে নেবার এবং ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করে' সেই বাছাই কথাগুলিকে নিজের পছন্দমত পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবার স্বাধীনতাই আমাদের আছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা জহুরী, তাঁরা এই চলতি কথার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করেন, এবং শিল্পগুণে গ্রথিত করে' দিব্য হার রচনা করেন। নিজের রচনাশক্তির দারিদ্র্যের চেহারাই আমরা মাতৃভাষার মুখে দেখ্‌তে পাই, এবং রাগ করে' সেই আয়নাখানিকে নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হই, এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের সংস্কৃত দর্পণের সাহায্যে মুখরক্ষা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। এক রকম কাচ আছে, যাতে মুখ মস্ত দেখায়—কিন্তু সেই সঙ্গে চেহারা অপরিচিত বিকটাকার ধারণ করে। আমাদের নিজেকে বড় দেখাতে গিয়ে যে আমরা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করি, তাতে আমাদের কোন লজ্জাবোধ হয় না।—এখানে কেউ প্রশ্ন কর্‌তে পারেন যে, প্রচলিত ভাষা কাকে বলে? তার উত্তরে আমি বলি, যে ভাষা আমাদের নিকট সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি। তা খাঁটী বাঙ্গলাও নয়, খাঁটী সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনরূপ খিচুড়ীও নয়। যে সংস্কৃতশব্দ প্রকৃত কিংবা বিকৃত রূপে বাঙ্গলা কথার সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাংলা বলেই জানি, এবং মানি। কিন্তু কেবলমাত্র নূতনত্বের লোভে নতুন করে যে সকল সংস্কৃত শব্দকে কোন লেখক জোর করে বাঙ্গলা ভাষার ভিতর প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ খাপ্‌ খাওয়াতে পারেন নি, সেই সকল শব্দকে ছুঁতে আমি ভয় পাই। এবং যে সকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টতঃ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সকল শব্দ যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে আমি লেখকদের সতর্ক হতে বলি। নইলে বঙ্গভাষার বনলতা যে সংস্কৃত ভাষার উদ্যানলতাকে তিরস্কৃত কর্‌বে, এমন দুরাশা আমার মনে স্থান পায় না। শব্দকল্পদ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে

পড়েছে, তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনও আপত্তি নেই। তলার কুড়োও, কিন্তু সেই সঙ্গে গাছেরও পেড়ো না। তাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, তার অনুরূপ ফললাভ হবে না।

শুধু গাছ থেকে পাড়া নয়, একেবারে তার আগ্‌ডাল থেকে পাড়া গুটি-কতক শব্দের পরিচয় আমি সম্প্রতি বইয়ের মলাটে পেয়েছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার দু একটি কথা বক্তব্য আছে। যাঁরা "শব্দাধিক্যাৎ অর্থাধিক্যং" মীমাংসার এই নিয়ম মানেন না, এবং তার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে "অধিকন্তু ন দোষায়" এই উদ্ভট বচন অনুসারে কার্য্যানুবর্তী হয়ে থাকেন, তাঁরাও একটা গভীর বিবর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহসী হন না। এমন সাহিত্য-বীর বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে খুব কম আছে, যারা বঙ্গরমণীর মাথায় "ধম্মিল্ল" চাপিয়ে দিতে সঙ্কুচিত না হয়, যদিচ সে বেচারারা নীরবে পুরুষের সব অত্যাচারই সহ্য করে থাকে। বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও "প্রাতিবেশিক" বাক্যটি ম-মুচের ন্যায় কটু ভাষার হিসাবে গণ্য করে, চোর এবং বিচারপতিকে একই আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। "প্রাতিবেশিক" বেচারা বাঙ্গালী জাতির নিকট এতই অপরিচিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার ঐরূপ লাঞ্ছনাতে কেউ আপত্তি করেনি। কিন্তু আজকাল ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দও, নবীন গ্রন্থের বক্ষে কৌস্তুভ মণির মত বিরাজ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দু একটির উল্লেখ করব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ভাবুক কবি। তাঁর ভাল মন্দ মাঝারি সকল কবিতাতেই তাঁর মনের কান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তাঁর রচিত এমন একটি কবিতাও নেই, যার অন্ততঃ একটি চরণেও স্বভাবকবিত্বের চিহ্ন না লক্ষিত হয়। সত্যের অনুরোধে এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল। "এষা" শব্দের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, এবং তার নামও আমি পূর্বে কখন শুনিনি। কাজেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে হয় ত "আয়েষা" নয় ত, "এসিয়া" কোনরূপ ছাপার ভুলে "এষা" রূপ ধারণ করেছে। আমার এরূপ সন্দেহ হবার কারণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যখন "আয়েষা"কে নিয়ে নভেল লিখেছেন, তখন তাকে নিয়ে অক্ষয়কুমার যে কবিতা রচনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কারণ কি থাকতে পারে?

“আবার বলি ওসমান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর”—এই পদটির উপর রমণী-হৃদয়ের সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ খাড়া করা কিছু কঠিন নয়। তার পর “এসিয়া”—প্রাচীর এই নবজাগরণের দিনে তার প্রাচীন নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য যে কবি উৎসুক হয়ে উঠবেন, এও ত স্বাভাবিক। যার ঘুম সহজে ভাঙ্গে না, তার ঘুম ভাঙ্গাবার দুটিমাত্র উপায় আছে, হয় টেনে হিঁচড়ে নয় ডেকে। এসিয়ার ভাগ্যে টানা হেঁচড়ানো ব্যাপারটা ত পুরো দমে চল্‌ছে, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্য হল না, তখন ডাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এসিয়াকে কাব্যে দর্শনে নানারূপ ঘুমপাড়ানী মাসীপিসীর গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন আবার জাগাতে হলে এ যুগের কবিরা “জাগর” গান গেয়েই তাকে জাগাতে পারবেন। সে গান অনেক কবি সুরে বেসুরে গাইতেও সুরু করে দিয়েছেন। সুতরাং আমার সহজেই মনে হয়েছিল যে, অক্ষয়কুমার বড়ালও সেই কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন শুন্‌ছি যে ও ছাপার ভুল নয়, আমারই ভুল। প্রাচীন গাথার ভাষায় নাকি “এষ,”র অর্থ অন্বেষণ। ললিতবিস্তর প্রমুখ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন গাথার ভগ্নাংশ সকল স্থানে স্থানে উদ্ধৃত আছে। সেই যদি প্রকৃত নমুনা হয়, তা হলে গাথা পদ্যও নয়, গদ্যও নয়, এবং তার ভাষা ঠিক সংস্কৃতও নয়, ঠিক বৈদিকও নয়। একালের লেখকরা যদি শব্দের অন্বেষণে সংস্কৃত যুগ ডিঙ্গিয়ে একেবারে প্রাচীন গাথা-যুগে গিয়ে উপস্থিত হন, তা হলে একেলে বঙ্গ-পাঠকদের উপর একটু অত্যাচার করা হয়; কারণ, সেই শব্দের অর্থ-অন্বেষণে পাঠক যে কোন দিকে যাবে, তা স্থির করতে পারে না। আজকালকার বাঙ্গলা বুঝতে অমরের সাহায্য আবশ্যক, তার পর যদি আবার যাস্ক চর্চ্চা করতে হয়, তা হলে বাঙ্গলা সাহিত্য পড়বার আমরা কখন অবসর পাব? যাস্কের সাহায্যেও যদি তার অর্থবোধ না হয়, তা হলে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা যে আমরা ত্যাগ করব, তাতে আর সন্দেহ কি? অর্থবোধ হয় না বলে যখন আমরা আমাদের পরকালের সদ্গতির একমাত্র সহায় যে সন্ধ্যা, তারি পাঠ বন্ধ করেছি, তখন ইহকালের ক্ষণিক সুখের লোভে যে আমরা গাথার শব্দে রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য পড়ব, এও আশা করা যেতে পারে না। তা ছাড়া বৈদিক এবং অতিবৈদিক ভাষা থেকে যদি আমরা বাক্যসংগ্রহ করতে আরম্ভ করি, তা হলে তান্ত্রিক ভাষাকেই বা ছাড়ব কেন? আমার লিখিত নতুন বইখানির নাম যদি আমি “ফেৎকারিণী”,

“ডামর” কিংবা “উড্ডীশ” দিই, তা হলে কি পাঠকসম্প্রদায় খুব খুসী হইবেন?

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুস্তিকাগুলির নামকরণ বিষয়ে যে অপূর্ব্বতা দেখিয়ে থাকেন, তা’ আমাকে ভীত না করুক, বিস্মিত করে। আমি সাহিত্যের বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যবসা খুলে বসিনি। সুতরাং সুধীন্দ্র বাবুর রচনার দোষগুণ দেখানো আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। একমাত্র মলাটে তাঁর লেখা যেটুকু আত্মপরিচয় দেয়, সেইটুকু আমার বিচারাধীন। ‘মঞ্জুষা’ ‘করঙ্ক’ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যে আমাদের একেবারে মুখ-দেখাদেখি নেই, এ কথা বলতে পারিনে। তা হ’লেও স্বীকার করতে হবে যে, অন্ততঃ পাঠিকাদের নিকট ও পদার্থগুলি যত সুপরিচিত, ও নামগুলি তাদৃশ নয়। তা ছাড়া ঐরূপ নামের যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে, তাও আমার মনে হয় না। আমাদের কল্পনাজাত বস্তু আমরা প্যাটরায় পূরে সাধারণের কাছে দেইনে, বরং সত্য করে’ বল্‌তে গেলে মনের প্যাটরা থেকে সেগুলি বা’র করে’ জনসাধারণের চোখের সমুখে সাজিয়ে রাখি। করঙ্কের কথা শুনলেই তাম্বূলের কথা মনে হয়। পানের খিলির সঙ্গে সুধীন্দ্র বাবুর ছোট গল্পগুলির কি সাদৃশ্য আছে, জানিনে। করুণরস এবং পানের রস এক জিনিস নয়। আর একটি কথা। তাম্বূলের সঙ্গে সঙ্গে চর্ব্বিতচর্ব্বণের ভাবটা মানুষের মনে সহজেই আসে। সে যাই হোক্‌, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, সুধীন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত “বৈতানিক” শব্দ, আমি বৈতালিক শব্দের ছাপাভুল মনে করেছিলুম। হাজারে ন’শো নিরনব্বই জন বাঙ্গালা পাঠক যে ও শব্দের অর্থ জানেন না, এ কথা বোধ হয় সুধীন্দ্র বাবু অস্বীকার করবেন না। আমার যত দূর মনে পড়ে, তা’তে কেবলমাত্র ভৃগুপ্রোক্ত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে এক স্থলে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ জানা আবশ্যক মনে করিনি। এইরূপ নামে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং তার পরিচয় গোপন করাই হয়। বাঙ্গালা সরস্বতীকে ছদ্মবেশ না পরালে যে তাঁকে সমাজে বা’র করা চলে না, এ কথা আমি মানিনে।

নিজের লেখার উপর লোকের যে অধিকার আছে, পরের লেখার উপর ঠিক সেই রকম সমান অধিকার আছে, এ কথা বোধ হয় কোন লেখকই বিনা আপত্তি’তে গ্রাহ্য করে নেবেন না। নিজের ছেলের মত নিজের বইয়ের

আমরা যা' খুসী নাম দিতে পারি, কিন্তু পরের লেখার যদি আমরা কেবলমাত্র সংগ্রহকার হই, তা হলে তার নামকরণ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যা' তুলে রাখবার মত জিনিস, যাকে আমরা ধনস্বরূপ গণ্য করি, তাই আমরা সংগ্রহ করি। ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ ধূলো মাটী জড় করে' আনন্দ অনুভব করে না। সুতরাং, সংগৃহীত স্বনামধন্য লেখার আমাদের দত্ত নামেতে কিছু সম্মান বাড়ে না। সংগ্রহকে সংগ্রহ বলাই যথেষ্ট। কিন্তু কোন একটি ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবুর কতকগুলি সর্ব্বলোকবিদিত কবিতা একত্রিত করে', তার "চয়নিকা" নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ শব্দটি বাঙ্গলা ভাষায় নেই। সংস্কৃত ভাষায় আছে কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান আমার লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে। তাই 'চয়ন' ব্যাকরণের নিয়ম মেনে "চয়নিকা"য় রূপান্তরিত হতে পারে কি না, জানিনে। তা হ'লেও ঐ কথাটা সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে। 'চয়নিকা' অর্থে সাজি, কি চালুনী, অর্থাৎ যাহাতে কিংবা যাহা দ্বারা চয়ন করা যায়, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ পদার্থটাকে বোঝায়, তার প্রমাণ কথাটির মধ্যে পাওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে, চয়নের পৃষ্ঠে এই "ক" প্রত্যয়টি হয় স্বার্থে, নয় স্বল্পার্থে করা হয়েছে। যার নাম ভাজা চাল, তারই নাম মুড়ি, হয় এই হিসাবে চয়ন 'চয়নক' হয়েছে, নয় সংক্ষিপ্ত করে একত্রিত করা হিসেবে ঐ রূপ ধারণ করেছে। তার পর, শব্দটিকে বিশেষরূপে মুখপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর 'আকার' দেওয়া হয়েছে। শব্দরাজ্যে স্ত্রীলিঙ্গের প্রতি লেখকদের অতিরিক্ত আসক্তি জন্মালে, ভাষার ব্যভিচার ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা। ফলে ঘটছেও তাই। আজ কাল আমাদের সাহিত্যে মধুর রসের অতিরিক্ত চর্চ্চাবশতঃ ভাষার সুনীতি রক্ষা হয় না। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে সুরুচির ন্যায় সুনীতি বলেও একটি জিনিস আছে। ব্যাকরণ এবং অভিধানের নিয়ম রক্ষা করার নাম ভাষার সুনীতি। অনাবশ্যকে, স্বার্থে, স্বল্পার্থে, কিংবা অনর্থে 'ক' প্রত্যয়ের বাড়াবাড়িটে না থামাতে পারলে ক্রমে তা 'ইংরেজী পেটেণ্ট ঔষধে'র ইন্ প্রত্যয়ের মত সকল ভদ্র শব্দের পিঠে চড়ে বসবে। মণ্টীন, কুইনীন, ফস্ফরীণ, হ্যাজ্‌লীন, ভ্যাজ্‌লীন, গ্লিসরীন, হাবুলীন ইত্যাদি আমাদের সকলের নিকট বিশেষ সুপরিচিত। এমন কি, অনেকের বিশ্বাস যে, ঔষধের

পশ্চাৎদেশে এ 'ইন্' যুক্ত না থাকলে আমাদের কোন রোগই সারে না কিন্তু ইন্-প্রিয়তা যে এ যুগের একটা নতুন মানসিক রোগ, এ জ্ঞানটা বোধ হয় সকলের নেই। যেমন ছোট ছেলের বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা শব্দের সঙ্গে অনুস্বার যুড়ে দিলেই সংস্কৃত হয়, তেমনই আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী পুরুষেরও বিশ্বাস যে, কোন একটা পদার্থের সঙ্গে 'ইন্' যুড়ে দিলে তার মাহাত্ম্য বাড়ে। সেই কারণেই কুন্তলীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কুন্তলীন যে কেবলমাত্র চুল চেপে ধরেছে, তা নয়, আমাদের মাথারও উপরেও তার প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। কুন্তলীন-সাহিত্য নামে একটি নব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যা পুরোপুরি রকম উপভোগ করতে হলে পূর্ব্বে মাথায় কুন্তলীন মাখা আবশ্যক। কুন্তলীনের উদাহরণটি একটু জোর করে টেনে আনবার উদ্দেশ্য আমার সেই প্রথম কথার প্রমাণ দেওয়া। সে কথা এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ভিতর সমালোচনার মত নামকরণেও বিজ্ঞাপনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের আর পাঁচটা দোষের ভিতর একটা হচ্ছে তার ন্যাকামী। ন্যাকামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্য্যের ভাণ এবং ভঙ্গী। ন্যাকামী জিনিসটে আমার একেবারেই অসহ্য। এবং বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, তাই দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হয়ে পড়েছি যে, কঠোরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্রও দ্বিধা করিনে। কথায় বলে, "যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে"; কিন্তু শর্করার ভাগ অতি বেশি হলে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হয়ে ওঠে, তখন ঐ পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্যও যে অরুচিকর হয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কি? লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তা হলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রাণবান হয়, তা হলে তাহার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা আপশোষের বিষয়। যখন বঙ্গসাহিত্যে অন্ধকার আর "বিরাজ" করবে না, তখন এ বিষয়ে আর কারও "মনোযোগ আকর্ষণ" করবার দরকারও হবে না।

বীরবল।

প্রত্নবিদ্যা।

"পুরাণে প্রতন-প্রত্ন পুরাতন-চিরন্তনাঃ॥"

আজ যাহা পুরাতন, একদিন তাহা নূতন ছিল। আজ যাহা নূতন, একদিন তাহা পুরাতন হইবে। তথাপি নূতন-পুরাতনের সম্বন্ধ-সূত্র বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। সুতরাং পুরাতন যতই পুরাতন হউক না কেন, তাহার পরিচয় লাভের প্রয়োজন আছে। মানবমন শিক্ষায় ও সভ্যতায় যতই বিস্তৃতি লাভ করে, পুরাতনের পরিচয় লাভের জন্য ততই লালায়িত হইয়া থাকে। পুরা-প্রীতি,—যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহার অনুসন্ধান-লালসা,—সভ্য মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। কেহ জ্ঞানলাভের আশায়, কেহ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আকাঙ্খায়, কেহ বা কেবল পুরাতনের স্বপ্নমোহে, পুরাতনের পরিচয় লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন,—তাহা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সহজসাধ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

যে বিদ্যার সাহায্যে পুরাতনের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার নাম প্র ত্ন বি দ্যা। অল্পকাল পূর্ব্বেও তাহা একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইত না। যে কেহ, যে কোন ভাবে, তাহার আলোচনা করিত। এখন দিন ফিরিয়াছে; জ্ঞানানুরাগ বাড়িয়াছে; এখন আর যে কেহ যে কোন ভাবে পুরাতনের আলোচনা করিতে সাহস করে না;—এখন কোন কোন স্থানে তাহার যথাযোগ্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনারও সূত্রপাত হইয়াছে। সভ্য-সমাজের সুধীবৃন্দ বুঝিয়াছেন,—অধিকাংশ বিদ্যায় আলোচ্য বিষয় বাহ্যবস্তু; কেবল প্রত্নবিদ্যারই আলোচ্য বিষয় পৃথক্। বাহ্যবস্তুর সাহায্যে মানব-প্রকৃতির ও মানব-মনের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রের অনুসন্ধান করাই তাহার প্রকৃত লক্ষ্য।

এক সময়ে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। আমাদের দেশে এখনও বিলক্ষণ মতভেদ আছে। এখনও আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্যের নিকটেও প্রত্নবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন উপহাসের বিষয়;—কাহারও কাহারও নিকটে তাহা নিতান্ত খেয়াল বলিয়াই পরিচিত। তথাপি এই বিদ্যার অনুশীলনে পাশ্চাত্য সভ্য সমাজ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছে; যাহাদের সহিত আমাদের দেশের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তাহারাও আমাদের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে

অগ্রসর হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমাদের দেশেও কেহ কেহ ইহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ইহাকে একটি শুভ লক্ষণ বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

প্রথম উদ্যমে ভ্রম ক্রটি অপরিহার্য্য—বাঙ্গালা লেখকগণের গ্রন্থে বা প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইলে, তাহাকে তেমন দোষের কথা বলিয়া তিরস্কার করা চলে না। কারণ, প্রত্নবিদ্যার প্রকৃত লক্ষ্য কি, তাহার প্রকৃত অনুসন্ধান প্রণালীই বা কিরূপ, তদ্বিষয়ে আমাদের মাতৃভাষায় ও পর্য্যন্ত একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই; অন্যান্য ভাষায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বজন-পরিচিত হইতে পারে নাই। সুতরাং আমাদের দেশে প্রত্নবিদ্যার আলোচনায় কিছু কিঞ্চিৎ অনধিকার-চর্চ্চার আড়ম্বর উৎসাহ লাভ করিতেছে।

ইহা অসঙ্গত হইলেও, নূতন নহে। এক সময়ে পাশ্চাত্য সভ্য সমাজেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তদ্দেশে অনধিকারচর্চ্চা-নিবারণের এক অব্যর্থ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে উপায় সহজ এবং প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ। প্রত্নবিদ্যার লক্ষ্য কি, তাহার অনুসন্ধান-পদ্ধতিই বা কিরূপ,—তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করাই সেই সহজ উপায়। যাঁহারা সেই উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল মিশরে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া এক্ষণে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশরতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার গ্রন্থ * ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং সুলভ হইলেও, আমাদের দেশে সর্ব্বজন পরিচিত হইতে পারে নাই।

এই গ্রন্থের প্রথমেই অধিকার-বিচারের কথা। সকল বিদ্যার অনুশীলনেই অধিকারী-অনধিকারী আছে; কেবল প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনেই তাহা নাই এরূপ তর্ক আদৌ উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে তাহাই উত্থাপিত হইয়া থাকে। তাহার প্রভাবে যে কেহ লিখিতেছেন,—যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন,—অনেক স্থলে নিতান্ত নির্লজ্জের মত লিখিতেছেন! তথাপি তাহা অল্প কথা। শিক্ষার ক্রটি সারিয়া লওয়া যায়। চরিত্রের ক্রটি থাকিলে,

* Methods and Aims in Archeology by W. M. Flinders Petrie D.C.L. L.L.D. Ph. D. & C.

Macmillian & Co (1904).

সহজে সারিয়া লওয়া যায় না। তজ্জন্যই অধ্যাপক পেট্রি অধিকার বিচারে হস্তক্ষেপ করিয়া, চরিত্র-বিচারকেই সর্ব্বাগ্রে স্থান দান করিয়াছেন।

সকলের নিকট সমান সত্যনিষ্ঠার আশা করা চলে না। যাহারা করতালি-লোলুপ, তাহারা অতি সহজে সত্যনিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে। যাহারা জীবিকা-লোলুপ,তাহারাও সকল সময়ে সমান ভাবে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। ইহা বুঝাইবার জন্য অধ্যাপক পেট্রি লিখিয়াছেন—"সকল বিষয়েই কর্ম্মিগণের মধ্যে একটি মজ্জাগত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ জীবিকা-লোলুপ,—বাঁচিবার জন্যই কর্ম্ম করিতে বাধ্য। কেহ কর্ম্ম-লোলুপ,—কর্ম্ম করিবার জন্যই জীবন ধারণ করে। প্রথম শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্য পেশাদারী; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের লক্ষ্য জ্ঞানলাভ বা সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ। যে সকল যুবক ব্রাণ্ডি-সোডা পান করে, মনিবকে ঠকাইয়া মিথ্যা খরচ লিখিয়া হিসাবের ফর্দ্দ রচনা করে, অথবা যাহারা কেবল উপাধির দোহাই দিয়া কিম্বা ঐশ্বর্য্যের আস্ফালনে আপন আপন অহমিকার কিম্বা স্বার্থের চরিতার্থতা সাধন করিতে চায়, তাহারা যেন প্রত্নবিদ্যার অনুশীলন-ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকে।"

অধ্যাপক-প্রবরের এই উক্তি যতই কঠোর হউক, ইহা শিক্ষাপ্রদ। একে অনুসন্ধানকারীর সংখ্যা অল্প; তাহাতে আবার পেশাদারের সংখ্যাই অধিক। যাহারা পেশাদার নয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপন অহমিকার অথবা স্বার্থের চরিতার্থতা সাধনের জন্যই অধিক লালায়িত। এই সকল কারণে, প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনে অপরিহার্য্য অন্তরায়ের অভাব নাই। যাহারা বেতন লইয়া কাজ করে, অথবা দেশের লোকের নিকট চাঁদা কুড়াইয়া কাজ চালায়, তাহাদিগের পক্ষে মনিবের মনোরঞ্জনের লালসা, আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপনের লালসা, এবং যে কোনও উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লালসা বড় স্বাভাবিক। তাহারা বিজ্ঞাপন চায়, চাটুকার চায়, যশের ডঙ্কা বাজাইবার জন্য লোক ভাড়া করে; যাহারা একটু চতুর, তাহারা চেলা সংগ্রহ করিয়া, তাহার সাহায্যে আপন অভিমত প্রচারিত করিতে থাকে। এই সকল লোক চাকরী বা ব্যবসায়টা বজায় রাখিবার জন্যই প্রাণপণ করে। ভুল করিলে, ভুল স্বীকার করে না; ভুল দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ না হইয়া, উত্যক্ত হইয়া উঠে। প্রত্নবিদ্যার যাহা হয় হউক, আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা পাইলেই ইহারা কৃত-

কৃতার্থ হয়; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ত ভুল করিলেও, বিজ্ঞতার আড়ম্বরে ভুলগুলিকে চাপা দিয়া রাখিতে চায়।

প্রত্নবিদ্যার অনুশীলন বড় ব্যয়সাধ্য। অনেক সময়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও ফল হয় না। তথাপি কেবল অর্থের বলে সকল বিষয়ে ফললাভ করিবার আশা নাই,—মনস্বিতাই প্রধান অবলম্বন। অনেকে ইহা বিস্মৃত হইয়া, অর্থবলে গ্রন্থ লিখাইয়া লইতে গিয়া কিরূপ গ্রন্থ লাভ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের দেশেও নিতান্ত অপরিচিত নাই।

অনেক শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে, প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনে অধিকার লাভ করা যায় না। কিন্তু সকল শাস্ত্রের উপর অভিজ্ঞতার মর্য্যাদাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাহাদের অভিজ্ঞতা নাই, তাহারা অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বে শিখাইতে বসিলেই, তাহারা পদে পদে ভ্রমপ্রমাদে বিজড়িত হইয়া যাইবে। গৃহে বসিয়া, পুস্তকালয়ে যাতায়াত করিয়া, অথবা অভিজ্ঞগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, এই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। অনুসন্ধানক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন না করিলে, অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। অভিজ্ঞতার প্রসাদে দৃষ্টিশক্তি নিপুণতা লাভ করে। অনভিজ্ঞের এবং অভিজ্ঞের পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য কত অধিক;—পদে পদে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক পেট্রি তাহার অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অভিজ্ঞতা কেবল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা নয়। ইতিহাসেও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে ইতিহাস পাঠ করিয়া, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, উপাধি লাভ করিলেও কিছু হয় না। অভিজ্ঞের দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। না করিলে, অনেক আবিষ্কৃত তথ্যের প্রকৃত মর্ম্ম অপরিজ্ঞাত বা অনাদৃত থাকিয়া যাইতে পারে; অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তও প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবার আশঙ্কা থাকে।

অভিজ্ঞতা চাই, নানা শাস্ত্রে অধিকারও চাই। উভয়ের সম্মিলিত শক্তিতেই অনুসন্ধানকারী প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত করিবার আশা করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অনভিজ্ঞের সংখ্যাই অধিক। এক হিসাবে সকলেই অনভিজ্ঞ;—কেহ অধিক, কেহ বা অল্প। প্রত্নবিদ্যার যে কোনও বিভাগের আলোচনা করিলেই প্রতি পদে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যায়। সম্প্রতি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার উপলক্ষে তাহা অতিমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে সকল পুরাতন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আলোচনা করিবামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অল্প লিপিই বিশুদ্ধ ভাবে পঠিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের দেশের লিপি, আমাদের দেশের ভাষায় রচিত, আমাদের দেশের অক্ষরেই ক্ষোদিত; অথচ বিদেশের লোকেই তাহার পাঠোদ্ধারে ও ব্যাখ্যাকার্য্যে সমধিক সাফল্যলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন! প্রথমে ইহা একটি অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রাচীন লিপিতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়,—আমাদের এরূপ দুর্গতির প্রকৃত কারণ আমাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

যিনি সংস্কৃত ভাষা জানেন না, জানিবার জন্যও চেষ্টা করেন না, তিনি অক্ষর পাঠে কথঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিলেও. পাঠোদ্ধারে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, অথচ অক্ষরপাঠে অনভ্যস্ত, তিনি ব্যাখ্যাসৌকর্য্যের লালসায় মনঃকল্পিত পাঠ যোজনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। তাহা আরও প্রবল কারণ। আমরা সকলেই অল্লাধিক মাত্রায় চিরাগত সংস্কারের পক্ষপাতী, জনশ্রুতির ক্রীতদাস; বংশমর্য্যাদার ও সম্প্রদায়-মর্য্যাদার পৃষ্ঠপোষক। প্রাচীন লিপি হইতে আমাদের সংস্কারের অনুরূপ অর্থের সন্ধান করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাচীন লিপিতে কি আছে, নির্লিপ্ত ভাবে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমরা তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মনের মত করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্যই কষ্টকল্পনার শরণাপন্ন হইয়া পড়ি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই সকল সংস্কারের অতীত। তজ্জন্য তাঁহারা অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন; নির্লিপ্ত ভাবে পাঠোদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যাসাধন করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ ঘটিলেও, তাহার সঙ্গে অন্য কিছুরই সম্পর্ক থাকে না;—ভ্রম স্বীকার করিতেও ইতস্ততঃ ঘটে না।

প্রাচীন লিপিগুলি সকল সময়ে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কখন কখন কালপ্রভাবে অনেক অক্ষর বিলুপ্ত হইবার পর, তাহা আমাদের হস্তগত হয়। এই সকল লিপিতে অনেক সমসাময়িক ব্যক্তির বা ঘটনার ইঙ্গিতমাত্রই ব্যক্ত হয়। সুতরাং লিপিকাল স্থির করিতে না পারিলে, যাহা

লিখিত আছে, কেবল তাহারই সাহায্যে সকল তথ্য অবগত হইবার উপায় থাকে না। কিন্তু লিপিকাল স্থির করিবার অন্তরায়ের অভাব নাই। অনেক লিপিতেই কোনরূপ সুপরিচিত বা প্রচলিত সম্বৎসরের উল্লেখ থাকে না। কোন কোন লিপিতে রচনাকাল-বিজ্ঞাপক কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না; কোন কোন লিপিতে তাৎকালিক রাজার রাজ্যাঙ্ক মাত্র উৎকীর্ণ থাকে। এরূপ অবস্থায় লিপিপ্রণালীর সাহায্যেই রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারে, অন্য উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা লিপিতত্ত্বের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। বহুসংখ্যক প্রাচীন লিপির অক্ষরবিন্যাস-প্রণালীর সমালোচনা করিয়া কোন্ যুগে অক্ষরের এবং মাত্রার আকার কিরূপ ছিল, তাহা স্থির করিয়া লইয়া, তাহারই সাহায্যে লিপিকাল নির্ণয় করিতে হয়। নিতান্ত শিক্ষানবীশের পক্ষে এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে দুইচারিজন বাঙ্গালী ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ লিপিপাঠবিদ্যাকে কৃপণের ধনের ন্যায় লুকাইয়া রাখেন; দেশের লোককে তদ্বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রদান করেন না! লিপিকরের ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গীর প্রভাবে এবং যে প্রদেশে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল সেই প্রদেশের প্রচলিত লিপিভঙ্গীর প্রভাবে, একই যুগের লিপিতেও সকল সময়ে সকল স্থানে একরূপ অক্ষরের বা মাত্রার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন লিপিপাঠে সাফল্য লাভ করা যে কত কঠিন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রাচীন লিপির ন্যায় প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন দেব-মূর্ত্তি, প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতেও পুরাকালের বিবিধ বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখকের নিকটেই মুদ্রাতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত। তদ্বিষয়ে এখনও আমাদের ভাষায় একখানি গ্রন্থও লিখিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিবার সুযোগ অনেকের পক্ষেই নিতান্ত দুর্লভ। এরূপ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হয়,—অনভিজ্ঞের হাতে পড়িয়া প্রাচীন মুদ্রা নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রচারিত করে। প্রাচীন দেব মূর্ত্তি লইয়া যাঁহারা সচিত্র-প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহার এক শ্রেণী আবার শিল্পসৌন্দর্য্যের উপাসক। দেবমূর্ত্তির আলোচনা-বিজ্ঞাপক যে কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, বিষয়টি যতই মনোজ্ঞ হউক

না কেন, তাহার আলোচনা এখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরোহণ করিতে পারে নাই ;—এখনও কল্পনা-জল্পনাই প্রাধান্য রক্ষা করিতেছে। সময়ে সময়ে দেবমূর্ত্তির আলোচনায় যে সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়া থাকে, এবং তাহা লইয়া যে সকল বাদ প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা হইতে অন্তঃসারশূন্য বাচালতারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির আলোচনা আবার ইহা অপেক্ষাও হাস্যাস্পদ।

আমাদের ইতিহাস নাই। কিন্তু ইতিহাসের অনেক উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সঙ্কলন ও সমালোচনা করিতে না পারিলে, আমরা উপকার লাভ করিতে পারিব না। তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, অনধিকার চর্চ্চাকে নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে সে কর্ত্তব্য পালিত হইয়া থাকে। সেখানে যে কোন গ্রন্থ প্রশংসা লাভ করে না। কিন্তু আমাদের দেশে যে কোনও গ্রন্থই প্রশংসা লাভ করে ;—যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহারাও যে কোনও গ্রন্থেরই ভূমিকা লিখিয়া দেন ; পত্র সম্পাদকগণের প্রবন্ধদৈন্যে যে কোনও প্রবন্ধই আগ্রহের সহিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং যে কোনও গ্রন্থের উপর অবলীলাক্রমে পরিষদের মোহর মুদ্রিত হইয়া যায়! এই সকল অত্যাচারে প্রত্ন বিদ্যা নিতান্ত উপহাসের বিষয় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া পড়িতেছে!

কাহাকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তদ্বিষয়েও আমাদের দেশে মত ভেদের অভাব নাই। যে দেশ ন্যায় শাস্ত্রের পর্য্যাপ্ত আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই দেশে প্রত্নবিদ্যার আলোচনায় যে সকল বিষয় মুখ্য প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময় উপস্থিত হয় না, লজ্জা উপস্থিত হয়। প্রত্নবিদ্যার আলোচনায় এখন আর অন্য কোনও সভ্য দেশে মূর্খতা অতদূর আড়ম্বর প্রকাশ করিতে সাহস করে না। সুতরাং যাহা আমাদের দোষ বলিয়া ধরা পড়িবে, তাহা চিরাভ্যস্ত বা চিরপ্রিয় হইলেও, তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের হাতে পড়িয়া প্রত্নবিদ্যা মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে না।

প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকেও বিবিধ বিদ্যার পারদর্শী হইয়া, স্বদেশের সর্ব্বত্র তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে ; ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপদ্ধতির ন্যায় প্রমাণ পর্য্যালোচনায় সত্য নির্ণয় করিতে হইবে, এবং যাহা সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, তাহার উপায়েই ইতিহাসের ভিত্তি

সংস্থাপিত করিতে হইবে। একের পক্ষে এতগুলি বিদ্যা অধিগত করা অসম্ভব হইলেও, অনেকের সমবেত চেষ্টায় তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও প্রত্নবিদ্যানুশীলনে সমবেত চেষ্টার অধিক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। সমবেত চেষ্টায় সত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে, ব্যক্তিগত যশোলিপ্সাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়;—কে কতটুকু সত্য নির্ণয় করিলেন, কে তজ্জন্য কতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিলেন, তাহা বিস্মৃত হইতে হয়;—সকলের সমবেত শক্তিতে আলোচনা যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই পরিচয় প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা প্রত্নবিদ্যার কোন কোন বিভাগে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমবেত শক্তিতে তথ্যালোচনায় অগ্রসর হইতেছেন না; যাঁহারা প্রত্নবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিচ্ছিন্ন ভাবেই অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইতেছেন, এবং অনেক সময়ে কল্পনাকে সত্যের আলোক বলিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে গিয়া পথভ্রষ্ট হইতেছেন!

বাঙ্গালীর অতীত কাহিনী নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় বলিয়া ধরিয়া লইয়া, যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে বীতস্পৃহ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা যৎসামান্য ক্লেশ স্বীকার করিলেই দেখিতে পাইবেন,—বাঙ্গালীর ইতিহাসেও গৌরব-যুগের অভাব ছিল না। তাহার কথা বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইলেও, একেবারে অতল তলে চিরবিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখনও বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেক বিবরণ সঙ্কলিত হইবার আশা আছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে, সে আশা কদাপি সফল হইবে না। তাহার জন্যই সমবেত তথ্যানুসন্ধান-চেষ্টা আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতি।

সাহিত্য-সিংহদিগের সন্দর্শনলাভ নিশ্চয়ই সৌভাগ্যসাপেক্ষ; অন্ততঃ আমি নিজে তাহা পরম সৌভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু, সে সৌভাগ্য এই অকিঞ্চিৎকর লেখকের ভাগ্যে, এ যাবৎকালের মধ্যে, অতি অল্পই ঘটিয়াছে; —প্রায় ঘটে নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। অথচ বড়লোক দেখার সাধ বাল্যকাল হইতেই খুব বেশী। বড়লোক দেখার সাধ বরাবরই বেশী;

তবে বার্দ্ধক্যের এই আসন্ন আবির্ভাবে, সে সাধ, বোধ হয় কিছু সংকুচিত হইলেও হইয়া থাকিতে পারে। কেন না, আমার মনে হয়, বার্দ্ধক্যে বাসনা-নদীর বেগ স্থানে স্থানে বিষম বর্দ্ধিত হইলেও, অনেক স্থলে তাহা "বহতা" থাকে না; অনেক স্থলে, তাহার বারিই থাকে না;—থাকে কেবল হায়! বিরক্তির বালুকার'শি! শুষ্ক, সর্দ্দি-যুক্ত, শ্মশানময় নদী-চরের বিষণ্ণ বালুকারাশি! মনোরাজ্যে মৃত্যু-খচিত এক মহা মরুভূমি!

বড়লোক দেখার সাধ বিলক্ষণই ছিল;—এখনও যে একেবারে নাই, এমন নহে; কিন্তু, সে সাধ মিটাইবার সুযোগ কখনও তেমন ঘটিয়া বা জুটিয়া উঠে নাই। পরন্তু, সে সাধ মিটাইতে কখনও আমার সাহসেও কুলাইয়া উঠে নাই। সুযোগ না জুটার কারণ 'এ পক্ষের' বহুকাল বিদেশে প্রবাস। প্রবাস ত প্রবাস! অরণ্যে নিবাস বা বনবাস বলিলেও বেশী বলা হয় না। অতি দূর মফঃস্বলের মাঠে মাঠে বাস বসতি ছিল। সেথায় সাহিত্য-সিংহের পরিবর্ত্তে বরং বন্য-সিংহের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার সমূহ সম্ভাবনা হইতে পারিত। বহুযোজনব্যাপী বড় বড় ক্ষেত্র; কিন্তু সাহিত্যের জোত আবাদ ছিল না। স্বপ্নের ফুলের চাষ চালাইলেও বরং সে সব বেয়াড়া স্থলে চলিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের চাষ চষা তথায় বিড়ম্বনা। তাহার একটা সাবষ্টি-টিউট্" তথায় না ছিল. এমন নহে। সাহিত্যের পরিবর্ত্তে শ্যামা, কইনি মাড়ুয়া মকায়ের চাষে মসগুল ছিলাম।

সুদূর মফঃস্বলের মাঠ ঘাট যে সাহিত্যের এলাকাভুক্ত নহে, এমন কথা আমি অবশ্য বলিতেছি না। অসঙ্কোচে অম্লানবদনে কেন এমন কথা বলিয়া অপ্রতিভ হইব? সাহিত্যের অধিকার তথায় থাকিতে পারে, আছেও বটে। তবে কি না, সাহিত্যের যে কিছু ব্যাপার, বাণিজ্য, বিস্তার, তাহা সভ্যতার আকর বা কেন্দ্রস্থল সহর বাজারেই ব্যাপ্ত। সাহিত্যসেবক সুধীজনেরা সচরাচর নগরে, সহরেই বাস করিয়া থাকেন। সভ্যতা ও সাহিত্য হইতে সাংঘাতিক দূরে নিয়তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াও, বহু-কালের মধ্যে আমি যে এক আধবারও নগরে সহরে আসি নাই তাহা নহে। কালে ভদ্রে কখন কখনও আসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কখনও বড় লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করার, তাঁহাদের সমীপে যাওয়ায় বা সংঘর্ষে আসার সুযোগ হয় নাই। সাহসের অভাবে, ততোধিক সাহিত্যের সহিত কোনও নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের অভাবে, সে সুযোগ হয়

নাই। কেবলমাত্র ব? লোক দেখায় ইচ্ছা টুকু টেঁকে করিয়া ত আর বড়লোকের নিকটে যাওয়া চলে না। তথায় যাইতে হইলে আরও একটু কিছু উপযুক্ত উপলক্ষ আবশ্যক হয়। হয় অন্ততঃ এক বিন্দুও বড় বা বিখ্যাত হওয়ার দরকার হয়; অথবা বড়লোকের প্রীতি-উৎপাদন কিম্বা কোনও প্রয়োজনসাধন করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি না থাকিলে চলে না। নিঃসম্পর্কে বড়লোকের নিকটে যাইতে পারেন বড় লোকে; আর যাইতে পারে খামাধরা। যথাক্রমে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য বশতঃ, এই দুই উপকরণের একও আমাতে বিদ্যমান না থাকাতে, আমার ভাগ্যে বড় লোকের সংসর্গ প্রায় কখনও ঘটে নাই। অথচ বড় লোকদিগের সশরীরে সন্দর্শন, তাঁদের বাক্যালাপ শ্রবণ ও আচার ব্যবহারাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার বাসনাটি চিরকালই বলবতী ছিল। বসওয়েলের বিবিধ শক্তি ও সাহিত্য-বুদ্ধি বাদে, আমি প্রকৃতিতে একটি বিরাট বস্‌ওয়েল, বলিলেও বলিতে পারি। কারণ ইহা সত্য কথা। সত্য, অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও আমিত্বপূর্ণ হইলেও, তাহা সংগোপন করা আর (অন্ততঃ) এখনকার সাহিত্যের রীতি নহে। অতএব অনায়াসে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে এত আত্মকথা অনাবৃত করিতে অণুমাত্রও ইতস্ততঃ করিতেছি না। বাসনায় বস্তুতই আমি প্রকৃতিনির্ম্মিত একটি বস্‌ওয়েল। তবে দুঃখ এই যে, এ জীবনে আমার জনসন মিলিলেন না। বয়সকালে বিদেশে বসিয়া ভাবিতাম, যদি একটি জনসন পাই, চাকুরী বাকুরী ছাড়িয়াও বসওয়েলী করি। এবং তাহার পর বাঙ্গালার জীবনীলেখকদিগকে বিধিমত প্রকারে বুঝাইয়া দিই, জীবন-বৃত্ত কিরূপে লিখিত হয়। তা, জনসন জুটা ত পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের কথা, কখনও কোনও বড়লোকের সন্দর্শনলাভও ভাল করিয়া আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তার পর সাহিত্যসিংহদিগকে চিঠিপত্র লেখা, সে ত সত্য সত্যই সুদূরপরাহত। তদ্দ্বারা বেচারীদিগকে বিষম বিরক্ত ও বিপদগ্রস্ত করা হয়, বলিয়াই আমার কেমন একটি সংস্কার। এ সংস্কারও হয় ত সাহসের অত্যন্ত অভাব-জনিত। যাহাই হউক, সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে, কোনও উপন্যাসের বা কাব্যের প্লট বা অর্থের প্রতি প্রশ্ন করিয়া আমি কখনও কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারকে পত্র লিখিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার নিকট পরিচিত হইতে প্রয়াস করি নাই। ততটায় আমার সাহসও পৌঁছে নাই; প্রবৃত্তিও হয় নাই। এক কথায় আমি বসওয়েলের বাসনা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সুবুদ্ধি ও সাহসিকতা এক রত্তিও আমার পাতে পড়ে নাই।

আমি আমার চির-আরাধ্য বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির কথা বিবৃত করিতে বসিয়াছি ; অথচ দেশবিদেশবিখ্যাত বঙ্কিম বাবুকে আমি অতি অল্পই দেখিতে পাইয়াছিলাম। পরন্তু, তাঁহার সহিত ঘটনাক্রমে, ইদানী আমার যে একটু আলাপ হইয়াছিল, তাহাও নেহাত অল্প। অতএব, ইহাতে, পাঠক যদি এই খান হইতেই নিরাশ হইতে চাহেন, অবশ্যই হইতে পারেন ; তাহাতে আমার কোনও হাত নাই।

আমি বঙ্কিমবাবুকে একবার দেখিয়াছিলাম আমার বাল্যকালে। সেই তাঁহাকে আমার সর্ব্বপ্রথম দেখা। সে অনেক কালের কথা ;—তখন আমি এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্র। বঙ্কিমবাবু নিমন্ত্রিত হইয়া সেই গ্রামের সাহিত্যানুরাগী জমিদার সা—বাবুর বাটীতে গিয়াছিলেন ; সেইখানেই আমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলাম। সে কোন সাল, আমি এখন ঠিক বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু তখন বোধ হয় খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ; অথবা খুলনা হইয়া অন্য কোথাও আসিয়া থাকিবেন। যতটা স্মরণ হইতেছে, সম্ভবতঃ তখন তিনি খুলনায় ছিলেন না ; বোধ হয়, খুলনা ঘুরিয়া আসিয়া অন্য কোনও স্থানে কর্ম্ম করিতেছিলেন। কিন্তু ইহা আমার ঠিক মনে আছে যে, সে সময়ে তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামাচরণ বাবু, বসুরহাট মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি যে ক্ষুদ্রগ্রামখানির কথা এ স্থলে বলিতেছি, তখন তাহা রেলওয়ে লাইন ও ষ্টেশন সমন্বিত ম্যুনিসিপাল সহরে পরিণত না হইলেও, সমৃদ্ধিশালিতা ও সভ্যতায় সে স্থান এখনকার অপেক্ষা তখন কম ছিল না। তাহার সম্ভ্রম এখনকার অপেক্ষা তখনই বিলক্ষণ বেশী ছিল।—বেশী ছিল সেই জমিদার মহোদয়ের বদান্যতায়, বিদ্যানুরাগে, সুশীলতায় ও সহৃদয় জমিদারোচিত স্বাভাবিক শক্তিতে। কিন্তু, যাউক সে কথা। এই গ্রাম বসুরহাট মহকুমার এলাকাধীন তখন ছিল ;—এখনও আছে। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে উক্ত মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামচরণ বাবু ঐ গ্রামে মফস্বল-ভ্রমণে আসেন ; অথবা তিনি আসিবেন বলিয়া তাঁহার লোক লস্কর, তাম্বু, পিয়াদা পুলিস পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। আমলা ও মোক্তার মহাশয়দিগেরও কেহ কেহ বোধ হয়, সেই সঙ্গে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন কিম্বা অর্দ্ধ পথে ছিলেন, ঠিক মনে হইতেছে না ; যাহা হউক, সে তেমনি একটি দিন বোধ হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। হাকিম আসিতে-

ছেন বলিয়া গ্রামমধ্যে গোল পড়িয়া গিয়াছে। তাম্বু টানাইবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। হাকিমের কাছারী এজলাস ও আপিসের তাম্বু পড়িবে; এবং তাঁহার সর্কিট প্রবাসে কয়েক দিন বাসের জন্য স্বতন্ত্র তাম্বু খাড়া হইবে। লোক লস্করেরা (নাজিরের আদেশানুসারেই বোধ হয়) তাম্বু টানাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে; এবং সেই স্থানে কুলি মজুর ধরিয়া তাম্বু খাটাইতেছে; দুই একটা তাম্বুর কতকাংশ বা উত্থিতও হইয়া থাকিবে; অথবা তখনও হয় নাই;—কেবল আসবাব ও খোটাখুঁটি আসিয়া পড়িয়াছে। স্থান একটি আমবাগানে। আমবাগানের যে স্থলে তাম্বু খাটান হইতেছে, সে স্থল তথাকার কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির খিড়িকি ও খিড়িকির পুষ্করণীর নিকটবর্ত্তী এবং সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জমিদার মহাশয়ের অতি সন্নিকট কুটুম্ব,—ভগিনীপতি! সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের খিড়িকির উপর হাকিমের তাম্বু,—মাজিষ্ট্রেরের এসলাস;—বাবুদের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল; তাঁহাদের লোকজনেরা যাইয়া তাহাতে প্রথমতঃ বাক্যের দ্বারা বাধা দিল। বলিল,—"তোমরা এখানে তাম্বু তুলিও না,—এ স্থান * * * বাবুর অন্দরমহলের অতি নিকটে; চল, ইহা অপেক্ষা উত্তম স্থান দেখাইয়া দিতেছি।"

সবডিবিজনের সরকারী লোকেরা এ কথায় কর্ণপাত করিল না। জমিদার পক্ষ হইতে আর একটু জোরে আপত্তি উত্থিত হইল। হাকিমের পুলিস পিয়াদা আর্দ্দালী তাহাতে জলিয়া উঠিল। সেই স্থান ভিন্ন আর কোথাও তাঁবু খাটাইবে না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁবু টানাইতে লাগিল। বাবুদের দুই এক জন লোককে ধাক্কাধুক্কি চড় চাপড়টাও দিল। কিন্তু, এ বীরত্ব বড় বেশীক্ষণ টিঁকিল না। অল্প কয়েক মিনিট মধ্যেই মহকুমার লোকদিগকে মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইল। তাহারা তাম্বু, তল্পি তুলিয়া, ডেরাডাণ্ডা লইয়া অভিমানে ম্লান মুখে মহকুমা পানে ছুটিল। যে সকল নৌকাতে আসিয়াছিল, সেই সকল নৌকাতেই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে পলাইল; কিন্তু বড় রুষিয়া গেল। ক্ষত গৌরবের অধিকতর উদ্ধত স্বরে গর্জ্জিয়া বলিল, "দেখেঙ্গা।"

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সহিত গ্রাম্য জমিদার পরিবারের এরূপ প্রবল বিসম্বাদ,—বিশেষতঃ সরকারী কানাত-কাটা লইয়া কথা;—ব্যাপারটি বড় সহজ নয়। চারিদিকে বিলক্ষণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শঙ্কা সন্দেহ গ্রামবাসীদিগের সকলেরই হৃদয় অধিকার করিল। তখন সংবাদপত্র পড়িতাম না;—পড়িবার

তেমন সুবিধা ছিল না। অতএব বলিতে পারি না, সংবাদপত্রে, এ ব্যাপারের কিরূপ বিবরণ ও সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, সংবাদপত্রের 'কলম' ও সম্পাদকের মস্তিষ্ক এ কাণ্ডে কিছু কালের আহার্য্য বস্তু আহরণ করিতে পারিয়াছিল, এ কথা অনুমানে বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, উপরোক্ত ব্যাপারটি সহজ না হইলেও,—যত দূর জানি ও স্মরণ হয়,—খুব সহজে ও শীঘ্র মিটিয়া গিয়াছিল। মিটিয়া গিয়াছিল উভয় পক্ষের সরলতায় ও সৌজন্যে।

বিবাদ মিটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ম্মিলন ও বিশেষরূপে বন্ধুত্ব সংস্থাপনের আবশ্যক জমিদার পক্ষ হইতে স্বভাবতই হইয়াছিল। হইবারই কথা বৈষয়িক হিসাবে ত বটেই; তাহা ব্যতীত সামাজিকতা ও সহৃদয়তার হিসাবও ছিল। মহকুমার মাজিষ্টর জমিদারের অব্যবহিত বিধাতা,—বৈষয়িক সে এক সবিশেষ হিসাব বটে; তাহার উপর সে ম্যাজিষ্টর আবার স্বয়ং শ্যামাচরণ বাবু,—বঙ্কিমবাবুর জ্যেষ্ঠ অগ্রজ। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা তখন প্রতিদিন পরম রমণীয় মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হইতেছিল। কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবার শিক্ষায়, সভ্যতায়, সম্ভ্রমে, পদমর্য্যাদায় এবং সাহিত্যানুশীলনে তখন দর্শনীয়দিগের মধ্যেও সবিশেষ দ্রষ্টব্য। তাঁহাদের,—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক সখ্যতা ও সংস্রব কাহার না প্রলোভনীয় কাহার না প্রার্থনীয়;—তাঁহাদের সহিত অসৌহৃদ্য ও শত্রুতা করিতে কে অভিলাষী? বিশেষতঃ, বক্ষ্যমাণ এই জমিদার মহাশয় সুশীল, সামাজিক, সখ্যতাপ্রবণ, সাহিত্যানুরাগী ও সভ্যতাপিপাসু ছিলেন। সুতরাং উপরোক্ত বিসংবাদের পর পুনর্ম্মিলন দ্বারা মনোমালিন্য বিদূরিত ও বন্ধুত্বের ভিত্তি প্রকৃষ্টভাবে প্রোথিত করার প্রস্তাব হয়। ৺দীনবন্ধু মিত্র সর্ব্বলোকপ্রিয় অতি সরল ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, সকলেই জানে। দীনবন্ধু বাবু তখন সাহিত্যাকাশে অতীব সজীব ও শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র; সামাজিকতায় ও সখ্যতায় অদ্বিতীয়। দীনবন্ধু বাবু বঙ্কিমবাবুর অভেদাত্মা বন্ধু। উপরোক্ত জমিদার বাবু মহাশয়ের সহিত ও দীনবন্ধু বাবুর সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহাদের প্রণয়-সখ্যতার মিলনোচ্ছ্বাসের আমোদ আহ্লাদ আমি বাল্যকালে কয়েকবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। একটি দিনের দৃশ্য আমার পুরাতন স্মৃতিপটে অতি ক্ষীণ মৃদুভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট-আপিস পরিদর্শন উপলক্ষে (উপরোক্ত স্থানে) গিয়াছেন। জমিদার পরিবারের সুবিশাল সৌধের এক সুসজ্জিত

গৃহে মেহগনি কৌচের উপর বসিয়া, জমিদার-বন্ধুর অনুরোধে নিজে "নীল-দর্পণ" পাঠ করিতেছেন। শিক্ষিত ও সাহিত্য-রস-পিপাসু কতকগুলি ভদ্র লোক তথায় উপবিষ্ট ;—সকলেই অবাক ও একাগ্রচিত্ত হইয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে নাটককারের সেই সরস, সুমিষ্ট, নাটকীয় ভঙ্গীযুক্ত নীলদর্পণপাঠ শ্রবণ করিতেছেন। এক এক বার হাস্যরসের উচ্চ উচ্ছ্বাসে বিস্তীর্ণ বৈঠক-খানার ছাদ যেন ফাটিয়া যাইতেছে। পুনঃ করুণরসের উদ্দীপনায় শ্রোতৃগণ অশ্রুমোচন করিতেছেন। আমরা বাবুর বাড়ীর কোনও কোনও বালক দূরে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সংগোপনে সেই সাহিত্যামোদ অল্পাধিক উপভোগ করিতেছি। কলিকাতায় যে রাত্রে প্রথম পেশাদারি থিয়েটার খোলা হয়, আমি অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলাম। স্মরণ হইতেছে- সেটি ন্যাশনাল থিয়েটার। "ন্যাশনাল" তাহার উদ্বোধন নিশিতে নীলদর্পণ অভিনয় করিয়াছিল। তাহার পরও বোধ হয় দুই একবার নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া থাকি। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের নিজমুখে নীলদর্পণপাঠ যাহা শুনিয়াছিলাম,-তাহার নিকট উক্ত নাটকের অভিনয় ঢের নিকৃষ্ট বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। যাউক অপ্রাসঙ্গিক কথা। দীনবন্ধু বাবু তাঁহার সুরধনী কাব্যে উপরোক্ত জমিদার বাবুর বদান্যতা ও বন্ধুত্বের দিব্য একটি চিত্র অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন।

বোধ হয় উভয় পক্ষের প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু বাবুর মধ্যবর্ত্তিতায় পূর্ব্বোলিখিত পুনর্ম্মিলন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। এবং এই পুনর্ম্মিলন উপলক্ষে বঙ্কিম বাবু শ্যামাচরণ বাবু প্রভৃতির সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের জমিদার ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুবাবু সে দিন ছিলেন কি না আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না।

পার্টি, প্রাতঃকাল নটা দশটার সময় যাইয়া পৌঁছিল। "বঙ্কিমবাবু আসিয়াছেন," "বঙ্কিমবাবু আসিয়াছেন"—একটা 'ধুম' পড়িয়া গেল। আমি অন্যান্য বালকের সহিত বঙ্কিমবাবু দেখিতে দ্বিতলে ছুটিলাম। সদা-সুসজ্জিত ড্রইংরুম আজ অধিকতর সজ্জিত। বিশাল মার্ব্বেল টেবিল বেড়িয়া কৌচ কেদ্‌রা কারুকার্য্যময় বড় রকমের আসন। বিস্তীর্ণ গৃহের স্থানে স্থানে আরও অনেক উত্তম উত্তম টেবিল চেয়ার মূল্যবান বস্ত্রমণ্ডিত বিবিধ গঠনের প্যাটের পর্য্যঙ্ক। গৃহময় সুরুচিনির্ব্বাচিত শিল্পশোভা। উত্তম উত্তম চিত্র বড় বড় অয়েলপেণ্টিং দেয়ালে বিলম্বিত। পুস্তক ও পুষ্পগুচ্ছপূর্ণ পুষ্পাধার যথা তথা বিন্যস্ত।

মার্ব্বেল টেবিল ঘিরিয়া আগন্তুকেরা উপবিষ্ট হইয়াছেন শ্যামাচরণ বাবু এক সুদীর্ঘ নলকুণ্ডলিত প্রকাণ্ড রয়াল আলবোলায় তামাক সেবন করিতেছেন। অন্যান্য কেহ কেহ সুন্দর সু৺র শটকায় স্বর্ণমণ্ডিত হুকায় উক্ত শ্রান্তি-নাশক সুমধুর দ্রব্যের রসাস্বাদনে নিযুক্ত আছেন। বিবিধ বাক্যালাপ চলিয়াছে। সুগন্ধি তাম্রকূটধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া নৃত্য করিতে করিতে আকাশে মিশিয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবু তখন যুবাপুরুষ। কিন্তু তাঁহার তখনকার সে মূর্ত্তি আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না। হয় ত আমি অতগুলি বড় বড় বাবুর ভিতরে বঙ্কিমবাবুকে বুঝিতে পরি নাই। সাহসের অভাবে বোধ হয়, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই,—বঙ্কিমবাবু কোনটি। বোধ হয় বুঝিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু কে, না চিনিতে পারা যোহা বোকামি বেকুবী। ঐ দুই আখ্যার আস্পদ হইতে, হয় ত আমার ইচ্ছা ছিল না। শ্যামাচরণ বাবুকে, এ সময়ের অব্যবহিত পরে আরও কয়েক বার দেখিয়াছিলাম; তাই তাঁহার তখনকার চেহারা আমার মনে পড়ে। সে মজলিসে শ্যামাচরণ বাবু ছিলেন, বঙ্কিম বাবু ছিলেন, আর ছিলেন বোধহয়, প্রথম বাঙ্গালী পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদ॑শ নাথ রায়। যেন মনে হয়, জগদীশ বাবুর মস্তকে আমি পককেশবাহুল্য দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এ কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না।

তখন "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয়, "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" ও হইয়া থাকিবে। এই তিন পুস্তক বহু আয়াসে ও আগ্রহে বাবুর বাড়ীর সদর বা অন্দরমহল হইতে আহরণ করিয়া, নিশীথ সময়ে লুকাইয়া লুকাইয়া এক একটি রাত্রির অধিকাংশ জাগিয়া উদরস্থ করিয়াছিলাম, মনে পড়ে। অতএব সেই বাল্যকালেও বোধ হয়, কিছু কিছু বুঝিয়াছিলাম বঙ্কিমবাবু বস্তু কি। কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে সেবার ভাল করিয়া দেখিয়া, তাহার দেবোপম-মূর্ত্তি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি নাই; দেখার সাধই মিটে নাই। বাবুর বসতিবাড়ীর বৈটকখানায় তাঁহারা খুব অল্প সময়ই বসিয়াছিলেন। এবং আমরা ভয়ে ভয়ে সেস্থানের কতকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। সমস্ত সময় টুকুও তথায় দাঁড়াইয়া থাকার সুযোগ হয় নাই; তাহার পর বাল্যকাল হইতেই আমার "সর্ট সাইট", কাযেই দূর হইতে দেখিয়া সম্যক্ রূপো৺হণের অসুবিধা হইয়াছিল। সে রাত্রিও ইহাদের কেহ কেহ তথায় ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বোধ হয় বৈকালেই বিদায়

লইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি রাত্রিতে ছিলেন। প্রমোদ উদ্যানের রজনীর বাঙ্গলাতে ইহাঁদের বাসা দেওয়া হইয়াছিল। তথায় বাছা বাছা পূর্ণবয়স্ক বাবুরাই যাইতে পারিয়াছিলেন। বিস্তর ও বিবিধ আমোদ আহ্লাদে রাত্রি কাটিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুকে এই আমার প্রথম বারের দেখা।

আর একবার,—ইহা দ্বিতীয়বার—আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখিয়াছিলাম, উপরি-উক্ত ঘটনার বহু দিন পরে। একবার তাঁহাকে এক দিন দেখি কলিকাতায়, সেন্সাস আপিসে। সে বোধ হয় খৃঃ ১৮৭১—৭২ সাল। তখন আমি কলিকাতায় আসিয়া, কৈশোর বয়সের একমাত্র অবশিষ্ট থাকিতেই কেরাণীগিরিতে প্রথম ভর্ত্তি হইয়াছি। আমি বালকের বই ছাড়িয়া কেরাণীর কলম প্রথম স্পর্শ করি। হৈ অধমতারণ ও অস্থায়ী সেন্সাস আপিসই কিশোরবয়স্ক কেরাণীর, জীবনসংগ্রামে, কেরিয়ার আরম্ভের অতি উপযুক্ত আপিসই বটে! তা, এক হিসাবে নেহাত অনুপযুক্তও ছিল না। সমর্থ হইলে, "মোরত্নম সুমারি" হইতে আমার সবিশেষ শিক্ষালাভের সমূহ সম্ভাবনা ছিল;—তাহা হইতে জীবিকানির্ব্বাচনের অনেক স্বাস্থ্যকর ও অতিমূল্যবান সদুপদেশ সংগ্রহ করা যাইতে পারিত; মনুষ্যজীবনের ফিলজফিও বিস্তর সঙ্কলন না করা যাইত, এমন নহে। কিন্তু তখন সেই বৃহতী বুদ্ধির ও বিশ্লেষণশক্তির আমার নেহাত অবিকশিত অবস্থা বা ঐকান্তিক অভাব। সুতরাং সেন্সাসের হিসাবসঙ্কলন করিতে ভর্ত্তি হইয়া সবিশেষ কিছু শিক্ষালাভ বা আত্মকার্য্যোপযোগী কোনও সদুপদেশ আদায় করিতে পারি নাই। পারিলে হয় ত এখন এ দুর্গতি হইত না। সেন্সাস রিটার্ণের সঙ্কলন ব্যবকলন হইতে শিক্ষা বড় কিছু হাসিল করিতে পারি নাই; তবে যৎকিঞ্চিৎ টাকা আদায় করিয়াছিলাম বটে; আর অভিভূত হইয়াছিলাম ডেঙ্গুজ্বরে। কলিকাতায় তখন ডেঙ্গু ডাকিয়া উঠিয়াছিল এ দেশে ডেঙ্গুর সেই সর্ব্বপ্রথম পরিচ্ছেদ।

তৎকালে "বঙ্গদর্শন" বাহির হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের পূর্ণ গৌরব। মাস পড়িতে পড়িতেই পাঠক বঙ্গদর্শনের আগমনপ্রত্যাশায় প্রাতঃকাল হইতে পথে ডাকপিয়ন আসিতেছে কি না, তাকাইয়া দেখে। বঙ্গদর্শনের যশ-জ্যোতি বঙ্গময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা ভাষার বিবিধ শক্তির বিকাশ অথবা বাঙ্গালা ভাষার শরীরে,—শিরায়, শোণিতে, মস্তকে, পূর্ব্ব-অপরিচিত বিবিধ শক্তির সঞ্চার করিতেছেন। বঙ্কিম-প্রতিভার নানা দিক্‌প্রসারিণী শক্তি বঙ্গদর্শনে প্রতিবিম্বিত প্রতিভাত হইয়া

লোককে বিস্মিত ও বিমোহিত করিতেছিল। তাঁহার গৌরবপ্রভা যেন তখন মধ্যাহ্ন-গগন হইতে সতেজে সগর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিকীর্ণ হইতেছিল। সাহিত্যসমাজে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিতেছেন ভাল, তাহাই ভাল, তাহাই সুন্দর; যাহা বলিতেছেন মন্দ, তাহাই কুৎসিত, তাহাই কদর্য্য। রুচি-রাজ্যে ঐরূপ সিংহপ্রতাপ বঙ্গদেশে, বোধ হয়, আর কেহ কখনও প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, পারিবেন না। এক দিন "এডিনবরা রিবিউ" বিলাতে যাহা করিয়াছিল, একদিন বঙ্গদর্শন বাঙ্গালায় তাহা করিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যাঁহাদের গায়ে বঙ্গদর্শনের এক একটা সই মোহরের ছাপ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাবধি সেই ছাপের গুণে সাহিত্যে স্মরণীয়। এ হেন বঙ্কিমবাবুর চেহারা দেখিতে তখন কাহার না সাধ হইত? অতএব আমারও হইয়াছিল, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সঞ্জীববাবু দোহারা দৃঢ় দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ, সঘন সুকৃষ্ণ গুম্ফে শোভিত খোপসুরৎ চেহারা, চোগা চাপকান পাগড়ীতে দেখিতে এক জন আমীর ওমরার মত; বিলক্ষণ একটু জাঁদরেলী ভাব। তাহার পার্শ্বে বঙ্কিমচন্দ্র, তখন ঈষৎ একহারা, অত্যন্ত চিন্তাশীল, চাঞ্চল্যচপলতাবিরহিত, যেন কিছু সলজ্জ, মৃদু সুমিষ্ট সুন্দর গৌরবর্ণ মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির অভ্যন্তরে অতং রস রসিকতা, ঐরূপ দর্শন ও সৃষ্টি-শক্তি এবং সমালোচনার তত সুতীক্ষ প্রখর খরসান সন্নিবিষ্ট, যাদ বিদ্রূপের তাদৃশ বিমল তীব্র প্রভাব লুকায়িত থাকিতে পারে, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষুদ্রতর পরিধিটিতে বেড় পায় নাই। চৌকোস চতুর "কিজিগ্‌নমিষ্ট" ব্যতীত তাহা তখন অন্য কাহারও পক্ষে করা সম্ভব হইল কি না, আমি বলিতে পারি না। আমি ইদানীং রবীন্দ্রবাবুকে দেখিয়াছি। তাঁহার মৃদু মোলায়েম করুণ চেহারাটি দেখিয়া তদীয় স্বপ্নময়ী কবিতার কিছু আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু কবির মধ্যে যে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের শাণিত শক্তি ও শ্লেষের সপ্তস্বরভেদী সন্তানিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাঁহাকে কেবল দেখিয়া কে বুঝিতে পারে? রবীন্দ্র বাবু স্বভাবতঃ কবি,—কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু ব্যক্তিত্বের অবিদিত নাই যে, তাঁহার বক্র অথচ বিমল বিদ্রূপে শৈল চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা; তদীয় গদ্য রচনা স্বয়ংসিদ্ধ, নিজস্বপ্রতিপাদনে তাঁহার পদ্যের উপর নির্ভর করে না; কাব্য কবিতারও অপেক্ষা রাখে না। তাহা আপন বলে আপনি উঠিয়া আপন প্রভাব প্রতিপন্ন করিয়াছে। রবীন্দ্রবাবু

কখনও যদি একটি কবিতাও না লিখিতেন, তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধাবলী আমার বিবেচনায় এক বিন্দুও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। আমাদের কবিদিগের মধ্যে, এক দ্বিজেন্দ্র বাবু ব্যতীত গদ্যে এরূপ দক্ষহস্ত আর দ্বিতীয়টি দেখি নাই। সাময়িক সাহিত্যে এখনকার গদ্য লেখকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রবাবুর লেখনী অলক্ষ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, এ কথা আমাদের পুরাতন ও অতিপ্রিয় প্রবন্ধকার কালীপ্রসন্ন বাবু, অক্ষয় বাবু, চন্দ্রশেখর বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবুর তখনকার প্রভাব সত্বেও, এখন আর অস্বীকার করা যায় না। এবংবিধ স্থলে তুলনা আদৌ সম্ভবে না; তুলনা একান্ত অবজ্ঞেয়। আমি তুলনা করিতেছি না। তবে শেষোক্ত লেখকদিগের শক্তি অতি শীঘ্রই পশ্চিমে ঢলিয়াছে; সময়ের সহিত আর ইঁহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; ইহা সত্যের ও সুবিচারের খাতিরে অগত্যাই অনুভব করিতে হয়। কিন্তু, মস্তিষ্কের অকালমৃত্যুর জন্য, বোধ হয়, বঙ্গদেশীয় মৃত্তিকাই দায়ী।

ফলতঃ, কেবল মূর্ত্তি দেখিয়া মস্তিষ্কের বিচার করা সচরাচর লোকের সাধ্য নহে। তবে এ সম্বন্ধে যাঁহারা শাস্ত্রীয় সঙ্কেত জানেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

বঙ্কিমবাবুকে এই দ্বিতীয়বার দেখার পর, দীর্ঘকাল আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই। দীর্ঘকাল,—সে খুবই দীর্ঘ। বিশ বৎসরেরও বেশী। কিন্তু এই কালের মধ্যে, তাঁহার দর্শনলাভ না করিলেও, ঘটনাক্রমে আমি তাঁহার নিকট কিছু পরিচিত হইয়াছিলাম; তাঁহার সহিত কোনও সূত্রে আমার চিঠিপত্র লেখা কিছু কিছু চলিয়াছিল। সে সব কথা ক্রমে বলিতেছি। কিন্তু তাহার সহিত আনুষঙ্গিক আরও অনেক কথা সংযুক্ত। সেগুলি শুনিতে যদি পাঠকের একান্ত ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, তবেই তিনি এই স্মৃতিতে বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধীয় কিছু শ্রোতব্য কথা শুনিতে পাইবেন। সম্ভবতঃ আমি এক সময়ে অতি আন্দোলিত একটি সামাজিক সমস্যায় বঙ্কিমবাবুর অভিমতব্যঞ্জক কিছু কিছু চিঠিপত্রও (যাহা তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, এবং যাহা আমি সযত্নে রাখিয়াছি) এই স্মৃতির যথাস্থানে প্রকাশিত করিব। কিন্তু সবই পাঠকের সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করিতেছে।

১৮৭১ সালে যে সেন্সাস সংগৃহীত হইয়াছিল, আমি অবশ্য সেই সেন্সাস আপিসের কথাই বলিয়াছি। আপিস বসিয়াছিল রেজিষ্ট্রার জেনারালের আপিসের সম্মুখে একটা একতালা বাটীতে। রাস্তাটির নাম ঠিক আমার মনে পড়িতেছে না; কিন্তু স্থানটি যেন সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। বোধ হয়,

বেভার্লী সাহেব সেবারকার সেন্সাস-সুমারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। আর বঙ্কিমবাবুর মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীব বাবু হইয়াছিলেন সেন্সাস আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সেবারকার সেন্সাস্ সম্বন্ধে সঞ্জীববাবু বঙ্গদর্শনে একটি পরিপাটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, পুরাতন পাঠকের বোধ হয় মনে থাকিতেও পারে। সঞ্জীববাবু বেভার্লী সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন; আমরা কেরাণীরা ছিলাম সঞ্জীববাবুর অধীনে। তবে ছোট কেরাণীর উপরে আবার বড় কেরাণী ছিল। আমরা ছোট কেরাণীর তাঁবে কর্ম্ম করিতাম। তাঁহারই নিকট কাজকর্ম্মের নিকাশ দিতে হইত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সঞ্জীববাবু আমাদের সকলকে দূরের কথা—অনেককেই চিনিতেন না। চিনিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, ইংরেজী বাঙ্গালায় আমরা কেরাণী হইয়াছিলাম কুড়ি দশ এগার। প্রতিদিন কত আসিতেছে, কত যাইতেছে; কে কাহাকে চিনিয়া রাখে। নিত্য নূতন নূতন মূর্ত্তি। অনেকেরই অদৃষ্টে চেয়ার টেবিল জুটিয়া উঠে নাই। বসিবার জন্য বড় বড় চৌকি পাতা ছিল। বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ হইতে বালক অতিবালক অজাতশ্মশ্রু কেরাণী;—পাকা, পলিত, শাঁশা, ডাঁশা, কাঁচা, কয়কোচা, কচিকচি কেরাণীও ছিল। আমি অজাতশ্মশ্রু সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক জন ছিলাম। বয়ঃক্রমে স্বর্গীয় পিতামহদেবের সমতুল্য ব্যক্তিরা আমার সহযোগী ছিলেন। জীবিকাসংগ্রহে বৃদ্ধের সহিত বালকের একাসনে একই কার্য্যে ব্যাপৃতি ও বিমিশ্রণের সে এক বিচিত্র দৃশ্য। দৃশ্য কিছু বিসদৃশ হইলেও, জীবনসংগ্রামের সে এক অনিবার্য্য অতিকঠোর মূর্ত্তি।

সেন্সাস আপিসে কেরাণীদের দৈনিক কার্য্যের পরিমাণানুসারে তাহাদের বেতন গণিত হইত বলিয়া মনে হইতেছে। কার্য্য কম হইলে বা তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ হইলে বেতন কাটা পড়িত। কেরাণীদের কার্য্য "পরতল" বা পরীক্ষা করিয়া লওয়ার জন্য স্বতন্ত্র আর এক দল কেরাণী ছিল। কিন্তু, তথাচ এত দিনের পরেও শপথ লইয়া বলিতে পারি, ভ্রমের ইয়ত্তা থাকিত না। একবার এই কেরাণীদের বেতন পাইতে কিছু কাল বিলম্ব হওয়ায়, তাহারা বেতনের জন্য কয়েক দিন ধরিয়া অনেক দরবার করে, দোহাই দস্তুর দেয়, কিন্তু তাহাতেও বেতন পায় না। শুনিয়াছিলাম, হিসাবের কাগজে কি একটা গোলযোগ হওয়ায় এই কালবিলম্ব ঘটিয়াছিল। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সম্বলহীন কেরাণীরা পাল বাসা-খরচের দায়ে বিপাকে পড়িয়া ধর্ম্মঘট করে, এবং একদিন বিকাল বেলা তাহাদের অনেকেই একত্র কলম

ছাড়িয়া বেতন-আদায় উদ্দেশে কুচ করে; দলে দলে পালে পালে যাইয়া রেজিষ্ট্রার-জেনেরেলের আপিসের সম্মুখে দাঁড়ায়। সেই রঙ্গস্থলে কোনও কোনও কেরাণীবীর কিঞ্চিৎ রণমূর্ত্তিও ধরিয়াছিলেন। বেতনের জন্য প্রথমে হল্লা হুজ্জত, তার পর হরিবোল পড়িয়াছিল। এ দৃশ্য দেখিতে রাস্তায় লোক জমিয়াছিল। কিন্তু কেরাণীর ধর্ম্মঘট আর কতক্ষণ টিকে? এক জন চাহিতে শত জন জুটে। "তু" বলিয়া ডাকিবার বিলম্বও হয় না। কেরাণীরা বীরত্ব-প্রদর্শনের পরক্ষণেই পীঁপড়ার সারির মত পিল পিল করিয়া পুনঃ কলম-অন্বেষণে ফিরিল। কেরাণীদের মধ্যে কোনও রসিক বৃদ্ধ এই সেলাস-সংগ্রাম সম্বন্ধে এক ছড়া বাঁধিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে ছড়া সঞ্জীববাবু বা কোনও বড় কেরাণীর কাণে উঠে নাই। উঠিলে বোধ হয় একটা কাণ্ড বাধিত। সেলাসের ছড়া আর কারও কাণে উঠে নাই; ছোট কেরাণীদের মনে মনেই ছিল। কোনও কেরাণী সময়ে সময়ে সংগোপনে সে ছড়া কাটাইতেন। উড়ানী-বিলম্বিত-বক্ষ-কেরাণী-কণ্ঠে গোবিন্দ অধিকারীর ধরণে সে ছড়া গীত হইত। আমি তাহা শুনিয়াছিলাম। মনে থাকিলে এই স্মৃতির সহিত কিঞ্চিৎ সংযোগ করিয়া দিতাম। বেতনবিষয়ক উপর্য্যুক্ত বেআদবী কাণ্ডে, বোধ হয়, কোনও কোনও কেরাণীর কর্ম্ম গিয়াছিল। কেহ কেহ অন্ন-কষ্টে কলিকাতায় না থাকিতে পারিয়া বেতন ছাড়িয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের চাকুরে শ্রেণীর একটা চিত্র এই। অতএব এখনকার অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা কেবল অনুমেয়। পরবর্ত্তী সেলাসসময়ে সে কথা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা হয় নাই, ইহা সমীচীন শাসনপ্রণালীর উপযুক্ত নহে। প্রাদেশিক শাসনবিবরণীনিচয়ে দেশের অবস্থা বিবৃত ও বিশ্লেষিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রতিবৎসরবর্দ্ধিত এই সম্বলহীন চাকুরীমাত্র-উপজীবী লেখনী-চালক উমেদার ও বেকার শ্রেণীর জীবিকাসমস্যা ও জীবনপরিণাম তাহাতে আদৌ উপেক্ষিত হয়। অথচ ইহা একান্ত উপেক্ষণীয়,—ইহা কি কেহ সজ্ঞানে বলিতে পারেন? উমেদার ও বেকারের বিপুল বহলতা ও বিভ্রাট অবশ্য সভ্যতাবৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল। কিন্তু সভ্য শাসন-প্রণালীমাত্রই ত সর্ব্বত্র এ সমস্যা-পূরণে অত্যধিক চেষ্টা করিয়া থাকেন; চেষ্টা করিতেছেন। এ দেশে সেরূপ চেষ্টা কি আছে? অপরিসীম উপেক্ষা ভিন্ন ত আর কিছুই দেখি না। শাক্‌ স্বানুবর্ত্তিতার দোহাই দিলে এ সমস্যা কাটে না। স্বানুবর্ত্তিতাতেও শ্রমের ক্ষেত্র ও উপলক্ষ চাই। আবশ্যকতানুসারে নূতন ক্ষেত্র ও উপলক্ষ সৃষ্ট বা পুরা-

তনের বিস্তার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেশের শাসকগণ ও ধনকুবেরগণ স্ব স্ব মদালসে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষাবান। এ উপেক্ষার ফল অদৃষ্টবাদীর দেশে অচিরাৎ না ফলিলেও, এক সময়ে ফলিবে না, কে বলিবে? সমাজদ্রোহ ও শাসনবিদ্রোহের বীজ এই রূপেই উপ্ত হইয়া অগোচরে বর্দ্ধিত ও বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। সোসিয়ালিজম ও নিহিলিজম অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়ে না; এই রূপেই জন্মে।

কেরাণীগিরির অগৌরব, কেরাণীর দুরবস্থার কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, শুনিতে পাই। সেটা বলা এখনকার ফ্যাসান হইয়াছে। বলেন বিস্তর লোকে, কিন্তু বিষয়টা ভাবেন কয়টি লোক? কেরাণীগিরি অত্যন্ত অগৌরবের, অতীব অশ্রদ্ধার, তাহাতে সন্দেহ না থাকিতে পারে। কিন্তু কেরাণীগিরির অগণিত উমেদারের অবস্থাটা কি, তাহা উদরান্নশালী অকেরাণী মহাশয়েরা অবগত আছেন কি? অবগত হইবার জন্য কখনও বিশ্রাম ও বিলাসকালের এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিয়াছেন কি? কেন করিবেন? সায়ান্সে লেখে,—survival of the fittest"। তা যাউক। কেরাণীর কলম দারুণ কষ্টেরই বটে। কষ্টের নয়, কে বলিবে? বিশেষতঃ আমি বহুকালের কেরাণী, কিরূপে বলিব, কষ্টের নয়? সে কিরূপ আয়তনের কষ্ট ও কত উপাধির কষ্ট, এখনই অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারি; কিন্তু আবশ্যকতা নাই। এমনই আমার এই স্মৃতিতে শত গণ্ডা অতিরিক্ত কথা আসিয়া পড়িতেছে; তাহার উপর আবার সেটা চাপাইলে, পাঠকের ধৈরজ-তরী সটান বান-চাল হইবে। ধরুন,—কেরাণীর কলমের আপাদমস্তকেই অমর্য্যাদা ও ক্লেশ। কিন্তু ইহসংসারে সেরূপ ক্লেশ কিসেই বা নয়? আর * * * মর্য্যাদাই বা কিসে? কৃষ্ণকায় কেরাণীদের অপেক্ষা সেই-বর্ণবিশিষ্ট হাকিম মহাশয়দের মর্য্যাদাটা কিছু বেশী নাকি? অবস্থাজ্ঞ নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন,—"হায়! সো পাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ।" উকীল, অ্যাডভোকেট, এঞ্জিনীয়ার, টীচার, ডাক্তার, বা ডেপুটী মাজিষ্টর, যিনিই হউন না, জানা আছে, রাঙ্গা মুখের কাছে মর্য্যাদাটা সকলেরই প্রায় কেরাণীরই মত। আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞানে ইহাঁরা অনেকেই এক নৌকায় স্থিত। বরং যেখানে উচ্চপদ ও অধিক টাকা, সেইখানেই অসম্ভ্রম ও আত্মসম্ভ্রমহীনতার অংশ মাত্রায় বেশী। পঁচিশ টাকার কেরাণী, পয়জারখানা পড়ে পড়ে পড়িতেছে দেখিয়া, হয় ত সাহসে ভর করিয়া পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু পাঁচ শত টাকার হাকিম প্রায়ই সেই পয়জারধারণের জন্ত প্রণতশিরে পৃষ্ঠ পাতিয়া দেন।

কেন না, পঁচিশ টাকা গেলে বরং আবার হয় ত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু পাঁচ শত টাকা গেলে হওয়ার প্রত্যাশা কোথায়? কর্মক্ষেত্রে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপই বলিলাম; নহিলে বহুকাল কেরাণীগিরি করিয়াছি বলিয়া কেরাণীর কুৎসিত অবস্থা আবৃত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেরাণীর কলম ক্লেশের, খুবই ক্লেশের। কিন্তু তবুও "স্ক্রাইবে"র কলমের তুলনায় সে বরং কতক সুখের কলম। এ অধীন আপাততঃ যে কলমে কালী তুলিয়া, মুদ্রাঙ্কণের জন্য, কাগজের উপর এই আঁচড় কাটিতেছে, ইহার নামই স্ক্রাইব বা স্ক্রাইবারের কলম। এ কলম কেরাণীর কলম অপেক্ষা অক্লেশের কিসে? ইহা কণ্টকাকীর্ণ, কলঙ্কপূর্ণ, কঙ্কালসার, হিংসা-দ্বেষ দলাদলির দাপটে সঙ্কীর্ণ, শীর্ণ, বা চূর্ণ;—কেরাণীর অপেক্ষা স্ক্রাইবের কলম এ দেশে অশীতি গুণ অনর্থকর ও কঠোরতর ক্লেশকর;—আমি উহাদের উভয়েরই অভিজ্ঞতা কিছু কিছু আদায় করিয়া, এক মাত্রা 'অথরিটী'র সঙ্গেই বলিতেছি। কেরাণীর কলম লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও গালিগালাজের সঙ্গে সঙ্গে তবু দিনান্তে ও মাসান্তে রক্তমাংসময় দেহধারণের জন্য কিছু আহার্য্য উপার্জ্জন করে, কিন্তু স্ক্রাইবের কলমে অর্জ্জন করে কি? করে উপবাস ও অপযশ!—অথবা যাহা অপযশ অপেক্ষাও অধিকতর অজীর্ণকর,—ঔদাসীন্য। যশ যখন আকাঙ্ক্ষণীয়, তখন অপযশও অবশ্য সহনীয়; কেন না, উভয়ই এক বৃক্ষের বিবিধ ফল। কিন্তু ঔদাসীন্য, হিমাচল গুজনের ঔদাসীন্য, এ দেশীয় লেখকের অস্থি মজ্জা মস্তিষ্ক গুঁড়া গুঁড়া করে। যশও নাই, অযশও নাই; নিরবচ্ছিন্ন নীরস ঔদাসীন্য। অপযশে উৎসাহ বিনাশ করে না; বরং বর্দ্ধিতই করে। কিন্তু অবিমিশ্র ঔদাসীন্যে বুকের রক্ত জমিয়া যায়। তাহার উপর উপবাস। অথবা উপবাসের উপর ঔদাসীন্য। সোনায় সোহাগা;—এক অপরের স্বাভাবিক সহযাত্রী। দেহের সহিত আত্মাকে একত্রিত রাখিতে কিছু "মেটীরিয়াল" অন্ন আবশ্যক; এটা সাধারণ স্বীকার্য্য ও সার্ব্বভৌমিক সত্য হইলেও, এদেশীয় লেখকের জীবন ও জীবাত্মা ইহার সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়া চাই। উহা অন্নমাত্র স্পর্শ করিবে না; কেবল "ইথর" আহার করিয়া আবরণ টিঁকিয়া থাকিবে, ইহাই নিয়ম।

আমি কথায় কথায় আত বক্তব্য কথা হইতে এত অধিক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে, তাহা অমার্জ্জনীয়। তবে এ অপরাধের এক মাত্রা কমাইবার জন্য যদি আমার নিকট হইতে কোনও কৈফিয়ৎ লওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে আমি নির্ভয়ে নিবেদন করি যে, আমার পুরাতন স্মৃতিগুলা সব অন্ধকারে

একত্র জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহাদের একটাতে ঘা লাগিয়া আর গুলাও আপনা হইতে আসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। আমি খুব খবরদারী ও হুঁসিয়ারী সত্বেও সবগুলাকে সমান ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। অতএব মহাশয়েরা যদি পারেন, একটু মার্জ্জনা করিবেন।

আমাদের উপরি-উক্ত সেন্সাস আপিসে এক দিন বঙ্কিমবাবু সঞ্জীববাবুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সে বোধ হয়, একটি শনিবার দিন। বঙ্কিমবাবু তখন কি বারুইপুরে? অথবা ডায়মণ্ডহার্ব্বারে? ঠিক বলিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবু কোয়াটার খানেক সেন্সাস আপিস হলের মধ্যস্থিত একটা যৎসামান্য টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। রেজেষ্টারী আপিসের ভিতরও এক বার গিয়াছিলেন। তাঁহার সে দিনকার মূর্ত্তি আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। চোগা-চাপকান-সজ্জিত সুন্দর যুবা পুরুষ। গরদের চোগা, গরদের চাপকানই যেন দেখিয়াছিলাম, মনে হয়। গুম্ফ-শোভিত সুগঠিত বদন; বদনে ও বিশাল ঈষৎবঙ্কিমভঙ্গিযুক্ত নয়নে প্রতিভাজ্যোতি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বাম হস্তে কি একখানি পুস্তক। মুখটি একটু হেলাইয়া ঈষৎ হেঁট হইয়া বসিয়াছেন। গম্ভীর বিনম্র,—যেন কেমন একটু সুমিষ্ট সলজ্জভাব। সুন্দর মূর্ত্তিটি,—মুখখানি দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দেখি কেমন করিয়া? সঞ্জীববাবু সে দিন সিংহের মত সেখানে বসিয়া,—কেরাণীরা তাঁহার সম্মুখে শৃগালবৎ ভয়ে জড়-সড়। কাহারও নড়ন চড়ন নাই। হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, তামাক খাইতে জলখাবারের ঘরে যাওয়া, তখন পঞ্চভূতে পঞ্চীকৃত হইয়া গিয়াছে। কেরাণী-মাত্রই নীরব নিঃশব্দ; হাঁচিতে, কাশিতে, স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতেও সাহস হইতেছে না। একমনে, একচিত্তে যেন কতই কার্য্যময় হইয়া সেন্সাস রিটার্ণ খাতার পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া আমরা অঙ্কপাত করিতেছি। সঙ্কলন ব্যবকলনে সবিশেষ ব্যস্ত আছি; কেহ 'টোটাল' দিতেছি; কেহ তাহা মিলাই-তেছি; কেহ কেহ 'মোরদুম সুমারী'র জাতি, বৃত্তি, স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকাদির সংখ্যা ভাগ ও বিভাগ ও বিশ্লেষ করিয়া খতিয়ান খতাইতেছি। দৃশ্যতঃ কতই যেন কার্য্য করিতেছি। কিন্তু মন রহিয়াছে একান্ত অন্য দিকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যটা তখন কমই হইতেছিল। সিংহসমীপে ধূর্ত্ত শৃগালবৎ আড় চোখে দূর হইতে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতেছিলাম, তৎক্ষণাৎ অমনই সঞ্জীব-বাবুর মুখপানে লুকাইয়া তাকাইতেছিলাম; অনুধাবন করিতেছিলাম, তাঁহার নজরটা কোন দিকে; আমাদের চৌকির দিকে, বা অন্য কোনও

দিকে। অবস্থা এই। এ অবস্থায় ইচ্ছা মিটাইয়া বঙ্কিমবাবুকে দেখা ও তাঁহার মূর্ত্তিটিকে 'ষ্টাডি' করা যেরূপ সম্ভব, তাহাই ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, ততটুকুও ঘটে নাই ; কেন না, তখন বুদ্ধি বিদ্যায় নেহাত নাবালক অবস্থা।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

উষ্ণীষ।

দেহের ঘটক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে মস্তক উত্তমাঙ্গ নামে অভিহিত। এই উত্তমাঙ্গ সুস্থ থাকিলেই মানব নানা বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়া বিবিধ সূক্ষ্মতত্ত্বের নির্ণয়ে অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং শীতোষ্ণাদির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য-পালনের একটি উপকরণ উষ্ণীষ। সম্ভবতঃ সভ্যতার উন্মেষকালেই সভ্যসমাজে উষ্ণীষের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল। "উষ্ণং ঈষতে হিনস্তি ঈষ ক শকন্ধ্বাদি পররূপ" উষ্ণকে হিংসা অর্থাৎ নিবারণ করে, এই অর্থে উষ্ণীষ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। শব্দের এই নিরুক্তির উপর নির্ভর করিলে বোধ হয়, প্রথমতঃ যেন উষ্ণের আক্রমণ হইতে উত্তমাঙ্গের রক্ষণই উষ্ণীষধারণের প্রয়োজনরূপে অনুভূত হইয়াছিল। সুতরাং উষ্ণপ্রধান দেশই যেন ইহার জন্মভূমি। পরবর্ত্তী কালে শীতবাতাদির আক্রমণনিবৃত্তিও ইহার প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রয়োজন আয়ুর্ব্বেদে উষ্ণীষের গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। * শিরোবেষ্টন ও মুকুট, এই উভয় অর্থেই উষ্ণীষ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরাতন সাহিত্যে কেবল শিরোবেষ্টন অর্থেই ইহার ব্যবহার ছিল, তাহা অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্বলায়ন গৃহ্যে এক স্থলে † "উষ্ণীষং কৃত্বা" এইরূপ একটি বাক্য আছে। বৃত্তিকার নারায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অহতবাসসা শিরোভিবেষ্ট্যেত্যর্থঃ" (বস্ত্রের দ্বারা মস্তক বন্ধন করিয়া)। পরবর্ত্তী সাহিত্যে

---

* পবিত্রং কেশ্যমুষ্ণীষং বাতাতপরজোপহম্।
বর্ষানিলরজোধর্ম্মহিমাদীনাং নিবারণম্।
—সুশ্রুতসংহিতা, চিকিৎসাস্থান, ২৪ অধ্যায়।

† আয়ুষ্যমিতি সূক্তেন মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্যোষ্ণীষং কৃত্বা তিষ্ঠন্ সমিধোহভ্যাদধাৎ ৩।৮।১৬
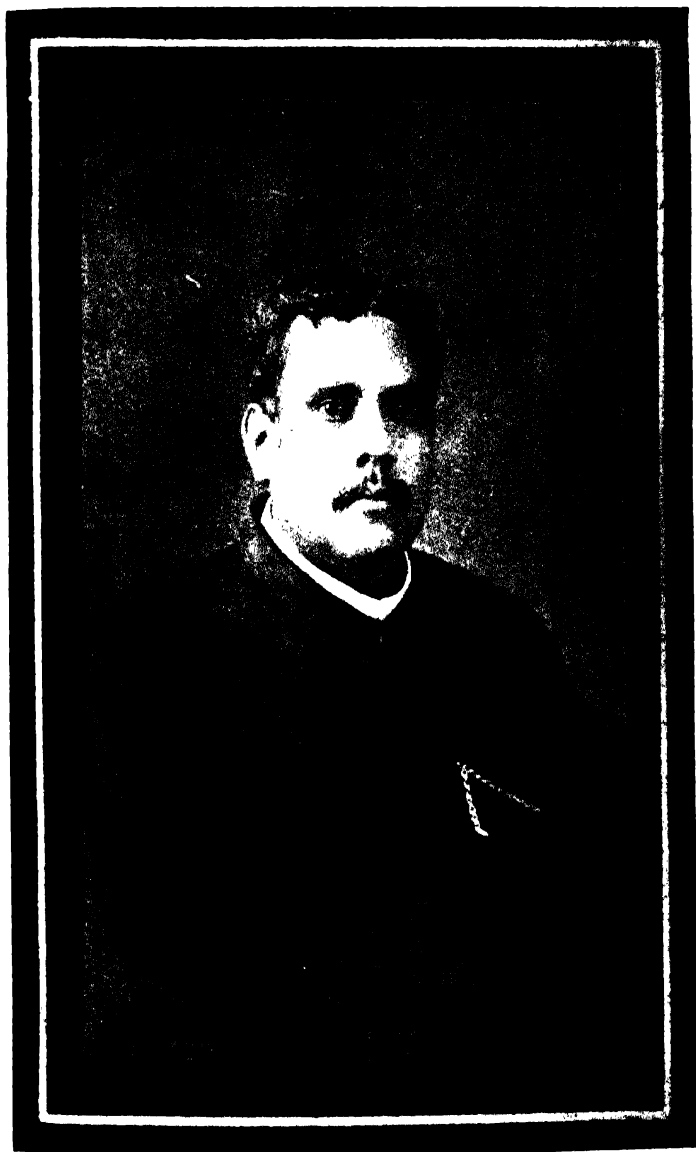
স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

মুকুট অর্থে প্রয়োগ দেখিয়াই বোধ হয় অভিধানকার * অমর ইহাকে উভয়ার্থক শব্দরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে উষ্ণীষ বলিলে মুকুট ও পাগড়ী এই উভয়কেই আপাততঃ বুঝিতে হয়, অতএব ছাতার ন্যায় ইহাকেও সামান্যবিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

রাজার ও যুবরাজ প্রভৃতি রাজপরিবারের ব্যবহার্য্য শিরোবেষ্টন মুকুট, এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য পাগড়ী। রাজার ও রাজপরিবারের মুকুটগত পার্থক্য ছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠে জানা যায়, রাজার মাথায় মুকুট ও যুবরাজ প্রভৃতির মাথায় অর্দ্ধ-মুকুট ধৃত হইত। "নরাধিপানাং কর্ত্তব্যং মস্তকে মুকুটং বুধৈঃ। সেনাপতেঃ পুনশ্চাপি যুবরাজস্য চৈব হি। যোজয়েদর্দ্ধমুকুটং কুটমাত্রাশ্চ যে নরাঃ।" সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠে না, সম্রাট প্রদত্ত রাজা মহারাজ উপাধিধারী বাঙ্গালী ভূম্যধিকারিগণ বিলাতী ধরণের উষ্ণীষই ধারণ করেন, সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে মুকুট চেনা একেবারে অসম্ভব হইত, কেবল রাজসজ্জার অনুকারী বিবাহের বর সেই অভাবটি অদ্যাপি দূর করিতেছে। উষ্ণীষ যে এক সময়ে সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, প্রাচীন সাহিত্যে এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুকুলে বাস করিবার সময়ে যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ, সমাবর্ত্তনের সময়ে গুরুর আজ্ঞানুসারে সমাবৃত্তগণ সেই সকল দ্রব্য মন্ত্রপূর্ব্বক প্রথম ব্যবহার করিবে, গৃহ্যগ্রন্থে তাহা কথিত হইয়াছে। এই সময়ে যে সকল দ্রব্য উপন্যস্ত করিবার বিধান আছে, তাহার মধ্যে ছত্র পাদুকা প্রভৃতির ন্যায় উষ্ণীষও স্থান পাইয়াছে।

"অথৈতান্যুপকল্পয়ীত সমাবর্ত্তমানে মণিঃ কুণ্ডলে বস্ত্রযুগং ছত্রযুগং পাদযুগং দণ্ডঃ স্রজমুন্মর্দ্দন-মনুলেপন মঞ্জন 'মুষ্ণীষ' মিত্যাত্মনে আচার্য্যায় চ।"—আশ্বলায়নগৃহ; ৩৮৪।

উষ্ণীষ-ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্মের অঙ্গরূপেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কার্য্যবিশেষে শাস্ত্রানুসারে তাহার বর্ণের ব্যবস্থা হইত। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে ঋত্বিক্-দিগের রক্তবর্ণ উষ্ণীষ বিহিত হইয়াছে। † এই ব্যবস্থার মূলে শ্রুতি ও দেখিতে পাওয়া যায়,—"লোহিতোষ্ণীষ ঋত্বিজশ্চরন্তি"। প্রয়োজনানুসারে বিভিন্নরূপ উষ্ণীষব্যবহারের রীতি ছিল।

---

* উষ্ণীষঃ শিরোবেষ্টকিরীটয়োঃ।

† সমৃদ্ধা লোহিতোষ্ণীষা নিস্ত্রিংশিনো যাজয়েয়ুঃ। আ। শ্রৌ। ৯।৭।৩

স্নানের পর মাথার জলনিঃশেষ করিবার অভিপ্রায়ে এক প্রকার অতি-ধবলবর্ণ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। বড়লোকের ব্যবহার্য্য এই শ্রেণীর উষ্ণীষ ক্ষৌমবস্ত্র ও পট্টবস্ত্রের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইত। কাদম্বরীতে বর্ণিত স্নাত শূদ্রক নৃপতির এইরূপ উষ্ণীষ-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। (অতিধবল-জলধরচ্ছেদশুচিনা 'দুকূলপট্টপল্লবেন' কৃতশিরোবেষ্টনঃ) পুরাকালের এই জাতীয় উষ্ণীষ রাজহংসের সহিত উপমিত হইয়াছে।* এই উপমার প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, এ উষ্ণীষ বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহার্য্য তোয়ালের মত কাপড়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর উষ্ণীষ-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বঙ্গের ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থাপক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নানের পর ব্যতীত অন্য সময়ে উষ্ণীষ-ব্যবহারের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যুত ধারণা করিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। "উষ্ণীষধারণং শিরোজলাপনয়নায়, তেন তদনন্তরং ন ধার্য্যম্"—আহ্নিকতত্ত্ব। তিনি স্বমতসমর্থনের জন্য মহাভারত হইতে স্নানের পর রাজহংসনিভ উষ্ণীষধারণের পরিচায়ক বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে কি অন্য সময়ে উষ্ণীষধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে? স্নানের পরক্ষণে উষ্ণীষধারণেই কি শীতোষ্ণের আক্রমণ বিদূরিত হইয়া যায়? তাঁহার সময়ে বাঙ্গালায় উষ্ণীষ-ব্যবহারের প্রথা ছিল না, এমতও বলা যায় না; কারণ, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম ভণ্ডচূড়ামণি ভাঁড়ু দত্তের মাথায় গরীবের উপযুক্ত উষ্ণীষ পরাইয়া তাহাকে দরবারে পাঠাইয়াছেন।† বাঙ্গালার পুরোহিত ঠাকুরগণ হোম করিতে হইলে অদ্যাপি যজমানের কাছে উষ্ণীষের দাবী করিয়া থাকে। সুতরাং স্মার্ত্তমহোদয়ের এই ব্যবস্থার মূল কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বিশেষতঃ, এই উষ্ণীষব্যবহার এক সময়ে রাজকীয় নিয়মের অধীন হইয়াছিল। মহর্ষি বৃহস্পতির একটি বচন-পাঠে জানা যায়, বিচারালয়ে সাক্ষ্য

* ক্ষৌমং দুকূলং দুগূলম্—হেমচন্দ্র

আপ্লুতঃ সাধিবাসেন জলেন চ সুগন্ধিনা।
রাজহংসনিভং প্রাপ্য উষ্ণীষং শিথিলার্পিতম্।
জলক্ষরনিমিত্তং বৈ বেষ্টয়ামাস মূর্দ্ধনি ॥
—আহ্নিকতত্ত্বে মহাভারত।

† পাগপাগি বান্ধে ভাঁড়ু বাড়ি চাকে কেশ।—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

প্রদান করিবার সময়ে, পাদুকা ও উষ্ণীষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবার রীতি ছিল।* অথচ আদালতে যাইয়া স্নানের ব্যবস্থা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। উষ্ণীষ লঘুত্ব ও গুরুত্বানুসারে ভিন্ন গুণ সম্পাদন করে। রাজবল্লভের মতে, লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা উষ্ণীষ কেশের হিতকর, কান্তিজনক, রজোবাত ও কফের নিবারক। গুরু উষ্ণীষ পিত্তজনক ও চক্ষুরোগকারক। বর্ত্তমান সময়ে উষ্ণীষের আকার দেখিয়া মৈথিল, মারহাট্টা, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতিকে চিনিতে পারা যায়। দেশভেদে উষ্ণীষের আকারভেদ কত কাল হইতে চলিতেছে, তাহার নিশ্চয় নাই। এইরূপ আকারভেদ দেখিয়াই বোধ হয় মেদিনীকোষকার উষ্ণীষকে চিহ্নবিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।† পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তির মস্তকেও মুকুট ও সাধারণ উষ্ণীষের অনেক রকম আকার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ও রাণীর মস্তকে ভিন্নরূপ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে রাজা ও রাণীর সাজসজ্জার অনুকারী বিবাহের বর কন্যার মস্তকে ধার্য্য শোলার শিল্প সেই প্রাচীন রীতির অনুকূলে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীপুরুষ সাধারণের মস্তকেই উষ্ণীষ-ব্যবহারের রীতি আছে।

দেবতার প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তিতে স্ত্রীপুরুষ সাধারণের মস্তকেই মুকুটের ছটা বিদ্যমান। দুর্গা কালী প্রভৃতির ইদানীন্তন মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিও মুকুট-শোভায় বঞ্চিত নহে। বরকন্যার মস্তকে অদ্যাপি মুকুট ও অর্দ্ধমুকুট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু নাট্যাচার্য্য ভরতের মতে, রমণী মহলে মুকুটধারণের ব্যবস্থা নাই। ইহার মূলে কি রহস্য আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাচীনকালে মুকুট স্বর্ণোপাদানে নির্ম্মিত হইত, এবং তাহাতে সুষমা-সম্পাদনার্থ নৈপুণ্যের সহিত হীরক খচিত হইত। প্রমাণস্বরূপ হরি-বংশের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।—"মুকুটশ্চাপতত্তস্য কাঞ্চনো বজ্রভূষিতঃ"।

---

* বিহায়োপানহুষ্ণীষৌ দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরন্।
হিরণ্যং গোশকৃদ্দর্ভান্ সমাদায় ঋতং বদেৎ ॥

পরাশরমাধবধ্যবহারকাণ্ডে।

† উষ্ণীষং কান্তিকৃৎ কেশ্যং রজোবাতকফাপহম্।
লঘুশ্রেষ্ঠ্যং তে যস্মাৎ গুরুপিত্তাক্ষিরোগকৃৎ।

‡ উষ্ণীষন্তু শিরোবেষ্টে কিরীটে লক্ষ্মান্তরে।

মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মণিভূষিত মুকুটের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ের মুকুটে স্বর্ণের অপেক্ষা মণির অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে বর্ণিত চন্দ্রাপীড়ের অনুগামী সামন্তনৃপতিবৃন্দের মস্তক মণিমুকুটে শোভিত ছিল।* কবিপ্রবর মাঘ শিশুপালের মস্তক মণিমুকুট দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। † বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসাম দেশবাসী, এই তিন জাতিকেই নিরাবরণমস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলে কোনও রহস্য আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

দুইটি গান।

বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্ত-রূপে, বাঙ্গালীকে এই গান শুনাইয়াছেন :—

"এস, এস, বঁধু এস,
আধ আঁচরে বস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
তুমি মণি নও, মাণিক নও,
যে, গলায় পরিয়া তোমায় রাখি॥
যদি নারী না গড়িত বিধি,
তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
যখন তুয়া বঁধু পড়ে মনে,
চাহি বৃন্দাবন পানে,
এলাইলে নাহি বাঁধি কেশ
যখন রন্ধনশালাতে যাই,
তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥"

---

* আবদ্ধাবনতমৌলিশিখিলমণিমুকুটপঙ্ক্তিভিঃ।

† লোলমুকুটমণিরশ্মিসটৈর্ মণবৈঃ প্রকম্পিতজগদ্ভরাং শিরঃ। ১৫।৩

আর শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থে এই গানটি দেখিতে পাইয়াছি :—

"আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসিয়া বৈস,
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিয়া আঁখি ॥
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ,
সেখানে রাখিয়া থোব ॥
কালো কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব,
পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহে প্রবোধিব,
পরিয়াছি কালো পাটের জাদ ॥
নহে তান হের নিগড় করিয়া
বাঁধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥"

প্রথমটি লোচন দাসের বিরহব্যথিতার আশার উক্তিকে আধুনিক ইংরেজী ছাঁচে ঢালিয়া কমলাকান্তের গান; দ্বিতীয়টি মহাজন-রচিত পদ—গোবিন্দ দাসের পদ। প্রথমটিতে ভাব-বিপর্য্যয় ও রস-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; দ্বিতীয়টিতে ভাবের ও রসের ঘন বাঁধুনী নিত্য বিগুমান। আমি সাধক, দ্বৈতভাব-বিধুর; সখাকে যখন একবার দেখিতে পাইয়াছি, তখন "সফল করিয়া আঁখি" তাঁহাকে দেখিব—মীনের ন্যায় নির্নিমেষ হইয়া তাঁহাকে দেখিব। দেখিতে দেখিতে "হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ, সেখানে রাখিয়া থোব"। এই ত আমার সাধ—এই ত আমার সাধনা! এই সাধ ও সাধনার কথা মহাজনের পদেইপরিস্ফুট।

কিন্তু কমলাকান্ত উল্টা কথা বলিতেছেন। তিনি বঁধুকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে "হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ" সেখানে না রাখিয়া "আধ আঁচরে" বসিতে অনুরোধ করিতেছেন। এ কথায় সরলতা ও ঘনিষ্ঠতা দেখান হইতেছে, একাত্মতার চেষ্টা কবির কথায় ফুটিয়া উঠে নাই। কমলাকান্ত বলিতেছেন যে, সখা! "তুমি মণি নও, মাণিক নও যে গলায় পরিয়া তোমায় রাখি।" সে কি? তিনি মণি নহেন? "কোটী চাঁদ নিঙড়ান সুধামাখান

ইন্দ্রনীলমণি" তিনি, তাঁহাকে "মাথে রাখি, বুকে রাখি, নাহি পাই ওর"। তাঁহাকে "পরাণ ভিতরে রহে সে রসিক"—তাঁহাকেই গলায় পরাইয়া রাখি। তাঁহাকে মালা করিয়া পরি, খোঁপায় বাঁধিয়া রাখি, "হিয়ার মাঝারে, গুপ্ত আগারে", "প্রেমের পেটিকায়, রসের কৌটায়" লুকাইয়া রাখি। রসজ্ঞ মহাজনগণ এই কথাটা যে কত রকমে, কেমন অনিন্দ্যসুন্দর ভাব দিয়া বলিয়াছেন, তাহা আর হিসাব করিয়া বলা যায় না। কমলাকান্তের কথায় রস-বৈদগ্ধ্য ভাব ঘটিয়াছে। কোনও বৈষ্ণব সাধক কমলাকান্তের কথার প্রতিধ্বনি করিতে পারেন না। ভাবের কষ্টিপাথরে কমলাকান্তের খাদটুকু ধরা পড়িয়াছে।

কমলাকান্ত বলিতেছেন—"যদি নারী না গড়িত বিধি।" আরে ছি ছি! পুরুষ ত এক তিনিই, আর কি পুরুষ এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে, না থাকিতে পারে? তিনি অতিপ্রাকৃত বিশ্বরূপ পুরুষ; প্রকৃতি-জাত আমরা সবাই নারী; তাঁহার লীলাবিতানের ক্ষেত্রস্বরূপ। বিধাতার অশেষ দয়া, তাই নারী করিয়া শ্রীমতীকে গড়িয়াছিলেন; সেই নারীদেহ শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া শ্রীমতী আজ জগৎপূজ্যা। মানে, বিরহে, উপেক্ষায় শ্রীমতী ক্ষোভ করিয়া নারী-দেহের ধিক্কার করিতে পারেন, পরন্তু মিলনসম্ভবা হইয়া, দেবতার দেবতা হৃদয়সখাকে কাছে পাইয়া, নারীদেহের জন্য বিধাতাকে তিরস্কার তিনি কখনই করিতে পারেন না। কোনও মহাজনের পদে এমন রসদূষণ ভাবের উন্মেষ নাই। যদি থাকে, তবে তাহা মহাজনের পদ নহে, সাধারণ কবির লেখা কাব্যমাত্র।

কমলাকান্ত আবার বলিতেছেন—"তুয়া হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।" কথাটা বড়ই অদ্ভুত। যাহাকে পাইবার জন্য দেশ বিদেশে আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সৃষ্টির সর্ব্বত্র যাঁহাকে পাইবার জন্য অন্বেষণ করিয়াছি, তেমন অণু হইতে অণু, মহান হইতে মহত্তর পরম পুরুষকে—"তুয়া হেন গুণনিধিকে" পাইলে, আর দেশবিদেশে ঘুরিয়া মরিব কেন? তখন তাঁহাকে "হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ সেখানে রাখিয়া থোব।" কমলাকান্তের এই কথাতে বিষম রসচ্যুতি ঘটিয়াছে। কমলাকান্তের বাকী দুইটি পদ নির্ভেজাল কাব্য—মিঠা 'পোয়েট্রি'। উহাতে সাধকজনশোভন ভাবের অভিব্যঞ্জনা নাই, আছে সামান্যা নায়িকার মনের খেদের কথা। কবির হিসাবে উহার বিচার করিতে হয় ত কর, সাধক-

রসিকের পক্ষে শেষের দুই চরণ হইতে কোনও রস আহরণের অবসর নাই। সাধনতত্ত্ববর্জ্জিত সামান্য প্রেমকাব্যকে জ্ঞানদাস কেতকীকুসুমের সহিত তুলিত করিয়াছেন। গন্ধ আছে, পরাগ আছে; মধু নাই, রস নাই। উহার চারি দিকে ভ্রমর ঝঙ্কার করে না, বরং উহার তলে কামের করাল ব্যাল সদাই বাস করে।

এইবার যাহার অনুকরণে কমলাকান্তের গান, সেই আসল মহাজন-পদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। গানটির আগাগোড়া রস-সামঞ্জস্য বিদ্যমান, কোনখানে একটি বাজে কথা নাই। কবি বলিতেছেন—এস, এস, বঁধু! এস, বসিবার জন্য আমার অঞ্চলের অর্দ্ধেকখানা বিছাইয়া দিলাম, তুমি তাহার উপর বস। অতি সন্নিকটে পাইয়া নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। কেন না, অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, তাই আজ আঁখি সফল করিয়া তোমাকে দেখিব। কেবলই কি দেখিব? তাই যেন বাহ্বাস্ফোট করিয়া, সিদ্ধ সাধকের দর্পদম্ভের সহিত, স্বীয় সাধনপদ্ধতির প্রতি প্রগাঢ়ভক্তিমান হইয়া, শ্লাঘার সহিত মহাজন বলিতেছেন,—

"বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব?
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ,
সেখানে রাখিয়া থোব।"

যাইবে কোথায় তুমি! আমার কোটী জন্মের সাধনার ফল তুমি, আমার লাখ লাখ জনমের ঈপ্সিত পুরুষ তুমি, তোমায় যখন আধ আঁচরে বসাইতে পারিয়াছি, তখন যে হিয়া অনাদিকাল হইতে তোমার বিরহে কাঁদিতেছে, সেই হিয়ার তপ্ত-অশ্রুসঞ্চিত স্নেহসরোবরে প্রাণ নামক যে শতদল কমল ফুটিয়া আছে, তাহারই মধ্যে তোমায় লুকাইয়া রাখিব;—স্থির-চপলার ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়, স্থির তড়াগবক্ষে প্রতিবিম্বিত বালারুণের ন্যায় তোমাকে লুকাইয়া রাখিব। সিদ্ধ কবি তাই আবার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন,—

"কেবা নিতে পারে, নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥"

আমার পাঁজর কাটিয়া, হিয়ার মাঝারে সিঁধ দিতে না পারিলে, সে গুপ্ত স্থানের সমাচার ত কেহ পাইবে না। আমি ত ঘুমাই না! ঘুমেরে ঘুম পাড়াইয়া সদাই সজাগ ও সজীব আছি। তাই সিঁধ কাটিতে কেহ পারিবে

না। তোমাকে যেখানে রাখিয়াছি, তোমাকে সেইখানেই থাকিতে হইবে।

ইহার উপর আরও একটু মজার—অপূর্ব্ব ভাবুকতার ইঙ্গিত আছে। কবি বলিতেছেন,—

"নহে তান হের নিগড় করিয়া,
বাঁধিব চরণারবিন্দ।"

যে নিগড় গুরুজন দেখিতে না পায়, বাহিরের লোকে জানিতে ও বুঝিতে না পারে, এমন নিগড় তৈয়ার করিয়া তোমার বৃন্দারকবন্দনীয় শ্রীচরণারবিন্দ-যুগলকে বাঁধিয়া রাখিব। এ বন্ধন ত তুমি ছিন্ন করিতে পার না, কখনও ছিন্ন কর নাই। কাজেই আর ত ভয় নাই। কবির প্রত্যেক পদে শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কবি বলিতেছেন,—

"কালো কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব,
পুরাব মনের সাধ।"

হিয়ার মাঝারে রাখিয়া যদি নিশ্চিন্ত হইতে না পারি, তবে তোমায় মাথার কালো কেশের মাঝে রাখিব। মাথার মাণিক মাথার উপরে রাখিলে নিশ্চয়ই মনের সাধ পূর্ণ হইবে। কিন্তু মাথায় রাখিলে ত লোকে দেখিতে পাইবে? তাই—

গুরু জন জিজ্ঞাসিলে তাহে প্রবোধিব,
পরিয়াছি কালো পাটের জাদ।"

কথাটার মধ্যে যে কত রসিকতা নিহিত রহিয়াছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাতে ব্যঙ্গোক্তি আছে, অর্থান্তরন্যাস আছে, কাকুর সহিত একটু তত্ত্বকথার ইঙ্গিত আছে। সেকালে যখন একবেণীর খোঁপার ব্যবহার ছিল, ঘাড়ের উপর, কেশরি-কেশরের অনুকরণে খোঁপা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত, তখন এই খোঁপাকে ঠিক রাখিবার জন্য পাটকে খয়ের ও ভ্যালা দিয়া রং করিয়া, তাহারই একটি বেণী রচিয়া, খোঁপার চারি দিকে বাঁধিয়া রাখা হইত। এই পাটের বেণীকে 'জাদ' বলিত। ফিতার ও কাঁটার অভাবে পরচুলা ও পাটের জাদ ব্যবহৃত হইত। শ্রীকৃষ্ণকে পাটের জাদ বলিয়া কেশের সহিত ঘন সামীপ্যের ইঙ্গিত করা হইল; কেশরাশির মধ্যে জাদের কুটিল গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নটবরের কৌটিল্যের প্রতিও ব্যঙ্গ করা হইল।

আসলে ও নকলে—মহাজনে ও কবিতে এত পার্থক্য। মহাজন শাস্ত্রোক্ত সাধনক্রমকে কাব্যের আবরণে ফুটাইয়া, রোচক করিয়া তুলেন। কবি

কেবল খোস খেয়ালের বশে মন-ভুলান কথা বলেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু সাগর মন্থন করিয়া এমন একটি পদ পাইবে না, যাহা শাস্ত্রসঙ্গতিবিরুদ্ধ; অথচ প্রত্যেকটিই উচ্চাঙ্গের কাব্য। শাস্ত্রের—ভক্তিসূত্রের ঈক্ষণ-যন্ত্র ব্যতীত মহাজনের কোনও পদেরই রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। কমলাকান্তের সে যন্ত্র ছিল না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুগ্ধ।

বাহিরে পূর্ণিমা হাসে শুভ্র জ্যোৎস্নায়,
দীপ লয়ে রহিবে কি ঘরে?
অদূরে অকূল সিন্ধু মেঘমন্দ্রে ধায়,
ব'সি রবে কূপের ভিতরে?

কূলে কূলে ফুলময় হাসে পদ্মবন,
অতসীর করিবে আদর?
কোকিলের কল কণ্ঠে শিহরে পবন,
শুনিবে কি পল্লব-মর্ম্মর?

জ্বলিছে কাঞ্চনজঙ্ঘা জ্যোতির মুকুটে,
দুর্ব্বাদলে দেখিবে শিশিরে?
কূলে কূলে ভরা গঙ্গা দুলে চলে ছুটে,
রহিবে কি ফল্গুনদীতীরে?

নন্দন-চন্দন-বনে মলয় অচলে
খুঁজিবে কি যূথিকার বাস?
দীপ্ত দীর্ঘ ছায়াপথ,—বনবীথিতলে
দেখিবে কি খদ্যোতবিলাস?

ছন্দে ছন্দে মধুমন্দ্রে বাজে বীণা বেণু,
  শুনিবে কি ঝিল্লীর ঝঙ্কার?
স্পর্শমণি হাতে পেয়ে ছায় স্বর্ণরেণু
  কুড়াবে কি সুবর্ণরেখায়?

কলাপে চাঁদের মালা—নাচিছে ময়ূর,
  চাহিবে কি প্রজাপতি পানে?
বৈকুণ্ঠের দ্বারে বসি' রবে স্বপ্নাতুর
  ধূলিময়ী ধরণীর ধ্যানে?

মোরা অমৃতের পুত্র, শক্তির সন্তান—
  আনন্দের উত্তরাধিকারী;—
এই রূপ, রস, স্পর্শ—এই গন্ধ, গান,
  সে সিন্ধুর বিন্দু বিন্দু বারি!

ক্ষুদ্র সুখে ঘুচে না এ প্রাণের পিপাসা,
  জ্বলে বুক রুদ্র তৃষ্ণা-ক্লেশে,
এ জহ্নু-গণ্ডূষে গঙ্গা, পুরে না যে আশা,
  দেখ দেখ নিঃশেষ নিমেষে!

ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র তৃপ্তি পলকের মোহ,
  বৃষ্টিবিন্দু তপ্ত মরুতলে।
ঘুচে অতৃপ্তির দাহ—বাসনা-বিদ্রোহ
  মহাবন্যা যদি না উথলে?

কেন মরীচিকা পানে লুব্ধ নেত্রে চাও
  বহ্নিময় এ মরু-প্রান্তরে?
পরমা তৃপ্তির লাগি' যাও—ডুবে যাও,
  সুন্দরের আনন্দ-সাগরে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

———

ভারতের নারী।

বরোদার মহারাণী ইংরেজী ভাষায় একখানি বহি লিখিয়াছেন। শ্রীযুত সিদ্ধমোহন মিত্র নামক এক জন বাঙ্গালী সহচর লেখকরূপে পুস্তকখানির

বরোদার মহারাণী।

ভাষা ও লিখনভঙ্গী সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকাল হায়দরাবাদে ছিলেন; এখন ইংলণ্ড-প্রবাসী। এই পুস্তকখানির নাম The position of

women in Indian life ; অর্থাৎ, ভারতবাসীর সংসার-যাত্রায় নারীদিগের স্থান। ইহাতে ইউরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের নারীদিগের অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ সকল দেশে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া নারী স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, অথবা স্বামীর সহচরীরূপে গৃহস্থলীর উন্নতি-বিধান করিয়া থাকেন, তাহারই আলোচনা এই পুস্তকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ রীতিপদ্ধতি ভারতের উপযোগী, ভারতের নারীসমাজের অবলম্বনযোগ্য, তাহারও নির্দ্দেশ করা আছে। এক হিসাবে পুস্তকখানি অতি উপযোগী হইয়াছে। উহার ভাষা ভাল, বিষয়বিন্যাস ভাল, উপদেশের ভঙ্গীও অতি সুন্দর। মনে হয়, এই পুস্তকখানি ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইলে ভাল হইত।

অতি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার প্রয়াসেই যে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিবই। ভারতের নারী জাতির উন্নতিকামনা করিয়াই যে লেখিকা মহারাণী পাশ্চাত্য সমাজের আলেখ্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও আমাদিগকে বলিতে হইবে। এই দিক্ দিয়া দেখিলে তাঁহার কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে আমরা পারি না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার সমর্থন করিতেই ইচ্ছা করে। কিন্তু ইউরোপ ত ভারতবর্ষ নহে; ভারতবাসী ইউরোপীয় নহে; ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের অবস্থার তুলনায় সমালোচনা সম্ভবপর নহে। প্রথম কথা, ভারতবর্ষ পরাজিত মহাদেশ; ভারত-বাসী পরাধীন প্রজার জাতি। সমাজের কতটা বিশ্লেষণ, সমাজশক্তির কতটা শৈথিল্য ঘটিলে, একটা জাতি অন্য জাতির দ্বারা পরাজিত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির যে একেবারে অব্যভিচারী ভাব নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই ভাবের অভাব জন্যই আমরা সদাই স্ব-স্ব-প্রধান; সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত; প্রত্যেকেই ভোগায়তন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির জন্য ঔৎসুক্যের চাঞ্চল্যে বিব্রত। এমন অবস্থায় কেহ কি কাহারও কথা শুনে, না শুনিতে পারে? সাক্ষাৎ স্বার্থের বন্ধনে, আপাতমধুর নগদ-বিদায়ের লোভে যাহারা বদ্ধ বা মুগ্ধ, তাহারা এক একটা লোকের এক একটা খেয়ালে আবদ্ধ হইয়া একটা আধটা কাজ করিতে পারে, করিয়াও থাকে; পরন্তু এ আনুগত্যে সমাজসংস্কার হয় না, সমাজে একটা নূতন পদ্ধতি চালান যায় না। এক এক জন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন হইয়া কিছু কালের জন্য জন কয়েক ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন

করিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রভাব প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকার মতন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। এ সকল ব্যবস্থার দ্বারা সমাজসংস্কার হইতে পারে না, স্থবির জাতির মধ্যে সজীবতা আনয়ন করা যায় না। পক্ষান্তরে, এই প্রকারের চেষ্টায় পরাজিত সমাজে যা একটু cohesiveness বা আঁট-সাঁট আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। ইহা যে কেবল আমাদের কথা, তাহা নহে; ইউরোপের সকল দেশের সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। গ্রাণ্ট এলেন প্রমুখ ইংরেজ লেখকগণও এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল বিচার করিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্র দুই দিক্ দিয়া নারীকে দেখিয়াছেন। এক ভোগের দিক হইতে, অপর গৃহধর্ম্মের দিক্ হইতে। ভোগের দিক্ হইতে নারী পুরুষের সম্পত্তি; গৃহধর্ম্মের দিক্ হইতে নারী দেবী ও সহধর্ম্মিণী। তন্ত্রে জায়াকে গৃহমাতৃকা বলে; জায়া জগদম্বার অংশরূপিণী। গৃহকর্ম্ম ব্যতীত কোনও কর্ম্মই নারীর কর্ত্তব্য নহে। নারীর পালন-ভার পুরুষের উপর চির-বিন্যস্ত। তবে আপদ্ধর্ম্মের হিসাবে নারী সূতা কাটিতে, সীবন কার্য্য করিতে, পাচিকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। ভারতের পুরাণ ও তন্ত্র নারীকে বড়ই উচ্চবেদীর উপর বসাইয়াছেন। যে সমাজে নারী রাজপথ-বিহারিণী ভিখারিণী, সে সমাজকে শাস্ত্র অভিশাপ দিয়াছেন। এই আদর্শ অনুসারে ভারতের সকল প্রদেশের আর্য্য ও শ্রেষ্ঠ সমাজ পরিচালিত। দীর্ঘ পরাধীনতার বশে যেমন শাস্ত্রগত অন্য আদর্শ পরিম্লান হইয়াছে, তেমনই নারীবিষয়ক আদর্শও ক্লেদকর্দ্দমে পরিলিপ্ত হইয়াছে। আদর্শের মালিন্য ঘটিলেও, আদর্শের প্রতি একটা ক্ষীণ ও অস্ফুট মমত্ববোধ এখনও বজায় আছে। সহসা কেহ এই আদর্শে আঘাত করিলেই স্থবির ও নিশ্চল ভারতবাসী এখনও চঞ্চল হইয়া উঠে। বিলাসের মহামোহে, অজ্ঞাতে সমাজে যে কত অনাচার ও কদাচার প্রবেশ করিতেছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। পরন্তু সজ্ঞানে—জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিলেই মতবিরোধের উৎপত্তি হয়। স্থবিরতা-জনিত এই অবসাদ দূর করিতে না পারিলে সমাজের কোনও সংস্কারই সম্ভবপর হইবে না। লেখিকা মহারাণী মহোদয়া এ বিষয়ের আলোচনা আদৌ করেন নাই। তিনি কেবল অনুরাগরঞ্জনের লোহিত আভায় পাশ্চাত্য সমাজের আলেখ্য লিখিয়া দেখাইয়াছেন। কেবল ছবি দেখাইলে কোনও ফলোদয় হইবে কি?

ভারতের নারীর ও ইউরোপের নারীর স্বভাবগত ও অবস্থাগত পার্থক্যের বিচার করিতে হইবে। ভারতের নারী, বিশেষতঃ বাঙ্গালার ও আর্য্যাবর্ত্তের নারীলতা ধর্ম্মাবলম্বিনী; বিনাশ্রয়ে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। যুগে যুগে পুরুষের আনুগত্য করিয়া, বংশপরম্পরায় শাস্ত্রাদিষ্ট নারীর কর্ত্তব্যের কথা শুনিয়া, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ-নারীর চরিতকথা আয়ত্ত করিয়া, ভারতের নারীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। বংশানুক্রমের (Heredity) প্রভাবে একটা স্বতন্ত্র সংস্কার ভারতের নারীবুদ্ধিতে যেন অনপনেয় ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছে। ইহা সহসা দূর হইবার নহে। উপরন্তু পুরুষের শিক্ষাও এই ধারণার অনুকূল। নানা কারণে ভারতের পুরুষমাত্রই এখন নারীকে কেবল ভোগ্যবস্তু বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবেও এ দুষ্ট ধারণা এখনও অপসারিত হয় নাই। এমন অবস্থায় ইউরোপের আদর্শ অনুসারে ভারতের নারীকে গড়িয়া তুলিলে তাহা কি কল্যাণজনক হইবে? প্রতিভাশালিনী লেখিকা এই বিষয়টিরও সম্যক্ আলোচনা করেন নাই।

মনুষ্য-দেহে রক্তদুষ্টি ঘটিলে সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটকের উদ্ভব হয়। যদি কোনও চিকিৎসক রক্তদুষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল এক একটি স্ফোটক লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে রোগী কি আরোগ্য লাভ করিতে পারে? সর্ব্বাগ্রে যাহাতে রক্তদুষ্টি দূর হয়, বিশেষভাবে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতের সমাজ-দেহে রক্তদুষ্টি উপস্থিত হইয়াছে; তাই সমাজ-দেহের সর্ব্বাঙ্গে বিস্ফোটক দেখা দিয়াছে। মহারাণী মহোদয়া একটি বিস্ফোটকের আরোগ্য-চিন্তায় চঞ্চল হইয়াছেন, সমাজ-শরীরের শোণিত-শোধনের জন্য তিনি ব্যগ্র নহেন। এই হেতু তাঁহার পুস্তকে যা একটু ক্রটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। ইউরোপ ও জাপান, যে দেশের কথা তিনি কহিয়াছেন, সে সকলই স্বাধীন দেশ। সে সকল দেশের সমাজের কর্ত্তা আছে, সে কর্ত্তার কথা সামাজিকগণ শুনিয়া থাকেন, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও কথানুসারে কাজ করিয়া থাকেন। কাজেই সে সকল দেশে যে ভাবে কাজ হইবে, ভারতে সে ভাবে ত কাজ হইতে পারে না। ইংরেজী-শিক্ষা ও সভ্যতার আলোড়নে যে কয়টা বুদ্বুদ্ নবানুরাগরঞ্জিত হইয়া ভারত-সমাজ-সাগরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা ইউরোপের ঐশ্বর্য্য-ভাস্করের জ্যোতিতে আত্মহারা হইতে পারে, তজ্জ্যোতিঃ-প্রতিবিম্বে প্রফুল্লিত হইয়া এক অভিনব জাতিতে পরিণত হইতে পারে।

পরন্তু তাহারা কয়টা? তাহারা ত সাগরবক্ষে ভাসিতেছে; নিম্নে যে অগাধ ও অজ্ঞেয় সলিলরাশি রহিয়াছে, তাহা ত অনড় ও অচল! এই নরসাগরের আমূল আলোড়ন ঘটাইতে না পারিলে কোনও সংস্কারই ত সার্থক হইবে না! মহারাণী ও মিত্র মহাশয় ত এটুকুও ভাবিয়া দেখেন নাই।

মহারাণী লিখিয়াছেন :—Far and wide throughout the world to-day a new energy is spreading amid the ranks of women of every class. পৃথিবীর সকল দেশেই নারী জাতির মধ্যে একটা নবীন সজীবতা পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই পৃথিবী বা এই জগতে আমাদের—ভারতবাসীর স্থান আছে কি? একটা, দুইটা, দশটা, বা হাজারটা ভাগ্যধর বা ভাগ্যবতীর কথা নহে, যে দেশে ত্রিশ কোটী নরনারীর বাস, সে দেশে এই নবীনতা-মুগ্ধ ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের প্রভাব কতটুকু, এবং কত গভীর, তাহা ত ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সংবায়ের কথা কহিতে যাইয়া মহারাণীকে একটু বিহ্বল হইতে হইয়াছে। সে কথায় ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার পূর্ণদৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই তাঁহার ইউরোপীয় যুক্তির শৃঙ্খলা তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই। ভারতের পুরাতন সংস্কাররাশির হিমগিরি ভূমিসাৎ করিতে না পারিলে, গোটা ইউরোপকে আনিয়া ভারতক্ষেত্রে বসান চলিবে না। ইউরোপের স্তুতির কন্দুক-আঘাতে এ হিমগিরির চূড়া ভাঙ্গিবে না। স্বাধীন ও পরাধীন সমাজে স্বর্গ নরকের প্রভেদ আছে। স্বাধীনের আদর্শে পরাধীনকে গড়া যায় না। সে সংঘাতে পরাধীনের বিশিষ্টতা চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হয়। বোধ হয়, মহারাণী ভারত-সমাজকে শুষ্ক সিকতা-মুষ্টিতে পরিণত করিতে চাহেন না। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিব, এই পুস্তক-প্রণয়নে মহারাণীর সাধু চেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদেশী গল্প।

জল্লাদ।

স্পেন দেশের ক্ষুদ্র মেন্দা নগরীর দুর্গশিখরস্থিত ঘড়ীতে রাত্রি দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল। উদ্যানপ্রান্তবর্ত্তী দুর্গের সুবৃহৎ ছাদের অলিন্দে ভর দিয়া জনৈক পুরুষ কি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সৈনিকের জীবন কি কঠোর, কি অনিশ্চিত, সম্ভবতঃ এই বিষয়ই তিনি আলোচনা করিতেছিলেন। বাস্তবিক, এইরূপ গভীর নিশীথে মুক্তাম্বরতলে গাঢ়চিন্তা করিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট অবসর, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

উপরে মেঘলেশহীন উদার, সুনীল আকাশ; নিম্নে বৃক্ষলতাবহুল, স্তিমিতনক্ষত্রালোকদীপ্ত মনোরম উপত্যকাভূমি অজগরবৎ দূরে বিসর্পিত; কোথাও বা চন্দ্রের কোমল আলোকে উদ্ভাসিত! সৈনিক পুরুষ মুকুলিত কমলালেবু বৃক্ষে দেহভার রক্ষা করিয়া শত-ফুট-নিম্নবর্ত্তী মেন্দা নগরীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তার পর ধীরে ধীরে দূরবর্ত্তী সমুদ্রের পানে চাহিয়া দেখিলেন। কি সুন্দর দৃশ্য! চন্দ্রকরসমুজ্জ্বল তরঙ্গমালা যেন কোনও চিত্রের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রূপার পাড়ের ন্যায় তীরভূমিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে!

দুর্গের অসংখ্য বাতায়নপথে উজ্জ্বল আলোকরশ্মিমালা নির্গত হইতেছে দুর্গমধ্যে বল নৃত্যের উৎসব চলিতেছিল। বেহালার মধুর কোমল ঝঙ্কার, নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগের কলগুঞ্জন, সামরিক কর্ম্মচারীদিগের হাস্যপরিহাসধ্বনি ও দূরাগত সমুদ্রতরঙ্গের কলোচ্ছ্বাস মৃদুপবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। দিনের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে তাঁহার শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিল। শীতল নৈশ বায়ু তাঁহার অবসন্ন দেহকে যেন সজীব ও উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। উদ্যানের পুষ্পসৌরভামোদিত পবনে যুবক যেন অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

মেন্দা দুর্গ জনৈক স্পেনদেশীয় আমীরের সম্পত্তি। বর্ত্তমান সময়ে তিনি সপরিবারে দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই দিন অপরাহ্ন হইতে দুর্গস্বামীর জ্যেষ্ঠা কন্যা এমনই আগ্রহভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন যে, ফরাসী সৈনিক পুরুষের হৃদয় সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লারা পরমসুন্দরী। তাঁহার তিনটি সহোদর, এবং আর একটি ভগিনী বিদ্যমান। তথাপি ফরাসী সৈনিক পুরুষের বিশ্বাস ছিল যে, মাকুইস্ লেগা-

নের বিপুল সম্পত্তি হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে প্রচুর যৌতুক প্রদত্ত হইবে। কিন্তু তিনি জানিতেন, স্পেনদেশীয় আভিজাত্যগর্ব্বান্ধ ওমরাহ কখনই তাঁহার ন্যায় এক জন সামান্য ফরাসী দোকানদারের সন্তানকে কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহিবেন না। বিশেষতঃ, স্পেনবাসীরা ফরাসীদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে। মার্কুইস সপ্তম ফার্দ্দিনান্দকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় দেশবাসীকে উত্তেজিত করিতেছেন, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায়, সেই প্রদেশের ফরাসী শাসনকর্ত্তা জেনারেল জি ভিক্টর মাঁর্শা ও তদধীন সেনা-দলকে মেন্‌দা নগরী রক্ষার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। মেন্‌দার সন্নিহিত জন-পদসমূহের অধিবাসিবর্গ মার্কুইস্ দে লেগানের আদেশ বেদবাক্যের ন্যায় জ্ঞান করিত। সুতরাং মেন্‌দা নগরে সেনা সন্নিবেশিত হইলে নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের অধিবাসীরা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিবে। মার্শাল নের নিকট হইতে সম্প্রতি যে গুপ্ত সংবাদ আসিয়াছিল, সামরিক কর্ম্মচারী তাহাতে বুঝিয়া-ছিলেন যে, ইংরেজের রণতরী শীঘ্রই তথায় আসিতে পারে। মার্কুইস্‌ও সম্ভবতঃ লণ্ডনে মন্ত্রিবর্গের সহিত এই বিষয়ে গোপনে চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন।

সেই কারণে, স্পেনবাসীরা সসৈন্য ভিক্টর মাঁর্শাকে সমাদরে গ্রহণ করি-লেও, তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। ছাদে যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি নগর-টিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সেখানে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দেশে এখন শান্তি বর্ত্তমান, মার্কুইস্‌ও তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনি কি করিয়া তাঁহাদের সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে পারেন? দেশমধ্যেও শান্তি বিরাজ করিতেছে, তবে শাসনকর্ত্তার মনে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইল কেন? পরস্পরবিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্যই বা রক্ষিত হইতে পারে কি করিয়া! কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয় হইতে এরূপ চিন্তা তিরোহিত হইল। তিনি অনুমান করিলেন, নিম্নবর্ত্তী নগরে বহুসংখ্যক দীপ জ্বলিতেছে। সে দিন সেণ্টজেম্‌স পর্ব্ব। তথাপি সেই দিবস প্রভাতে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, সামরিকবিধানানুসারে নিয়মিত সময়ের পর নগরের কোথাও উৎসবালোক প্রজ্বলিত হইবে না। কেবল দুর্গটিকে বাদ দিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থলে, তাঁহার নিযুক্ত প্রহরীরা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। আলোকসম্পাতে তাহাদের মার্জ্জিত সঙ্গীনগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। নগর মধ্যে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল।

আলোক জলিতেছে, অথচ কোনও উৎসবপ্রমত্ত স্পেনবাসীর কণ্ঠরব শ্রুত হইতেছে না। নগরবাসীরা কেন যে আদেশ পালন করে নাই, তাহার কারণ আবিষ্কারের জন্য তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; রহস্য অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হইল। কয়েকটি অধীন সামরিক কর্ম্মচারীকে সেই রাত্রিতে পুলিসের কার্য্য করিবার জন্য তিনি আদেশ দিয়াছিলেন; তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে এক এক বার নগর পরিভ্রমণ করিবেন, এরূপ উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছিল।

নগর-প্রবেশের মুখে যে ঘাঁটীর প্রহরী আছে, তাহার নিকট হইতে সংবাদ-সংগ্রহের আশায় সৈনিক পুরুষ যৌবনোচিত চাপল্যের বশবর্ত্তী হইয়া ছাদ হইতে নিম্নস্থ পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিলেন। সদর রাস্তা দিয়া গেলে তথায় পঁহুছিতে বিলম্ব হইবে, ততটা ধৈর্য্য তাঁহার রহিল না। তিনি লম্ফ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দূরে কাহার মৃদু পদধ্বনি শুনিয়া তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনে হইল, কঙ্করাকীর্ণ উদ্যানপথে কোনও রমণী লঘুগতিতে আসিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া তিনি পশ্চাতে চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সমুদ্রের বিচিত্র উজ্জ্বলতায় মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া গেল। তিনি পর মুহূর্ত্তে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে নাই ত? রজতশুভ্র চন্দ্রালোকে চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই উজ্জ্বলালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, দূরে—বহু দূরে, সমুদ্রমধ্যে কতিপয় অর্ণবযান অবস্থান করিতেছে, তাহাদের পালগুলি চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সৈনিকপুরুষ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন যে, ও কিছু নয়, সম্ভবতঃ তরঙ্গোপরি কৌমুদীরাশি নিপতিত হওয়ায় এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম জন্মিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় লম্ফ দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় পুরুষ-কণ্ঠে কেহ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল। তখন প্রাচীরের দিকে চাহিবামাত্র তিনি জনৈক সৈনিককে তথায় দেখিতে পাইলেন। এই সৈনিক তাঁহার সহিত দুর্গে যাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

"সেনাপতি মহাশয়, আপনি কি ওখানে আছেন?"

মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "হাঁ, কি হয়েছে?" কে যেন ভিতর হইতে তাঁহাকে সতর্কভাবে কথা কহিতে উপদেশ দিল।

"অতি গোপনে অস্ত্রের অলক্ষ্যে অনেক লোক জমা হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।"

ভিক্টর মাঁর্শা বলিলেন, "তার পর ?"

"একটা লোক দুর্গ হইতে লণ্ঠন হাতে করে' এই দিকে আসছে দেখলাম, তাই আমিও তাহার পিছনে পিছনে এসেছি। যখন লণ্ঠন হাতে আছে, তখন নিশ্চয়ই সন্দেহজনক ব্যাপার! এত রাত্রিতে কোনও খ্রীষ্টান বাতি জ্বালে না। আমি ভাবলুম যে, ওরা আমাদিগকে সাবাড় করিতে চায়। তাই তার পিছু নিয়েছিলাম। এখন দেখ্‌লুম যে, এখান থেকে দুই তিন হাত দূরে এক রাশ জ্বালানি কাঠ জমা করা রয়েছে।"

অকস্মাৎ নগরমধ্য হইতে একটা বিকট চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। সৈনিকও থামিয়া গেল। সেনাপতির মুখমণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য সৈনিক মস্তকে গুলি-বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। দশ হস্ত দূরে সহসা একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। যে কক্ষে 'বল্‌' নৃত্য চলিতেছিল, সেখানকার সঙ্গীত, বাদ্যধ্বনি ও কলহাস্য সেই মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। উৎসবের আনন্দের পরিবর্ত্তে আহতের আর্ত্তনাদ ও মরণাহতের কাতরোক্তি নৈশপবন ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাহার পর সমুদ্রের বক্ষ হইতে কামান-গর্জ্জন শ্রুত হইল।

নবীন সৈনিকপুরুষের ললাট স্বেদার্দ্র হইল। তরবারীও তাঁহার কাছে ছিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সেনাদল নিহত হইয়াছে। ইংরেজ সৈন্যও শীঘ্রই তীরে উপনীত হইবে। বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে, এ কথা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। সামরিক বিচারালয়ে তিনি আহূত হইয়াছেন, এ দৃশ্য যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল। মুহূর্ত্তমাত্র দৃষ্টিপাতে তিনি একবার নিম্নস্থ উপত্যকাভূমির গভীরতার পরিমাণ করিলেন, তার পর যেমন তিনি লম্ফপ্রদানে উদ্যত হইবেন, অমনই ক্লারা তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

তিনি বলিলেন, "পালান! আমার ভ্রাতারা এখনই আপনাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ঐ পাহাড়ের নীচে জুনিতোর আন্দালুসিয়ান নামক ঘোড়া বাঁধা আছে। যান, পালান!"

যুবতী তাঁহাকে ঠেলিয়া দিলেন। যুবক বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মরক্ষার চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র

ক্লারার নির্দ্দিষ্ট পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষেরও মনে জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা থাকে। যুবক শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি যে পথে চলিতেছিলেন, পার্ব্বত্য মেষ অথবা অজনন্দন ব্যতীত সে পথে কখনও কোনও মানব ইতিপূর্ব্বে গমন করিতে সাহস করে নাই। তিনি শুনিতে পাইলেন, ক্লারা তাহার ভ্রাতাদিগকে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। আততায়ী, হত্যাকারীদিগের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। পুনঃ-পুনঃ তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রনিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলকগুলি শোঁ শোঁ করিয়া তাঁহার কাণের পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তিনি নিরাপদে পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদদেশে উপনীত হইলেন; সেখানে একটি অশ্ব দাঁড়াইয়া আছে, দেখিতে পাইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি এক লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎগতিতে ধাবিত হইলেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে সৈনিকপুরুষ সেনাপতি জি'র শিবিরে উপনীত হইলেন। তখন সেনাপতি সদলবলে আহারে বসিয়াছেন।

যেন্দার পরিশ্রান্ত সেনানায়ক বিবর্ণমুখে বলিলেন, "আমার জীবন-মৃত্যু আপনার হাতে!"

একখানি আসনে বসিয়া পড়িয়া সেনানী সেই ভীষণ কাহিনী বিবৃত করিলেন। সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে নীরবে এই বীভৎস হত্যাকাহিনী শ্রবণ করিলেন।

সমস্ত শুনিয়া কঠোরহৃদয় সেনাপতি বলিলেন, "তোমার এ অবস্থা শুনিয়া তোমাকে অপরাধী করিতে পারি না; তোমার জন্য দুঃখ হইতেছে। স্পেন-বাসীদিগের অপরাধের জন্য তুমি দায়ী নহ। যদি মার্শাল তোমার সম্বন্ধে অন্যবিধ আদেশ প্রদান না করেন, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।"

হতভাগ্য সেনানী এ কথায় সম্পূর্ণ সান্ত্বনালাভ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সম্রাট এ সংবাদ জানিতে পারিলে কি বলিবেন!" সেনাপতি বলিলেন, "তিনি তোমাকে বন্দুকের গুলিতে মারিয়া ফেলিতে চাহিবেন। যাক্‌, সে তখন দেখা যাইবে।" গম্ভীরভাবে তিনি অবশেষে বলিলেন, এখন আর এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিসে আমরা প্রকৃত প্রতিশোধ দিতে পারি, এখন তাহারই উপায় নির্দ্ধারণ করা যাক।

যাহারা বর্ব্বরের ন্যায় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে, আতঙ্কে আর কেহ কখনও এমন কার্য্য করিতে সাহস করিবে না।"

এক ঘণ্টা পরে একদল অশ্বারোহী সৈন্য ও একদল গোলন্দাজ কামান সহ রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ব্যূহের প্রথমেই সেনাপতি ও ভিক্টর অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। সৈনিকগণ তাহাদের মেনদাস্থিত সহচরগণের শোচনীয় পরিণামের কাহিনী শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধান শিবির হইতে মেন্‌দা দুর্গ বহু দূরে অবস্থিত ; কিন্তু অত্যন্ত স্বল্প সময়ে তাহারা এই দীর্ঘ পথ অতিবাহন করিল। দেখা গেল, প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসীরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। সেনাদল প্রত্যেক পল্লী অধিকার করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল।

ইংরাজ রণতরীসমূহ তখনও তীরভূমি হইতে বহু দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করিতেছিল। পরে জানা গেল যে, জাহাজগুলি কামানবাহী পোতমাত্র। তাহারা রণতরীসমূহের পূর্ব্বে তথায় আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। সুতরাং মেন্‌দা-বাসীরা ইংরেজ-পক্ষ হইতে কোনও সাহায্য পাইল না। আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তাহারা ফরাসী সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। ইহাতে তাহারা আতঙ্কে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, অবিলম্বে স্পেনবাসীরা ফরাসীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। জেনারেল জি'র নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত ভীষণ, তাহারা ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিল ; পাছে তিনি মেন্‌দা নগর জ্বালাইয়া দেন, এবং অধিবাসিবর্গকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিবার আদেশ প্রচার করেন, সেই আশঙ্কায়, ফরাসীদিগের হত্যাকাণ্ডে যাহারা সংশ্লিষ্ট ছিল, সকলেই সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত, এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। জেনারেল জি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন যে, দুর্গের যাবতীয় ব্যক্তি—সামান্য ভৃত্য হইতে স্বয়ং মার্ক্‌ইস্‌ পর্য্যন্ত সকলকেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্পেনবাসীরা সে সর্ত্তে সম্মত হইল। তখন জেনারেল অবশিষ্ট নগরবাসীর জীবনরক্ষার আদেশ দিলেন। সৈন্যদল যাহাতে লুণ্ঠন ও নগরদাহ না করিতে পারে, সেইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি প্রচুর অর্থও দাবী করিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাবীর সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিতে হইবে। তজ্জন্য নগরের ধনকুবেরগণ জামীন হইয়া রহিলেন।

আপনার সেনাদলকে নিরাপদে রাখিবার জন্য জেনারেল যথোচিত

সাবধানতা অবলম্বন করিলেন ; নগরবাসীর রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিলেন। নাগরিকের গৃহে সৈনিকদিগকে আহার্য্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেনাদলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে জেনারেল বিজয়ী বীরের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পরিবারের সকলকেই মুখ বাঁধিয়া বৃহৎ নৃত্যাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। তাঁহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সতর্ক পাহারা রহিল।

নৃত্যাগারের পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ কক্ষে জেনারেল সদলবলে প্রবেশ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য যাহাতে তীরে অবতীর্ণ হইতে না পারে, তাহার উপায়নির্দ্ধারণের জন্য সেইখানে মন্ত্রণা-সভার বৈঠক বসিল। জেনারেলের জনৈক পার্শ্বরক্ষক মার্শাল নের নিকট প্রেরিত হইলেন। সমুদ্রতীরে কামান সজ্জিত হইল। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া জেনারেল বন্দীদিগের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। নগরবাসীরা যে দুই শত বন্দীকে ফরাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, সেনাপতির আদেশে দুর্গের ছাদের উপর তাহাদিগকে গুলি করিয়া নিহত করা হইল। সামরিক হত্যাভিনয়ের পর জেনারেল সেই স্থলে নৃত্যাগারে অবরুদ্ধ বন্দীদিগের সংখ্যার অনুপাতে ফাঁসীমঞ্চ-নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। তার পর নগর হইতে জল্লাদ আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। আহারের পূর্ব্বে ভিক্টর বন্দীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি জেনারেলের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কম্পিতকণ্ঠে সেনানী বলিলেন, "আমি তাড়াতাড়ি আসিয়াছি ; আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

বিদ্রূপভরে জেনারেল বলিলেন, "তোমার !"

ভিক্টর বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ। একটি ক্লেশকর বিষয়ের জন্য নিবেদন করিতেছি। ফাঁসীমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে, মার্কুইস তাহা দেখিয়াছেন। তিনি আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ফাঁসীর পরিবর্ত্তে সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগকে শিরশ্ছেদ করিয়া দণ্ড দেওয়া হউক।"

সেনাপতি বলিলেন, "আচ্ছা, মঞ্জুর।"

"তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মানুমোদিত অন্তিম প্রার্থনাদি করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দয়া করিয়া অনুমতি দিবেন। সেই সময়ে যেন তাঁহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা পলায়নের চেষ্টা করিবেন না, অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

সেনাপতি বলিলেন, "এ প্রার্থনাও মঞ্জুর করিলাম; কিন্তু সে জন্য তুমি দায়ী রহিলে।"

"বৃদ্ধ ওমরাহ বলিতেছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে যদি আপনি মুক্তি দেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি আপনাকে অর্পণ করিবেন।"

সেনাপতি বলিলেন, "বটে! রাজা জোসেফ ইতিমধ্যেই যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।" একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "ভাল, তাঁহারা যাহা চাহিতেছেন, আমি তাহা অপেক্ষাও কিছু বেশী দিতেছি। তাঁহার শেষ প্রার্থনার অর্থ আমি বুঝিয়াছি। ভাল, তাঁহার বংশলোপ হইবে না। পুরুষানুক্রমে তাঁহার নাম জগতে থাকিয়া যাইবে। কিন্তু স্পেনবাসীরা যখনই এ ঘটনার উল্লেখ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার পরিণাম স্মরণ করিতে পারিবে! মার্কুইসের যে কোনও পুত্র জল্লাদের কাজ করিতে সম্মত হইবে, আমি তাহাকে জীবন দান করিব, এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাহাকে সমর্পণ করিব।...থাক, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কাছে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।"

আহার্য্য প্রস্তুত। সামরিক কর্ম্মচারীরা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। শুধু ভিক্টর মাঁর্শা সে সময় সেখানে ছিলেন না। কিছুক্ষণ ইতঃস্ততঃ করিবার পর তিনি নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলেন। গর্ব্বিত লেগানে পরিবারের শেষ দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। বিষণ্ণচিত্তে তিনি সে দৃশ্য দর্শন করিলেন। গত রজনীতে, এই কক্ষমধ্যেই তিনি তাহাদিগকে হাস্যপ্রফুল্লমুখে নৃত্যগীতে যোগদান করিতে দেখিয়াছিলেন। আর আজ ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সুকুমারী কিশোরীদিগের মস্তক অত্যল্পকাল পরেই ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইবে! স্বর্ণখচিত আসনে হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায় পিতা, মাতা, তিনটি পুত্র ও কন্যা দুইটি নিঃস্পন্দভাবে উপবিষ্ট। আট জন ভৃত্যও শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান। এই পঞ্চদশটি বন্দীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা গম্ভীরভাবে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত আয়োজন, সকল চেষ্টা যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, এবং তজ্জন্য যে তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কাহারও কাহারও ললাটের রেখা দেখিয়া সে অনুমান হইতেছিল।

যে সকল প্রহরী তাঁহাদিগের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারাও

তাহাদের এই চিরশক্রদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিল। যখন ভিক্টর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সকলেরই মুখে কৌতূহল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার আদেশে বন্দীদিগের বন্ধন-রজ্জু মুক্ত হইল। তিনি স্বহস্তে ক্লারার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। যুবতী একটু ম্লান হাসি হাসিল। বন্ধন মুক্ত করিবার সময় সেনানীর বাহু যুবতীর বাহুমূলে স্পৃষ্ট হইল। সৈনিকপুরুষ মনে মনে তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি ও ক্ষীণ কটিদেশের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না।

ম্লানহাস্যে ক্লারা বলিলেন, "মত করিতে পারিয়াছেন কি ?" সে হাস্যে তখনও যেন বালিকাসুলভ সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ ছিল।

ভিক্টর একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ হইবে। তিনি দেখিতে খর্ব্বকায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনও বিসদৃশ। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও অহঙ্কার তাঁহার আননে পরিস্ফুট। প্রাচীনকালে স্পেনদেশীয় বীরের হৃদয়ে বিলক্ষণ কোমলতা ও ভাবপ্রবণতা দেখা যাইত। কঠোর হৃদয়ে এইরূপ কোমলতার জন্য স্পেনদেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের হৃদয়ে সেরূপ কোমলতার অভাব ছিল না। তাঁহার নাম জুয়ানিতো। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ফিলিপ। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হইবে। তিনি দেখিতে ঠিক তাঁহার সহোদরা ক্লারার মত। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের বয়স আট বৎসর। ক্ষুদ্র ম্যানুয়েলের আননে একটা দৃঢ়তা ছিল। ভিক্টর সকলের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে নিরাশভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। জেনারেলের আদেশ ইঁহাদের মধ্যে কে পালন করিবে ? যাহা হউক, তিনি ক্লারার নিকট কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। স্পেন-যুবতীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া তিনি পিতার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। বলিলেন, "বাবা, জুয়ানিতোকে বলুন ; আপনি তাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, সে তাহা পালন করিবে। তাহা হইলেই আমরা মনে শান্তি পাইব।"

মার্কুইস-পত্নীর হৃদয় আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু যখনই তিনি স্বামীর নিকট হইতে ক্লারার বীভৎস প্রস্তাবের কথা শুনিলেন, তখনই তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। জুয়ানিতোও সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। মার্কুইস ভিক্টরের কথামত চলিবেন, এই অঙ্গীকার করিলে, সৈনিকপুরুষ প্রহরীদিগকে স্থান ত্যাগ

করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করা হইল। তখন কক্ষমধ্যে শুধু ভিক্টর রক্ষি-স্বরূপ রহিলেন। বৃদ্ধ মার্কুইস উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জুয়ানিতো!" উত্তরে জুয়ানিতো এমন ভাবে মাথা নামাইলেন যে, তিনি পিতার আদেশপালনে সম্মত নহেন; আসনে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুশূন্যলোচনে পিতা মাতার পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি অসহনীয়। ক্লারা ভ্রাতার নিকটে গিয়া তাঁহার জানুর উপর উপবেশন করিলেন। তার পর বাহুবেষ্টনে ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিয়া তাহার নয়নে চুম্বন করিলেন, প্রফুল্লভাবে বলিলেন, "জুয়ানিতো, দাদা আমার, তোমার হাতে আমার মৃত্যু যে কত সুখকর, তাহা যদি জানিতে! জল্লাদের ঘৃণিত হস্তের স্পর্শ কি আমাকে সহ্য করিতে হইবে দাদা? এ ভীষণ বিপদ হইতে কি আমাকে রক্ষা করিবে না? অন্যে আমার দেহ স্পর্শ করিবে, তুমি কি ইহা দেখিতে পারিবে?—তবে?"

সুদীর্ঘ কৃষ্ণতার নয়নের তীব্র দৃষ্টি ভিক্টরের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। ক্লারা তখন ভ্রাতার হৃদয়ে ফরাসীদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

মধ্যম ভ্রাতা ফিলিপ বলিলেন, "সাহস অবলম্বন কর, বুক বাঁধ, নহিলে আমাদের এত বড় প্রাচীন বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না।"

অকস্মাৎ ক্লারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জুয়ানিতোর সম্মুখ হইতে সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ পিতা পুত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন গম্ভীরভাবে বৃদ্ধ বলিলেন, "জুয়ানিতো, আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি।"

যুবক কোনও উত্তর করিল না। পিতা পুত্রের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। ক্লারা, ম্যানুয়েল, ফিলিপ, তিন জনেই পিতার দেখাদেখি ভ্রাতার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। সকলেই যুক্তকরে পিতৃবাক্যের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন, "জুয়ানিতো! বংশ রক্ষা কর।"

"বৎস, তুমি কি স্পানিয়ার্ডদিগের প্রকৃতিগত সৎসাহস হারাইয়াছ? আমি তোমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া থাকিব, তুমি কি তাই চাও? নিজের জীবন ও দুঃখ যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিবার তোমার কি অধিকার আছে?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ মার্কুইস পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এ কি আমার পুত্র ম্যাদাম্?"

মাতা যন্ত্রণাবিদীর্ণহৃদয়ে, তারস্বরে বলিলেন, "জুয়ানিতো নিশ্চয় সম্মত

হইবে।" পুত্রের ললাটদেশে চিন্তারেখার পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি পুত্রের মনোভাব অবগত হইয়াছিলেন।

মধ্যমা কন্যা মারিকুইতা জননীর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া উষ্ণ অশ্রু নির্গত হইতেছিল। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ম্যানুয়েল তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সেই সময় দুর্গের ধর্ম্মযাজক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে লইয়া জুয়ানিতোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিক্টর সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্লারার নিকট ইঙ্গিতে বিদায় লইয়া আর একবার তাহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে গেলেন। জেনারেল তখন খুব স্ফূর্ত্তি করিতেছেন। সামরিক কর্ম্মচারীরা তখনও পানভোজনে ব্যাপৃত। সুরাপানে সকলেরই হৃদয়-কপাট খুলিয়া গিয়াছিল।

এক ঘণ্টা পরে জেনারেলের আদেশ অনুসারে মেন্দার এক শত প্রধান নাগরিক দুর্গের ছাদে লেগানে পরিবারের মৃত্যুদণ্ড দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইল। মার্কুইসের ভৃত্যবর্গকে যেখানে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই তল দিয়া নাগরিকগণ আসিতেছিল। দেশের জন্য যাহাদের প্রাণদণ্ড হইল, তাহাদের চরণ নাগরিকগণের মস্তক স্পর্শ করিতেছিল। এক দল সৈন্য শান্তিরক্ষার জন্য তথায় বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ফাঁসীমঞ্চ হইতে প্রায় ত্রিশ হস্ত দূরে যূপকাষ্ঠ অবস্থিত, তদুপরি শাণিত খড়্গ। যদি জুয়ানিতো এ কার্য্য করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে জল্লাদকেই তাহা করিতে হইবে। তাই জল্লাদও যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

চারি দিকে প্রগাঢ় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। অকস্মাৎ বহু ব্যক্তির পদশব্দে সে নীরবতা ভঙ্গ হইল। তখন সকলেরই দৃষ্টি দুর্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, মার্কুইস স্ত্রীপুত্রকন্যাপরিবৃত হইয়া আসিতেছেন। সকলেরই আনন প্রশান্ত, ভয়লেশশূন্য। ধর্ম্মযাজক শুধু এক জনকে উপদেশ দিতেছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, বিবর্ণ। পুরোহিত ধর্ম্মের নানা তত্ত্বকথা দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছিলেন। তখন জল্লাদ ও দর্শকবৃন্দ সকলেই বুঝিতে পারিল, জুয়ানিতো একদিনের জন্য জল্লাদের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। বৃদ্ধ দম্পতী, ক্লারা, মার্কুইস ও ভ্রাতৃযুগল যূপকাষ্ঠ হইতে কিছু দূরে জানু পাতিয়া বসিলেন। পুরোহিত জুয়ানিতোকে নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া গেলেন। জল্লাদ জুয়ানিতোকে উপদেশ দিবার

জন্য এক পাশে লইয়া গেল। ধর্ম্মযাজক বন্দীদিগকে এমন ভাবে বসাইলেন যে, কেহ কাহারও মৃত্যু চক্ষে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু সকলেই নির্ভীক-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বাগ্রে ক্লারা ভ্রাতার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "জুয়ানিতো, আমার সাহস কম, সুতরাং দয়া করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমাকে লও!"

সেই মুহূর্ত্তে কাহার দ্রুতপদধ্বনি শোনা গেল। ভিক্টর ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। ক্লারা তখন যূপকাষ্ঠে মাথা পাতিয়া দিয়া খড়্গপতনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেনানীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম ঘটিল; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তিনি ক্লারার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও, জেনারেল তোমাকে প্রাণদান দিবেন।"

স্পেন-যুবতী সগর্ব্বে ঘৃণাভরে সেনানীর প্রতি চাহিলেন। তার পর গাঢ়স্বরে বলিলেন, "জুয়ানিতো, এইবার!"

ভিক্টরের পদতলে তাঁহার ছিন্ন মস্তক লুণ্ঠিত হইল। মার্কুইস-পত্নীর দেহ একবারমাত্র কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতিতে অথবা ব্যবহারে অন্য কোনও উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল না।

ক্ষুদ্র ম্যানুয়েল বলিল, "দাদা, ঠিক হইয়াছে? মাথা ঠিক রাখিয়াছি ত?"

জুয়ানিতো ভগিনীকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "মার্কুইতা, তুমি কাঁদছ!"

বালিকা বলিল, "হাঁ দাদা, তোমার কথা ভাবিয়াই আমার কান্না আসি-তেছে। আমরা চলিয়া গেলে, কি দারুণ দুঃখেই তোমার জীবন কাটিবে!"

তার পর দীর্ঘঋজুদেহ মার্কুইস যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রকন্যাগণের রক্তে বধভূমি প্লাবিত হইতেছিল, সে দিকে একবার চাহিয়া তিনি নির্ব্বাক নিশ্চল দর্শকবৃন্দের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীর-উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, "স্পেনবাসিগণ! আমার পুত্রকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এইবার, এস মার্কুইস, ভয় করিও না, আঘাত কর; তোমার কোনও অপরাধ হইবে না।"

পুরোহিতের অঙ্গে ভর দিয়া যখন জননী যূপকাষ্ঠের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, তখন জুয়ানিতো চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মাতার স্তন্যপান করিয়াছিলাম! বুকের রক্ত দিয়া মা আমায় এত বড় করিয়াছেন!" সে কণ্ঠস্বর এমনই করুণ, এমনই বীভৎস যে, বিচলিত দর্শকবৃন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই ভীষণ চীৎকারে পানোন্মত্ত সামরিক কর্ম্মচারিগণের আনন্দধ্বনি নীরব হইয়া গেল। মার্কুইস-পত্নী বুঝিলেন, জুয়ানিতোর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। তিনি ছাদ হইতে বিদ্যুদ্বেগে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। পাহাড়ের পাষাণ-গাত্রে তাঁহার দেহ শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে জয়ধ্বনি করিল। জুয়ানিতো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এ দিকে অর্দ্ধোন্মত্ত জনৈক সেনানী বলিলেন, "জেনারেল, এই প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে মঁার্শা আমাকে বলিতেছিলেন; আমি বাজী রাখিতে পারি যে, কখনই আপনার আদেশ—"

জেনারেল জি বলিলেন, "আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, একমাসের মধ্যে ফ্রান্সের পাঁচ শত পরিবার শোকবস্ত্র পরিধান করিবে? আমরা যে এখনও স্পেনরাজ্যে রহিয়াছি, তাহা কি জানেন না? আপনারা কি আপনাদের অস্থিগুলি এ দেশে রাখিয়া যাইতে চাহেন?"

সেই কথার পর আর কোনও ব্যক্তি পানপাত্র শূন্য করিবার সাহস করিলেন না।

মার্কুইস দে লেগানে সর্ব্বজনপূজ্য ও জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেও তিনি জীবনে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন নাই। স্পেনের অধীশ্বর তাঁহাকে উচ্চ খেতাব ও সম্মান দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আত্মানুশোচনায় চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কখনও সাধারণের সহিত কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন না। বীরোচিত পাপের বোঝা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

জড় ও জীব।

অধ্যাপক শ্যাফার (Professor Schafer) জড় হইতে জীবের উদ্গম সম্ভবপর, ইহা রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া ইউরোপের

বালজাক্-রচিত ফরাসী গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। জীবতত্ত্বের সিদ্ধান্তই এই যে, জীব হইতে জীবের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, নির্জীব জড় পদার্থ হইতে সজীব প্রাণীর উদ্ভব সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক শ্বাফারের পরীক্ষা যদি সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে জীবতত্ত্বের এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করিতে হইবে। তাই এই বিষয় লইয়া ইউরোপে এক বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। এই বিতণ্ডায় স্যর ওলিভর লজ (Sir Oliver Lodge) যে কয়টি কথা কহিয়াছেন, তাহার উত্তর এখনও কেহ দিতে পারে নাই। তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জড়ই বা কি, জীবই বা কি? ইহাদের স্বরূপ কেমন? এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারে কি? সৃষ্ট সংসারে, সৃষ্ট জীবের চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সকল লইয়া, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় সকল লইয়া, আমরা যাহা দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি, বা অনুমান ও অনুভব করিতে পারি, তাহারই নানা ভাবে আলোচনা, নানা অবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া, আমরা পদার্থতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু এই সৃষ্টির অনুভূতিগম্য বা অনুমানগম্য যাহা কিছু, তাহা যে কি, তাহার স্বরূপ কেমন, সে বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার আমাদের কি আছে? যেমন A farmer moves a seed into the ground, or an egg into an incubator, and a living thing results, which might not otherwise have appeared. In other words life of a certain kind has been thereby enabled to interact with a particular portion of matter, and to display itself amid material surroundings. * * *

The nature of life not be more known than before ; any more than the nature of magnetism is known to a child, who succeeds in evoking it in a piece of steel.

এক জন কৃষক মৃত্তিকায় বীজ বপন করে, অথবা যন্ত্রবিশেষে অণ্ড রাখিয়া দেয়। কালে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয়; ডিম ফাটিয়া পাখী বাহির হয়। এই জীবোৎপত্তি অন্য কোনও উপায়ে বা অন্য কোনও অবস্থায় হইত না। অর্থাৎ, এক প্রকারের প্রাণ জড়ের অংশবিশেষের সংঘটনে, জড় বা পদার্থ-প্রতিবেশের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইল। এই উদ্ভবন অবস্থা-সাপেক্ষ। রাসায়ন পরীক্ষাগারেই হউক, ভূমিগর্ভেই হইক, ইন্কুবেটর

যন্ত্রে হউক, বা বিহঙ্গপ্রসৃতির বক্ষেই হউক, অনুকূল অবস্থার সংঘটন না হইলে জীব প্রকট হয় না। কোনটা অনুকূল, কোনটা প্রতিকূল অবস্থা, তাহা ত আমরা জানি না; কারণ, জড় ও জীবের প্রকৃত সমাচার আমরা পাই নাই। কোনটা জড় এবং কোনটা জীব, ইহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে পারি না। বালক যেমন তম্বুজ (magnetism) শক্তি ইস্পাতখণ্ডে সমাহরণ করিয়া ক্রীড়া করিতে পারে, পরন্তু উহার তত্ত্ব জানে না, তেমনই এ সকল পরীক্ষা—রাসায়ন-চেষ্টা, শিশুসুলভ ক্রীড়ামাত্র।

কথাটা এই যে, বায়লজী, বা জীবতত্ত্বে বলে যে, spontaneous generation বা স্বয়মেব জীবোৎপত্তি সম্ভবপর নহে। জীবের চেষ্টায় জীবোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধ্যাপক শ্তাফার দেখাইতে চাহেন যে, না, নিরবলম্ব বা স্বয়মেব জীবোৎপত্তি হইতে পারে। এই দেখ, আমি রাসায়ন পরীক্ষার দ্বারা জীবসৃষ্টি করিতেছি। স্যর ওলিভর লজ বলেন, তুমি কি বলিতে চাহ যে, জীবশূন্য করিয়া, প্রাণিত্বের আধার শক্তিরহিত করিয়া তুমি এই পরীক্ষা করিয়াছ? তোমার পরীক্ষায় জীবোৎপত্তির একটা অজ্ঞাত ও অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাই জীবাণু দেখা দিয়াছে। তোমার পরীক্ষায় If life results, it will be because of the properties of those materials, and of the laws of interaction of life and matter. যদি জীবোৎপত্তি হয়, তবে সে জীবোৎপত্তি উপাদানের গুণজন্য ঘটিয়াছে, এবং জীব ও জড়ের পরস্পর ক্রিয়াসামঞ্জস্য হেতু ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে। স্যর ওলিভর লজের এই শঙ্কার ও পূর্ব্বপক্ষের উত্তর অধ্যাপক শ্তাফার এখনও দিতে পারেন নাই। জড়বিজ্ঞানের প্রাবল্য হেতু ইউরোপের বৈজ্ঞানিকসমাজে যে কতটা নাস্তিকতার প্রাবল্য হইয়াছে, তাহা এই বিতণ্ডা হইতে বুঝা যায়।

মার্কিনে হিন্দু।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় তাম্রবর্ণ বর্ব্বর জাতির বাসের পূর্ব্বে, অনেকগুলি সভ্য ও শিক্ষিত জাতির বাস ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। Mound-builders বা স্তূপনির্ম্মাতা এক জাতি যে উত্তর আমেরিকার বর্ত্তমান যুক্তরাজ্যের সকল দেশ জুড়িয়া ছিল, তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। এ জাতি কি ও কেমন ছিল, তাহা পূর্ব্বে কেহ অনুমানেও ঠিক করিতে পারে নাই বলিয়া, উহাদের নির্ম্মিত স্তূপ ও জঙ্গল সকল দেখিয়া

উহাদিগকে স্তূপনির্ম্মাতা বা 'মাউণ্ডবিল্ডার' নাম দেওয়া হইয়াছে; সম্প্রতি ইহাদের নির্ম্মিত অতি পুরাতন জাঙ্গাল সকল কাটিয়া যে সব দেবমূর্ত্তি ও অস্ত্র যন্ত্র তন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা হিন্দু ছিল। অতি পুরাকালে, মহাভারতের মহাযুদ্ধের সমসময়ে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ হিন্দুপ্রভাব-সমুজ্জ্বল ছিল। বাবিলন, এসিরিয়া, চালদিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, মহাচীন প্রভৃতি দেশে হিন্দুর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল; হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার জগন্মান্য ছিল। এই সময়ে সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনাই প্রচলিত ছিল। পারস্য, এসিরিয়া ও বাবিলন প্রভৃতি দেশে বহ্নির উপাসনা ছিল; মঙ্গোলিয়া বা মহাচীন, চীন ও ভারতবর্ষে সূর্য্যোপসনা প্রবল ছিল। বিপদে, সম্পদে, দুঃস্বপ্নে সকলেই সূর্য্যার্ঘ্য দিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে ভানুমতী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিতেছিলেন, দুর্য্যোধন তাহাতেও বাধা ঘটাইয়াছিলেন। এই সূর্য্যোপাসনাকে Shamanism বা শমনউপাসনা বলা হয়। সৌরগণ বর্ষকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত না করিয়া অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিত, প্রতি মাসকে পঁয়তাল্লিশ দিনে গণনা করিত; তিন পক্ষে এক মাস ধরিত; ষড় ঋতুর স্থানে চারিটা ঋতুর কল্পনা করিত। তিথির হিসাবে দিনের নির্ণয় করিত। দিনের স্বতন্ত্র নাম ছিল না। মার্কিণের যুক্ত রাজ্যের জাঙ্গাল কাটিয়া এই প্রকারের সৌর-উপাসকগণের গণনা-প্রস্তর, যন্ত্র, পূজোপকরণ, এমন কি, গণেশ বা হেরম্বের মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। তাই কথা উঠিয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১৩০০ শতাব্দীর পূর্ব্বে মহাচীনের পথ দিয়া ভারতীয় হিন্দুগণ মার্কিণ দেশে যাইয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর যুগে যুগে শাক্ত তান্ত্রিক, লিঙ্গপূজক শৈব, নাগপূজক ও বৌদ্ধগণ মার্কিণে গিয়াছেন। উত্তর আমেরিকা হইতে ঔপনিবেশিকের প্রবাহধারা হণ্ডুরাস, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা হইয়া দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইয়াছিল। ইহারাই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় সভ্যতার বিস্তার করে। তাহার পর, কবে, কোন কালে, কোন নৈসর্গিক কারণে আমেরিকা মহাদেশ এশিয়ার সহিত সংস্পর্শশূন্য হইল, কিসের জন্য এত বড় প্রবল জাতি বর্ব্বরতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এই সকল কথা লইয়া গত সেপ্টেম্বর মাসের Indian Reviewতে অনরেবল আলেক্স ডেল্‌মার (Hon. Alex Del Mar) একটি সুন্দর সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের দীর্ঘ সমালোচনা ও বিচার

করিব, বাসনা করিয়াছি। তবে এই সময়ে আরও গোটাকয়েক কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। উত্তরে বেহরিং প্রণালী যে পূর্ব্বে প্রণালী ছিল না, আমেরিকার সহিত যুক্ত ছিল, এ কথা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন। দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সহিত এশিয়ার আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; এবং অষ্ট্রেলিয়ার পর যে দ্বীপশ্রেণী আছে, তাহা যে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির সহিত সংযুক্ত ছিল, ইহাও অনেকে অনুমান করেন। এই সকল দ্বীপ বর্ব্বর রাক্ষসের দ্বারা পূর্ণ হইলেও, উহাতে উচ্চতর সভ্যজাতির সভ্যতার জনপদের চিহ্ন সকল এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌ ডাক্তার রেণল্ডস এই সকল চিহ্নের পরীক্ষা করিবার জন্য, এই সকল দ্বীপের অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও অন্যান্য দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সহস্র কিংবা দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এশিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে যে একটা খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়াছিল, ধরিত্রী স্বদেহাবরণকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন, এমন কথাও অনেক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন। প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে, এই সকল দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্বে, সাগরতলে অনেক নিমজ্জিত জনপদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কাজেই বলিতে হয়, বিধাতার বিধানে সহসা আমেরিকার সহিত এশিয়ার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। কবে হয়, কখন হয়, তাহা এখনও কেহ জানিতে পারে নাই। আর এক কথা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেবল ভারতবর্ষ লইয়া হয় নাই, সমগ্র এসিয়া-খণ্ডের ভারতসভ্যতানুদ্ধ সকল জাতির স্বার্থ লইয়া এই ভীষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। যে শক্তি ভারতকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে এক করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সে শক্তি শিথিল হইয়া যায়। এই শৈথিল্য জন্য এশিয়ার সকল দেশ হইতে দলে দলে নরনারী উপনিবেশস্থাপনের জন্য দেশান্তরে চলিয়া যায়। এশিয়ায় একটা বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটে। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে কোন কোন শক্তিসংঘতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, কেমন করিয়া নবীন সমাজ গঠিত হয়, তাহার নির্দ্ধারণের ভার ভাবী ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর ন্যস্ত আছে। এ ন্যাস সাফল্য লাভ করিবে কি না, বিধাতাই বলিতে পারেন।

রিভিউয়ের লেখক বৈদিক জ্যোতিষগণনার উল্লেখ করিয়া অনেক সিদ্ধান্তের কথা কহিয়াছেন। সে সকলের বিচার পরে করিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরাহ্ন।

গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপের রাশি।
গোলাপের রং ছিল অনন্ত আকাশে,
গোলাপের গন্ধ ছিল ধরাতে বাতাসে,
নারীর অধরে ছিল গোলাপের হাসি॥

রং এবে গেছে জ্বলে', গন্ধ হ'ল বাসি,
শুকানো পাতার রাশি ওড়ে চারি পাশে,
বসন্ত নিদাঘে পুড়ে ছাই হয়ে আসে,
পৃথিবীতে মনে হয় হয়েছি প্রবাসী॥

অলক্ষিতে খসে' গেছে মায়া-রক্ত ঠুলি।
এ বিশ্ব মাটীর গড়া, দেখি চক্ষু খুলি॥

প্রেমের গোলাপী নেশা গিয়াছে ছুটিয়া।
যে নেত্রে আদর ছিল, হেরি অবহেলা॥
যৌবনের স্বর্ণপুরী গিয়াছে টুটিয়া।
মহাশূন্য মাঝে আজি করি ধূলাখেলা॥

অন্বেষণ।

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই।
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে অঙ্গে মেখে ছাই॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই।
খুঁজি তারে, যার গর্ভে জগৎ প্রসব॥
পূজা করি নির্ব্বিচারে শিব কি কেশব।
আজিও জানিনে কিন্তু তাতে কিবা পাই॥

রূপের মাঝারে চাহি অরূপ-দর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ-স্পর্শন॥

খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়।
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর॥
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়।
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অব্যক্তের সুর॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বঙ্গরাজশ্বশুর জগদ্বিজয়।

অল্প দিন হইল, সামলবর্ম্মরাজপুত্র ভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। ঢাকা রিভিউ ও সাহিত্য পত্রিকায় তাহার পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। * কিন্তু উভয় পত্রিকায় ভোজবর্ম্মার মাতৃকুলপরিচায়ক ১০ম শ্লোকটি যথাযথ পঠিত ও অনুবাদিত হয় নাই। আমি সেই শ্লোকটির এইরূপ পাঠ ও অনুবাদ উপস্থিত করিতেছি,—

"তথোদয়ী"-(১)-সূনুরভূৎ প্রভূতপ্রতাপবীরেষ্বপি সঙ্গরেষু।
যশ্চন্দ্রহা [স]-প্রতিবিম্বিতং স্বমেকং মুখং সম্মুখনীক্ষতে স্ম ॥"

সেইরূপ প্রভূতপ্রতাপ উদয়ীর পুত্রও জন্মিয়াছিলেন, যিনি বীরগণের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রেও চন্দ্রহাসে আপন মুখই কেবল সম্মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিতেন।

এই ১০ম শ্লোকে উদয়ীর পুত্রের নাম না থাকিলেও, পরবর্ত্তী ১১শ শ্লোকে তাঁহার নামটি এইরূপে পাইতেছি—

"তস্য মালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥"

সেই জগদ্বিজয় মল্লের কন্যা ছিলেন কামদেবের বৈজয়ন্তী মালব্যদেবী ত্রৈলোক্যসুন্দরী।

এই মালব্যদেবী অর্থাৎ মালবরাজকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরীই হইতেছেন—(ভোজবর্ম্মার মাতা) ও সামলবর্ম্মার অগ্রমহিষী বা পাটরাণী।

আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি—চেদিপতি কর্ণদেবের দৌহিত্র বঙ্গাধিপ সামলবর্ম্ম ১০৭২ খৃঃ অব্দ হইতে প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেখিতে হইবে, তৎকালে মালব রাজ্যে উদয়ী বা জগদ্বিজয় নামধেয় কোনও রাজা বা রাজবংশীয় বীরের অভ্যুদয় হইয়াছিল কি না? বাস্তবিক তৎকালে মালবের সিংহাসনে উদয়াদিত্য

* Dacca Review, July, pp. 139—145, সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৯ পৃঃ ৩৮৯—৩৯১।

(১) মূল তাম্রশাসনে 'তত্তোদয়ীসূনু' এইরূপ পাঠই আছে, কিন্তু লিপিকরপ্রমাদ হেতু 'তথা' স্থানে 'তত্ত' হইয়াছে। উভয় পত্রিকায় 'তত্ত' পাঠই গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু 'তত্ত' পাঠ গ্রহণ করিলে, ১২শ শ্লোকের সহিত অর্থসঙ্গতি হয় না। তাম্রশাসনরচয়িতা কবি পুরুষোত্তম ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শ্লোকে যেমন ভোজবর্ম্মার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ পরবর্ত্তী ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্লোকে মাতা, মাতামহ ও প্রমাতামহের উল্লেখ করিয়াছেন।

নামধেয় এক জন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিকে অধিষ্ঠিত দেখি। এই উদয়াদিত্যের নাগপুর প্রশস্তিতে লিখিত আছে, ইনি কর্ণদেবের অধিকার হইতে মালব যুক্ত করিয়াছিলেন। ১১৩৭ বিক্রম সংবৎ বা ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ উদেপুর প্রশস্তি হইতে জানা যায়, তৎকালেও উদয়াদিত্য জীবিত ছিলেন। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে উদয়াদিত্য-পুত্র জগদ্দেবের অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

আমি মনে করি, উক্ত মালবপতি উদয়াদিত্য তাম্রশাসনে উদয়ী নামে ও তৎপুত্র মহাবীর জগদ্দেবই জগদ্বিজয় মল্ল নামে অভিহিত হইয়াছেন। মেরুতুঙ্গ বিস্তৃতভাবে জগদ্দেবের যে আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ সারসংগ্রহ প্রকাশ করিতেছি—

মালব দেশে ধারানগরে উদয়াদিত্য রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই রাণী। তন্মধ্যে এক জন বাঘেলা ও অপরা শোলাঙ্কী-বংশীয়া। বাঘেলী রাণী মহারাজ উদয়াদিত্যের অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শোলাঙ্কী রাণীর অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। রাজা তাঁহার ভরণপোষণের জন্য তিনখানিমাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেই শোলাঙ্কী কন্যার গর্ভে জগদ্দেবের জন্ম। বাঘেলী রাণী রাজ-অন্তঃপুরের কর্ত্রী। সপত্নীপুত্র জগদ্দেবের রাজবাটীতে প্রবেশের অধিকার ছিল না। মধ্যে মধ্যে রাজা তাঁহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিয়া আদর করিতেন, এবং ইচ্ছামত বস্ত্রালঙ্কার দিয়া বিদায় করিতেন। বাঘেলী রাণীর নিকট সে সংবাদ পঁহুছিত। তজ্জন্য রাজাকেও মধ্যে মধ্যে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইত। জগদ্দেব ক্রমে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আর ধারা নগরী ভাল লাগিল না। অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য দুঃখিনী মাতার নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলেন। চাবড়বংশীয় রাজকন্যা বীরমতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহাকে গৃহে আনিতে পারেন নাই। তিনি ধারা পরিত্যাগ করিয়াই প্রথমে শ্বশুরের রাজ্যে পঁহুছিলেন। রাজোদ্যানে ঘটনাক্রমে বীরমতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখন বীরমতী কিছুতেই পতিকে ছাড়িলেন না, তিনি পতিব্রতা-ব্রত গ্রহণ করিলেন। কয়েক দিন পরে উভয়ে রাজরাজের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণে সোজা পথে চলিলেন। পথে জগদ্দেব প্রকাণ্ড দুইটি ব্যাঘ্র মারিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। উভয়ে শোলাঙ্ক নৃপতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজের রাজধানী পত্তনে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। এখানে সহস্রলিঙ্গ সরোবরের তীরে বৃহৎ অশ্বথবৃক্ষের ছায়ায় উভয়ে নামিয়া অশ্ব দুইটি রাখিলেন। এই সরোবরতীরে বীরমতীকে রাখিয়া জগদ্দেব বাসভবনের অনুসন্ধানে নগরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার অনুপস্থিতিকালে এক বেশ্যাকন্যা বহু আড়ম্বরে আসিয়া বীরমতীকে তাঁহার শ্বশুরের ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া হস্তগত করিল; এবং বুঝাইল যে, তাহারই বাটীতে জগদ্দেবের সহিত পরে দেখা হইবে। বীরমতী সেই বেশ্যার বৃহৎ অট্টালিকায় আসিয়া রাত্রিকাল পর্য্যন্ত জগদ্দেবকে আসিতে না দেখিয়া তাহার দুরভিসন্ধি কতক কতক বুঝিতে পারিলেন। সেই বাটীতে নগরপালের পুত্র যাতায়াত করিত। এরূপ একটি রাজকন্যা জুটাইয়া দিতে পারিলে বেশ্যা যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে, এরূপ কথা ছিল। গভীর নিশায় সেই দুষ্টা নগরপালপুত্রকে বীরমতীর ঘরে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বুদ্ধিমতী বীরমতী নিজ সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি নেশাখোর নগরপালপুত্রকে মদ খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া ছুরিকাঘাতে তাহার প্রাণবধ করিলেন, এবং গালিচা দিয়া রীতিমত জড়াইয়া রাজপথে ফেলিয়া দিলেন।

এ দিকে জগদ্দেব বাটী ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বুঝিলেন, বীরমতী কোনও দুষ্ট লোকের হস্তে পড়িয়াছেন। খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই জানিয়া তিনি নগরপালের অশ্বশালায় গিয়া একটি কর্ম্মের প্রার্থী হইলেন। নগরপাল তাঁহাকে আপনার অশ্বপরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

সেই রাত্রিতে প্রহরীরা রাজপথ দিয়া আসিবার সময় বেশ্যালয়ের সম্মুখে একটি বৃহৎ পুঁটুলী দেখিতে পাইল; মনে করিল, তাহারা পশ্চাতে আসিতেছে দেখিয়া চোরেরা উহা ফেলিয়া গিয়াছে। তাহারা নগরপালের নিকট পুরস্কার পাইবার আশায় পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া চলিল। সূর্য্যোদয় হইল। নগরপালের সম্মুখে পুঁটুলিটি উপস্থিত করা হইল।* পুঁটুলিটী খোলা হইলে নগরপাল দেখিলেন, তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পরে তিনি দলবল লইয়া বেশ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। বেশ্যা বীরমতীর ঘর দেখাইয়া দিল। বীরমতী কোনওমতে দ্বার খুলিলেন না। একটি লোক যাইতে পারে, সেই গৃহের প্রাচীরে এরূপ একটি ছিদ্র ছিল। নগরপাল ছিদ্র দিয়া সশস্ত্র লোক ভিতরে পাঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রবেশ করে কে? প্রবেশ করিবার সময় বীরমতী একে একে তিন জনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। হুলস্থূল পড়িয়া

গেল। জয়সিংহ সিদ্ধরাজের নিকটেও সে সংবাদ পঁহুছিল। তিনি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার অশ্বশালায় অশ্ব প্রস্তুত করিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। জগদ্দেব অশ্ব লইয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজা নগরপালের লোকজনকে সরাইয়া দিয়া বীরমতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! আমি এ দেশের রাজা; তোমার কোনও ভয় নাই, দ্বার খুল, এবং নিজ পরিচয় দাও।" বীরমতী ভিতর হইতে সমস্ত পরিচয় দিয়া রাজার নিকট জানাইলেন যে, তাঁহার স্বামী উপস্থিত না হইলে দ্বার খুলিবেন না। জগদ্দেব রাজার পশ্চাৎ হইতে বীরমতীকে ডাকিলেন। স্বামীর স্বর শুনিয়া বীরমতী দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজা উভয়কে মহাসমারোহে রাজভবনে লইয়া গেলেন, এবং জগদ্দেবকে পদোচিত রাজকর্ম্ম দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিন দিন জগদ্দেবের প্রতি রাজার স্নেহ ও ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মাসিক বাট হাজার মুদ্রার ব্যবস্থা হইল। রাজার এরূপ ব্যবহারে অপর সামন্তগণের যথেষ্ট ঈর্ষ্যা জন্মিল। রাজা তাঁহাদের মনোভাব জানিয়াও জগদ্দেবের প্রতি প্রত্যহই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।

জগদ্দেবের দুইটি পুত্র হইয়াছে। তিনি রাজার প্রধান শরীররক্ষী সামন্তরূপে দিন যাপন করিতেছেন। এমন সময়ে ভাদ্র মাসে অন্ধকারময়ী বর্ষার রজনীতে একদিন রাজা শুনিলেন, পূর্ব্বদিক হইতে চারি জন রমণী যেন গান করিতেছে, এবং তাহারই কিছু দূরে আর চারি জন রমণী যেন বিলাপ করিতেছে। রাজা প্রহরীকে ডাকিলেন। জগদ্দেব আসিয়া কহিলেন, "মহারাজের কি আদেশ?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগদ্দেব! এখনও পর্য্যন্ত তুমি বাটী যাও নাই কেন?" জগদ্দেব উত্তর দিলেন, "রাজাদেশ ব্যতীত কিরূপে যাইব?" তখন রাজা জগদ্দেবকে সেই গান ও বিলাপের কারণ জানিবার জন্য আদেশ করিলেন। জগদ্দেব চর্ম্মাবৃত হইয়া অসিহস্তে বাহির হইলেন। সেই দুর্য্যোগে জগদ্দেব কোথায় যায়, জানিবার জন্য রাজার কৌতূহল হইল। আরও কয়েক জন সামন্ত-রাজ রক্ষীর কর্ম্ম করিতেছিলেন। সিদ্ধরাজ তাঁহাদিকেও ডাকিয়া পূর্ব্বোক্ত সংবাদ লইবার জন্য অনুমতি করিলেন। রাজার নিকট হইতে আসিয়া তাহারা যে যাহার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। রাজা সিদ্ধরাজ * ছদ্মবেশে জগদ্দেবের অনুসরণ করিলেন।

* Paramaras of Dhar and Malwa, by Captain C. E. Luard. P. 28.

যে দিক হইতে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত বিলাপধ্বনি আসিতেছিল, জগদ্দেব বরাবর সেই দিকে আসিয়া দেখিলেন যে, কয়েক জন রমণী রোদন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জগদ্দেব কহিলেন, "তোমরা কে? ডাকিনী, যোগিনী, অথবা প্রেতিনী? এই মহানিশায় তোমরা কেন রোদন করিতেছ?" তাঁহারা অতি কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "আমরা পত্তনের ভাগ্যলক্ষ্মী। আগামী কল্য দশ ঘটিকার সময় সিদ্ধরাজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর কে তাঁহার মত যাগ, যজ্ঞ, বলি ও দান করিবে? তাই আমরা কাঁদিতেছি।" রাজা সিদ্ধরাজও সে কথা শুনিলেন।

পরে যাঁহারা মধুর কণ্ঠে গান গাইতেছিল, জগদ্দেব তাহাদিগকেও আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের আনন্দ-সঙ্গীতের কারণ কি?" সেই কোকিলকণ্ঠী রমণীরা উত্তর করিলেন, আমরা দিল্লীর ভাগ্যলক্ষ্মী। এই দেখ, রথ প্রস্তুত। কাল আমাদেরই হস্তে সিদ্ধরাজের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে; তাই আমরা আনন্দ করিতেছি।" জগদ্দেব কাতরকণ্ঠে জানাইলেন, "বর্ত্তমানকালে সিদ্ধরাজের মত ধার্ম্মিক দানশীল রাজা আর নাই। আপনারা দয়া করিয়া বলুন, কিরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "যদি তাঁহার মত উচ্চ-রাজবংশীয় কেহ প্রাণোৎসর্গ করেন, তাহা হইলে, সিদ্ধরাজের প্রাণরক্ষা হইতে পারে।"

অতঃপর কালবিলম্ব না করিয়া জগদ্দেব বীরমতীকে সকল ব্যাপার জানাইলেন। ধর্ম্মশীলা বীরমতী উত্তর করিলেন, "'এমন দিন কি হবে? এই জীবন-উৎসর্গের জন্যই আমরা ধন, জন, ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। প্রভুর জন্য জীবনদান রাজপুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। বল, আমরা সপুত্র রাজার জন্য প্রাণ দান করিব।" পতি ও পত্নী দুই জনে দুই পুত্র কোলে করিয়া ভাগ্যনারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জগদ্দেব কহিলেন,—"আমার মাথা দিলে রাজার কত বর্ষ পরমায়ু বর্দ্ধিত হইবে?" ভাগ্য উত্তর করিলেন, "বার বর্ষ।" "যদি আমরা চার জনেই মাথা দিই?" "তাহা হইলে ৪৮ বর্ষ।" "বেশ; তাহাই হইবে" এই বলিয়া জগদ্দেব পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন। বীরমতী ক্রোড় হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অর্পণ করিলেন। জগদ্দেব অগ্রে জ্যেষ্ঠপুত্রের মাথা কাটিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় পুত্রটি লইয়া যখন কাটিতে যাইবেন, তখন ভাগ্যলক্ষ্মীরা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "জগদ্দেব! তোমার প্রভুভক্তিতে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তোমার জন্য সিদ্ধরাজ আটচল্লিশ বর্ষ রাজত্ব করিবেন।" এই বলিয়া তাঁহারা মৃতশরীরে অমৃতকুণ্ডের জল ছিটাইয়া দিলেন। তাহাতে জগদ্দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র আবার বাঁচিয়া উঠিল। তখন পরমানন্দে জগদ্দেব সপরিবারে গৃহে ফিরিলেন। রাজা সিদ্ধরাজও প্রাণদাতা জগদ্দেবের প্রভুভক্তির প্রশংসা করিতে করিতে রাজভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন রাজসভায় সিদ্ধরাজ জগদ্দেবের জন্য তাঁহার জীবনবৃদ্ধির কথা ও অপর সামন্তগণের রাজাদেশপালনে অক্ষমতা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। সেইদিন হইতে প্রজাবর্গ রাজা সিদ্ধরাজ ও জগদ্দেবকে সমতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধরাজও জগদ্দেবকে প্রধান সামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানারূপে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। মেরুতুঙ্গ তৎপরে জগদ্দেবের সম্বন্ধে আরও অনেক অভূতপূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল ঘটনার ঐতিহাসিকের চক্ষে কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। তন্মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কালভৈরবকে পরাজয় এবং চামুণ্ডাদেবীকে তাঁর মুণ্ডদান প্রধান ঘটনা। চামুণ্ডামাতা চারণীর বেশে সিদ্ধরাজের সভায় ভিক্ষা করিতে আসেন। জগদ্দেব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্রমে পত্তন-সভায় জগদ্দেবের প্রতিপত্তি এত বাড়িয়াছিল যে, সকলে সিদ্ধরাজ অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক সম্মান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধরাজ তাহাতে ধারা-রাজকুমারের নিকট আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া ধারানগরী আক্রমণের আয়োজন করিলেন। জগদ্দেব এ সংবাদ শুনিবামাত্র পত্তন-রাজের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন, এবং জন্মভূমি ধারা নগরীতে আসিয়া পিতৃরাজ্যরক্ষায় মনোযোগী হইলেন।

মেরুতুঙ্গ তাঁহাকে ধারার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক শিলালিপি ও তাম্রফলকে তাঁহার আধিপত্যলাভের প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবপ্রকাশিত মালব ইতিহাস হইতে আমরা পাইতেছি যে, মালবরাজ উদয়াদিত্যের তিন পুত্র, প্রথম লক্ষ্মদেব, দ্বিতীয় নরবর্ম্মা, তৃতীয় জগদ্দেব। উদয়াদিত্যের মৃত্যুর পর প্রথমে লক্ষ্মদেব ও তৎপরে নরবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন, জগদ্দেব কখনও রাজা হন নাই। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে ভাটদিগের গ্রন্থে এই কবিতাটি পাওয়া যায়।—

"সম্বৎগাররসৌ একাবন চৈৎ সুদী রবিবার।
জগদেব সীস সমপিয়ে ধারানগরে পবার॥"

অর্থাৎ, ১১৫১ বিক্রম-সংবতে (১০৯৪ খৃঃ অঃ) চৈত্র শুক্লপক্ষে রবিবার দিবসে ধারানগরের পরমার জগদেব কালীদেবীকে মাথা দিয়াছিলেন। *

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

আর্য্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বিগত শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত "আর্য্য" নামক প্রবন্ধে দেখাইতে যত্ন করিয়াছি—

(১) ঋগ্বেদে যাঁহারা "আর্য্য" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে এক বীজপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা একাকৃতি ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শ্বেতাঙ্গ ও কেহ শ্যামাঙ্গ ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণের বংশধরেরাই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কর্তৃক গৌর ও কপিলকেশ ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

(২) শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণ হয় ত কোনও শীতপ্রধান দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এবং শ্যামাঙ্গ আর্য্য-গণ গ্রীষ্মপ্রধান পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়াছিলেন।

(৩) শ্বেতাঙ্গ ও কপিলকেশ ঋষিগোত্রজগণ হয় ত আদিম আর্য্য ; অর্থাৎ, আর্য্যভাষা ও আর্য্যসভ্যতার শিক্ষাগুরু।

কিন্তু সেই প্রবন্ধে (২) এবং (৩) এর সবিস্তার আলোচনা করিবার অবসর লাভ করি নাই। ভারতে যাঁহারা আর্য্যভাষা ও আর্য্যসভ্যতার শিক্ষাগুরু, মধ্য-এসিয়া তাঁহাদের আদিনিবাসস্থান, স্কুলপাঠ্য ভারতেতিহাস হইতে আমরা ইহাই শিক্ষালাভ করিয়াছি। ইদানীং অনেকে, সুমেরুক্ষেত্র আর্য্য-গণের আদিনিবাসস্থান, পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক প্রচারিত এই মতবাদ (theory) শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত অগষ্ট মাসের "মডারণ রিভিউ" পত্রে প্রবীণ লেখক প্রত্নবিৎ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

---

* যাঁহারা জগদ্দেব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধ-চিন্তামণি, গুজরাতের রাসমালা ও Paramaras of Dhar and Malwa পাঠ করিতে পারেন।

"ভারতের আর্য্যগণ" (The Aryans of India) নামক প্রবন্ধে এক অভিনব মতবাদ অথবা অভিনব যুক্তি অবলম্বনে একটি পুরাতন মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন করিয়াছেন।* এবং সেই সূত্রে "মডারণ রিভিউ"এর স্তম্ভে এই বিষয় লইয়া আলোচনারও সূত্রপাত হইয়াছে। বিজয় বাবুর সহিত আমার কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, তিনি "মডারণ রিভিউ" পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের আলোচনার আয়োজন করিয়া যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। জাতিভেদের ভিত্তির উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, এবং জাতিতত্ত্বের আলোচনা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ, জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে এ দেশে প্রতিবৎসর অনেক গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু এ সকল গ্রন্থ প্রায়ই অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত, এবং একদেশদর্শিতা-মূলক। এ সময় যাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাতিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহারা যে সুধু জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন নহে, তাঁহারা সামাজিক কল্যাণেরও সূচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাতিতত্ত্বের আলোচনার অন্যতম পথপ্রদর্শক, মদীয় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত শশধর রায়। বিজয় বাবুকেও তাঁহার জাতিতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধগুলির বঙ্গানুবাদ প্রচার করিতে অনুরোধ করি। আমার প্রথম প্রস্তাবে ধৃত বচন-প্রমাণ অনুসারে বৈদিক আর্য্যগণের আদিম বাসক্ষেত্র কোন দিকে নিরূপিত হইতে পারে, এই প্রস্তাবে তাহারই আলোচনা করিব।

বিজয় বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতে আর্য্য-গণ আগন্তুক নহেন, ভারতবর্ষই আর্য্য-গণের আদিনিবাসক্ষেত্র। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রথম যুক্তি,—"There is nothing in the whole of the Vedic literature to suggest that the Aryans of India did ever cross the Indus or did at any time live on the other side of it." (pp 144-145) অর্থাৎ, সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে এমন কিছু নাই, যা হইতে মনে করা যায় যে, ভারতীয় আর্য্যগণ কখনও সিন্ধুনদ পার হইয়াছেন, বা কখনও সিন্ধুনদের

* "জর্ণাল অফ্ দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর" ষোড়শখণ্ডে এ. কর্জন (A Curzon) নামক এক জন লেখক, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের আদিনিবাস ভূমি এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। Muir's Sanskrit Texts vol II, Chap. II. sect. vl.

অপর পারে বাস করিয়াছেন। বিজয় বাবুর দ্বিতীয় যুক্তি,—চারি দিক্‌বাচক পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ শব্দ সংস্কৃত (এবং জেন্দ) ভিন্ন অন্য কোনও আর্য্যভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমার ভাষাতত্ত্বে অধিকার নাই, সুতরাং বিজয় বাবুর দ্বিতীয় যুক্তির বলাবল-বিচার আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু একটি কথা বলা যাইতে পারে। যদি দিক্‌বাচক শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে, সংস্কৃত ব্যতীত অপরাপর সমস্ত আর্য্যভাষার দিকবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তির বিচার করিয়া, সিদ্ধান্ত-স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ভরসা করি, বিজয় বাবু তাঁহার প্রতিশ্রুত আর্য্যতত্ত্বসম্বন্ধীয় অপর প্রবন্ধে তাহা করিবেন। বিজয় বাবুর প্রথম যুক্তির প্রতিকূলে আমার প্রথম প্রস্তাবে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের দুইটি বচন (৬।২০।১২ ; ৬।৪৫।১ ; সাহিত্য ; ১৩১৯ ; ২৮৩ পৃ) উল্লিখিত হইতে পারে। প্রথমোক্ত বচনে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ইন্দ্র তুর্ব্বস ও যদুকে সমুদ্র পার করাইয়া আনিয়াছিলেন। কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "সমুদ্র" শব্দ সাগর অর্থে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা মনে করেন, ঋষিরা সিন্ধু নদের সুপ্রশস্ত দক্ষিণাংশকে "সমুদ্র" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ মনে করিবার একমাত্র কারণ, আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, এই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার। ক্ষণকালের জন্য এই সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিবেচনা করিলে, ঋগ্বেদে ব্যবহৃত "সমুদ্র" শব্দকে প্রকৃত সমুদ্র অর্থে গ্রহণ করিবার কোনও বাধা থাকে না। ঋগ্বেদ ভিন্ন আর কোনও বৈদিক গ্রন্থে যাদবগণের ও তুর্ব্বসগণের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাভারত হইতে জানা যায়, যাদবগণ সৌরাষ্ট্র বা কাঠিওয়ারের অধিবাসী ছিলেন, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তিনী দ্বারকা তাঁহাদের প্রধান নগরী ছিল। মহাভারতে কুরুবংশীয় যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দেবাপি ও শান্তনুর নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কাঠক-সংহিতায়, বিচিত্রবীর্য্য ও তৎপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারত সাক্ষ্যদান করিতেছে,—শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য ও ধৃতরাষ্ট্রের সমসময়ে যাদবগণ সমুদ্রতীরবাসী ছিলেন। ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য এই, মহাভারতে পরিরক্ষিত প্রাচীন জনশ্রুতি অনুসারে যাদবগণ বৈদিকযুগে সমুদ্রতীরবাসী ছিলেন। যদুর ও তুর্ব্বসের সমুদ্রের পরপার হইতে আগমনসম্বন্ধীয় ঋগ্বেদোক্ত জনশ্রুতির সহিত মহাভারতোক্ত

এই জনশ্রুতি একত্র বিচার করিলে অনুমান হয়, যাদবগণ সমুদ্রের অপর পার হইতে আগমন করিয়া সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

আরবসাগরের অপর পার হইতে আর্য্যভাষাভাষী ইন্দ্র-উপাসক (ইন্দ্র-কর্ত্তৃক আনীত) আগন্তুকগণের জলপথে আসিয়া সৌরাষ্ট্রে উপনিবেশস্থাপন অসম্ভব নহে। সিরিয়া দেশের উত্তরাংশে ইউফ্রেটীস নদের উত্তর দিকে মিটেনি (Mitani or Mitanni নামক জাতি বাস করিত। মিশরের (ইজিপ্টের) অষ্টাদশ রাজবংশের রাজন্যবর্গের লিপি হইতে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের ষোড়শ শতাব্দে মিটেনিরাজ উত্তর সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মিশরের সম্রাট তৃতীয় টেথমোসিস (আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) ইউফ্রেটীস নদ পার হইয়া মিটেনিগণের রাজ্য ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি মিটেনি-রাজগণ মিশরের সম্রাটকে কর প্রদান করিতেন। তৃতীয় টেথমোসিসের প্রপৌত্র তৃতীয় ত্রমেনোফিস মিটেনিরাজ "সুত্তর্ণে"র দুহিতা "নিলুখিপা"কে বিবাহ করিয়াছিলেন। "সুর্ত্তণে"র পরলোক-গমনের পর তদীয় পুত্র "দুষ্‌রত্ত" মিটেনিরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। "অর্ত্তসুবর" নামক আর এক জন রাজকুমার "দুষ্‌রত্ত"কে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বিদ্রোহী হওয়ায় "দুষ্‌রত্ত" তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করিয়াছিলেন, এবং এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া মিশরের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী (গিলুখিলা) যেন অসন্তুষ্টা না হয়েন, এই উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপহার-দ্রব্য সহ সম্রাটের নিকট বিদ্রোহের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বিশেষ বিনীতভাবে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বেবিলনে ও এসিরিয়ায় প্রচলিত কিউনিফর্ম অক্ষরে উৎকীর্ণ এই পত্র মিশরের অন্তর্গত টেল্‌-এল-অমর্ণ নামক ভগ্নস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন টেল-এল-অমর্ণের লিপিনিচয়মধ্যে "সৌক্ষতর" (সোক্ষত্র) এবং "অর্ভতম" নামক আরও দুই জন মিটেনি রাজের নাম পাওয়া গিয়াছে। নৃপতিগণের যে নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "অর্ত্তমন্য," "ময়র্জন", "সুবন্দু", "সুবর্দত" ও "যশদত" নাম দৃষ্ট হয়। মিটেনি রাজগণের ও এই সকল নৃপতিগণের নাম প্রাচীন পারস্য বা ইরাণী ভাষার ও সংস্কৃত ভাষার সহিত সম্পর্কিত কোনও বিলুপ্ত আর্য্যভাষা হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং মিটেনিগণ ও সিরিয়ার অপরাপর অংশের কতক লোক আর্য্যভাষাভাষী ছিলেন, পণ্ডিতগণ অনেক দিন যাবৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া-

ছিলেন।* ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক উইঙ্ক্‌লার (Winckler) কর্তৃক এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত বোগাজকুই নামক স্থানে আবিষ্কৃত দুইখানি কিউনিফর্ম অক্ষরের লিপিতে মিটেনিগণের অবলম্বিত ধর্ম্মেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুইখানি লিপি হিটাইট-রাজ সুব্বিলুলিউমের ও মিটেনি-রাজ দুষ্‌রত্তের পুত্র মত্তিউয়জের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রে উভয় রাজ্যের উপাস্য দেবতাগণকে সাক্ষী করা হইয়াছে, এবং মিটেনি-রাজ্যের উপাস্য দেবতার মধ্যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য-দ্বয়ের নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। এই সন্ধিপত্রের আনুমানিক সম্পাদন-কাল ১৩৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। সুতরাং বোগাজকুই লিপিতে পাওয়া গেল, আর্য্য-ভাষাভাষী সিরিয়ার মিটেনিগণ বৈদিক দেবতার উপাসক ছিলেন। এসিয়ার পশ্চিমাংশের প্রাচীন মানবচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, মিটেনি রাজ্যের সীমান্তে সুবিস্তৃত বেবিলন রাজ্য অবস্থিত ছিল, এবং তাহা পারস্যোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে পারস্যোপসাগর ও আরব সাগর অতিক্রম করিয়া সৌরাষ্ট্রে ইন্দ্র-উপাসক ও সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কিত আর্য্যভাষা-ভাষী ঔপনিবেশিকের আগমন অসম্ভব মনে করা যাইতে পারে না। মিটেনিগণ আর্য্যভাষাভাষী ও আর্য্যধর্ম্মী ছিলেন, এবং বেবিলনীয়গণ সেমিটিক-ভাষাভাষী ছিলেন। বেবিলন রাজ্যের ভিতর দিয়া যে সকল আর্য্য ঔপনিবেশিক সৌরাষ্ট্রে আসিয়াছিলেন,তাঁহাদের দেহে অবশ্যই সেমিটিক রুধির প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাঁহারা সম্ভবতঃ মিটেনি ত্যাগ করিয়া প্রথম বেবিলনে আসিয়া উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং পরবর্ত্তী কালে কোনও কারণে বেবিলন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জলপথে সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে যদু ও তুর্ব্বস, অনু. পুরু. ও দ্রুহ্যর সহিত একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। নিঘণ্টু নামক প্রাচীন বৈদিক অভিধানে যদু, অনু, তুর্ব্বস, দ্রুহ্য ও পুরু মনুষ্য শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে বা জাতিবাচক বলিয়া বিখ্যাত

* "The names Artashuvara and Artatama open out with the syllables *arta*—, familiar to Western students of history as part of the numberless Persian names like Artaxesxes Artaphernes, etc. This stem *arta* is identical with *arta* of the western Iranian, Achemenidiar, inscriptionswith *asha* of the Avesta and with *rita* of the **Veda. M.** Bloomfield, *the Religion of the Veda* (New York. 1908), p. 12.

হইয়াছে। মহাভারতে যদু প্রভৃতি শব্দ জাতিবাচক নহে, ব্যক্তি বাচক,—যযাতির পাঁচ পুত্রের নাম। জাতিতত্ত্বের হিসাবে মহাভারতোক্ত রাজা যযাতি ও তাঁহার পাঁচ পুত্র বিষয়ক আখ্যানের অর্থ যদু, তুর্ব্বস, অনু, দ্রুহ্যু ও পুরুগণ একবংশোদ্ভব বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অনু, দ্রুহ্যু ও পুরুগণ হয় ত আদৌ যদু ও তুর্ব্বসগণের জ্ঞাতি ছিলেন, এবং বেবিলনের দিক হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বেবিলেন রাজ্যের উত্তর দিকে জেগ্রস নামক পর্ব্বতমালার মধ্যে কস্‌ বা কসাই জাতি বাস করিতেন। ইঁহারা সূর্য্যকে "সুরিয়স" সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন, এবং ইঁহাদের আর এক জন উপাস্য দেবতার নাম "মরুত্তস্‌"।* সুরিয়স ও "মরুত্তস্‌" নামক আর্য্য প্রভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং কাসাইটগণের বাসভূমির দিক্‌ হইতে স্থলপথে সূর্য্য ও মরুতের উপাসকগণের ভারতবর্ষে আগমন সম্ভবপর।

ঋগ্বেদোক্ত দুই শ্রেণীর "আর্য্য" মধ্যে যজমান শ্রেণীর যদু ও অন্যান্য জনগণ যাঁহারা বেবিলনের পথে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্যামাঙ্গ বেবিলনীয় সেমিটিকগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্যামাঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে পুরোহিত শ্রেণীর কণ্বকে শ্যামাঙ্গ বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণমতে, কণ্ব পুরুবংশোদ্ভব অর্থাৎ আদৌ যজমানশ্রেণীভূক্ত ছিলেন (সাহিত্য, ১৩১৯, ২৮১, পৃ) সুতরাং কণ্বের শ্যামাঙ্গ হইতে যজমান শ্রেণীর শ্যামাঙ্গত্ব সূচিত হয়।

তার পর জিজ্ঞাসা, অপর বা পুরোহিত শ্রেণীর "আর্য্য"-মধ্যে বশিষ্ঠগণের ন্যায় যাঁহারা শ্বেতাঙ্গ, বা পতঞ্জলির মতে যে সকল ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশবিশিষ্ট, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী বা আগন্তুক? ভারতভূমির উপর সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বর্ষণ করেন, এবং ভারতের বায়ু জলীয় বাষ্পের ভারে আক্রান্ত। এইরূপ জলবায়ুর মধ্যে গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশবিশিষ্ট জাতির অভ্যুদয় অসম্ভব। প্রাচীন মিটেনি রাজ্যের অনতিদূরে, এসিয়া মাইনরের পূর্ব্বাংশ হইতে পারস্যের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুর্দিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্য্যভাষাভাষী গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশ মনুষ্য অদ্যাপি দৃষ্ট হয় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার ফেলিক্স ভন লুশন ত্রিশ বৎসর কাল পশ্চিম এসিয়ায় জাতিতত্ত্বের ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া অনুসন্ধানের ফল ১৯১১ সালের "হক্‌সালি স্মারক বক্তৃতা"য় প্রকাশিত করিয়াছেন।

ডাক্তার লুশনের এই বক্তৃতার শিরোনাম "পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন অধিবাসী" *Early inhabitants of Western Asia*। তিনি এই বক্তৃতায় কুর্দিস্থান-বাসী কুর্দ্দিগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—তাঁহারা অধিকাংশই গৌরাঙ্গ কপিলকেশ-(fair-hair) বিশিষ্ট; তাঁহাদের মস্তক দীর্ঘ, অর্থাৎ, মস্তকের প্রাশস্ত্য ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত ৪/৫ এর ন্যূন। ডাক্তার লুশন কুর্দ প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন,—*

"So the Kurds are descendants of Aryan invaders and have maintained their type and their language for more than 3,300 years."

"অতএব কুর্দগণ আর্য্য আক্রমণকরিগণের বংশধর, এবং ৩৩০০ বৎসরেরও অধিক কাল আপনাদিগের ভাষা এবং আকৃতি অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

কুর্দগণ কোথা হইতে পশ্চিম এসিয়ায় আসিয়াছেন, অর্থাৎ আর্য্যগণের আদিমবাসস্থান কোথায়,ডাক্তার লুসান এ প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করেন নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন,— ইউরোপের উত্তরাংশের অধিবাসিগণের (Nordic Race) উৎপত্তি যে দেশে, কুর্দগণের উৎপত্তিও সেই দেশে। গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশ ভারতীয় আর্য্যগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, কুর্দিস্থান ভিন্ন এসিয়ার আর কোথাও ইহাদিগের জ্ঞাতিগণের বংশধর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইঁহারাও ঐ একই দিক হইতে—পশ্চিম এসিয়া হইতে—স্থলপথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ ও কপিলকেশ ভারতীয় আর্য্যগণের, আদিম মিটেনিগণের ও কুর্দগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একদেশবাসী ও একগোত্রীয় ছিলেন।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

হরিহর ছত্রের মেলা।

১

এই বৎসর, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৯১২ নবেম্বর মাসের, হরিহর ছত্রের মেলা, অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা ঘটা ও আড়ম্বরের সহিত হইতেছে। 'হইতেছে',—কারণ, এখনও মেলা শেষ হয় নাই। ঠিক কখন শেষ হইবে, তাহা এখন নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব যতটুকু দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহার কথা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

* Journal of the Royal Anthropological Institute 1911, p. 230.

আপনারা জানেন বোধ হয় যে, হরিহর ছত্রের মেলা সোনপুরে প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। নারায়ণী কিংবা গণ্ডকী এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে সোনপুর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বদিকে ত্রিহুত জেলার মহকুমা হাজিপুর এবং দক্ষিণ দিকে পাটনা, অর্থাৎ বিহার প্রদেশের পুরাতন রাজধানী পাটলিপুত্র। ইন্দ্রপ্রস্থ কিংবা দিল্লী যেমন পৌরাণিক যুগের রাজধানী, পাটলিপুত্রকেও তেমনই ঐতিহাসিক যুগের রাজধানী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র ভারতবর্ষের না হউক, অন্ততঃ বহু প্রবলপ্রতাপান্বিত হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিগণের ইহা এককালে রাজধানী ছিল। সম্রাটের অনুজ্ঞানুসারে দিল্লীর পুনরুত্থানে যেমন ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্ব্বগৌরব প্রদীপ্ত হইয়াছে, বিহার ও বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিয়া পাটলিপুত্রের পুনর্গঠনসঙ্কল্প রাজকর্ম্মচারীগণের ততোধিক সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছে।

হরিহর ছত্রের মেলার ভিত্তি হরিহর দেবের মন্দির। কবে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। হরিহরের সম্মিলন অপূর্ব্ব লীলা। ইহার তথ্য ভক্তগণই জানেন। তবে যাঁহারা ভূগোলবৃত্তান্তের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের জ্ঞাতার্থ বলা যাইতে পারে যে, বৈকুণ্ঠ (কিংবা হিমালয়ের পরপারের ভূমি এবং কৈলাস কিংবা ভৌম হিমালয়) হইতে এক দিকে হরি, এবং অন্য দিকে হর মিলনার্থ যদি কোনও যুগে বহির্গত হইয়া থাকেন, তবে সোনপুরেই তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্ভব। তাহাই জনশ্রুতি। গঙ্গা বাহিনী হর, এবং নারায়ণী বাহিনী হরি, উভয়ে যে অপূর্ব্ব স্থানে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই আধুনিক হরিহরের মন্দির।

কিন্তু মন্দির লইয়াই লীলা সাঙ্গ হয় নাই। হরের সহিত ভূত প্রেতের এক প্রকাণ্ড ফৌজ আসিয়াছিল, এবং হরির সহিত বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণ, এবং তৎপশ্চাতে মর্ত্ত্যের ভক্তগণও আগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কেবল মানব নহে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণও সেই মহামেলায় উপস্থিত হয়। পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বিমানচারী, এবং স্থলচর ও জলচর পক্ষী, গাধা, ঘোড়া, গরু, বানর উষ্ট্র এবং বিশালদেহ হস্তী, দলে দলে নৃত্য করিয়া মহামেলার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

নানা জীব জন্তুর আগমনে একটা বিবাদের সূত্রপাত হয়। জিঘাংসাবশতঃ লাঙ্গুল, দন্ত, হস্তপদাদি লইয়া প্রাণিবর্গ পরস্পরকে সংহার করিতে উদ্যত! রণস্থলে ভূতপ্রেত পিশাচাদির নৃত্য, এবং হরিভক্তগণের জীবক্ষয়জনিত ত্রাস দেখিয়া ডমরুধ্বনি করিয়া এক দিকে হর ও মুরলীহস্তে অন্য দিকে হরি, তথায় দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একত্রিত হইলেন। বিস্মিতনেত্রে ত্রিলোকবাসী সংহার ও পালনের একাসনে স্থিতি ও উভয়ের অর্দ্ধাঙ্গ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। উভয়ের জ্যোতিঃ একত্রিত হইয়া জীব-হৃদয়ে সভ্যতা ও প্রেমের সঞ্চার করিল। জীব জন্তুগণের স্কন্ধে দেব ও মানবগণ আরোহণ করিয়া ভূত-প্রেতাদির সহিত মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পূর্ণিমা নিশি অবসানপ্রায়। নক্ষত্রদ্যুতি সঙ্গমস্থলে প্রতিবিম্বিত। অসংখ্য জীব জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নানাদি করিয়া তৃপ্তহৃদয়ে হরিহর-মূর্ত্তি দেখিল।

তাহার পরেই দান। শ্মশানবাসী হর ও তাঁহার ফৌজ নিঃসম্বল। বহু বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের মালিক হরি ও তাঁহার দল। এমন অবস্থায় কি প্রকারে উভয় পক্ষ হইতে আদান

প্রদান হওয়া সম্ভব, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দেবগণ একটি কমিটী স্থাপন করিলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি সর্ব্বসম্মত হইয়াছিল।

১। বিশ্বকর্ম্মা বাঁশ ও তালপত্র লইয়া একটি অপূর্ব্ব আগার নির্ম্মাণ করিবেন। তাহার মধ্যে কেবল মানবদেহধারী জীবগণ থাকিবে। দেবগণের নিমিত্ত বস্ত্রাবাস (কিংবা তাম্বু) নির্ম্মিত হইবে। ভূতপ্রেতগণ তাহারই রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিশাকালে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে।

২। পশুপক্ষিগণ বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয়লাভ করিবে, এবং দিবাভাগে পক্ষ, চঞ্চু, লাঙ্গুলাদি সঞ্চালনপূর্ব্বক যথাসাধ্য ধূলি বিকীর্ণ করিয়া দেব ও মানবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

৩। মানবগণের দ্বারা পশুপক্ষিগণের গুণপণা প্রচারিত হইবে; কারণ, তাহারা মূক। গাভীর কত দুগ্ধ হয়, অশ্ব কত প্রকার ভঙ্গী করিতে পারে, হস্তীর দর্শন ও দৌড় কি প্রকার, রামছাগল দুগ্ধ দিতে পারে কি না, বানর ও গর্দ্দভের বেশভূষাপূর্ব্বক কটাক্ষপাত সম্ভব কি না, উষ্ট্রের গোঁফে তা দিলে কি রকম দেখায়, এবং পিপীলিকা, সারস ও খরগোস প্রভৃতিকে নাচাইয়া, চীৎকার করাইয়া ও বহু প্রকার ভাবের ভঙ্গি করাইয়া যাহাতে জীবের ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা প্রমাণিত হইতে পারে, ইহার যথাবিধি চেষ্টা সকলে করিবেন।

৪। বস্তুর কত প্রকার বিকৃতি সম্ভব, তাহা বিশ্বকর্ম্মা পদার্থকল্পে দর্শাইবেন। ভূতপ্রেতগণ তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করিবে। অথচ উভয়ের মধ্যে সহতোষ্টচক ব্যবহার আদান প্রদান কিরূপে হয়, তাহা দর্শনার্থ বিপণীবিভাগে এক দল বিক্রয় করিবে, এক দল ক্রয় করিবে। তাহার লাভ ভূতপ্রেতগণের করে সমর্পিত হইবে। এই লাভ একটা অমূলক পদার্থ, সুতরাং লাভালাভ মহাদেবের সেবায় অর্পিত হওয়াতে, দান গ্রহণ করা হইল না।

৫। মেলা-সমাপনে সকলের জ্ঞানের উদয় হইবে।

উক্ত পাঁচটি মন্তব্যের মধ্যে প্রথম চারিটি ব্রহ্মার চতুর্মুখে প্রচারিত হইলে, পঞ্চম মন্তব্য স্বয়ং বৃষবাহন ভগবান মহাদেব প্রচারিত করিলেন। বিষ্ণু উদাসভাবপূর্ব্বক তাহাতে সায় দিয়াছিলেন।

এই ত গেল পৌরাণিকী কথা। তৎপরে বৎসর বৎসর কতকাল ধরিয়া, কি হইয়াছিল, তাহার কথা আমরা কোনও পুঁথিতে বর্ণিত না পাইলেও, অনেকটা অনুমান করিবার শক্তি আছে। জগতের নিয়ম এই যে, বহুকাল ধরিয়া যদি কোনও প্রথা প্রবর্ত্তিত ও অনুসৃত হয়, তবে তাহার কতকটা বজায় থাকে। বাহ্য আচরণে ও আড়ম্বরে তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। মৌলিক মতিগতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও, তাহা একেবারে লুপ্ত হয় না। যেমন মানুষ দেখিয়া আমরা বানরের পূর্ব্বাভাস পাই, কিংবা জ্ঞান দেখিয়া আত্মা নামক পদার্থের ভাব গ্রহণ করি, সেইরূপ আধুনিক হরিহর ছত্রের মেলা দেখিয়া সনাতন জমক্রান্তিমূলক কথার সার্থকতা অনুভব করাও সম্ভব।

বাস্তবিক, হরিহর ছত্রের পূর্ব্বকথা লোকের মুখে শুনিবার পূর্ব্বেই আমরা অনেকটা দেখিয়া শুনিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম।

২

হরিহরের ছত্রে বিশাল অষ্ট ভাগ :—

১। হস্তিক্ষেত্র। ২। অশ্বক্ষেত্র। ৩। গাভীক্ষেত্র। ৪। বানরক্ষেত্র। ৫। চিড়িয়া-বাজার; খরগোস্ ছাগল প্রভৃতি। ৬। মিনাবাজার অর্থাৎ রকমারি পদার্থের বিপণী। ৭। ইংলিশ কোয়ার্টার (সাহেবটোলা) ও তাম্বু গৃহাদি। ৮। ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

ইহারই মধ্যে উপবিভাগ আছে। যথা ছাতুর দোকান, কাঠের দোকান, পুস্তকের দোকান, শীতের কম্বল, গ্রীষ্মের সোডা লেমনেড, পানের দোকান, সার্কাস, বায়স্কোপ এবং থিয়েটার। নদীর তীরে কুম্ভকারের মৃণ্ময় পাত্র, এবং তটস্থ উদ্যানে গোময় এবং হস্তী অশ্বগণের পুরীষ দেখিবার জিনিস।

এই অষ্ট বিভাগ ও তদানুসঙ্গিক বিভূতিবর্গের দৃশ্য অতীব মনোহারী।

হস্তিক্ষেত্র। প্রায় পঞ্চ শত হইতে সহস্রাধিক হস্তীর সমাগম হয়। পূর্ব্বকালে আরও হইত; কিন্তু হস্তিকুলের হ্রাস হওয়াতে এখন তত নাই। বিশেষতঃ রাজন্যবর্গের অবনতি ও ধ্বংসে হস্তিবর্গের দন্তোদ্গম প্রায় বন্ধ হইয়াছে। এখন যে সকল হস্তী আসে, তাহা তিন প্রকার :—

১। যাহার দন্ত পড়িয়া গিয়াছে।

২। যাহার দন্ত বাহির হইয়া আর বর্দ্ধিত হইতে চাহে না।

৩। দন্তহীন এবং বালক হস্তী।

যত দূর দেখা গেল, জমীদার ও মহাজনবর্গ পুরাতন ও বৃদ্ধ হস্তী ও হস্তিনী লইয়া ও তাহাদিগের চাকচিক্যবর্দ্ধন করিয়া মেলায় বিক্রয়পূর্ব্বক লাভ করেন, এবং সেই টাকায় তদপেক্ষা বৃদ্ধ ও বিশ্রী হস্তী ক্রয় করিয়া লোকসান দিয়া থাকেন। উহার নাম হস্তীর ব্যবসায়। অর্থাৎ যাহাদিগের অতিবৃদ্ধ জানোয়ারের ভার দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহারা ভগবানের কৃপায় এই মহা মেলায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক জানোয়ার লাভ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হস্তী ছিল। তাঁহারা বৃদ্ধ জানোয়ার ক্রয় করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। হস্তীর বেশভূষা উল্লেখযোগ্য। হস্তিনীর মস্তকে সিঁথির ন্যায় চন্দনচর্চ্চিত আভরণ, সীমন্তে সিন্দূর, এবং হস্তীর মস্তকে প্রায় পাগড়ী থাকে। হস্তিশাবকগণের মস্তকে চূড়া এবং ত্রিনেত্রের মত চন্দনবিন্দুরেখা। হস্তীর কৃষ্ণকায়ের চাকচিক্য-বর্দ্ধনের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভ্যারাণ্ডার তৈল ল্যাজে ও মস্তকে ব্যবহৃত হয়। শরীরে হয় না; তাহার কারণ, দুই বেলা জলে অবগাহনের ফলে চর্ম্ম সর্ব্বদাইসিক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ থাকে। স্নানের পর হস্তীর পৃষ্ঠকঙ্কালে এক রকম "রোগন" দিয়া মাহুতগণ তাহার শোভবার্দ্ধন করে। উষ্ট্রগণের পৃষ্ঠে ও গোঁফে "ব্রাউন" পালিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নান ও বৃক্ষপত্র-কণ্টক (এবং কখনও দশ সের হইতে অর্দ্ধ মণ দানা ও ভূষি) জলযোগ করিয়া হস্তিগণ নদীতটস্থ উদ্যানে বদ্ধ হয়। সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না। ইদানীং সামান্য রজ্জু দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হয়। প্রেমিক হস্তী ও প্রেমিকা হস্তিনীর বামপদে লাল ফিতা বাঁধিয়া বৃক্ষের কাণ্ডে বাঁধিলেই যথেষ্ট। উহাতেই তাহারা আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করে। হস্তী কিনিতে

গেলেই প্রথমতঃ হস্তী শুণ্ড তুলিয়া একটা বিকট উদ্গার করে। ভাব,—"আমার এ আবহাওয়া সহ্য হয় না; অতি কঠিন অগ্নিমান্দ্য (ডিস্‌পেপ্‌সিয়া)" এবং "আমাকে শীঘ্র ক্রয় করিয়া লইয়া চল।" তৎপরে ডেপ্ হট্ হিট্ প্রভৃতি শব্দ করিলে হস্তিপ্রবর একবার জানু ও অন্যবার পদাদি উত্তোলনপূর্ব্বক হাস্যকরী অধীনতার পরিচয় দিয়া থাকে। পরকালে গমনের সময় আত্মার সহিত যেমন প্রেতদেহের অনুগমন করে, হস্তী কিনিলে তাহার সহিত মাহুতকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আনিতে হয়, নচেৎ পিত্রালয়ের ঝি-হীনা নববধূর ন্যায় সে পথেই মরিয়া ভূত হয়।

আমি একটি প্রবীণ বিজ্ঞ মাহুতের মুখে শুনিয়াছি যে, ইদানীং দন্ত ও কর্ণমূলের মাংসপেশী দেখিয়া হস্তীর বয়ঃক্রম নির্ণয় করা যায় না। চতুর ক্রেতা হস্তীর শুণ্ডাগ্রভাগে অর্থাৎ নাসিকার মূলে বেনারসী নস্য দিয়া তাহা পরীক্ষা করে। যদি প্রথম চোটেই হাতী হাঁচিয়া ফেলে তবে জানিবে যে বয়স অতি অল্প। দশ গ্রেণ নস্য দ্বারা নিম্নলিখিত হাঁচির অনুপাতে হস্তীর বয়ঃক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এক মিনিটে—১০টা	হাঁচি		বয়স—৪০
,, —২০	...	...	৩০
,, —৩০	...	...	২০
,, —৪০	...	...	১০

যাহারা হাঁচে না, তাহারা অতিবৃদ্ধ। এবার চশমা পরিহিতা একটা হস্তিনী দেখা গিয়াছে, বৃহস্পতির অপেক্ষাও তাহার বয়স অধিক। কাটিহারের কোনও ধনী তাহা খরিদ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় লইয়া যাইবেন।

আপনারা জানেন বোধ হয় হস্তীর লোমকূপ নাই, এবং গুহ্যদ্বারে থাকিয়া তাহারা ডিম্ব প্রসব করে। লোমকূপের অভাবে হস্তীর নাসিকাও চক্ষু দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হয়। বোধ হয়, যেন সর্ব্বদাই জীবদুঃখে কাতর। শুণ্ড দিয়া স্নেহ প্রকাশ করে বলিয়া ইহাদিগের চুম্বন অতি দীর্ঘ, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী নহে। ডিম্বপ্রসবের সময় হইলে দেহের বিকার উপস্থিত হয়। দাঁত পড়িয়া যায়, কর্ণে বধিরতার সঞ্চার হয়। এই সময় পুনর্ব্বার হরিহরের ছত্রের মেলায় লইয়া গেলে লোকসানের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মরিলে মূল্য বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া হস্তিগণ প্রায়ই আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু খোরাকের তারতম্যে এবংবিধ প্রবৃত্তির হ্রাস হয়। হস্তী অপেক্ষা, এমন কি, সকল পশু অপেক্ষা এই মেলায় অশ্বের সংখ্যা অধিক। হস্তীর মধ্যে যেমন বেশীর ভাগ পুরাতন, অশ্বের মধ্যে তেমনি অধিকই নূতন।

অশ্বের রকমারি অনেক। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত শ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য:—

১। সারবীয় অশ্ব।
২। দুতপক্ষ নবাবখাস্।
৩। স্বদেশী দিবাঘোটক।
৪। বিদেশী ঘোর্ষালনা।
৫। আড়-পাদি কিংবা টাটুঘোড়া।
৬। ডাকঘাসাড়ীর ঘোড়া ও টাটু।

অশ্ব-পরীক্ষার্থ একটা কমিটি আছে। তাঁহারা বহু উপায়ে অশ্বের জাতি, বয়ঃক্রম, তেজ ও দ্রুতগমনশীলতার বিচার করেন।

প্রথম উপায়। দন্ত-পরীক্ষা।
দ্বিতীয় „ । পুরীষ-(লিদি)-পরীক্ষা।
তৃতীয় „ । পদ এবং মাংসপেশী প্রভৃতির পরীক্ষা।
চতুর্থ „ । পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কসরৎ।

দন্ত-পরীক্ষা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে ; কারণ, বিক্রেতৃগণ অশ্বের দন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া হোমিও-প্যাথিক ক্যালকেরিয়া কার্ব ও সাইলিসিয়া খাওয়াইয়া দেয়। ইহাতে অশ্বের চেহারা যুবাপুরুষের ন্যায় সতেজ হইয়া মহা প্রবঞ্চনার ক্ষেত্র হইয়া পড়ে। পদতল ও মাংসপেশী দ্বারাও এখন অশ্ব ঠিক পরীক্ষা করা যায় না। দাঁড়াইয়াছে কেবল পুরীষ ও পৃষ্ঠারোহণ।

তাহার উপায় এই। প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ক্রেতৃগণ অশ্বগণের পুরীষত্যাগের সময় নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে স্থির ও নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। দুর্গন্ধময় পুরীষ অশ্বের হীনতা-জ্ঞাপক। পুরীষ-পরীক্ষার একটি ল্যাবোরেটরী আছে। উক্তানুসারে অশ্বের তেজ বুঝিতে হইবে। তাহার পর organic analysis করিয়া মূত্র ও লিদিতে কার্ব্বনেট অফ্ সোডা, লাইম, ইউরিক আসিড, ফসফেট্স, গ্লিসারিণ প্রভৃতি কত বর্ত্তমান, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। (Veterenary Surgeon) এবংপ্রকারে অশ্বের বহুমূত্র আছে কি না, কতদিন পরে পেন্সন লইবে, ঘণ্টায় কতক্ষণ কর্ম্ম করিতে পারিবে, তাহা চট্ করিয়া বলিতে পারেন। তাঁহাদিগের ফিস্ ৮৲ টাকা। মূত্রপরীক্ষা না করিলে চারি টাকা।

মেলায় হস্তিবৈদ্য দেখিলাম না। কিন্তু শালকরা অশ্ববৈদ্য ও স্বদেশী গোবৈদ্য অনেক। তাঁহাদিগের বিজ্ঞতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া এক জন আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, সেই ঘোটকের পিতামহ এক জন জমীদারের ক্ষেতে ধান খাইয়া আড়গড়া গিয়াছিল। আড়গড়ার কাঠের বেড়া ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে ভোজন করাতে গলায় ঘা হয়, এবং সেই ক্ষত পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হইয়া বর্ণিত ঘোটকের পশ্চাদ্দেশে আঁচিল-রূপে বিকাশ পাইয়াছে। কাল ক্রমে ইহার অপারেশন করিতে ১৬৲ টাকা লাগিতে পারে।

বায়বীয় অশ্বগণ প্রায়ই আরবজাতীয় এবং বহুমূল্য। ইহাদিগের পুরীষ পদ্মগন্ধ। মৃতপক্ষ অশ্বযুগ্ম পশ্চাদ্দেশের পদতল যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া দানা খাইতেছে। মখমলের সাজ ভিন্ন অন্য সাজ তাহারা পৃষ্ঠে সহিতে পারে না, এবং দৌড়িবার সময় চারিটি পদ চক্রাকারে বিক্ষেপ করিয়া এক ঘণ্টায় এক ক্রোশ অবলীলাক্রমে যায়। ইহাদিগের মূল্য পড়ে ১০০৲। স্বদেশী দিব্য ঘোটক দুইপ্রকার ; শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণগুলি ধবল রোগীর ন্যায়, এবং মুখ হইতে উদরের দিক দিয়া একটা extra পটী না দিলে তাহারা বিবাহের বরযাত্রে যাইতে পারে না। কৃষ্ণবর্ণগুলি কেবল অকারণে চমকাইতে ও লাফাইতে পটু। বেশী ভাগ কদমের চাল্। ইহাদিগের পুরীষ চন্দনগন্ধ। দোআঁসলা অশ্ব প্রায়ই সবুজবর্ণের, এবং আজ্‌গনি কমলালেবুর ন্যায়ের ন্যায় পুরীষ ত্যাগ করে। ছ্যাকড়া টাটু সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বক্তব্য নাই। কোনটারই মূল্য ৫০৲ টাকার কম নহে।

পৃষ্ঠারোহণ ব্যাপার অতীব চমৎকার। বিক্রেতা প্রথমতঃ চাবুক লইয়া অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে যায়, এবং পটু করিয়া একটা শব্দ করে। ইহাতে পদবিক্ষেপ করিয়া ত্রস্ত হইলে জানিতে

হইবে, ঘোড়াটা বজ্জাত। কিন্তু কোনও ঘোড়াই হত্রের মেলায় পা ছুড়িয়া ক্রেতার ব্যবসা নষ্ট করে না। দাম চুকাইয়া দিলে পা ছুড়িয়া ও কামড়াইয়া বজ্জাতি আরম্ভ করে। বিক্রেতা তৎপরে হাস্যপূর্ব্বক কহে, "ইহা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক।" ছ্যাকড়া-গাড়ীর ঘোড়া প্রায় কেহ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করে না; কারণ, কালক্রমে তাহারা কর্মচারিগণের ন্যায় বিনত ও অনুগত হইয়া পড়ে। যাহার পুরীষের ভাগ অধিক, তাহার মূল্যও অধিক; কারণ, ইহাদের পুরীষে ক্ষেত্রের সার হয়।

প্রায়ই শুনিতে পাইবেন, "এই অশ্বের পূর্ব্বপুরুষগণ চিলেনওয়ালা কিংবা পলাশীর ক্ষেত্রে" উপস্থিত ছিল। দক্ষ ক্রেতৃগণ ভাবভঙ্গী ও আকার প্রকারে তাহা বুঝিয়া লন। যাহারা পুচ্ছ উদরের দিকে সঙ্কুচিত করে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ রণক্ষেত্রে পলায়ন করিয়াছিল, ইহাই সিদ্ধ। কাহারও চক্ষুর সলজ্জ ভাব দেখিয়া বুঝিতে হয়, ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মতলায় ঘোড়ে ডক্ সাহেবের আখোলে মিশনরীগণের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিল।

কতকগুলি বর্ম্মা ও মহারাষ্ট্রদেশের টাটুও দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ইরাবতী ও পুণার যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল। কতকগুলি ঘোড়া ছিল, যাহারা সায়েস্তা (broken) হয় নাই, কিন্তু শুনিলাম, বেয়াদবী এবং বেসায়েস্তা অবস্থাতেই তাহারা মনোহারী।

হস্তী ও অশ্ব বিচিত্র বটে, কিন্তু গাভীর বিচিত্রতা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল। এক ছটাক হইতে ত্রিশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়, এমন শত শত গাভী হত্রের পূর্ব্বভাগ শোভা-বিত করিয়া বিরাজমান। তাহার মধ্যে দুইএকটা খোটাই দুগ্ধ দেয় না। তাহারা কোন জাতীয়, বুঝা গেল না।

লাঙ্গুল-শৃঙ্গ বিহীনা গাভী পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম মাত্র। এবার চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়াছে। ইহারাই বেশী দুগ্ধ দেয়।

গাভীগণের খোরাক শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাহারা ত্রিশসের দুগ্ধ দেয় তাহাদের আহারের মূল্য দৈনিক চারি টাকা। সুতরাং মূল্য ও সুদ ধরিলে টাকায় চারি সের দুগ্ধ পড়ে। প্রত্যেক সেরের হিসাবে গাভীর মূল্য দশ টাকা, কিন্তু দুই সেরের কম দুগ্ধ দিলেও কুড়ি টাকার নীচে দাম নাই! কারণ, তাহাদিগের চর্ম্ম ও অস্থির দাম অধিক। অধিক দুগ্ধের প্রায় চর্ম্মের ক্ষীণতার পরিচায়ক।

দুগ্ধের পরিমাণ দেখিয়াই বলা যায় না যে, ভবিষ্যতে কত দুগ্ধ প্রাবিত হইয়া ক্রেতা গৃহস্থের পুত্রকলত্রগণকে পরিপুষ্ট করিবে। গ্রীক ও রোমাণ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি যে সম্যক্ দুগ্ধবতী নারীর কন্যাগণই বিবাহক্ষেত্রে বিশেষ আদৃতা হইতেন। হঠাৎ দুগ্ধের প্রাচুর্য্য দেখিয়া গাভীক্রয় করা মূর্খতা। কারণ, নানাপ্রকারে পুষ্টিসাধন করিয়া এবং দুগ্ধের পরিমাণ-বর্দ্ধন করিয়া হত্রের মেলায় গো-বিক্রেতৃগণ বঞ্চনা করিয়া থাকে। যাহারা সৎ, তাহারা সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুই পুরুষ অর্থাৎ মাতা ও মাতামহীকে লইয়া আসে। তাহারা দুগ্ধ দেয় না; কিন্তু তাহাদিগের বিশাল দেহ ও স্তনাদি দর্শন করিলে বৈষ্ণবী ভক্তির সঞ্চার হয়। তাহাদিগের হাম্বারবে বশিষ্ঠের কামধেনু ও বিশ্বামিত্রের সহিত কলহাদি স্মরণ করিয়া কলেবর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে।

পূর্ব্ববৎসরে যখন ছত্রের মেলায় আসি, তখন ত্রিশ টাকা দিয়া দৈনিক ছয় সের (অর্থাৎ ক্রয়ের পর তিন সের) দুগ্ধবতী গাভী কিনিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, যে বৎসটা সঙ্গে আসে, তাহা অন্য গাভীর। সন্ধ্যাকালে ভ্রমক্রমে বদলাবদল, হইয়া গিয়াছিল। বৎস দুগ্ধ খায় না; কেবল ঘাসের উপর নির্ভর। গাভী দুগ্ধ দিত না, কেবল পুরীষত্যাগ করিত। সেই গোময় শুষ্ক করিয়া মাসে দুই টাকার মাল সংগ্রহ করিতাম। কিন্তু গাভীটি উচ্চজাতীয়া। এবার ছত্রে আসিয়া তাহার হারাধন বৎস পাওয়া গেল। যেমন বৎসকে দেখা, অমনই গাভীর হাম্বারব ও দুগ্ধ স্রাবের আরম্ভ। রঙ্গস্থলে লোক স্তম্ভিত। আমি লজ্জিত। শ্রীযুক্ত আশু বাবু (Veterinary Surgeon) আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এমত দেখা গিয়াছে যে, বৎস-বিহীনা গাভীর দুগ্ধ সাত আট বৎসর ধরিয়া বদ্ধ ও সঞ্চিত থাকে, এমন কি, ক্ষীর ও ছানা প্রভৃতি হইয়া যায়। গরম জল খাওয়াইয়া বাহির করিতে হয়।

বন্ধুবর গিরিশ (আমার পার্শ্বের গরু দেখিতেছিলেন) বলিলেন, ঠিক। একবার সাহেবের গালি খাইয়া আমার বাক্‌রোধ হয়। এক বৎসর ফর্লো লইয়া আমি মধুপুরে আসি। ক্রমে একদিন হঠাৎ চটিয়া গৃহিণীকে গালি দিতে লাগিলাম। মুখ, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু প্রভৃতি রন্ধ্রাদি যেতর ছুটিতে লাগিল। রুদ্ধ হৃদয়ের ক্রুদ্ধভাব অতি বিষম! দুগ্ধ বাহির হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, এবার সাবধানতার সহিত সকলকে সবৎসা গাভী বাছিতে কহিলাম। কারণ, প্রথম পক্ষের জঞ্জালের পর, দ্বিতীয় বারের নির্ব্বাচন অতিশক্ত।

সীতামারী নামক স্থানে একজাতীয় গো পাওয়া যায়, তাহারা প্রতি বৎসর এক জোড়া করিয়া বলদ প্রসব করে। ইহাদিগের দাম প্রায় ৫০০৲ হইতে ১০০০৲। নীলকর সাহেব ও জমীদারগণ ইহাদ্বারা সাম্পনি নামক গোযান পরিচালন করেন। ইহারা অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী, এবং ইহাদের শৃঙ্গদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত জরির টুপী বিশিষ্ট।

বানর ও পক্ষিগণের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য নাই। একটা গোদাবানর বসিয়া (এখানে হনুমান দুর্লভ) খঞ্জনী বাজাইতেছিল, এবং তাহার পার্শ্বে দলে দলে সন্ন্যাসিগণ নৃত্য করিতেছিল। বানররাজ বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসিগণ শৈব। হরিহর ছত্রে সনাতন সময় হইতেই নানাবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় ও নানা জাতি,—বিহারি বাঙ্গালী, ঘোষ ও সিং, খাঁ সাহেব ও ভট্টাচার্য্য-গণ একত্রিত হইয়া নিগূঢ় সখ্যতা-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন। সেই অপূর্ব্ব লীলার গন্ধ এখনও বহিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, এই মহাবাণী কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইবার পর ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়গণের মধ্যে যে অন্তরের প্রেম বহিতেছে, তাহা নিরন্তর ভাবিয়া কাহার না হৃৎকম্প ও ঘর্ম্মের উদ্রেক হয়?

সন্ন্যাসীর দল হরিহর ছত্রের প্রধান অঙ্গ। জটা-ভস্ম-ধারী সন্ন্যাসী, শরশয্যা-শায়িত ভণ্ড বাবা, দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ও সাধু। ইহারা পূর্ব্বকল্পের। অধুনা নূতন দলের সন্ন্যাসী দেখা গেল। এক জন দক্ষিণ চক্ষুপল্লব উল্টাইয়া রক্ত বর্ণ অভ্যন্তর বিকাশ করিয়া বাম চক্ষু শ্যামবর্ণের (Sun Protector) চস্মা দ্বারা আবৃত করিয়া দর্শকগণের হৃদয়ে

বিশ্বরূপকায় করিতেছে। অন্য এক জন উল্লুকের ন্যায় মসীকৃত কজ্জল সর্ব্বশরীরে লেপন করিয়া গোঁফে তা দিতেছে। সকলেই কিঞ্চিৎ গীতা ও কিঞ্চিৎ 'পোলিটিকল' কথা জানে; এমন কি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার লড়াই-এর 'অপটুডেট্' সঠিক বর্ণনা করিতে পারে।

চিড়িয়া-বাজারে ঘুঘুই, ময়ূর ও সারসপক্ষীর দলই অধিক। আহার না পাইয়া পরস্পরকে ঠোকরাইয়া আহার সংগ্রহে যত্নবান। এখানে সামান্য পক্ষীকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ব্যবসায়িগণ ক্রেতাদিগকে মুগ্ধ করে। গোটাকতক গাঙশালিক্ 'সানাটোজেন' খাইয়া সোনালী রঙ মাখিয়া পিঞ্জরে স্বীয় অভিনব দুর্দ্দশা চিন্তা করিতেছিল। একটা কাকাতুয়া সম্মুখে ধরাতে চ্যা চ্যা করিয়া মাতৃভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিল। বিক্রেতা মাড়োয়ারী। সে কহিল ইহা অষ্ট্রেলিয়া নামক প্রদেশের "pheasant bird" (ফেজণ্ট পক্ষী)। ভারতবর্ষের জল হাওয়াতে স্বদেশী ভাব গ্রহণ করিতেছে।

বানর ও চিড়িয়াখানা দেখিয়া মীনাবাজারে যাইতে হয়। মীনাবাজার বলিলে প্রথমে কিছু অদ্ভুত বুঝায় কিন্তু বাস্তবিক বড়বাজারের ও চাঁদনীর অপকৃষ্টাংশগুলিও ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ, রাশীকৃত মিলের কাপড় দেখিয়া পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী হউক বা বিলাতী হউক, এ আড়ম্বর প্রেতলোকের জন্য; নচেৎ এত বস্ত্র পরিধান করিয়া পেটে খাইবে কে? সম্মুখেই শতচ্ছিন্ন বেদান্তের ঘটি ও বর্মা কোম্পানীর আধুনিক পট। রাশীকৃত সিগারেট ও বিড়ি। মিঠায়ের দোকানে পিষ্ট মৃত কীটপতঙ্গ ও মল-পরিপূর্ণ ঘৃত। বড় বড় নাগরী, বিলাতী ও পাম্পী জুতা। নানা বর্ণের জীর্ণ ও অজীর্ণ শাটী। দয়া, ধর্ম্ম ও লজ্জার লেশমাত্র নাই। এই সকল বিভূতি লইয়া প্রেত-পিশাচাদির নৃত্য। ঘোর ধূলিঅন্ধকারে ভূষিত হইয়া "বেহার স্বদেশী কোম্পানী"র দোকানে 'মাইসেড' খাইয়াছিলাম। তাহার বীর্য্যবীর তেজ দূরে থাকুক, দুর্গন্ধ এখনও জাগ্রত এবং যথাযথায় সঞ্চারিত হইতেছে। ইহারই মধ্যে দুই পয়সা পেয়ালার 'চা'। বোধ হয়, পচা ও পুরাতন জুতার কাথ। এই বিশাল ক্রয়-আবর্ত্তনে বিহারদেশ বাঙ্গালার পোলিটিক্যাল রীতি নীতি শিক্ষা করিতেছে।

পার্শ্বেই তাহার আদর্শ ইংলিশ কোয়ার্টার,—তাহার এক ভাগে দোকান, অন্য ভাগে তাম্বু। নেটিভ কোয়ার্টারে পাতী ক্রেতারা দড়ি কিনিয়াই পালান। ইংরেজী কোয়ার্টারে ঘোড়া ও হাতীর মনোহর সাজ বিপণীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দামী চা ও aerated waters। নেটিভ বিভাগের দোকানদারগণের ন্যায় ইহারা ধূলিরঞ্জিত প্রেতগণের ন্যায় নহে। কারণ, এ বিভাগের রাস্তায় দুই বেলা বারিধারা সিঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এ দিকে অনেকটা 'সভ্য' মানুষের আড্ডা। ক্রমে জিলাপাত্রের 'ক্যাম্প' অর্থাৎ তাম্বু, এবং তাহার শেষে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। কলিকাতার নকলমাত্র।

তবে মৌলিক হিসাবে হরিহর ছত্রের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে।—

১। লোকসমাগম। ২। ধূলি ও কর্দ্দম। ৩। মেলা ও পুজোর ব্যাপার।
৪। কলরব ও সঙ্গীত নৃত্যাদি। ৫। হরিহরের মূর্ত্তিদর্শন।

এ বৎসর ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ জন্য একটা অসাধারণ ব্যাপার হইয়াছিল।

হরিহরছত্রে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। স্নানের সময় পূর্ণিমার দিন বোধ হয় দুই লক্ষের অধিক নরনারী একত্রিত হয়। পদব্রজে কত লোক আসে যায় তাহার সংখ্যা নাই। ব্যাসায়িগণ বৎসর বৎসর তাহাদিগের হাব ভাব অঙ্গ ভঙ্গী সখ্ প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া বিক্রয়ার্থ দ্রব্যাদি লইয়া আসে। যে সকল বস্ত্রাদি কৃষকগণের পছন্দ, যাহা দেখিলে কৃষকবধূগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হয় এবং অপোগণ্ড শিশুগণ কজ্জলরঞ্জিত চক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক চাহিয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্যাদিরই আমদানী অধিক। 'মেটে সিন্দুর' ভ্যারাণ্ডার তৈল, গালার শাঁখা ও চুড়ি, বাঁশের ডালা, জয়পুরী ছাপের বড়ী, পিতলের নথ, বাঁশের চরখি ও ছোট ছোট ডুগ্ ডুগি বাদ্য, কড়িখচিত ঝাঁপি ও রঞ্জিত কন্থা ও মোটা কম্বল—ইহাদেরই আদর অধিক। বোধ হয়, লক্ষ্মী ও হরগৃহিনী যাহা পুরাকালে লইয়া আসিয়াছিলেন সেই প্যাটার্ণের বিভূতিবর্গ এখনও ভারতের দরিদ্র কৃষকরমণীর স্মৃতিতে অঙ্কিত।

কিন্তু তখন রেল ও পুল ছিল না। দলে দলে মালগাড়ীতে ঘোড়াগাধার ন্যায় লোকদিগকে ভর্ত্তি করিয়া ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে (B. N. W. R.) যে লীলা দেখাইতেছেন, তাহা মৌলিক লীলা হইতেও বিস্ময়করী। আমাদের বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে যে, বিড়ালকে আনিয়া বন্ধ করিয়া নদীর পরপার করিয়া দিলেও সে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিয়া আসে। এ স্থলেও একটা লোক পথভ্রষ্ট কিংবা জীবলীলা হইতে বিচ্যুত হয় না। এত বড় মহা মেলাতে কেবল এক জন বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধা গত রাত্রিকালে দেহত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেহ ঠিক আছে, কিন্তু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নাই। ইহা দেখিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। শীঘ্রই পুলিস-তদন্ত হইবে। যদি দেহযুগলকে 'Morgue'এ লইয়া গেলে আত্মযুগল ম্লেচ্ছস্পর্শভয়ে ফিরিয়া আসে, এই সম্ভাবনাটা অধিক ও আশাপ্রদ।

ধীরভাবে আফিং চড়াইয়া হরিহর ছত্রের হ্যাকড়া এক্কায় আরোহণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বহির্গত হইলে একটা অপূর্ব্ব রোল শ্রুতিগোচর হয়, এবং একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন পরিতৃপ্ত করে। প্রথমতঃ হস্তীর বৃংহতি ও অশ্বের হ্রেষার সহিত গাভীর হাম্বারব, এবং তাহারই মধ্যে মিশ্রাবিষ্ট চিড়িয়াগণের কাকলি। ইহা তাহাদের নবীন সঙ্কিত স্বভাব। তাহারই মধ্যে পথে ক্লান্ত ও শ্রান্ত গ্রাম্য নরনারী ও তাহাদিগের বৎসগণের কলরব। অদূরে সার্কাস ও বায়স্কোপের "হাঁকাহাকি ডাকাডাকি। নদীতটে বড় বড় বজরা ও নৌকার উপর ওস্তাদ ও Amateur গণের গীতবাদ্য। অসংখ্য দীপালোকে উদ্ভাসিত মাড়ুয়াবাসীগণের টিকি ও টুপী, মহাজনগণের মৈথিল পাগড়ী, ও সন্ন্যাসিগণের জটা একত্রিত হইয়া ধূম্রবর্ণ নদীবক্ষে অপূর্ব্ব বিভ্রমের উৎপাদন করিতেছে। সর্ব্বদৃশ্য ও শব্দাদি একত্র সংগ্রহ করিলে একটা ভৌতিক ও তাণ্ডব ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয়।

এ বৎসর চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা হইতে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা দৈবকৃপা বলিতে হয়। প্রথমতঃ ধূলি কর্দ্দমে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতের যাত্রীর পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, হাটেঘাটে অন্ন ও তাড়ীবর্গ স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, যাহারা নিতান্ত ভক্ত, তাহারাই কেবল স্নান ও দর্শনাদি করিতে আসিয়াছে। সমস্ত চতুর্দ্দশীর রাত্রি

ও সমস্ত পূর্ণিমার দিন ও রাত্রি বৃষ্টিপাতে শীতল-বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া অদ্য (প্রতিপদ) নিবৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি ভক্তের উৎসাহ কমে নাই। সারা রাত্রিদিন সিক্ত, তিক্ত, ক্লিষ্ট অবস্থায় বৃক্ষতলে, নদীতটে, উলুবনের মধ্যে ও কর্দমে একবস্ত্রপরিধানে লক্ষাধিক যাত্রী স্নানার্থ বসিয়া!

পরপারের বস্ত্রাগার (তাম্বু) গুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। রাজা, মহারাজ, জমীদার, মহাজন, নবাব, ও লস্কর, ফিরিঙ্গী ও সাহেব, যথাযোগ্যভাবে পলায়নতৎপর হইয়া নানাবিধ আশ্রয়ে দিন রাত্রি যাপন করিয়াছেন। অদ্য সকলে ফিরিয়া আসিতেছে।

স্নান এখনও শেষ হয় নাই। মন্দিরের নিকট মহা ভিড়। শুনিতে পাওয়া গেল দুর্বৃত্ত তস্করগণ অনেক স্ত্রীলোকের নাক কাণ ছিঁড়িয়া মাকড়ি ও নথ লইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আভরণগুলির ব্যবহার বোধ হয় উঠিয়া যাইবে। অনেক পেশাদার লোক (প্রায়ই বৃদ্ধ) মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আসর জমকাইয়া রাখিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের এই ব্যবসায়। কোনও উদ্দেশ্য নাই। পাছে এহেন বিদ্যা লোপ পাইয়া যায়, এই ভয়ে নিষ্কামহৃদয়ে ও পবিত্রমনে ঘন ঘন কটাক্ষপাত করে। এক জন কহিল, "এই কসরৎ আমি কালীঘাটে শিখিয়াছিলাম।" সাবাস বিহারী ভাই!

তথাপি লক্ষ লক্ষ যাত্রী মন্দিরের দিকে চলিয়াছে। ঊর্দ্ধে হরিহরের বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান। অভ্যন্তরে সেই অপূর্ব্ব মিশ্রমূর্ত্তি। অর্দ্ধাঙ্গ হর ও অর্দ্ধাঙ্গ হরি। দিন নাই, রাত্রি নাই, ক্লেশ নাই, বিরাগ নাই, যাত্রিগণ তাহাই দেখিবে। যদি বল, "ও প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া লাভ কি?" যাত্রী বলিবে, "তোমরা বাবার ও দাদার মূর্ত্তি পটে আঁকিয়া রাখ কেন?"

যে যুগেই হউক, যে স্থানেই হউক, যে কারণেই হউক, হরি ও হর মিলিত হইয়াছিলেন, হইতেছেন, এবং হইবেন। তাহার স্মৃতি, তাহার ছবি, তাহার অর্থ বাকী ঐ মন্দিরের মূর্ত্তি দেখিলে মনে পড়িবে। বিস্মৃতিই অবনতির কারণ। মনে রাখিও, মধ্যে মধ্যে দেখিও, লুকাইয়া ভাবিও, এবং মনে করিও।

এই অপূর্ব্ব মহামেলার বীভৎস দৃশ্যের মধ্যেও একটা অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্যটুকু বর্দ্ধিত করিবার, সেই সনাতন ভক্তিটুকুর উদ্ধার করিবার, সেই সার্ব্বজনীন প্রেম সঞ্চারিত করিবার উপায় তোমাদের হাতে। এত বড় একটা জাতীয় ও ধর্ম্মমেলা ভারতবর্ষে বিরল। অথচ যাত্রীদিগের থাকিবার স্থান নাই, লজ্জানিবারণ করিবার উপায় নাই, এবং যাহাতে মনুষ্যত্বের উৎকর্ষসাধন হয়, এমন কোনও আদর্শ নাই। যতদিন না নারায়ণীতটে আম্রকাননে সনাতন উদাত্ত সামধ্বনি উচ্চারিত হইবে, প্রকৃত সাধুগণ সমবেত হইয়া শাস্ত্র সঞ্চারণা করিবেন, দয়া ও প্রীতির সহিত সকলে মিলিত না হইবে, ততদিন এই পৌরাণিকী মহামেলার গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে না। দিল্লী হউক, পাটলিপুত্র হউক, হরিহরছত্র হউক, তাহাদিগকে পুরাতন মন্ত্রে আহ্বান কর। কসাইখানা, বেশ্যালয় ও সুরাচুয়ীর কল-কারখানা বসাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার নকল করিও না। ঠকিবে। বেমালুম ও বেতরতাবে ঠকিবে। জাহান্নমে যাইবে। গঙ্গা ও নারায়ণীর শুষ্ক বক্ষের উপর পঞ্চাশ বৎসর পরে কাঁদিবে। মরিলে দুর্ভাগ্যকপালে লইয়া যাইবে।

নিধিরাম।

সাহিত্য

রাজশেখর।

কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি যেমন সংস্কৃতে নাটক লিখিয়া অমর হইয়াছেন, কবি রাজশেখরও তেমনই স্বীয় নাটকগুলিতে বিবিধভাষাভিজ্ঞতা ও লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বালরামায়ণ, কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকা নামক নাটক, সট্টক ও নাটিকা সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। বালভারতের কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশাল ভঞ্জিকার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। বালরামায়ণের অনুবাদ হয় নাই। কর্পূরমঞ্জরীর বিশেষত্ব এই যে, ইহা আদ্যন্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই ভাষায় রাজশেখরের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন ছন্দে তিনি অনর্গল যেরূপ প্রাকৃত শ্লোকের রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রভূত শক্তির পরিচায়ক। বিভিন্ন প্রাকৃতের রীতির মধ্যে তিনি শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীর ব্যবহার করিয়াছেন। গদ্য কথোপকথনে শৌরসেনী ও শ্লোকগুলিতে মহারাষ্ট্রী ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজশেখর প্রাকৃতে বহুলপরিমাণে মারাঠী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে দাক্ষিণাত্যবাসী, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বালরামায়ণেও ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। রামচন্দ্র লঙ্কা-সমরের পর সীতা, লক্ষ্মণ, ত্রিজটা, সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছেন; সেই সময় কবি বিবিধ জনপদের বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশ ও নদীর এরূপ বিশদ বর্ণনা অল্প সংস্কৃত গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কবি দাক্ষিণাত্যের সহিত সুপরিচিত। দাক্ষিণাত্য তাঁহার জন্মভূমি। কাজেই তাহার প্রশংসা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কালিদাসের মেঘ-দূত হইতে যেমন তদানীন্তন উত্তর-ভারতের মানচিত্রের জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ বিস্তৃত বালরামায়ণের দশম অঙ্কে বর্ণিত বিষয় সকল হইতেও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পরিচয় পাওয়া যায়। অগস্ত্যাশ্রম হইতে দ্রবিড়দেশ রামচন্দ্রের নয়নপথবর্ত্তী হইল। প্রথমে কেরল দেশের বর্ণনা। তাম্বূলপত্র, কর্পূর ও গুবাক সেখানে প্রচুর। রাম সীতাকে কন্দর্পের লীলাভূমি এই দেশ দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে কহিলেন।

(১) সুগ্রীব দক্ষিণ দিকে দেখাইলেন,—গোদাবরী নদী সপ্তধারায় ছুটিয়াছে। তাহার তীরে শিবমূর্ত্তি স্থাপিত। সেই দেশ অন্ধ্র নামে পরিচিত। গোদাবরীর বিভিন্ন প্রবাহে দ্বীপ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। রমণীগণ বাক্য, মন ও অঙ্গে মদন নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে। (২) তাহার পর কাবেরী নদী। দুই কূলে শ্রেণীবদ্ধ মনোরম নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষরাজি। পৃথিবীর কবরীর ন্যায় নদীর শোভা। কর্ণাটদেশবাসিনী ললনাদিগের নাভিসজ্ঘর্ষজনিত বিচিত্র সলিল পূর্ব্ব দিকে বহিয়া চলিয়াছে। (৩) কিছু পরেই সম্মুখে মহারাষ্ট্র-জনপদের সুমহান্ দৃশ্য। বিদর্ভ হইতে কুন্তল পর্য্যন্ত এই জনপদ স্বর্গের মার্গ-স্বরূপ, যেন ছয়টি বেদাঙ্গের অতিরিক্ত আর একটি অঙ্গ। প্রজ্ঞা-চক্ষু এখানে বিকশিত হয়। ইক্ষুরস অপেক্ষাও মধুর কাব্যরসের উদ্ভবক্ষেত্র, প্রসাদগুণযুক্ত রচনার নিলয় বিদর্ভ দেশ কি রমণীয়! এইখানে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর হইয়াছিল। কুন্তলকামিনীগণের রূপমাধুরীও দর্শনযোগ্য। (৪) তাহার পর নর্ম্মদা নদী। বামভাগে লাটদেশ দেখা যাইতেছে। রমণীগণের সুখোচ্চার্য্য

(১) তত্রাপি দ্রবিড়াঃ :—
পর্ণৈ নাগরখণ্ডনাহুর্মুহুশ্চর্বং পূগীফলৈর্লীলয়া
কর্পূরস্য চ তত্র কোঽপি চতুরস্তাম্বূলযোগক্রমঃ।
দেশঃ কেরল এষ কেলিসদনং দেবস্য পুষ্পায়ুধ-
স্তদ্ দৃষ্ট্বা কুরু কোমলাক্ষি সফলে শ্লাঘীয়সী লোচনে ॥—৬১ শ্লোক।

(২) বাক্সম্ভাষণসুন্দরৈর্বিরচিতৈর্বনিতাং মনোজ্ঞাঙ্গতো
বামাক্ষ্যঃ প্রণয়ন্তি যত্র মদন-ক্রীড়ামহানাটকম্।
অন্ধ্রাস্তত্র চ দক্ষিণেন তু ইমে গোদাবরীস্রোতসাং
সপ্তানামপি বারিনির্গমবশাৎ দ্বীপান্তরাণি স্থিতাঃ ॥—১০ শ্লোক।

(৩) কাবেরী কবরীব ভামিনি ভুবো দেব্যাঃ পুরো দৃশ্যতাং
পূগৈর্নাগলতাশ্রিতৈঃ ক্রমুকপাদিশস্তালৈর্নবিস্তারিণ।
কর্ণাটীজনমণ্ডলেষু জঘনৈর্দত্যাঃ পয়ঃ প্লাবিতং
পীত্বা নাভিগভীরবারিরুচিভিঃ প্রাচীং দিশং নীয়তে ॥—১২ শ্লোক।

(৪) যৎ ক্ষেমং ত্রিদিবায় বর্ত্ম নিগমস্যাঙ্গং চ যৎ সপ্তমং
স্বাদিষ্ঠং যদিক্ষুকাদপি রসাচ্ছন্দস্য বচোঽমৃতম্।
তদ্ যস্মিন্ মধুরং প্রসাদি রসবৎ কান্তং চ কাব্যামৃতং
সোঽয়ং সুভ্রু পুরো বিদর্ভবিষয়ঃ সারস্বতী জন্মভূঃ ॥—১৪ শ্লোক।

সংস্কৃতের উদ্ভবস্থল সরল গদ্য রচনা ও প্রাকৃতের উৎপত্তিক্ষেত্র এই দেশ। ইহার বিশেষত্বযুক্ত রচনা শ্রবণ করিলে অন্য প্রকার রচনা বিস্বাদ বলিয়া অনুভূত হয়। (৫) তাহার পর মালবদেশ ও পুণ্যকীর্ত্তি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী দেদীপ্যমান। ধীরে ধীরে যমুনা ও তাপী নয়নপথে ফুটিয়া উঠিল। তাপীর তীরস্থ প্রস্তরে স্বর্ণের পরীক্ষা হইয়া থাকে। নিকষোপল এইখানেই পাওয়া যায়। (৬) বাম দিকে পঞ্চালদেশ। এখানকার কবিগণ গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় ও লৌকিক নবীন কাহিনীর সুনিপুণভাবে রচনা করেন। (৭) তাহার পর গঙ্গা-পরিবেষ্টিত কান্যকুব্জ নগর। এই নগরের রমণীগণ যেরূপ বেশ পরিধান করে, যেরূপ অলঙ্কারে অঙ্গ সজ্জিত করে, যেরূপ বেণীবন্ধন করে, যেরূপ বচন-বিন্যাস করে, অন্য প্রদেশের রমণীগণ তাহাই সযত্নে শিক্ষা করে। (৮) এই কান্যকুব্জে রাজশেখর জীবনের অধিকাংশ যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ নৃপতির উপাধ্যায় ছিলেন। সুতরাং কান্যকুব্জ বা মহোদয় নগরের বর্ণনায় তিনি মুক্তকণ্ঠ। তাহার পর প্রয়াগ, বারাণসী, মিথিলা ও সরযূতটবর্ত্তিনী অযোধ্যার বর্ণনা।

রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী ও বিদ্ধশালভঞ্জিকায় নিজ উদ্ভাবিত গল্প অবলম্বন

---

(৫) যদ্‌যোনিঃ কিল সংস্কৃতস্য সুদৃশাং জিহ্বাসু যন্মোদতে
যত্র শ্রোত্রপথাবতারিণি কটুর্ভাষাক্ষরাণাং রসঃ।
গদ্যং চূর্ণপদং পদং রতিপতেস্তৎপ্রাকৃতং যদ্বচ
স্তাংল্লাটাংল্ললিতাঙ্গি পশ্য সুদতী দৃষ্টেনিমেষ-ব্রতম্‌॥—শ্লোক ৭৮।

(৬) সেয়ং সুভ্রু পুরঃ কলিন্দতনয়া গীর্ব্বাণসিন্ধোঃ সখীঃ
বামঃ কালিয়পন্নগদ্য যমুনা দৃগ্‌গোচরে বর্ত্ততে।
বন্দস্বার্য্যমনীমিমাং দুহিতরং বৈবস্বতস্যানুজাং
যস্যাঃ স্বর্ণপরীক্ষণক্ষমদৃষত্তাপী স্বসা সোদরী॥—শ্লোক ৮৫।

(৭) যত্রার্য্যো ন তথানুরজ্যতি কবিগ্রাম্যৈণগীগুম্ফনে
শাস্ত্রীয়াসু চ লৌকিকীষু চ যথা ভব্যাসু নব্যোক্তিষু।
পঞ্চালাস্তব পশ্চিমেন ত ইমে বামা গিরাং ভাজনা-
স্তদ্‌ দৃষ্টৈরতিথীভবন্ত যমুনাং ত্রিস্রোতসং চান্তরা॥—শ্লোক ৮৬।

(৮) যো মার্গঃ পরিধানকর্ম্মণি গিরাং যঃ সূক্তিমুদ্রাক্রমো
ভঙ্গির্যা কবরীচয়েষু রচনং যদ্ভূষণালীষু চ।
দৃষ্টং সুন্দরি কান্যকুব্জললনালোকৈরিহান্যচ্চ য
চ্ছিক্ষন্তে সকলাসু দিক্ষু তরসা তৎকৌতুকিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ॥—শ্লোক ৯০।

করিয়াছেন; রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান লইয়া বালরামায়ণ ও বালভারতের রচনা করিয়াছেন। বালরামায়ণ সুবৃহৎ নাটক। সংস্কৃত অন্য কোনও নাটকই এত দীর্ঘ নয়। কবি নিজেও বুঝিয়াছিলেন যে, নাটকখানি বহুবিস্তৃত হইয়াছে। তাই প্রস্তাবনায় বলিতেছেন, "যদি কেহ বলে যে, বাল-রামায়ণ খুব বিস্তৃত, এই এক মহৎ দোষ, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাতে প্রকৃষ্ট রচনা-নৈপুণ্য বিদ্যমান আছে কি না; যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে আমার ছয় প্রবন্ধ পাঠ কর; নতুবা নট ও পাঠকের নিকট আমার কাব্য জর্জ্জর হইয়া থাকুক।" (৯) বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতাদৃশ বৃহৎ নাটক কিরূপে অভিনীত হইত? বালরামায়ণে কবি বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে রামায়ণবর্ণিত ঘটনায় কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন রামচন্দ্রের বনবাসের আজ্ঞা দশরথ স্বয়ং দেন নাই, শূর্পনখা ও রাক্ষসগণ দশরথ ও কৈকেয়ী প্রভৃতির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, ইত্যাদি। ভবভূতি মহাবীর-চরিতেও এইরূপ রামায়ণোক্ত অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কৌশলে বালি-বধ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ভবভূতি সম্মুখযুদ্ধে বালীর বধ দেখাইয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ এরূপ পরি-বর্ত্তনের সমর্থন করিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,—"নায়ক বা রসের যাহা অনুপযুক্ত, তাহা হয় পরিত্যাগ করিবে; না হয় অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করিবে।" (১০) উদাত্তরাঘব নামক নাটকে বালিবধ-বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজশেখর যে ভবভূতির অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। কৈকেয়ীর দোষক্ষালনের প্রয়াস, লঙ্কা ও অলকার কথোপকথন প্রভৃতি ভবভূতি হইতে অনুকৃত। বালরামায়ণ ও বালভারতের প্রস্তাবনায় রাজশেখর দৈবজ্ঞের মুখ দিয়া এই শ্লোকটি বলাইয়াছেন,—"পূর্ব্বে যে কবি বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পর পৃথিবীতে যিনি ভর্ত্তৃমেণ্ঠ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষে যিনি ভবভূতি নামে বিখ্যাত হইয়া-

(৯) ব্রূতে যঃ কোঽপি দোষং মহদিতি সুমতির্বালরামায়ণেঽস্মিন্
প্রষ্টব্যোঽসৌ পটীয়ানিহ ভণিতিগুণো বিদ্যতে বা ন বেতি।
যদ্যস্তি স্বস্তি তুভ্যং ভব পঠনরুচি-র্বিদ্ধি নঃ ষট্ প্রবন্ধা-
নৈবং চেদ্দীর্ঘমাস্তাং নটবটুবদনে জর্জ্জরা কাব্যকন্থা ।—প্রস্তাবনা।

(১০) যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ ।—[সা. দ.—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।]

ছিলেন, তিনিই এক্ষণে রাজশেখর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" (১১) বাল্মীকি ও ভবভূতি সুপরিচিত। ভর্তৃমেণ্ঠের যথার্থ পরিচয় অজ্ঞাত কোনও কোনও পুস্তকে 'ভর্তৃমেন্ঠু' এই পাঠ আছে। ভর্তৃমেণ্ঠ 'হস্তিপক' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচিত হয়গ্রীববধ কাব্যের উল্লেখ রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। আনন্দরাম বড়ুয়া স্বীয় "Bhavabhuti and his place in Sanskrit Literature নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"the second line evidently alluded to Bhattikavya, but the reading is corrupt." পরে লেভিও (Levi) এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এ মতের পোষক বিশেষ কোনও যুক্তি নাই।

রাজশেখর মহারাষ্ট্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহামন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নাম কি, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। বালরামায়ণে পাঠ আছে,—"দৌর্দুকিঃ"। বিদ্ধশালভঞ্জিকায় আছে,—"দৌহিকিনা"। ইহা হইতে তাঁহার পিতার নাম দুর্দুক কিংবা দুহিক ছিল, ইহা জানা যায়। তাঁহার মাতার নাম শীলবতী। মহারাষ্ট্রচূড়ামণি অকালজলদ হইতে রাজশেখর চতুর্থ পুরুষ। ইঁহাদের বংশের নাম যাযাবর বংশ। সুরানন্দ, তরল, কবিরাজ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ কবি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি রাজশেখর নিজেই এইরূপে বংশপরিচয় দিয়াছেন,—"মূর্তিমান্ গুণসমূহের ন্যায় অকালজলদ যে বংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার রচনাবলী কর্ণপুটে সাদরে পেয়, সেই সুরানন্দ, তরল, কবিরাজ প্রভৃতির কথা আর কি বলিব?—ইঁহারা সকলে যে বংশে উৎপন্ন, সেই যাযাবর-বংশে এই মহাভাগ রাজশেখর স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন।" (১২)

(১১) বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥
—বালরামায়ণ ; ১।১৬ ও বালভারত ১।১২

(১২) স মূর্ত্তো যত্রাসীদ্ গুণগণ ইবাকালজলদঃ
সুরানন্দঃ সোঽপি শ্রবণপুটপেয়েন বচসা।
ন চান্যে গণ্যন্তে তরল-কবিরাজপ্রভৃতয়ো
মহাভাগ তস্মিন্নয়মজনি যাযাবরকুলে ॥

তদামুষ্যায়ণস্য মহারাষ্ট্রচূড়ামণেরকালজলদস্য চতুর্থো দৌর্দুকিঃ শীলবতীসূনুরুপাধ্যায়-শ্রীরাজশেখরঃ।—বালরামায়ণ, প্রস্তাবনা।

যাযাবরেণ দৌহিকিনা কবিরাজশেখরেণ বিরচিতায়াঃ—বিদ্ধশালভঞ্জিকা ; প্রস্তাবনা।

নারায়ণ দীক্ষিত যাযাবর শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"দ্বিবিধো গৃহস্থঃ, যাযাবরঃ শালীনশ্চ।" যাযাবর ও শালীন, দুইপ্রকার গৃহস্থ। হল্ লিখিয়াছেন,—যাহারা যজ্ঞীয় অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রাখে, তাহারা যাযাবর। ("Maintainer of a sacrificial hearth." Hall.)

রাজশেখর শৈব ছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কর্পূরমঞ্জরী, বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও বালভারতে যে নান্দীশ্লোকগুলি আছে, তাহা হরপার্ব্বতীর প্রণামসূচক। তবে কেবল এই প্রমাণে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। যশস্তিলকচম্পূ নামক সোমদেবসূরি-রচিত মহাকাব্যের তৃতীয় আশ্বাসে, রাজশেখর সময়ে সময়ে জৈনধর্ম্মের গৌরবার্থ সচেষ্ট হইতেন, ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দুই রাজশেখর এক কি না, তাহা বিচার্য্য।

রাজশেখর-পত্নীর নাম অবন্তীসুন্দরী। তিনি চৌহানকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইনি রাজপুত-বংশীয়া ছিলেন। রাজশেখর কান্যকুব্জাধিপতি নির্ভয়রাজের গুরু ছিলেন, এ কথা "নির্ভয়গুরুর্য্যস্ত চ বাল্মীকিক্রিয়াং কিমনুস্থত্য" (বালরামায়ণ ১।৫) ও "রঘুকুলতিলকো মহেন্দ্রপালঃ সকলকলানিলয়ঃ স যস্য শিষ্যঃ" (বিদ্ধশালভঞ্জিকা ; ১।৬) হইতে অবগত হওয়া যায়। উপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

রাজশেখর কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। রাজশেখর নামধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। সকলকে এক ধরিয়া লইলে বিষম ভ্রম হইবে। আনন্দরাম বড়ুয়া লিখিয়াছেন,—"মাধবাচার্য্যের শঙ্করদিগ্‌জয় (বোম্বাই হইতে কৃষ্ণজী গণপৎজী কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা আনন্দগিরির শঙ্করবিজয় হইতে বিভিন্ন) নামক গ্রন্থে আছে যে, রাজশেখর শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক ছিলেন।" ("We know from Madhavacharya's Sankara-Digjaya that its author Rajasekhara was a contemporary of the reformer Sankaracharya. p. 16. Bhavabhuti.]

এই মত ভিত্তিহীন। যদিও রাজশেখর নামে কোনও জন শঙ্করাচার্য্যের সময় বিদ্যমান ছিলেন, এমন হয়, তাহা হইলে তিনি কবি রাজশেখর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। শঙ্করাচার্য্য রাজশেখর নামক এক নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত হইতে আমরা তাহা অবগত হই। কবি রাজশেখর রাজা ছিলেন না।

রাজশেখর নিজে লিখিয়াছেন, তিনি নির্ভয়রাজ ও মহেন্দ্রপালের গুরু ছিলেন। এই রাজা কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দুইখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে রাজশেখরের সময় অসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

আস্‌নি ফলকে (Asni Inscription—Fleets corpus Inscriptionum Indicarum দেখ) মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালের নাম পাওয়া যায় এই ফলকের তারিখ—বিক্রম-সংবৎ ৯৭৪। ইংরাজী ৯১৭ খৃষ্টাব্দ। রাজশেখর এই মহীপালের পিতা মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ছিলেন। সিয়াদোনি ফলকে মহোদয় নগরের নাম আছে। মহোদয় ও কান্যকুব্জ একই স্থলের নাম। বালভারত মহোদয়ে অভিনীত হইয়াছিল। বালরামায়ণের দশম অঙ্কে মহোদয় ও কান্যকুব্জ যে এক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সিয়াদোনি ফলকে নিম্নলিখিত চারি জন কান্যকুব্জের রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

১। ভোজ (৮৬২, ৮৭৬, ৮৮২ খৃষ্টাব্দ)

২। মহেন্দ্রপাল, নির্ভয়নরেন্দ্র বা মহিষপাল (৯০৩ হইতে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ)। ইনিই রাজশেখরের শিষ্য ছিলেন।

৩। ক্ষিতিপাল, মহীপাল, বা হেরম্বপাল (৯১৭ খৃঃ) ইনিও রাজশেখরের পোষক ছিলেন।

৪। দেবপাল। ইনি ক্ষিতিপালের পুত্র।

ফ্লীট্ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"ফলকটির পাঠ মহিষপাল, মহেন্দ্রপাল নয়; মহেন্দ্রপাল নির্ভয়নরেন্দ্রের পুত্র বা পৌত্র হইবেন।" কিন্তু আস্‌নি ফলকে মহীপালের পিতার নাম মহেন্দ্রপাল পাওয়া যায়। সুতরাং এ ফলকের মহিষপাল পাঠ যুক্তিযুক্ত নয়। কীল্‌হরণ (Kielhoron) এই বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছেন। ফ্লীট জানিতেন না যে, মহেন্দ্রপাল ও নির্ভয়নরেন্দ্র একই ব্যক্তি। অফ্রেট্ ও পিশেল্ (Aufrecht, Pischel) দেখাইয়াছেন, ইঁহারা একই।

সুতরাং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজশেখর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাজশেখরের নাম দশরূপকে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র-কৃত ঔচিত্যালঙ্কারেও তাঁহার উল্লেখ আছে। এই ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীররাজ অনন্তের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। (১০৫০ খৃষ্টাব্দ) [Journal of Bombay Royal Asiatic

Society Vol. XVI. pages 83 - 85 দ্রষ্টব্য।] এই ঔচিত্যালঙ্কারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে : -

কর্ণাটীদশনাঙ্কিতঃ শিতমহারাষ্ট্রীকটাক্ষাহতঃ
প্রৌঢ়ান্ধ্রীস্তনপীড়িতঃ প্রণয়িনীভ্রূভঙ্গবিত্রাসিতঃ।
লাটীবাহুবিবেষ্টিতশ্চ মলয়স্ত্রীতর্জ্জনীতর্জ্জিতঃ
সোঽয়ং সম্প্রতি রাজশেখর-কবির্বারাণসীং বাঞ্ছতি॥

অর্থাৎ, কর্ণাটদেশস্থ রমণীগণের দন্তচিহ্নে চিহ্নিত, মহারাষ্ট্রনারীদিগের কটাক্ষাহত, অন্ধ্রনারীস্তনপীড়িত, প্রণয়িনীর ভ্রূকুটীদর্শনে ভীত, লাট-ললনার বাহুবেষ্টিত, মলয়সীমন্তিনীর অঙ্গুলিতাড়নায় তর্জ্জিত রাজশেখর কবি এক্ষণে কাশীধাম প্রার্থনা করিতেছেন।

বালরামায়ণেও কর্ণাট, অন্ধ্র, লাট প্রভৃতি দেশের রমণীগণের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা রাজশেখরের চরিত্র সূচিত হইয়াছে। আমাদের মতে, এরূপ নিদর্শন দ্বারা কবির চরিত্র-নিরূপণ অন্যায়। কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনাতেও আদিরসবর্ণনার বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে কালিদাসের চরিত্রহীনতা প্রতিপন্ন হয় না। কেহ কেহ বলেন, বালরামায়ণে প্রথমে অন্ধ্র, লাট প্রভৃতি দেশের রমণীদের বর্ণনা করিয়া কাশীবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া রাজশেখরের প্রতি ঐ বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাব এই,—যিনি রমণীর ভাবভঙ্গীতে এত মুগ্ধ, তিনি আবার কাশীবর্ণনা করিতেছেন! উল্লিখিত শ্লোক যে ভাবেই ধরা হউক না কেন, রাজশেখরের চরিত্রে উহা কোনও কলঙ্কের রেখাপাত করিতেছে না। কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে উদ্ভট শ্লোকের অভাব নাই।

আমরা এক্ষণে রাজশেখর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শঙ্করবর্ম্মণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করি,—

পাতুং শ্রোত্ররসায়নং রচয়িতুং বাচঃ সতাং সম্মতা
ব্যুৎপত্তিং পরমামবাপ্তুমবধিং লব্ধুং রস-স্রোতসঃ।
ভোক্তুং স্বাদু ফলঃ চ জীবিত-তরোর্যদ্যস্তি তে কৌতুকং
তদ্ভ্রাতঃ শৃণু রাজশেখরকবেঃ সূক্তীঃ সুধাস্যন্দিনীঃ॥

চাহ যদি মনোহর রচনা-লহরী, শুনি যাহা জুড়াবে শ্রবণ।
চাহ যদি নিপুণতা সাধুমনোমত বাক্যাবলী করিতে রচন॥
আস্বাদিতে চাহ ফল জীবন-তরুর, রস-নদী করিতে লঙ্ঘন,
শোন সুরচনা কবি রাজশেখরের করে যাহা পীযূষ-বর্ষণ॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

প্রাচী-ভ্রমণ।

৪

সস্ত্রীক প্রিন্স প্রভাতী, যে ঘরে আমি থাকিব, সেই ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন, বার্ণিস করা কাঠের মেজে, বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত আছে, প্রচুর বায়ু ও আলোক আসিবার জন্ত অনেকগুলি জানালা আছে। তাঁহাদিগকে বসিতে কহিয়া নিজে বসিলাম। প্রিন্সের বয়ঃক্রম প্রায় ২৯।৩০ বৎসর। ইনি জর্ম্মণীতে বহুদিন অবস্থান করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাকরিয়াছেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গী—আমাদের মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদের স্তায় কাছা দিয়া একখানি রঙ্গীন কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন। সমস্ত শরীরে কোনও অলঙ্কার নাই ; কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তে কঙ্কণের স্থানে একটি সূক্ষ্ম সুবর্ণশিকল, তাহাতে ক্ষুদ্র-হীরক-জড়িত হৃদয়াকার সুবর্ণ সংলগ্ন ছিল। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে কাণ বেঁধা, নাক বেঁধার যেরূপ বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, শ্যামের বড়ঘরের মহিলাদের মধ্যে বা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ দুই কানে দুইটিমাত্র ছিদ্র করিয়া থাকেন। আঙ্গুলে আংটি ও হাতে কিছু গহনা সাধারণতঃ শ্যামরমণীরা পরিধান করিয়া থাকেন। শ্যামবাসীদের পান ও তাহার সহিত দোক্তা না হইলে এক মুহূর্ত্ত চলে না। প্রিন্সেস মহোদয়া পান ও দোক্তায় এত আসক্তা যে, তাঁহার সম্মুখের দন্তগুলি বেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকের দোক্তা ধারণ করিয়া অধরের মাংস বড় হইয়া গিয়াছে, ইহা একটু সামান্ত লক্ষ্য করিলেই টের পাওয়া যায়।

অপরাহ্ণে এক জন লোক লইয়া শ্যামের ব্রাহ্মণদের দেখিতে গমন করিলাম। আমার অবস্থানগৃহের নিকটেই ইহাদের দেবালয় ও বাসস্থান। গন্তব্য পথে, একটি চতুষ্পথের মধ্যস্থানে শ্যামের সাও-চিঙ্গ-চা নামক বিখ্যাত উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আমি এই উৎসবের সময় উপস্থিত থাকিয়া ইহার ক্রিয়াকলাপ ও বহু সহস্র শ্যামবাসীর এক স্থানে সম্মিলন দেখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

এ স্থানে "সাও চিঙ্গ চা" সম্বন্ধে একটু কথা কহিয়া অগ্রসর হইব। চতুষ্পথের মধ্যস্থলে দুইটি বিরাট স্তম্ভ প্রোথিত আছে। শ্যামের ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা

এই স্তম্ভে দোলা খাটাইয়া দুলিয়া থাকেন। এই স্তম্ভকে সম্মুখে রাখিয়া দাঁড়াইলে, বাম দিকে সুবৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির; দক্ষিণ দিকের সম্মুখের রাস্তার ধারে ব্রাহ্মণদের মন্দির। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমাদের পূজিত বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ যুবকগণ বৃত্তাকারে অবস্থান করিয়া, কমলা লেবুর স্থায় বড় শূন্যগর্ভ বেতের বল লইয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে পদাঘাত করিয়া অন্য ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিতেছে; সেইরূপ অপরে পশ্চাদ্ভাগ হইতে প্রতিঘাত করিয়া অন্যের নিকট প্রেরণ করিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি আগ্রহের সহিত ক্রীড়া দেখিতেছিল। সকলের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। যখন তাহারা শুনিল, আমি এক জন ব্রাহ্মণ, তাহাদের মন্দির দেখিতে আসিয়াছি, তখন তাহারা—যেন বোধ হইল—একটু বিস্ময়ের সহিত আমাকে দেখিতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি আমার পাদুকা-পরিত্যাগের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিলাম। যখন দেখিলাম, আমার সঙ্গী কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া গমন করিল, তখন আমিও অগত্যা জুতা পরিয়া তাহার অনুগমন করিলাম। মন্দিরের মধ্যে উচ্চবেদীতে থাকে থাকে ঠাকুর সকল সাজান রহিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে মদুরা প্রভৃতির মন্দিরের গাত্রে ও লণ্ডনে মিউজিয়মে মহাদেবের যেরূপ তাণ্ডব-নৃত্যের প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ তিনটি মূর্ত্তি, আর কতকগুলি দাঁড়ান গণেশ, বসা গণেশ, শিব, বিষ্ণু, অষ্টভুজা দেবী শোভা পাইতেছেন। বেদীর দুই পার্শ্বে স্ব স্ব বাহনে উপবিষ্ট বিষ্ণু ও শিব অবস্থান করিতেছেন। পূজার কোনরূপ সন্ধান পাইলাম না; কেবলমাত্র দীপের দগ্ধাবশিষ্ট অংশ পতিত রহিয়াছে।

মন্দির দেখিয়া, মন্দিরের পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণপল্লী দেখিবার জন্য গমন করিলাম। শ্যামে প্রচুর কাষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা সুলভ, এবং অনেক স্থলে লৌহের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্যামবাসীদের গৃহের প্রধান উপাদান কাষ্ঠ। এ দেশ স্যাঁৎসেঁতে বলিয়া সম্ভবতঃ মাচার মতন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এখানকার ব্রাহ্মণদের বাড়ীও এইরূপ প্রথায় প্রস্তুত। উপর হইতে আবর্জ্জনা ও সকল প্রকার জল পড়ায় ইহা যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। ব্রাহ্মণপল্লীর মধ্যে মাচার নীচে কুক্কুট সকল চারি দিকে আহার অন্বেষণ করিয়া জঞ্জাল সকল ছড়াইতেছে। এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের

নিকট আমি নীত হইলাম। তাঁহার নিকট কোনও প্রাচীন পুস্তক আছে কি না, অনুসন্ধান করিলাম। কতদিন ও কোন দেশ হইতে কি সূত্রে এ দেশে আগমন করিয়াছেন, ইত্যাদি প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর দিতে পারিলেন না। আমি তাঁহাকে আমার দোভাষী দ্বারা বলিলাম, সংস্কৃত মন্ত্র যদি শিখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত। সম্ভবতঃ তিনি আমার দোভাষীর কাছে ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, যা আমাদের পৈত্রিক চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। নানা কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা সংখ্যায় অল্প; আপনাদের বিবাহ কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে ? তাঁহার কথার মর্ম্ম এইরূপ যে, পুত্রগত কুল—আর "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ শ্যামাবী কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণী করিয়া লয়। ব্রাহ্মণকন্যা শ্যামাবীকে বিবাহ করিলে শ্যামাবীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তাহার ব্রাহ্মণত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ নানা প্রকার আলাপ করিয়া আমি আমার আবাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

সায়ংকালের পূর্ব্বে প্রিন্স প্রভাতীর সহিত ভারতবর্ষ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় কতকগুলি যুবক ইউরোপীয় সৈনিকের বেশে আমাদের কাছে আগমন করিল।

ইহারা যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার্থী। সপ্তাহ কাল সেনানিবাসে অবস্থান করিয়া সপ্তাহান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ইহারা প্রিন্স সুমাতর আশ্রিত পরিবারবর্গের সন্ততি। আমাদের প্রাচ্য ভূমিতে দাস্য ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোমলতাই অনুভূত হইয়া থাকে। প্রিন্সের আশ্রিতবর্গের কোনও পূর্ব্বজের—আধুনিক কথায়—"ক্রীতদাস" হইতে পারে, কিন্তু তাহারা আশ্রিত অনুগতের ন্যায় কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই সুপ্রাচীন ভারতেও শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমনে,—ভরত বলিয়াছিলেন আমার অনুমতে যদি আর্য্য বনে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভৃত্যত্যাগজনিত যে পাপ, তাহা আমাকে স্পর্শ করুক। প্রিন্স সুমাতের আবাসের চতুষ্পার্শ্ব তাঁহার আশ্রিতগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। এই আশ্রিতবাৎসল্য ভাবটা আমার বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতায় বিমুগ্ধ হইলেও আমাদের ন্যায় প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। পুলিস-প্রহরী ও সৈনিকেরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। ভদ্রলোকেরা গৃহে

অবস্থানকালে লুঙ্গি অথবা মালকোঁচা বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া থাকেন। স্ত্রী-লোকেরা মহারাষ্ট্রীয় রমণীর ন্যায় কাছা দিয়া কাপড় পরিয়া থাকেন। রমণীরা মস্তকের চুল ছোট করিয়া কাটাইয়া থাকেন; ইহা আমাদের চক্ষে একটু বিসদৃশ দেখায়। সাধারণতঃ ইহারা বক্ষোদেশ চাদর বাঁধিয়া থাকে। শ্যাম-বাসীরা যখন পায়ে পুরো মোজা পরিয়া রঙ্গিন কাপড়ে মালকোঁচা বাঁধিয়া ও কোট পরিয়া গমন করে, তখন ইহাদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বোধ হয়। আজকাল পৌষ মাস হইলেও এখানে শীতের প্রকোপ কিছুমাত্র নাই। বরং দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের কিরণ তাপপ্রদ হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ কিরূপ ক্লেশজনক, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। মস্তক রক্ষা করিবার জন্য এ দেশের রাজকর্ম্মচারীরা হ্যাট ব্যবহার করিয়া থাকেন। জনসাধারণ আমাদের ন্যায় উলঙ্গমস্তক।

শ্যামে নানা প্রকারের ফল প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম দুই দিন আমি ফল খাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছিলাম। ভাত খাইবার জন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা হয় নাই। শ্যামে যত দিন ছিলাম, তাহার অধিকাংশ দিবসই খিচুড়ী রাঁধিয়া খাইয়াছি। আমার রন্ধন ও ভোজন ব্যাপার দেখিয়া প্রিন্স প্রভাতী একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "একবেলা অল্প খিচুড়ী, আর রাত্রে কিছু ফল খাইয়া কেমন করিয়া শরীর রক্ষা করিবেন?" প্রত্যুত্তরে আমি বলি, "ইহাতেই আমার যে বল আছে তাহাতে তিন চারি জন শ্যামবাসীর সহিত বল-পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ নহি।" ভাত ও মাছই এদেশবাসীর প্রধান খাদ্য। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে রন্ধন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। চীনে দোকানীরা রন্ধনশালার ভার লইয়া আহার্য্য যোগাইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বাজারেও অন্নাদি বিকাইয়া থাকে। এদেশের লোকেরা কলা তেলে ভাজিয়া উপভোগ করিয়া থাকে। মাংস সম্বন্ধে ইহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই; হিন্দুর অখাদ্য মাংসও ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এক জন শ্রামণীকে আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমরা বৌদ্ধ হইয়া এরূপ হত্যায় প্রশ্রয় দাও কেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "প্রশ্রয় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আমরা হত্যা করি না; এক শ্রেণীর অ-বৌদ্ধ আছে, তাহারা হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে—বৌদ্ধে হত্যা করে না।" আর এক জন বলেন, "আমি বড় পশু খাই না; ছোট পশু খাই।" যে দিবস আমি ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হই, সেই দিবস রাজ্যের একটি ঘটনা অনেক দিন আমার

মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। স্বভাবতঃই আমি একটু সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করিয়া থাকি। সেই অভ্যাস অনুসারে এখানেও আমি আমার পর্য্যঙ্কে শয্যা গ্রহণ করি, এবং নিদ্রাদেবীর কৃপায় দুই এক মিনিটের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই। ১০।১০॥ টার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় "ভগবা" শব্দ আমার কর্ণকুহরগত হইল। একবার বোধ হইল, আমার বালক বালিকাদের মধ্যে বুঝি কেহ তাহাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া শয়ন করিবার উপক্রম করিতেছে—ধীরে ধীরে এ স্বর সে স্বর হইতে পৃথক বলিয়া উপলব্ধি হইল। একবার মনে হইল,আমাদের দেশের কোনও স্থানে গিয়াছি, তথাকার কোনও কথা বুঝি আমার কর্ণগোচর হইতেছে। অল্পে অল্পে তন্দ্রা কাটিয়া গেল—তখন মনে হইল, আমি ব্যাঙ্ককে প্রিন্সের বাড়ীতে শয়ন করিয়া রহিয়াছি—আর এ স্বর এক জন বৃদ্ধার কণ্ঠ-নিঃসৃত। পালি (শ্যামে বালি ভাষা বলে) ভাষায় ভগবান বুদ্ধদেবের গুণগাথা সকরুণ স্বরে আবৃত্তি করিতেছে। এই ব্যাঙ্ককে অবস্থানকালে যে স্বর মুহূর্ত্তের জন্ম আমাকে স্বদেশে স্বজনগণমধ্যে প্রেরণ করিয়াছিল, সেই স্বর, সেই বুদ্ধস্তুতি কিয়ৎক্ষণ শ্রবণ করিয়া আবার নিদ্রাগত হইলাম।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

নীহারিকা।

অন্ধকার রজনীতে নির্ম্মল আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে শুভ্র মেঘের ন্যায় একটি ক্ষীণ আলোকবর্ত্ম দেখিতে পাওয়া যায়। উহা আকাশের উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই আলোকবর্ত্মকে ছায়াপথ কহে। ছায়াপথ একটি বৃত্তের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া অনন্ত আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। আমরা একবারে ছায়াপথের অর্দ্ধাংশমাত্র দেখিতে পাই। পৃথিবী যদি কাচের মত স্বচ্ছ হইত,তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া ছায়াপথের অপরার্দ্ধও এক সময়ে দেখিতে পাইতাম। কার্ত্তিক মাসের প্রথমভাগে রাত্রি প্রায় ৭-৩০ সাড়ে সাতটার সময় ছায়াপথ আমাদের মাথার উপরে আইসে। পৌষ মাসের প্রথমভাগে সন্ধ্যার পরই ছায়াপথ পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়ে, তার পর অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন শেষ রাত্রিতে উঠিয়া দেখিলে ছায়া-পথের অপরার্দ্ধ পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কল্পনাকৌতুকী কবিগণ ছায়াপথকে "স্বর্ণদী", "আকাশগঙ্গা," "যমের জাঙ্গাল", "দেববত্ম" প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন। ছায়াপথ সম্বন্ধে প্রাচীন সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে এক সময়ে নানা বিচিত্র গল্প প্রচলিত ছিল। এই সকল গল্প হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে অতি ক্ষীণ-আলোক-বিশিষ্ট ছায়াপথ তৎকালের অধিবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত গ্যালিলিও সর্ব্বপ্রথম ছায়াপথের প্রহেলিকা-আবরণ উন্মুক্ত করিয়া প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার করেন। তিনি দূরবীক্ষণের পরীক্ষায় সপ্রমাণ করেন যে, ছায়াপথ বহুসংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টিমাত্র। অতিশয় দূরে অবস্থিত বলিয়া ঐ সকল নক্ষত্র পৃথক পৃথক দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল উহাদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ দুগ্ধবৎ শুভ্র দেখায়।

গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণটি আজকালের দূরবীক্ষণের তুলনায় অতিশয় নিকৃষ্ট ছিল। সুবিখ্যাত লর্ড রসের Lord Ross অথবা আমেরিকার "লিক্" মানমন্দিরের দূরবীক্ষণের তুলনায়, গ্যালিলিও যে দূরবীক্ষণের ব্যবহার করিতেন, উহাকে একটি "খেলনা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকাশ্যে ঈদৃশ দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিতে বোধ হয় অপমান বোধ করিবেন। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁহার "সেকেলে" দূরবীক্ষণের সাহায্যেই চন্দ্রের গিরিগহ্বর, শনৈশ্চরের বিচিত্র বলয় (Rings) ও ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রনিচয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চন্দ্রের পর্ব্বতরাজি ও শনৈশ্চরের বলয়ের বিবরণ যখন গ্যালিলিও প্রথম প্রকাশ করেন তখন কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। আপামর সাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত উপহাস করিয়াছিল, এমন কি, পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাতুলালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যখন গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—সূর্য্য স্থির, পৃথিবী সচলা, তখনও তদানীন্তন ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে তিনি কত না নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। এখন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণও এই সকল তথ্য অবগত আছে। অভিনব সত্যের প্রচার যে কি দুরূহ কার্য্য, গ্যালিলিওর জীবনাখ্যায়িকা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্যালিলিওর পর অসাধারণমনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত সার উইলিয়াম হর্শেল (Sir William Harschel) আবির্ভূত হইলেন। হর্শেল তাঁহার উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গ্যালিলিওর

আবিষ্কৃত তথ্য যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি ছায়াপথের স্থানে স্থানে তাঁহার বিরাট দূরবীক্ষণের দৃষ্টি (Vision) নির্দ্দেশ করিয়া দেখিলেন, যে স্থানটি পূর্ব্বে শুভ্র মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তথায় উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় অগণিত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিতেছে! নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, তার পর আবার নক্ষত্র! স্তরের পর স্তর! কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য! এই সকল কোটী কোটী নক্ষত্রের প্রত্যেকটিই আমাদের সৌরজগতের সম্রাট স্র্য্যের ন্যায় বৃহৎ ও উজ্জ্বল, এবং পরস্পর হইতে কোটী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত!

ছায়াপথ অসংখ্য নক্ষত্রমালার সমষ্টিমাত্র, গ্যালিলিও কর্ত্তৃক প্রচারিত এই সত্য হর্শেল অভ্রান্ত বলিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি অধিকতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত আকাশ-পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। বহুবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হর্শেল অনেকগুলি ঘন-বিন্যস্ত নক্ষত্রপুঞ্জের আবিষ্কার করিলেন শুধু চোখে আকাশের স্থানে স্থানে যে শুভ্র পাত্‌লা মেঘের মত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, হর্শেলের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল, ইহাদের অনেকগুলিই অতিশয় দূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ (star cluster); অচিন্তনীয় ব্যবধান হেতু আমরা পৃথিবী হইতে তারকাসমূহকে পৃথকভাবে দেখিতে পাই না, কেবল ইহাদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়! এতদ্ব্যতীত হর্শেল আকাশের কয়েকটি স্থানে প্রদীপ্ত বাষ্পময় পদার্থের আবিষ্কার করিলেন। এই বাষ্পময় পদার্থকেই নীহারিকা (nebula) কহে। অতঃপর আমরা এই প্রবন্ধে আকাশস্থ জলন্ত বাষ্পরাশিকে নীহারিকা নামে অভিহিত করিব।

নীহারিকার বিবরণ যেমন রহস্যময়, তেমনই অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, আকাশস্থিত নীহারিকাসমূহ হইতেই অগণিত নক্ষত্রনিচয়, আমাদের সূর্য্য, পৃথিব্যাদি গ্রহ ও উহাদের চন্দ্ররাজি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তকেই নীহারিকাবাদ (Nebular Hypothesis) কহে।

হর্শেল তাঁহার সুবিশাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, আকাশের সকল নক্ষত্র এক প্রকার নহে, ভিন্ন-ভিন্ন-অবস্থাপন্ন। অর্থাৎ, কোনও কোনও নীহারিকা সম্পূর্ণ বাষ্পময়; কোনটির যেন স্থানবিশেষ ঘনীভূত হইয়াছে। কোনটি কঠিন হইয়া নূতন নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আবার উহাদের আকৃতিগত বৈচিত্র্যও অসামান্য

রহস্যময়। কোনও নীহারিকার আকৃতি কুণ্ডলীর মত (spiral); কোনটি চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান (annular); কোনও নীহারিকার দুইটি অংশ আছে। এই অংশদ্বয় উভয়ের মধ্যস্থ নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারি দিকে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। হয় ত কালে উহারা ঘন হইয়া যুগল-নক্ষত্রে (duble ster) পরিণত হইবে।

নীহারিকার প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া হর্শেল সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রদীপ্ত নীহারিকা-রাশির অবস্থান্তর হইতেই জগতের অভিব্যক্তি।

আকাশে এখনও যে সকল নীহারিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, কালক্রমে উহারাও সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কে পরিণত হইবে। বিশ্বপতির বিচিত্র শিল্পশালায় লোকচক্ষুর অন্তরালে এইরূপ কত নব নব জগৎ সৃষ্ট হইতেছে।

লাপ্লাস (Laplace), লিবনিজ (Leibnitz), হর্শেল Sir John Horshel), কেণ্ট (Kent) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত নীহারিকাবাদের (Nebular Hypothesis) পক্ষপাতী।

লাপ্লাস সৌর জগতের উৎপত্তির যে কারণনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নীহারিকাবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়াছে। তাঁহার মতে, সৌরজগতের সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্ক সকল এক সময়ে একটি বিরাট জলন্ত বাষ্প-গোলাকারে আকাশে অবস্থিত ছিল। সেই সুবিশাল বাষ্প-গোলা এক স্থানে স্থির থাকিত না, উহা নিজের চারি দিকে ঘুরিত। ক্রমে সেই উত্তপ্ত বাষ্প-রাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। এই সঙ্কোচ কার্য্য যতই চলিতে লাগিল, বাষ্পরাশি ততই ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেই নীহারিকার-(বাষ্প)-সঙ্কোচের অনুপাতে উহার ঘূর্ণনের বেগও বাড়িয়া চলিল, এবং কেন্দ্রাপসারিণী (Centrifugal) শক্তিও বৃদ্ধি পাইল। কোনও গোলকের প্রত্যেক অংশের কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি ও সেই স্থানের মাধ্যাকর্ষণের শক্তি যতক্ষণ সমান থাকে,ততক্ষণ ঐ গোলক অবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতে থাকিবে। যে স্থানের কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি তথাকার মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে অতিক্রম করিবে, সেই স্থানের বাহিরের অংশগুলি আর গোলকের সহিত সংযুক্ত থাকিতে পারিবে না, উহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। ঘূর্ণ্যমান গোলকের কটি-দেশের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই জন্য তথাকার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিও

সেই পরিমাণে অধিক। সেই বিশাল বাষ্প-গোলকের বিষুব রেখার সন্নিহিত অংশ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু উৎক্ষিপ্ত হইয়াও অধিক দূরে যাইতে পারিল না। ইহা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন হইয়া মূল বাষ্প-গোলক বা নীহারিকাকে গ্রহের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। এইরূপে নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি গ্রহ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে মূল নীহারিকা হইতে পরিত্যক্ত বৃহৎ অংশ সকল হইতে পুনরায় স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক উৎপন্ন হইয়া এই সকল অংশকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; উহারাই উপগ্রহ নামে অভিহিত হয়। অনন্ত আকাশে যত জ্যোতিষ্ক বিরাজমান আছে, সকলই এইরূপে নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নীহারিকা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত আধুনিক পণ্ডিতগণও গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আকাশে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখিতেছি, সকলই এক সময়ে জ্বলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা অবস্থায় ছিল। আমাদের শৈলকিরীটিনী, নদনদীসীমন্তিনী ধরণী এখন অগণিত জন প্রাণীর আবাসভূমি, কিন্তু একদিন এই ধরিত্রী জ্বলন্ত বাষ্পীয় চক্ররূপে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত। শীতল আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তপ্ত বাষ্পীয় পৃথিবীর তাপক্ষয় হইতে লাগিল। বহু সহস্র বৎসর এইরূপে তাপ-ক্ষয় হওয়াতে ক্রমে উহা শীতল ও ঘন হইয়া পরে তরলতা প্রাপ্ত হইল। তখন সমুদ্রে ভাসমান হিম-শৈলের (Iceberg) ন্যায় অপেক্ষাকৃত জমাট পদার্থরাশি পৃথিবীর উপর ভাসিতে লাগিল। ক্রমে এই সকল জমাট পদার্থরাশি পৃথিবীকে আবৃত করিয়া একটি আবরণের সৃষ্টি করিল। এই আবরণ (crust) এখন একেবারে শীতল হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি দেবী সযত্নে ও সুনিপুণহস্তে ধীরে ধীরে উহাকে সুশ্যামল বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত করিয়াছেন। ধরণীপৃষ্ঠে আজ কত কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদমালায় শোভিত জনাকীর্ণ নগর বিরাজিত। উহার সুকঠিন বক্ষ আজ কোটী কোটী প্রাণীর লীলানিকেতন। 'ধন-ধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এক কালে জলন্ত বাষ্পে অবস্থিত ছিল, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতেও পারিতেছি না!

সৌর-জগতের সম্রাট সূর্য্যও ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিবীর ন্যায় নিষ্প্রভ ও কঠিন হইয়া যাইবে। যে পদার্থ যত বৃহৎ, উহা শীতল হইতে তত অধিক সময়

লাগে। সমান উত্তপ্ত এক বাটি জল এক কলসী জলের অনেক পূর্ব্বে ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এবং এক চামচ জল এক বাটি জলের অনেক আগে শীতল হইয়া থাকে। সৌর জগতের বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহ সকল বহুদিন পূর্ব্বেই শীতল হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র পৃথিবীর ১/৫০ পঞ্চাশ ভাগের একভাগমাত্র; চন্দ্রও পৃথিবীর ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়াছে। উহার আগ্নেয় গিরিগুলিও নিভিয়া গিয়াছে। বৃহস্পতি গ্রহটি আমাদের পৃথিবী হইতে প্রায় ১৩০০ তের শত গুণ বৃহৎ; সুতরাং উহার পৃষ্ঠ আজও অতিশয় উত্তপ্ত রহিয়াছে। বৃহস্পতির তাপক্ষয় হইতে আরও অনেক সময় লাগিবে। পৃথিবীর বাষ্পাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। এখনও পৃথিবীর আবরণের (crust) অভ্যন্তরে তরল পদার্থরাশি উত্তপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এখনও ভূমিকম্পের সময় সেই সকল পদার্থ বহিরাবরণ বিদীর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পদার্থ-রাশিই শীতল হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে।

এখন সূর্য্যের পরিণামের কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সূর্য্যই আমাদের তাপাধার। সূর্য্য হইতে অবিশ্রান্ত তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা পৃথিবীতে যত উত্তাপ পাই, তাহার ২১৭০০০০০০০ দুই শত সতর কোটী গুণ উত্তাপ সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রতি দিন এত তাপ বিতরণ করিয়াও একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতেছেন না কেন? বহুবৎসর যাবৎ তাপক্ষয় চলিতেছে, তবুও আমরা অপেক্ষাকৃত শৈত্য অনুভব করিতেছি না। ইহার এক কারণ এই হইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্প শীতল হইলে সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিকিরণ করে। সূর্য্যের বাষ্পময় গোলক যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া বিস্ফুরণ-জনিত তাপক্ষয়ের সমতা রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্যরূপ বিরাট গোলক এক সময়ে সমগ্র সৌর-জগৎ ব্যাপিয়া ছিল। ক্রমে উহা সঙ্কুচিত হইতেছে। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে পরিমাণ উত্তাপ সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হয়, তাহা পূরণ করিতে সূর্য্যকে বৎসরে ২২০ ফিট নিজ ব্যাস সঙ্কুচিত করিতে হইতেছে। এইরূপে সঙ্কুচিত হইতে হইতে সূর্য্য শেষে একেবারে কঠিন ও শীতল হইয়া যাইবে। তখন এই জলন্ত মার্ত্তণ্ড জ্যোতির্হীন হইয়া গৌরবময় সূর্য্য-পদ হইতে চ্যুত ও গ্রহ-পরিবার-ভুক্ত হইয়া আলোকের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইবে! সূর্য্যদেবের এই

শোচনীয় পরিণাম দেখিবার জন্য আমরা অবশ্যই কেহ জীবিত থাকিব না। কারণ, সেই দিন যদিই আসে, তবে দুই এক লক্ষ বৎসরের মধ্যে কিছুতেই আসিবার আশঙ্কা নাই। তখন এই পৃথিবী হয় ত জনপ্রাণিশূন্য হইয়া যাইবে। নতুবা নিকটস্থ কোনও নীহারিকা ঘনীভূত হইয়া নূতন সূর্য্যে পরিণত হইয়া আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য সৌরপরিবারভুক্ত জ্যোতিষ্কের উপর প্রভা ও আধিপত্য বিস্তার করিবে। এইরূপে বিশ্বপতির বিরাট সাম্রাজ্যে কত জগতের বিলয় ও কত নূতন জগতের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহা কে জানে! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব কিরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিবে?

আমরা নীহারিকা হইতে জগৎ-উৎপত্তির ক্ষীণ আভাস প্রদান করিলাম। এখন তৎসম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শুধু নীহারিকা প্রত্যক্ষ করা ত অসাধ্যই, এমন কি, সাধারণ দূরবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা যে সকল জ্যোতিষ্ককে নীহারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখন উৎকৃষ্টতর দূরবীক্ষণের সাহায্যে কুসুমস্তবকবৎ ঘনবিন্যস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন, আজ আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণে যে সকল জ্যোতিষ্ক নীহারিকা বলিয়া অনুমিত হইতেছে, আরও ভাল দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হইলে, সেগুলিও হয় ত নক্ষত্রপুঞ্জ (Star cluster) বলিয়া সপ্রমাণ হইবে। সার উইলিয়ম হর্শেলও প্রথমে এইরূপই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তার পর তিনি বর্ণবীক্ষণযন্ত্র (Spectroscope) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই উহারা বাষ্পময় জলন্ত পদার্থ, কিছুতেই নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে পারে না। নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে নীহারিকা যে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা সার উইলিয়ম হগিন্স (Sir William Huggins) সর্ব্বপ্রথম প্রমাণিত করেন। সার উইলিয়ম হর্শেল পাঁচ শতেরও অধিক নীহারিকার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সার জন্ হর্শেল আরও ১৭০০ নূতন নীহারিকার আবিষ্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত-তালিকা-ভুক্ত করেন। নীহারিকার আকার ও আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনও নীহারিকা গোলাকার, কোনও নীহারিকা বাদামী ধরণের, কতকগুলি চক্রাকার, অন্যগুলি বিচিত্র কুণ্ডলী পাকান। শেষোক্ত আকৃতির নীহারিকার সংখ্যাই অধিক।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি নীহারিকার আলোক-

চিত্র (photograph) তুলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কালপুরুষ নক্ষত্র-মণ্ডলীর (Constallation of orion) অন্তর্গত নীহারিকাটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বৃহৎ। এ পর্য্যন্ত নানা দেশের মানমন্দির হইতে এই নীহারিকার অনেকগুলি চিত্র তোলা হইয়াছে। এণ্ড্রোমিডা (Andiomeda) নক্ষত্রমণ্ডলীর নীহারিকাটিও খুব বৃহৎ। ইহারও বিভিন্ন সময়ের অনেক আলোকচিত্র আছে। বীণা (Lyra) নক্ষত্রমণ্ডলীর নীহারিকা বৃত্তাকার ; উহার কেন্দ্র-স্থলে আর একটি ক্ষুদ্রতর নীহারিকা অবস্থিত। কেনিস্ ভিনেটেসি (Canis Venataci) নক্ষত্রমণ্ডলীর নীহারিকা কুণ্ডলী পাকান (Spiral)। কর্কট ও ডাম্বেল (Dumbbell nebula in Velpecula) প্রভৃতি বিচিত্র-আকৃতি কয়েকটি নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

কান্‌কাটা ও জুজু

বাঙ্গালার ঘুম-পাড়ান ছড়ায় যেমন বর্গীর উপদ্রবের কথা আছে, সেইরূপ কানকাটার কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্গীর উল্লেখ-বিশিষ্ট ছড়াটিতে ছেলেদের প্রতি ভয়প্রদর্শন বড় একটা নাই। বরঞ্চ বুলবুলী ও বর্গী কর্ত্তৃক ধান্য নষ্ট হওয়ায় উহাতে বৃদ্ধেরই খাজনা দিবার চিন্তা বিশেষরূপ প্রকটিত। ছেলে ত পূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তায় ছড়া-কবি গায়িয়াছেন,—

ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?

শিশুদের কাজ দুই—খাই আর শুই। এমন দুটি কাজও ভয় দেখাইয়া করাইতে হয়! এমন অনেক শিশু আছে, যাহারা ভয়ে সকল কাজ করে। ভয় দেখাইলে ঘুমায়, বা দুধ খাইতে চায়। ভয় না দেখাইলে সহজে কোনও কাজই করিবে না। বাঙ্গালার শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য সর্ব্বজন-বিদিত প্রচলিত ছড়া,—

"কান্‌কাটা বলে, আমি তাল গাছে থাকি।
যে ছেলেটা কাঁদে, তার কান্‌টি ধরে নাচি॥

দিদিমাদের মুখে ছেলেবেলা থেকে এই ছড়াটি শুনিয়া আসিতেছি। ছেলে-

বেলা হইতে কান্‌কাটার এক ভীষণ চিত্র মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সে চিত্র যে কিরূপ ভীষণ, তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে। পুরাণের রাক্ষস রাক্ষসীর বর্ণনা তাহার তুলনায় সামান্য মনে হয়। যেন কোন্ এক তাল-বনে কান্‌কাটা ছেলে ধরিবার জন্য অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে—তাহার জঙ্ঘা তালগাছের সমান, খোন্তার মত দন্তপংক্তি, সুদীর্ঘ কেশরাশি শল্লকী-কণ্টকের ন্যায় মুণ্ডকোপরি সমুত্থিত। ছেলেবেলায় মশারির পার্শ্বে প্রদীপের ছায়া পড়িলে মনে হইত, ইহাই বুঝি কান্‌কাটার জঙ্ঘা। শৈশবের সে কাল এখন যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সেই স্বপ্নযুগের কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন মনে হইল, শিশুদিগকে কান্‌কাটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবার ছড়া বাঙ্গালায় প্রচলিত হইল কেন? অবশ্য ইহার কোনও মূল থাকিবে। যদি বৈদিক আর্য্যদের সময় হইতে কান্‌কাটার কথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য অন্যান্য আর্য্যজাতির ছড়ায় উক্ত কর্ণচ্ছেদকারী জীববিশেষের উল্লেখ থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত; অথবা বৈদিক গ্রন্থাদিতে উহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু যত দূর মনে হয়, তাহা ত দেখি নাই। বুঝিলাম, ইহা বাঙ্গালার কোনও ঐতিহাসিক কাহিনীর সহিত বিজড়িত।

যেমন বাঙ্গালায় এক দিকে এককালে বর্গীর উপদ্রব ছিল, সেইরূপ কান্‌-কাটারও উপদ্রব ছিল। দুই উপদ্রবকারীই দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার শান্তিভঙ্গ করিয়া যাইত। বোম্বাই বিভাগ হইতে যেমন বর্গীরা আসিত, সেইরূপ মান্দ্রাজ বিভাগ হইতে কান্‌কাটারা আসিয়া উপদ্রব করিত। কিন্তু আর কানকাটা প্রভৃতি হইতে শিশুদিগের ভয়ের কোনও কারণ নাই। এইবারে কানকাটা ও জুজু সকলেই ধরা পড়িয়াছে। কান্‌কাটার উৎপত্তি কোথা হইতে, জানা আছে কি? উড়িয়া "কন্ধকাটা" হইতে। "কন্ধকাটা"র পরিণতি বাঙ্গালায় "কাঁধ্‌কাটা" এবং ক্রমে লোকমুখে "কান্‌কাটা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ইতিহাসে উহাদের নাম পড়িয়াছি "খন্দ"। কিন্তু "খন্দ" অঞ্চলের অধিবাসী উড়িয়ারা উহাদিগকে "কন্ধ" বা "কন্ধকাটা" বলে। "কন্ধকাটা"র অর্থ;—যাহারা স্কন্ধদেশ ছেদন করে,—অর্থাৎ যাহারা গলা কাটে। কন্ধেরা নরবলি দিবার উদ্দেশে মনুষ্যের স্কন্ধদেশ ছেদন করে বলিয়াই উহাদের এই নাম। বর্ত্তমান কালে ইংরাজ-শাসনের প্রভাবে এই নরবলি প্রথা একরূপ নিবারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও সুযোগ পাইলে

কন্ধেরা দেবীর উদ্দেশে গভীর অরণ্যপ্রদেশে নরবলি দিতে ছাড়ে না। উহাদের বিশ্বাস যে, ইহাতে ক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি ও শস্য বৃদ্ধি পায়, এবং তাহাদের সন্তান সন্ততির মঙ্গল হয়। বয়স্ক মনুষ্য অপেক্ষা শিশুবলিদান উহাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাই বলির জন্য শিশুসংগ্রহার্থ খন্দেরা চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানে বাহির হয়। শিশুটিকে অনেকদিন লালনপালন করিয়া বলি দিলে অধিকতর ফললাভ হয় বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। Children were kidnapped from the plains. The victim on being brought in the village was welcomed at every threshold, daintily fed and kindly treated, till the fatal day arrived.*

শিশুহত্যায় কন্ধেরা বড়ই অভ্যস্ত। মেজর ম্যাকফারসন আসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে খন্দদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "In addition to these human sacrifices * * * there is a fearful amount of infanticide among the Khond people." খন্দ মহলের গবমেণ্ট নিযুক্ত প্রতিনিধি মিঃ ক্রাই উহাদিগের ভীষণ নরবলির যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে কাহার না শরীর মন শিহরিয়া উঠে? "The victim is surrounded by a crowd of half intoxicated Khonds and dragged around some open place whom the savages with loud shouts rush on the victim cutting the living flesh piecemeal from the bones, till nothing remains but the head and bowels, which are left untouched." "বলির চতুর্দ্দিকে মদোন্মত্ত খন্দেরা ঘিরিয়া দাঁড়ায়, এবং ক্রমে উহাকে এক উন্মুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া সেখানে তাহারা ভীষণ চীৎকারপূর্ব্বক বলির উপরে গিয়া পড়ে, এবং সেই জীবিত মনুষ্যের দেহ হইতে মাংস খণ্ড খণ্ড আকারে ছাড়াইয়া কেবল মাত্র মুণ্ড ও নাড়ীভুঁড়িগুলি ফেলিয়া যায়।"

অতি আদিমকাল হইতে নাগ প্রভৃতি মুণ্ডপ্রিয় জাতিরা ভারতে বিদ্যমান। এই স্কন্ধকাটারা তাহাদেরই অন্যতম শাখা বলিয়াই মনে হয়। কেবল তন্ত্র প্রভৃতি উন্নত আর্য্যধর্ম্মের সংস্পর্শে উহাদের পূর্ব্ব অভ্যাস অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত হইয়া থাকিবে। ইহারই ফলে উহারা দেবতার নামে নরমাংস

---

* Principal Nation of India গ্রন্থ দেখ।

উৎসর্গ করিয়া পরে নিজকার্য্য সাধন করে। বর্ত্তমানকালে উড়িষ্যার কোনও কোনও বিভাগে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম ও বিশাখাপত্তন এই দুই বিভাগে ইহাদিগের বসবাস। এই সকল প্রদেশের পার্ব্বত্য ও জাঙ্গল ভূভাগে ইহারা বাস করে। এক কথায় কলিঙ্গভূমির অধিকাংশ ইহাদিগেরই অধিকৃত। এককালে সমগ্র উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের গঞ্জাম ও বিশাখাপত্তন বিভাগ পর্য্যন্ত কলিঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কন্ধেরা কলিঙ্গভূমির আদিম অধিবাসী হইলেও হইতে পারে। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের কোনও বিচার নাই। শুনিয়াছি, গোমাংস নরমাংস খাইতেও কোনও বাধা নাই। যদি কোনও ক্রমে কাহারও গাভী ইহাদের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ইহারা গাভীর প্রাণবধ করিয়া আহারান্তে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ছড়ায় আছে,—

কান্‌কাটা বলে, আমি তালগাছে থাকি।

ইহার অর্থ কি? ছড়াকবি কান্‌কাটার তালগাছে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন কেন? সত্যসত্যই কি কন্ধকাটারা তালগাছে থাকে? গঞ্জাম ও বিশাখাপত্তনের নিকটবর্ত্তী জয়পুর ও উদয়গিরি প্রভৃতি স্থানের শবর ও কন্ধেরা, যাহারা এখনও বড় একটা সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নাই, তাহারা সত্যসত্যই তালের ঝোপড়ার মধ্যে বাস করে। সে একরূপ তালগাছ বলিলেই হয়। ইহাদের গৃহদ্বার সমস্তই তালনির্ম্মিত। যাহারা বিশাখাপত্তনে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া থাকেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন যে, এই প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর অসভ্যেরা তালগাছে থাকে কি না। তাহাদের ঝোপড়াগুলা দেখিলে মনে হয়, যেন তালগাছেই তাহাদের বাসা। এই কারণেই সম্ভবতঃ ছড়ায় আছে,—

কান্‌কাটা বলে, আমি তালগাছে থাকি।

তার পর অবশিষ্ট ছত্র,—

যে ছেলেটি কাঁদে, তার কান্‌টি ধরে নাচি।

সকলেই মনে করেন যে, ছড়াকবি বুঝি কাঁদুনে ছেলেদের কর্ণমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাহা নয়। এই অংশটির ইহা অর্থ নয় যে, কাঁদিলে 'কান্‌কাটা' তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাচে অর্থাৎ কর্ণমর্দ্দন করিয়া দেয়।

প্রকৃত ছত্রটি এই,—

যে ছেলেটি কাঁদে, তাঁর কাঁধ্‌টি ধরে নাচি।

"কাঁধ্‌কাটা" যেমন কান্‌কাটা হইয়াছে, সেইরূপ 'কাঁধ্‌টি' উচ্চারণ

করিতে গিয়া 'কান্‌টি' উচ্চারিত হইয়া পড়ে। সেই কারণে 'কান্‌টি' ধরে নাচি বলিয়া থাকে। ছড়াটির মর্ম্ম এই যে, ছেলের ক্রন্দন শুনিলে কন্ধকাটারা সন্ধান পাইয়া আসিবে, এবং কোনও উপায়ে তাহারা শিশুটিকে সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহার স্কন্ধদেশ ছেদন করিয়া কাঁধ্‌টি ধরিয়া অর্থাৎ মুণ্ডটি লইয়া নৃত্য করিবে। ভারতের নাগ ও বর্ণিয়োর ডায়ক প্রভৃতি সকল মুণ্ডপ্রিয় জাতিদিগের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কন্ধ বা নরমুণ্ড লইয়া আনন্দে নৃত্য করা উহাদের বড়ই প্রিয়, এইরূপ নৃত্যের নামে বৃদ্ধেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, শিশুদিগের ত দূরের কথা। প্রকৃত কথা এই যে, ছেলেদের যাহা বলিয়া ভয় দেখান হয় তাহা, অবশ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদিগেরও ভয়োৎপাদক; তাহা না হইলে তাঁহারা ছেলেদের সে কথা বলিয়া ভয় দেখাইবেনই বা কেন?

এ পর্য্যন্ত যদিও দেখাইলাম যে, 'কান্‌কাটা' প্রকৃত 'কন্ধকাটা' বা "কাঁধ্‌কাটা" ছাড়া আর কিছুই নহে, তথাপি উহাদের কান্ দুটা একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সচরাচর সমস্ত দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কাণে বড় বড় ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রমধ্যে নানারূপ অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। কন্ধদিগের মধ্যে যাহারা অতিরিক্তমাত্রায় কর্ণে ছিদ্র করে, তাহাদিগকে 'কাণফোড়া কন্ধ' বলে। এককালে বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতা এই 'কাঁধ্‌-কাটা'দের ছেলে ধরার উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়াছিল, তাই এই ছড়া আজও সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সূচিত করিয়া লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ছড়াটি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া এইরূপ অর্থহীন প্রলাপবাক্যের ন্যায় হাস্যজনক হইয়া পড়িয়াছে; নহিলে এই সামান্য ছড়াটিতে কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক জ্ঞান ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে আমার অনুরোধ যে, এখন হইতে শিশুদিগকে যেন বিকৃত আকারে ছড়াটি আবৃত্তি করান না হয়; শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিতে ছড়াটি যেন সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হয়,—

'কাঁধকাটা' বলে, আমি তালগাছে থাকি।
যে ছেলেটা কাঁদে, তার কাঁধ্‌টি ধরে নাচি॥

শ্রীধর্ম্মেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কন্ধ বা কানকাটি

ধূমধারা।

[নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিয়া।]

পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, চলে না চরণ।
অগ্রসরি' চলিয়াছি, ভেঙ্গে পড়ে মন।
কি দেখিতে কোন আশে, আসিনু এ দূর দেশে,
শুধু ক্ষুদ্র বনপথ, তরুলতা, বন;
তারি তরে এত ক্লেশ, এতই পীড়ন।
সহসা সরিয়া গেল বনের আঁধার,
মুক্ত হ'ল পথ যেন সম্মুখে আমার;
সহসা কে কলরোলে সম্মুখে বহিয়া চলে,
কার এই রূপরাশি অসীম অপার?
হেরিয়া ফিরাতে আঁখি পারিনে যে আর!
আপনার রূপভরে আপনি মাতিয়া,
নর্ম্মদা! কোথায় তুমি চলেছ ছুটিয়া?
ভাঙ্গিয়া প্রস্তর-কারা, দূরে ফেলি বিঘ্ন সারা,
কোন সুখে কার আশে অধীর হইয়া,
নর্ম্মদা! এমন ভাবে চলেছ ছুটিয়া?
বিমুগ্ধ নয়ন হেরি' আকুল উচ্ছ্বাস,
কি রূপ—কি লীলা তাহে হতেছে প্রকাশ!
কার প্রেমে আত্মহারা, ছুটিছ পাগল পারা?
কার লাগি' উন্মাদিনী? যাও কার পাশ?
কার লাগি' এত সাজ, এ হেন উচ্ছ্বাস!
রজতের ধারা যেন পড়ে ছড়াইয়া,
বাষ্পসম ধূমধারা উঠিছে পড়িয়া।
লীলাময়ী! লীলারঙ্গে ভাসাইয়া দেহ অঙ্গে,
তোমার রূপেতে মুগ্ধ পাষাণের হিয়া,
তোমাতে মিশিয়া গেছে গলিয়া ঝরিয়া।
হেরি' এ মহান দৃশ্য নয়নে আমার,
জেগে উঠে বিশ্ব-রূপ অসীম অপার।

যাঁর সৃষ্টি এই ধরা, এত স্নেহ-প্রেম-ভরা,
কি কৌশল—কি আশ্চর্য্য লীলারাশি তাঁর!
হৃদয় চরণে তাঁর লুটে বার বার।
অমনি সকলি ভুলি' তাঁহার লাগিয়া,
ছুটে যাক্ আত্মহারা আমার এ হিয়া ;—
ভাঙ্গিয়া এ দেহ-কারা, ভুলি এ জীবন সারা,
আকাঙ্ক্ষা কামনারাশি সব বিসর্জ্জিয়া,
লভি শান্তি প্রীতি প্রাণে তাঁহারে লভিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পর-পারে।

যশস্বী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই "প্রকরণ" শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যখানির আখ্যানবস্তু এই,—এক যে ছিলেন বৃদ্ধ জমীদার, তাঁর নাম ছিল বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বরের ইহসংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল একটি নাতিনী, তার নাম ছিল সরযূ। সরযূ অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-হীনা ; দাদামহাশয় তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন ; সরযূর একটা দিদিমাও ছিল না। সরযূ ছিল বুড়া দাদামহাশয়ের চখের মণি, নাকের নিশ্বাস ও বুকের রক্ত। দাদামহাশয় ভাল বুঝিয়া দেখিয়া শুনিয়া মহিম নামক একটি পাত্রের সহিত সরযূর বিবাহ দিলেন। মহিমের মা ছিলেন স্নেহময়ী দেবী—নাম করুণাময়ী। তিনি বৌ-কাঁটকী শাশুড়ী ছিলেন না, ছেলে ও বৌকে বড়ই ভালবাসিতেন। মহিমের বুকে প্রেম ছিল না,—ছিল কেবল অদম্য যৌবনসুলভ লালসা। সে সেই লালসার চক্ষে সরযূকে দেখিয়া মজিল ; কিন্তু সরযূ দেবী বলিয়া তাহাকে লালসার কূপে ফেলিতে পারিল না ; মা "মহিম মহিম" করিয়া কাঁদিয়া মরিল ; সরযূ মহিমকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট দেখিয়া কত কথা বলিল ; শেষে মহিম লালসা লইয়া দেবীপূজা অসম্ভব দেখিয়া মদ ও বেশ্যা ধরিল। দাদামহাশয় সরযূকে যে টাকা দিতেন, সেই টাকা দিয়া মহিম বেশ্যা পুষিল, এবং বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে সরযূর কোলের শিশু শুকাইয়া মরিল। সরযূ তাহার দুঃখের কথা দাদামহাশয়কে একদিনের জন্যও না জানাইয়া, মাতালের গৃহে লাথি খাঁটা

খাইয়া বড় ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিল। পরে মহিম সরযুকেও গুলি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু মহিমেরই রক্ষিতা শান্তা তাহার প্রাণ বাঁচাইল। বুড়া দাদামহাশয়ের কপালে এক দিকে তাঁহার জীবনের সম্বল, স্নেহের সর্ব্বস্ব পদাঘাতে ও দরিদ্র্যের পীড়নে শুকাইতে লাগিল ; অন্য দিকে মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও দানশীলতার ফলে সংসারের নির্ম্মম রাক্ষসেরা তাঁহার মাটীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ফতুর করিয়া দিল। দাদামহাশয় যখন সকল দিকেই ফতুর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন তাঁহার স্নেহের পুতলীর শেষ ছায়াটুকুও অস্তমিত হইতে বসিল। মহিম শান্তাকে গুলি করিয়া মারিবার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইয়া সরযুর ঘাড়ে দোষ চাপাইল ; এবং সরযুও মিথ্যা করিয়া আপনার ঘাড়ে দোষ টানিয়া লইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় জেলে গিয়া ফাঁসির দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ফতুর দাদামহাশয় সরযুকে রক্ষা করিতে না পারিয়া, যখন নিশ্চিন্তমনে সরযূ মরিয়াছে বলিয়া জানিয়াই গৃহমধ্যে তাহার ধ্যানে উদ্ভ্রান্ত, তখন দৈবমুক্তা সরযূ বাহিরে "দাদামহাশয়, দাদামহাশয়" বলিয়া ডাকিতেছিল ; মরা সরযুর নির্ভুল স্বর যখন দাদামহাশয়ের কাণে গেল, তখন সরযূ স্বর্গ হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে মনে করিয়া তিনি একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন বৃদ্ধ শরীরের অতি ক্ষুদ্র বাধা শিথিল হইয়া আসিল, এবং সে বাধাটুকুও অতি দ্রুত দূর করিবার জন্য বুড়া দাদা-মহাশয় বুকে ছুরীর ঘা মারিলেন। তাহার পর দেখিলেন, সত্যকার সরযূ তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে। এমনই করিয়া দাদামহাশয়ের এ পারের লীলাখেলা শেষ হইয়া গেল।

গল্পের আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনার মধ্যে দুর্ভাগিনী পতিতা রমণী শান্তার কথাই প্রধান। যে রাক্ষস দাদামহাশয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিল, সেই রাক্ষস ও সেই পিশাচই শান্তার জননীর সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে এক দিন গোপনে হত্যা করিয়াছিল। শান্তা জানিত, সে পতিতা রমণী ; তাই সে উদরান্নের জন্য রূপ বেচিতে বসিয়াছিল ; উপায় থাকিলে সে কৃষকের ঘরেও বধূ হইয়া পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিত। মহিমের গুলিতে শান্তার প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই ; তাই শান্তা সরযূকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

. পাঠকেরা দেখিতে পাইতেছেন যে, সম্পূর্ণরূপে কয়েকটি সামাজিক কথা লইয়া কবির এই প্রকরণখানি রচিত ; এবং ইহার প্রাণ বা কেন্দ্র দাদা-

মহাশয় বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাধু পুরুষ, দয়াময় দাতা ও অগাধ-স্নেহময় পিতামহ। মেয়েরা বিবাহিতা হইয়াই সুখী হয়; তাই দাদা মহাশয়ও সরযূকে সুখী করিবার প্রয়াসে যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু সরযূকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল, তিনি যেন আপনার চক্ষু ছুটি উপড়াইয়া ফেলিতেছেন, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন। যে দিন সরযূ আপনার কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া পাপিষ্ঠ নরহন্তা স্বামীর পিছু পিছু ছুটিতে চাহিল, সে দিন কর্ত্তব্যের খাতিরে সরযূকে ত্যাগ করিতে গিয়া বিশ্বেশ্বর যেন একটা জড় যন্ত্রের মত চালিত হইয়া নিজের চক্ষু নিজে উপড়াইতে যাইতেছিলেন। হয় ত এ গভীর ভালবাসার মূলে একটুখানি ভীমরথীধরা ক্ষিপ্ততা ছিল! থাকুক; কিন্তু এই dotage-টুকু বড় মধুর, বড় প্রাণস্পর্শী। সরযূ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিত যে, তাহার দাদামহাশয়ের ভালবাসার গভীরতা কত! তাহার বিদায়ের কথায় বিশ্বেশ্বরকে উদ্ভ্রান্ত দেখিয়া সরযূ কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি চলিয়া গেলে আত্মহত্যা করবেন না কি?" বিশ্বেশ্বর সরযূর আশঙ্কার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন। নিজের প্রাণের নিভৃত স্পন্দনটুকু সরযূ অনুভব করিতেছিল দেখিয়া আনন্দের ভাষায় উত্তর দিয়া বলিলেন, "ঈস্? তোর জন্য আমি আত্মহত্যা করব! ভারি গুমর!" সরযূ বলিল—"তবে কি করবেন?" বিশ্বেশ্বর ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—"সঙ্গিহীন বিড়ালের ছানার মত আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেলা করব।" এই ক্ষুদ্র কথাটুকুর মধ্যে ভাবের যে গভীরতা, তাহা অনুভব করা যায়; বুঝাইয়া বলা চলে না। পারিবারিক স্নেহের এমন সুপরিস্ফুট মধুর চিত্র সাহিত্যে অতি বিরল। বিরহে কিংবা শোকে মানুষ টুক্ করিয়া মরিয়া যায় না; কিন্তু যেখানে ভালবাসার গভীরতা অধিক, সেখানে আঘাত বড় বেশী লাগে। দাদামহাশয়ের মনের অবস্থা ও বয়সের দিকে তাকাইয়া বালিকা সরযূ যাহা বুঝিয়াছিল, আমাদের তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না, যে, সরযূ যদি একটা স্বাভাবিক মৃত্যুতেও মরিয়া যাইত, তাহা হইলে অজ্ঞাতসারে কোনও ব্যাধি আসিয়া দাদামহাশয়ের ক্ষীণ জীবন-প্রদীপ নিভাইয়া দিত।

এ কথা সত্য যে, দাদামহাশয় পরহিতব্রতে অকাতরে অর্থদান করিয়া ফতুর হইয়া গিয়াছিলেন; মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস হেতু তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে পরের সেবায় বিলাইয়া দিতে পারিতেন। যে কোনও মানুষের

দুঃখে তাঁহার অসীম সহানুভূতি থাকিলেও, তাঁহার সমগ্র প্রাণ সরযূময় ছিল। জুয়াচোরেরা তাঁহার দয়ার অবারিত দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে ঠকাইয়া যখন তাঁহার সর্ব্বনাশ করিত, তখনও কেহ তাঁহাকে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী করিতে পারে নাই। পরেশ বলিলেন,—"মানুষকে অত বিশ্বাস করিবেন না, তাওয়াই মহাশয়!" বিশ্বেশ্বর তাহার উত্তরে বলিলেন - "সে কি! মানুষকে বিশ্বাস করব না! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার, যে রূপে আমরা দেবদেবীর কল্পনা করি, তাকে বিশ্বাস করব না! জগতের প্রভু, সমাজের নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের গুরু, ত্যাগের শিষ্য, স্নেহের দাস—মানুষকে বিশ্বাস করব না! বল কি পরেশ! তবে কি পশুকে বিশ্বাস করব!"

কিন্তু হায়! মানুষ তাঁহাকে বড় দাগা দিয়াছে। যে দিন তাঁহার নিরপরাধা অভাগিনী পতিপরিত্যক্তা সরযূ পাষণ্ড নরহন্তা স্বামীকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা কহিয়া, আপনার ঘাড়ে দোষের বোঝা টানিয়া আনিয়া, প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছিল, সে দিন কোনও মানুষ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করে নাই; বরং তাঁহার প্রয়োজনের আধিক্য দেখিয়া টাকা দিবার ছল করিয়া তাঁহার সম্পত্তির যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্টও অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে রাক্ষসেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল! যিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তিনি তাঁহার দুঃখের দিনে মুষ্টিভিক্ষাও পাইলেন না; বরং যাহারা তাঁহার দান পাইয়া মানুষ, তাহারা তাঁহাকে সে দিন পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল! তাঁহার প্রাণের পুত্তলী সরযূ তাঁহার প্রদত্ত টাকা পাপিষ্ঠ স্বামীকে দিয়া স্বামীর উৎপীড়নে অন্ধকার কুটীরে যক্ষ্মারোগীর মত তিলে তিলে শুকাইয়া যাইতেছিল; যাঁহার টাকায় শত পাপিষ্ঠ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পৌত্রীর পুত্র দারিদ্র্যের কশাঘাতে অন্ধকার কুটীরে শুকাইয়া মরিল।

বিধাতা ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ মানুষের কপালের জন্যও ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এতখানি দুঃখ সহ্য করিয়াও তিনি বাঁচিয়া ছিলেন! যখন সরযূকে বাঁচাইতে পারিলেন না, এবং যখন নিশ্চিত জানিলেন যে, সরযূ ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরিয়াছে, তখনও এই পিশাচপাদপিষ্ট দেবতা মরেন নাই! বৃদ্ধ বয়সের পাঁজরার হাড় ক'খানা যখন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, যখন তাঁহার সম্মুখে মহাজ্বালাময় ধ্বংস পৃথিবীতে প্রলয় আনিতেছিল, যখন শোকের

তীব্র আঘাতে স্মৃতি ও কল্পনা একত্র মিশিয়া গিয়া তাঁহার উদ্ভ্রান্ত মস্তকে কেবল সরযুর লম্বমান মৃতদেহখানি দোলাইতেছিল, তখনও বিশ্বেশ্বর আত্মহত্যা মহাপাপ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন যে, সকল দুঃখই সহিয়া তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। স্নেহের সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া যখন দেহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখনও বিশ্বেশ্বর কম্পিতহস্তে ভাঙ্গা বাঁধ চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। যত ক্ষণ জ্ঞান ছিল, তত ক্ষণ তিনি আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন সরযূ সত্যসত্যই বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছিল, তখন তাঁহার মস্তিষ্ক একেবারে মুষড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এ অবস্থা প্রাকৃতিক কি না, এ কথা পাঠকেরা যে কোনও বড় বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বিশ্বেশ্বরের জ্ঞানে সরযুর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব ছিল; তাহাকে ত নিজেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইয়াছে! সে যে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছে, সে কথা ভাবিবার তাঁহার কোন প্রকার অধিকার ছিল না; এ কথা স্বপ্নেও উদিত হইতে পারিত না। যখন সরযুর সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ আহ্বান তাঁহার কানে আসিল, তখন এ কথা ভাবা ছাড়া তাঁহার গতি ছিল না যে, সরযূ স্বর্গপথে তাঁহাকে পরপারে যাইবার জন্য ডাকিতেছিল। পরপারের পথে যাইবার জন্য উৎসুক বৃদ্ধের কাছে তাঁহার অতি জর্জ্জর শরীরখানি একটু ক্ষুদ্র বাধা ছিল। সেই অতি ক্ষুদ্র বাধাটুকু দূর করিবার জন্য যখন তিনি ভূমীর একটি পা দিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার ইহকাল-পরকালের স্বপ্ন সরযূ সত্য হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিল।

এ বর্ণনায়, এ চরিত্রচিত্রে সুদক্ষ কথাকার চারুচন্দ্র যাহা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ inevitable তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। স্থূলদর্শী পাঠকেরা বলিতে পারেন যে, দাদামহাশয়ের মত ধর্ম্মপরায়ণ, স্নেহশীল ও দয়াময় ব্যক্তি যদি পরিণামে আত্মহত্যা না করিতেন, এবং সকল দুঃখদারিদ্র্য মাথায় বহিয়া দ্বারে দ্বারে লোকহিতচেষ্টায় ফিরিতেন, তবে অল্প আয়াসেই একটা অতি বড় আদর্শ চরিত্র সৃষ্ট হইতে পারিত। দৈনিক লিপি-বহির নৈতিক প্রবচন মুখস্থ করিয়া বালকেরা যে আদর্শের কথা ভাবিতে পারে, কবি যে কেন তাহা চিত্রিত করেন নাই, তাহা বুঝিয়া দেখিবার জিনিস। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর "কৃষ্ণকান্তের উইল" মাসে মাসে "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইবার সময়, এক মাসের পত্রিকায় রোহিণীর মৃত্যুকথা পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল, তখন অনেক পাঠক বঙ্কিম বাবুকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--

"আপনি রোহিণীকে মারিলেন কেন?" বঙ্কিম বাবু পরের বারের "বঙ্গদর্শনে" একটুখানি রূঢ় ভাষায় উত্তর দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যাঁহারা কাব্যকৌশলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র গল্পের খাতিরে গল্প পড়েন, তাঁহারা যেন তাঁহার উপন্যাস বা কথা-গ্রন্থ পাঠ না করেন। গল্পের মূল হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে, ঘটনাগুলি প্রাকৃতিক ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, তাহার সংযোগে যে ফল অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহাই গ্রন্থকারকে চিত্রিত করিতে হয়। মানবচরিত্র-তত্ত্বে যাঁহাদের গভীর দৃষ্টি নাই, তাঁহারা ঘটনার অবশ্যম্ভাবী inevitable ফল কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; তাঁহাদের গল্প লিখিবার যোগ্যতা নাই, পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতাও নাই। অনেক দুঃখ কষ্টের চিত্র আঁকিয়া তাহার মাঝে এক জন পুরুষ বা রমণীর মুখে অনেক বড় বড় নৈতিক কথা আরোপ করা যাইতে পারে, এবং তাঁহাকে সকল বিপদে অটল অচল বলিয়া খাড়া করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক-কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বুঝিয়া গল্পের ঘটনা-গুলিকে বিকশিত করিয়া তোলা অতি কঠিন কার্য্য। সেক্সপীয়ার অনায়াসেই লিখিতে পারিতেন যে, ম্যাকবেথ রাজার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে আপনাকে তিরস্কার করিলেন, এবং পতি-পত্নী উভয়ে মিলিয়া পাপচিন্তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনেক আত্মত্যাগের কার্য্য করিলেন, অথবা লীয়ার সন্তান-দ্বয়ের কৃতঘ্নতা দেখিয়া, তাহাদের ও অন্যের মঙ্গলকামনায় ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রধান নাটকগুলি যাহাদের নামে নামাঙ্কিত, তাহারা কেহই আদর্শচরিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত নহে। নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইলে এক দিকে যেমন ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা বুঝিয়া লইতে হয়, তেমনই আবার অন্য দিকে দেখিতে হয় যে, যে সকল ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সে সকল স্বাভাবিক ঘটনা কি না, এবং স্বাভাবিকভাবে তাহা নাটকে ফুটিয়া উঠিয়া, যে ফল অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক, তাহারই উৎপাদন করিয়াছে কি না! যদি কেহ এ চিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আশা করি, পাঠকেরা এই আখ্যানের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।

দাদামহাশয়ের ক্লেশের ও যন্ত্রণার আতিশয্য দেখিয়া দয়াল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—"হা রে হতভাগা! এত ভালবাসা নিয়ে সংসারে এসেছিলে কেন?" আমরাও দাদামহাশয়ের দুঃখ দেখিয়া ঐ কথাই ভাবি। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরূপ আদর্শ খোঁজেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে,

কবি যখন বিশ্বেশ্বরকে অনেক পরহিতৈষণা দিয়া ভূষিত করিয়াছেন, তখন "আমি কার, কে আমার" ভাবটুকু দিলেই গোল চুকিয়া যাইত। তাহা হইলে বিশ্বেশ্বর কাহারও জন্যেই কাঁদিতেন না। এ পৃথিবীর এ কালের সকল দেশের ধর্ম্মগুলিই যে দিন প্রেমের নবমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিবে, সেদিন অস্বাভাবিক মতবাদের আবর্জ্জনা দূরে ফেলিয়া দিয়া, লোকে স্বাভাবিকভাবে বুঝিতে পারিবে যে, হরির নাম জপ করিয়া মরা অপেক্ষা স্নেহের স্মৃতিতে মাথা পাতিয়া দিয়া মরা কত শ্রেষ্ঠতর। "হরি, হরি" বলিয়া চীৎকার করিয়া ভগবদ্দত্ত সংসারের স্মৃতিকে কৃত্রিমভাবে ডুবাইয়া ফেলা অপেক্ষা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংসারের সুমধুর সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, পরের জন্য ভাবিতে ভাবিতে মরিয়া যাওয়া অতি উচ্চতর ধর্ম্ম।

পুত্রের আশাপথ চাহিতে চাহিতে যখন অভাগিনী করুণাময়ীর স্নেহার্দ্র চক্ষু চিরদিনের মত মুদ্রিত হইতে যাইতেছিল, তখন অভ্যাসগত দুর্গানাম অপেক্ষা তাঁহার মনে স্বাভাবিকভাবে অন্য কথা উপস্থিত হইতেছিল। করুণাময়ী তাঁহার সদ্যঃপ্রসূতা গাভী ও গাভীর বাছুরটি দেখিয়া এবং পুত্র মহিমের কথা ভাবিয়া মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও সুখলাভ করিয়াছিলেন। কবির আদর্শ এই ক্ষুদ্র সমালোচকের নিকট বড় মধুর। আমরা অনেক স্থলে ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির নামে স্নেহ প্রেম বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনেক সময়েই প্রেমের ধার বড় ধারেন না। যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাসের জোরে শোকও ভুলিতে পারেন এবং মিলনে আশ্বস্ত হয়েন, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথপ্রতীক্ষা করেন ; জড়তা ও পশুত্ব লইয়া "কেহ কাহারও নয়" বলেন না। এক জন কাশীবাসী বাঙ্গালী পুত্রের মৃত্যুর পর হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতে গাহিতে শ্মশানঘাটে যাইতেছেন দেখিয়া যখন বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তখন আর এক জন কাশীবাসী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কাশীতে মরিলে "শিব" হয় বলিয়া এখানে সকলকেই আনন্দপ্রকাশ করিতে হয়। "যে মরিয়া যায়, সে ত 'শিব' হয় বুঝিলাম ; কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা 'পশু হয় কেন,"—আমার এ কথার কোনও উত্তর তিনি দেন নাই।

বিশ্বেশ্বরের পরে এই প্রকরণখানিতে বুঝাইয়া বলিবার মত চরিত্র আর দুইটি আছে। দুইটিই স্ত্রীচরিত্র ; একটি সরযূ ও অপরটি শান্তা। সরযূ ধনীর নাতিনী, স্নেহময় দাদামহাশয়ের হৃদয়ের পুত্তলী, এবং কর্ত্তব্যপালনে কঠোর

ব্রতধারিণী। পতিতা শান্তা ইঁহাকে ধূসরবসনে, রুক্ষকেশে ভূমিশয্যায় দেখিয়া বলিয়াছিল—"এই স্ত্রী! এই সতী! মুখে কি জ্যোতিঃ! ললাটে কি মহিমা! অঙ্গে কি লাবণ্য! শৈলমূলে প্রভাতমণ্ডিত হ্রদের মত শান্ত, স্বচ্ছ, সুন্দর। এই সতী! ঐ ভূমিশয্যা মনে হচ্ছে স্বর্ণসিংহাসন, ঐ মাথার কাপড়খানি জলছে যেন হীরার মুকুট—এই সতী!" শান্তা হতভাগিনী,সে রূপ বেচিয়া খাইত। কবি তাহাকে উজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত করিয়া গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ নাটকে 'শান্তা'র চরিত্র একটু অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেশ্যা এরূপ হয় কি না, তাহা আমি জানি না। বেশ্যার স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়াছি। যদি সে কথা মিথ্যা হয়, হোক। কিন্তু সমাজে একটা প্রকাণ্ড শ্রেণীর এক জন অভাগিনীও তাহার দারুণ অবস্থা ঠেলিয়া দেবীর পদে উঠিতে পারে, সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক, এ কথা ভাবিতেও আমার আনন্দ হয়। এ চিত্র যদি কাল্পনিক হয়, হৌক; কাল্পনিক বীভৎসতা অঙ্কিত করায় লাভ নাই; কিন্তু কাল্পনিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করায় সমূহ উপকার আছে। এরূপ চিত্রই জগতের সমস্ত 'আর্ট গ্যালারি'তে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এরূপ চিত্রাঙ্কণে জগতের সৌন্দর্য্যরাজ্য সমৃদ্ধ হয়, জগতে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়; মানুষের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি প্রসারিত হয়।"

সরযুর জীবনকাহিনী বিশ্বেশ্বরের কথার সঙ্গে অনেক বলিতে হইয়াছে। পাঠকেরা সরযুর চরিত্র অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন; কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। সরযু সুন্দরী, সদ্‌গুণসম্পন্না ও কর্ত্তব্যপরায়ণা; এবং তাহার স্বামী মহিমও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া স্নেহময়ী মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এরূপ স্থলে যে প্রাকৃতিক নিয়মে মহিমের অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। সরযু দাদামহাশয়ের খাঁটী ভালবাসায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া কোনও নকল ভালবাসা তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। সরযু বিবাহের পরেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে বিবাহে সুখী হইবে না। মহিমও সরযুকে বিবাহ করিবার পর মায়ের কাছে তাহার আতঙ্কের কথা বলিয়াছিল। সে কালের গল্পে ও নাটকে ভবিষ্যৎ অশুভ ঘটনার আভাস দিবার জন্য এক একটা আকস্মিক দুর্নিমিত্তের কথা উল্লিখিত হইত; কেবলমাত্র ফলিত-জ্যোতিষের সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য-কারণের সঙ্গে কোনও

প্রাকৃতিক নিয়মে সে দুর্নিমিত্তকে যোজনা করা চলে না। এ কালের "কুন্দনন্দিনী"র স্বপ্নও সেকালের ছায়ায় গড়া; কিন্তু মহিম ও সরযূ অনুভূতিতে প্রাকৃতিক ভাবেই রহিয়াছে। যাহা প্রকৃত প্রেম, তাহার বিকাশে হৃদয় মন সরসতা লাভ করে, বসন্তের পুষ্পবিকাশের মত সমগ্র জীবন-কানন ভরিয়া ভাবের নব কুসুম ফুটিয়া উঠে। লালসার স্পর্শে যে উন্মত্ততা ও অশান্তি হৃদয়কে অধিকার করে, প্রেমসঞ্চারে কদাপি তাহার অনুভূতি জন্মে না। মহিম মনে মনে যে শয়তানের টান অনুভব করিতেছিল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, সে ন্যায় ও কর্ত্তব্য হইতে বহু দূরে চলিয়া যাইতেছে। সরযূ লালসার শিক্ষাশালায় বর্দ্ধিত হয় নাই; তাই মহিমের দৃষ্টি ও স্পর্শ তাহাকে মাতাইতে পারে নাই। সরযূ প্রতিপদে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তাহার স্বামী প্রেম হইতে বহু দূরে, কর্ত্তব্য হইতে বহু দূরে। মহিম যখন স্নেহময়ী জননীর অন্তিম শয্যা পায়ের তলায় ঢাকিয়া, লালসার উৎসবের জন্য চন্দ্রালোকে কুসুমের আস্তরণ পাতিতেছিল, সরযূ তখন তাহাকে কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিতে ভুলে নাই; লালসাভরা প্রশ্নের উত্তরে সে এ কথা ব'লতেও কুণ্ঠিত হয় নাই যে, সে দাদামহাশয়ের মত এ সংসারে কাহাকেও ভালবাসে না। লালসা লালসাতেই বর্দ্ধিত হয়; পবিত্রতার পুণ্যস্পর্শে তাহার ধ্বংস ও নির্ব্বাণ। কাজেই সরযূর মনোহর রূপ মহিমকে বাঁধিতে পারিল না। পুণ্যাত্মা দাদামহাশয় কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে, সরযূর দেবীমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া মহিম কেমন করিয়া একটা শয়তানীর পদতলে আত্মবিসর্জ্জন করিল। যেখানে লালসার নির্লজ্জ অভিনয়, সেখানকার ক্রীত চুম্বন যে পাপিষ্ঠের অধিক তৃপ্তিদায়ক, এ কথা বুঝিবার ক্ষমতা দাদামহাশয়ের ছিল না।

মহিম যখন তাহার বেশ্যার জন্য সরযূর নিকটে টাকা না পাইয়া তাহাকে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিল, তখন দুঃখপীড়িতা সরযূ যাহা বলিয়াছিল, তাহা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। মহিম বলিয়াছিল যে, সরযূর যদি না পোষায়, তাহা হইলে সে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে পারে। সরযূ যদি পতিত হিন্দুসমাজের আদর্শ রমণী হইত, তবে হয় সে সত্যই বাপের বাড়ী যাইত, নয় ত গলায় দড়ি দিয়া মরিত। কিন্তু দাদামহাশয়ের ঘরে শিক্ষিতা সরযূ একটুখানি ভিন্ন ছাঁচে গড়া। সে বলিল যে, সে দুইটি ভাতের কাঙ্গাল হইয়া মহিমের ঘরে থাকিয়া দাসীবৃত্তি বা গণিকাবৃত্তি করিতে আসে নাই; সে

যে গৃহে ছিল, সে গৃহ তাহার ; সে গৃহের সে কর্ত্রী ; সে ঘর ভাঙ্গা হউক, পোড়া হউক, তাহা মহিমেরও যেমন, তাহারও তেমন, নিজের সংসার ভাঙ্গা বলিয়া তাহা সে ছাড়িয়া যাইতে চাহে নাই। সেখানে সে সতীর ধর্ম্ম পালন করিতেছিল, স্ত্রীলোক অনেক তিরস্কার সহ্য করিতে পারে, অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে পারে ; কিন্তু সে যদি যথার্থ সতী হয়, তবে দেবতারও সাধ্য নাই যে, তাহার সতীত্বের বিরুদ্ধে কথা কহেন। মহিম যখন সরযূর সতীত্বের কথায় উপহাস করিয়াছিল, তখন সরযূ দম্ভের সহিত বুক ফুলাইয়া বলিয়াছিল, আমি সতী কি অসতী, সে কথা এক জন মাতালের মুখে, এক জন বেশ্যাসক্তের মুখে শুনিতে চাই না। এ উক্তি যাঁহাদের কাণে কঠোর বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা আদর্শ ধার্ম্মিক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সাধুতা ও পবিত্রতার তত্ত্বের সহিত অপরিচিত।

বাঙ্গলা ভাষার দৃশ্যকাব্য-সাহিত্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সুরচিত "রূপক" ও "উপরূপক" গ্রন্থগুলি আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের বিশেষ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। কবির এই নবরচিত 'প্রকরণ' শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যখানি এ কালের সমাজের উপাদান লইয়া রচিত বলিয়া কবি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"পরপারে আমার প্রথম সামাজিক নাটক।" যাঁহারা কবির সকল রচনার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা হয় ত কবির নিজের এই উক্তিটি সম্পূর্ণ স্বীকার করিবেন না। বড় কবিদের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, তাঁহারা মুখ্যতঃ একটি প্রধান ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। আমাদের সামাজিক দুর্গতি দেখিয়া কবি দুঃখিত ; এবং যাহাতে এই পতিত জাতি সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে, কবির লেখনীতে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য ও প্রেরণা পদে পদে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। অতি ক্ষুদ্র "একঘরে", গ্রন্থে তিনি সামাজিক কপটতার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছেন ; অধিকাংশ হাসির গানে সামাজিক দুর্নীতি ও ভণ্ডামি তীব্র ভাবে উপহসিত হইয়াছে ; অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপরূপকে বিলাতী বাঁদর হইতে গোঁড়া ভণ্ড পর্য্যন্ত বহু শ্রেণীর লোকের চিত্র জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ইতিহাসের খ্যাতবৃত্ত অবলম্বন করিয়া কবি যে কয়েকখানি অতুল্য নাটক লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই যে, সামাজিক দুর্দ্দশার প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। তিনি সুবিধা পাইলেই সামাজিক অবস্থার কথা অতি

হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের এ দুর্দশা যে স্বদেশ-হিতৈষণার নামে খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার অভিনয়ে দূর হইবে না, সে কথা "বেবার-পতনে" মানসী সত্যবতীকে যে ভাষায় বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা যায় না। দেশের পতন যে একটা তুচ্ছ যুদ্ধের ফলে আরম্ভ হয় নাই, সেই কথা বলিয়া মানসী বলিতেছেন যে, যেদিন থেকে এ দেশের সমাজ নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে,—যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে, সেদিন থেকে তাহার পতনের আরম্ভ। কবি অশ্রান্তভাবে এ কথা আমাদিগকে শুনাইতে ছাড়েন না যে, আমাদের সমাজ এখন একখানি প্রাণহীন আচারের কঙ্কালমাত্র; আমরা এখন নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা ও বিজাতিবিদ্বেষ লইয়া পচিয়া মরিতেছি। কাজেই বলিতে পারি যে, সামাজিক কথা লইয়া রূপক-রচনা কবির পক্ষে এই প্রথম নয়। তাঁহার প্রাকৃতিক ধর্ম্মে তিনি চিরদিনই সমাজের কথাই লিখিয়া আসিতেছেন। কবি যে এত দিন পরে নূতন করিয়া আমাদের সামাজিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া এই প্রকরণখানি লিখিয়াছেন, এ কথা যেন পাঠকেরা মনে না করেন। কবির সজাগ দৃষ্টি যে চিরদিনই আমাদের সমাজের অবস্থার উপর পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি যে বহুদিন হইতে সযত্নে আমাদের সামাজিক সকল অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহার সকল রচনা হইতেই বুঝা যায়।

স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনাময় সঙ্গীতে, সমাজ-বিভ্রাটের তীব্র পরিহাসের গানে, নব্য হিন্দু ও গৌড়াদিগের উপহাসাস্পদ আচরণের সরস বিবৃতিতে, চম্পটীর দলের চারু চিত্রে, তিনি সমাজের সকল বিভাগের কথা চিত্রিত করিয়া সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক বয়সের রচনায় সামাজিক ছবি কি ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আভাস দিলাম। আশা করি, পাঠকেরা কেবলমাত্র সামাজিক কথার বিবৃতির জন্য পাঁচটি অঙ্কে ১৮১ পৃষ্ঠায় রচিত এই প্রকরণখানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্যে চাবুক।

১

সেদিন ষ্টার থিয়েটারে "আনন্দ-বিদায়ে"র অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লোককে দর্শকমণ্ডলী লাঞ্ছিত করেছেন; এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই আনন্দ-বিদায়ের রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখেছেন যে, তিনি সকল রকম "মি"র বিপক্ষে। ন্যাকামি জ্যাঠামি, ভণ্ডামি, বোকামি প্রভৃতি যে সকল "মি"-ভাগান্ত পদার্থের তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির যে কোনও ভদ্রলোকই পক্ষপাতী, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়; অন্ততঃ পক্ষপাতী হলেও, সে কথা কেউ মুখে স্বীকার করবেন না। কিন্তু সমাজে থাক্‌তে হলেই পাঁচটি "মি" নিয়েই আমাদের ঘর করতে হয়, এবং সেই কারণেই সুপরিচিত "মি"গুলি সাহিত্যে না হোক্, জীবনে আমাদের সকলেরই অনেকটা সওয়া আছে। কিন্তু যা আছে, তার উপর যদি একটা নতুন "মি" এসে আমাদের ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে সেটা নিতান্ত ভয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। আমরা এতদিন নিরীহ প্রকৃতির লোক বলেই পরিচিত ছিলুম। কিছুদিন থেকে ষণ্ডামি নামে একটা নতুন "মি" আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করেছে। এতদিন রাজনীতির রঙ্গভূমিতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। সুরাট কংগ্রেসে সেই "মি"র তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সুরাটে যে যবনিকা-পতন হয়েছে, তা আর সহসা উঠবে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনীতিতে প্রশ্রয় পেয়ে ষণ্ডামি ক্রমশঃ সমাজের অপর সকল দেশও অধিকার করে নিয়েছে। ষণ্ডামি জিনিসটের আর যে ক্ষেত্রেই সার্থকতা থাক্, সাহিত্যে নেই, কেন না সাহিত্যে বাহুবলের কোন স্থান নেই।—ষ্টার থিয়েটারের Box হতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে গায়ের জোরে নামান সহজ, কিন্তু তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ আসন লাভ করেছেন, বাহুবলে তাঁকে সেখান থেকে নামান অসম্ভব। লেখকমাত্রই নিন্দা-প্রশংসার সম্বন্ধে পরাধীন। সমালোচকদের চোখরাঙানি সহ্য করতে লেখকমাত্রেরই প্রস্তুত হওয়া

আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্য-জগতের ঢিলটে মারলে যে জড়জগতের পাটকেলটা আমাদের খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ও রকম একটা নিয়ম প্রচলিত হলে' সাহিত্যরাজ্যে আমাদের বাস করা চলবে না। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বুদ্ধির জোর গায়ের জোরের কাছে বরাবরই হার মানে। এই কারণেই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং লজ্জিত।

২

কিন্তু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে এ যুগের সাহিত্যে আবার "কবির লড়াই" ফিরে আনবার প্রয়াস পেয়েছেন, তার জন্য আমি আরও বেশী দুঃখিত। ও কাজ একবার আরম্ভ করলে শেষটা খেউড় ধরতেই হবে। দ্বিজেন্দ্র বাবু বোধ হয় এ কথা অস্বীকার করবেন্ না যে, সেটি নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

এ পৃথিবীতে মানুষে আসলে খালি দুটি কার্য্যই করতে জানে; সে হচ্ছে হাসি আর কান্না। আমরা সকলেই নিজে হাস্‌তেও জানি, কাঁদতেও জানি, কিন্তু সকলেরই কিছু আর অপরকে হাসাবার কিংবা কাঁদাবার শক্তি নেই। অবশ্য অপরকে চপেটাঘাত করে কাঁদানো কিংবা কাতুকুতু দিয়ে হাসানো, আমাদের সবারই আয়ত্ত, কিন্তু সরস্বতীর বীণার সাহায্যে কেবল দুটি চারটি লোকই ঐ কার্য্য করতে পারেন। যাঁদের সে ভগবৎদত্ত ক্ষমতা আছে, তাঁদেরি আমরা কবি বলে মেনে নেই। বাদবাকী সব বাজে লেখক। কাব্যে, আমার মতে, শুধু তিনটিমাত্র রস আছে; করুণ রস, হাস্য রস, আর হাসিকান্না-মিশ্রিত মধুর রস। যে লেখায় এর একটি না একটি রস আছে, তাই কাব্য; বাদবাকী সব নীরস লেখা,—দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি যা খুসী তা হতে পারে, কিন্তু কাব্য নয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অদ্বিতীয়। তাঁর গানে হাস্যরস, ভাবে কথায় সুরে তালে লয়ে পঞ্চীকৃত হয়ে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে। হাসির গান তাঁর সঙ্গে জুড়ীতে গাইতে পারে, বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে এমন গুণী আর একটিও নেই। কান্নার মত হাসিরও নানাপ্রকার বিভিন্ন রূপ আছে, এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর মুখে হাসি নানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে যে কেবল আমাদের মিষ্টি হাসিই হাস্‌তে হবে, এ কথা আমি মানি নে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্র বাবু যে বলেছেন যে কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান

আছে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটের প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ্ দিলে শুধু তার উপ্‌টুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না। হাস্‌তে হলেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে, তা নয়, দাঁতখিঁচুনী বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে। সে ক্রিয়াটি যে ঠিক হাসি নয়, বরং তার উল্‌টো, জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং উপহাস জিনিসটে সাহিত্যে চল্‌লেও, কেবলমাত্র তার মুখভঙ্গীটি সাহিত্যে চলে না। কোনও জিনিস দেখে যদি আমাদের হাসি পায়, তা হলেই আমরা অপরকে হাসাতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র যদি রাগই হয়, তা হলে সেই মনোভাব হাসির ছদ্মবেশ পরিয়ে প্রকাশ করলে, দর্শকমণ্ডলীকে শুধু রাগাতেই পারি। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই কথাটি মনে রাখলে লোককে হাসাতে গিয়ে রাগাতেন না।

৩

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেছেন যে, নাটকাকারে parody কোন ভাষাতেই নেই। যা কোন দেশে কোন ভাষাতেই ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নি, তাই সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি একটি অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বামিত্রের তপোবল আমাদের কারও নেই ; সুতরাং বিশ্বামিত্রও যখন নূতন সৃষ্টি করতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন, তখন আমরা যে হব, এত নিশ্চিত।

মানুষে মুখ ভেংচালে দর্শকমাত্রেই হেসে থাকে। কেন যে সে কাজ করে, তার বিচার অনাবশ্যক ; কিন্তু ঘটনা হচ্চে যে, ওরূপ মুখভঙ্গী দেখলে মানুষের হাসি পায়। parody হচ্চে সাহিত্যে মুখ ভেংচান। parody নিয়ে যে নাটক হয় না, তার কারণ দু ঘণ্টা ধরে লোকে একটানা মুখ ভেংচে যেতে পারে না ; আর যদিও কেউ পারে ত দর্শকের পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দেয় বলেই, এবং তার কোন মানে মোদ্দা নেই বলেই মানুষের মুখ-ভেংচানি দেখে হাসি পায়। সুতরাং ভেংচানির মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি ভীষণ জিনিস সব পুরে দিতে গেলে ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে রুচিকর হয় না। ঐরূপ করাতে ভেংচানির শুধু ধর্ম্ম নষ্টই হয়। শিক্ষাপ্রদ ভেংচানির সৃষ্টি করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবু রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি।—যদি parodyর মধ্যে কোনরূপ দর্শন থাকে ত সে দন্তের দর্শন।

৪

দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁর "আনন্দ-বিদায়ে"র ভূমিকায় প্রকারান্তরে স্বীকারই করেছেন যে, লোক হাসানো নয়, লোকশিক্ষা দেওয়াই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। প্রহসন শুধু অছিলা মাত্র। বেত হাতে গুরুমশাইগিরি করা এ যুগের সাহিত্যে কোন লোকের পক্ষেই শোভা পায় না। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—এ কথা শুধু অবতীর্ণ ভগবানের মুখেই সাজে, সামান্য মানবের মুখে সাজে না। লেখকেরা যদি নিজেদের এক একটি ক্ষুদ্র অবতারস্বরূপ মনে করেন, কিংবা যদি তাঁরা সকলে কেষ্ট বিষ্টু হয়ে ওঠেন, তা হলে পৃথিবীর সাধুদেরও পরিত্রাণ হবে না, এবং দুষ্টদেরও শাসন হবে না; লাভের মধ্যে লেখকেরা পরস্পর শুধু কলমের খোঁচা-খুঁচি করবেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ইচ্ছাও যে তাই হয়। এবং তিনি ঐরূপ খোঁচা-খুঁচি হওয়াটা যে উচিত, তাই প্রমাণ করবার জন্যে বিলাতী নজীর দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে, Wordsworthকে Browning চাবকেছিলেন, এবং Wordsworth, Byron এবং Shelleyকে চাবকেছিলেন। বিলাতের কবিরা যে অহরহ পরস্পরকে চাবকা-চাবকি করে থাকেন, এ জ্ঞান আমার ছিল না।

Browning Wordsworth সম্বন্ধে Lost Leader নামে যে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন, সেটিকে কোন হিসাবেই চাবুক বলা যায় না। কবি সমাজের সর্ব্বমান্য এবং পূজ্য দলপতি, দলত্যাগ করে' অপর দলভুক্ত হওয়াতে কবি-সমাজ যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, ঐ কবিতাতে Browning সেই দুঃখই প্রকাশ করেছিলেন। Wordsworth যে Byron এবং Shelley কে চাবকেছিলেন, এ কথা আমি জানতুম না। Byron অবশ্য তাঁর সমসাময়িক কবি এবং সমালোচকদের প্রতি দু হাতে ঘুঁষো চালিয়েছিলেন, কিন্তু সে আত্মরক্ষার্থ। অহিংসা পরমধর্ম্ম হলেও আততায়ি-বধে পাপ নেই। দ্বিজেন্দ্র বাবু যে নজীর দেখিয়েছেন, সেই নজীরের বলেই প্রমাণ করা যায় যে, চাবুক পদার্থটার বিলাতী কবি-সমাজে চলন থাকলেও, তার ব্যবহারে যে সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তা নয়। Wordsworth, Shelly, Byron প্রভৃতি কোন কবিই কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর তাড়নার ভয়ে নিজের পথ ছাড়েননি, কিংবা সাহিত্য-রাজ্যে পাশ কাটিয়ে যাবারও চেষ্টা করেন নি। কবিমাত্রেরই মত যে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ।"

অ্যাপোলো বেল্‌বিডীর।

চাবুকের ভয় কেবলমাত্র তারাই করে, যাদের "স্বধর্ম্ম" বলে জিনিসটা আদপেই নেই, এবং সাহিত্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া যাদের গত্যন্তর নেই। এ শ্রেণীর লেখকেরা কি লেখেন, আর না লেখেন, তাতে সমাজের কিংবা সাহিত্যের বড় কিছু আসে যায় না।

এ কথা আমি অস্বীকার করিনে যে, সাহিত্যে চাবুকের সার্থকতা আছে। হাসিতে রস এবং কষ দুইই আছে। এবং ঠিক মাত্রা অনুসারে কষের স্বাদ দিতে পারলে হাস্যরসে জমাট বাঁধে। কিন্তু তাই বলে "কষে"র মাত্রা এত অধিক বাড়ানো উচিত নয় যে, তাতে হাসি জিনিসটে ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে, যা খাঁটী মাল বাকী থাকে, তাতে শুধু "কশাঘাত" করা চলে। সাহিত্যেও অপরের গায়ে Nitric acid ঢেলে দেওয়াটা বীরত্বের পরিচয় নয়। দ্বিজেন্দ্র বাবু "কষাঘাত"কে "কশাঘাত" ভুল করে ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেন নি। সাহিত্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর চাবুক প্রয়োগ করাটা অনাচার। সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠেই ওর প্রয়োগটা সনাতন প্রথা। মিথ্যা যখন সমাজে আস্কারা পেয়ে সত্যের সিংহাসন অধিকার করে বসে, এবং রীতি যখন নীতি বলে' সম্মান লাভ করে ও সমগ্র সমাজের উপর নিজের শাসন বিস্তার করে, তখনই বিদ্রূপের দিন আসে। পৃথিবীতে সব চাপা যায়, কিন্তু হাসি চাপা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি চাবুকের প্রয়োগ চলে না। কোন লেখক যদি নিতান্ত অপদার্থ হয়, তা হলে তার উপর কশাঘাত করাটা কেবল নিষ্ঠুরতা; কেন না, গাধা পিটে ঘোড়া হয় না অপর পক্ষে যদি কোন লেখক সত্য সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র হন, তা হলে তাঁর লেখার কোন বিশেষ অংশ কিংবা ধরণ মনোমত না হলেও, সেই বিশেষ ধরণের প্রতি যেরূপ বিদ্রূপ সঙ্গত, সেরূপ বিদ্রূপকে আর যে নামেই অভিহিত করো, "চাবুক" বলা চলে না। কারণ, ওরূপ ক্ষেত্রে কবির মর্য্যাদা রক্ষা না করে বিদ্রূপ করলে সমালোচকেরও আত্মমর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। কোন ফাঁক পেলেই, কলি যে ভাবে নলের দেহে প্রবেশ করেছিলেন, সমালোচকের পক্ষে সেই ভাবে কবির দেহে প্রবেশ করা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়।

৫

চাবুক ব্যবহার করবার আর একটি বিশেষ দোষ আছে। ও কাজ করতে করতে মানুষের খুন চড়ে যায়। দ্বিজেন্দ্র বাবুরও তাই হয়েছে। তিনি এক-মাত্র "চাবুকে" সন্তুষ্ট না থেকে, ক্রমে "ঝাঁটিকা", "চাটিকা" প্রভৃতি পদার্থেরও

প্রয়োগ কর্‌বার চেষ্টা করেছেন। আমি বাঙ্গালায় অনাবশ্যকে "ইকা" প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে আমার মত "মলাট-সমালোচনা" নামক প্রবন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছি। সুতরাং আমি নির্ভয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবুকে এই প্রশ্ন কর্‌তে পারি যে, "চাটিকা"র "ইকা" বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, সে জিনিসটে মারাতে কি কোন লেখকের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়? "ঝাঁটা" সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সম্মার্জ্জনীর উদ্দেশ্য ধুলো ঝাড়া, গায়ের ঝালঝাড়া নয়। বিলাতী সরস্বতী মাঝে মাঝে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেও, বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে ঝাঁটা উঁচিয়ে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওয়াটা যে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়, এ কথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার কর্‌বেন না।

৬

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজে মার-মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বার যে কারণ দেখিয়েছেন, আমার কাছে সেটি সব চেয়ে অদ্ভুত লাগল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে, "যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।"

এক কথায়, সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য নৈতিক চাবুক মারাই দ্বিজেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায়। পৃথিবীতে অনেক লোকের ধারণা যে, কাউকে ধর্ম্মাচরণ শেখাতে হলে মৃত্যুর মত তার চুল চেপে ধরাটাই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এবং সেই জন্য কর্ত্তব্য। স্কুলে, জেলখানায়, ঐ সমাজের মঙ্গলের জন্যই বেত মারবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল অনেকেরই এ জ্ঞান জন্মেছে যে, ও পদ্ধতিতে সমাজের কোনও মঙ্গলই সাধিত হয় না, লাভের মধ্যে শুধু যে বেত মারে এবং যাকে মারা হয়, উভয়েই তার ফলে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্ব লাভ করে। অপরের উপর অত্যাচার করবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োগটা যে বর্ব্বরতা, এ কথা সকলেই মানেন, কিন্তু একই উদ্দেশ্যে নৈতিক বলের প্রয়োগটাও যে বর্ব্বরতামাত্র, এ সত্য আজও সকলের মনে বসে যায় নি। কঠিন শাস্তি দেবার প্রবৃত্তিটি আসলে রূপান্তরে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও জিনিসটিকে সমাজের মঙ্গলজনক মনে করা শুধু নিজের মন ভোলানো মাত্র। নীতিরও একটা বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামি আছে। নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়, এক রকম প্রকৃতির লোকের হাতে নীতি পদার্থটা পরের উপর অত্যাচার করবার একটা অস্ত্রমাত্র। ধর্ম্ম এবং নীতির নামে মানুষকে

মানুষ যত কষ্ট দিয়েছে, যত গর্হিত কার্য্য করেছে, এমন বোধ হয় আর কিছুরই সাহায্যে করেনি।—আশা করি, দ্বিজেন্দ্রবাবু সে শ্রেণীর লোক নন, যাঁহাদের মতে, সুনীতির নামে সাত খুন মাপ হয়।—ইতিহাসে এর ধারাবাহিক প্রমাণ আছে যে, নীতির বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির অত্যাচার সাহিত্যকে পুরোমাত্রায় সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, সাহিত্য সকল দেশে সকল যুগেই বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির বিপক্ষ, এবং প্রবল শত্রু।

নীতি অর্থাৎ যুগবিশেষে প্রচলিত রীতির ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষকে বাঁধা; কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কাযেই পরস্পরের সঙ্গে দা-কুমড়োর সম্পর্ক। ধর্ম্ম এবং নীতির দোহাই দিয়েই মুসলমানেরা আলেক্‌জণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরি ভস্মসাৎ করেছিল।

এ যুগে অবশ্য নীতি-বীরদের বাহুবলের এক্তিয়ার হতে আমরা বেরিয়ে গেছি, কিন্তু সুনীতির গোয়েন্দারা আজও সাহিত্যকে চোখে চোখে রাখেন, এবং কারও লেখায় কোন ছিদ্র পেলেই সমাজের কাছে লেখককে ধরিয়ে দিতে উৎসুক হন। কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করা এক, কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ করা আর। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কবিতার রূপকমাত্র। কারণ, সে বাঁশীর ধর্ম্মই এই যে, তা "মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।" ছিদ্রান্বেষী নীতিধর্ম্মীদের হাত পড়্‌লে সে বাঁশীর ফুটোগুলো যে তাঁরা বুজিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? এক শ্রেণীর লোক চিরকালই এই চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছেন; কারণ, সে ছিদ্র স্বয়ং ভগবানের হাতে করা বিঁধ, তাকে নিরেট করে দেবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। "মি" জিনিসটাই খারাপ, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের পক্ষে সব চাইতে সর্ব্বনেশে "মি" হচ্ছে "আমি"। কারণ, ও পদার্থটির আধিক্য থাকলে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সবই লুপ্ত হয়ে আসে। অন্যান্য সকল মি-ও ঐ "আমি"কে আশ্রয় করেই থাকে। কিন্তু "আমি" এত অব্যক্তভাবে আমাদের সমস্ত মনটায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, আমরা নিজেও বুঝতে পারিনে যে, তারই তাড়নায় আমরা পরের উপর কুব্যবহার করতে উদ্যত হই, সমাজ কিংবা সাহিত্য—কারও মঙ্গলের জন্য নয়।—এই কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে আমরা পরের উপর নৈতিক চাবুক প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হই।—এই কারণেই যদি এক জন কবি অপর এক জন সমসাময়িক কবির

সমালোচক হয়ে দাঁড়ান, তা হলে তাঁর কবি এবং কাব্যের ভেদবুদ্ধিটি নষ্ট হওয়া অতি সহজ।

৭

দ্বিজেন বাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হতে দুর্নীতির যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা হাস্যরসাত্মক না হোক, হাস্যকর বটে। "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন"—এ কথাটা ভারতবাসীর পক্ষে যে অপ্রীতিকর, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য—কেন না, যামিনী গেলেও আমরা জাগবার বিপক্ষে।—আমরা শুধু রাত নয়, অষ্টপ্রহর ঘুমুতে চাই। সুতরাং যদি কেউ অন্ধকারের মধ্যেই চোক খোলবার পক্ষপাতী হন, তা হলে তাঁর উপর বিরক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।—সে যাই হোক, ও গানটিতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে কি অমঙ্গল ঘটেছে, তা আমি বুঝতে পারলুম না। এ দেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হতে প্রচলিত আছে। রাধিকার নামে বেনামী করলে ও কবিতাটি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বোধ হয় আর কোনও আপত্তি থাকত না। আমরা যে একটা নাম জিনিসটির অধীন হয়ে পড়েছি, সেটা আমাদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। আর যদি দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে ও গানটি ভদ্রসমাজে অশ্রাব্য হয়, তা হলে সেটির parody করে তিনি কি তাকে এতই সুশ্রাব্য করে তুলেছেন যে, সেটি রঙ্গালয়ে চীৎকার করে না গাইলে আর সমাজ উদ্ধার হয় না? দ্বিজেন্দ্র বাবু যেমন বিলাতী নজীরের বলে, চাবকা-চার্বাক বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত করতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলাতী puritanismএর ভূতও নামাতে চান। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অনেক ত্রুটী আছে—কিন্তু puritanism নামক ন্যাকামি এবং গোঁড়ামি হতে এ দেশীয় সাহিত্য চিরকালই মুক্ত ছিল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত যদি আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়, তা হলে—অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" থেকে সুরু করে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" পর্য্যন্ত অন্ততঃ হাজার বৎসরের সংস্কৃত কাব্য সকল আমাদের অগ্রাহ্য করতে হবে।—একখানিও টিকবে না। তার পর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত সকল কবির সকল গ্রন্থই আমাদের অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে। একখানিও বাদ যাবে না। যাঁরা রবীন্দ্র বাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে, তাই খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-কবিদের সরস্বতীকে কি করে তুষারগৌরী-রূপে দেখেন, তা আমার একবারেই

দুর্ব্বোধ্য।—শেষ কথা, puritanismএর হিসেব থেকে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র বাবুও কিছু কম অপরাধী নন। তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই রয়েছে।—"আনন্দ-বিদায়" moral text-book বলে গ্রাহ্য হবে, এ আশা যদি তিনি করে থাকেন, তা হলে সে আশা সফল হবে'না।

—বীরবল।

রমেশচন্দ্র দত্ত।*

ইহা একখানি সুদীর্ঘ জীবনচরিত, ইংরেজী ভাষায় লেখা, ইংরেজের দেশে ছাপা এবং সেই দেশেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বয়ং এক জন সিবিলিয়ান, এবং সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের জামাতা। বরোদার মহারাজ গায়কবাড় এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পুঁথির ছাপা ও বাঁধাই ভাল, ছবিগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে।

প্রথমেই ভূমিকার কথা বলিব। এই ভূমিকার লেখক যখন স্বয়ং মহারাজ গায়কবাড়, তখন উহার সুখ্যাতি করিতে হয়; কিন্তু মহারাজের একটি উক্তির জন্য তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসার কুসুমাঞ্জলি আমরা তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলাম না। মহারাজ লিখিয়াছেন যে,

"Romesh Dutt came from a province the climate and traditions of which are commonly supposed to discourage, in a peculior degree, the exercise of physical anr mental energy."

রমেশ দত্ত এমন প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বা আসিয়াছিলেন, যে প্রদেশের জলবায়ু ও পরম্পরাগত সংস্কার দৈহিক ও মানসিক বলের বিশিষ্ট প্রয়োগের পক্ষে তদ্দেশবাসিগণকে সম্যক্ উৎসাহিত করে না, ইহাই সাধারণতঃ লোকের অনুমান বা ধারণা। সোজা কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা দেশের জলবায়ু ও বাঙ্গালী প্রকৃতির এমনই ভঙ্গী যে, ঐ দেশবাসীদিগের দেহের ও মনের বল সম্যক পরিস্ফুট হয় না। অর্থাৎ বাঙ্গালার জলবায়ুর দোষে, বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের সংস্কারপারম্পর্য্যের দোষে বাঙ্গালায় বলবান পুরুষের জন্মগ্রহণ বা অশেষ

* *The life and work of Romes Cnandra Dutt C. I. E. by J. N. Gupta. I. C. S.*

বুদ্ধিজীবী পুরুষের উদ্ভব সম্ভবপর নহে। লোকমতের দোহাই দিয়া লেখক মহারাজ বাঙ্গালী জাতির এই গ্লানি করিয়াছেন ; আর পুস্তক-প্রণেতা গুপ্ত মহাশয় অম্লানমুখে স্বজাতির এই নিন্দার সম্ভার মাথায় করিয়া বিদ্বজ্জন-সমাজে প্রকট হইয়াছেন ! জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি,—এই অপূর্ব্ব ধারণা কাহার, বা কাহাদের ? যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অম্লানমুখে এখনও স্বীকার করেন যে, নব্য ন্যায়ে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজের গুরুস্থানীয়। রঘুনাথ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বাঙ্গালী বুধগণের নাম করিলে এখনও ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিতগণ হেঁটমুণ্ডে প্রণাম করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্য ও পদাবলী ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় ; বুঝি বা জগতের সাহিত্যে ইহার তুল্য মাধুরীপূর্ণ কাব্যগাথা আর পাওয়া যায় না। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বাঙ্গালায় যে অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এখনও অন্য সকল সাহিত্যের আদর্শস্বরূপ। বাঙ্গালার মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এখনও ভারতে অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় হইয়া আছেন। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি সকল বড় বড় প্রাদেশিক ভাষায় ইঁহাদের গদ্যপদ্য লেখা অনূদিত হইয়াছে, এবং হইতেছে। বাঙ্গালার রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রামগোপাল, সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণ বন্দ্য, রাজা রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস, লালমোহন, উমেশচন্দ্র, রাসবিহারী প্রভৃতি মনস্বিপ্রধানগণের সমকক্ষ ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে আছে কি ? এখনও কাশীতে গিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিতগণ আসিয়া মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চরণে ঋষি-জ্ঞানে প্রণত হইতেছেন। ইহাতেও কি বলিবে, বাঙ্গালার জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালার সংস্কার বা জাতিগত ধারাপারম্পর্য্যের দোষে বাঙ্গালায় মনীষার বিকাশ সম্ভবপর নহে ? নবদ্বীপ যে সহস্র বৎসরকাল ভারতের বিদ্যাকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল, ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই এ কথাটা জানেন। আর দেহের বলের কথা না তুলিলেই ভাল হইত। আমরা ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারী যখন এক বিজেতা জগজ্জয়ী রাজার জাতির পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন দৈহিক বলের ইতরবিশেষ করিয়া আস্ফালন করা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। এই প্রতিবাদ প্রয়োজন বলিয়া গোড়ায় আমরা এই তিক্ত কথা কয়টি বলিয়া

রাখিলাম। এই অপূর্ব্ব মতবাদের জন্য আমরা লেখক মহারাজের যতটা দোষ না দিই, বাঙ্গালী গ্রন্থকার গুপ্ত মহাশয়কে তাহার সহস্রগুণ দোষ দিই। রমেশচন্দ্রের সুখ্যাতিটি রাজমুখে পূর্ণাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি এত বড় গ্লানির কথা নিঃসঙ্কোচে ছাপিলেন ত! এইটুকু ভাবিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, মহারাজকে এই ত্রুটীটুকু দেখাইয়া দিলে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমসংশোধন করিয়া দিতেন।

এইবার আসল পুস্তকখানির পরিচয় দিব: উহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বংশ-পরিচয়, বাল্যজীবন, বিলাত-যাত্রা, সিবিলীয়ানের চাকরী, সাহিত্য-সেবা, ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রভৃতি রমেশচন্দ্রের জীবনের প্রথম স্তরের সকল কথার আলোচনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সিবিলীয়ানী চাকরী ত্যাগ হইতে কংগ্রেসের সভাপতির পদ-গ্রহণ, রাজনীতিক চর্চ্চা ও জীবনের কথা বর্ণিত আছে। তৃতীয় খণ্ডে বরোদায় চাকরী, বরোদার শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনচেষ্টা, বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের কার্য্য, বঙ্গ-ভঙ্গে তাঁহার পরামর্শ ও চেষ্টা, এবং শেষ জীবনের বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে খুব কমই লিখিয়াছেন; তিনি রমেশচন্দ্রের চিঠিপত্র ও সাময়িক সংবাদপত্র সকলের মন্তব্যগুলি বাছিয়া গুছাইয়া এমন ভাবে সাজাইয়া তুলিয়াছেন যে, উহাদের পাঠেই রমেশচন্দ্রের জীবনের আলেখ্য অনেকটা ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, গ্রন্থকার পাকা চিত্রকর নহেন; তিনি আলেখ্যের ক্ষেত্র বা back ground পরিপ্রেক্ষণের পর্য্যায় সমন্বয় করিয়া (perespective) ফলাইয়া তুলিতে পারেন নাই। না পারিবার হেতুও আছে। গ্রন্থকার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের জামাতা, তাঁহাকে একটু সঙ্কোচের সহিত লেখনী পরিচালনা করিতে হইয়াছে। অথচ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার আশায় তিনি এত অধিক মাত্রায় ঘরের কথা ও পরিবারের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহাতে আলেখ্য-ক্ষেত্র অতিশয় গাঢ় হইয়া গিয়াছে। এই গাঢ় ক্ষেত্রের উপর রেম্বাণ্টের (Rembrandt) তুলিকায় চিত্র লিখিলে তবে ছবি ফুটিয়া উঠিত, সজীব বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু জগতে একটি বই দুইটি রেম্ব্রাণ্টের জন্মগ্রহণ সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকার গুপ্ত মহাশয় তাই রমেশচন্দ্রের জীবন-আলেখ্যখানিকে আদর্শ আলেখ্যরূপে বিদ্বজ্জনসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। তথাপি বলিব,

এক হিসাবে গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই। উহাতে আধুনিক বাঙ্গালার এক পৃষ্ঠা সুসন্নিবিষ্ট আছে, উহাতে ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাতে বাঙ্গালী মনীষার উন্মেষের ক্রমবিস্তারবিষয়ক অনেকগুলি কথা বলা আছে, উহাতে আধুনিক বৈধ রাজনীতিক চর্চ্চার পারম্পর্য্য-শৃঙ্খলা সুবিন্যস্ত আছে, ইংরেজ শাসননীতির শোষণ-পদ্ধতির গন্ধটা কোথা হইতে উঠিয়াছিল, তাহার প্রকৃত সমাচার উহা হইতেই পাইয়াছি। এই সকল কারণে এবং লেখকের সংযত ও মার্জ্জিত ভাষার অনুরাগে আমরা এই বহিখানিকে সাদরে মাথায় করিয়া লইয়াছি!

আমাদের মনের কথা এখন আমরা একটু খুলিয়া বলিব। রমেশচন্দ্র আধুনিক ইংরেজী সভ্যতাসঞ্জাত নবীন বাঙ্গালার এক জন আদর্শ পুরুষ। সকল প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইউরোপীয় উন্নত জাতি সকলের ব্যবহার-চাকচিক্যে মুগ্ধ হইলে বাঙ্গালীর চিত্ত, বুদ্ধি ও মেধা কোন পথে ও কেমন ভাবে বিকাশ লাভ করে, তাহা রমেশচন্দ্রের জীবনকথার পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রথম কথা, রমেশচন্দ্র ইউরোপীয় হিসাবে Patriot বা দেশহিতৈষী হইয়াছিলেন। সিবিলিয়ানী চাকরী করিয়া দীর্ঘ জীবন অতিবাহন করিলেও তাঁহার দেশাত্মবোধ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে দেশাত্মবোধ তাঁহার উপন্যাস সকলে পরিস্ফুট, এবং তাঁহার সমাজ-সংস্কার-চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজনীতিচর্চ্চায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি দেশকে ও জাতিকে বড় ভালবাসিতেন, তাই দেশে মানুষ গড়িবার উদ্দেশে তাঁহার "শতবর্ষ" শীর্ষক উপন্যাস-মালা রচিত হইয়াছিল। "শতবর্ষ" পাঠ করিলে জাতি-প্রীতির জাগরণ হইবে, তাই শত বর্ষের প্রচার। জাতির জাগরণ পুষ্টির উদ্দেশে, মানুষ গড়িবার সাধে তিনি "সমাজ", "সংসার" প্রভৃতি উপন্যাস সকল লিখিয়াছিলেন। সমাজের দোষ গুণের বিচার করিয়া সমাজের ব্যাধির স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতায় বিমুগ্ধ তিনি ইউরোপীয় ঔষধের প্রয়োগের দ্বারা সামাজিক রোগের উপশমসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেশাত্মবোধ এই ইউরোপীয় ঔষধকে দেশীয় মোড়কে, বারাণসীর সোণার তবকে মুড়িয়া দিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। রমেশচন্দ্রের স্বভাব অতি মধুর ছিল, তিনি হাঙ্গামা-হুজ্জৎ ভালবাসিতেন না। ভাগ্যধর পুরুষ তিনি, শান্ত সংযত ভাবে সংসারের সুখদুঃখ উপভোগ করিতে ভালবাসিতেন; তাই তাঁহার চরিত্রে আপোষের (Compromise) ভাবটা বড়ই ফুটিয়া উঠিয়া-

ছিল। সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, বন্ধুসংসর্গেও তিনি সামঞ্জস্যের মন্ত্র কখনও ভুলেন নাই ; দেশের ও সমাজের কার্য্যেও তিনি সামঞ্জস্যকে প্রথম স্থান দিতেন। এই জন্যই তাঁহার স্বভাবগত মাধুরী সর্ব্বত্র সমান ভাবে ফুটিয়া উঠিত।

গ্রন্থকার স্বয়ং একটি সূচনা লিখিয়াছেন ; ইংরেজীতে তাহার নাম দিয়াছেন Preliminary.। এই সূচনায় তিনি অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে পারি নাই। তিনি কাহাকে Nation বা জাতি বলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। লর্ড মর্লি লর্ড মিণ্টোর সাহায্যে যে সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক-সভার প্রচলন এ দেশে করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"The far-sighted Viceroy, who with Lord Morley has shared the high honour and lasting glory of building the foundations of autonomy in India."

যে দূরদর্শী রাজপ্রতিনিধি লর্ড মর্লির সহযোগে ভারতে শাসন-স্বতন্ত্রতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান ও অশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি জাতির উদ্বোধনের বার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন, ভারতে জাতিসৃষ্টির প্রসব-বেদনার (parturial pains) সমাচার রাখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত ও ইউরোপীয় সভ্যতায় বিমুগ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জন কয়েকের ইউরোপীয় গণতন্ত্রতার আদর্শে রাজনীতিচর্চ্চার অনুচিকীর্ষা দেখিয়া কি এই অগাধ, অনমুমেয় ও অপরিজ্ঞাত ভারতীয় লোকসঙ্ঘের মধ্য হইতে জাতিসৃষ্টির অনুমান বা কল্পনা করা যায়? যাহা অনুচিকীর্ষাসঞ্জাত, তাহা আদর্শের অপহ্নবে নষ্ট হইবেই ; তাহা ত চামড়ার উপরের অস্থায়ী রং মাত্র। শত শত বর্ষ ধরিয়া আমরা মুসলমানদের হাব ভাব ভাষা সভ্যতা সাজ-পরিচ্ছদ-আদব-কায়দা প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া মগ্ন করিতেছিলাম। ইংরেজের প্রথম আমলেও আমাদের পিতৃপিতামহগণ মোসলেম-সভ্যতার অনুকারী ছিলেন। আর পঞ্চাশ বৎসর কাল দেড় পুরুষ বা দুই পুরুষ ইংরেজী শিখিয়া সাত শত বৎসরের সংস্কারকে আমরা একেবারেই জলাঞ্জলি দিয়াছি ; আমরা এখন পূর্ণমাত্রায় ইংরেজ সাজিয়াছি। এই ইংরেজ-সাজা, ইউরোপীয়-ব্যবহারের অনুচিকীর্ষু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেবল কথায় বার্ত্তায় কি জাতিসৃষ্টির—ত্রিশ কোটী নরনারীর সাগরমন্থনজাত জাতীয় উদ্বোধনের

অনুমান বা কল্পনা করিতে হইবে? গ্রন্থকার যে কেবল Nation ও Nationalism এই দুইটা শব্দে মুগ্ধ হইয়া আছেন, তাহা তাঁহার লেখায় বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

This fusion of many races is the solidifying principle which underlies the British domination of India"। ইহার অর্থ এই যে, এই বহুজাতি-সমন্বয় ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যরক্ষার মূলীভূত কারণ, এই সমন্বয়-সাধন ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ঘটিতেছে। কথাটা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতে যখন ডাক, টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ী ও ষ্টীমার ছিল না, তখন ভারতের প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ সদ্ভাব ও সম্মিলনের ভাব ছিল, এখন তেমন নাই। এখন প্রত্যেক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোককে হিংসা ও ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে; সামান্য চাকরীর জন্য সারমেয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলেই পাগল। মুসলমানদের সহিত আর পূর্ব্বেকার মতন হিন্দুর সে শ্রদ্ধার ও সৌহৃদ্যের ভাব নাই। বকর-ঈদের উৎসবে গোহত্যা-জন্য কাটাকাটি মারামারি আমাদের কথার পোষকতা করে। মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের সময়ে পিণ্ডারী, ঠগ, মারাঠা ডাকাত দেশে বিষম অনর্থের সূচনা করিয়াছিল বটে, পরন্তু যখন ভারত বা আর্য্যাবর্ত্ত মোগল শাসনের অধীন ছিল, তখন এখানকার মতন এমন বিষম প্রাদেশিকতা বর্ত্তমান ছিল না। উর্দ্দু ভাষা তখন সকল ভদ্রলোকেই জানিতেন; এখন যেমন ইংরেজী, তখন তেমনই উর্দ্দুর সাহায্যে সকল প্রদেশের লোক সকলের কাছে মনোভাব জ্ঞাপন করিতে পারিতেন। হিন্দী কবি বীরবল, নরহরি, ব্রজভূষণদাস, শ্যামদাস, কবীর, তানসেন মোগল ও পাঠান দরবারে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। সে সমাদরের কাহিনী সকল এখনও পঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে লোকমুখে প্রচলিত আছে। আসল কথা এই, ইংরেজের আমলে এখন ভারত-সমাজে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ভারতের পক্ষে নূতন নহে। এ খেলা আমরা একবার খেলিয়াছি,—খেলিয়া ঠকিয়াছিলাম বলিয়াই পঞ্জাবে নানক শিখজাতির বীজ বপন করেন; মহারাষ্ট্রে রামদাস স্বামী ও শিবাজী মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন; বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার করেন। এ খেলায় ঠকিতে হয় বলিয়াই ইংরেজের আমলে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল; পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের বনীয়াদ গাড়িয়া স্বামী দয়ানন্দ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। Nation-building বা জাতি-

সৃষ্টি নকলনবীশী রাজনীতির সাহায্যে হয় না; ভারতের কোনও প্রদেশে কোনও কালে হয় নাই। ধর্ম্মের বনীয়াদ ঠিক না থাকিলে ভারতে জাতিসৃষ্টি কখনই হয় নাই, হইবেও না। গ্রন্থকার এই Nationalism বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝেন নাই, তাই এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"How to reconcile the claims of racial nationalism with the claims of that imperial and composite patriotism"। অর্থাৎ, সম্প্রদায়গত (racial) জাতীয়তার প্রভাবকে সার্ব্বভৌম ও সাকল্যগত দেশাত্ম-বোধের সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে। ইহা কেবল শব্দের ঝঙ্কার, বোলওয়ারীর বাহার মাত্র। লিখিতে এবং পড়িয়া শুনাইতে বেশ। ইহার অর্থ কি? Racial nationalism কেমন পদার্থ? পুস্তকের কোনখানে ইহার বিবৃতি (definition) খুঁজিয়া পাইলাম না। আবার লেখক অন্য স্থানে লিখিয়া-ছেন,—"Who have laid the foundations of true nationalism." অর্থাৎ, যাঁহারা প্রকৃত জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত জাতীয়তা বাক্যের অর্থ কি? ন্যাশনালিজমে true and false, প্রকৃত ও অপ্রকৃত অবস্থা আছে না কি? যাহা অপ্রকৃত, তাহাকে কি মেকী বলিব? তিনি কোন কথাটা বলিতে চাহিতেছেন, তাঁহার লেখা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। তবে গ্রন্থকার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, রমেশচন্দ্রের

"Whole life was a living demonstration of that true intermingling of the East and West."

সমগ্র জীবনটা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমঞ্জসীকরণের অব্যাহত চেষ্টার স্বরূপ হইয়াছিল। এখানেও একটা true শব্দ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থকার গোল ঘটাইয়াছেন। রমেশচন্দ্র চং চাং রকম সকমে ইংরেজের মতন ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইউরোপীয়দিগের সহিত যৌন সম্বন্ধ ঘটান নাই; কোনও পুত্র কন্যার ইউরোপীয়দিগের সহিত বিবাহ দেন নাই। ইহাই কি true inter-mingling? খোলসা কথা বলা ভাল, শ্বেতাঙ্গের সহিত কৃষ্ণাঙ্গের যৌন সম্মিলন কৃষ্ণাঙ্গের পক্ষে কল্যাণদায়ক নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যিনি এ চেষ্টা করিবেন, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। মেরিডিথ টাউন্‌সেণ্ডই বল, রডিয়ার্ড কিপ্‌লিংই বল, প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে সম্মিলন সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা যে সূত্রবাক্যের উচ্চারণ করিয়াছেন, সে সূত্রগত সিদ্ধান্তের আমরা প্রগাঢ় পক্ষপাতী। জেতা বিজিতের সংমিশ্রণের ফলে বিজিতের বিশিষ্টতাই

নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়; বিজিত জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ভারতে ইউরেশীয় বা ফিরিঙ্গী সমাজের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ-দেখি; উহাদের মধ্যে ভারতীয় বিশিষ্টতা কিছু পাইবে কি? এই ফিরিঙ্গীয়ানার পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই যদি গ্রন্থকারের মতে true Nationalism হয়, তবে সে ন্যাশনালিজমকে প্রত্যেক ভারতবাসীই দূরে পরিহার করিবেন। উহা কোনও ভারতবাসীরই ঈপ্সিত হইতে পারে না। উহার জন্য রমেশচন্দ্র প্রাণপাত করেন নাই, উপন্যাস আদি লেখেন নাই, রাজনীতির চর্চ্চা করেন নাই। বলা বাহুল্য, আমরা রমেশচন্দ্রের প্রায় সকল লেখাই পড়িয়াছি। তাঁহার প্রকাশিত ইংরেজী বাঙ্গালা সকল পুঁথিই আমরা সাবধানে পড়িয়া দেখিয়াছি। অনেক সময়ে তাঁহার সহিত অনেক বিষয় লইয়া আলোচনাও করিয়াছি। তাঁহার বিষয়ে যাহা আমাদের বিশ্বাস, তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছি। তাহার উপর আর একটি কথা এইখানে বলিব। তিনি "intermingling of the East and West" লইয়া কখনই পাগল হন নাই। তিনি চাহিতেন,

"May we, in the course of years, progress in civilisation and in self-government, in mercantile enterprise and in representative institutions even as the young English colonies in Australia are doing year by year. And may our son's sons when they come to Europe, feel that India can take her place among the great advancing countries of the earth."

ইহার অর্থ এই যে, আমরা ইউরোপ-মার্কিনের জাতি সকলের সমকক্ষ হইতে পারি। আমাদের যাহা ভাল আছে, তাহা বজায় রাখিব; আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিব, অথচ অর্থোপার্জ্জনের বিলাসের সভ্যতার সাহচর্য্যে ও স্বায়ত্তশাসনে আমরা ইউরোপের সমকক্ষ হইব। তাঁহার দৃষ্টিতে ইউরোপের যেটি ভাল বোধ হইয়াছে, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন তাঁহার দৃষ্টিতে ভারতের বেদবেদান্তের ঋষিমুনির যাহা ভাল, তাহাই রক্ষা করিতে তিনি প্রাণপণ করিতেন। National individualism বা জাতির বিশিষ্টতা তিনি কখনই নষ্ট করিতে চাহেন নাই। চাহিলে জীবন-প্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, বঙ্গবিজেতা প্রভৃতি উপন্যাস লিখিতেন না। তাঁহার সংসার ও সমাজ প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসে তাঁহার এই বুদ্ধি পরিস্ফুট হইয়া আছে। খাঁটী নির্ভেজাল ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজম্ বা দেশহিতৈষণা তিনি এ দেশের সাহিত্যে আমদানী করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল হেমচন্দ্র যাহা কাব্য-ঝঙ্কারে ফুটাইয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র তাহা গদ্যে প্রকাশ

করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবটাকে ব্রাহ্মণ্য সাধনার আবরণে আনন্দ-মঠে ফুটাইয়া ছিলেন, রমেশচন্দ্র তাহাতে স্বদেশের খাদ না দিয়া এ দেশে আমদানী করিতে চাহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যাহার প্রচারক, রমেশচন্দ্র তাহারই অন্য প্রকারের ব্যাখ্যাতা। রীতির পার্থক্য থাকিতে পারে, প্রকৃতির পার্থক্য ইহাদের মধ্যে আদৌ নাই। কথার আবরণে এই সত্যটুকু যতই ঢাকিতে চেষ্টা কর না কেন, উহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার নহে। রমেশচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইউরোপের সমকক্ষ হইতে বলিয়াছেন ; পরে ঋগ্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া, ভারতের সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া, ভারতের প্রতি ইউরোপের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপের সমকক্ষতা করা, ইউরোপের প্রশংসা লাভ করা তাঁহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ঈপ্সিত, সাধ্য ছিল। উহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু এ মহা-মন্ত্রের সাধক দিনে দিনে এ দেশে কমিয়া যাইতেছে। তাই মনে হয়, রমেশ-চন্দ্রের অপূর্ব্ব জীবনব্যাপিনী চেষ্টা ইহারই মধ্যে বিস্মৃতির অজ্ঞেয় তলে ডুবিয়া যাইতেছে। মনে হয়, তাই রমেশচন্দ্রের জীবনকথা ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এখনও হইল না, বুঝি বা কখনও হইবে না। যে ভাবের ঢেউ দেশের উপর আসিতেছে, তাহার প্রভাবে এই সকল অনুচিকীর্ষাজাত চেষ্টা ও উদ্যম, সাধনা ও কার্য্যতৎপরতা, সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে ; সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ সাধকমণ্ডলীও বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাইবেন।

গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন ; তাঁহার লিখিত গ্রন্থখানি অনেক অংশে ভাল হইয়াছে বলিয়াই আমরা একটু বিশ্লেষণ করিয়া নানা কথার অবতারণা করিলাম। আমাদের মতই যে অভ্রান্ত, এমন কথা কখনই বলি নাই, ভবিষ্যতেও বলিব না। তবে আমাদের সিদ্ধান্তরাশি যে চিন্তার বিষয়, সেটুকু স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে ছাড়িব না। রামেশচন্দ্রের লিখিত গ্রন্থ সকলের বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার জীবন-ব্রতের আবিষ্কার করিতে পারিলে, গ্রন্থকারের পরিশ্রম অধিকতর সার্থক হইত। তথাপি পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে, বিদ্বজ্জনসমাজে ইহার আদর হইয়াছে। আরও হইতে পারে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বংশানুক্রম।

আমরা দেখিলাম, মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে লক্ষণ সকল প্রথমে মিশ্রিত হইয়া পরে বি-যুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু জীবদেহে বহু লক্ষণ আছে, মনেও বহু ভাব দেখা যায়। সে সকলের কোন-গুলি মেণ্ডেলের বিধান অনুসারে বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইবে, এবং কোনগুলি ঐ বিধানের অধীন হইবে না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইতে হয়; তদ্ভিন্ন জানিবার অন্য উপায় নাই। এইরূপে পণ্ডিতগণ অবধারণ করিতেছেন যে, লিঙ্গভেদ একটি মেণ্ডেলীয় বিধান। পূর্ব্বে লিঙ্গভেদের নানা কারণ অনুমিত হইত। সে সকল আমি "নব্যভারতে" স্ত্রী-পুং-ভেদ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি। যদিও সে সকল মত এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু এখন মেণ্ডেলীয় বিধানমতেই লিঙ্গভেদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেছে। লিঙ্গভেদ প্রধানতঃ স্ত্রী-পুং-কোষ-গত। যমজ সন্তানের লিঙ্গ-পরীক্ষা দ্বারা ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীকোষ পুংকোষ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইবার পর যে যুক্তকোষ উৎপন্ন হয়, তাহা দুই, চারি, আট......ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে অপত্য-দেহের রচনা করে। কিন্তু যদি ঐ বিভাগসময়ে যুক্তকোষ দ্বিধা খণ্ডিত হইয়া উভয় অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, একাংশ অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকে, তবে প্রত্যেক খণ্ড হইতে একটি একটি ভ্রূণ জাত হয়; এরূপ স্থলে দুইটি ভ্রূণই সমলিঙ্গ হইয়া থাকে। দুইটি যমজেরই আকৃতি ও লিঙ্গ একরূপ হয়। তুল্য আকৃতির যমজ উভয়ই পুত্র অথবা উভয়েই কন্যা হয়। কিন্তু দুইটি পৃথক স্ত্রীকোষ পৃথকভাবে দুই পুংকোষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে যে ভ্রূণদ্বয় উৎপন্ন হয়, তাহারা সমলিঙ্গই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তাহা-দিগের আকৃতিও তুল্য হয় না। গ্যাল্টন বহু যমজের পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির করিয়াছেন। সুতরাং লিঙ্গ যুক্তকোষের অনুপ্রাণকের উপর নির্ভর করিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং আকৃতির তুল্যতাও একটি কোষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার উপরই নির্ভর করিল।

লিঙ্গভেদ।

যাহা হউক, বংশানুক্রমের অর্থই পুরুষপরম্পরায় লক্ষণের সাদৃশ্য ও বৈষম্য। এই সাদৃশ্যের ও বৈষম্যের কারণ পূর্ব্বেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে। কিন্তু মূল কারণ এখনও বলা হয় নাই। পণ্ডিত ওয়াইসম্যান মূল কারণের নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা

বংশানুক্রমিক হেতু।

বুঝিতে হইলে জীবদেহের কোষভেদ অগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক। জীব-দেহে, অন্ততঃ অতিনিম্নশ্রেণীর জীব ভিন্ন অপর সকল জীবের দেহেই দ্বিবিধ কোষ আছে;—(১) বংশরক্ষক; (২) দেহরক্ষক কোষ। দেহরক্ষক কোষ দেহের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ইত্যাদি সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই দেহ-রক্ষক কোষ আছে। কিন্তু বংশরক্ষক কোষ কেবল এক স্থানেই উৎপন্ন হয়। নিম্নজীবগণের উদর প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে বংশরক্ষক কোষ জাত হইত; কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ স্তন্যপায়ী জীবের কেবল অণ্ডে এই কোষ উৎপন্ন হয়। অণ্ড কাটিয়া ফেলিলে আর তাহাদের পরবংশ-গঠন করিবার শক্তি থাকে না। দেহের অন্যস্থানীয় কোষ ক্ষত ইত্যাদি কারণে নষ্ট হইলে পুনরায় তদনুরূপ দেহরক্ষক কোষ জাত হইয়া ক্ষতাদি পূর্ণ করে। কিন্তু ঐ সকল কোষ হইতে পরবংশ গঠিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উহাদিগকে দেহরক্ষক কোষ বলা যায়, বংশরক্ষক কোষ বলা যায় না। কিন্তু বংশরক্ষক কোষ হইতে দেহরক্ষক ও বংশরক্ষক, উভয়বিধ কোষই উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীকোষ ও পুংকোষ, উভয়ই বংশরক্ষক কোষ। উহারা মিলিত হইয়া যে অপত্যের গঠন করে, তাহাতে দেহরক্ষক কোষ. এবং যথাসময়ে বংশরক্ষক কোষ, উভয়ই উৎপন্ন হয়। বংশরক্ষক কোষ হইতেই পূর্ণদেহ জীব গঠিত হয়, এবং যথা-কালে তাহার অণ্ডমধ্যে বংশরক্ষক কোষ উৎপন্ন হইয়া স্ত্রীকোষের সংমিশ্রণে বংশশ্রেণী রক্ষা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেহরক্ষক কোষ হইতে বংশরক্ষক কোষ উৎপন্ন হয় না; কিন্তু বংশরক্ষক কোষ হইতে উভয়বিধ কোষই উৎপন্ন হয়

কিন্তু দেহরক্ষক কোষই হউক, আর বংশরক্ষক কোষই হউক, সকলই জীববস্তুর বিকার। এই জীববস্তুর এক বিশেষ বিকার হইতেই বীজ উৎপন্ন হয়, এবং বীজই বংশরক্ষা করে। এই বীজবস্তুই (১) বংশরক্ষক কোষে অর্থাৎ স্ত্রীকোষে ও পুংকোষে পরিণত হয়। এই দ্বিবিধ কোষের বীজ-বস্তু মিলিত হইয়া ক্রমে যখন বীজবস্তু হইতে দেহরক্ষক কোষ উৎপন্ন হয়, এবং ঐ কোষ নানা ভাবে বিবর্দ্ধিত হইয়া অস্থি, মাংস, রক্তাদি নির্ম্মাণ করে, তখন বীজবস্তুর কিয়দংশ হইতে ঐ সকল কার্য্য হইয়া থাকে; অপরাংশ বীজবস্তুই থাকিয়া যায়। উহা প্রায় অবিকৃত এবং অ-বিবর্ত্তিত ভাবেই ভ্রূণ-দেহের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করে। দেহরক্ষক কোষ পৃথক হইয়া নানা

(১) Germ-plasm.

ভাগে বিভক্ত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন করে, এবং নানারূপে বিবর্ত্তিত হইয়া অস্থিমাংসাদিতে পরিণত হয়; কিন্তু বংশরক্ষক কোষ কোনও বিভাগেই যোগ দেয় না, কোনরূপ বিবর্ত্তনেরই অধীন হয় না। উহা চিরাতীত কাল হইতে নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছে। জীবের দেহকোষ কতরূপ দেহের রচনা করিল; মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রভৃতি কতই উৎপন্ন হইল; এককোষ (২) জীব বহুকোষে (৩) পরিণত হইল। কিন্তু বংশরক্ষক কোষ এক ভাবেই রহিয়া গেল; সে প্রায় কোনও পরিবর্ত্তনেই যোগ দিল না। সে এক-কোষ ব্যতীত বহু-কোষ হইল না। সে নির্লিপ্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় (৪) বংশপরম্পরায় এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে চলিয়া যায়। আবার তথা হইতে তৃতীয় পুরুষের রচনা করে। এইরূপে অনন্ত বংশধারা রক্ষিত হইতেছে।

এই কারণবশতঃ পিতা পুত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। একই পদার্থ বীজ-বস্তু পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে সংক্রমিত হওয়ায়, দেহে ও মনে সাদৃশ্য হইবেই ত। কিন্তু ঐ পদার্থ যদিও অপরিবর্ত্তিত থাকে, তথাপি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকে না। উহা যে সকল দানা দ্বারা গঠিত, তাহাদের সকলের অবস্থান ও বেষ্টনী সমান নহে। ঐ দানাগুলির কেহ বা কোষের পরিধিস্থানে, কেহ বা মধ্যস্থলে, কেহ বা অন্যত্র; সুতরাং যে রস দ্বারা উহারা পুষ্ট হয়, তাহা সকলে সমান প্রাপ্ত হয় না। এ নিমিত্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে যেমন জীবন-সংক্রম ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (৫) আছে, জীববস্তুর দানা সকলের মধ্যেও তদ্রূপ বীজগত সংক্রম ও বীজগত নির্ব্বাচন(৬) হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে যেমন যোগ্যতর ব্যক্তি জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়, অপরে নিধন প্রাপ্ত হয়, বীজ বস্তুর দানাগুলির মধ্যেও তদ্রূপই হইয়া থাকে। এই বীজগত নির্ব্বাচনের ফলে, এবং পূর্ব্বে যে দানাগুলির "তাসা"র কথা বলিয়াছি, তদ্ধেতু বীজমধ্যেও, অর্থাৎ বংশরক্ষক কোষ

(২) unicellular (৩) Multicellular.

(৪) At an early stage reproductive cells are set apart. These remain simple and undifferentiated, preserving the structural and functional traditions of the original germ cell. These cells and the results of their division are but little implicated in the differentiation which makes the multicellular organism what it is.—Geddes and Thomson. The Evolution of Sex. P. 261-2.

(৫) Natural Selection. (৬) Germinal Selection.

মেরী, শিশু খ্রীষ্ট ও সেন্ট জন।

চিত্রকর বুগেরিও।

Mohila Press.

মধ্যেও সমভাব রক্ষিত হয় না। কোষস্থ দানাগুলির গঠন, সংস্থান ও ধর্ম্ম অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হয়। যদি পরিবর্ত্তনের মাত্রা অল্প থাকে, তবে একগণ-(৭)-মধ্যেই ব্যক্তিগত প্রভেদ উৎপন্ন হয়; আর যদি উহার মাত্রা অত্যন্ত অধিক হয়, তবে একগণভুক্ত জীব অন্যগণভুক্ত জীবে বিবর্ত্তিত হয়। ইহাতেই নিম্ন প্রাণী হইতে উচ্চ প্রাণীর বিবর্ত্তন সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অল্প পরিবর্ত্তনবশতঃ যে ব্যক্তিগত ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই একগণভুক্ত ব্যক্তি সকলের, অথবা একবংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেই কিছু কিছু বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশানুক্রমিক সাদৃশ্য ও বৈষম্য এইরূপে বীজবস্তু হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহার বংশানুক্রমিক কারণ বীজগত, অর্থাৎ স্ত্রী-পুং-কোষ-গত। পারিপার্শ্বিক কারণে বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিতে পারে না।

স্ত্রী-পুং-কোষকে বংশরক্ষক কোষ বলিয়াছি। এই বংশরক্ষক কোষের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু আছে। তাহার মধ্যে যে আঁশগুলি আছে, তদ্দ্বারাই পর পর বংশ গঠিত হয়। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই আঁশগুলি দানাদার। যখন এই সকল দানা হইতেই অপত্য জাত হয়, তখন ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে

স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ।

যে, যে সকল কারণ ঐ দানাগুলির গঠন, সংস্থান, অথবা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়, তাহাতেই অপত্যের পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে বংশরক্ষক কোষের ঐরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহাতে বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তনও সিদ্ধ করিতে পারিবে না। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে জীবের স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ বংশানুগত হইবে কি না? স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ কি? যে লক্ষণ নিজ জীবনে অর্জ্জন করি, তাহাই স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ। ব্যায়াম করিয়া কোনও ব্যক্তির বাহুর পেশী দৃঢ় হইল; তাহার অপত্য ঐরূপ দৃঢ়পেশী লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে কি না? কেহ ইংরেজী শিক্ষা করিল। তাহার অপত্য ঐ ভাষার জ্ঞান লইয়া জাত হইবে কি না? এ সকল নিজ জীবনে অর্জ্জিত, সুতরাং স্বোপার্জ্জিত। ইহা বংশানুগত হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, এই সকল কারণ-বশতঃ বংশরক্ষক কোষের অভ্যন্তরে কোনরূপ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঐ সকল কারণে বংশানুগত পরিবর্ত্তনও ঘটিবে না।

(৭) Species.

ঐ সকল কারণে এবং ঐরূপ স্বোপার্জ্জিত কারণে যে সকল লক্ষণ জাত হয়, তাহাতে বংশরক্ষক কোষের, অর্থাৎ স্ত্রী-পুং-কোষের পরিবর্ত্তন হইবার কোনও উপায় নাই। দেহ-যন্ত্রে এমন কোনও উপায় দেখা যায় না, যাহাতে স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ বংশরক্ষক কোষকে আশ্রয় করিতে পারে। অথবা তথায় কোনও পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং ওয়াইস্‌-ম্যান সর্ব্বপ্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, এইরূপ লক্ষণ বংশানুগত হয় না। তদবধি অধিকাংশ পণ্ডিত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, স্বোপার্জ্জিত লক্ষণ বংশানুগত হইবার প্রমাণ নাই; সুতরাং তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ৮) কেহ কেহ কতিপয় পীড়াকে বংশানুগত মনে করেন, যেমন উপদংশ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পীড়া প্রকৃতপক্ষে স্বভাবতঃ বংশানুক্রমিক নহে। ঐ পীড়ার বীজ (germ) পিতার পুং-কোষমধ্যে স্থান লাভ করিলে, তৎসহ স্ত্রীকোষের সহিত মিলিত হয়, এবং অপত্য উৎপন্ন করে। সুতরাং উহা এক দেহ হইতে পুং-কোষ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া অপর দেহে চলিয়া গেল, এইমাত্র। আমি কোনও একটি পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া গেলে, তাহাকে বংশানুক্রম বলা যায় না। যে সকল লক্ষণ বীজগত স্বাভাবিক কারণবশতঃই বংশানুক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বংশানুক্রম বলে। সুতরাং এই সকল পীড়াকে বংশানুগত বলা সঙ্গত হইতে পারে না।

ভ্রান্ত বিশ্বাস।

এখন আমরা বঙ্গদেশপ্রচলিত কতিপয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করিব। অনেক দেশেই এক সময়ে সাধারণ জনগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ঋতুস্নাতা নারী প্রথমেই যাহার মুখদর্শন করে, অপত্য তাহার ন্যায় হয়। আর একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই ছিল যে, গর্ভিণী নিয়ত যাহাকে চিন্তা করে, অপত্য তদ্বৎ হইয়া থাকে। তৃতীয় বিশ্বাস কোনও কোনও স্থলে প্রবল ভাবেই বিদ্যমান ছিল; তাহা এই যে, একবার এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক গর্ভসঞ্চার হইলে, পরে যদি অন্য ব্যক্তি দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয়, তথাপি অপত্য পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে; যেন তাহার প্রভাব স্ত্রী-যন্ত্রে যুক্তই থাকে। চতুর্থ বিশ্বাস, গর্ভিণীকে সময় সময় উৎকৃষ্ট সরস পদার্থ আহার করিতে

---

* We may fairly sum up our position in regard to the theory of the inheritance of acquired characters in the verdict of non-proven.—Morgan's Evolution and adaptation p. 260.

দিলে পুত্র সন্তান জাত হইবে। এই সকল ও আরও বহু ভ্রান্ত মত পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উল্লিখিত কারণ সকল কি উপায়ে বংশরক্ষক কোষের কেন্দ্রবিন্দুস্থ আঁশগুলির দানার মধ্যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিবে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং ঐ সকল কারণে অপত্যের কোনও লক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা স্বীকার করা যায় না। শ্রীশশধর রায়।

শৃঙ্খলিতা।

['আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রী রচিত।]

১

তোমার হৃদয়ে আসিনু
তোমার প্রেমের লোভেতে ;
শান্তি তৃপ্তি দুই নাশিনু,
কেঁদে মরি সেই ক্ষোভেতে।

২

স্বপন যেমন আসে গো,
এনু ঘুমঘোরে ভাসিয়া ;
বাঁধিলে কঠিন পাশে গো,
অতিশয় ভালবাসিয়া।

৩

বড় গান গেছি ভুলিয়া,
মৃদু প্রেম-বুলি গাহিব।
পক্ষ কণ্ঠ দুই খুলিয়া,
ঊর্দ্ধদিকে নাহি চাহিব।

৪

এ শৃঙ্খল-ভার বহিব,
যাব না আকাশে উড়িয়া ;
জন্মজন্মান্তর রহিব
তোমার পিঞ্জর জুড়িয়া।

৫

অথবা যেদিন কহিবে,—
সেদিন যাইব চলিয়া ;
শেষ গীতি মোর রহিবে
অশ্রুজলে জলে গলিয়া।

স্বর্গীয় দেউস্কর।

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর আর ইহজগতে নাই। ইনি দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সখারাম বাবু কর্ম্মী ছিলেন,—ইনি কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ইনি মহারাষ্ট্রীয় হইলেও বঙ্গদেশকে ও বাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা সেই ক্ষতিতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে দেউস্কর মহাশয় বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিছু দিন রোগ ভোগ করিবার পর তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্নের সুচিকিৎসায় দেউস্কর সে যাত্রা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আরোগ্যলাভের পর তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য রাজগৃহে গমন করেন। সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ক্রমে স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতেছিলেন। তিন মাস পূর্ব্বে দেউস্কর কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় তিন চারি দিন অবস্থিতি করিবার পর আবার আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। এবারও কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু দেউস্কর এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আত্মীয় বান্ধবগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। দেউস্কর কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন দুর্ব্বল অবস্থায় বিদেশযাত্রা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া বন্ধুবর্গ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেউস্কর কাহারও নিষেধ না শুনিয়া গত ১৮ই আশ্বিন বৈদ্যনাথের সন্নিহিত দেওঘরে গমন করেন। দেওঘরে গিয়া তিনি এক মাস সুস্থ ছিলেন, তাহার পর আবার সেই কালজ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করে। সাহিত্যসেবীর চিরন্তন অভিশাপ দারিদ্র্য দেউস্করের চিরজীবনের সঙ্গী ছিল। মৃত্যুশয্যায় সেই দারিদ্র্যের যাতনা ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রভাতে তিনি ধরার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছেন।

ভগবান্ কর্ম্মক্লান্ত, পথশ্রান্ত পথিকের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া করুণার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকে তিনি তাঁহাকে শান্তিদান করুন।

বৈদ্যনাথের সন্নিহিত কর্ম্মাটাঁড় নামক রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী করো গ্রাম দেউস্করের জন্মভূমি।

১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে নাগপুরের শ্রীযুত রঘুজী ভোঁসলে বাঙ্গালার তদানীন্তন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। আলিবর্দ্দী খাঁ মারাঠীদিগকে চৌথস্বরূপ উৎকল প্রদেশ দান করেন। সেই সময়ে রঘুজী ভোঁসলে কৃষ্ণভট্ট রায়কর নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতিভূস্বরূপ নবাবের নিকট রাখিয়াছিলেন। স্বজাতির প্রতিভূ হইয়া রায়কর বাঙ্গলা দেশে বাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে বীরভূম জেলার শাসনকর্ত্তা বদীয়াৎ জমা খাঁ কোনও কারণে মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরাগভাজন হন। কৃষ্ণভট্ট রায়কর বদীয়াৎ জমা খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবাবকে বুঝাইয়া সুকৌশলে তাঁহার ক্রোধশান্তি করেন। নবাব আবার বদীয়াৎ জমা খাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। এই উপকারের পুরস্কারস্বরূপ কৃতজ্ঞ বদীয়াৎ কৃষ্ণভট্ট রায়করকে বৈদ্যনাথের সন্নিহিত 'করো' নামক একখানি গ্রাম নিষ্কর ভাবে দান করেন। সেই সূত্রে কৃষ্ণভট্ট করো গ্রামে বসবাস করেন।

এই কৃষ্ণভট্ট রায়করের বংশজাত এক কন্যার সহিত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত রত্নগিরি জেলায় ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর আলবান নামক দুর্গের নিকটে 'দেউস্' নামক গ্রাম আছে। ঐ দেউস্ গ্রাম দেউস্কর-বংশের আদিনিবাস। সখারাম বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় সদাশিব বিঠ্‌ঠল দেউস্কর শেষ বাজী রাওয়ের ভ্রাতা শ্রীমন্ত অনন্ত রাও পেশোয়ার আশ্রিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইলে, সদাশিব দেউস্কর শ্রীমন্ত অনন্তের সহিত মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রথমে চিত্রকূটে, পরে চিত্রকূট হইতে বারাণসীধামে আগমন করেন।

পূর্ব্বে যে কৃষ্ণভট্ট রায়করের কথা বলিয়াছি, তাঁহার বংশধর রামকৃষ্ণ রাও সে সময়ে বারাণসীতে বাস করিতেছিলেন। নবাগত সদাশিব বিঠ্‌ঠল রামকৃষ্ণ রায়করের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ ভগিনীপতি সদাশিবকে করো গ্রামে কিছু ভূসম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ দান করেন। সদাশিব করো গ্রামে বাস করিলেন।

করো গ্রামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র গণেশ সদাশিব কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করেন। গিধোড়ের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বৈদ্যনাথ দেওঘরে বাস করিতেন। তিনি গণেশ সদাশিবকে আশ্রয় দেন। ১৯২৬ সংবতের পৌষ মাসে শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে বাঙ্গলা দেশে বিখ্যাত ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা-প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে সখারামের মাতৃবিয়োগ হয়। সাধ্বী পত্নীর মৃত্যুর পর সখারামের পিতা আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সখারামের বিধবা পিতৃষসা তাঁহার লালন-পালন করেন। একপত্নীব্রত, পুত্রবৎসল পিতার সখারামই নয়নমণি ছিলেন, তাহা না বলিলেও চলে। সখারামের পিতৃষসা বুদ্ধিমতী ও সংসারধর্ম্মে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার ছিল। তাঁহারই যত্নে, উপদেশে, পরিশ্রমে সখারামের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

সখারাম বাল্যকালে কিছু দিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বৈদ্যনাথের ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অবস্থাবৈগুণ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তিনি বৈদ্যনাথ স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

সখারাম বাল্যেই বাঙ্গালা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসের অনুশীলনে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাঁহার অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না; তথাপি সাংসারিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও মারাঠী ঐতিহাসিক গ্রন্থ ক্রয় করিতেন। এই অনুশীলনের পূর্ণ ফল তিনি দেশবাসীকে দান করিবার অবকাশ পাইলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের ও ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিতের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনব্রত ছিল। সেই পুণ্যব্রত অসমাপ্ত রহিল। সখারাম কার্য্যসূত্রে ও প্রসঙ্গক্রমে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাই তাঁহার কীর্ত্তিরক্ষা করিবে কিন্তু যাহা তাঁহার সঙ্গে গেল, তাহার অভাব কে পূর্ণ করিবে?

অল্প বয়সেই সখারাম বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বৈদ্যনাথ মহকুমায় এক জন হাকিম ছিলেন। এই কর্ম্মচারীর

অনুচিত আচরণে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সখারাম বাবু "হিতবাদী" পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মহকুমা-হাকিম কোনও সূত্রে তাহা জানিতে পারিয়া সখারামের প্রতি এমন বিরূপ হন যে, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সখারাম বাবুকে শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিতে হয়।

"হিতবাদী"র তদানীন্তন সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহাকে "হিতবাদী"র প্রুফ-রীডারের পদে নিযুক্ত করেন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে সখারাম কিছু দিনের মধ্যে বিশারদের দক্ষিণ হস্তে পরিণত হইয়াছিলেন। বিশারদ মহাশয়ের জীবিতকালেও সখারাম বাবু সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। বিশারদের লোকান্তরের পর, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "হিতবাদী"র সম্পাদক হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে সুরাট কংগ্রেস ও শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের সমর্থন উপলক্ষে "হিতবাদী"র স্বত্বাধিকারীদের সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটে। নিঃসম্বল দেউস্কর সেই মুহূর্ত্তে পদত্যাগ করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন। মতের স্বাতন্ত্র্যে তাঁহার অকপট অনুরাগ ছিল। জীবিকার জন্য তিনি পরমতের অনুবর্ত্তন ও আত্মমতের বলিদানে সম্মত হন নাই। বাঙ্গালার সংবাদপত্র-জগতে এমন তেজস্বী সম্পাদক বিরল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"হিতবাদী"র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া তিনি ন্যাশান্যাল কাউন্সিলের বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার ও ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

সখারাম বাবুর (১) দেশের কথা, (২) বাজী রাও, (৩) আনন্দী বাই, (৪) মহামতি রাণাডে, (৫) এটা কোন্ যুগ, (৬) ঝান্সীর রাজকুমার ও (৭) তিলকের মোকদ্দমা বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে দেশের কথা ও তিলকের মকদ্দমা গবর্মেণ্ট জব্দ করিয়াছেন।

কর্ম্মী দেউস্কর ইহজন্মের কর্ম্ম শেষ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিনটি কন্যা বর্ত্তমান। দুইটি কন্যা বিবাহিতা, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা চারি বৎসর বয়স্কা, অবিবাহিতা। ভগবান সখারাম বাবুর শোকসন্তপ্ত স্বজনগণকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন। *

---

* বসুমতী।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শোভাবাজার রাজবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে ;— রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র দেশে শোকের ছায়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরঋণী। তিনি সাহিত্য-পরিষদের প্রবর্ত্তক ; সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠাতা। স্বয়ং সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতিবিধান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

রাজা বাহাদুর প্রথম যৌবনে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতার মিউনিসিপাল বিলের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ছিলেন।

বিবাহ-সংস্কার, সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক সংস্কারেও তিনি নায়ক হইয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের সমাজ যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা রাজা বিনয়কৃষ্ণের চেষ্টার ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

দরিদ্রের দুঃখে রাজা বিনয়কৃষ্ণ বেদনা অনুভব করিতেন। তাঁহার সেই করুণা ও সমবেদনার ফল "শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট সোসাইটী"। এই পুণ্য অনুষ্ঠান তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর দুইখানি ইংরেজী দৈনিক প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ইংরেজী দৈনিক আজ যে শক্তি ও প্রভাবের অধিকারী হইয়াছে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাহার মূল উৎস। তিনি "হিতবাদী" পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কলঙ্কভঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি স্বয়ং সুলেখক ছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি অনেক সন্দর্ভের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল মনস্বী এ কালে অত্যন্ত বিরল। রাজনীতিবিজ্ঞানে, ইতিহাসে ও সমাজতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আমরা তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যয়ন ও চিন্তাশক্তির পরিণত ফলের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর মহাকাল তাঁহাকে হরণ করিয়া আমাদিগকে তাহাতে বঞ্চিত করিলেন।

সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও লোকসেবা, দেশচর্য্যার এই চারি পর্য্যায়ে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কর্ম্মে তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে। দেশের ও দশের কল্যাণকল্পে বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তিনি আন্তরিক আনন্দ ও চিত্তপ্রসাদ অনুভব করিতেন। বিলাস-ব্যসন পদদলিত করিয়া তিনি কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, অর্দ্ধপথে সে যাত্রা সমাপ্ত হইল।

তিনি অনাবিল চারিত্র্য ও অসাধারণ মনঃশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি মনীষী ছিলেন; মনীষীর ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যের আলোচনা, মনস্বী, মনীষী ও চিন্তাশীল সুধীগণের সংসর্গই তাঁহার চিত্তবিনোদের উপাদান ছিল। মনীষীর সমাদর, প্রতিভার পূজা তাঁহার ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল।

মণ্ডলী বা সংঘের গঠনে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ও নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার বৈঠকে অহি-নকুলের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি; তাঁহার অনুষ্ঠানে তেলে জলে মিশিয়া গিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যের তুলনা হয় না। তিনি অতি সহজে লোককে আপনার করিয়া লইতেন। তিনি যাহাদের ভালবাসিতেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে তিনি যেমন অধৃষ্য, বন্ধুজনের পক্ষে তেমনই অভিগম্য ছিলেন।—'অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।' সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তাঁহার মুখের কথা ছিল না। তাঁহার প্রাসাদে মহারাজাধিরাজের পার্শ্বে দরিদ্র সাহিত্যসেবী বা কর্ম্মী সমান আসন ও সম্মান লাভ করিতেন। তিনি মতের স্বাতন্ত্র্য দেখিলে আনন্দিত হইতেন। যাঁহারা বহু বিষয়ে তাঁহার মতের বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের মত-স্বাতন্ত্র্যে তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। বাঙ্গালার অনেক স্বর্ণগর্দ্দভ তাঁহার চরণমূলে বসিয়া সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা করিতে পারিত। তাঁহার চরিত্রগত দৃঢ়তা সকল কর্ম্মে পরিস্ফুট হইত। অধ্যবসায়, উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতার প্রভাবে তিনি অত্যন্ত সঙ্কিপ্ত জীবনে সমাজে যে গভীর কর্ম্মরেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ভক্তকবি তুলসীদাস দোঁহায় বলিয়াছেন,—

"তুলসী! যব্ জগ্‌মে আয়ো, জগ্ হসে, তোম্ রোও।
অ্যায়সা করনা করকে চলো, তোম্ হসো, জগ্ রোয়!"

হে তুলসীদাস, তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে, তখন তুমি কাঁদিয়াছিলে;

জগৎ হাসিয়াছিল। এমন কাজ করিয়া চলিয়া যাও যে, যাত্রাকালে তুমি হাসিবে, কিন্তু জগৎ কাঁদিবে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ তুলসীদাসের দোঁহা অন্বর্থ করিয়া বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়া স্বয়ং হাসিতে হাসিতে ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ধন্য, তাঁহার আদর্শ বাঙ্গালায় অক্ষয় হইয়া থাকুক।

বাল্যস্মৃতি।

১

অন্নপ্রাশনের সময় যখন আমার নামকরণ হয়, তখন আমি ঠিক আমি হইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই হউক, আর ঠাকুর্দ্দাদা মহাশয়ের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ দখল না থাকাতেই হউক, আমি 'সুকুমার'। অধিক দিন নহে, দুই চারি বৎসরেই ঠাকুর্দ্দাদা মহাশয় বুঝিলেন যে, নামটার সহিত আমার তেমন মিশ খায় নাই। এখন বার তের বৎসর পরের কথা বলি। অবশ্য আমার এ আত্মপরিচয়ের কথা কেহ ভাল বুঝিতে পারিবেন না তবুও

দেখুন পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী। সেখানে আমি ছেলেবেলা হইতেই আছি। পিতা মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। আমি বড় একটা সেখানে যাইতাম না। ঠাকুরমার নিকট দেশেই থাকিতাম। বাটীতে আমার উপদ্রবের আর সীমা ছিল না। এক কথায় একটি ক্ষুদ্র রাবণ ছিলাম। বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দাদা যখন বলিতেন, 'তুই হলি কি? কারও কথা শুনিসনে। এইবার তোর বাপকে চিঠি লিখব।' আমি অল্প হাসিয়া বলিতাম, "ঠাকুর্দ্দা, সে দিন কাল আর নেই বাপের বাপকেও আমি ভয় করিনে।" ঠাকুরমা কাছে থাকিলে আর ভয় কি? ঠাকুর্দ্দাকে তিনিই বলিতেন, "কেমন উত্তর দিয়াছে—আর লাগবে?"

ঠাকুর্দ্দাদা মহাশয় যদি বড় বিরক্ত হইয়া আমার পিতাকে পত্র লিখিতেন, আমি তখনই তাঁর আফিমের কৌটা লুকাইয়া ফেলিতাম। পরে পত্রখানি না ছিঁড়িয়া ফেলিলে আর কৌটা বাহির করিতাম না। এই সকল উপদ্রবের ভয়ে, বিশেষতঃ মৌতাত সম্বন্ধে বিভ্রাট ঘটে দেখিয়া, তিনি আমাকে আর কিছুই বলিতেন না। আমিও বেশ ছিলাম।

হইলে কি হয়? সকল সুখেরই একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। আমারও তাহাই হইল। ঠাকুর্দ্দাদার খুড়তুত ভাই গোবিন্দ বাবু বরাবর এলাহাবাদে

চাকুরী করিতেন। এখন পেনসন লইয়া তিনি দেশে আসিলেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বি, এ, পাশ করিয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে মেজ দাদা বলি। পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ জানাশুনা ছিল না। তিনি বড় একটা এ অঞ্চলে আসিতেন না; বিশেষতঃ, তাঁহাদের আলাদা বাড়ী; আসিলেও আমার বিশেষ খোঁজ লইতেন না। কখনও দেখা হইলে "কি রে কেমন আছিস? কি পড়িস্?" এই পর্য্যন্ত।

এবার তিনি জাঁকিয়া আসিয়া দেশে বসিলেন। কাজে কাজেই আমার বিশেষ খোঁজ হইল। দুই চারি দিবসের আলাপেই তিনি আমাকে এরূপ বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই আমার ভয় হইত, মুখ শুখাইয়া যাইত, বুক ধড়াস ধড়াস করিত—যেন কত দোষই করিয়াছি, কত শাস্তিই পাইব। আর যথার্থ আমি তখন প্রায়ই দোষী থাকিতাম। সর্ব্বদা একটা না একটা অন্যায় করা আমার চাই। দুটা চারিটা অকর্ম্ম, দুই চারিবার উপদ্রব করা আমার নিত্য কর্ম্ম। ভয় করিলেও আমি দাদাকে বড় ভালবাসিতাম। ভাই ভাইকে যে এত ভালবাসিতে পারে, পূর্ব্বে তাহা আমি জানিতাম না। তিনিও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁর কাছেও কত দোষ করিয়াছি, কিন্তু কিছু বলিতেন না; আর বলিলেও মনে করিতাম, "মেজদাদা ত, একটু পরে আর কিছুই মনে থাকিবে না।"

ইচ্ছা করিলে হয় ত তিনি আমার চরিত্রসংশোধন করিতে পারিতেন; কিন্তু কিছুই করিলেন না। তাঁর দেশে আসাতে আমি পূর্ব্বের মত স্বাধীন নয় বটে, কিন্তু তথাপি যাহা আছি, বেশ আছি।

রোজ ঠাকুর্দ্দাদার এক পয়সার তামাক খাইয়া ফেলি। বুড়ো বেচারী আমার ভয়ে—খাটের খুরোর পাশে, তক্তপোষের পেটের সিন্দুকে, চালের বাতায়, যেখানে তামাক রাখিতেন, আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সবটুকু টানিয়া আনিয়া খাইয়া ফেলিতাম। খাই দাই ঘুড়ি ওড়াই—বেশ আছি। কোনও জঞ্জাল নাই; পড়া শুনা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। পাখী মারিতাম, কাঠবেরাল মারিয়া পোড়াইয়া খাইতাম, বনে বনে গর্ত্তে গর্ত্তে খরগোস খুঁজিয়া বেড়াইতাম—কোনও ভাবনা ভয় ছিল না।

বাবা বর্ম্মায় চাকুরী করিতেন। সে স্থান হইতে আমাকে দেখিতেও আসিতেন না; মারিতেও আসিতেন না। ঠাকুরমা ও ঠাকুর্দ্দাদার হাল পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং, এক কথায়, আমি বেশ ছিলাম।

একদিন দুপুর বেলা বাড়ী আসিয়া ঠাকুরমার নিকট শুনিলাম, আমাকে মেজদাদার সহিত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া একছিলিম তামাকু হাতে করিয়া আসিয়া ঠাকুদ্দাদাকে বলিলাম, "আমাকে কলকাতায় যেতে হবে?" ঠাকুদ্দাদা বলিলেন, "হাঁ।" আমি পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, এ সকল ঠাকুদ্দাদার চালাকী। বলিলাম, "যদি যেতে হয়, আজই যাব।" ঠাকুদ্দাদা হাসিয়া বলিলেন, "সে জন্ম চিন্তা কি দাদা? রজনী আজই কলকাতায় যাবে। বাসা ঠিক হয়ে গেছে—আজই যেতে হবে।" আমি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলাম। একে ত সেদিন ঠাকুদ্দাদার তামাকু খুঁজিয়া পাই নাই—যে এক ছিলিম পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার একটানও হইবে না—তাহার উপর আবার এই কথা! ঠকিয়া গিয়াছি; নিজে নিমন্ত্রণ লইয়া আর ফিরান যায় না। কাজেই সেদিন আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। যাইবার সময় ঠাকুদ্দাদাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম, "হরি, কালই যেন তোমার শ্রাদ্ধে বাড়ী ফিরে আসি। তার পরে আমাকে কে কলিকাতায় পাঠায়, দেখে নেব।"

২

আমি এই প্রথম কলিকাতায় আসিলাম। এত বড় জমকাল সহর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মনে ভাবিলাম, যদি এই প্রকাণ্ড গঙ্গার উপরের কাঠের সাঁকোর মাঝামাঝি, কিংবা ঐ যেখানে একরাশ মাস্তল খাড়া করিয়া জাহাজগুলা দাঁড়াইয়া আছে, সেই বরাবর যদি একবার গুলাইয়া যাই, তাহা হইলে আর কখনও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিব না। কলকাতা আমার একটুও ভাল লাগিল না। এত ভয়ে কি আর ভালবাসা হয়? কখনও যে হইবে, সে ভরসাও করিতে পারিলাম না।

কোথায় গেল আমাদের সেই নদীর ধার, সেই বাঁশঝাড়, মাঠের কতবেল গাছ, মিত্তিরদের বাগানের এক কোণের জামরুল গাছ,—কিছুই নাই। শুধু বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী ঘোড়া, আর লোকজনে ঠেসাঠেসি পেশাপেশি, বড় বড় রাস্তা। বাড়ীর পিছনে এমন একটি বাগান নাই যে, লুকাইয়া এক ছিলিম তামাক খাই। আমার কান্না আসিল। চোখের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলাম, "ভগবান জীবন দিয়েছেন—আহার তিনিই দেবেন।"

কলিকাতায় আসিয়াছি, স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, ভাল করিয়া পড়াশুনা করি,

কাজেকাজেই আমি আজ কাল ভাল ছেলে। দেশে অবশ্যই আমার নাম জাহির হইয়া গিয়াছে—যাউক সে কথা।

আমরা আত্মীয় বন্ধু বান্ধব মিলিয়া একটা মেস্ করিয়া আছি। আমাদের মেসে চারি জন লোক। মেজদাদা, আমি, রাম বাবু ও জগন্নাথ বাবু। রাম বাবু ও জগন্নাথ বাবু মেজদাদার বন্ধু। এতদ্ভিন্ন এক জন ভৃত্য ও এক জন পাচক ব্রাহ্মণ আছে।

গদাধর আমাদের রসুয়ে ব্রাহ্মণ। সে আমা অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড় ছিল। অমন ভাল মানুষ লোক আমি কখনও দেখি নাই। পাড়ার কোনও ছেলের সহিত আমার আলাপ ছিল না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইলেও সে আমার মস্ত বন্ধু হইয়া উঠিল। তাহাতে আমাতে যে কত গল্প হইত, তাহার আর ঠিকানা ছিল না। তাহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলার একটা পল্লীগ্রামে। সেখানকার কথা, তাহার বাল্য ইতিহাস ইত্যাদি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত। সে সব কথা আমি এতবার শুনিয়াছি যে, আমার বোধ হয়, আমাকে সেখানে চোখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত স্থানটা স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি। রবিবারে তাহার সহিত আমি গড়ের মাঠে বেড়াইয়া আসিতাম। সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরে বসিয়া খিল দিয়া দু জনে বিন্তি খেলিতাম। ভাত খাইয়া তার ছোট হুঁকোটিতে দু জনে তামাকু খাইতাম। সব কাজ আমরা দু জনে করিতাম। পাড়ার কাহারও সহিত আলাপ নাই; সঙ্গী, দোস্ত, ইয়ার, বন্ধু, মুচিপাড়ার ভুলো, কেলো, খোকা, খাঁদা—সবই আমার সে। তা'র মুখে আমি কখনও উঁচু কথা শুনি নাই। মিছামিছি সবাই তাহাকে তিরস্কার করিত; আমার গা জ্বালা করিত—কিন্তু সে কোনও কথার উত্তর দিত না—যেন যথার্থ ই দোষ করিয়াছে।

সকলকে আহার করাইয়া সে যখন রান্নাঘরের কোণে একটি ছোট থালায় খাইতে বসিত, তখন আমার শতকর্ম্ম থাকিলেও সেখানে উপস্থিত হইতাম। বেচারীর ভাগ্যে প্রায় কিছুই থাকিত না; এমন কি, ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িত। কাহারও খাইবার সময় আমি থাকি নাই—খাইতে বসিয়া ভাত কম পড়ে, তরকারী কম পড়ে, মাছ কম পড়ে, আমি আগে কখনও দেখি নাই। আমার কেমন কেমন বোধ হইত।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমা মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "ছেলেটা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে দড়ী হয়ে গেছে—আর বাঁচবে না।" আমি

কিন্তু ঠাকুরমার ভোরপেট কিছুতেই খাইতে পারিতাম না। 'শুকাইয়াই' যাই, আর 'দড়ী' হইয়াই যাই, আমার আধপেটাই ভাল লাগিত! এখন কলিকাতায় আসিয়া বুঝিয়াছি, সে 'আধপেটা'য় এ 'আধপেটা'য় অনেক প্রভেদ। কেহ খাইতে না পাইলে যে চোখে জল আসিয়া পড়ে, আমি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। পূর্ব্বে কতবার ঠাকুদ্দাদার পাত্রে উৎসৃষ্ট জল দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিই নাই; ঠাকুরমার গায়ে সারমেয়-সন্তান নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপস্থিত কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিরত করিয়াছি— তাঁহাদেরও আহার হয় নাই; কিন্তু চোখে কখনও জল আসে নাই। পিতামহ, পিতামহী, আপনার লোক—গুরুজন, আমাকে স্নেহ করেন—তাঁহাদের জন্য কখনও দুঃখ হয় নাই; স্বইচ্ছায় তাঁহাদিগকে অর্দ্ধভুক্ত, এমন কি, অভুক্ত রাখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আর এই গদাধর কোথাকার কে—তাহার জন্য অনাহূত অশ্রু আপনি আসিয়া পড়ে!

কলিকাতায় আসিয়া যে আমার কি হইল, তাহা ঠিক ঠাওরাইতে পারি না। চোখে এত জলই বা কোথা হইতে আসে, ভাবিয়া পাই না। আমাকে কেহ কাঁদিতে দেখে নাই। জিদ করিয়া আস্ত খেজুরের ছড়ি আমার পৃষ্ঠে ভগ্ন করিয়াও বাল্যকালে গুরুমহাশয় তাঁহার সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ছেলেরা বলিত, "সুকুমারের গা ঠিক পাথরের মত।" আমি মনে মনে বলিতাম, "গা পাথরের মত নয়—মন পাথরের মত। কচি খোকার মত কাঁদিয়া ফেলি না।" বাস্তবিক কাঁদিতে আমার লজ্জা বোধ হইত; এখনও হয়; কিন্তু সামলাইতে পারি না। লুকাইয়া, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, চোরের চুরী করার মত—দুবার চক্ষু মুছিয়া ফেলি। স্কুলে পড়িতে যাই, এক পাল লোক ভিক্ষা করিতেছে। কাহারও হাত নাই, কাহারও পা নাই, কাহারও চক্ষু দুটি নাই, এমনই কত-কি-নাই-ধরণের লোক দেখি, তাহা আর বলিতে পারি না। তিলক কাটিয়া খঞ্জনী হাতে লইয়া "জয় রাধে" বলিয়া ভিক্ষা করে, তাহাই জানি—এ সব ভিখারী আবার কি রকমের? মনের দুঃখে মনে মনেই বলিতাম, "ঠাকুর! এদের আমাদের দেশে পাঠিয়ে দাও।" যাক্, পোড়া ভিখারীর কথা—আমার কথা বলি। চক্ষু অনেকটা সড়গড় হইলেও আমি একেবারে বিদ্যাসাগর হইতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের মা সরস্বতী যে কোথা হইতে আসিয়া আমার স্কন্ধদেশে ভর করিতেন, বলিতে পারি না। তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিতাম,

তজ্জন্য এখনও আমার সে সরস্বতীর উপর ঘৃণা হইয়া আছে। বাসায় কাহার কি অনিষ্ট করিব, সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়াইতাম। রাম বাবু তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার দেশী কালাপেড়ে কাপড় কুঞ্চিত করিলেন;—বিকালে বেড়াইতে যাইবেন; আমি অবসর বুঝিয়া কাপড়খানি খুলিয়া টানিয়া প্রায় সোজা করিয়া রাখিয়া দিলাম। তিনি বিকালে বস্ত্রখানির অবস্থা দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার আর আমোদ ধরে না। জগন্নাথ বাবুর আফিসের বেলা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি আহার করিতে বসিয়াছেন, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিতেছে না। আমি সময় বুঝিয়া তাঁহার চাপকানের বোতামগুলি সমস্ত কাটিয়া লইলাম। স্কুল যাইবার সময় একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেলাম, জগন্নাথ বাবু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছেন। মনের আনন্দে আমি সমস্ত পথ হাসিতে হাসিতে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় জগন্নাথ বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “আমার চাপকানের বোতামগুলো গদা বেটা চুরী করে বেচে ফেলেছে—বেটাকে তাড়িয়ে দাও।” জগন্নাথ বাবুর চাপকানের বিবরণে দাদা ও রামবাবু উভয়েই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। মেজদাদা বলিলেন, “কত রকমের চোর আছে, কিন্তু চাপকানের বোতাম চুরী করে বেচে ফেলতে কখনও শুনিনি।” জগন্নাথ বাবু এ কথায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“বেটা বোতামগুলো সকালে নিলে না, বিকালে নিলে না, রাত্রে নিলে না;—ঠিক আফিস যাবার আগেই নিয়েছে। আজ দুর্গতির একশেষ করেছে—একটা কালো ছেঁড়া পিরান গায়ে দিয়ে আমাকে আফিস যেতে হয়েছে।”

সকলেই হাসিলেন। জগন্নাথ বাবুও হাসিলেন। কিন্তু আমি হাসিতে পারিলাম না। মনে ভয় হইল, পাছে গদাধরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সে যে নির্ব্বোধ, হয় ত কোনও কথা বলিবে না, সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইবে।

কে বোতাম লইয়াছে, মেজ দাদা হয় ত বুঝিয়াছিলেন। গরীব গদাধরের উপর কোনও জুলুম হইল না। কিন্তু আমিও সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিয়া অন্যকে বিপন্ন করিব না।

এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ব্বে কখনও করি নাই; কখনও করিতাম কি না, জানি না; শুধু গদাধর আমাকে একেবারে মাটী করিয়া দিয়াছে।

কি উপায়ে কাহার যে চরিত্র সংশোধিত হইয়া যায়, কেহই জানে না।

গুরু মহাশয়ের, ঠাকুর্দ্দাদা মহাশয়ের, আরও অনেক মহাশয়ের কত চেষ্টাতেও আমি যে প্রতিজ্ঞা কখনও করি নাই, এক গদাধর ঠাকুরের মুখ মনে করিয়া আজ সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম। এত দিনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে কি না, জানি না ; কিন্তু স্বেচ্ছায় কখনও ভঙ্গ করিয়াছি, এমন মনে হয় না।

এখন আর এক জন লোকের কথা বলি। সে আমাদের রামা চাকর। রামা জাতে কয়েত কি সৎগোপ, এমনই কি একটা ছিল। বাড়ী কোথায়, শুনি নাই—এত হুঁসিয়ার চট্‌পটে চাকর সর্ব্বদা দেখা যায় না। আর যদি কখনও দেখা হয়, ইচ্ছা আছে, তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।

সকল কর্ম্মে রামকে চরকীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। এই রামা কাপড় কাচিতেছে ; তখনই দেখি, মেজদাদা স্নানে বসিয়াছেন, সে গা রগড়াইয়া দিতেছে ; পরক্ষণেই দেখি, সে পান সুপারি লইয়া মহা ব্যস্ত ! এই রূপে সে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়। মেজদাদার "The favourite"; মস্ত লোক। আমি কিন্তু তাহাকে দেখিতে পারিতাম না। সে বেটার জন্য আমি মেজদাদার নিকট প্রায়ই তিরস্কৃত হইতাম। বিশেষতঃ, গদা বেচারীকে সে সর্ব্বদাই অপ্রস্তুত করিত। আমি তাহার উপর বড় চটা ছিলাম ; কিন্তু হইলে কি হয়, সে মেজদাদার "The favourite" !

আমাদের বাসার রামবাবুও তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "The Rogue"। তখন এ কথাটার ব্যাখ্যা তিনি নিজে না করিতে পারিলেও, আমরা দু জনে বিলক্ষণ বুঝিতাম, "রামা The Rogue"। তাঁহার চটিবার আরও অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, সে নিজেকে রাম বাবু বলিয়া পরিচিত করিত। মেজদাদাও সময়ে সময়ে রাম বাবু বলিয়া ডাকিতেন—আমাদের রাম বাবুর এ সব ভাল লাগিত না। যাক্ বাজে কথা—

একদিন বিকালে মেজদাদা একটা ল্যাম্প ক্রয় করিয়া আনিলেন। বড় ভাল জিনিস, প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা মূল্য। সকলে বেড়াইতে যাইলে আমি গদাধরকে ডাকিয়া আনিয়া সেটা দেখাইলাম। গদাধর সে রকম আলো কখনও দেখে নাই। সে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেটা দুই চারি বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল ; তাহার পর আপনার কর্ম্মে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। আমার কিন্তু curiosity কিছুতেই থামিল না। কি করিয়া চিমনী খুলি ? কি করিয়া

সাগর--মায়া।

চিত্রকর রসেটী।

Mohila Press.

ভিতরের কল দেখি! অনেক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, অনেকবার ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই খুলিল না। অনেক observation-এর পরে দেখিলাম, নীচে একটা ইষ্ক্রু আছে; অগত্যা সেটা ঘোরাইলাম। কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর হঠাৎ একেবারে lampeএর আধখানা খসিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ভাল ধরিতে পারিলাম না, উপরের কাঁচগুলা টেবিল হইতে নীচে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

৩

সে দিন অনেক রাত্রে আমি বেড়াইয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়া উঠিয়াছে। গদাধরকে মাঝ-খানে লইয়া সকলে গোল হইয়া বসিয়াছে। মেজদাদা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। গদাধরের জেরা চলিতেছে।

গদাধরের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। বলিতেছে, "বাবু, আমি ওটা ছুঁয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাঙ্গিনি। সুকুমার বাবু আমাকে দেখালেন আমিও দেখ্‌লাম। তার পর তিনিও বেড়াতে গেলেন, আমিও রাঁধতে গেলাম।"

কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সাব্যস্ত হইয়া গেল, সে-ই চিমনী ভাঙ্গিয়াছে। তাহার মাহিয়ানা বাকী ছিল; সেই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা দিয়া আবার নূতন চিমনী আসিল। সন্ধ্যার সময় যখন আলো জ্বলিল, তখন সকলেই বেশ প্রফুল্ল হইল, সুধু আমার চক্ষু দুটো জ্বালা করিতে লাগিল। সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল, তাহার মাতার তিন টাকা আমি চুরী করিয়া লইয়াছি। আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া কোনও রূপে মেজদাদার মত করিয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, ঠাকুরমার নিকট হইতে টাকা আনিয়া গোপনে সাড়ে তিন টাকার পরিবর্ত্তে গদাধরকে সাত টাকা দিব। আমার নিজের কাছে তখন টাকা ছিল না। সব টাকা মেজদাদার নিকট ছিল। কাজেই টাকা আনিতে আমাকে দেশে আসিতে হইল। মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, এক দিনের অধিক থাকিব না। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যদিও ঠাকুর্দ্দাদার শ্রাদ্ধের তখনও বিলম্ব ছিল, তথাপি আমার সাত আট দিন দেশে কটিয়া গেল।

. সাত আট দিন পরে আবার কলিকাতার বাসায় ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই ডাকিলাম, "গদা!" কেহ উত্তর দিল না। আবার ডাকিলাম, "গদাধর

ঠাকুর!" কোনও উত্তর নাই। "গদা!" এবার রামচরণ আসিয়া বলিল, "ছোট বাবু, কখন এলেন?"

"এই আসছি—ঠাকুর কোথায়?"

"ঠাকুর নেই।"

"কোথায় গেছে?"

"বাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"তাড়িয়ে দিয়েছেন? কেন?"

"চুরী ক'রে ছিল বলে'।"

প্রথমে কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই, তাই কিছুক্ষণ রামার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। রাম আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ছোটবাবু আশ্চর্য্য হচ্চেন, কিন্তু তাকে ত আপনারা চিন্‌তেন না। তাই অত ভালবাসতেন। সে মিটমিটে ডান ছিল; ভিজে বেরালকে কেবল আমিই চিন্‌তাম।"

কিসে সে মিটমিটে ডাইন ছিল, কিংবা কেন যে সেই সিক্ত মার্জ্জারকে চিনিতে পারি নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার টাকা চুরী করেছে?"

"মেজ বাবুর।"

"কোথায় ছিল?"

"জামার পকেটে।"

"কত টাকা?"

"চার টাকা।"

"কে দেখেছে?"

"চোখ দিয়ে কেউ দেখেনি বটে, কিন্তু সে একরকম দেখাই।"

"কেন?"

"সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা কত্তে হয়! আপনি বাসায় ছিলেন না; রাম বাবু নিলেন না; জগন্নাথ বাবু নিলেন না; আমি নিলাম না। তবে নিলে কে?—কোথায় গেল?"

"তুই তবে তাকে ধরেছিস?"

রাম হাসিয়া বলিল, "না হলে আর কে?"

ঠনঠনের চটী জুতা আপনারা স্বচ্ছন্দে কিনিতে পারেন। তেমন মজবুত চটী জুতা বোধ হয় আর কোথাও প্রস্তুত হয় না।

৪

আমি রন্ধনশালায় গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সেই ছোট কলি হুঁকাটিতে ধূলা পড়িয়া রহিয়াছে। আজ চারি পাঁচ দিন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই; কেহ জল বদলায় নাই। দেয়ালে এক স্থানে কয়লায় লেখা রহিয়াছে—"সুকুমার বাবু, আমি চুরী করিয়াছি। এ স্থান হইতে চলিলাম। বাঁচিয়া থাকি, আবার আসিব।"

আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। নিতান্ত ছেলে বুদ্ধিতে সেই হুঁকাটিকে বুকে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন যে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

আমার আর সে বাসাতে মন টিকিত না। সন্ধ্যার সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতাম। আর এক জন রাঁধিতেছে দেখিয়া অন্যমনে আপনার ঘরে আসিয়া বৈ খুলিয়া পড়িতে বসিতাম। সময়ে সময়ে আমার মেজ দাদাকেও দেখিতে পাইতাম না। ভাত পর্য্যন্ত আমার তিক্ত বোধ হইত। অনেক দিন পরে একদিন রাত্রে দাদাকে বলিলাম, "মেজদা! কি করেছ?"

"কিসের কি করেছি?"

"গদা তোমার টাকা কখনও চুরী করেনি।" সকলেই জানিত, আমি গদা ঠাকুরকে বড় ভালবাসিতাম। মেজদাদা বলিলেন, "ভাল করিনি সুকুমার। যা হইবার হয়েছে, কিন্তু রামাকে তুই অত মেরেছিলি কেন?"

"বেশ করেছিলাম। আমাকেও কি তাড়াবে নাকি?"

দাদা আমার মুখে কখনও অমন কথা শোনেন নি। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কত টাকা উসুল হয়েছে?" দাদা বড় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ভাল করিনি। সব টাকা তার কেটে নিয়ে আড়াই টাকা উসুল করেছিলাম। আমার এতটা ইচ্ছা ছিল না।"

আমি যখন তখন রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। দূরে যদি কোনও লোক ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া ছেঁড়া চটী জুতা পায়ে চলিয়া যাইত, আমি দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিতাম। কি যে একটা আশা নিত্য নিত্য নিরাশায় পরিণত হইত, তা আর কি বলিব?

প্রায় পাঁচ মাস পরে দাদার নামে একটা মনি-অর্ডার আসিল। দেড়

টাকার মনি-অর্ডার। দাদাকে আমি সেই দিন চোখের জল মুছিতে দেখি। সে কুপনটা এখনও আমার নিকট আছে।

কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই গরীব গদাধর-ঠাকুর আমার বুকের আধখানা জুড়িয়া বসিয়া আছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্যে ধর্ম্ম।

বিলাতের অক্সফোর্ডের বিশপ সাহিত্যে ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিয়া একটা সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপের উন্নত সাহিত্য খৃষ্টানধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছে, তাই আর সাহিত্যে প্রাণ নাই, সে ভাবোন্মাদনা নাই। ধর্ম্ম অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা; যাহা দেখি নাই, দেখিতে পারি না ও জানি না, অথচ যাহা জানিবার বাসনা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতর হইয়া উঠে, যাহার প্রভাব জীবনযাত্রার প্রতিপদে বুঝিতে পারি—অনুমান করিতে পারি, ধর্ম্ম তাহারই ঈক্ষণ-যন্ত্র যোগাইয়া দেয়, মানবকে সেই অজ্ঞাত পথে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করে। কাব্য-সাহিত্য ধর্ম্মের এই ঈক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে অজ্ঞাতের এক অপূর্ব্ব আলেখ্য রচনা করে। সেই আলেখ্য দেখিয়া মানব-হৃদয় অতি-প্রাকৃতের দিকে ধাবিত হয়, ভাবের স্তরান্তরে উন্নীত হয়। ইহার ফলে মনে, হৃদয়ে, বুদ্ধিতে চিত্তে সজীবতা উপস্থিত হয়; মেধা ও মনীষা সংসারের মোটা (solid) কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া কল্পনার মাধুরীতে ডুবিয়া যায়। তখন মানুষের পাপকার্য্যে সঙ্কোচ বোধ হয়, স্থূল বা দেহগত স্বার্থপরতায় মানুষ আর বিভোর থাকে না। রক্তমাংসের জবরদস্তি একপ্রকার অপরিহার্য্য; ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টির লালসা অতিক্রম করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধর্ম্ম মানুষকে এই রক্তমাংসের জবরদস্তি হইতে, এই দেহসুখের লালসা হইতে ভাবের পবনস্তরে উপরে—সংসারের পঙ্ক হইতে অতি উচ্চে—উন্নীত করিয়া থাকে। কাব্য-সাহিত্য এই উন্নয়ন-ক্রিয়াকে মধুময়, শোভাময়, সুখময়, সুধাময় করিয়া দেয়। গতিকেই কাব্য-সাহিত্যের

বনীয়াদে ধর্ম্ম থাকিতেই হইবে। ধর্ম্ম জাতিবিশেষের সাহিত্যের বিশিষ্টতার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। খৃষ্টান জাতির সাহিত্য খৃষ্টানধর্ম্মমূলক, মোসলেম জাতির সাহিত্য ইসলামধর্ম্মবিমণ্ডিত, হিন্দুর সাহিত্য তেমনই ঋষিমুনির ধর্ম্মে ও ভাবে ওতঃপ্রোত। তাই মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্ট, দান্তের ইনফার্নো, লেসিঙ্গের লেওকুন বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠাপিত; তাই সেক্সপীয়র, গেটে, আল্‌ফাইয়ারী, পেত্রার্ক, বায়রণ, কীট্‌স্, শেলী, টেনিসন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শীলার, হীন, টলষ্টি প্রভৃতি কবিগণ খৃষ্টান ভাবে বিভোর হইয়া, বাইবেল-সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য্য করিয়া কাব্যগাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের সকল দেশের সাহিত্য এই ধর্ম্মভাবে সঞ্জীবিত ছিল। ইউরোপের গদ্য পদ্য নানা ভাবে এই ধর্ম্মের ধ্বনি করিত; এখনও সে ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে; পরন্তু দিনে দিনে সে ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে, বুঝি বা অচিরে ধর্ম্মের এই ঝঙ্কার আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না। এই ধ্বনি ক্ষীণ হইতেছে বলিয়া ইউরোপের সাহিত্যে পূর্ব্বেকার মতন সে ভাবোন্মাদনা নাই, কাব্যের সে অতিপ্রাকৃত, অনৈসর্গিক ঝঙ্কার নাই, সাহিত্যে সে অপরিজ্ঞাতের আহ্বান নাই। ফলে, ইউরোপের সাহিত্যের অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে; তেমন কবি ও কাব্যের প্রকাশ হইতেছে না।

কেন এমন হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশপ মহোদয় বলিতেছেন যে, পদার্থতত্ত্বের বা সায়ান্সের চর্চ্চা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়াতে, দেহসুখের পুষ্টি ও বিস্তৃতি উদ্দেশ্যে লোকমনীষা কেবল ব্যাপৃত থাকাতে,সাহিত্যে এবংবিধ নাস্তিকতার সূচনা হইয়াছে, জাতির ভাব ও কল্পনা জড়তা ও স্থবিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, কেবল পদার্থতত্ত্বের সাধনা করিতেছেন। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্ সায়ান্সের সাহায্যে কেবল মানুষ মারিবার নানাবিধ কলকব্জার আবিষ্কার করিতেছেন, সামরিকগণের জিগীষার পুষ্টি করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্ রসায়ন ও পদার্থ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া এমন সকল উপায়ের উদ্ভাবন করিতেছেন, যাহার প্রভাবে অর্থোপার্জ্জন সুকর হইতেছে, ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তৃতিসাধন হইতেছে। উভয়পক্ষেরই সাধনার কেন্দ্র হইল—মনুষ্য-দেহ। এই মানবদেহের ষড়রিপুর মুখে ইঁহারা নানাবিধ অপূর্ব্ব ইন্ধন যোগাইতেছেন কোটীবিধ প্রকারের বিলাসের উপচার উদ্ভাবিত হইতেছে; দেহসুখের উপাদান যেন প্রকৃতিকে মথিত করিয়া—দোহন করিয়া বাহির করা হইতেছে। জাতির

মধ্যে যাহারা মনীষী ও মনস্বী, তাহাদের মেধা ও বুদ্ধি যদি কেবল দেহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে, জাতিগত লোকসাধারণের দৃষ্টি পরলোকের দিকে বিসর্পিত হয় না; সামাজিকগণ কেবল ইহকাল লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহাই হইল ধর্ম্মের বিরূপ গতি। ধর্ম্ম-দেহটাকে উপেক্ষা করিতে বলে, ইহকালকে কর্ম্মাবসর বলিয়া পরকালের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে বলে। ফলে, আধুনিক সায়াজ্ঞ-প্রাধান্যভাব ধর্ম্মের বিরোধী ভাব। একের বিস্তারে অপরের সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী। দেহসুখ লইয়া এতটা বিব্রত থাকিলে মানুষ ভাবের ঘোরে কল্পনার বিস্তার ঘটাইতে পারে না। দেহপরায়ণ জাতির মধ্যে কবি ও কাব্যের, ভাব ও ভাবুকের উদ্ভব হইতে পারে না। যে দেশে ও যে জাতির মধ্যে ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টির জন্য সকলেই বিব্রত থাকে, সে দেশে ও সে জাতির মধ্যে নাস্তিকতার প্রাবল্য ঘটিবেই। কঠোর নাস্তিকের কল্পনা নাই, কঠোর ও ভোগী নাস্তিক কাব্য-সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারে না। ইউরোপে নাস্তিকতা ও বিলাসের অতিবিস্তার ঘটিয়াছে বলিয়া কাব্য-সাহিত্যের অপচয় হইতেছে; ভাবের উৎস বিশীর্ণ ও শুষ্কপ্রায় হইয়া যাইতেছে।

এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বিশপ মহোদয় দেখাইতেছেন যে, আধুনিক ইংলণ্ডের সাহিত্য শুষ্ক সুবিধাবাদের ও উপযোগিতার সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবেলার্ড হেলোয়সের প্রেমে ও রিরংসায় সুবিধাবাদ ছিল না, তাই সে প্রেমের দ্বারে নায়ক ও নায়িকা জীবনব্যাপী দেহসুখকে বলিদান দিতে পারিয়াছিল; কেন না, আবেলার্ড হিলোয়স উভয়েই খাঁটী খৃষ্টান ছিলেন, সমাজ খৃষ্টান ছিল, সমাজের দৃষ্টি পরলোকের উপর নিবদ্ধ ছিল। তাই রক্তমাংসের জবরদস্তিতে উন্মত্ত হইলেও, উভয়ে দেহসুখকে বলিদান করিতে পারিয়াছিল। আর আধুনিক উপন্যাস-লেখকদিগের উপন্যাস দেখ; জোলা হইতে ভিক্টোরিয়া ক্রস পর্য্যন্ত সকলের উপন্যাস পড়িয়া দেখ দেখি, —দেখিবে কেবল সুবিধাবাদ, কেবল উপযোগিতার আদর, কেবল মোটা দেহটার মাংস শোণিত লইয়া নাড়া চাড়া। ভাব নাই, ভাবুকতা নাই, ত্যাগ নাই, সংযম নাই। এখনকার কবি ত পরকাল মানে না, সে ত্যাগের আদর্শ দেখাইবে কোন ভাব-ক্ষেত্রের উপরে? বড় জোর সে লোকহিতের আদর্শ ফুটাইতে পারে, পরন্তু সে আদর্শ ব্যষ্টিগত আদর্শ, ইহকাল লইয়া বিব্রত আদর্শ; তাহার মোহিনী শক্তি নাই, আকর্ষণের প্রভাব নাই। লোক তাহা

দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। প্রটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রথম উদ্ভবকালে ইউরোপের নর নারী ধর্ম্মের জন্য অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পরকালের ঐশ্বর্য্যের জন্য হেলায় অগ্নি-কুণ্ডে দেহ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাই প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম দাবানলের ন্যায় ইউ-রোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সমাজ নূতন ঢঙ্গে নূতন ভঙ্গীতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর এখন আকাশে উড়িবার জন্য, চাতুরীপ্রভাবে পররাজ্য গ্রহণ করিবার লালসায় ইউরোপের বিদ্বান ও বিদুষী সকল হেলায় দেহ বিসর্জ্জন করিতেছে; তাহার ফলে ইউরোপে বিলাসের বাড়বানল বিস্তীর্ণ হইতেছে, সোসিয়ালিষ্ট, সফ্রাজিষ্ট, এনার্কিষ্ট প্রভৃতির প্রভাব বাড়িতেছে, ঈর্ষ্যানলে সমাজ-শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে। এমন যুগে ভাবময় সাহিত্যের পুষ্টি হয় না, এমন যুগে কল্পনার বালাংশু ভাববাষ্পের উপর সপ্তবর্ণের ইন্দ্রধনু রচনা করিতে পারে না। এ কাল তৃপ্তির কাল নহে, তৃষ্ণার কাল; বিশ্বাসীর স্বর্গ এ কালে দেখিতে পাইবে না, ট্যাণ্টেলসের অতৃপ্তির—বিষম পিপাসার নরক এ কালে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

ইহাই বিশপের অভিভাষণের সারাংশ। একবার, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কার্দিন্যাল্ নিউম্যান এই সিদ্ধান্তের কথা সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করিয়া-ছিলেন। সে ব্যাখ্যানের মর্ম্ম নানা ভাবে এই সাহিত্যেই প্রকাশ করিয়াছি। আজ উহারই এক সমর্থক মত বঙ্গীয় বিবুধমণ্ডলীকে উপঢৌকন দিলাম। এই এই সিদ্ধান্তের নিকষে কষিয়া পূর্ব্বে একবার দেখাইয়াছিলাম যে, ইউরোপীয়-সভ্যতা-সঙ্ঘাত-জাত, ইংলণ্ডীয়-বিদ্যা-সংস্পর্শ-জাত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য চিরস্থায়ী হইয়া এ দেশে টিকিবে না। কারণ, উহার ধর্ম্ম নাই, দেশীয় বিশিষ্ট-তার সহিত উহার সামঞ্জস্য নাই। দেশের লোক উহাকে আপনার করিয়া গ্রহণ করে নাই, দেশের লোকের মতি গতি, ভাব ও ভাবনা উহার দ্বারা পরিচালিত নহে। ঐ সাহিত্য খোস খেয়ালের সাহিত্য, সখের সামগ্রী, অনু-চিকীর্ষার ফল, ইউরোপীয় মনীষার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সন্তান। তাই মাইকেল বাঙ্গালার মিল্টন ও দান্তে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার স্যর ওয়াল্টার স্কট, নবীনচন্দ্র বাঙ্গালার বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার শেলী ও কীট্‌স্। বস্তুতঃ ইঁহাদের কাব্যগাথায় ইংলণ্ডের কাব্যসুন্দরীর অঞ্চলের ছায়া পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন এ দেশে ইংরেজী লেখাপড়ার চর্চ্চা প্রবল থাকিবে, ততদিন সম্প্রদায় বিশেষে এ সাহিত্যের চর্চ্চা অল্পবিস্তর ভাবে থাকিবে। পরন্তু ইংলণ্ডে যে কারণে মিল্টন দান্তের, সেক্সপীয়ার বায়রণের পঠনপাঠন সঙ্কুচিত

হইয়া আসিতেছে, সেই কারণের জন্যই বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেঘনাদ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র আদি কাব্যের রীতিমত পঠনপাঠন বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইউরোপের বিলাস-জোয়ারের ঢেউ লাগিয়া বাঙ্গালীও দেহসুখী ও ইহকালপরায়ণ হইতেছে। যে সকল কাব্যে সেই অজ্ঞেয়র আলেখ্য চিত্রিত আছে, সেই পরলোকের পথ দেখান আছে, সে সকল কাব্যের আদর ত দেহবিলাসীর সমাজে হইবে না। তাই এখন লালসার ভাবপূর্ণ কদর্য্য পুস্তক সকলের কাট্তি বাড়িয়াছে। প্রেমপ্রধান নাটক নভেলের আদর হইয়াছে। অনেক বাঙ্গালী কারিকর ইংলণ্ডের বিলাস-পুরীষপূর্ণ সাহিত্যপ্রবাহকে বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালিয়া ঈপ্সিত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। এখনকার সাহিত্যের মাপকাঠী টাকা। টাকার মাপকাঠীতে মাপিয়া যাহার নির্ম্মাণ হয়, তাহা স্থায়ী হয় না। ইউরোপের Realism বা দেহবিলাসী লেখকদিগের প্রতিভার প্রভাব উষ্ণবায়ুর মত একবার করিয়া সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, পরে সে প্রতিভা বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। বিশেষতঃ, মেকী টিকে না; নকলনবীশের চেষ্টা প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকার মত সূর্য্যোদয়ে অপনীত হয়ই; তবে আমরা যতই করি না কেন, বাঙ্গালীত্ব ত পরিহার করিতে পারিব না। আমাদের সাহিত্যে যেটুকু দেশের ও জাতির বিশিষ্টতাসংযুক্ত, তাহাতে আবার প্রতিভার ছাপ থাকিলে, তাহাই হয় ত রহিয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, এই কথাটা লইয়া একটু আলোচনা হইলে ভাল হয়। আমাদের বিশিষ্টতা কি, এবং কিসে সংগুপ্ত রহিয়াছে, ইংরেজী নবীশ আমরা, এই আলোচনার ফলে সেইটুকু বুঝিতে পারিব। এমন বোধোদয়ে লাভ আছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—অগ্রহায়ণ। প্রথমেই শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের অঙ্কিত "বিরহিণী সীতা" নামক একখানি ত্রিবর্ণে মুদ্রিত সুদর্শন চিত্র। 'ভারতী' 'ভারতীয় চিত্রকলা'র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কলে সনাতন চিত্রের আবির্ভাব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে সত্যের জয়ই সূচিত হইতেছে। এই চিত্রখানি ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় ইহার পুনরাবির্ভাব দেখিলাম। কিন্তু সম্পাদিকা কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই।—সীতার আদর্শ অতুলনীয়। ভারতের যে চিত্রকর, যে ভাস্কর কলায় সেই মহনীয় আদর্শ ফুটাইতে পারিবেন, তিনি অমর হইবেন। পূর্ণবাবুর 'বিরহিণী সীতা' সে উচ্চ আদর্শের অনুরূপ না হউক, ইহাতে অঙ্কনপটুতা ও বর্ণবিন্যাস-নিপুণতার পরিচয় আছে। সীতার মুখে ভাবের অভিব্যক্তি আছে; নয়নযুগলে বিষাদের ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবীন চিত্রকরের শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। সেই শক্তি সাধনায় বিকশিত ও উপচিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সূত্রপাত' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি উপভোগ্য। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর "বৈজ্ঞানিক জীবনী—গেলিলিও" উল্লেখযোগ্য।—"জীবনী"র অপব্যবহার না করিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। চরিত প্রভৃতি শব্দগুলিকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া অনধিকারী শব্দগুলিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রবৃত্তি আজ কাল একটু প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক এক জন কবি 'সন্ধ্যা' নাম দিয়া শব্দ-শম্বূকের এক ছড়া মালা গাঁথিয়াছেন, এবং লাউ-মাচার হাঁড়ী-মস্তক, বাগারী-কর-পদ ভূতের কণ্ঠকে বঞ্চিত করিয়া ভারতীর কম্বুকণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন। 'ক্ষীণ দীপ্তিরাশি' যখন 'বগড়াবাঁটী খেলিতেছিল', সেই সময়ে 'ও পারে ঐ কনক আলো তলিয়ে গেল জলে!' তার পর 'ঝুঁকিয়া পড়ে পিশাচী নিশি লুণ্ঠিতারি গায়' সন্ধ্যার 'তৃষণরাশি' হরণ করিল! এমন পিশাচী কল্পনা ত কখনও দেখি নাই! পূর্ব্বকালে কবিত্ব দুর্লভ ছিল, এখন অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে। একটা বেগুনের দাম দুই পয়সা দিতে হয়, কিন্তু এক পয়সায় এক গণ্ডা 'কবি' পাওয়া যায়! 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' শায়েস্তা খাঁর মত কবিকুঞ্জের তোরণে এ কথা সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে পারেন। তাঁহাদের কল্যাণেই কবি ও কবিতা এত সস্তা হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? 'বালিকা ও সন্ধ্যাতারা' এই শ্রেণীর আর একটি 'কবিতা'। শ্রীআমোদিনী ঘোষজায়ার 'মনুষ্যত্বের সাধনা' আলোচনার যোগ্য। শ্রীপ্রিয়ংবদা দেবীর 'শরতে' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি রমণীয়।—'সরিষা ফুলের সোনার আঁচল দূরে দিগন্তে লোটে'—সুন্দর! শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'সনেটে' চারিটি সনেট আছে। চারিটিই সুন্দর; কিন্তু 'ভর্তৃহরি' ও 'পত্রলেখা' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।—কল্পনায় এমন লীলা সর্ব্বদা দেখা যায় না। প্রমথবাবু চিন্তাশীল ও সুলেখক, রসিক ও ভাবুক, তাহা জানিতাম। কিন্তু তিনি এমন সুকবি, তাহা অকস্মাৎ চোখে পড়িয়া গেল। ইহা নূতন আবিষ্কার, এবং আশাপ্রদ আবিষ্কার! কবিকুঞ্জে এখন কেবল কবিবর বড়ালের সাধা বাঁশীর মোহন তান শুনিতে পাই। তা ছাড়া

অধিকাংশই কাঠ্‌ঠোকরা কবি। বাঙ্গালার পত্তকবিতার ক্ষেতে কেবল রসুন পেঁয়াজের আবাদ চলিতেছে! তাহার চাষেও কি ছাই হবু-কবিদের অভিজ্ঞতা আছে। আনাড়ী চাষার আওলাতে যাহা ফলে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ফলিতেছে। এমন কবিতা দেখিলে ভয় হয়। এই দুঃসময়ে প্রমথ বাবুর কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত—আশান্বিত হইয়াছি। তিনি গতানুগতিক নহেন। তাঁহার কল্পনা স্বচ্ছন্দচারিণী ;—রঙ্গমঞ্চের ডানাকাটা পরী নহে। ভাষায় অনাবশ্যক বাহুল্যের আবিলতা নাই, তাহার অবাধগতি ও স্বচ্ছন্দ-লীলার পূর্ণ ছায়া প্রকটিত হইতেছে। 'পত্রলেখা'য় কবি চতুর্দ্দশটি রেখায় যে রমণীর ছবিখানি আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা বাণভট্ট দেখিলেও তৃপ্ত হইতেন। কবি ভর্তৃহরিকে বলিয়াছেন,—

> 'যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজকবি,
> দেখেছ কখন বিশ্ব শুধু নারীময়,
> আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়,
> সুবর্ণে গৈরিকে আঁকো সেই দুই ছবি।'

ইহা ভাবুকের উপভোগ্য। কবি 'সুবর্ণে গৈরিকে' ভর্তৃহরির ছবি আঁকিয়া অল্পে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'পত্রলেখা'য়—

> 'অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্র যায় দূরদেশ,
> অঙ্গে তার আঁকা তুমি বিদ্যুতের রেখা!'

সুন্দর ; কল্পনা-প্রাচুর্য্যের পরিচায়ক। মিলেও কবির বিলক্ষণ অধিকার। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঙ্গীত' নামক প্রবন্ধের অধিকাংশই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, এবং এই অঘটন-ঘটনায় একটু বিস্মিত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর একচেটে ও মামুলী 'প্রাণশক্তি' প্রভৃতির 'সঙ্গীতে' অভাব নাই বটে, তবুও ইহা বুঝা যায়। কবিবর এ দেশের শিক্ষায়তন-সমূহে ও সমাজে কলাবিদ্যাকে স্থান দিতে বলিয়াছেন। রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুরের 'শরীর-স্বাস্থ্যবিধান' বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা'য় অনেক তথ্যের সমাবেশ আছে। সেকালের ছবিগুলি দেখিতে ভাল লাগে।

স্বাস্থ্য-সমাচার।—অগ্রহায়ণ। ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু 'স্বাস্থ্য-সমাচার' প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই পত্র আমাদের সমাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। 'অন্নযৌক্তি' নামক প্রবন্ধে লেখক যে উপদেশ দিয়াছেন, এই অজীর্ণ-জীর্ণ দেশের অধিবাসীদিগের তাহা অনুশীলনযোগ্য। 'আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা', 'অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা', 'থুতুফেলা', 'যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসাতে বিশ্রামের আবশ্যকতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ দেশ কালের উপযোগী, সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য। 'বিবিধ সংগ্রহে' নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন,—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' আমরা তাহা ভুলিয়াছি। গ্রাম্য জ্ঞানী 'প্রবচনে' উপদেশ দিয়াছিলেন,—'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। আমরা তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা ৺কংগ্রেসের পিণ্ড দিতেছি। বক্তৃতারঙ্গকে ছানিয়া ছাঁকিয়া পিষিয়া প্রকাণ্ড

ভারতের বোঝা করিতেছি। কেবল বাঁচিবার, বাঁচিয়া থাকিবার, সুস্থ বংশধরে বংশধারা রাখিয়া যাইবার কোনও চেষ্টাই করিতেছি না। ধ্বংসের প্রশস্ত পথে জাতীয়তার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে বাতুলতা, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। 'ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্'—ইহা ঋষিবাক্য। এই ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষার—বংশরক্ষার চেষ্টা না করিলে আমরা অচিরে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিব, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই জন্য আমরা দেশবাসীকে বলি, স্বাস্থ্য-তত্ত্বের আলোচনা করুন, স্বাস্থ্য-রক্ষায় অবহিত হউন; দেশবাসীকে স্বাস্থ্যতন্ত্রের মূলমন্ত্রগুলি বুঝাইয়া দিন। এ পক্ষে ডাক্তার বসুর 'স্বাস্থ্য-সমাচার' দেশবাসীকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে এই পত্রের বহুল প্রচার ও পুষ্টিবিধান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় 'স্বাস্থ্য-সমাচার' প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-সংহিতা।—পৌষ। 'স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর', 'রাজা বিনয়কৃষ্ণ' ও 'শোকগাথা' সাময়িক প্রবন্ধ—শোকের উচ্ছ্বাস। 'সাহিত্য-সংহিতা'য় প্রথিতকীর্ত্তি রাজার জীবনকাহিনী দেখিবার আশা করি। শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নের 'বঙ্গদেশে বিদ্যাচর্চ্চা'য় আমরা পাঠকের অবধান প্রার্থনা করিতেছি। 'স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

'গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় এক সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের এক জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, ও পরে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠায় রাজা বিনয়কৃষ্ণের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ইহার প্রতিষ্ঠার পর হইতে কয়েক বৎসর সাহিত্য-সভার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

'হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১২৬০ সালের ১৫ই চৈত্র তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাধানগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান বলিয়া বিখ্যাত। রাজার সহিত বিদ্যানিধির দূর সম্বন্ধও ছিল। বিদ্যানিধি বাল্যকালে স্বগ্রামে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া পরে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন ও তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহাকে বাণীমন্দির পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি এক ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

'বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যানিধির প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দারিদ্র্যের ভীষণ নিষ্পেষণেও তাঁহার সে অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। পঠদ্দশাতেই তিনি হানিমানের একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। ইহার কয়েক বৎসর পরে তৎপ্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। তাঁহার এই গ্রন্থখানি সাহিত্যসমাজের আদরের বস্তু হইয়াছিল। এক্ষণে এইরূপ গ্রন্থ সকল রচনার জন্য উপাদান-সংগ্রহের যতটা সুবিধা হইয়াছে, বিদ্যানিধির সময়ে সেরূপ সুবিধা ছিল না। তথাপি তিনি যেরূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক চরিত-লেখকগণেরও অনুকরণীয়। আর্য্যনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধেও

তাঁহার একখানি গ্রন্থ ছিল। কেবল গ্রন্থরচনা নহে, তিনি "জন্মভূমি" প্রভৃতি কয়েকখানি মাসিকপত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন ও স্বয়ং "পুরোহিত", "অনুশীলন" প্রভৃতি কয়েকখানি মাসিকপত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

'বিদ্যানিধি চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যায় অর্থোপার্জনে সম্ভাবনা অতি অল্প, এমন সংস্কৃত বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং দারিদ্র্যের চিরসহচ সাহিত্য-সেবা—বিশেষতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। যে দারিদ্র্যে মস্তক অবনত হয় না, যাহাতে চরিত্র ও মনের গর্ব্ব বিনষ্ট হয় না, যাহা জীবনে ব্রত হইতে মানুষকে বিচ্যুত করিতে পারে না, সে দারিদ্র্যে লজ্জা নাই, বুঝি বা দুঃখ নাই। বিদ্যানিধির দারিদ্র্যও এইরূপ ছিল। তিনি আজীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও দারিদ্র্যের পদানত হন নাই; বীরের ন্যায় আত্মবিসর্জন করিয়া ছেন, কাপুরুষের ন্যায় কৃপা ভিক্ষা করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, একদিন সমস্ত দি অনাহারে থাকিয়া তিনি অপরাহ্নে তাঁহার এক উচ্চপদস্থ বাল্য-সুহৃদের সহিত সাক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন নিজের কোন উপকারের জন্য নহে, এক দুঃস্থ ছাত্রের উপকারের জন্য। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সমস্ত দিন অনাহারের কথা জানিতে পারিয়া সুহৃদ কিছু জল খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিদ্যানিধি সে কথা হাসিয় উড়াইয়া দিলেন। আবার বিদ্যানিধির পরোপকারও যথেষ্ট ছিল। আপনি অর্থাভাবে ক পাইতেছেন; কিন্তু কোনও দরিদ্র তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিলে, তিনি নিজে মুখের গ্রাস তাহাকে দিয়াছেন, বহুপরিশ্রমলব্ধ দুই একটি মুদ্রা কাছে থাকিলে, তাহা অম্লানমুখে তাহাকে দিয়া তাহার সাময়িক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহি সভার পুস্তকাগার স্থাপিত হইলে বিদ্যানিধি বহু অর্থব্যয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে আজীবন-সংগৃহীত আপনার পুস্তকাবলী—তন্মধ্যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও ছিল, যাহা বিক্রয় করিয়া তিনি বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিতেন—নিজব্যয়ে বাগানপাড়া হইতে একখানি নৌকা বোঝাই করিয়া আনিয়া সাহিত্যসভাকে উপহার দিয়াছিলেন। বিদ্যানিধি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই এরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ধনী হইলে পারিতেন না। এরূপ দারিদ্র্য গৌরবজনক, এরূপ দরিদ্র বরেণ্য।

একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে আহূত এক সভায় বাবু অমৃত-লাল বসু মহাশয় বিদ্যানিধিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যানিধি বাঙ্গালার Encyclopedia। বাস্তবিকই বিদ্যানিধি এ উপাধির যোগ্য ছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, তাঁহার সহিত পাঠশালার ছাত্রগণের ধরণে একটি দপ্তর থাকিত। তাঁহার বন্ধুরা পরিহাস করিয়া তাহাকে কমলাকান্তের দপ্তর বলিতেন। সে দপ্তরের মধ্যে সন্ধান করিলে অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস, অনেক প্রাচীন সংবাদ পাওয়া যাইত। কারণ সার্ ওয়াল্টার স্কটের ন্যায় বিদ্যানিধিও কোন জীর্ণ কাগজখণ্ডকে অনাদরের বস্তু মনে করিতেন না। অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককেও সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য বিদ্যানিধির দপ্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত।'

উপেক্ষিতা।

[আলো ও ছায়া রচয়িত্রী রচিত।]

১

গত যা, তা গত, প্রিয়,
কেন ভাব আর ?
এ নহে সে ক্ষত, প্রিয়,
দাগ শুধু তার।

২

দিন, মাস, বর্ষ, প্রিয়,
কেহ না দাঁড়ায় ;
অবসাদ, হর্ষ, প্রিয়,
সাথে লয়ে যায়।

৩

স্বপনের ব্যথা ভয়
রহে কত ক্ষণ ?
সেই ঘোর দুঃসময়—
ভাবিনি তখন।

৪

স্বপ্নের স্মৃতির মত
কভু হতে পারে,
দগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা
পারে জুড়াবারে।

৫

মধুমাসে ফুটে ফুল,
ছোটে কত গান,
নিদাঘে পিপাসাকুল
অধীর পরাণ।

৬

তার পর হৃদাকাশ
ঘন মেঘে ছায় ;
অশ্রুধারা দীর্ঘশ্বাস
কত বহি যায়।

৭

আজি নিশি শরতের—
শান্ত পূর্ণচাঁদ
ভাবিছ পাতিবে ফের
কুসুমের ফাঁদ ?

৮

চলে গেছে মধুমাস
ফুলে ফুলময় ;
এ তো আকাশের হাস,
ধরণীর নয়।

৯

ক্ষুদ্র জীবনের মায়া
কেটে দূরে গেলে ;
আজ মরণের ছায়া
দেখিবারে এলে !

১০

আজ ছেড়ে দাও, প্রিয় !
নয়নে আমার
কি দেখিতে পাও প্রিয় !
কেন অশ্রুধার ?

১১

নূতন প্রভাতে নিতে
এসেছে মরণ,
কাল থেকে শান্তচিতে
করিব স্মরণ !

১২

জীবনের পূর্বভাগ
জান না, কি হবে ?
গেছে ক্ষত, এই দাগ—
এও নাহি রবে ?

১৩

মন বাষ্পভরে আনি
কেন আঁখি ঢাক ?
অচেনা এ হিয়াখানি
আজ চিনে রাখ।

১৪

ফিরে দেখা হলে— হেন
অসম্ভব নয়—
এ জন্মের ভুল যেন
আর নাহি হয়।

প্রাচী-ভ্রমণ।

প্রিন্স মহাশয় ব্যাংককের দ্রষ্টব্য স্থান সকল আমাকে দেখাইবার জন্য এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এ লোকটি কাম্বোজদেশীয়। ভারতের ভূগোলে এক সময় দুইটি কাম্বোজ লিখিত হইয়াছিল। একটি বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি পূর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত। প্রথমটি মুসলমান অধিবাসী কর্তৃক অধ্যুষিত; অপরটি সুবিশাল হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। অতিবিজ্ঞাপিত মিশরদেশের পিরামিড ইহার বিপুলতার প্রভাবে হীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসের ললিত-কলা ইহার ভাস্করকার্য্যের তুলনায় হীনপ্রভ বলিয়া উপলব্ধি হয়। ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর যে কীর্ত্তি এখনও বর্তমান রহিয়াছে, ভারতবর্ষেও সেরূপ কীর্ত্তি নাই। প্রথমোক্ত কাম্বোজই আমাদের প্রচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান গ্রন্থকারেরা ইহাকে কাম্বো নামে অভিহিত করিয়াছেন। আজ কাল কেহ কেহ তিব্বতকে কাম্বোজ নামে নির্দ্দেশ করিতেছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

কাম্বোজদেশীয় পরিদর্শক আমাকে একটি রাজকীয় দেবালয়ে লইয়া চলিল। ইহার নিকটের চত্বরে ব্রাহ্মণদের দুলিবার বিরাট স্তম্ভ অবস্থিত। এই "ওয়াহ" (বোধ হয় আমাদের আয়তন শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।) বাহির হইতে দেখিতে খুব জাঁকাল। বহুসংখ্যক শ্রমণ এখানে অবস্থান করিয়া

থাকেন। ইহার সুবিস্তৃত আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই স্থানের রমণীয়তা ও পবিত্রতা উপাসক ও দর্শকদিগের হৃদয়ে সাত্বিক ভাব জাগরিত করিয়া তুলিতেছে। আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের এক বিরাট মূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। সমস্ত মন্দিরের ভিত্তি ও স্তম্ভে নানা রঙ্গে ভগবানের বিচিত্র জীবনচরিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। ভগবান ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ধ্যানস্তিমিতনেত্রে উপবিষ্ট। ভারতভূমি স্পর্শ করিয়া উপবেশন করিলেও তিনি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে এ দেশের অত্যুচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সকল ভূমির উপর তাঁহার সমান অধিকার, তাহাই বোধ হয় তিনি ইঙ্গিতে ভূমিস্পর্শ করিয়া দেখাইতেছেন। এত বড় বিশাল প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে জীবনে কখনও দর্শন করি নাই। মন্দির দেখিয়া ভিক্ষুকদের থাকিবার স্থান দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কোনও কোনও শ্রমণ ভক্তমণ্ডলীমধ্যে ধর্ম্মকথার ব্যাখ্যা করিতেছেন। কেহ কেহ বা বালক ও যুবকগণকে শ্যাম ও পালী ভাষা শিক্ষা দিতেছেন। বর্ত্তমান কালে শ্যামে ইয়ুরোপীয় প্রথায় স্কুল কলেজের সৃষ্টি হইলেও, শ্রমণেরা শ্যামের জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শ্যামের জনসাধারণ লক্ষাধিক ভিক্ষুককে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উষ্ণ অন্ন, এবং সামর্থ্য অনুসারে নানা প্রকার ফলমূল, হংসডিম্ব, মৎস্যাদি ব্যঞ্জন প্রদান করিয়া পোষণ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে, শ্রমণ মহাশয়েরাও সামর্থ্য অনুসারে স্বদেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গ্রামবাসীদের দ্বারদেশে যে মধুর দৃশ্যের অভিনয় হয়, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী ও নয়নতৃপ্তিকর। পাঠক! পাঠিকা! যদি আপনারা কখনও বৌদ্ধদের দেশে গমন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, অল্পবয়স্ক বালক ও বালিকা, অথবা অপরে, যখন বড় চামচায় উষ্ণ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রদান করিয়া সুন্দর হাত দুইটি যোড় করিয়া ভক্তিপূর্ণ কমনীয় মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করে, তখনকার সে স্বর্গীয় ভাব বড়ই মধুর, তৃপ্তিপ্রদ। এইরূপ দানে কোমল হৃদয়ের পেশল বৃত্তি সকল মধুর ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রমণদের ব্যবহারেও বেশ গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক সময়ে বহু জন উপস্থিত হইলেও, ভিক্ষাগ্রহণজন্য অত্যধিক

আগ্রহ-প্রকাশ, বা অগ্রে পাইবার জন্য ঠেলা-ঠেলি প্রভৃতি বিশৃঙ্খলা শ্রমণগণ-মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এই সমস্ত ভিক্ষুকদিগের মধ্যে ৮।১০ বৎসরের বালকও দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তাহাদিগের মধ্যেও কোনরূপ চঞ্চলতার চিহ্ন দেখিতে পাই নাই।

সমগ্র শ্যামে প্রায় তেরো হাজার বুদ্ধ-মন্দির বা বিহার বর্ত্তমান আছে। ইহাতে দেড় লক্ষের উপর ছাত্র শিক্ষা পাইয়া থাকে। নিজ ব্যাংকক সহরে বড় বড় বিহারের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহাদের আয়ও সেইরূপ প্রচুর। প্রত্যেক বৌদ্ধ শ্যামবাসী জীবনের কিছুদিন বিহারে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহাতে রাজপুত্র বা দরিদ্রপুত্র বলিয়া কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না; সকলেই ভিক্ষু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন। পরস্পর সন্দিগ্ধচিত্ত পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক পুরুষ স্বদেশরক্ষার জন্য যেরূপ জীবনের কিয়দংশ সময় সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রাণীদিগের প্রাণনাশক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রাচীতে প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিয়া যুবকগণ শান্তিকামনা করিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ভাব শ্যামে বহুদিন থাকিবে কি না,সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্যামের যুবকগণের মুখশ্রীতে সমরকান্তি বেশ ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাদের হাব, ভাব, অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতিতে সামরিক শৃঙ্খলা ব্যক্ত হইয়া থাকে। এমন কি, পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুও যখন রাস্তায় গমন করে, সেও সৈনিক-গতির অনুকরণ করিয়া বীরদর্পে গমন করিয়া থাকে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি আমার কাম্বোজ দেশের সঙ্গীর সহিত আবাসস্থানে প্রত্যাগত হইলাম।

স্নান, রন্ধন ও ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া আবার সহর দেখিতে বাহির হইলাম। বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে আমার রন্ধনের বিষয় একটু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানকার বাজারে আলু, মূলা, বেগুন, কচু, বাঁশের কোঁড়, নানাপ্রকার শাক, পেঁপে-কলা-লেবু-ডুরিয়ান-সফেটা প্রভৃতি নানাপ্রকার ফল ও বহুপ্রকার মৎস্য প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। বাজারটা একবার দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম, স্ত্রীলোক বিক্রেত্রীর সংখ্যাই অধিক। বাজার আমার বাসার নিকটে। কিছু আলু ও পাতিলেবু ক্রয় করিলাম। এক জন ভৃত্য একটা সচল-চুল্লীতে পোড়া কাঠের কয়লা জ্বালাইয়া আমার অবস্থানগৃহের মধ্যে রাখিল। আমি একপাকে দাল চাউল ও

আলু দিয়া পাক করিয়া, আগুনে পাঁপর ভাজিয়া, ঘৃত ও লেবুর সংযোগে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ অন্নের আস্বাদন পরিতোষের সহিত উপভোগ করি। ইহাতে বেশী সময়, আয়াস ও অর্থের প্রয়োজন হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমার রন্ধনপ্রণালী প্রিন্স মহোদয়ের মহানসশালার অধ্যক্ষ আগ্রহের সহিত দর্শন করিল। ব্রাহ্মণের ভোজন ব্যাপার দেখিয়া সে কি মনে করিয়াছিল, তাহা আমার জানিবার অবকাশ হয় নাই।

সঙ্গী সহ ব্রাহ্মণদের ঝুলনের আকড়া দেওয়া দেখিতে গমন করিলাম। ইহার ইতিবৃত্ত ভালরূপে কেহ কহিতে পারেন না। অনেকের ধারণা, ব্রাহ্মণদের সহিত ইহার ইতিবৃত্ত জড়িত; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা চীনদেশীয় প্রথাবিশেষের শেষ স্মৃতি। অপরে কহেন, দেশ যাহাতে ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়, সে জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ে ইহা শ্যায়ামী ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত; সুতরাং আমাদের ইহা অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। চিত্রে যে দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার উচ্চতা প্রায় এক শত ফিট। একখানা তক্তার দুই পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে শক্ত দড়ি বাঁধিয়া দোলান হইয়া থাকে। মাটি হইতে ইহা ১০ ফিট উচ্চ। চারি জন লোক এই তক্তার উপর বসিয়া থাকে; দুই পার্শ্বে দুই জন, আর মধ্যের দড়িটাকে পশ্চাৎ করিয়া দুই জন বসিয়া থাকে। তক্তায় একটা দড়ী আটকান থাকে। নিম্ন হইতে এক জন ব্রাহ্মণ দড়া ধরিয়া দোল দিতে থাকে। উপরের দোদুল্যমান ব্রাহ্মণচতুষ্টয় যুগপৎ যুক্তকরে হস্তপ্রসারণ করিয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে নীচের লোক দড়ি টানিয়া লয়। এই সময় উপরের ব্রাহ্মণেরা এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে। নিম্নের দর্শকবৃন্দ আনন্দপ্রকাশ করিলে তাহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত অঙ্গবিক্ষেপ করিতে থাকে। দোলকস্তম্ভের নিকটে একটা বাঁশ পোতা থাকে। তাহার উপরিভাগে একটা পুঁটুলীতে কিছু টাকা বাঁধা থাকে। দোলা যখন দুলিতে দুলিতে সেই পুঁটুলীর কাছে উপস্থিত হয়, সেই সময়ে দোলার অগ্রভাগস্থ ব্যক্তি কখনও হস্ত দ্বারা, কখনও বা দন্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ দোলার পর, তাহারা অবতরণ করিলে, কার্য্য সম্পন্ন হয়। দর্শকবৃন্দও স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করে।

আমার সঙ্গী আমাকে মৃতরাজা চূড়ালঙ্করণের স্থাপিত বেঞ্জম বপিত্র বা

বুদ্ধ-মন্দির ও তথাকার প্রধান শ্রমণ মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য চলিল। যে রাস্তা দিয়া আমরা গমন করিয়াছিলাম, সেরূপ প্রশস্ত সুন্দর

ওয়াই।

রথ্যা ভারতবর্ষে আমি কখনও দেখি নাই। ইহা যেমন প্রশস্ত, তেমনই

পরিচ্ছন্ন। মধ্যপথের দুই ধারে হাঁটিয়া যাইবার দুইটি পথ। এই দুইটি পথের পার্শ্বে আবার দুইটি পথ। হাঁটা পথের দুই ধারে দুই থাক করিয়া বার থাক আমাদের তেঁতুল গাছ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপিত হইয়াছে। গাছগুলি নাতিদীর্ঘ; নিম্নভাগ সমানভাবে ছাঁটা থাকায় দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। এই রাস্তার একধারে মিলিটারী কলেজ, অপরধারে সৈনিক নিবাস; এবং সম্মুখ ভাগের শেষ সীমায় নবীন রাজার নবীন প্রাসাদ। এই প্রাসাদের নিকট আমার দ্রষ্টব্য স্থান। মৃত শ্যামাধিপতি চূড়ালঙ্করণের মর্ম্মরমূর্ত্তি পথিক-রূপে পথের উপর অবস্থান করিতেছে। পথের পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালীতে বৃহদাকার পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া এই স্থানের রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। আমরা এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমে আমি এখানকার শ্রমণ মহাশয়ের নিকট নীত হইলাম। কক্ষটি সন্ন্যাসীর অবস্থানগৃহ হইলেও নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে শোভিত। সন্ন্যাসী মহাশয়, আমি ভারতবাসী অবগত হইয়া, যথেষ্ট অনুগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই চা পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি সে রসে বঞ্চিত শুনিয়া একটু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পুস্তকের জাতকগ্রন্থ সিংহল ও বর্ম্মার অক্ষরে পালি গ্রন্থ সকল রহিয়াছে, দেখিলাম। ভারতবর্ষের তীর্থসমূহ দর্শন করিবার ইচ্ছা শ্রমণ মহাশয়ের অত্যন্ত বলবতী। বৌদ্ধতীর্থ সকলের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, সে সকল বিষয় তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রমণ মহোদয় অল্প অল্প সংস্কৃত জানেন। ইহার সহিত পালি মিশ্রিত করিয়া ভাবের আদান প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ভোজন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমার না খাইবার কারণ শুনিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। বিদায়প্রদানকালে কয়েকটি কমলালেবু ও অমৃপায় । অযোধ্যায় প্রাপ্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া মন্দিরমধ্যস্থ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

মন্দিরের মধ্যে দেখিলাম, কনককান্তি শাক্যসিংহের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির উচ্চতার তুলনা হইতে পারে না। এই দূরদেশে আমার কথা কেহ বোঝে না, আমিও কাহারও কথা বুঝি না। কিন্তু মন্দিরে যখন প্রবেশ করি, তখন আমার দেশের ঠাকুর

নীরবতার ভিতর দিয়া নীরবে কথা কহিয়া আমাকে সমাশ্বস্ত করিলেন। যাঁহাকে বাল্যকাল হইতে অবগত আছি, আমার গোত্রজ কোনও কাশ্যপের সহিত যাঁহার হার্দ্দিক সম্বন্ধ ছিল, যিনি আমাদের দেশের কল্যাণকল্পে কত না পরিশ্রম, কত না চিন্তা করিয়াছেন, তিনি কি বিদেশে তাঁহার স্বদেশ-বাসীকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধনেত্রে দেখিয়া আশ্বস্ত করিবেন না? এখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া আমি আমার সঙ্গীর সহিত শ্রমণ মহাশয়ের ভদ্রতা ও তাঁহার স্বচ্ছন্দ জীবনের বিষয় আলাপ করিতে করিতে আবাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপ রাজভোগসম্পন্ন শ্রমণদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বোধ হয় জৈনাচার্য্য মহামতি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

মৃদ্বী শয্যা প্রাতরুত্থায় পেয়া মধ্যে ভক্তং পানকং চাপরাহ্নে।
দ্রাক্ষাখণ্ডং শর্করা চার্দ্ধরাত্রে মোক্ষশ্চান্তে শাক্যসিংহেন দৃষ্টঃ॥

শ্যাম দেশের শ্রমণদের বিষয়ে শ্লোকোক্ত সকল বিষয় প্রযুক্ত হইতে পারে কি না, তাহা জানি না। কিন্তু প্রাতঃকালে পান ও পেয় (চা) না হইলে তাঁহাদের চলে না, এ কথা খুব নিশ্চিত। এমন কি, প্রাতঃকালে যখন তাঁহারা ভিক্ষা করিতে গমন করেন, সে সময়েও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পান চর্ব্বণ করিয়া থাকেন।

ব্যাংকক সহর মেনমের উভয় তটে অবস্থিত। উভয় তটেই বহুসংখ্যক মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মন্দিরের মধ্যে শয়ান বুদ্ধের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। এরূপ কথিত হয় যে, পৃথিবীর মধ্যে শায়িত বুদ্ধদেবের এত বড় মূর্ত্তি আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরের ভিতর আলোকের কিছু অভাব থাকায় এই বিরাট মূর্ত্তি অধিকতর বৃহৎ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

এখানকার মিউজিয়ম, জাতীয় পুস্তকালয়, মরকত-বুদ্ধের মন্দির প্রভৃতি দর্শন জন্য প্রিন্স মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিলাভের জন্য আমাকে কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। পুস্তকালয়ের এক জন কর্ম্মচারী আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করেন। তিনি পালি ভাষায় অভিজ্ঞ, আমাদের কথোপকথন উভয়ের কুতূহলের কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমার দ্রষ্টব্য স্থান সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ইহার সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নানা প্রকার আকৃতির পিত্তলের কামান সকল রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কামান

শ্যামের প্রাচীন কালের আগ্নেয় অস্ত্রের ও বাহুবলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এগুলি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জিনিস। এই প্রাঙ্গণের সম্মুখে ও পার্শ্বে আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনুমোদিত সুবৃহৎ অট্টালিকাতে সৈনিকগণ অবস্থান করিয়া থাকে। আমি আমার সঙ্গীর সহিত প্রহরি-রক্ষিত দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বারে উপনীত হইলাম। এই আঙ্গিনার মধ্যস্থানে নানা প্রকার কারুকার্য্যে শোভিত মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধ ভগবানের বহুমূল্যবান মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহার নাম শাশ্বতা আরাম। এই আরামের চতুর্দ্দিকে যে প্রশস্ত বারাণ্ডা আছে, তাহার ভিত্তিতে সমস্ত রাম-চরিত্র নানা রঙ্গে চিত্রিত। চৈনিক-প্রভাব-যুক্ত চিত্রকর শ্রীরামচন্দ্র ও অযোধ্যার জনগণকে চীন পরিচ্ছদে আবৃত করিলেও, ভগবান রামচন্দ্রের বা সীতাদেবীর কমনীয়তা তাহার মধ্য হইতেও পরিস্ফুট হইতেছে। চিত্রের সম্মুখের স্তম্ভে শ্যাম ভাষায় চিত্রের বর্ণিত বিষয় লিখিত হইয়াছে। ভক্তি ও ঔৎসুক্যের সহিত শ্যামবাসীরা এই সকল চিত্র চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিতেছেন। জনসাধারণের রাম-চরিত্র-শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভিতরের ভিত্তিতে বুদ্ধদেবের সমস্ত চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এ চিত্রেও চৈনিক প্রভাব বর্ত্তমান। কপিলবস্তু যেন পিকিনের অংশবিশেষ, আর অধিবাসীরা চীনে বলিয়া প্রতীত হয়। সে যাহা হউক, চিত্র দেখিতে বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে স্বর্ণ-বুদ্ধ; তাহার উপর স্ফটিকের বুদ্ধ; তাহার উপর ইতিহাসবিখ্যাত মরকত-বুদ্ধ শোভা পাইতেছেন। নানা প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর ও স্বর্ণে জড়িত হওয়াতে ইহার সৌন্দর্য্য অধিকপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মন্দির-দর্শনের পর আমি পুস্তকালয়ে নীত হইলাম। শ্যামের জাতীয় পুস্তকালয় অতি অল্পদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অল্পদিনের হইলেও, ইহার পুস্তক-সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। দুইটি বিষয়ে শ্যামের জাতীয় পুস্তকালয় বিশেষ মূল্যবান। প্রথম কাম্বোজ শিলালিপি, দ্বিতীয় হস্তলিখিত পুঁথি। আমাদের মিউজিয়মে যেরূপ ভাবে শিলালিপি সকল পতিত আছে, এখানে সেরূপ ভাবে পড়িয়া নাই। প্রত্যেক শিলা কাষ্ঠাসনে রক্ষিত, এবং আচ্ছাদনে আবৃত। এ সকল শিলালিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। কাম্বোজ শিলালিপির পাঠোদ্ধার হইলে চীনের দক্ষিণাংশের হিন্দু সাম্রাজ্যের অনেক নূতন কথা

প্রকাশিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুঁথিগুলি প্রাচীন শ্যাম প্রথায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহার কাষ্ঠাধার আলমারীর অনুরূপ; ইহাতে শ্যামী কারুকার্য্য আছে। পুস্তকের সূতার ও রেশমী বস্ত্রের বেষ্টনীও দেখিবার জিনিস। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের বস্ত্রের উপর অতি সুন্দর সূচের কার্য্য করা হইয়াছে। ইহাতে শ্যামবাসীর শিল্পনিপুণতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। পুস্তকালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ এক জন জর্ম্মান, নাম O. Frankfurter Ph. D.। শ্যামবিষয়ক অভিজ্ঞতা ইঁহার যথেষ্ট আছে। ইনি গার্টেনজেন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্যাম রাজের কার্য্য গ্রহণ করেন। লোকটি বড়ই ভদ্র।

পুস্তকালয় পরিদর্শন করিতেছি, এমন সময় আমার শ্যামী সঙ্গী আসিয়া বলিলেন, প্রিন্স দামরঙ্গ আসিয়াছেন। যাঁহার বাড়ীতে আমি অবস্থান করি, তিনি পূর্ব্বেই আমার কথা ইঁহাকে লিখিয়াছিলেন। আমি প্রিন্স দামরঙ্গের কাছে উপস্থিত হইলে তিনি অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমার এ দেশে আসিবার কারণ অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, "আমাদের ইতিহাস আমাদেরই লেখা উচিত; যে পর্য্যন্ত ইহা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত আমাদের ইতিহাস হইতেছে না।" আমি বলিলাম, "আমাদের দেশে সেই যুগ আসিবার পূর্ব্বরূপের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। আর আমি তাহাদিগের মধ্যে এক জন অযোগ্য ব্যক্তি এ দেশে আগমন করিয়াছি।" এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পর প্রিন্স মহাশয় আমার খালি মাথা দেখিয়া আমার মস্তকের আবরণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করি, সেই পরিচ্ছদে আমি এখানে আসিয়াছি।" ইঁহার আকৃতিও পরিচ্ছদ যেন ভারতবাসীর মতন। আজানু মোজা, কাপড় মাল কোঁচা, গায়ে কোট; ইউরোপের অনুকরণের মধ্যে মাথায় টুপী। এ অনুকরণটা বোধ হয় মন্দ নয়। আমাদের স্বদেশবাসীরা যখন ইউরোপীয় আবরণে আবৃত হন, তখন যেমন তাঁহাদিগকে ট্যাস বলিয়া ভ্রম হয়; এখানে সেরূপ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। যাক এ সব কথা। কল্য হইতে প্রিন্স মহোদয়ের অতিথি হইবার জন্য আমি আমন্ত্রিত হইলাম; বলা বাহুল্য যে, এ জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

লাইব্রেরী হইতে প্রিন্স মহাশয় মিউজিয়ম দেখিবার জন্য আমাকে সঙ্গে

করিয়া লইয়া গেলেন। ইহা একটি দ্বিতল গৃহ। ইহার অধিকাংশ দ্রব্য প্রিন্সের সংগ্রহীত। রাজ্যের নানা স্থান পরিদর্শনকালে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে বৌদ্ধপরিব্রাজকদিগের ব্যবহৃত কতিপয় মৃন্ময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম। প্রিন্স একটি গুহায় এগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কতকগুলির সম্মুখ ও পৃষ্ঠ ভাগে কিছু লিখিত থাকায়, সেগুলি আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছিলাম। প্রিন্স তাহা দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে আমাকে কয়েকটি দিবেন, বলিলেন। এই যাদুঘরে শ্যামের প্রাচীন অস্ত্র, শস্ত্র, মুদ্রা, মূর্ত্তি ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে।

প্রিন্স মহাশয় আমাকে বিদায় দেবার পূর্ব্বে আমার শ্যামের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথা বা অযোধ্যা যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। অযোধ্যার প্রধান কর্ম্মচারীর উপর আদেশপত্র প্রভৃতি লইবার জন্য আমার ভাবী সঙ্গী আদিষ্ট হইলেন। ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া H. R. H Prince Krom Suang Damrong Minister of the Interior করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম।

যে দ্বার দিয়া আমি অবতরণ করিলাম, তাহার সম্মুখে শ্বেতহস্তি-শালা। শ্যামের শ্বেতহস্তী চিরপ্রসিদ্ধ। সময় সময় এ দেশ শ্বেত হস্তীর দেশ বলিয়া কথিত হয়। শ্বেত বলিলে পাঠক যেন তুষারশুভ্র মনে না করেন। সাধারণ হস্তীর ন্যায় ইহার বর্ণ ধূসর নহে, অপেক্ষাকৃত ফিকে কটা। শ্যামবাসী ইহা যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন। এই হস্তিশালা অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। শ্বেতহস্তীর খাদ্য তৃণাদি অতি যত্নের সহিত সংগ্রহীত হয়। মানুষ যাহা কষ্টকর বিবেচনা করেন, সেরূপ কোনও কষ্ট যাহাতে হস্তিরাজের না হয়, সে বিষয়ে তত্ত্বাবধারক মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। শ্যামের জাতীয় পতাকা শ্বেতহস্তি-লাঞ্ছিত। শ্বেতহস্তীর অবমাননা করিলে শ্যামবাসী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা এই :—এক সময় এক জন ইউরোপীয় সার্কাসওয়ালা পয়সা রোজগারের জন্য শ্যামে আসেন; তিনি শ্যামবাসীকে নানারূপ ক্রীড়া দেখাইয়া এক দিন শ্যামবাসীকে যথার্থ শ্বেতহস্তী দেখাইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁহার শ্বেতহস্তী ধবল ধবল, তাহাতে কাল্যের লেশমাত্র নাই। যথাসময়ে সার্কাসওয়ালা হস্তী দেখাইলেন। তাহা দেখিয়া শ্যামবাসীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বাস্তবিকই সার্কাসের হস্তীতে

কৃষ্ণবর্ণের লেশমাত্র ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামবাসীদের ভ্রম দূর হইল; তাহারা বুঝিল, ইউরোপীয় তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। ইহার বর্ণ শ্বেত নহে, ইহা এরূপ শ্বেত যে, যাহার সহিত ইহার গাত্রস্পর্শ হইতে লাগিল, তাহা পর্য্যন্ত শ্বেত বর্ণের হইতে লাগিল। যখন সকলে বুঝিল, খড়ি মাখাইয়া হস্তীকে শাদা করা হইয়াছে, তখন সকলে সার্কাসওয়ালাকে নিন্দা ও নিজেদের শ্বেতহস্তীর স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে অল্পদিনের মধ্যে সারকাসের মালিক মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্যামবাসীরা এ কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের শ্বেতহস্তীর অভিসম্পাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

পূর্ব্বে ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিরা শ্বেতহস্তী অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন। সময়ে সময়ে এই হাতীর জন্য তাঁহারা দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। এখন আর সে দিন নাই। এখন একমাত্র শ্যামদেশেই শ্বেতহস্তী পূজিত হইয়া থাকে। শ্যামের আমাদের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই সকল পূজার কার্য্য সম্পাদিত হয়। যখন বনমধ্যে হস্তী ধৃত হয়, তখন সে সংবাদ প্রচারিত হইলে রাজ্যমধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়। ব্রাহ্মণগণ নানা প্রকার পূজা, পাঠ ও উৎসব করিয়া শ্বেতহস্তীকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। ইহার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পাঠও ব্রাহ্মণগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন তথায় শ্বেতহস্তীর পূজা হইত; সে সময় শ্যামী ব্রাহ্মণগণ শ্বেতহস্তী দর্শন করিবার জন্য মান্দালায় গমন করিতেন।

মিউজিয়মের নিকট টাঁকশাল। পূর্ব্বে শ্যামে রূপার টুকরা বর্ত্তমান কালের টাকার স্থান অধিকার করিয়াছিল। টাঁকশাল স্থাপিত হইবার পর আমাদের টাকা অপেক্ষা কিছু ভারি টাকা প্রস্তুত হইতেছে। এ দেশের টাকাকে টিকল কহে। টিকল আমাদের টাকার ন্যায় ৬৪ ভাগে বিভক্ত নহে, ইহা শতাংশে বিভক্ত। প্রত্যেক শতাংশকে শতাঙ্ক কহে, ইহা তাম্র মুদ্রা; ইহার মধ্যস্থলে ছিদ্র থাকায় সুতা বাঁধিয়া রাখিবার পক্ষে সুবিধাজনক। নিকলের ৫ ও ১০ S'tang বা শতাঙ্ক মুদ্রাও প্রচলিত আছে। রূপার বাজারের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত টিকলের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমি যে সময় শ্যামে অবস্থান করি, সে সময় আমি ১৩ টিকল ২৯ শতাঙ্কে গিনি ভাঙ্গাইয়াছিলাম। যাঁহারা শ্যামে গমন করিবেন, তাঁহাদের সিঙ্গাপুরে কিছু শ্যামের মুদ্রা সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথা নূতন লোক পাইয়া দোকানীরা

ঠকাইয়া থাকে। আর সামান্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমাদের গিনি সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

মিউজিয়ম, পুস্তকালয় ও টাঁকশালার মধ্যে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। ইহার চতুঃপার্শ্বে তেঁতুল গাছ স্তরে স্তরে ছাঁটিয়া দেওয়াতে বেশ শোভা হইয়াছে। তেঁতুল গাছ যে এরূপ শোভা দিতে পারে, ভারতে তাহা অবিদিত।

এই সকল দেখিয়া আমি আমার থাকিবার স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। আসিবার পথে আমাদের ব্রাহ্মণদের মন্দির। আজ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরে যেন বিশেষ উৎসব হইয়া গিয়াছে। বেদীস্থ প্রতিমার সম্মুখে স্তূপাকারে খৈ, কলা, আস্ত আক প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। আজ বিশেষ পূজা হইয়া গিয়াছে। আজ পূর্ব্বাহ্নে পৌষ পার্ব্বণ। পৌষ মাসে হয় বলিয়া আমি ইহাকে এই নামে অভিহিত করিলাম। অন্যান্য দিবস যেরূপ, আজও সেইরূপ হইল। অধিকন্তু পুলিস-প্রহরী দেখিলাম; মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত সহস্র সহস্র শ্যাম রমণী ও পুরুষ দেখিলাম। ৯॥০ টার সময় রাজার প্রতিনিধি মহাশয় আগমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে অশ্বারোহীরা টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত আগমন করিল। রাজপ্রতিনিধি আগমন করিলে পর ব্রাহ্মণগণ স্বর্ণের কারুকার্য্যযুক্ত চোগা পরিয়া, কেহ কেহ বেগুনে রংয়ের রেশমের কাপড় পরিয়া, কেহ বা কাপড়ের উপর বিলাতী টুপী পরিয়া, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের আগে বাদকেরা মান্ধাতার আমলের ঢোল,—সবগুলিই কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি বা ছিন্নচর্ম্ম,—ধীরে ধীরে বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল। ইহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ বীরাসনে উপবেশন করিয়া আমাদের স্ত্রীলোকদের বরণ করা প্রথার ন্যায় হস্ত উঁচু করিয়া নাবাইয়া কপালে ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিল। তার পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসে যেরূপ দোলার আখড়া দেখিয়াছিলাম, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। এই উৎসবে তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে এই পর্ব্বের শেষ দিন। এ দিন জনসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় সব হইল, কেবলমাত্র ঝুলন-ক্রীড়ার পর দোলন-স্তম্ভের নিকটে একখানি চালাঘর করা হইয়াছিল; তাহাতে জলপূর্ণ কুম্ভ রক্ষিত হইয়াছিল। এক জন ব্রাহ্মণ তাহা হইতে জল লইয়া জনমণ্ডলীর মস্তকে সেচন করিতে লাগিলেন। আর সকলে আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ বৎসরের মতন ঝুলন-

যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইল। ইহাতে রাজা ও রাজ্য উভয়েরই মঙ্গল সূচিত হইয়াছে। দর্শক ও অভিনেতা সকলেরই শান্তির সহিত বৎসর কাটিয়া যাইবে, এইরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া জনসমূহ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রীড়াচত্বর কোলাহলশূন্য নিস্তব্ধ হইল। বিদেশী পথিকও বিদেশে ব্রাহ্মণ-প্রভাবের অতীত কথা স্মরণ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

চীন কাহিনী।

চীনের রঙ্গালয়ে অনেকবার অভিনয় দর্শন করিয়াছি। তাহাদের রঙ্গমঞ্চে কোনও দৃশ্যপট নাই। অভিনেত্রীও নাই। যুদ্ধাদির বিবরণাত্মক নাটকই প্রধানতঃ অভিনীত হইয়া থাকে। দেবতাদের অথবা পুরাকালের রাজাদের অভিনয়ে নায়ক নায়িকারা সেই সময়ের আকৃতির অনুযায়ী মুখোস পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাত্রার দলে রাবণ, হনুমান প্রভৃতি মূলচরিত্রের মুখোস পরিত, চীনেদের অভিনয়ে এখনও সেই প্রথা দৃষ্ট হয়। অভিনয়ে অনেক গান থাকে, কিন্তু সকল গানের সময়ই চীনে বাদ্য এরূপ সজোরে বাদিত হয় যে, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারা যায় না। সকল গানই করুণরসাত্মক, এবং অনুনাসিক সুরে গীত হইয়া থাকে। দর্শকবৃন্দকে চা বিস্কুট ইত্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাই সাধারণ নিয়ম আমাদের ভাগ্যে ত ইহা অজস্র বর্ষিত হইত। প্রত্যেক রঙ্গালয়ে দর্শকের সংখ্যা দেখিয়া মনে হইত, চীনেরা অভিনয় দেখিতে খুব ভালবাসে। প্রকৃতই তাহারা অভিনয়ের খুব পক্ষপাতী। মুটে মজুরেরা পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিতে গিয়া থাকে। দর্শনীর হারও কম। দিবাভাগেও অনেক সময় অভিনয় আরব্ধ হয়। সামান্য সামান্য অভিনয় রাস্তার উপর অভিনীত হইতেও দেখা যায়। প্রকাশ্য রাজপথে কুৎসিত ছবি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য তাহারা দণ্ডিত হয় না, কিংবা ঐরূপ ছবি দেখাইতেও লজ্জাবোধ করে না। একটি বাক্সের মধ্যে ঐ ছবিগুলি রক্ষিত হয়। বাক্সের তিন দিকে দুইখানি করিয়া ছয়খানি Magnifying Glass লাগান থাকে। ঐ কাচের মধ্য দিয়া দর্শকেরা ছবিগুলি নিরীক্ষণ করে। কাচের গুণে ছবিগুলি

বেশ বড় দেখায়; এমন কি, বায়স্কোপের চিত্রের মত হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ঐরূপ বাক্সে নানা দেশের ছবি এক পয়সায় দেখান হইয়া থাকে চীন দেশে অনেকে শুধু গল্প বলিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। বাড়ীর মেয়েদের কাছেই ইহাদের প্রতিপত্তি অধিক। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহাদের গল্প শুনিয়া মোহিত হয়। ইহাদের গল্প বলিবার ক্ষমতা অসাধারণ। অনেকটা আমাদের দেশের কথক ঠাকুরদের মত অনেক বড়লোক চীনের বাড়ীতে বেতনভুক গল্প-কথক আছে। আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের ভাঁড়ের ন্যায় অনেক হাস্যরসিক ভাঁড় এখানে দেখিয়াছি। তাহাদের হাব ভাব ও কথা শুনিলেই হাসি পায়। রাজপুতানার চারণগণের মত অনেকে শুধু স্বদেশের গৌরবগীতি গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

চীন জাতিকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে কখনই যথার্থ মনের ভাব ব্যক্ত করে না। ইহা তাহাদের স্বভাবজাত লক্ষণ।

যুদ্ধের দেবতাকে চীন দেশে 'কোয়াংটি' বলে। কোনও স্থানে যুদ্ধ জয় হইলে ইঁহার পূজা দেওয়া হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেও জয়ের জন্য ইঁহার উপাসনা হইয়া থাকে।

চীন দেশে সময়ে সময়ে এমন ধূলিময় ঝড় উঠিয়া থাকে যে, তখন কিছুই নয়নগোচর হয় না। অনেকে মাঠের মধ্যে এই ঝড়ে পড়িয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া গিয়াছে, এমন শুনা গিয়াছে। অনেক ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়াছে, নৌকাডুবি হইয়া অনেক লোক মরিয়াছে। ভারতের পশ্চিম প্রদেশগুলিতেও এইরূপ ঝড় উঠিয়া থাকে; তাহাকে 'আঁধি' বলে।

উত্তর চীনে শীতকালে উপকূলসন্নিহিত অগভীর সমুদ্রে জল জমিয়া যায়। জাহাজ আসিতে পারে না। তখন কেবল নিউ-চি-ওয়াং বন্দর খোলা থাকে। সকল জাহাজই তথায় আসিয়া লাগে। তথাকার বন্দরও খুব গভীর।

চীন দেশে বসন্ত রোগ ও টাইফয়েড জ্বরের খুব প্রাদুর্ভাব।

চীন দেশে মেথর নাই শূকর, কুকুর, কুক্কুট, মালী ও কৃষক, ইহারাই এই কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদের দেশে পাইখানা পরিষ্কারের জন্য মেথরকে মাহিয়ানা দিয়া রাখিতে হয়। চীনদেশে ইহার বিপরীত। কৃষক ও মালী গৃহস্থকে কিছু কিছু টাকা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া গিয়া তাহাদের ক্ষেত্রে বা বাগানে সার-রূপে ব্যবহার করে। ঐ সকল লোক কোনও কোনও বৃহৎ পরিবারে

বিষ্ঠা ও মূত্রের জন্য বাৎসরিক ৪০৲ ৫০৲ টাকা দিয়া থাকে, এইরূপ শুনা গিয়াছে। শুনিয়াছি, জাপানেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। পঞ্জাব প্রদেশে লোকে উন্মুক্ত ছাতের উপর বিষ্ঠাদি পরিত্যাগ করে, এবং সেগুলি শুকাইলে কতক জ্বালানী-কাষ্ঠরূপে এবং কতক ক্ষেত্রে সার-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনের যেখানে এইরূপ সার প্রস্তুত হয়, তাহার প্রায় এক মাইল দূর হইতেই উক্ত স্থানের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে যে নানা প্রকার রোগবীজ উৎপন্ন ও বায়ু-সংযোগে পরিচালিত হইয়া কঠিন পীড়ার সৃষ্টি করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের দেশের পশ্চিমদেশবাসীদিগের মত চীনেরা গৃহে জানালা রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করে না; অতএব, বিশুদ্ধ-বায়ু-সঞ্চালনের অভাবেও অনেক সময় নানা পীড়ার সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদের দেশের ন্যায় চীন দেশে স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। স্বামীর সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী না হইলে স্ত্রীর আর গত্যন্তর নাই। নিম্নলিখিত সাতটি কারণে স্বামী স্ত্রীকে বর্জ্জন করিতে পারে,—

(১) শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হইলে।

(২) কোন্দলপ্রিয়া ও বহুভাষিণী হইলে।

(৩) হিংসাপরায়ণা হইলে।

(৪) ব্যভিচারিণী হইলে।

(৫) বন্ধ্যা হইলে।

(৬) চুরী করিলে।

(৭) কুষ্ঠরোগ হইলে।

পক্ষান্তরে, স্বামী সহস্র দোষ করিলেও স্ত্রী স্বামীকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। চীনের প্রধান পণ্ডিত কনফুসাস বলিয়াছেন, 'স্ত্রীলোককে বশে রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কায। বেশী আদর পাইলে ইহারা মাথায় চড়ে। আবার না দিলে অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়।'

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যেমন সতীদাহ প্রচলিত ছিল, তদ্রূপ চীনদেশেও কোনও কোনও স্থলে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে আত্মহত্যা করিত। তখন তাহার মৃতদেহের উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত ও 'সতী-স্তম্ভ' নামে অভিহিত হইত। সহস্র সহস্র নারী উক্ত স্তম্ভের নিকট ধূপধূনা জ্বালাইয়া পূজা দিত। অদ্যাপি এইরূপ পূজোপহার দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। তাহাদের বিশ্বাস, যাহারা এইরূপে সতীত্ব প্রদর্শন করিয়া জীবন

বিসর্জ্জন করে, তাহারা পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে। এইরূপ একটি সতীর প্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শ্রীআশুতোষ রায়।

উড়িষ্যা ও তাহার ধ্বংসাবশেষ।

উড়িষ্যা ও তাহার ধ্বংসাবশেষ এখন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে সকল অনিন্দ্যসুন্দর পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিয়া চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে হইলে, উড়িষ্যা ভ্রমণ অপরিহার্য্য। রাষ্ট্রবিপ্লবের অসদ্ভাব না ঘটিলেও, রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসলীলা উড়িষ্যায় বহু দীর্ঘকাল অব্যাহতগতিতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সুতরাং এখনও অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন প্রায় অক্ষুণ্ণভাবেই বর্ত্তমান আছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

উড়িষ্যা-ভ্রমণের প্রধান ও প্রবল অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তীর্থদর্শনের আশায়, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের সম্ভাবনায়, অথবা কেবল সমুদ্রসৈকতের সান্ধ্য সম্মিলন-প্রলোভনে, অনেকেই উড়িষ্যা-ভ্রমণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় উড়িষ্যা-বিষয়ক দুই চারিখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ অবশ্যই পুরাতত্ত্বালোচনার প্রকৃত সহচর বলিয়া কথিত হইতে পারে না। সেরূপ গ্রন্থ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে, সমস্তই ইংরাজী ভাষায়

লিখিত। তন্মধ্যে ষ্টারলিঙ্গের, ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের ও ডাক্তার হণ্টারের গ্রন্থই প্রধান। যে যুগে এই সকল গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার পর অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং উড়িষ্যাবিষয়ক নূতন গ্রন্থ লিখিত হইবার প্রয়োজন পুনরায় অনুভূত হইতেছে।

উড়িষ্যার অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন কি না, এখনও তাহার পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু এক জন বাঙ্গালী প্রাচীন ও মধ্যযুগের উড়িষ্যার ও তাহার ধ্বংসাবশেষের বিবরণসংযুক্ত একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।* গ্রন্থখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত,—দশ অধ্যায়ে বিভক্ত, পাঁচ শত চল্লিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত,—এবং অনেকগুলি চিত্রপটে সুসজ্জিত। বিচারপতি উড্রফ মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া এই গ্রন্থের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহাতে যেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠের অজস্র প্রশংসালাভের যোগ্য।

এই গ্রন্থে উড়িষ্যার সকল স্থানের সমস্ত পুরাকীর্ত্তির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত বিবরণের অসামঞ্জস্য অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যে কয়েকটি স্থানের পুরাকীর্ত্তির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই বিলক্ষণ ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়াছে। এ দেশে এরূপ গ্রন্থের অধিক কাটতি হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থকার তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যত দূর করিয়াছেন, তাহার জন্যই সাধুবাদলাভের যোগ্য। যাঁহারা উড়িষ্যা-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নানা ভাবে অর্থব্যয় করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থকে উৎসাহদান করিলে, গ্রন্থকারের উপকার করিতে গিয়া স্বয়ং উপকৃত হইতে পারিবেন।

উড়িষ্যার ইতিহাস এখনও যথাযোগ্যভাবে লিখিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য উড়িষ্যার নানা স্থানে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের অনেক চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার ফলে উত্তরোত্তর অনেক বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। এইরূপে প্রাচীন লিপি ও শিল্পনিদর্শন হইতে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে উড়িষ্যার ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা করিতে হইলে, উড়িষ্যাকে আর্য্য-প্রভাবক্ষেত্র বলিয়াই বর্ণনা করিতে হইবে। অধিবাসি-

* Orissa and her Remains—Ancient and Medieval, by Mano Mohan Ganguly Vidyaratna B. E., M. R. A. S. &c Thacker Spink & Co. 1912.

গণের অধিকাংশ অনার্য্য হইলেও, পুরাতন কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে আর্য্য-প্রভাবের পরিচয় সর্ব্বত্র সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।
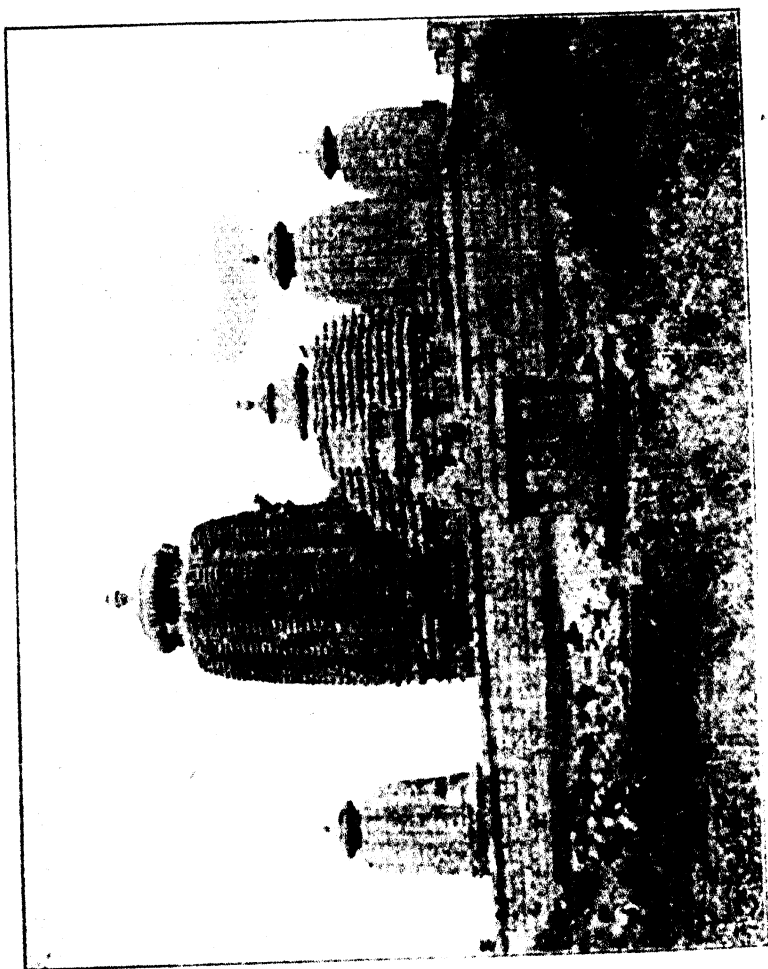
ভুবনেশ্বর মন্দিরের উত্তর পার্শ্ব।

বৈতরণীর দক্ষিণে ও ঋষিকুল্যার উত্তরে বঙ্গোপসাগরের যে উপকূলভাগ নৈসর্গিক শোভায় উড়িষ্যার সৌন্দর্য্য-গৌরব জগদ্বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সকল স্থানে একই শ্রেণীর পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উল্লেখ না করিলে, ভারত-স্থাপত্যের বা ভারত-ভাস্কর্য্যের

ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গে আর্য্যপ্রভাব দৃঢ়মুদ্রিত। ভাষায়, আচার-ব্যবহারে ও সুকুমার সাহিত্যেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন সময় হইতে কিরূপ ঘটনাচক্রে উড়িষ্যার ন্যায় দুর্গম প্রদেশে আর্য্যপ্রভাব প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বকালবর্ত্তী তৃতীয় শতাব্দীতে—মহারাজাধিরাজ অশোকের কলিঙ্গবিজয়ের সমসাময়িক কাল হইতে—উড়িষ্যার সহিত মগধের ভুবনবিখ্যাত মৌর্য্যসাম্রাজ্যের সম্পর্ক সংস্থাপিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাকেই উড়িষ্যায় আর্য্যপ্রভাব-বিস্তৃতির আরম্ভকাল বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না।

উড়িষ্যা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র "প্রদেশ"। তাহা অন্যান্য "প্রদেশ" হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল না। ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ উভয় বিভাগের নানা "প্রদেশে"র সহিত উড়িষ্যার অল্পবিস্তর সম্পর্ক থাকিবার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সম্পর্ক যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন "উড়িষ্যা" নামটি পর্য্যন্ত প্রচলিত হইতে পারে নাই; তাহা অপেক্ষাকৃত উত্তরকাল হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং উড়িষ্যায় যাহা আছে, তাহাকে উড়িষ্যার চতুঃসীমার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উদ্‌ভাবিত প্রাদেশিক শিল্প-নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যাঁহারা ভারত-শিল্পের ইতিহাস-সঙ্কলনে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই আর উড়িষ্যাকে অনন্যসাধারণ প্রাদেশিক শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছেন না। সুপণ্ডিত ভিন্সেণ্ট স্মিথ কৃত নবপ্রকাশিত ভারতশিল্পের ইতিহাসে তাহা স্পষ্টাক্ষরেই সূচিত হইয়াছে।

উড়িষ্যার শিল্পাদর্শ কোন্ শিল্পাদর্শ, তাহাই সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাস্য। তাহা যে ভারতবর্ষের বাহিরের কোনও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য শিল্পাদর্শের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত হয় নাই, সে কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এই কথা সর্ব্বাংশে সত্য হইলেও, উড়িষ্যার শিল্পাদর্শকে উড়িষ্যায় উদ্‌ভাবিত অনন্যসাধারণ শিল্পাদর্শ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। গ্রন্থকার ইহার যথাযোগ্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিলে, ভারত-শিল্পেতিহাসের সংকীর্ণ জ্ঞানগণ্ডীর ক্ষুদ্র সীমা কিয়ৎপরিমাণে বিস্তৃত করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, গ্রন্থারম্ভে মানিয়া লইয়াছেন,—

"উড়িষ্যার শিল্প আশ্চর্য্যরূপেই তাহার জন্মগত পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ;—যেখানে জন্ম, সেখানকার ভূমিখণ্ডের উপরেই লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে,—বাহিরের কোনরূপ সহায়তা লাভ করে নাই। স্থাপত্যের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ ;—এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোনও স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

এইরূপ উপক্রমের উপযুক্ত উপসংহারে গ্রন্থকার আরও স্পষ্টভাষায় লিখিয়াছেন ;—

"সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, আমি মনে করিতেছি যে,—বাঙ্গালা দেশের পক্ষে যত দূর পূর্ব্বগৌরবের দাবী করা সম্ভব হইতে পারে, উড়িষ্যার দাবী তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদনিচয়ের মধ্যে বাঙ্গালা অপেক্ষা উড়িষ্যার স্থানই অগ্রগণ্য ছিল।"

গ্রন্থকার কিরূপ প্রমাণের বলে এরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুলনা সকল সময়েই আপৎসঙ্কুল ; তাহা কথনও কথনও অপ্রীতিকর হইবারও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং তুলনার অবতারণা না করিলেও, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের প্রকৃত গৌরব ক্ষুণ্ণ হইত না। ইহার অবতারণা করায়, অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা দেশের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এখনও যথাযোগ্যভাবে পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানচেষ্টা প্রচলিত হয় নাই। এ কালের বাঙ্গালী কার্য্যের স্বাধীনতা হারাইয়া, চিন্তার স্বাধীনতাও হারাইতে বসিয়াছে ;—স্বদেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন কি, তদ্বিষয়েও সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেহ তাহাতে পদমাত্র অগ্রসর হইলে, অনেকে অনেক অনির্ব্বচনীয় কারণে, তাহার উৎসাহ দান না করিয়া, তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সমালোচনা করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। যে দেশে এখনও এইরূপ দুর্দ্দশার অবস্থা বর্ত্তমান, সে দেশের ভূগর্ভে কোথায় কি পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন লুক্কায়িত আছে, তাহা জানা না বলিয়াই, তাহাকে উড়িষ্যার তুলনায় হীন বলিয়া প্রচার করা চলে না। প্রাচীনকালের কথা যাহাই হউক, মধ্যযুগের বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য-রীতি বাঙ্গালা দেশেই উদ্ভাবিত হইয়া, উড়িষ্যাদি বহু দূরদেশেও প্রভাববিস্তার করিয়াছিল।

এই ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইবার পূর্ব্বে, উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য একটি অনন্যসাধারণ শিল্প-সম্পৎ বলিয়া উল্লিখিত হইত। এখন সুধীসমাজে সেই পুরাতন সিদ্ধান্ত আর আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। পুরাকালে ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাহার পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রমাণাবলী যতই আবিষ্কৃত

হইতেছে, ততই উড়িষ্যার প্রাদেশিক গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষের সাধারণ গৌরব বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

কোণার্ক মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ব—জগমোহন ও তৎপার্শ্বে বিধ্বস্ত বিমান।

অন্যান্য প্রদেশে, রাষ্ট্রবিপ্লবের অব্যাহত ধ্বংসলীলায়, পুরাতন কীর্তিকলাপের অধিকাংশই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে; অনেক স্থলে নবাগত বাহ্যপ্রভাবেও মূলপ্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উড়িষ্যায় যাহা আছে, তাহা অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। ইহাই উড়িষ্যার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গৌরব। এক সময়ে উত্তর-ভারতের সকল স্থানে একই রীতির স্থাপত্য-নিদর্শন বর্তমান ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ "ইন্দো-এরিয়ান"

রীতি বলিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন। তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত, আর্য্য-রচনারীতি। উত্তর-ভারতের খাজুরাহ নামক স্থানে এই রীতির অনেকগুলি দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই রচনারীতি এক সময়ে সমগ্র উত্তরাপথে ও তদন্তর্গত প্রাচ্যভারতেও প্রভাববিস্তার করিয়াছিল; তজ্জন্যই প্রাচ্যভারতের অন্তর্গত উড়িষ্যাপ্রদেশে এখনও তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নিদর্শন বাহ্যপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয় নাই বলিয়া, উত্তর-ভারতের পুরাতন স্থাপত্য-রীতির তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে, উড়িষ্যা হইতেই তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিতে হয়। গ্রন্থকার নিজেও উড়িষ্যা হইতেই কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন; এবং উড়িষ্যার স্থাপত্য যে "ইন্দো-আরিয়ান" রচনারীতির স্থাপত্য, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

আর্য্য স্থাপত্য-রীতিতে গঠিত দেবমন্দিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন্ অংশের সহিত কোন্ অংশের কিরূপ মান-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত, উড়িষ্যার মন্দিরসমূহে তাহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকার প্রশংসনীয় উদ্যমে অশেষ অধ্যবসায়বলে তাহার মাপগুলি প্রকাশিত করায়, এই গ্রন্থ সকলের পক্ষেই উড়িষ্যা-ভ্রমণের সহচর হইবার যোগ্য হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য স্থাপত্য বিজ্ঞানে গ্রন্থকারের যে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা আছে, তাহার সহিত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বাস্তুজ্ঞান মিলিত হইয়া, এ বিষয়ে মণিকাঞ্চন যোগ সংঘটিত করিয়াছে।

গ্রন্থোক্ত সকল কথার সহিত সকলের মতের মিল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; গ্রন্থকার নিজেও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সকল বিষয়ে মতের মিল না ঘটিলেও, সকলকেই গ্রন্থকারের উদ্যমের পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিতে হইবে। যাঁহারা মনে করেন,—স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষের আলোচনায় বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্য শ্রমস্বীকার ও অর্থব্যয় নিরর্থক, অথবা আপাততঃ তাহার আলোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই,—তাঁহারা যাহা জানেন না, বা বুঝিতে পারেন না, সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের একটি প্রধান পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ দান করেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, ইহার সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিলে, বঙ্গসাহিত্যের কিছু উপকার হইবার আশা আছে;—এরূপ পরামর্শের প্রভাব সুসংযত হইলে, অনুসন্ধান

কারিগণের কর্ম্মক্ষেত্র কণ্টক-বিমুক্ত হইতে পারিবে। এই একটিমাত্র কারণেই এই গ্রন্থখানি বহুমূল্য বলিয়া কথিত হইতে পারে।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। ইংরাজী ভাষায় না লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিলে, গ্রন্থখানি অধিক সুলিখিত হইত। দেশের লোকে দেশের কথা দেশের ভাষায় লিখিলে, অনেক লোকে উপকারলাভ করিতে পারিত। সম্প্রতি তিন জন বাঙ্গালী পুরাতত্ত্ববিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন ;—তিনখানিই ইংরেজী ভাষায় লিখিত। ইহাতে হয় ত একটি উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের পুরাতন শিক্ষা-দীক্ষার ও সাহিত্য-শিল্পের মূলসূত্রের সন্ধানলাভের জন্য পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ধারণা এই যে, আমরা আমাদের নিজের দেশের কথাও ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিবার যোগ্যতা লাভ করি নাই ; আমাদের গ্রন্থে বা প্রবন্ধে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যলাভ করে না। এরূপ ধারণাকে একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই ; কারণ, আমাদের আলোচনা-প্রণালী এখনও সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক পন্থায় আরোহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। যাঁহারা সেই প্রণালীর অনুসরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে ও তাহা সুধী-সমাজে মর্য্যাদালাভ করিলে, আমাদের রচনা-চেষ্টা উত্তরোত্তর গৌরবলাভ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ চেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে,অধিক উপকারলাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখনও তাহার পথ বড়ই সংকীর্ণ। সে পথে অনধিকারচর্চ্চার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার এখনও অত্যন্ত প্রবল ;—লেখা অপেক্ষা লেখকের নামের মোহই অধিক। যতদিন একনিষ্ঠা অপেক্ষা পল্লবগ্রাহিতা,—গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপকতা,—পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পণ্ডিতম্মন্যতা বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির পথ সংকীর্ণ করিয়া রাখিবে, ততদিন দেশের লোকে প্রকৃত পণ্ডিত-সমাজের নিরপেক্ষ সমালোচনায় শিক্ষালাভ করিবার আশায়, দেশের কথা বিদেশের ভাষায় লিখিতে থাকিলে, তাহা বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ভারতবর্ষের পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র, ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষ্য করিয়া, অনেকেই তথ্যানুসন্ধানে বীতরাগ হইয়া পড়েন।

যে দেশ মানব-সভ্যতার বহুপুরাতন লীলাভূমি, বহু যুগের বহু বিপ্লবের চিতাভস্মাচ্ছন্ন মহাশ্মশান, তাহাতে পুরাকীর্ত্তির ধারাবাহিক নিদর্শন সহসা আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। উড়িষ্যার অবস্থাও সেইরূপ। একশ্রেণীর পুরাকীর্ত্তি প্রাচীনযুগের সাক্ষ্যদান করে; আর এক শ্রেণীর পুরাকীর্ত্তি মধ্যযুগের সাক্ষ্যদান করে; কিন্তু এই উভয় যুগের মধ্যবর্ত্তী কালের সহিত ধারাবাহিকতা দেখাইয়া দিতে পারে, এরূপ পুরাকীর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যায় না; তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন যুগের কীর্ত্তি-বিজ্ঞাপক যে সকল নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাও অতি প্রাচীনতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। তাহার গঠন-সামঞ্জস্য, সৌন্দর্য্যবিকাশ-কৌশল ও রচনা-গাম্ভীর্য্য তাহাকে আদিযুগের অশিক্ষিত সমাজের প্রথম আত্মপ্রকাশচেষ্টার অসম্পূর্ণ নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারে না। তাহাকে বহুযুগের বহুসাধনার পরিণত ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। খণ্ডাচলের গিরিগুহাবলী এই শ্রেণীর পুরাকীর্ত্তির প্রধান নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

খণ্ডাচল উড়িষ্যার পুরাতন শিল্পনিদর্শনের অক্ষয় গৌরবাচল। এই দ্বিধাবিভক্ত অচল-কলেবর এখন খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে পরিচিত। উভয় খণ্ডেই বহুসংখ্যক পুরাতন গুহা বিদ্যমান আছে। এই স্থান এখন গুহাবলীর অবস্থানভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু অতি পুরাকালে কোন না কোনরূপ ধর্ম্ম প্রসিদ্ধির কারণ বিদ্যমান না থাকিলে, এখানে এত-গুলি গুহা রচিত হইয়াছিল কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে প্রসিদ্ধির মূল কি, তাহা কতদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছিল, এখন আর তাহার সন্ধান-লাভের উপায় নাই। সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই অনুন্নত শৈলনিবাস বহু যুগের বহুসংখ্যক সাধক-সম্প্রদায়ের পবিত্র পদরেণুসংস্পর্শে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ গুহার ক্ষুদ্র আয়তন হইতে তাহার রচনা-প্রয়োজন অনুমিত হইতে পারে। তাহা বিলাসীর বিলাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই; সাধকের সাধনানুকূল আশ্রমকুটীর-রূপেই রচিত হইয়াছিল। ভক্ত সাধক তাহাকে ভক্তি-সলিলে সুমাজ্জিত করিয়া শিল্প-কৌশলে সুসজ্জিত করিয়াছিল। তাহার শান্তসমাহিত অনির্ব্বচনীয় মাধুরী এখনও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহা এখনও পুরাতন ভারতবর্ষের একখানি ধ্যানস্তিমিত দৃশ্যপটের ন্যায় সম্ভোগ

অপেক্ষা সংযমের মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়া, মানব-সভ্যতার প্রকৃত উচ্চ লক্ষ্যের দিকে নীরবে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে।

এই সকল গুহা কিছুদিন লোকসমাজে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বনানীনিহিত গুহাগৃহগুলি সাহিত্যেও অনুল্লিখিত ছিল। ষ্টারলিঙ্গ্ ইহার সন্ধানলাভ করিয়া, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ম্যাকেঞ্জীর সাহায্যে হস্তিগুম্ফার শিলালিপি প্রকাশিত করিবার পর, তাহার কথা পুনঃপুনঃ আলোচিত হইতেছে। কোন গুহা কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল,শিলালিপির ও ভাস্কর্য্যরীতির সাহায্যে তাহার পরিচয়-সংগ্রহের জন্য অনেকে অনেক চেষ্টার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"হস্তিগুম্ফা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বকালবর্ত্তী চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত, এবং নবমুনিগুম্ফা সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন, প্রথম খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী।" ইহার সহিত সকলের মত-সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারের মতে, খণ্ডাচলে বৌদ্ধ ও জৈন, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এক সময়ে গুহাবলী বৌদ্ধ-কীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়া কথিত হইয়াছিল। ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজী হস্তিগুম্ফার শিলালিপির পাঠ উদ্ধৃত করিয়া খারবেল নামক কলিঙ্গাধিপতির কীর্ত্তিকাহিনীর ব্যাখ্যা করিবার পর, পূর্ব্বমত কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এই সকল গুহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন এখনও তিরোহিত হয় নাই। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া, গ্রন্থকার তাহার প্রতি পুনরায় পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। খণ্ডগিরির শিখরদেশে যে আধুনিক জৈন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থকার তাহাকে অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত মহারাষ্ট্রীয়গণের কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই সকল গুহার মধ্যে যে কয়েকটি বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, গ্রন্থকারও কেবল সেই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। লোক-সমাজের ন্যায় সাহিত্য-সমাজেও "ফ্যাসানে"র প্রভাব প্রবল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া, গুহাবলীর মধ্যে স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করিতে পারিলে, অনেক নূতন নূতন তথ্য সঙ্কলিত হইতে পারে। যে গুহার মধ্যে জৈন তীর্থঙ্করগণের সলাঞ্ছন শ্রীমূর্ত্তিনিচয় বর্ত্তমান আছে, সেই গুহার বাহিরে ও ভিতরে অনেকগুলি শক্তিমূর্ত্তিও

বর্ত্তমান আছে। তীর্থঙ্করগণের ও শক্তিনিচয়ের শ্রীমূর্ত্তি মধ্যযুগের ভাস্কর্য্য-প্রথার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৎকালে এক দিকে তান্ত্রিক মত, অন্য দিকে মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকতাপূর্ণ বৌদ্ধমত যে ভাবে শ্রীমূর্ত্তি-রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল, জৈনগণের উপাস্য তীর্থঙ্করগণেরও সেই ভাবের নিজ নিজ শক্তির পৃথক মূর্ত্তি রচিত হইয়াছিল। ঐ সকল জৈন শক্তিমূর্ত্তি ও তান্ত্রিক শক্তিমূর্ত্তি যে একই শ্রেণীর, এক প্রকারের বীজ-সম্ভূত, এবং একই প্রকার আরাধনা-প্রণালীর অন্তর্গত, খণ্ডগিরিতে মূর্ত্তিশিল্পে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকার তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বরং জৈন তীর্থঙ্করগণের পর্য্যায়ভুক্ত সুপরিচিত মূর্ত্তির সহিত গুহাবস্থিত মূর্ত্তি-পর্য্যায়ের যৎসামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে শিল্পীর অজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। সকল স্থানে লাঞ্ছনের যথাযোগ্য পরিদর্শন কার্য্য কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; তজ্জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ন্যায় গ্রন্থকারও কোনও কোনও তীর্থঙ্কর মূর্ত্তিকে চিনিবার অযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে প্রচলিত আলোচনা-প্রণালীর অনুসরণমাত্রেই গ্রন্থকারের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইতে পারে না।

উড়িষ্যার নানা স্থানে মধ্যযুগের যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরের দেবমন্দিরগুলি সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া সুপরিচিত। এখন যাহার নাম ভুবনেশ্বর, তাহারই পুরাতন নাম—একাম্রকানন। তাহা উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান শিবক্ষেত্র হইলেও, তথায় একটি শক্তি-মন্দির ও একটি বিষ্ণু-মন্দিরও দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই পবিত্র ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সকলগুলিই প্রস্তরগঠিত, কোনও কোনও মন্দিরের কারুকার্য্য জগদ্বিখ্যাত। অনেক মন্দির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যাহা আছে, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। তন্মধ্যে উচ্চতায় ও রচনা-গাম্ভীর্য্যে লিঙ্গরাজের মন্দির, ভাস্কর্য্য-গৌরবে পরশুরামেশ্বর ও মুক্তেশ্বর মন্দির, শিখর-সামঞ্জস্যে রাজারাণীর মন্দির সুধীসমাজে সুপরিচিত।

কোনও কোনও মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। যে সকল এঞ্জিনিয়ারের উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা বহু যত্নে বহুশ্রমে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়েই সংস্কার-কার্য্য যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। দুই এক স্থলে যৎসামান্য ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া গিয়াছে; গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজে এঞ্জিনিয়ার হইয়াও, সংস্কার-কারক আধুনিক

এঞ্জিনিয়ারগণকে লইয়া বিলক্ষণ রঙ্গ করিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রানভিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারগণের হাতে পড়িয়া, পরশুরামেশ্বর-মন্দিরের ও ভাস্করেশ্বর-মন্দিরের (?) গণপতি ও পার্ব্বতী পার্শ্বদেবতাদ্বয়ের অবস্থান-কুক্ষি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে; পার্ব্বতীর কুক্ষিতে গণপতি ও গণপতির কুক্ষিতে পার্ব্বতী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।" যে সকল মন্দির ভারত-স্থাপত্য-রীতির নিদর্শনরূপে যুগে যুগে অধ্যয়নশীল শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা দান করিবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে যাহার সংস্কারকার্য্যের জন্য অর্থব্যয় করিয়া সদাশয় গবর্মেণ্ট বহুযত্নে কীর্ত্তিরক্ষা করিতেছেন, তাহাতে সত্যসত্যই এরূপ কুক্ষি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিলে, তাহার সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু এরূপ কুক্ষি-বিপর্য্যয় সত্যসত্যই সংঘটিত হইয়াছে কি না, গ্রন্থকার তাহার বিচার করিবার চেষ্টা করেন নাই। শৈব মন্দিরের পার্শ্বদেবতা—গণপতি, কার্ত্তিকেয় ও শক্তি। কার্ত্তিকেয়ের নির্দ্দিষ্ট কুক্ষি মূলমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে; শক্তির কুক্ষি উত্তরভাগে, এবং গণপতির কুক্ষি দক্ষিণভাগে। সুতরাং দর্শক কোনও পূর্ব্বদ্বারী শৈব-মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার দক্ষিণে গণপতির কুক্ষি ও বামে শক্তির কুক্ষি দেখিতে পাইবেন;—লিঙ্গরাজের মন্দিরে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দর্শক কোনও পশ্চিমদ্বারী শৈব-মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান হইলে, সেরূপ কুক্ষিবিন্যাস দেখিতে পাইবেন না; দেখিবেন—তাঁহার দক্ষিণে শক্তি ও বামে গণপতি। কারণ, কুক্ষিগুলি নির্দ্দিষ্ট "দিক্‌" পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা যে কেবল ভুবনেশ্বরেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নয়। যেখানে সংস্কার-কার্য্যের সূত্রপাত হয় নাই, এবং আধুনিক এঞ্জিনিয়ারগণের উপরে কটাক্ষপাত করিবারও কিছুমাত্র উপায় নাই, সেখানেও এইরূপ। মুখলিঙ্গমের সোমেশ্বর-মন্দিরে তাহার উদাহরণ আছে। সুতরাং পশ্চিমদ্বারী পরশুরামেশ্বর-মন্দিরের ও (লেখক কর্ত্তৃক ভাস্করেশ্বর নামে কথিত) পশ্চিমদ্বারী মেঘেশ্বর মন্দিরের যে কুক্ষিতে যে পার্শ্ব-দেবতা থাকিবার, তাহাই আছে; এঞ্জিনিয়ারগণের অপরাধ নাই। অনেক স্থলে এইরূপ আরও অনেক গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাবে কোনও কোনও স্থলে অজ্ঞাতসারে গ্রন্থকার কল্পনা-স্রোতে বহুদূরে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছেন। একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। দেবমূর্ত্তির প্রভামণ্ডলের নিম্নে, বিজয়তোরণের পার্শ্বদেশে ও দেবমন্দিরের নানা স্থানে গজরাজের উপরে বিক্রমপ্রকাশকারী সিংহমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়;—উড়িষ্যার বাহিরেও ইহার

অসদ্ভাব নাই। গ্রন্থকার এই গজসিংহ-মূর্ত্তির আলোচনায় লিখিয়াছেন,—ইহা উড়িষ্যার কেশরী রাজগণের বৌদ্ধবিজয়-বিজ্ঞাপক শিল্প-চিহ্ন! বিষ্ণু-মন্দিরের পার্শ্বদেবতার কুক্ষিগুলির পরিচয় দিবার জন্য, পুরীধামের জগন্নাথ-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—তাহার পার্শ্বদেবতা,—নৃসিংহ, বামন ও কল্কী। বলা বাহুল্য, তাহার পার্শ্বদেবতা—নৃসিংহ, বামন ও বরাহ।

অনন্তবাসুদেব-মন্দির ভট্টভবদেব নামক বাঙ্গালীর কীর্ত্তি,—তাঁহার শিলালিপি অদ্যাপি মন্দিরপ্রাঙ্গনের প্রাচীরগাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রশস্তি বাচস্পতি নামক কবির রচিত বলিয়া শিলাফলকে উল্লিখিত আছে। লিপির সাহায্যে মন্দিরের রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারে। গ্রন্থকার সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া, [২৭৩ পৃষ্ঠায়] অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের মতাবলম্বী হইয়া, অনন্তবাসুদেব-মন্দিরকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কীর্ত্তি বলিয়া আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু [৩৭৮ পৃষ্ঠায়] সে সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া, এই মন্দিরকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগের কীর্ত্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলোচনায় লিপ্ত হইবার পর, গ্রন্থকারের মত এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মত-পরিবর্ত্তনের ফলে, গ্রন্থকার অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুপণ্ডিত ডাক্তার গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"র গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রকে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও ভট্টভবদেবের প্রশস্তি-লেখক বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন; এবং রামচরিত কবিশেখর নামক কুলশাস্ত্রলেখককে হরিবর্ম্মদেবের প্রশস্তি-লেখক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত একবার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচনায় সংক্ষেপে প্রচার হইয়াছিল; আবার বর্ত্তমান গ্রন্থকারের রচনায় পুনরুক্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তটি কত দূর বিচারসহ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় তাহা পরীক্ষিত হইতে পারে না। ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য-কীর্ত্তির ইতিহাসে ভট্টভবদেবের নাম উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাঁহার মন্দির-নির্ম্মাণের কাল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া নির্ণীত হইলে, ভুবনেশ্বরের স্থাপত্যের ইতিহাস নূতন করিয়া রচনা করিতে হইবে। গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে উড়িষ্যার ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, এইরূপ অনেক তর্কসঙ্কুল সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন।

পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনগুলির আলোচনা করিয়া কি কি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানলাভ করা যাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধানের মুখ্য বিষয়। আজকাল অবলীলাক্রমে যে সকল ঐতিহাসিক মত প্রচারিত হইতেছে, তাহার সাহায্যে স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির আলোচনা করিতে হইলে, সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা কঠিন হইয়া পড়িতে পারে। উড়িষ্যায় যে সকল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে ইতিহাসের উপাদানের অভাব নাই। তাহার সহিত "মাদলা পাঞ্জী"র সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য নাই; এবং সকল বিষয়ে "মাদলা-পাঞ্জী" ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে নিঃসংশয়ে অবলম্বিত হইতে পারে না। গ্রন্থকার তাহা লক্ষ্য করিয়াও, রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "কুলপঞ্জী"কে নিঃসংশয়ে অবলম্বন করায়, তাঁহার নিকট বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি সকল স্থলে সমান সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি এই গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য;—ইহা বাঙ্গালী লেখকের অভিনব অনুসন্ধানচেষ্টার প্রথম ফল;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আদরের সামগ্রী। গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে, এবং ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই, ইহার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিলাম। গ্রন্থকার যে আমাদিগকে এরূপ বহুবিবরণপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্যই আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানচেষ্টা কোন্ প্রণালীতে পরিচালিত হইলে, সত্য-নির্ণয়ের সহায় হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমাদের দেশের লেখকগণের মধ্যে মত-পার্থক্যের অভাব নাই। জনশ্রুতি, জনশ্রুতি-মূলক আধুনিক সাহিত্য ও জাতিগত—সম্প্রদায়গত চিরপরিচিত সুদৃঢ় সংস্কার, আমাদিগকে সকল বিষয়েই অল্পাধিকপরিমাণে সনাতন-বাদী করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, যাহা আছে, তাহাই যুগযুগান্তর হইতেই বর্ত্তমান আছে। ধ্বংসাবশেষমাত্রই বিশ্বকর্ম্মার কীর্ত্তিচিহ্ন; তাহাতে মানব-হস্তের স্পর্শদোষ সংক্রামিত হইতে পারে নাই। এরূপ ধারণা অজ্ঞাতসারে-শিক্ষিত-সমাজকেও কিয়ৎপরিমাণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধানচেষ্টার প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় বেষ্টিত থাকিয়াও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর তথ্যানুসন্ধানচেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল না হইলেও, আশাপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ ও অনুকরণযোগ্য। গ্রন্থকার তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা যতই ঘনীভূত হইবে, গ্রন্থকারের নিকট

ততই অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতি উপকার লাভ করিতে পারিবে।

মধ্যযুগে উড়িষ্যার সঙ্গে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব ছিল না। উড়িষ্যা যখন কলিঙ্গ রাজ্যের অংশমাত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে গোদাবরীতীর পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে এক শাসনতন্ত্র সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। পালরাজগণ যখন গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাসাধনের জন্য দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন তৃতীয় পাল-নরপাল দেবপালদেবের ভ্রাতা বিজয়ী জয়পালের নামমাত্র "দূর হইতে শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া [স্বকীয়] রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন," দেবপালদেব "উৎকলকুলকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন।" এই ঐতিহাসিক বিবরণ নারায়ণপালদেবের [ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ও বরেন্দ্রভূমির গরুড়স্তম্ভলিপিতে যথাক্রমে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

এই সকল সমসাময়িক প্রাচীন লিপির প্রমাণে উৎকল রাজ্যের সহিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের যে সকল সম্পর্কের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, উড়িষ্যার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাহার পরিচয়-বিজ্ঞাপক কোনও প্রমাণ বর্ত্তমান আছে কি না, এখনও তাহার তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হয় নাই। গ্রন্থকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিতেন।

কোণার্কের ধ্বংসাবশেষ এখনও যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। মহানদী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ কোণার্ক সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার অত্যল্পকাল পরে প্রকাশিত বর্ত্তমান গ্রন্থে কোণার্কের অনেক বিবরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি কোণার্কের অনেক কথাই আলোচিত হয় নাই। কোণার্কে যে সকল সূর্য্যমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে সূর্য্যদেবের পদদ্বয়মধ্যে পৃথিবী দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় সূর্য্যমূর্ত্তিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি, তাহা এখনও ব্যাখ্যাত হয় নাই। স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রচনাকাল-বিজ্ঞাপক কি কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এবং তাহার সাহায্যে ধ্বংসাবশেষগুলির রচনাকাল কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে, তাহার আলোচনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

ফার্গুসনের ভারত-স্থাপত্য-বিষয়ক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার সময়ে (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে) কোণার্কের অনেক ধ্বংসাবশেষ

ভূগর্ভে লুক্কায়িত ছিল। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে মন্দিরসজ্জার বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া, পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের তুলনায় কোণার্কের সূর্য্য-মন্দিরকে অধিক প্রাচীন কালের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, শিল্পের ক্রমোন্নতির যুগে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে) কোণার্কের সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; জগন্নাথ-মন্দির তাহার অনেক পরে,—শিল্পের অধোগতির যুগে, নির্ম্মিত হইয়াছিল! এই সিদ্ধান্ত এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার ফার্গুসনের ভ্রম-প্রদর্শনের জন্য "মাদলা পাঞ্জী"র ও প্রাচীন লিপির শরণাপন্ন হইয়াছেন; কিন্তু কোণার্কের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাহার অর্ব্বাচীনতার কি কি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। আশা করি, সুযোগ্য গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়া, উড়িষ্যার ও তাহার ধ্বংসাবশেষের বিবরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবেন। যাহা সুন্দর হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হউক, এই আশায় এ সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা।

দার্শনিক বলেন, কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্বাতন্ত্র্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব করি বলিয়াই, উহাকে কোনও এক বিশেষ বস্তু বলিয়া ভাবিয়া থাকি;—পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই যেন আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের সমষ্টি।* কোনও বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি কি, তাহা শুধু যুক্তি দ্বারা বুঝিবার প্রয়াস করিতে পারি;—উহা স্থূল ইন্দ্রিয়-বোধের বহির্ভূত।

বিজ্ঞান শুধু বস্তুর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রকৃতি লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়বোধকে অবিমিশ্রিত ইন্দ্রিয়বোধ বলিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিকেই ঠিক অবিমিশ্রিত বলা যাইতে পারে না। যেমন আস্বাদন। কথায় বলে, "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্।" শুধু ঘ্রাণ লইলে অর্দ্ধভোজন না হইলেও, ভোজনের আনন্দটুকুর জন্য ঘ্রাণ (flavour) অনেকটা দায়ী। এক জন দার্শনিক বলিয়াছেন,—চক্ষু মুদ্রিত ও নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে পলাণ্ডু ও

* "Phenomenalism" of Kant. "A permanent possibility of sensations" mill.

আপেলের মধ্যে কোনও পার্থক্য বুঝা যায় না। লেবুর রসটুকু নিংড়াইয়া ফেলিলেও উহার গন্ধেই জঠর ও জিহ্বা পুলকিত হইয়া উঠে। রসগোল্লাগুলি সুগোল সুদর্শন না হইয়া যদি কুৎসিতদর্শন হইত, তবে সম্ভবতঃ আস্বাদনেও তারতম্য ঘটিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বক্তৃতাকালে তাঁহার গাম্ভীর্য্যবিমণ্ডিত বদনমণ্ডলের বিচিত্র ভঙ্গী না দেখিতে পাইলে যেন আলোচ্য বিষয়ের তাৎপর্য্য সম্যক সুস্পষ্ট হয় না।

পরিদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুর অন্যান্য গুণাবলী দূরের কথা,উহাদের আয়তন-সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সঠিক জ্ঞান কি না, ভাবিবার বিষয়। আমাদের নেত্রযন্ত্র যদি অন্য কোনও প্রকারের হইত, তাহা হইলে উহাদের আয়তনও হয় ত অধিকতর ছোট বা বড় দেখিতাম। দূরবীক্ষণের সাহায্যে বস্তু বৃহত্তর দেখায়, এবং দূরবীক্ষণের ক্ষমতা (power) যতই প্রবল হইবে, কোনও বস্তুও ততই বৃহত্তর দেখাইবে ; কাজেই দূরবীক্ষণের ক্ষমতা অনন্ত (infinite) হইতে পারিলে বস্তুর আয়তনও অনন্ত। সেইরূপ চক্ষুঃ-দর্পণ (opticlens) যদি অধিকতর ক্ষমতাশালী হইত,তাহা হইলে হয় ত বস্তুও বৃহত্তর দেখিতাম। তবে বস্তুর যথার্থ আয়তন কি? আপত্তি হইবে—আমরা ত শুধু চোখের উপর নির্ভর করি না;—আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, উহা দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু কোনও বস্তুর আয়তন যদি স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, তবে চক্ষু দ্বারা উহাকে যত বড় দেখিব, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারাও উহাকে তত বড় করিয়াই সীমাবদ্ধ করিব। কারণ, ঐরূপ চক্ষু দ্বারা আমাদের হস্তপদাদিও বৃহত্তর দেখিব,এবং ইঞ্চি, ফুট প্রভৃতির নামের কোনও পরিবর্ত্তন না করিলেও, উহাদের (ইঞ্চি, ফুট প্রভৃতির) আয়তন যে অনুপাতানুযায়ী দৃশ্যতঃ বৃদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, "পরিমাণ", "সংখ্যা" প্রভৃতি আপেক্ষিক শব্দমাত্র।

মানুষ কি হইলে কি হইত, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, মানুষ যাহা আছে, সেই অবস্থায় তাহার কৌতুকপ্রদ ভুলভ্রান্তির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

গভীর রাত্রি। শয্যায় শুইয়া আছি। বিশ্ব নিস্তব্ধ। তন্দ্রা আসিল। স্বপ্ন দেখিতেছি, যেন এক বিশালাকার বিকটদর্শন মনুষ্য আমার শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। দেশলাই জ্বালিলাম, প্রেত অদৃশ্য হইল ; কিন্তু দেশলাই নিবিয়া গেল। আমার চক্ষু উন্মীলিত, কিন্তু অন্ধকারে আবার সেই মূর্ত্তি! হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাণপণে

উহাকে আক্রমণ করিলাম,—কেহই নাই! চন্দ্রালোক গৃহস্থিত নানা বস্তুর বিচিত্র ছায়াপাতের সহিত মিলিত হইয়া ঐ কাল্পনিক প্রেতের সৃষ্টি করিয়াছিল। একটু হাসিলাম। কিন্তু বক্ষঃস্পন্দন তখনও রহিয়া গিয়াছে। ইহা কি? চক্ষুর্দ্বয় ত সম্পূর্ণ বিস্ফারিত ছিল, তথাপি ঐরূপ ভুল হইবার অর্থ কি? ইহাকে দর্শন-প্রহেলিকা (Illusion) বলে। যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার ধারণা (?) (idea) ঐরূপ প্রহেলিকাদর্শনের মূল।

উপরি-উক্ত ব্যাপার না হয় চিত্তের সাময়িক অসুস্থতা-জাত ধরিয়া লইলাম; কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় যে সকল আশ্চর্য্য ভ্রান্তি করিয়া থাকি, তাহার কারণ কি?

কালফণিনীকে রজ্জু বলিয়া ভ্রমের ইতিহাস না পাইলেও, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিবার দৃষ্টান্তটি যে মামুলী, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এরূপ ভ্রান্তির কারণ কি? দার্শনিক বলিয়াছেন যে, জগতে আমরা দর্শন অপেক্ষা বিচারই বেশী করি—অর্থাৎ, আমরা নিছকভাবে দর্শন করিতে জানি না;—দর্শকের পরিবর্ত্তে তার্কিক হইয়া পড়ি, এবং আমরা কোনও বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা গ্রহণ করি, সেই ধারণাটি অতর্কিত-কৃত যুক্তির ফলমাত্র। পূর্ব্বসংস্কারও কোনও বস্তুকে যথাযথরূপে দর্শনের পক্ষে অল্প বাধা নহে।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

মাধব-বর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[প্রশস্তি-পরিচয়।]

পুরী জেলার অন্তর্গত বিরোবৈ গ্রাম-নিবাসী, পুরী কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, স্বর্গীয় পদ্মচরণ মহান্তি মহাশয়ের নিকট হইতে পুরী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সদাশিব মিশ্র মহাশয় এই তাম্রশাসন-খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গত শারদীয় পূজাবকাশে বরেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতির সদস্যগণ উৎকলে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ে, মহামহোপাধ্যায় মিশ্র মহাশয় সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক, বন্ধুবর শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ বি. এ. মহাশয়কে পাঠোদ্ধারের জন্য এই তাম্রপট্টখণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। ৺পদ্মচরণ মহান্তি মহাশয় পুরী জেলায় কোন স্থানে নিজেই এই তাম্রশাসনখানির আবিষ্কার করিয়াছিলেন,

আবিষ্কার-কাহিনী।

কিংবা অন্য কেহ অন্য কোনও স্থানে আবিষ্কার করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলেন, তাহার কোনও সন্ধান লাভ করা যায় নাই।

অনুসন্ধান-সমিতি উৎকল-ভ্রমণের পর রাজসাহীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আমার উপর এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ভার অর্পণ করায়, মূল তাম্রশাসনের সহিত মিলাইয়া, ফটোগ্রাফের সাহায্যে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে, যে ভাবে পাঠ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই সুধীসমাজের বিচারার্থ প্রকাশিত হইল। পাঠোদ্ধারের পর, ব্যাখ্যা কার্য্যেও আমাকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

এই তাম্রশাসনের বংশ-বিবৃতি-সূচক শ্লোকগুলি মান্দ্রাজের বুগুড়া গ্রামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মার তাম্রশাসনের শ্লোকাবলীর অনুরূপ; এবং ইহার চতুর্থ শ্লোকটি ব্যতীত অন্যান্য শ্লোক কয়টি মধ্যমরাজের পারিকুদ্‌-তাম্রশাসনেও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু বুগুড়া-শাসনের প্রকাশকালে [Ep. Ind. Vol III p 44. and Vol. VII. p 100] অধ্যাপক কিলহর্ণ, এবং মধ্যমরাজের তাম্রশাসন-প্রকাশকালে [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা] শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. মহাশয় শ্লোকগুলির অনুবাদ প্রকাশিত করেন নাই।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

এই তাম্রশাসনের আয়তন ৬″×৩½″ ইঞ্চ। তাম্রপট্টের দক্ষিণভাগের মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তিতে ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তিতে সংস্কৃতভাষা-নিবদ্ধ পদ্য-গদ্যাত্মক দানলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠার প্রারম্ভেই দুইটি অক্ষরের পর, বুগুড়া ও পারিকুদ-তাম্রশাসনের ৭ম শ্লোকের তৃতীয় চরণ ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার একাদশ পংক্তির শেষেও "ধর্ম্ম-গৌরবাৎ"—পদের প্রথম চারিটি অক্ষরমাত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে;—লিপি-সমাপ্তি-বিজ্ঞাপক কোনও কথাই বর্ত্তমান নাই। এই সমস্ত কারণে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সমগ্র দান-লিপি এই প্রকার তিন খণ্ড ক্ষুদ্র তাম্রপট্টে ক্ষোদিত হইয়াছিল। প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড হারাইয়া গিয়াছে। তাম্রশাসন-সংবদ্ধ কোনও রাজমুদ্রা ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। লিপিটি নবম-দশম শতাব্দীর [গঞ্জাম প্রভৃতি স্থানে পরিদৃষ্ট] উত্তর-ভারতীয় অক্ষর-ভেদে লিখিত। কৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকর-প্রমাদের অভাব নাই।

লিপি-পরিচয়।

মাধব বর্ম্মা দেবের তাম্রশাসনের সম্মুখের পৃষ্ঠা।

Mohila Press, Calcutta.

এই তাম্রশাসনে বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে সৈন্যভীতের "বংশে" [২য় পংক্তি] যশোভীত নামক কোনও ক্ষিতীশের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যশোভীতের "তনয়" [৪র্থ পংক্তি] সৈন্যভীত-নামধারী ভূমিপতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শেষোক্ত সৈন্যভীতই পঞ্চম শ্লোকে "শ্রীনিবাস"—আখ্যায় বর্ণিত হইয়া, ষষ্ঠ শ্লোকে আবার "মাধব বর্ম্মা" নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই সৈন্যভীত [ওরফে শ্রীনিবাস বা মাধববর্ম্মা] রিপুকুল-প্রলয়তপন ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃরূপে অমরকুলের তৃপ্তিসাধক, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কোঙ্গেদ-মণ্ডলে "কৃত্তনকেত" [১১শ পংক্তি] ভূমিপতি মাধববর্ম্মা এই তাম্রশাসন সম্পাদন করাইয়া, শ্রীসামন্ত, মহাসামন্ত, মহারাজ, রাজন্যক, রাজপুত্র, অন্তরঙ্গ, দণ্ডনায়ক, দণ্ডপাশিক, উপরিক, বিষয়পতি, তদানিযুক্তক, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকরণ-ব্যবহারিগণকে এবং ব্রাহ্মণাদি জানপদদিগকে এবং চাটুভটাদি জাতীয়দিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, কোঙ্গেদ-মণ্ডলান্তঃপাতী খোরণ-বিষয়-সম্বদ্ধ মালগ্রামটি কৌশিক-গোত্রীয়, উচথ্যাদিপ্রবর, ছন্দোগচরণ, কৌথুমশাখ ভট্ট বিত্তদেবকে, মাতা পিতার ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য যাবচ্চন্দ্রসূর্য্য নিষ্কর করিয়া [যথাবিধি সলিলধারাপুরঃসর] প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্র-শাসনপ্রতিপাদয়িতা মাধববর্ম্মা উৎকলের শৈলোদ্ভব-বংশীয় কোনও নরপতি, এবং তাঁহার নিকেতভূমি [নিবাস] কোঙ্গেদ-মণ্ডলেই অবস্থিত ছিল।

লিপি-বিবরণ।

১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কিলহর্ণ মাধববর্ম্মার "বুগুড়া তাম্রশাসন" শীর্ষক যে প্রবন্ধ (১) প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শৈলোদ্ভবের কুলে ["কুলজঃ"] রণভীত নামক কোনও ব্যক্তি জন্মপরিগ্রহ করিবার, এবং ইন্দ্রসমানপ্রভাব রণভীতের সৈন্যভীত নামক এক পুত্র রাজা হইবার কথা উল্লিখিত আছে। এই সৈন্যভীতকে সৈন্যভীত ১ম বলিলেও বলিতে পারা যায়। তৎপরে এই প্রথম সৈন্যভীতের "বংশে" "ক্ষিতীশ" যশোভীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যভীত ১মের কয় পুরুষ পরে তাঁহার "বংশে" এই যশোভীতের জন্ম হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই যশোভীতের পুত্র সৈন্যভীতই [ওরফে মাধববর্ম্মা বা শ্রীনিবাসই] বুগুড়া-শাসনের প্রতি-পাদয়িতা। কিন্তু এই শ্রীনিবাস সৈন্যভীতাক দ্বিতীয়-তৃতীয়াদি আখ্যায়

(১) Epigraphia Indica. Vol. III. p. 41.

অভিহিত করা যাইতে পারে না। আলোচ্য তাম্রশাসনেও আমরা এই রাজ-বংশের অনুরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হইতেছি। এই উভয় শাসন হইতে বংশ-তরু এইরূপ আঁকিতে হইবে।—

শৈলোদ্ভব
⋮
(তৎকুলজঃ) রণভীত
|
(তৎসূনুঃ) সৈন্যভীত (১ম)
⋮
(তদ্বংশজাতঃ) যশোভীত
|
(তত্তনয়ঃ) সৈন্যভীত = শ্রীনিবাস = মাধববর্ম্মা।

বুগুড়া-তাম্রশাসনের পাঠ-প্রকাশকালে (২) অধ্যাপক কিলহর্ণ মাধব-বর্ম্মাকে সৈন্যভীতের পুত্র বলিয়া যে মত প্রচারিত করিয়াছিলেন, শশাঙ্কের রাজ্যকালে প্রদত্ত সৈন্যভীতের [গঞ্জামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনখানির (৩) সম্পাদনকালে [১৯০০—০১ খৃষ্টাব্দে] ডাক্তার হলৎস্ রাজমুদ্রাতে মাধবের পরিবর্ত্তে সৈন্যভীতের নাম অঙ্কিত দেখিয়া, সৈন্যভীত মাধবেরই নামান্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার পর, অধ্যাপক কিলহর্ণ [১৯০২—০৩ খৃষ্টাব্দে] স্বকীয় পূর্ব্বতন মত পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রবন্ধ (৪) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণের মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের মহারাজ-মহাসামন্তরূপে যে মাধবরাজ ৬১৯ খৃষ্টাব্দে [৩০০ গুপ্তাব্দে] কোঙ্গেদ-মণ্ডল হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু অপর এক মাধবরাজের পৌত্র, এবং যশোভীতের পুত্র যথা,— "মহারাজ-মহাসামন্ত-শ্রীমাধবরাজস্য প্রিয়তনয়ো মহারাজ-যশোভীতঃ, তস্যাপি প্রিয়সূনুঃ স্বগুণ-মরীচিনিকর-প্রবোধিত-শৈলোদ্ভব-কুলকমলঃ.........মহারাজ-মহাসামন্ত-শ্রীমাধবরাজঃ কুশলী" (৫)। তদনন্তর (৬) স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর

(২) Epigraphia Indica Vol III. p. 42. P. 144.

(৩) Epigraphia Indica, Vol. VI.

(৪) Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 100.

(৫) Epi. Ind. Vol. VI. p 144.

(৬) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (New Series) Vol I.

মহাশয় খুর্দ্দার তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশিত করেন। সেই শাসনের পাঠ হইতে আমরা তাম্রশাসন-প্রতিপাদয়িতা মাধবরাজকেও সৈন্যভীতের পৌত্র ও যশোভীতের আত্মজ বলিয়া কথিত দেখিতে পাই। এই উভয় শাসন হইতে যে তিন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহারা পিতামহ-পিতৃ-পুত্র-সম্বন্ধে সম্পর্কিত বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহাদের মধ্যে কোনও পুরুষান্তর ছিল না। এই তিন নরপতির পূর্ব্বে কোনও নরপতির নামও উল্লিখিত হয় নাই। যথা,—

মাধবরাজ [গঞ্জাম] = সৈন্যভীত [খুর্দ্দা]
|
যশোভীত
|
মাধবরাজ [= সৈন্যভীত মুদ্রানাম]

এই শেষোক্ত মাধবরাজ ও আলোচ্য শাসনের মাধববর্ম্মা একই ব্যক্তি হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের মাধববর্ম্মা [ওরফে সৈন্যভীত বা শ্রীনিবাস] যশোভীতেরই পুত্র বটে, কিন্তু কোনও সৈন্যভীতের পৌত্র নহেন ;—সৈন্যভীতের "বংশে" উৎপন্ন যশোভীতের "তনয়" বলিয়া উল্লিখিত। গঞ্জাম ও খুর্দ্দা শাসনে উল্লিখিত সৈন্যভীত ১ম বা মাধববর্ম্মা ১মের "বংশে"ও আমাদের ও বুগুড়া-শাসনের মাধববর্ম্মার পিতা যশোভীতের জন্ম ধরিতে পারা যায়। তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে যে, রণভীতের পুত্র সৈন্যভীত শৈলোদ্ভব-বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে প্রথম সৈন্যভীত বা প্রথম মাধবরাজ, এবং [রণভীতের প্রপৌত্র], এই সৈন্যভীতের পৌত্র, যশোভীতের "তনয়," সৈন্যভীত ২য় বা মাধবরাজ ২য়ই শশাঙ্করাজের মহাসামন্তরূপে ৬১৯ খৃষ্টাব্দে কোঙ্গেদ-মণ্ডল হইতে তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন। বুগুড়া, পুরী ও পারিকুদুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত রণভীতের পুত্র সৈন্যভীত ১মের "বংশে" উৎপন্ন যশোভীত-তনয় মাধববর্ম্মা [ওরফে সৈন্যভীত বা শ্রীনিবাস] রণভীত-সূনু সৈন্যভীত ১মের পৌত্র, মাধবরাজ ২য় বা সৈন্যভীত ২য় হইতে পৃথক ব্যক্তি। তবে রণভীত-সূনু সৈন্যভীত ১ম যদি গঞ্জাম ও খুর্দ্দার শাসনের প্রথম মাধবরাজ বা সৈন্যভীত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই উভয় শাসনের প্রতিপাদয়িতা মাধবরাজ বা সৈন্যভীতকে দ্বিতীয় মাধবরাজ বা দ্বিতীয় সৈন্যভীত আখ্যা প্রদান করাও অসঙ্গত ;—কারণ, রণভীত-সূনু সৈন্যভীত ১মের পরে আরও অনেক পুরুষ

রাজা থাকিবার পর, গঞ্জাম ও খুর্দ্দার প্রথম মাধবরাজ বা সৈন্যভীতের উৎপত্তি হইতে পারে। অথবা, রণভীতের পূর্ব্বেও তাঁহাদের তিন পুরুষের স্থান হইতে পারে। তথাপি "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ষোড়শ ভাগের চতুর্থ সংখ্যার ১৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠায়, "মধ্যমরাজের তাম্রশাসন"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ মহাশয় সৈন্যভীত (২য় ?) বা শ্রীনিবাস মাধববর্ম্মা-(২য় ?)-কে গঞ্জাম-শাসনের আদেশকারী মাধবরাজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া, শেষোক্ত ব্যক্তির কালনির্ণয়ে, মধ্যমরাজের পিতামহ সৈন্যভীত-শ্রীনিবাস-মাধববর্ম্মাকেও ৬১৯ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া, তৎপৌত্র যশোভীত-তনুজ মধ্যমরাজকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের শেষার্দ্ধে কিংবা অষ্টম শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া "বোধ" করিয়াছেন। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। পারিকুদ্ ও বুগুড়া শাসন হইতে তিনি যে বংশতরু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। তাঁহার উদ্ধৃত পাঠের ১৫শ পংক্তিতে "তস্যাপি বংশে" কথাই প্রধান অন্তরায়। গঞ্জাম-শাসনের অক্ষরও বুগুড়া, পারিকুদ্ ও আলোচ্য তাম্রশাসনের অক্ষর হইতে প্রাচীনতর বলিয়াই লক্ষিত হয়। অতএব আমাদের মাধববর্ম্মা (শ্রীনিবাস), একই বংশের তুল্যনামধারী অনেক পরবর্ত্তী নৃপতি।

মাধববর্ম্মা তাঁহার নিজবংশীয় পূর্ব্বতন নৃপতিগণের ন্যায় কোঙ্গেদ-মণ্ডলেই নিজ "নিকেত" স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই স্থানটি কোঙ্গেদ, কোঙ্গোদ, বা কৈঙ্গোদ নামে ভিন্ন ভিন্ন তাম্রশাসনে কোদিত দেখা যায়। গঞ্জাম-শাসনে এই স্থানটি উৎকলের শালিমা নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক কিলহর্ণ বলিয়াছেন যে, ইউয়ান্ চোয়াঙ্-নির্দ্দিষ্ট Kong-u-t'o (৭) ও কোঙ্গোদ একই স্থান। কারণসান্ মহোদয় কোঙ্গেদকে গঞ্জাম জেলার [কটক ও আস্ক নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী] কোনও স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র-রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইউয়ান্ চোয়াঙ্ আরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, সেই সময়ে কোঙ্গেদ-মণ্ডলেও উত্তর-ভারতীয় অক্ষর-মালাই প্রচলিত ছিল। কোঙ্গেদ-মণ্ডল হইতে প্রচারিত ও বর্ত্তমান যুগে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে ইহার যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৭) Beal's *Si-yu-ki*. Vol. II. p. 206.

মাধব বর্ম্মা দেবের তাম্রশাসনের পশ্চাতের পৃষ্ঠা।

Mohila Press, Calcutta.

[প্রশস্তি-পাঠ।]

[সম্মুখের পৃষ্ঠা।]

১। বাং (ন্) [।]

যং প্রা[প্য] নৈকশত-নাগঘটা-বিঘট্ট-

লব্ধ-প্রসাদবিজ[য়ং মু]মুদে

২। ধরিত্রী * [॥] (১)

তস্যাপি † বঙ্‌শে[থ] যথার্থনামা

জাতো যশোভীত ইতি ক্ষি-

৩। তি(তী)শঃ [।]

যেন প্রক(রূ)ঢ়োপি শুভৈ ‡ শ্চরিত্রৈ-

র্ম্মৃ(ষ্টঃ) কলঙ্ক[ঃ] কলৌ(লি)-দর্প্পণস্য [॥] (২)

---

* "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ষোড়শভাগের চতুর্থ-সংখ্যায় মধ্যমরাজের তাম্রশাসনের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিবার সময়ে, শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ মহাশয় 'ধরিত্রী'কে 'ধরিত্রীং' পাঠ করিতে হইবে বলিয়া একটি অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন কেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে, তাহার কারণ উদ্ঘাটন করা অসম্ভব।

(১) বসন্ততিলক। সমগ্র শ্লোকটি মাধববর্ম্মার বুগুড়া-শাসনেও উৎকীর্ণ আছে, [Epi. Ind. Vol III. P. 44 and Vol VII P. 100]। তদনুসারে সমগ্র শ্লোকটি এইরূপ :—

তস্যাভবদ্বিবুধপাল-সমস্ত সূনুঃ

শ্রীসৈন্যভীত ইতি ভূমিপতির্গরীয়ান্।

যং প্রাপ্য নৈকশত-নাগঘটা-বিঘট্ট-

লব্ধ-প্রসাদবিজয়ং মুমুদে ধরিত্রী ॥

এই শ্লোকের 'নাগঘটা' শব্দটি অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্তৃক সংশয়সহকারে 'বৈরি-ঘটা' রূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল। শ্রীযুত রাখালবাবু উহাকে অসংশয়ে 'নাশ-ঘটা' রূপে উদ্ধৃত করিয়া, নাগের নাশ ঘটাইয়া দিয়াছেন।

† তাম্র-পট্টে "তস্য তস্যাপি" ক্ষোদিত আছে ; তাহা লিপিকর-প্রমাদমাত্র।

‡ তাম্রপট্টে "শুভশুভৈশ্চরিত্রৈঃ" ক্ষোদিত আছে ; তাহাও লিপিকর-প্রমাদমাত্র। অন্যথা ছন্দোভঙ্গ উপস্থিত হয়।

(২) ইন্দ্রবজ্রা। মধ্যমরাজের তাম্রশাসনের এই শ্লোকের পাঠ উদ্ধৃত করিতে গিয়া, শ্রীযুত রাখালবাবু 'মৃষ্ট'কে 'দৃষ্ট' করিয়া, 'কলঙ্ক'কে ভাসিয়া দিয়াছেন।

৪। [আতোথ] * তস্ত তনয় স্মৃকৃতি(তী) সমস্ত-
সীমন্তিনী-নয়নষট্পদ-পুণ্ডরীক [:] ॥ (।)
শ্রী-

৫। সৈন্যভীত ইতি ভূমিপতি র্মহেভ-
কুম্ভস্থলী দলন-দুর্ললিতাসি-

৬। ধার[:] [॥] (৩)
জাতেন যেন কমলাকরবৎ স্বগোত্রম্
উন্মীলিতং দিনকৃতেব

৭। মহোদয়েন [।]
সঙ্ক্ষিপ্ত-মণ্ডলকচণ্ড গতা[:] প্রণাশ-
মাশু দ্বিষো গ্রহ-গ-

৮। ণা ইব যস্য দীপ্ত্যা [॥] (৪)
কালেয়ৈ ভূতধাত্রী-পতিভি রুপচিতানেকপাপা-

৯। বতারৈ-
নীতা যেষাং কথাপি প্রলয় মভিমতা কীর্তিপালৈ রজস্রম্ [।]

১০। যজ্ঞৈ স্তৈরশ্বমেধ-প্রভৃতিভিরমরা লম্ভিতা তৃ(তৃ)প্তিমুর্ব্বীং-
মুদ্ধৃত্যা-রাতি-

১১। পঙ্ক-ক্ষয়কৃতি-পটুনা শ্রীনিবাসেন যেন ॥ (৫)
কোঙ্গেদ-কৃত-নিকেতঃ

---

* "আতোথ"—শব্দস্থ তাম্রপটে স্থান পায় নাই।

৩) বসন্ততিলক।

(৪) বসন্ততিলক। এই শ্লোকটি মধ্যমরাজের তাম্রশাসনে নাই। সুতরাং তাম্রশাসনে ইহা দশম শ্লোকরূপে উৎকীর্ণ থাকায় Ep. Ind. Vol III p. 44. হইতে তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া, শ্রীযুত রাখাল বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় 'সংক্ষিপ্তমণ্ডলকচণ্ড' 'সংক্ষিপ্তমণ্ডলকচণ্ড' হইয়াছে; 'প্রণাশ' 'প্রণাস' হইয়াছে; 'দ্বিষো' 'দীপ্যো' হইয়াছে; এবং 'যস্ত' তস্ত' হইয়াছে।

† উর্ব্বীম্—মহতীম্। 'তৃপ্তিম্' পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত।

(৫) স্রগ্ধরা। মধ্যমরাজের শাসনের এই শ্লোকের পাঠকালে শ্রীযুত রাখাল বাবু 'উর্ব্বীং'কে 'উর্ব্বীং' রূপে, এবং 'উদ্ধৃত্য'কে 'অর্জ্জিত' রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

[পশ্চাতের পৃষ্ঠা।]

১২। শারদ-নিশাকর-মরি(রী)চি-সিত-কীর্ত্তি[ঃ] [।]
স শ্রীমাধব[ব]র্ম্মা রিপু-মান-

১৩। বিঘট্টন[ঃ] কুশলী ॥ (৬)
অস্মিং (ন্) ভূম্ম(ম)ণ্ডলে শ্রীসামন্ত-মহাসাম-

১৪। ন্ত-মহারাজ-রাজন(ন্য)ক-রাজপুত্র[া]-ত(ন্ত)
রঙ্গ-দণ্ডনায়ক-দণ্ডপাশি-

১৫। নো (কো)পরিকর*-বিষয়পতি-তদানিযু[ক্ত]
কাশ্ব(ন্ব)র্ত্তমান-ভবিষ্যতো ব্য-

১৬। বহারিণ[ঃ] সকরণাং (ন্) ব্রাহ্মণপুরোগাদী(ন্)+
জানপদাংশ্চাট্টভট-বল্লম(?)

১৭। জাতীয়াং(ন্)যথার্হং পূজয়তি মানয়তি — বিদিতমস্তু ভবতাম্

১৮। খোরণ‡বিষয়সম্বদ্ধ-মালগ্রাম[ঃ] × × × × × (১)কৌশিক

১৯। গোত্রায় × (২) উত্তথ্য প্রবরায় × × × (৩)নানাপ্রবরায়
চ্ছন্দোগচরণা-

২০। য় কৌথুমশাখায় ভট্টবিস্তুদেবস্য § মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ
পুণ্যা-

(৬) আর্য্যা।

* অন্যান্য তাম্রশাসনে 'উপরিক' পাঠই বহুশঃ দৃষ্ট হয়।

+ ব্রাহ্মণ-পুরোগাদীন্—'পুরো'গ শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই শব্দটিকে শ্রীযুত রাখাল বাবু যথাযরাজের শাসনপাঠকালে 'ব্রাহ্মণপরো আদি'রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

‡ খুর্দা-শাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, শ্রীমাধবরাজ এই খোরণ-বিষয়-সম্বন্ধ "আরহর" নামক একটি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।

(১) এই স্থানের পাঁচটি অক্ষর তাম্রপট্টে অর্দ্ধ-বিলুপ্ত।

(২) এই স্থানে অর্দ্ধলুপ্ত অক্ষরটিকে 'লু' বলিয়া বোধ হয়।

(৩) এই স্থানের অক্ষরত্রয় 'ললুত' বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু তাহাতে অর্থবোধ হয় না। একটি লোকের সম্বন্ধে দুইবার 'প্রবর' উল্লেখের প্রয়োজনও বুঝিতে পারা যায় না।

§ 'ভট্টবিস্তুদেবায়' হইবে।

২১। ভিবৃদ্ধয়ে সলিলধারাপুর[ঃ]সরেণাকরত্বেন* মা-(আ) চন্দ্রার্ক্কং ক্ষিতী (তি)সম-

২২। কালং প্রতিপাদিতোস্মাভি[ঃ]—যতশ্চ তাম্র(ম্র)পট্টকং দশধা ধর্ম্মগৌর—

[বঙ্গানুবাদ।]

(১)

বহুশত গজঘটার বিঘট্টন উৎপাদন করিয়া, তিনি প্রসাদ-বিজয় লা ক'রয়াছিলেন বলিয়া, ধরিত্রী তাঁহাকে [সৈন্যভীতকে নরপতিরূপে] প্রা হইয়া, প্রমুদিতা হইয়াছিলেন।

(২)

অনন্তর তাঁহারও [সৈন্যভীতের] বংশে যথার্থনামা যশোভীত নামে খ্যাত ক্ষিতিপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি [নিজ] শুভ ক্রিয়াকলাপের দ্বার কলিদর্পণের কলঙ্ক মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছিলেন।

(৩)

অনন্তর সকল-ললনা-নয়ন-মধুকর-কুলের পুণ্ডরীক-সদৃশ, সুকৃতী শ্রীসৈন্যভীত নামক ভূমিপতি তাঁহার [যশোভীতের] তনয়-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসিধারা মহাগজগণের কুম্ভস্থলী বিদারণ-ব্যসনে [সততই] আসক্ত থাকিত।

(৪)

দিনকরের উদয়ে যেমন কমলাকর উন্মীলিত [প্রস্ফুটিত] হয়, সেইরূপ সমৃদ্ধিমান এই [সৈন্যভীতের] উৎপত্তিতে তাঁহার নিজকুলও উন্মীলিত [প্রথিত] হইয়াছিল। দিনকরের দীপ্তিতে গ্রহগণের মণ্ডল-প্রভা সংকীর্ণ হইলে, তাহারা নিজেও যেমন অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ তাঁহার [সৈন্যভীতের] প্রভাবে অরাতিচক্রের প্রতাপও সংক্ষিপ্ত হইলে, তাহারা নিজেও প্রণষ্ট হইয়াছিল।

(৫)

কলিকালের ভূপতিগণ অনেক অনেক পাপের অবতারণা বৃদ্ধি করিয়া, কীর্ত্তিপালক [নরপাল-কুলের] সতত অভিপ্রেত যে সকল [অশ্বমেধাদি] যজ্ঞের

* গঞ্জাম জেলায় ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত আবিষ্কৃত তাম্রশাসনেই "অকরত্বেন", "অকরীকৃত্য" ও "অকরং"—এই পদগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

কথা পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, উদ্দৃপ্ত-শত্রুপক্ষ-ক্ষয়করণপটু এই শ্রীনিবাস অমরবৃন্দের মহতী তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

(৮)

কোজেদ-কৃতনিবাস শারদীয়-শশি-ময়ূখ-শুক্লকীর্ত্তি, রিপুদর্পাপহারী কুশলী সেই শ্রীমাধববর্ম্মা,—

এই ভূমণ্ডলে শ্রীসামন্ত, মহাসামন্ত, মহারাজ, রাজন্যক, রাজপুত্র, অন্তরঙ্গ, দণ্ডনায়ক, দণ্ডপাশিক, উপরিক, বিষয়পতি, তদানিযুক্তক, এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকরণ-ব্যবহারিগণকে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাদি জনপদবাসিগণকে, এবং চাট্ট-ভট বল্লম-(?)-জাতীয়গণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন ; – আপনারা সকলেই অবগত হউন যে, খোরণ-বিষয়-সম্বদ্ধ মালগ্রামটি...কৌশিকগোত্রীয় উতথ্যাদি-নানা-প্রবর, ছন্দোগচরণ, কৌথুম-শাখাধ্যায়ী ভট্ট বিস্তদেবকে, মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য নিষ্কর করিয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর [এবং] ক্ষিতিসমকাল পর্য্যন্ত উদকধারাপূর্ব্বক প্রদান করিলাম। এই হেতু তাম্রপট্টখানি দশধা ধর্ম্মগৌরবার্থ...।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

সাহিত্যে নৈতিক চাবুক।

[প্রতিবাদ।]

গত মাঘ মাসের সাহিত্যে" "বীরবল" দ্বিজেন্দ্র বাবুকে "সাহিত্যে চাবুক" সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বিবিধ নূতন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তবে সেগুলির মধ্যে যেগুলি "সত্য", সেগুলি নূতন নহে, এবং যেগুলি "নূতন", সেগুলি সত্য নহে।

প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি "আনন্দ-বিদায়"-রচনায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য দৈববলে জানিয়াছেন ; এবং তাহার জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় প্যারায় তিনি রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্র বাবুর লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া সমভাবে "দুঃখিত এবং লজ্জিত" হইয়াছেন। দুটি ধারণাই অমূলক। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। অতএব সে বিষয়ে নীরব থাকিয়া বীরবলের মতের আলোচনা করা যাউক।

২

বীরবল বিজ্ঞের মতই সমালোচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ক্রমাগত শূন্যে ঢিল মারিয়াছেন। তিনি এমন সব অবান্তর তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, যাহাতে আনন্দবিদায় সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, অথচ একটি প্রবন্ধ হয়। এ প্রথা মন্দ নহে।

বীরবলের মতে তিনটি রস আছে ; যথা, হাস্য, করুণ ও মধুর। ছিল, নব রস, হইল তিন রস। পরে আরও কি দাঁড়ায়, বলা যায় না। আমি বলি, অত গোলযোগে কাজ কি ? একটি রস রাখিলেই যথেষ্ট—অর্থাৎ মধুর রস। 'বীর', 'করুণ', মায় খেজুররস পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং অদ্বৈতবাদের কাছাকাছি পঁহুছানো যায়। কিন্তু এ বিষয়ে তর্ক অপ্রাসঙ্গিক।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অদ্বিতীয়।—" ইহাও অপ্রাসঙ্গিক। (শুধু এই হিসাবে প্রাসঙ্গিক যে, শ্রীযুক্তের হাস্যরসাত্মক রচনার সমালোচনা করিতে হইলে "লাফাইবার পূর্ব্বে একবার চাহিয়া দেখা" ভালো।)

৩

"কোনও জিনিস দেখিয়া যদি হাসি পায়, তাহা হইলেই অপরকে হাসাইতে পারি, কিন্তু যদি রাগই হয় ত রাগাইতেই পারি।"—গভীর ! যাহার রাগ হয়, সে অবশ্য হাসে না, কিন্তু অপরে কখনও কখনও হাসে। রবীন্দ্র বাবুর "হিং টিং ছট্" পড়িয়া চন্দ্রনাথ বসু হাসেন নাই, কিন্তু অপরে হাসিয়াছিল। বীরবলের রাগ হইলে প্রেমদাস কেন হাসিবে না— জানি না। তবে যাহাতে কাহারও হাসি পায় না, তাহাতে অবশ্য কাহারও হাসি পায় না। কিন্তু ইহা একটা আবিষ্কার নহে।

"Parody দেখিয়া দু ঘণ্টা কাল লোকে হাসে না।" কতক্ষণ হাসে ?— এক ঘণ্টা ? পনর মিনিট ? পাঁচ মিনিট ?

৪

Browning Wordsworthকে যে গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহার চারিটি লাইন নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

"Just *for a handful of silver* he left us."
"Blot out his name, then record *one lost soul more*."
"One more *triumph for devils* and sorrow for angels,
One wrong more to man, one *more insult to God*."

দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি রবীন্দ্রনাথকে এরূপ বলিতেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রের ভক্ত-সম্প্রদায় দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ঢিল মারিতেন।

Wordsworth কবি Byron, Shelley ও Keatsকে "Three poets of the satanic school নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—এই immoralityর জন্যই। Byron তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা 'বীরবল' জানেন না! আশ্চর্য্য! তথাপি Shelley ও Keats atheism ভিন্ন অন্য কোনও অপরাধে অপরাধী ছিলেন না, এবং Byronএর কাম-কবিতা রবীন্দ্রের কাম-কবিতার কাছে কিছুই নহে। Byron Don Juanএ লালসাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাতে লালসা' পূজা করিয়াছেন।

'কবিশেষের প্রতি চাবুক প্রয়োগ করা চলে না'।—স্বীকার। কিন্তু তাঁহার রচনাবিশেষের প্রতি চাবুকের প্রয়োগ চলে ত! তাহারই নাম তীব্র সমালোচনা। তাহাকে চাবুক নামে অভিহিত করা ভুল হইতে পারে। কিন্তু তীব্র সমালোচনা বলিয়া একরূপ সমালোচনা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে। ইহাতে অশোভন কিছুই নাই।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবিশেষের এইরূপই তীব্র সমালোচনা করিতেন। এইরূপ সমালোচনাই এইরূপ জঘন্য রচনাকে উন্মূলিত করিতে পারে।

কলি ও নলের উপমাটি বেশ হইয়াছে।

৫

'চাটিকা', 'ঝাঁটিকা' ইত্যাদির 'ইকা'য় যদি বীরবলের আপত্তি থাকে, না হয় বীরবল সেটুকু বাদ দিয়াই পড়িলেন। 'ধূলাঝাড়া' ও 'ঝালঝাড়া' রসিকতা বেশ হইয়াছে। কিন্তু তাহার মাত্রা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। পেঁচালো ভাষায় প্রকাশিত হইলেও ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দ্বিজেন্দ্র বাবু সমালোচনার নামে নিজের "ঝাল ঝাড়িয়াছেন।" এরূপ motive আরোপ সাহিত্য-সমাজে শোভা পায় না, এবং তর্কে ইহার কোনও সার্থকতা নাই। ইহা ব্যক্তিগত গালাগালি, অথচ আলোচ্য বিষয়টি মীমাংসা করিবার পক্ষে সহায়তা করে না।

"সাহিত্যের ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া" এরূপ code বীরবল কোথায় পাইলেন? মুক্তির ফল প্রায়ই দাঁড়ায় স্বেচ্ছাচার। সাহিত্যের ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার হইতে পারে না। তাহা হইলে সাহিত্যে বিরূপ সমালোচনার

স্থান নাই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সমাজ শাসনাধীন, সাহিত্য শাসনাধীন নহে ?

বীরবল নজীর দেখাইয়াছেন, "ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়া মুসলমানেরা আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী ভস্মসাৎ করিয়াছিল।" কিন্তু, তাহাতে কি প্রমাণ হয় যে, ধর্ম্ম ও নীতি খারাপ ? Christianityর দোহাই দিয়া সুসভ্য ইয়ুরোপ পৃথিবীময় গুলি গোলা চালাইতেছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নেড়ানেড়ীর দল হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনেক ব্রাহ্ম একটু বেশী গম্ভীর হইয়াছেন, (যদিও চিত্রাঙ্গদার ব্রাহ্ম কবি রবীন্দ্রকে তাঁহারা একঘরে করিয়াছেন—এরূপ শুনি নাই)। Platonic loveএর কি দুর্গতিই না হইয়াছে! শাক্ত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যপান ও নররক্তের স্রোত ভারতবর্ষে বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে কি প্রমাণ হয় যে, উক্ত ধর্ম্ম বা নীতিগুলি খারাপ ?

[মুসলমানগণ উক্ত পুস্তকাগার পুড়াইবার জন্য নীতির দোহাই দেয় নাই, ধর্ম্মের দোহাই দিয়াছিল বটে। "নীতি" কথাটি ধর্ম্মের সঙ্গে জুড়িয়া না দিলে উদাহরণটি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয়, এ জ্ঞান বীরবলের আছে, দেখিতেছি। এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তর্ক করিয়া সুখ আছে।]

"সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনেশে 'মি' হচ্ছে 'আমি'।"—বেশ রসিকতা। কিন্তু পুনর্ব্বার ইঙ্গিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ।

৭

"যামিনী না যেতে জাগালে না" সম্বন্ধে রসিকতাটি ভাল হয় নাই। যাহা হউক, ও গানটিতে বঙ্গসাহিত্যের কি অনিষ্ট হইয়াছে, বীরবল তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। বুঝাইয়া দিতেছি। "এ দেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হইতে প্রচলিত" থাকিলেও, অভিসার জিনিসটা খারাপ। অভিসারের অর্থ,—"স্ত্রীপুংসয়োরন্যতরস্য অন্যতরার্থং সঙ্কেতস্থলগমনম্।"—শব্দকল্পদ্রুম। "কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।" অতএব ইহা পুরাকালে থাকিলেও immoral, না থাকিলেও immoral। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ সাময়িক নীতি ও রুচির বাতাসের মধ্যে লালিত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষমার্জ্জনা করা যায়। কিন্তু এখন রুচি হিসাবে বিশুদ্ধতর বাতাস সেবন করিয়া কেহ সেরূপ লিখিলে মার্জ্জনা করিব কেন ? Shaskespeareএর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা এখন অনেক স্থলে রুচি হিসাবে অপাঠ্য।